বর্ষসূচী

৫২ম বর্ষ
(১৩৫৬ মাঘ হইতে ১৩৫৭ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী সুন্দরানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা ৷৷

উদ্বোধন—বিষয়সূচী

(মাঘ ১৩৫৬ হইতে পৌষ ১৩৫৭)

'উদ্বোধনে'র নববর্ষ

সম্পাদক

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধনে'র আর একটি বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইল। বর্তমান মাঘ মাসে এই মাসিক পত্র বাহান্ন বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘ কাল 'উদ্বোধন' ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সংযম প্রভৃতির মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে কীর্তন এবং মানবতার এই শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ যুগোপযোগী সংস্কার করিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। নববর্ষে পদক্ষেপ করিয়া এই মাসিক পত্র পুনরায় নবোদ্যমে তাহার আরব্ধ কার্যে আত্মনিয়োগ করিবে।

ইতিহাস সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ দেয় যে, পৃথিবীর মধ্যে প্রাচ্য দেশসমূহই বিশ্ব-মানবের অমূল্য সম্পদ ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভৃতির জন্মভূমি। প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষে এই সকল সম্পদ প্রথমে আবিষ্কৃত এবং পরে এখান হইতে অন্যান্য দেশে বিতরিত হয়। এইগুলি ভারতের অধিকাংশ নরনারীর জীবনে যেরূপ ভাবে রূপায়িত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ সম্ভব হয় নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে বর্তমানে নিদারুণ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার মধ্যেও অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবন ঐগুলি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মতে ইহাই ভারতের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে—ভারতে তো বহু ধর্ম, বহু দর্শন এবং বহু সংস্কৃতি আছে, ইহাদের মধ্যে কোন্ ধর্ম, কোন্ দর্শন এবং কোন্ সংস্কৃতি ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব? উত্তরে বলা যায়—এই বহু পরস্পরবিরোধী নয়, ইহারা স্ব স্ব বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও এক আশ্চর্য সামঞ্জস্যে সমন্বিত। বহুত্বের মধ্যে একত্বে এবং একত্বের মধ্যে বহুত্বে ভারতীয় সকল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ভারতবর্ষ বরাবর সৃষ্টির বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া উহাদিগকে একের অভিব্যক্তিরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা দিতেছে। মানুষমাত্রকেই তাহার অপূর্ণ জীবনের গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, মানুষের অস্থায়ী জীবত্ব দূর করিয়া তাহাকে শাশ্বত শিবত্ব দান এবং মানুষের আভ্যন্তর সত্য শিব ও সুন্দরকে তাহার ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশন ইহার আদর্শ। ত্যাগ সংযম

পরার্থপরতা ন্যায় নীতি তপস্যা প্রভৃতি এই মহান্ আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার উপায়। আধুনিক যুগে মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন এই অত্যুজ্জ্বল আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ। এই মহাপুরুষের জীবনে বিভিন্ন ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া ত্যাগ সংযম ও তপস্যাদি আশ্রয়ে অতি আশ্চর্যরূপে সমন্বিত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের এই জাতীয় বিশেষত্ব নির্বস্তুক ও অবাস্তব নয়, পরন্তু ইহা বস্তুতন্ত্রমূলক ও বাস্তব।

এই বাস্তব বৈশিষ্ট্যের জন্যই পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ধর্মভূমি—পুণ্যভূমি নামে অভিহিত ও সম্মানিত। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, এই বিশেষত্বই ভারতের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি। ইহা যত দিন অব্যাহত থাকিবে তত দিন ভারতের নাশ নাই। কিন্তু কোন কারণে যদি ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের এই প্রাণশক্তিরূপ বিশেষত্ব বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারা জাতি হিসাবে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় জীবনের এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক যুগে যুগে আবশ্যকীয় পরিবর্তন বা সংস্কার বরণ করিয়াই জীবনান্তকর বিপদরাশির মধ্যেও আজ প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাঁচিয়া আছে। সুতরাং ইহাই তাহার ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়। স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য 'উদ্বোধন' পুনরায় এই উপায়ের প্রতি দেশবাসীর সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, সদ্যমুক্ত স্বাধীন ভারতের আধুনিক সংস্কারকগণ ইহার অধিবাসিগণের চিরন্তন জাতীয় বিশেষত্ব ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সংযম প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান না করিয়া পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণে ধর্মবিবর্জিত রাজনীতির আশ্রয়ে তাহাদের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ সংস্কার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! ইঁহারা জানিয়াও জানেন না যে, ভারতের জাতীয় জীবন-গঙ্গাকে তাহার উৎসে ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করা অসম্ভব। এই প্রচেষ্টার বিষম ফলও সঙ্গে সঙ্গেই ফলিতেছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই অস্বাভাবিক চেষ্টার ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, ভারতবাসীর জাতীয় জীবন-রাগিণী অনেক ক্ষেত্রে বেসুরা বাজিতেছে, জাতীয় জীবনের সুরের সঙ্গে বহুবিষয়ক সংস্কার তাল রক্ষা করিতে পারিতেছে না! এই জন্য দেশময় অধর্ম অসত্য অন্যায় দুর্নীতি স্বার্থপরতা প্রভুত্ব প্রভৃতির একচ্ছত্র রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে! স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসকগণের অধিকাংশই এই সাংঘাতিক দোষগুলি দ্বারা ইতোমধ্যেই অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং এইগুলি ভারতের গণজীবন ক্রমেই অধিক মাত্রায় কলুষিত করিতেছে! জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশাও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা দ্বারা সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, দেশের গণজীবন—বিশেষ করিয়া দেশের অধিকাংশ পরিচালক শাসক ধনবান বিদ্বান শক্তিমান এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের জীবন সত্য ধর্ম ন্যায় ও নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে মানবতার দিক দিয়া অত্যন্ত দরিদ্র এবং সমগ্র জাতির মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। সত্য-ধর্ম-ন্যায়-নীতি-বিবর্জিত ভোগৈকলক্ষ্য রাজনীতিক মতবাদ এবং রাজনীতিক স্বাদেশিকতা দেশগত জাতিগত

দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন ও প্রভুত্ব-বিস্তারের উপায়রূপে পরিণত হইয়া বিশ্ব-মানবের কিরূপ অকল্যাণের কারণ হয়, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহাদের সত্য-ধর্ম-ন্যায়-নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল ভোগমূলক জাতীয়তা সংঘবদ্ধ স্বার্থপরতায় (Organised selfishness) রূপান্তরিত হইয়া জগতের মহা আতংকের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতবাসীর স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাকে এই অনর্থ হইতে মুক্ত রাখিতে হইলে তাহাদের জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব সত্য ধর্ম ন্যায় ও নীতির নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত করা অপরিহার্য।

সত্য বটে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সকল বিষয়ে জাগতিক উন্নতি-সাধনে যেরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, ভারতবাসী তাহা পারে নাই। স্বাধীন ভারতকে জগতের উন্নত ও শক্তিমান দেশসমূহের সমকক্ষ হইতে হইলে পাশ্চাত্যের জাগতিক উন্নতির উপায়গুলি গ্রহণ করিতেই হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভূত-পূর্ব উৎকর্ষ, জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্নবিষয়ক উচ্চশিক্ষা-বিস্তার, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ও কল-কারখানাদি পরিচালন, যাতায়াত ও সংবাদ-আদান-প্রদানের কল্পনাতীত সুবিধাসৃষ্টি, ভোগ-সুখের শত শত উপকরণ-সরবরাহ, গণতান্ত্রিক উপায়ে সুশৃঙ্খল ভাবে দেশশাসন, দেশরক্ষা ও যুদ্ধবিগ্রহের শত শত উপাদান-আবিষ্কার, দেশের জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়ন, জনগণের জন্য স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর খাদ্য এবং রোগে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান। স্বাধীন ভারতের পক্ষে এই দানগুলি গ্রহণ কেবল আবশ্যক নয়, পরন্তু অপরিহার্য। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বমানব-সভ্যতার উৎকর্ষ-সাধনে পাশ্চাত্যের এই অমূল্য অবদান-সমূহের যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, এই সকল সত্য-ধর্ম-ন্যায়-নীতি-বিবর্জিত ভোগলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ইহাদের আনুষঙ্গিক কুফলগুলিরও তেমন নিন্দা করিয়াছেন। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ জাগতিক উন্নতিক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করা সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মনীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল ভোগ কেবল তাহাদের নয় অধিকন্তু বিশ্ব-মানবের সুখশান্তি-পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য দূরদর্শী স্বামীজী পাশ্চাত্যের এই সাংঘাতিক ত্রুটিগুলি পরিহার করিবার একমাত্র উপায়রূপে তাহাদের সকলবিষয়ক জাগতিক উন্নতির অন্ধ অনুকরণ না করিয়া উহাদিগকে ভারতের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সংযম প্রভৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া গ্রহণ করিতে দেশবাসীকে উদাত্ত কণ্ঠে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের জাগতিক উন্নতি পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্তিত হউক, চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠুক, খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির উৎপাদন ও বিতরণব্যবস্থা চূড়ান্ত সমাজ-তান্ত্রিক নীতিমূলে পরিচালিত হউক, ভোগাধিকার-বৈষম্যশূন্য চূড়ান্ত শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া উঠুক, ইহাতে ভারতের উপকার ভিন্ন অপকার এবং উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইবে না। কিন্তু এই সকল সংস্কার তাহার জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সংযম প্রভৃতির অনুগত করিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহাই ভারতের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের এক-মাত্র উপায়। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বনে স্বাধীন ভারতের সকল বিভাগ সংস্কারের আবশ্যকতা প্রচার করিবার জন্য নববর্ষে পদার্পণ করিয়া 'উদ্বোধন' স্বদেশ-হিতৈষী শিক্ষিত মনীষিগণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

গুপ্তোত্তর বা আদি মধ্যযুগের কলাবিদ্যা (৬০০—৮০০ খৃঃ)

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

হর্ষবর্দ্ধন, আদি চালুক্য, রাষ্ট্রকূট এবং পল্লব

পঞ্চম শতাব্দীতে হূনদের আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী গুপ্ত-রাজত্ব মগধে টিকিয়া থাকে (৫৩৫-৭২০)। ইতোমধ্যে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থানেশ্বর ও কনৌজের হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৬৪৭) ক্ষমতালাভ করেন এবং গুপ্তদের লুপ্তগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। উত্তর ভারত হইতে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব বিস্তৃত ছিল।

হর্ষের ইষ্টদেবতা ছিলেন শিব, সূর্য্য এবং বুদ্ধ। প্রত্যেক দেবতার জন্য তিনি মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শেষ দিকে তিনি মহাযান-বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

এই যুগকে গুপ্তোত্তর যুগ বলা যায়; কারণ ইহাতে গুপ্তযুগের ধারাই প্রবহমাণ।

সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধবিহারসমূহ এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। হর্ষের সময়ে সুবিখ্যাত শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। হুয়েন শাঙ্ নালন্দার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার একটি দ্বার দিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে আটটি হল্ দৃষ্ট হয়। সুরম্য ও সুসজ্জিত গৃহের চূড়াগুলি পর্ব্বতশিখরের ন্যায় একত্র মিলিত। প্রভাতের কুজ্ঝটিকায় পর্য্যবেক্ষণের মন্দিরসমূহ যেন আবৃত; উপরিতলগুলি যেন মেঘের উপর বিরাজ করিতেছে। গবাক্ষপথে দেখা যায়, বাতাসে মেঘ নূতন আকার ধারণ করিতেছে, এবং ঊর্দ্ধে স্থিত ছাঁচে সূর্য্যচন্দ্রের সংযোজনা দৃষ্ট হয়। গভীর জলাশয়ের ভিতরে নীল পদ্ম ও গভীর নীলবর্ণের কনক পুষ্পের সম্মিলন দেখা যায়। বাহিরের প্রাঙ্গণে চতুস্তলযুক্ত ভিক্ষুদের বাসস্থান আছে। ড্রাগন (মকর) শোভিত। মুক্তার মত লাল কারুকার্য্য শোভিত রেলিং এর স্তম্ভ। ছাদ রঙ্গিন টালিতে ঢাকা, আলোকে সহস্র প্রকারে প্রতিফলিত হয়। এই সব দৃশ্যটির শোভাবর্দ্ধক।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ প্রাচীর ছিল ১৬০০ ফুট × ৪০০ ফুট। উহাতে ৮টি প্রবেশদ্বার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ১০,০০০ ভিক্ষু বাস করিতেন; ১০০টি উচ্চাসন হইতে দর্শন ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইত।

হুয়েন শাঙ্ প্রদত্ত নালন্দার বর্ণনা গুপ্তোত্তর যুগের। চৈনিক পরিব্রাজক ইচিংও নালন্দার বর্ণনা করিয়াছেন।

হুয়েনশাঙের লেখা হইতে জানা যায়, ৮০ ফুট উচ্চ বুদ্ধের তাম্রমূর্ত্তি ষট্-তলবিশিষ্ট মন্দিরের মধ্যে ছিল। ইহা খুবই আশ্চর্য্যজনক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ণবর্ম্মন্ ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। জাপানের নারার ব্রোঞ্জের বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি নিশ্চয়ই ইহার অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রায়পুর জেলার অন্তর্গত সিরপুরের লক্ষ্মণ-মন্দির সম্ভবতঃ হর্ষের সময়কার। ইহা ইষ্টক-

নির্ম্মিত শিখরমন্দির। মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। চৈত্যবাতায়ন কারুকার্য্য-শোভিত। সমস্ত মন্দির ষ্টুক্কো দ্বারা আবৃত ছিল।

আদি চালুক্য

রাজপুত-বংশোদ্ভব প্রথম পুলকেশী (৫৫০-৫৬৬) বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাতাপিনগরে (বর্ত্তমান বাদামি) রাজধানী স্থাপন করেন। বাদামি আইহোল এবং পট্টদকলের নিকটবর্ত্তী। দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৮-৬৪২) নাসিকে আর একটি রাজধানী স্থাপন করেন। হর্ষ তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। কাঞ্চির পল্লববংশীয় রাজা মহেন্দ্রবর্ম্মন্ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রবর্ম্মণের পুত্র নরসিংহবর্ম্মন্ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় পুলকেশী নিহত হন। চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৮০) এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৬) ৭৪০ খৃষ্টাব্দে পল্লব রাজধানী কাঞ্চিপুরম্ জয় করেন। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্যগণ রাষ্ট্রকূট দ্বারা পরাজিত হন।

আদি চালুক্যমন্দির বাদামির শিবালয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত।

এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পট্টদকলের বিরূপাক্ষ মন্দির ; উহা শিব অথবা লোকেশ্বরের উদ্দেশে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজ্ঞী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত। কাঞ্চীপুরম্ জয়ের পর ৭৪০ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটিতে পল্লবপ্রভাব দৃষ্ট হয়। কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ-মন্দিরের আদর্শে উহা নির্ম্মিত। মণ্ডপ স্তম্ভযুক্ত প্রাচীরে বেষ্টিত। জানালা প্রস্তরখণ্ড খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে। চতুষ্কোণ শিখরে বিভিন্ন তলা রহিয়াছে। শিখরে চৈত্যজানালা খোদিত আছে—ইহা দ্রাবিড়লক্ষণ। অনুমান করা হয়, কাঞ্চীপুরম্ হইতে পল্লব কারিগর আনাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। পুরাতন দ্রাবিড় মন্দিরের স্থাপত্যের ন্যায় বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সুরকি ছাড়া বসান ; উড়িষ্যার মন্দিরও এভাবে সুরকি ছাড়া নির্ম্মিত। বর্ত্তমানেও বিরূপাক্ষ-মন্দির বিশেষ জনপ্রিয়। কুমারস্বামী ইহাকে 'One of the noblest structures of India' বলিয়াছেন।

গুহামন্দির

গুহামন্দিরগুলি অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। গুপ্তদের প্রভাব শুধু উত্তর ভারতেই আবদ্ধ ছিল না, দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্য্যেও তাহা অনুভূত হইবে। এযুগে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মূর্ত্তিশিল্প পাওয়া গেলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শিল্পই প্রধান। গুপ্তশিল্পে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হওয়াতে তাহাতে আছে শান্তি ও স্থিতিশীলতার ভাব। আর গুপ্তোত্তর যুগে তাহা হইয়াছে গতিশীল ও পৌরুষভাবাপন্ন। তাহার কারণ এযুগে শিল্প হইল গুপ্ত ও মধ্যযুগের শিল্পের মধ্যবর্ত্তী।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম এসময়ে হীনপ্রভ ; হিন্দুধর্ম্ম নবজীবন লাভ করিয়া নবশক্তিতে বলীয়ান্। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এই নবচেতনা গুহাভাস্কর্য্যে ব্যক্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতাব্দী হিন্দু-ভাস্কার্য্যের শ্রেষ্ঠ সময় বলা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এবং অষ্টম শতাব্দীর পরে হিন্দু গুহা-মন্দির দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ১২০০ গুহামন্দির আছে, ইহার মধ্যে ১ শতেরও উপর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নহে, ৯০০ বৌদ্ধ, বাকী সব জৈন। স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে হিন্দুরা প্রচুর পরিমাণে বৌদ্ধদের নিকট ঋণী। প্রাচীন হিন্দু মন্দির গুপ্তযুগে দেখা যায়, সমতল ছাদ-যুক্ত কুঠরী বৌদ্ধদের অর্দ্ধগোলাকার ছাদ (Barrel-shaped roof—নৌকার ছইয়ের মত, বৌদ্ধ চৈত্যের ছাদের হয়ত নৌকার ছই হইতে উদ্ভব হইয়াছে)। কুঠরীর সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হইয়াছে অলিন্দ বা বারান্দা এবং স্তম্ভযুক্ত

ঢাকা প্রদক্ষিণপথ। গুপ্তদের কুঠরীমন্দির সৃষ্টি হইয়াছে নব্যপ্রস্তর যুগের 'ডলমেন' হইতে। প্রাচীন কতগুলি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাদের ছাদে কেবল একখানি পাথর আছে।

অজন্তাগুহা চিত্রের জন্যই অধিকতর বিখ্যাত; তবে কিছু ভাস্কর্য্যও উল্লেখযোগ্য। ২৬ নং গুহায় (সপ্তম শতাব্দী) বুদ্ধের শায়িত মূর্তি (মহাপরিনির্ব্বাণ) আছে, ২৩½ ফুট লম্বা। ইহা কাশিয়ার বুদ্ধমূর্ত্তির কথা স্মরণ করায়। দেয়ালে বুদ্ধ ও মারের আক্রমণের মূর্ত্তি খোদিত আছে; এই বিষয়ে অজন্তায় বিরাট চিত্রও আছে।

অজন্তার ১ নং গুহা সর্ব্বাপেক্ষা শেষ যুগের. ইহাতে বুদ্ধের জীবনের ঘটনা খোদিত আছে।

বাঘ গুহার ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

নিজামরাজত্বে এলোরার কাছে ঔরঙ্গাবাদে কয়েকটি গুহা আছে, ঐগুলি সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত: উহারা চালুক্যশিল্প। ভাস্কর্য্যের একটি বিষয় মাতালের দল। মাতালগুলি মদ খাইয়া গোলমাল করিতেছে, নৃত্য করিতেছে। এইরূপ 'ব্যাকানালিয়ান' দৃশ্য অন্যত্র আরো দেখা যায়। মথুরা-ভাস্কর্য্যে মাতালের মূর্ত্তি আছে। অজন্তার মাতাল চিত্র পারশীক বলিয়া বর্ণিত। ঔরঙ্গাবাদের নর্ত্তকী-মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলায় বাদামি গুহা অবস্থিত। চালুক্য সম্রাট প্রথম পুলকেশী (৫৫০-৫৬৬) বাদামিতে রাজধানী স্থাপন করেন। বাদামি গুহার ভাস্কর্য্য চালুক্য-শিল্প, ষষ্ঠ শতাব্দীর। ৩ নং গুহার বারান্দায় খোদিত বিষ্ণুমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। অনন্তনাগের উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং নরসিংহ মূর্ত্তিও আছে।

এলোরার ভাস্কর্য্য (সপ্তম হইতে অষ্টম শতাব্দী) ভারতীয় শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এলোরার গুহাসমূহ নিজামরাজ্যে অবস্থিত। সমস্ত গুহাগুলির সম্মুখ ভাগ মাপিয়া দেখিলে দেড় মাইল লম্বা হইবে। ওখানে ১৭টি বৌদ্ধ গুহা, ১৭টি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের, বাকী জৈন ধর্ম্মের।

দশ অবতার, রাবণকা খাই, ধুমর লেনা ও রামেশ্বর চালুক্য আমলের (৬৫০-৭৫০)। রামেশ্বরে চারি হস্তযুক্ত শিবের নৃত্যপরায়ণ মূর্ত্তি আছে, উহা বিরাট শক্তি ও গতির নিদর্শন। বারান্দায় বৃহৎ স্তম্ভে নগ্ন বৃন্দমূর্ত্তি আছে। স্তম্ভশীর্ষে কুম্ভের অলঙ্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্দায় গঙ্গা-যমুনার মূর্ত্তি বিদ্যমান।

দশ অবতার গুহায় শৈব ও বৈষ্ণব উভয়-বিষয়ক মূর্ত্তি আছে। গুহা দ্বিতলযুক্ত। ভৈরব, কালী এবং হিরণ্যকশিপুর মূর্ত্তি লক্ষণীয়।

বিশ্বকর্ম্মা গুহা বৌদ্ধচৈত্য (৬০০ খ্রীষ্টাব্দ); উহা অজন্তার চৈত্যকে স্মরণ করাইবে। ভিতরে বুদ্ধের মূর্ত্তি: জনসাধারণের কাছে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া পরিচিত। বিশ্বকর্ম্মা সূত্রধরের দেবতা। ভারতবর্ষের নানাদেশ হইতে সূত্রধরগণ এখানে পূজা দিতে আসে। আমি যখন ওখানে ভ্রমণ করিতে যাই, সুদূর কাথিওয়াড় হইতে আগত একজন সূত্রধরকে পূজা দিতে দেখিয়াছি।

এলোরার গুহাবলীর মধ্যে কৈলাসমন্দির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। ইহার নির্ম্মাতা রাষ্ট্রকূট-সম্রাট দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৭৫৭-৭৮৩)। দাক্ষিণাত্যে চালুক্যদের পরাজিত করিয়া তিনি দন্তিদুর্গ ও রাষ্ট্রকূট রাজ্য স্থাপন করেন, মালখেড়ে (মানৎখেট, নিজামরাজ্যে অবস্থিত) তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূটগণ প্রবল ছিলেন। পরে চালুক্যপ্রাধান্য পুনঃ স্থাপিত হয়।

কৈলাসমন্দির শুধু ভারতবর্ষে কেন, ইহা

পৃথিবীর মধ্যে একটি বিস্ময়ের বস্তু। সমস্ত পাহাড় খুদিয়া মন্দির বাহির করা হইয়াছে। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে কৈলাসমন্দিরও একটি আশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কৈলাসমন্দির মনোলিথিক, দ্রাবিড়-পদ্ধতিতে নির্মিত। দ্রাবিড়শিখর, লিঙ্গমন্দির, সমতল ছাদ-সমন্বিত ১৬টি স্তম্ভযুক্ত মস্তক এবং নন্দিবৃষের জন্য অলিন্দ আছে। মন্দিরের চারিদিকে প্রাঙ্গণ রহিয়াছে। নীচু গোপুরমের ভিতর দিয়া প্রবেশ-পথ। দুইটি ধ্বজস্তম্ভ দেখা যায়। প্রাঙ্গণে প্রাচীরের গায়ে মনোরম মকরবাহিনী গঙ্গা ও কচ্ছপবাহিনী যমুনার মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরগাত্রে রাবণ কর্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের কাহিনীটি খোদিত। সকল শিল্পসমালোচকই ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পাথরের মূর্ত্তির এই রকম কম্পোজিসন আর নাই। রাবণ কৈলাস পর্ব্বত কম্পিত করিলে, পার্ব্বতী ভীত হইয়া শিবকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছেন। শিব নির্ভীক, এক পায়ে পাহাড় চাপিয়া ধরিয়া আছেন : আকাশে দেবতাগণ ; নীচে রাবণ দশ মাথা ও কুড়ি হাত লইয়া পর্ব্বতকে নাড়া দিতেছে।

দুরধিগম্য অজন্তা গুহা বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল ; কিন্তু এলোরা গুহার কথা ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ জানিতেন। বিখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক এবং লেখক পিয়েলোটি এলোরা গুহায় শিবের মূর্ত্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ইহাকে ভয়াবহ গুহা নাম দিয়া ইহার কবিত্বময় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "গুহাগুলি পৌরাণিক দেবদেবীর উদ্দেশে নির্ম্মিত ; কিন্তু ধ্বংসের দেবতা শিবই ইহার ভিতর প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিরাট এবং রুদ্রের ভাবধারা অনুপ্রাণিত মানুষের বহু শতাব্দীর পরিশ্রমের ফলে গ্রেনাইট পাথরের এই গুহা খনিত হইয়াছে।" তাঁহার লেখা হইতে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় দশম শতকে আরব পর্য্যটক মাসুদি এলোরা দর্শন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন লেখক এলোরা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নাই। মাসুদির লেখায় বুঝা যায় এলোরার তখন পূর্ণ গৌরব। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে অগণিত তীর্থযাত্রী বিরামবিহীন স্রোতধারার মত এখানে আসিয়াছে।

বম্বের নিকটবর্ত্তী হস্তিগুম্ফার ভাস্কর্য্য এলোরার ন্যায়ই পৌরুষব্যঞ্জক : অষ্টম শতাব্দী হইতে ইহার আরম্ভ। এই গুহাগুলি মাটির নীচে ; অন্য গুহার ন্যায় মাটির উপরে নহে। দুইটি লিঙ্গ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য ; পর্ব্বতগাত্র হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন ; মন্দিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণপথ আছে। হস্তিগুম্ফার বিরাটাকার ত্রিমূর্ত্তি খুব বিখ্যাত, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। মূর্ত্তির ওষ্ঠ স্থূল, মস্তকে উন্নত জটাভার। ইহাকে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। ধ্যানী শিবের মূর্ত্তি আছে, বুদ্ধ যেন শিবে রূপান্তরিত হইয়াছেন।

শিবের বিবাহ কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র কথা স্মরণ করাইবে। ভৈরব ও তাণ্ডব-নৃত্যের মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

বম্বের এপোলো বন্দরের নিকট সমুদ্রের মধ্যে এলিফেণ্টা দ্বীপ অবস্থিত। এলিফেণ্টা নামকরণ পর্ত্তুগীজরা করিয়াছে। হাতীর একটা পাথরের মূর্ত্তি ছিল, তাহা হইতেই এই নাম হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশরা উহা অপসারিত করার চেষ্টা করে কিন্তু মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া যায়। বম্বের ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে এই ভগ্নাংশ রক্ষিত আছে। এই দ্বীপের পূর্ব্ব নাম ছিল ঘরপুরী বা গিরপুরী।

এলিফেণ্টা গুহায় পূর্ব্বে চুনের আস্তর ছিল। ডি কুটো (De Couto) নামে একজন বিদেশী

পরিব্রাজকের লেখা হইতে উহা জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর বিদেশী পর্য্যটকদের লেখায় এলিফেণ্টার উল্লেখ আছে।

পল্লবগণ গুহামন্দির নির্ম্মাণ করেন। পল্লব-রাজ মহেন্দ্রবর্ম্মন্ (সপ্তম শতাব্দী) অনেক গুহামন্দির আর্কট জেলায়, চেঙ্গলপেট এবং ত্রিচিনোপল্লীতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ত্রিচিনোপল্লী-গুহার শৈবমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

অভিযাত্রিক

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

পুরাণো পৃথিবী,
পুরাতন প্রতিবেশ,
ঘুমভাঙ্গা চলার নেশায়
অসহায় অভিযাত্রী চ'লেছে এগিয়ে।
অগ্রপথ বঙ্কিম বন্ধুর
গুহায়িত অন্ধকার—আলোকের নাহি
কোথা' লেশ!
লোলুপ অসুর
রাখিয়াছে শ্যেন-দৃষ্টি সম্মুখে প্রস্তুত,
শূল সমুদ্যত;
ভুখা প্রাণ খেলার পুতুল,
আয়ুগুলি খেয়াল-বিলাস,
জমিছে এমনি তা'র প্রত্যহের স্পর্দ্ধা সুবিপুল।
আশাহত ক্ষুব্ধ যাত্রিদল,
সঞ্চয়ের কিবা আছে পরম পাথেয়?
অপাংক্তেয়
ছিন্নমস্ত সভ্যতার পেষচক্রতল।

পুরোভাগে মৃত্যুর মিছিল—
বোবা বুক বেদনায় নীল:
বিনিময়ে রুধিরেরে ঢালি
বিনিময়ে জীবনেরে দিয়া,
তবু নিত্য কৃপার ভিখারী
অন্তহীন অসম্মান শিরে বহি' নিয়া।
শত কণ্ঠে শঙ্কাহীন শ্রান্তিলীন সুর—
অনাগত আর কত দূর?
প্রভাতের জয় তূর্য
কখন স্বনিবে?
আঁধারের অবসান আনি' কত পরে
সমুদিবে লাল সূর্য
নূতনের উজ্জ্বল শিখরে?

শাঙ্কর-ভাষ্যস্থ বেদাচার্য্যগণ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

ভর্তৃপ্রপঞ্চাচার্য্য—অধ্যাপক হিরণ্য সুরেশ্বর-কৃত 'বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিকে'র আনন্দজ্ঞান-কৃত শাস্ত্রপ্রকাশিকা টীকা থেকে শঙ্করনিরসিত ভর্তৃপ্রপঞ্চ-মত অনেক সংগ্রহ করেছেন (**Proceedings of Oriental Conference, Madras**)। তাঁর অনুসন্ধানকার্য্য থেকে জানা যায় যে ভর্তৃপ্রপঞ্চ ভেদাভেদবাদী ছিলেন। শ্রীমৎ আচার্য্যপাদ স্বীয় বৃহদারণ্যক-ভাষ্যকে যে 'অল্পগ্রন্থ' বলেছেন, তার হেতু সম্বন্ধে আনন্দগিরি বলেন, ভর্তৃপ্রপঞ্চ বৃহদারণ্যকের ওপর বিরাট ভাষ্য রচনা করেন, তার তুলনায় বাস্তবিকই শাঙ্কর ভাষ্য 'অল্পগ্রন্থ'। তাঁতে ও শঙ্করে ভেদ কেবল পরিণাম ও বিবর্ত্তে, এবং জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় বা অসমুচ্চয়বাদ নিয়ে। এতবড় গ্রন্থ যে কি ভাবে লোপ পেল, তার এখনও কোন অনুসন্ধান হয় নি। ভর্তৃপ্রপঞ্চের মতবাদ-সম্বন্ধে নানা বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়েরই সিদ্ধান্ত এখানে অনুসরণ করব।

ভর্তৃপ্রপঞ্চ-মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম-পরিণাম হেতু বিশেষ অভিব্যক্তি। এই বিশেষ অভিব্যক্তিটি আট প্রকার—জীব, অন্তর্য্যামী, অব্যক্ত, সূত্র, বিরাজ, দেবতা, জাতি ও পিণ্ড। এই আট প্রকারকে আরও সংক্ষেপে তিনটি রাশিতে বিভক্ত করা যায়—(১) পরমাত্মা রাশি অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভ—"অবিদ্যাকৃতঃ হিরণ্যগর্ভ আত্মা সর্ব্বসাধারণস্তেন আত্মনা সর্ব্ব-সত্ত্বানি আত্মবন্তি"—(বৃঃ উঃ বার্ত্তিকের আনন্দগিরি-কৃত 'শাস্ত্রপ্রকাশিকা' টীকা)। **অবিদ্যা** দ্বারাই ব্রহ্মের এই জগদাত্মত্ব, সূত্রত্ব বা অন্তর্য্যামিত্ব সিদ্ধ হয়—"স ইদং জগদাত্ম-ত্বেনাভিসম্পন্নোঽভূদবিদ্যয়া"—(ঐ)। (২) **জীব-রাশি**—ব্রহ্মপরিণাম কখন জড়াংশপ্রধান, কখন চেতনাংশপ্রধান। চেতনাংশপ্রধান জীব বিজ্ঞানময়—"বিজ্ঞানং পরং ব্রহ্ম তৎপ্রকৃতিকো জীবো বিজ্ঞানময়ঃ"—(ঐ); কর্ত্তা—"স পরমা-ত্মৈকদেশঃ কিল কর্ত্তা", "তৃজন্তেন কর্ত্তৃত্বমাচষ্টে", "কস্য কর্ত্তা? দৃষ্টেঃ"—(ঐ) এবং ভোক্তা ও দ্রষ্টা—"দৃষ্টিরিতি ভাবঃ ক্রিয়াসমাপ্ত্যর্থঃ ফলাশ্রিতো নির্দ্দিশ্যতে", "কিং পুনঃ ফলম্?—প্রকাশনম্", "বুদ্ধিপ্রত্যয়স্য ঘটাদেশ্চ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবেন সম্বন্ধাৎ ক্রিয়ান্তরনিবৃত্তৌ দ্রষ্টৈব"—(ঐ)।

জীবভাবের হেতু আসক্তি ও অবিদ্যা। প্রজ্ঞা, কর্ম ও তৎফলানুসারে জীবের বিচিত্র দেহভোগ। অবিদ্যানিবৃত্তিতে জীবের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানের উদয় হয় ও মুক্তিসিদ্ধি হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল আসক্তিনাশ এবং বিদ্যার ফল অবিদ্যানাশ। মোক্ষ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়-সাপেক্ষ। মুক্তি দ্বিবিধ—জীবন্মুক্তি ও পরমমুক্তি। শরীর বর্ত্তমানে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হলে পুরুষ জীবন্মুক্ত এবং অশরীর ব্রহ্মলয় হচ্ছে পরমমুক্তি—"দ্বিবিধো মোক্ষঃ অস্মিন্নেব শরীরে সাক্ষাৎকৃতব্রহ্ম মুক্ত ইত্যুচ্যতে, ন ব্রহ্মণি লীনঃ। তস্য শরীর-পাতোত্তরকালং ব্রহ্মণি লয়ো দ্বিতীয়ো মোক্ষঃ"—(ঐ)। জীব ব্রহ্মলীন হলে সর্ব্ব বিশেষ অবিশেষ হয়ে যায়—"বিশেষাণাং হি অবিশেষ

একতা ভবতি, যথা সমুদ্রে সমুদ্রোর্মীণাম্” “দ্বৈতবিষয়ে অন্যস্য অন্যেন আত্মনা অভিসম্পত্তিঃ। ইহ পুনরদ্বৈতে সমস্তভাবানামনন্যত্বাৎ সর্বমস্যৈবাত্মনোভিসম্পদ্যতে”, “বা তু অবিশেষাবস্থা পরমাত্মাবস্থৈব সা।”

(৩) মূর্তামূর্ত—জড়প্রধান বাহ্য যাবতীয় ব্রহ্মপরিণাম—“যাবান্ বাহ্যবিকারো বিজ্ঞানাত্মপরিবেষ্টনোঽধ্যাত্মং বাধিদৈবতং বা নামরূপবিভাগেন ব্যাকৃতঃ সর্বোঽপি এব মূর্তো বামূর্তো ভবতু। সচ্চ ত্যচ্চ”—(ঐ)। তাঁর মতে দ্বৈতপ্রপঞ্চ লৌকিক প্রমাণগম্য এবং অদ্বৈততত্ত্ব বেদপ্রমাণগম্য।

ভর্তৃহরি—ইনি বিবর্তবাদী, কিন্তু তাঁর অদ্বৈততত্ত্বটি শব্দব্রহ্ম। তিনি বৈয়াকরণ ও দার্শনিক. তাঁর গ্রন্থের নাম ‘বাক্যপদীয়’ : হেলরাজ তার ওপর টীকা রচনা করেন। মণ্ডনমিশ্র বোধ হয় এরূপ মতবাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর সম্প্রদায়ের নাম ছিল ঔপনিষদ। বৌদ্ধমতের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্বই এ মতের অপ্রচয়ের হেতু।

সুন্দরপাণ্ড্য—শ্রীমন্মাধবাচার্য্য তাঁর ‘সূত-সংহিতা’র টীকায় একে এক প্রাচীন শ্লোকবার্তিককার বলেছেন। ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৪ সূত্রভাষ্যের পরিসমাপ্তিকালে শ্রীমদ্ আচার্য্যপাদ এরই তিনটি গাথা উদ্ধৃত করেছেন—

“গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদিবাধনাৎ।
সদ্ব্রহ্মাহমিত্যেবং বোধে কার্য্যং কথং ভবেৎ॥
অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ।
অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মাদোষাদিবর্জিতঃ॥
দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥”

অর্থাৎ গৌণ এবং মিথ্যা আত্মার অনস্তিত্বে পুত্রদেহাদিরও বাধ (নাশ) হেতু এবং “আমি সৎ ব্রহ্মস্বরূপ”—এইরূপ বোধে কার্য্য কিরূপে সম্ভব? অন্বেষ্টব্য আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আত্মার প্রমাতৃত্ব। অন্বেষণ হয়ে যাওয়ার পর প্রমাতা জীব পাপদোষাদিবর্জ্জিত হয়ে যায়, অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মপ্রত্যয় যেমন অসংশয়-প্রমাণত্ব হেতু কল্পিত, লৌকিক প্রমাণও সেইরূপ আত্মার স্বরূপনিশ্চয় পর্য্যন্তই হয়ে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি (১) জ্ঞানকর্ম্ম-অসমুচ্চয়বাদী (২) জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাদী এবং (৩) ব্রহ্মের অপ্রমেয়ত্ববাদী।

বৃত্তিকার—ব্রহ্মসূত্রাদি শঙ্করভাষ্যে দুজন বৃত্তিকার ছিলেন বলে অনুমিত হয়—(১) এক জন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী, যাঁকে আচার্য্যপাদ ভাষ্যে “অন্যে তু”, “অপরে তু”, “কেচিত্তু” প্রভৃতি শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করেছেন। পণ্ডিতশিরোমণি আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, ইনিই বোধায়নাচার্য্য। আমার বোধ হয় প্রাচীন শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নীলকণ্ঠাচার্য্য তাঁর ভাষ্যে স্বীয় মত পোষণের জন্য একেই অনেক স্থলে উদ্ধৃত করেন এবং পরবর্ত্তী কালে পরমভাগবতাচার্য শ্রীরামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ‘শ্রীভাষ্যোপক্রমণিকা’য় লিখেছেন—“ভগবদ্‌বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।”—অর্থাৎ পূর্ব্বে বোধায়ন-বৃত্তি অতি বিস্তীর্ণা ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা সেটিকে সংক্ষেপ করে ফেলেন। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রি-সম্পাদিত ‘প্রপঞ্চহৃদয়’ গ্রন্থে আছে : “বিংশত্যধ্যায়নিবদ্ধস্য মীমাংসাশাস্ত্রস্য কৃতকোটিনামধেয়ং ভাষ্যং বোধায়নেন কৃতম্। তদ্‌গ্রন্থবাহুল্যভয়াদুপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তমুপবর্ষেণ কৃতম্।”—অর্থাৎ বিংশতি অধ্যায়ে নিবদ্ধ সমগ্র মীমাংসাশাস্ত্রের (পূর্ব ও উত্তর) বোধায়নকৃত ‘কৃতকোটি’ নামে এক ভাষ্য ছিল। সেই গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে উপবর্ষ উহা সংক্ষিপ্ত করেন। এই

বোধায়নাচার্য্য কল্পসূত্রকার কি না, অথবা বিষ্ণুপুরাণোক্ত (৩৪) ব্যাসশিষ্য বা প্রশিষ্য বোধ্য বা বোধি কি না সুধীদের বিচার্য্য। (এতৎসম্বন্ধে ২৫ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩২৯ সালের 'উদ্বোধনে'র বর্তমানলেখক-বিবৃত 'কথাপ্রসঙ্গে'র পাদটীকা দ্রষ্টব্য) পুনশ্চ "তত্ত্বটীকা"-কার বেঙ্কটনাথ বলেন, "বৃত্তিকারস্য বোধায়নস্যৈব হি উপবর্ষ ইতি স্যান্নাম"—অর্থাৎ বৃত্তিকার বোধায়নের নামই উপবর্ষ ছিল।

তজ্জন্য দ্বিতীয় বৃত্তিকার ভগবান উপবর্ষ বলেই বোধ হয়, যিনি বোধায়নাচার্য্যকৃত 'কৃতকোটি' ভাষ্য সংস্কার ও সংক্ষিপ্ত করে শঙ্করমতানুকূল বৃত্তি লেখেন। কারণ দেখা যায় আচার্য্যপাদ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের বহুস্থলে এর সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৯, ১।১।২৩, ১।১।৩১, ১।২।২৩, ৩।৩।৩৫)। যেমন "যদাহ ভগবান্ উপবর্ষঃ" ইত্যাদি। আচার্য্যপাদ নিজের মতপুষ্টির জন্যও তাঁর মতোল্লেখ করেছেন, যথা—"অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ? গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবান্ উপবর্ষঃ (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৮), "অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ"—(ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৩)। (এই প্রবন্ধটি বর্তমান লেখক-বিবৃত ২৫ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩২৯ 'উদ্বোধনের' 'কথাপ্রসঙ্গের' পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)।

দ্রমিড়াচার্য্য—আচার্য্যপাদ শঙ্কর ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলেছেন—"ওমিত্যেতদক্ষরমষ্টাধ্যায়ী ছান্দোগ্যোপনিষৎ তস্যাঃ সংক্ষেপতঃ ইহ জিজ্ঞাসুভ্যঃ ঋজুবিবরণমল্পগ্রন্থমিদমারভ্যতে।" কাজে কাজেই স্বকৃত ছান্দোগ্যভাষ্যকেও তিনি 'অল্পগ্রন্থ' বলেছেন, কারণ জিজ্ঞাসুদের সুবিধার জন্য সংক্ষেপ করেছেন। কিন্তু কিসের সংক্ষেপ করেছেন? বিপুল দ্রমিড়-ভাষ্যের। কেন না আনন্দগিরি ঐ ভাষ্যের টীকায় বলছেন, "ঋজুবিবরণমিতি ঋজুপাঠক্রমানুপাতি বিবরণম্ অর্থস্ফুটীকরণং প্রকৃতোপনিষদঃ যস্মিন্ ভাষ্যে তত্তথোক্তি যাবৎ। অর্থপাঠক্রমমাশ্রিত্যাপি দ্রামিড়ং ভাষ্যং প্রণীতং তৎ কিমনেন ইত্যাশঙ্ক্যাহঃ অল্পগ্রন্থমিতি—" অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদের দ্রমিড়ভাষ্য রয়েছে, তবে আবার এই গ্রন্থরচনার প্রয়োজন কি? না—এই অল্পগ্রন্থ জিজ্ঞাসুদের নিকট একটা সংক্ষিপ্ত সরল ব্যাখ্যা দেবার জন্য ইত্যাদি।

আবার ছান্দোগ্যের (৩।৮।৪০) খণ্ডের ব্যাখ্যায় সূর্য্যের উদয়াস্ত নিরূপণে শ্রুতির সহিত স্মৃতির আপাত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় আচার্য্যপাদ দ্রমিড়ের সাহায্য নিয়েছেন। কারণ আনন্দগিরি বলছেন, "অত্রোক্তঃ পরিহারঃ আচার্য্যস্য। যদ্যপি শ্রুতিবিরোধে স্মৃতেরপ্রামাণ্যং তথাপি যথা কথঞ্চিদ্ বিরোধপরিহারং দ্রমিড়াচার্য্যোক্তমুপপাদয়তি।"—অর্থাৎ ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্যের সাহায্যেই বিরোধ পরিহার করেছেন। এই দ্রমিড়াচার্য্য সম্বন্ধে বেদান্তদেশিককৃত 'তত্ত্বটীকা'-য় আরও একটু আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়—"ভাষ্যকারো ব্রহ্মানন্দিবাক্যব্যাখ্যাতা দ্রমিড়াচার্য্যঃ"— অর্থাৎ বাক্যকার ব্রহ্মানন্দী টঙ্ক ও টঙ্কবাক্যব্যাখ্যাতা দ্রমিড়াচার্য্য। পরন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য্যের 'সিদ্ধিত্রয়' গ্রন্থের প্রথমভাগে শ্রীরামানুজাচার্য্যের 'শ্রীভাষ্যোপক্রমণিকা'য় এবং তৎপ্রণীত 'বেদার্থসংগ্রহে' তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিরূপেই গৃহীত হয়েছেন। সর্বজ্ঞানমণির 'সংক্ষিপ্তশারীরকে'র ২১৭-২২১ শ্লোকপাঠে ঐরূপই অনুমিত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্যের 'বেদার্থ-সংগ্রহে' বোধায়নও দ্রমিড়াচার্য্য ছাড়াও টঙ্ক, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্য্যগণেরও উল্লেখ করেছেন।

করুণা

শ্রীরবি গুপ্ত

তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?
নিঃস্ব হ'য়ে বিলাতে চাই
চরণে তোর জীবন-পুঁজি।
মিলায়ে রাতের আঁধার কায়া
চির মলিন বেদন-ছায়া ;
প্রাণের প্রদীপ উজল হ'ল
সকল নিশা গেল ঘুচি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

নীল অমরার সূর্য আসে, লুটায় মা তোর চরণ-তলে,
লুটায় চন্দ্র-কিরণ-ধারা
যুগল সোনার শতদলে।
মর্ত্ত্য-মরণ-শঙ্কা ভুলে
লভি শরণ চরণ-কূলে,
অঙ্কে মা তোর এই জীবনের সকল আশার স্বপ্ন বুঝি,
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

মা তোর প্রাণের নিবিড় পরশ আমায় সুরে কেবল টানে,
ভরে জীবন শূন্য জীবন
তোরি গোপন-বিত্ত-দানে।
শুভ্র-পাবক-শিখার মত
জ্বলেছি আজ অবিরত ;
দু'টি অমল আঁখির উষায়
জাগি ধূলার ছায়া মুছি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ-ভুবনে কোথায় খুঁজি' ?

গীতাশাস্ত্রে ব্যাকরণ

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ

গীতা হ'লো মোক্ষশাস্ত্র, তার ভিতরে ব্যাকরণের কথা থাকতে পারে তা কিরূপে কল্পনা করা যায়? যে শাস্ত্র মুক্তির পথ বলে, নির্ব্বাণের পন্থা নির্ণয় করে, সৎ চিৎ ও আনন্দময় রাজ্যের সন্ধান দেয়, তাতে থাকবে শুষ্ককাষ্ঠবৎ নীরস ব্যাকরণ?

এক সময়ে সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় রচনা লিখবার বিষয়বস্তু ছিল এবং এখনও আছে—'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'। অর্থাৎ বেদের মুখ ব্যাকরণ, বেদ পড়তে হ'লে প্রথমতঃ ব্যাকরণপাঠ প্রয়োজন। বেদের অঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ। তৃতীয় অঙ্গ ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর অঙ্গী বেদে প্রবেশ করার সুবিধা হয়। বৈদিক ব্যাকরণ ও লৌকিক ব্যাকরণ ভিন্ন হ'লেও তাদের মূলতঃ কতগুলো সংজ্ঞা এবং প্রক্রিয়া এক। একই বর্ণমালা হ'তে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি। পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী সরস্বতী উভয় ভাষাতেই সুরভারতী বা দেবভাষা নামে পরিচিতা। তাকে কেউ বলেন ব্রাহ্মী ভাষা বা ব্রাহ্মী লিপি; কেউ বলেন গীর্বাণবাণী, কেউ বলেন গীঃ বা গৌঃ।

ব্যাকরণ শব্দের অর্থ যা' দ্বারা শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিনির্ণয় হয় এবং ভাষার গতি স্থিরীকৃত হয়—'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্'।

গীতাশাস্ত্রে তেমন কিছু ব্যাকরণ আছে কি যাতে প্রস্তাবিত আলোচনাটি সঙ্গতার্থ হয়? আমরা হয়তো ভাসা ভাসা কথায় বলবো—গীতার সমস্ত শ্লোক ব্যাকরণের বন্ধন অনুসারে রচিত, অতএব গীতা ব্যাকরণে ভরপুর। কিন্তু প্রকৃত কথা ত তা নয়!

দশম অধ্যায়ে ভগবান্ বলেছেন: "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ"—সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস। সমাস মোটামুটি ৪, অবান্তরভেদে ৬, সূক্ষ্মবিভাগে ২৬। সমস্ত সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসের ভিতর এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে এই সমাস অপরাপর সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারে? এর উত্তরে শ্রীধর স্বামী বলেছেন—যে হেতু এই সমাসে উভয় পদার্থ প্রধান সেই হেতু ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণৌ। এখানে রাম ও কৃষ্ণ উভয়কেই প্রধানরূপে জানতে হবে। অন্যান্য সমাসে কোন্ কোন্ পদ প্রধান তা জানতে হ'লে সমাসপ্রকরণ পড়তে হয়, পরে নির্ণয় করতে হয়। স্বামিপাদ ঠিকই বলেছেন। একই দ্বন্দ্বসমাস তিন ভাগে বিভক্ত এও জানতে হয়। সমাহার দ্বন্দ্ব, ইতরেতর দ্বন্দ্ব ও একশেষ দ্বন্দ্ব। পিতৃশব্দের প্রথমার দ্বিবচন হ'লে পিতরৌ পদ হয়। এতে কি দুই পিতা বুঝায়? না, মাতা ও পিতা উভয়কে বুঝায়; এই জন্য একশেষ দ্বন্দ্ব। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ইতরেতর সমাসের অন্তর্ভুক্ত করলে কি "আত্মানৌ" এইরূপ দ্বিবচন হতে পারে? যদি হয়—এবং তা হয়ও বটে—তবে অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয় না, কেন না দ্বিবচনে

করুণা

শ্রীরবি গুপ্ত

তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?
নিঃস্ব হ'য়ে বিলাতে চাই
চরণে তোর জীবন-পুঁজি।
মিলায়ে রাতের আঁধার-কায়া
চির মলিন বেদন-ছায়া ;
প্রাণের প্রদীপ উজল হ'ল
সকল নিশা গেল ঘুচি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

নীল অমরার সূর্য আসে, লুটায় মা তোর চরণ-তলে,
লুটায় চন্দ্র-কিরণ-ধারা
যুগল সোনার শতদলে।
মর্ত্য-মরণ-শঙ্কা ভুলে
লভি শরণ চরণ-কূলে,
অঙ্কে মা তোর এই জীবনের সকল আশার স্বপ্ন বুঝি,
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

মা তোর প্রাণের নিবিড় পরশ আমায় সুরে কেবল টানে,
ভরে জীবন শূন্য জীবন
তোরি গোপন-বিত্ত-দানে।
শুভ্র-পাবক-শিখার মত
জ্বলেছি আজ অবিরত ;
দু'টি অমল আঁখির উষায়
জাগি ধূলার ছায়া মুছি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ-ভুবনে কোথায় খুঁজি' ?

গীতাশাস্ত্রে ব্যাকরণ

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ

গীতা হ'লো মোক্ষশাস্ত্র, তার ভিতরে ব্যাকরণের কথা থাকতে পারে তা কিরূপে কল্পনা করা যায়? যে শাস্ত্র মুক্তির পথ বলে, নির্ব্বাণের পন্থা নির্ণয় করে, সৎ চিৎ ও আনন্দময় রাজ্যের সন্ধান দেয়, তাতে থাকবে শুষ্ককাষ্ঠবৎ নীরস ব্যাকরণ?

এক সময়ে সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় রচনা লিখবার বিষয়বস্তু ছিল এবং এখনও আছে—'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'। অর্থাৎ বেদের মুখ ব্যাকরণ, বেদ পড়তে হ'লে প্রথমতঃ ব্যাকরণপাঠ প্রয়োজন। বেদের অঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ। তৃতীয় অঙ্গ ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর অঙ্গী বেদে প্রবেশ করার সুবিধা হয়। বৈদিক ব্যাকরণ ও লৌকিক ব্যাকরণ ভিন্ন হ'লেও তাদের মূলতঃ কতগুলো সংজ্ঞা এবং প্রক্রিয়া এক। একই বর্ণমালা হ'তে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি। পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী সরস্বতী উভয় ভাষাতেই সুরভারতী বা দেবভাষা নামে পরিচিতা। তাকে কেউ বলেন ব্রাহ্মী ভাষা বা ব্রাহ্মী লিপি; কেউ বলেন গীর্বাণবাণী, কেউ বলেন গীঃ বা গৌঃ।

ব্যাকরণ শব্দের অর্থ যা' দ্বারা শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিনির্ণয় হয় এবং ভাষার গতি স্থিরীকৃত হয়—'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্'।

গীতাশাস্ত্রে তেমন কিছু ব্যাকরণ আছে কি যাতে প্রস্তাবিত আলোচনাটি সঙ্গতার্থ হয়? আমরা হয়তো ভাসা ভাসা কথায় বলবো—গীতার সমস্ত শ্লোক ব্যাকরণের বন্ধন অনুসারে রচিত, অতএব গীতা ব্যাকরণে ভরপূর। কিন্তু প্রকৃত কথা ত তা নয়।

দশম অধ্যায়ে ভগবান্ বলেছেন: "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ"—সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস। সমাস মোটামুটি ৪, অবান্তরভেদে ৬, সূক্ষ্মবিভাগে ২৮। সমস্ত সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসের ভিতর এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে এই সমাস অপরাপর সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারে? এর উত্তরে শ্রীধর স্বামী বলেছেন—যে হেতু এই সমাসে উভয় পদার্থ প্রধান সেই হেতু ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণৌ। এখানে রাম ও কৃষ্ণ উভয়কেই প্রধানরূপে জান্‌তে হবে। অন্যান্য সমাসে কোন্ কোন্ পদ প্রধান তা জান্‌তে হ'লে সমাসপ্রকরণ পড়তে হয়, পরে নির্ণয় করতে হয়। স্বামিপাদ ঠিকই বলেছেন। একই দ্বন্দ্বসমাস তিন ভাগে বিভক্ত এও জান্‌তে হয়। সমাহার দ্বন্দ্ব, ইতরেতর দ্বন্দ্ব ও একশেষ দ্বন্দ্ব। পিতৃশব্দের প্রথমার দ্বিবচন হ'লে পিতরৌ পদ হয়। এতে কি দুই পিতা বুঝায়? না, মাতা ও পিতা উভয়কে বুঝায়; এই জন্য একশেষ দ্বন্দ্ব। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ইতরেতর সমাসের অন্তর্ভুক্ত করলে কি "আত্মানৌ" এইরূপ দ্বিবচন হতে পারে? যদি হয়—এবং তা হয়ও বটে—তবে অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয় না, কেন না দ্বিবচনে

করুণা

শ্রীরবি গুপ্ত

তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?
নিঃস্ব হ'য়ে বিলাতে চাই
চরণে তোর জীবন-পুঁজি।
মিলায়ে রাতের আঁধার-কায়া
চির মলিন বেদন-ছায়া ;
প্রাণের প্রদীপ উজল হ'ল
সকল নিশা শেষ ঘুচি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

নীল অমরার সূর্য আসে, লুটায় মা তোর চরণ-তলে,
লুটায় চন্দ্র-কিরণ-ধারা
যুগল সোনার শতদলে।
মর্ত্ত্য-মরণ-শঙ্কা ভুলে
লভি শরণ চরণ-কূলে,
অঙ্কে মা তোর এই জীবনের সকল আশার স্বপ্ন বুঝি,
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

মা তোর প্রাণের নিবিড় পরশ আমায় সুরে কেবল টানে,
ভরে জীবন শূন্য জীবন
তোরি গোপন-বিত্ত-দানে।
শুভ্র-পাবক-শিখার মত
জ্বলেছি আজ অবিরত ;
দু'টি অমল আঁখির উষায়
জাগি ধূলার ছায়া মুছি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ-ভুবনে কোথায় খুঁজি' ?

গীতাশাস্ত্রে ব্যাকরণ

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ

গীতা হ'লো মোক্ষশাস্ত্র, তার ভিতরে ব্যাকরণের কথা থাকতে পারে তা কিরূপে কল্পনা করা যায়? যে শাস্ত্র মুক্তির পথ বলে, নির্ব্বাণের পন্থা নির্ণয় করে, সৎ চিৎ ও আনন্দময় রাজ্যের সন্ধান দেয়, তাতে থাকবে শুষ্ককাষ্ঠবৎ নীরস ব্যাকরণ?

এক সময়ে সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় রচনা লিখবার বিষয়বস্তু ছিল এবং এখনও আছে—'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'। অর্থাৎ বেদের মুখ ব্যাকরণ, বেদ পড়তে হ'লে প্রথমতঃ ব্যাকরণপাঠ প্রয়োজন। বেদের অঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ। তৃতীয় অঙ্গ ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর অঙ্গী বেদে প্রবেশ করার সুবিধা হয়। বৈদিক ব্যাকরণ ও লৌকিক ব্যাকরণ ভিন্ন হ'লেও তাদের মূলতঃ কতগুলো সংজ্ঞা এবং প্রক্রিয়া এক। একই বর্ণমালা হ'তে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি। পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী সরস্বতী উভয় ভাষাতেই সুরভারতী বা দেবভাষা নামে পরিচিতা। তাকে কেউ বলেন ব্রাহ্মী ভাষা বা ব্রাহ্মী লিপি; কেউ বলেন গীর্বাণবাণী, কেউ বলেন গীঃ বা গৌঃ।

ব্যাকরণ শব্দের অর্থ যা দ্বারা শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিনির্ণয় হয় এবং ভাষার গতি স্থিরীকৃত হয়—'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্'।

গীতাশাস্ত্রে তেমন কিছু ব্যাকরণ আছে কি যাতে প্রস্তাবিত আলোচনাটি সঙ্গতার্থ হয়? আমরা হয়তো ভাসা ভাসা কথায় বলবো—গীতার সমস্ত শ্লোক ব্যাকরণের বন্ধন অনুসারে রচিত, অতএব গীতা ব্যাকরণে ভরপুর। কিন্তু প্রকৃত কথা ত তা নয়।

দশম অধ্যায়ে ভগবান্ বলেছেন: "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ"—সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস। সমাস মোটামুটি ৪, অবান্তরভেদে ৬, সূক্ষ্মবিভাগে ২৮। সমস্ত সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসের ভিতর এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে এই সমাস অপরাপর সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারে? এর উত্তরে শ্রীধর স্বামী বলেছেন—যে হেতু এই সমাসে উভয় পদার্থ প্রধান সেই হেতু ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণৌ। এখানে রাম ও কৃষ্ণ উভয়কেই প্রধানরূপে জানতে হবে। অন্যান্য সমাসে কোন্ কোন্ পদ প্রধান তা জানতে হ'লে সমাসপ্রকরণ পড়তে হয়, পরে নির্ণয় করতে হয়। স্বামিপাদ ঠিকই বলেছেন। একই দ্বন্দ্বসমাস তিন ভাগে বিভক্ত এও জানতে হয়। সমাহার দ্বন্দ্ব, ইতরেতর দ্বন্দ্ব ও একশেষ দ্বন্দ্ব। পিতৃশব্দের প্রথমার দ্বিবচন হ'লে পিতরৌ পদ হয়। এতে কি দুই পিতা বুঝায়? না, মাতা ও পিতা উভয়কে বুঝায়; এই জন্য একশেষ দ্বন্দ্ব। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ইতরেতর সমাসের অন্তর্ভুক্ত করলে কি "আত্মানৌ" এইরূপ দ্বিবচন হতে পারে? যদি হয়—এবং তা হয়ও বটে—তবে অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয় না, কেন না দ্বিবচনে

করুণা

শ্রীরবি গুপ্ত

তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?
নিঃস্ব হ'য়ে বিলাতে চাই
চরণে তোর জীবন-পুঁজি।
মিলায়ে রাতের আঁধার-কায়া
চির মলিন বেদন-ছায়া ;
প্রাণের প্রদীপ উজল হ'ল
সকল নিশা শেষ ঘুচি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

নীল অমরার সূর্য আসে, লুটায় মা তোর চরণ-তলে,
লুটায় চন্দ্র-কিরণ-ধারা
যুগল সোনার শতদলে।
মর্ত্য-মরণ-শঙ্কা ভুলে
লভি শরণ চরণ-কূলে,
অঙ্কে মা তোর এই জীবনের সকল আশার স্বপ্ন বুঝি,
তোর করুণার পাই তুলনা এ ভুবনে কোথায় খুঁজি ?

মা তোর প্রাণের নিবিড় পরশ আমায় সুরে কেবল টানে,
ভরে জীবন শূন্য জীবন
তোরি গোপন-বিত্ত-দানে।
শুভ্র-পাবক-শিখার মত
জ্বলেছি আজ অবিরত ;
দু'টি অমল আঁখির উষায়
জাগি ধূলার ছায়া মুছি'।
তোর করুণার পাই তুলনা এ-ভুবনে কোথায় খুঁজি' ?

গীতাশাস্ত্রে ব্যাকরণ

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ

গীতা হ'লো মোক্ষশাস্ত্র, তার ভিতরে ব্যাকরণের কথা থাকতে পারে তা কিরূপে কল্পনা করা যায়? যে শাস্ত্র মুক্তির পথ বলে, নির্ব্বাণের পন্থা নির্ণয় করে, সৎ চিৎ ও আনন্দময় রাজ্যের সন্ধান দেয়, তাতে থাকবে শুষ্ককাষ্ঠবৎ নীরস ব্যাকরণ?

এক সময়ে সংস্কৃতশিক্ষার্থী ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় রচনা লিখবার বিষয়বস্তু ছিল এবং এখনও আছে—'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'। অর্থাৎ বেদের মুখ ব্যাকরণ, বেদ পড়তে হ'লে প্রথমতঃ ব্যাকরণপাঠ প্রয়োজন। বেদের অঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ। তৃতীয় অঙ্গ ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর অঙ্গী বেদে প্রবেশ করার সুবিধা হয়। বৈদিক ব্যাকরণ ও লৌকিক ব্যাকরণ ভিন্ন হ'লেও তাদের মূলতঃ কতগুলো সংজ্ঞা এবং প্রক্রিয়া এক। একই বর্ণমালা হ'তে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি। পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী সরস্বতী উভয় ভাষাতেই সুরভারতী বা দেবভাষা নামে পরিচিতা। তাকে কেউ বলেন ব্রাহ্মী ভাষা বা ব্রাহ্মী লিপি; কেউ বলেন গীর্বাণবাণী, কেউ বলেন গীঃ বা গৌঃ।

ব্যাকরণ শব্দের অর্থ যা দ্বারা শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিনির্ণয় হয় এবং ভাষার গতি স্থিরীকৃত হয় —'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্'।

গীতাশাস্ত্রে তেমন কিছু ব্যাকরণ আছে কি যাতে প্রস্তাবিত আলোচনাটি সঙ্গতার্থ হয়? আমরা হয়তো ভাসা ভাসা কথায় বলবো—গীতার সমস্ত শ্লোক ব্যাকরণের বন্ধন অনুসারে রচিত, অতএব গীতা ব্যাকরণে ভরপূর। কিন্তু প্রকৃত কথা ত তা নয়।

দশম অধ্যায়ে ভগবান্ বলেছেন: "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ"—সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস। সমাস মোটামুটি ৪, অবান্তরভেদে ৬, সূক্ষ্মবিভাগে ২৬। সমস্ত সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাসের ভিতর এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে এই সমাস অপরাপর সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারে? এর উত্তরে শ্রীধর স্বামী বলেছেন—যে হেতু এই সমাসে উভয় পদার্থ প্রধান সেই হেতু ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণৌ। এখানে রাম ও কৃষ্ণ উভয়কেই প্রধানরূপে জানতে হবে। অন্যান্য সমাসে কোন্ কোন্ পদ প্রধান তা জানতে হ'লে সমাসপ্রকরণ পড়তে হয়, পরে নির্ণয় করতে হয়। স্বামিপাদ ঠিকই বলেছেন। একই দ্বন্দ্বসমাস তিন ভাগে বিভক্ত এও জানতে হয়। সমাহার দ্বন্দ্ব, ইতরেতর দ্বন্দ্ব ও একশেষ দ্বন্দ্ব। পিতৃশব্দের প্রথমার দ্বিবচন হ'লে পিতরৌ পদ হয়। এতে কি দুই পিতা বুঝায়? না, মাতা ও পিতা উভয়কে বুঝায়; এই জন্য একশেষ দ্বন্দ্ব। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ইতরেতর সমাসের অন্তর্ভুক্ত করলে কি "আত্মানৌ" এইরূপ দ্বিবচন হতে পারে? যদি হয়—এবং তা হয়ও বটে—তবে অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয় না, কেন না দ্বিবচনে

দ্বৈতত্বাপত্তি। আচার্য্য শঙ্কর এই অংশে বেশী কিছু বল্লেন না, কেন না তিনি অদ্বয়বাদী। দ্বৈতবাদী শ্রীধর স্বামী উদাহরণ দিলেন রামকৃষ্ণৌ। যেই রাম সেই কৃষ্ণ হ'লে তো অভেদে কর্ম্মধারয় সমাস হয়ে পড়ে, এবং একবচন প্রয়োগ করতে হয়। ভগবান্ প্রভু, কিন্তু ভক্ত দাস—এই অর্থে অনন্তকাল ভক্তে ও ভগবানে দ্বৈতত্ব। দ্বন্দ্বশব্দের অর্থ যুগল, দ্বন্দ্বশব্দের অর্থ কলহ। রামকৃষ্ণৌ স্থলে রাধাকৃষ্ণৌ বা লক্ষ্মী-নারায়ণৌ হ'লে বোধ হয় আরও ভাল হ'ত।

দশম অধ্যায়ে ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত একই শ্লোকে বল্লেন 'অক্ষরাণামকারোঽস্মি'। অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার। আবার বল্লেন 'গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্'—বাক্যসকলের মধ্যে আমি একমাত্র অক্ষর। আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীধরস্বামী উভয়েই বলছেন—এক অক্ষর অর্থ ওম্। ওম্ শব্দটির মধ্যে ব্যাকরণের সন্ধি ও সমাস উভয়ই ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করছে। অ+উ+ম্ এই তিনটি মিলে একটি। স্বরসন্ধি এবং দ্বন্দ্ব সমাস, উভয়ই একত্রবদ্ধ। অকারে বিষ্ণু, উকারে শিব, মকারে ব্রহ্মা—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণাত্মক তিন দেবতা সন্ধিতে ও সমাসে বদ্ধ। তিনগুণের অতীত যিনি তাঁকে বুঝায় ঐ সন্ধিসমাসবদ্ধ একাক্ষর। আনন্দগিরি স্বকীয় ভাষ্যে লিখেছেন—"ওঙ্কারস্য ব্রহ্মপ্রতীকত্বেন তদভিধানত্বে চ প্রাধান্যম্।" এ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক এবং তারই নাম অক্ষর। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" তার বাচক হ'লো প্রণব, অর্থাৎ ওম্। "তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনম্।" এই মন্ত্রের জপদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ভাবনা করা হয়। অতএব গীতাশাস্ত্রে নিবদ্ধ ব্যাকরণজ্ঞানের পর ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্যাকরণ-রচনার আদিতেই হ'লো বর্ণনির্ণয় বা অক্ষরনির্ণয়। তার মধ্যে স্বরবর্ণের স্থান আদিতে, ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান অন্তে। স্বর ১৬, ব্যঞ্জন ৩৪, মোট ৫০ অক্ষর। বর্ণাত্মিকা সরস্বতীর মূর্ত্তি কল্পনাদ্বারা বিভিন্ন অঙ্গে ৫০টি বর্ণের প্রকাশ। ভারতীভক্ত মানবের দেহেও ছয়টি পদ্মের কল্পনা করা হইয়াছে। পদ্মের ৫০টি পাপড়ি ৫০টি বর্ণের প্রতীক। স্বরবর্ণের আদি অক্ষর 'অ' ইংরেজিতে 'এ', আরবীতে 'আলেফ'। গ্রীক বর্ণাবলীতে আল্ফা (Alpha) সর্ব্ব আদি। অ+উ+ম্ এই ত্রিবর্ণ মিলিত শব্দের আদিও অ। উচ্চারণ ওম্ অথবা ওঁ, অথবা নাদবিন্দুকলা সহ ওঁ। যদি উ+অ+ম্ রূপে বর্ণত্রয় স্থাপিত হয় তবে উচ্চারণ বম্। অনাহত শব্দের অর্থ আকাশের সঙ্গে বাতাসের আঘাতজনিত ধ্বনি নয়, কেন না ঐ নাদ আকাশ ও বাতাসের ঊর্দ্ধে। আরো সূক্ষ্ম, ইথার বা তড়িৎ হ'তে সূক্ষ্ম। সকলের আদিতে শুধু তারই সত্তা, সেই ধ্বনির সত্তা, সেই বর্ণের সত্তা, তিনের মধ্যে প্রথম যেটি সেটি 'অ'। অতএব ভগবান বললেন "অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার।" বর্ণব্রহ্মে ও শব্দব্রহ্মে অভেদ, ব্রহ্মে ও বর্ণে অভেদ। সকলের আদিতে যিনি, তিনি বৃহৎ, তিনি বিরাট, বৃহৎ, বৃহত্তম, ব্রহ্ম। কেউ যদি তাঁর নাম দেন বিষ্ণু, তবে তাও সত্য, কেন না 'অকারো বাসুদেবঃ স্যাৎ'। 'অ' অক্ষর বাসুদেবকে বা বিষ্ণুকে বুঝায়। বিশ্বকে বেষ্টন ক'রে যিনি আছেন তিনি বিষ্ণু। অতএব যিনি ব্রহ্ম তিনিই বিষ্ণু হ'তে পারেন। পূর্ব্বে যে বলা হ'য়েছে ওম্ ব্রহ্মবাচক, এর তাৎপর্য্য উহা বিষ্ণুবাচকও বটে। বিশেষতঃ স্বয়ং বাসুদেব বল্ছেন "আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অ, বাক্যসমূহের মধ্যে ওম্।" বাসুদেব ও বিষ্ণু এক।

ব্যাকরণের ক্রিয়াপদ নির্ণয়ে কালজ্ঞানের প্রয়োজন। তাই ভগবান্ গীতাতে বলেছেন "ক্ষণ-দণ্ড-মুহূর্ত্ত প্রভৃতি গণনাকারীদের মধ্যে আমি

কাল। মানবের আয়ু-গণনায় যত প্রকার কালের অংশ সম্ভব সব স্বয়ং ভগবান্। "কালঃ কলয়তামহম্।"

ভগবান্ আবার বললেন আমিই অক্ষয় কাল —"অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ।" কাল শব্দের উল্লেখ স্থানে। পরবর্তী দুই কালশব্দের অর্থ প্রবহমাণ অক্ষয়কাল, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—যত কিছু নাম দেওয়া যাক্ সবই তিনি। নব্যন্যায়শাস্ত্রের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে আছে পদার্থ সাত প্রকার। তন্মধ্যে দ্রব্য একটি পদার্থ। দ্রব্য বল্‌লে—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, কাল, দিক্, দেহী ও মন এই নয়টি।

যিনি একাধারে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, যিনি একই স্বরূপে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, কর্ত্তা হেতু ও ক্রিয়া, সেই পরাৎপর পরমপুরুষকে নমস্কার—

"জ্ঞাতা জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞানং দ্রষ্টা দর্শনদৃশ্যভূঃ।
কর্ত্তা হেতুঃ ক্রিয়া চাসৌ তস্মৈ জ্ঞপ্ত্যাত্মনে নমঃ॥"

প্রতীক্ষমাণ

(The Vigil)

স্বামী পরমানন্দ

(অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

পবিত্র আমার সেই প্রদীপ-শিখায়
ক্ষণেকের তরে হেরি' তব মুখছবি,
জ্বলিয়া উঠিল হৃদি তীব্র কামনায়
দেখিবারে পুনরায় তোমা হেন কবি।

প্রহর গণিয়া আমি রহিনু বসিয়া
জ্বালাইয়া বেদিকায় মম দীপখানি,
কবে গো আসিবে প্রিয়, এই আশা নিয়া
নেহারিব কবে পুনঃ তব মুখমণি।

অন্তরের অন্তরেতে জানি ওগো জানি
মর্ত্তের আলোক নারে প্রকাশিতে কভু
ত্রিদিবসম্ভব সেই তব মুখখানি।
তোমারি জ্যোতিতে তাহা দেখা যায় শুধু,
একথাও শতবার মানি ওগো মানি।

তব ওগো দিবারাতি আশার আলোক
জ্বালায়ে রেখেছি মম ক্ষুদ্র বেদি পরে,
যদিও বা কোন দিন ওগো প্রিয়তম
মুহূর্ত্তের তরে তোমা পাই দেখিবারে।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

মার্কিন্ মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম জেমস্ বলেন, যে সব জিনিষ মানুষ স্বর্গীয় মনে করে, সে সব জিনিষ সম্বন্ধীয় অনুভূতি, কাজ এবং অভিজ্ঞতাকে ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ধর্ম্মের কোন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে থাকেন। একটি নির্দ্দিষ্ট নীতির উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নয়। এর মাঝে বিভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয় বিদ্যমান। সম্প্রদায়ের দিক থেকে যদি আমরা ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখব ধর্ম্ম হচ্ছে একটা মতবাদ অথবা ঐতিহ্য। অনেকক্ষেত্রে ধর্ম্ম অন্ধবিশ্বাসে রূপান্তরিত। এর মাঝে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের মাঝে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। দার্শনিক সক্রেটিশ ধর্ম্মান্ধদের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ধর্ম্মান্ধগণ বহু সত্যসন্ধানীর জীবন নষ্ট করেছে। তাছাড়া স্বার্থসন্ধানীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করে নি।

দার্শনিক জেমস্ ফ্রেজার বলেন, মানুষের জীবন তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয়। প্রথম স্তরে মানুষের জীবনের উপর যাদুবিদ্যার প্রভাব দেখা যায়। দ্বিতীয় স্তরে ধর্ম্ম মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তৃতীয় স্তরে মানুষের জীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি বলেন, মানুষের জীবন যখন বিবর্তিত হয়ে প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে পৌছে, তখন যাদুবিদ্যা এবং ধর্ম্মের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সুরু হয়। আবার দ্বিতীয় স্তর থেকে মানুষের জীবন যখন বিবর্তিত হয়ে তৃতীয় স্তরে পৌছে তখন সুরু হয় ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে একটা বিরাট সংগ্রাম।

জেমস্ ফ্রেজারের এই অভিমত অন্যান্য দার্শনিকরা মেনে নিতে রাজী নন্। তাঁরা বলেন, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বাধতে পারে না, কারণ একটি আরেকটির পরিপূরক। যদি কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র ধ্বংসকার্য্য অথবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মকে ব্যবহার করে, তাহলে তজ্জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়। সত্যিকার বৈজ্ঞানিক মনোভাবের আভাস দিয়েছেন চিন্তাশীল মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল। তিনি বলেছেন: "The scientific attitude of mind involves a sweeping away of all other desires in the interest of the desire to know."

ব্যক্তির দিক থেকে যদি আমরা ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখব ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষের বিবেক অথবা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। অবশ্য একথা ঠিক যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধর্ম্ম জড়িত। আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই, ধর্ম্মের মাঝে এমন একটি গভীর অর্থ রয়েছে যে অর্থ উপলব্ধি করলে চারিদিকের প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে মানুষের সত্তা একাত্মতা লাভ করে।

স্বপ্ন কি ভবিষ্যৎ বলিতে পারে ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের মূল ভিত্তি কি এই প্রশ্ন লইয়া কত মনীষী যে কত ভাবে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু মূল ভিত্তি যাহাই হোক না কেন, একটু অলৌকিক কিছু মিশ্রিত না থাকিলে কোনও ধর্ম্ম টিকিয়া থাকিতে পারে কি? শুধু যাহা জাগতিক, যাহা পার্থিব, যাহা ইন্দ্রিয়গোচর, তাহা যদি ধর্ম্মের অধিষ্ঠান হইত, তাহা হইলে যত সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক আছেন তাঁহারা সকলেই ঋষিপদবাচ্য হইতেন; কিন্তু ইঁহারা কেহই ঋষি আখ্যা লাভের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই—অন্ততঃ ভারতবর্ষে—যেহেতু তাঁহারা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধান পাইবার বা দিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করেন নাই, অথবা তাঁহাদের 'ব্যবসায়াত্মিকা' বুদ্ধিরূপ করণ বিপ্রকৃষ্ট, সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তু দর্শনে অশক্ত। অথচ দেখা যায় কোন নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর ব্যক্তিও যদি একাদশ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন বস্তুর কথা বলে, লোকে তাহার কাছে ছুটিয়া যায় বড় বড় পণ্ডিতদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া। উপনিষদের, তন্ত্রের, মন্ত্রের এত মহিমা তাহারা অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপক বলিয়া, ইন্দ্রিয়াসাধ্য সাধ্যের সাধক বলিয়া।

স্বপ্নতত্ত্বও সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই স্বপ্ন সম্বন্ধে মানুষের যে কত রকম বিভিন্ন ধারণা আছে, তাহা কে বলিতে পারে? অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে এই স্বপ্নতত্ত্ব কথঞ্চিৎ আলোচিত যে হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ান্তর্গত তৃতীয় ব্রাহ্মণের জনকযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে—৭ম হইতে ১১শ অনুচ্ছেদে। উক্ত উপনিষদ পাঠে স্বতই প্রতীয়মান হয় যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মত বিশালদর্শী মনীষী দ্বিতীয় ছিলেন না। উপনিষৎ-তত্ত্ব মধ্যে তাঁহার অজ্ঞাত যেন কিছুই ছিল না মনে হয়। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধতম রাজর্ষি বিদেহ জনকের গুরু। তিনি 'স্বপ্নস্থান'কে 'সন্ধ্যাস্থান' বলেন। এই স্বপ্নস্থান হইতে ইহলোক-রূপ স্থান এবং পরলোকরূপ স্থান এই দুইটিই নাকি দেখা যায়। তাই দুই স্থানের সন্ধি এই স্বপ্নস্থান। ইহা ছাড়া তিনি স্বপ্ন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে যদিও আমাদের দেশে অনেক বেদপন্থী আছেন যাঁহারা বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন এবং জগৎ সত্য কি মিথ্যা এই বিচারে কালক্ষেপ করেন, ও ভূরি ভূরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখেন, তথাপি এই যে স্বপ্নবিষয়ে বেদান্তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নিষ্কর্ষ, যে স্বপ্নস্থান হইতে পরলোক-স্থান অনুভবগম্য হয়, সে তত্ত্বটিকে সম্প্রদায়বিদ্‌গণ বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ক্রমসম্মত অন্বীক্ষা, সমীক্ষা ও পরীক্ষার (Inference, observation & experiment) সাহায্যে ক্রম-বিবর্দ্ধমান গবেষণার বিষয়ীভূত করিয়া উহার পুষ্টিসাধন ও দৃঢ়সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার যে কোনও নিদর্শন আছে তাহা আমার জানা

নাই। যতদূর জানি আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অগ্রগতি দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ব্যাহত হয়, সম্ভবতঃ সব শাস্ত্রেরই সেই দশা। কিন্তু ভগবানের বিচিত্র ও অপক্ষপাত বিধানে দেখা যায়, যে চিন্তাস্রোত ভারতবর্ষে বাধিত হয়, তাহাই যেন কি প্রকারে পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষতঃ জার্ম্মেণীতে উদ্ঘাটিত হইয়া, আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে চোখে অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহাদের দেশে কি অমূল্য তত্ত্বভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে। এইজন্যই বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন সায়ণাচার্য্য ম্যাক্সমূলাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জার্ম্মেণীতে। আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ "বেদে আছে" বলিয়াই খালাস, কিন্তু বেদে যে আছে তাহা স্বরূপতঃ কি তাহা তলাইয়া দেখিবার বা বুঝিবার, বৈদিক তত্ত্বের সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য কতখানি ও কোনখানে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা স্পষ্টীকৃত করিয়া দিবার মহৎ প্রচেষ্টার অত্যন্ত অভাব। ফলে স্বপ্নতত্ত্বের মত জিনিষটি শকুনজ্ঞের শকুনে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সম্প্রতি হার্ভে ডেভি নামক জনৈক পণ্ডিত স্বপ্ন বিষয়ে কতকগুলি আশ্চর্য্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। নীচে তাহার সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইল ঃ

"কালকে এমন একটি রাস্তার সঙ্গে তুলিত করা যেতে পারে, যে রাস্তাটি এঁকে বেঁকে একটা তুঙ্গস্থানের চূড়ান্তে উঠে সেখান থেকে আর একপাশে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ওপাশেও এই মুহূর্ত্তে নানারকম ঘটনা ঘট্‌চে, যা আমরা অথবা আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই দেখতে পায় না। কিন্তু কোনও অদ্ভুত শক্তির বলে, ক্বচিৎ কয়েকটি মানুষ তাও দেখতে পায়। কেন আমরা জানি না, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এর রহস্য ভেদ ক'রতে হয়তো সমর্থ হবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন্ মেরি কলেজের গণিতের অধ্যাপক ডক্টর সোল কতকগুলি পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে কেউ কেউ ঘটনা ঘটবার দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ ক'রতে পারে। দুই মুহূর্ত্ত হ'লে, দশ মুহূর্ত্ত হ'তে কি বাধা? দশ হ'লে একশো হ'তেই বা কি? আর যদি একশোই হয়, তবে দশশো হাজারেই বা কি? কোনও সীমানারই বা কি দরকার?

"আমরা জানি যে স্বপ্নযোগে অনেক ঘটনাই আশ্চর্য্য যাথাতথ্যের সঙ্গে আগে থেকেই বর্ণিত হয়েছে। * * * স্বপ্নের আকারে এমন সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে ঘটনা খুঁটিনাটি শুদ্ধ আগে থেকেই বলা হয়েছে। এখন আমাদের কাজ এমন পন্থা আবিষ্কার করা যাতে আমরা সত্য স্বপ্ন দেখতে পারি। * * *

"স্বপ্নের একটা মজা এই যে যখন স্বপ্ন দেখা যায়, তখন মনে হয় যে স্বপ্ন বাস্তবের চাইতে অনেক বেশী সত্য ও তীব্র। ধরুন না কেন, স্বপ্নে মানুষ যে ভয় পায়, জাগ্রত অবস্থায় অনুভূত ভয়ের চাইতে তার মাত্রা অনেক বেশী। স্বপ্নজীবন অনন্তগুণে বেশী স্পষ্ট। ঘুম ভাঙ্গার পর মুহূর্ত্তেই একেবারে কিম্ভূতকিমাকার স্বপ্নগুলিও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। এক ঘণ্টা পরে অনেক কম বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তারপর সকাল বেলা অত্যন্ত জাজ্বল্যমান স্বপ্নও হুবহু হিজিবিজিতে পরিণত হয়।

"স্বপ্নের গঠন-সংস্থানটি যে কি তা আমাদের এড়িয়ে চলে। তথাপি স্বপ্ন-স্থানের কোনও মূল্য নেই ব'লে কি আমরা তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি? জে ডব্লিউ ডন্, স্টুয়ার্ট ইয়াং এবং মেগ্রজের মত সব বিজ্ঞানবিৎ ও লেখকগণ এ বিষয়ে বিরাট গবেষণা চালিয়েছেন এবং তাঁহারা নিঃসন্দেহ যে স্বপ্ন মানুষের কাজে লাগতে পারে।

অবশ্য আমাদের সকলের পক্ষে এমন ভাবে স্বপ্ন দেখা কখনই সম্ভব হবে না যাতে করে আমরা সকলেই ভবিষ্যৎ ব'লতে পারবো : কিন্তু যদি জনগণের খুব সামান্য অংশও ঠিক ঠিক সত্য ভাবে স্বপ্ন দেখতে সমর্থ হয়, তাহলে আমরা বিপদসংকুল ব্যাপারের পূর্ব্বাভাস পেয়ে সাবধানে হ'তে পারি ও জীবন বাঁচাতে পারি এবং দুঃখ এড়াতে পারি।

"সত্য স্বপ্নের কতকগুলি পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেয়ার যে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, তদপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা একটিও নেই : তাঁর মনে পড়ে যে ১৯৩৭এর ৮ই জুন ভীষণ পীড়িত একটি ছাত্র তাঁকে ডেকে পাঠায়। ছাত্রটি এই বলে তাঁর হেপাজতে একটি বাক্স রেখে দেয় যে সে যদি মারা যায় তবে যেন এই বাক্স খোলা হয়। ছেলেটি ১৩ই মারা যায় ও মেয়ার বাক্সটি খুলে দেখেন তার মধ্যে একটি চিঠি আছে যাতে ছেলেটি ৬ই জুন সে যে স্বপ্ন দেখেছিল তার বর্ণনা আছে।

"সে লিখেছে সে একটা কবরখানায় গিয়ে পড়েছিল, সেখানে সে দেখতে পেলো একটি কবরের পাথর যার উপর তার নাম ও জন্ম তারিখ খোদাই করা আছে। মৃত্যুর তারিখটা শ্যাওলার দরুন অস্পষ্ট ছিল। শ্যাওলা চেছে ফেলতে পড়া গেল ১৩ই জুন ১৯৩৭। তারপর সে জাগলো ভয়ত্রস্ত। দৃষ্টপূর্ব্ব তারিখে মৃত ছেলেটিকে তার স্বপ্নদৃষ্ট কবরেই সমাহিত করা হয়।

"কিন্তু কারও ভবিষ্যৎ যে স্বপ্নে জানা সম্ভব, একটি মাত্র বিবিক্ত ঘটনা তা' প্রমাণ করাবর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। কালের গালিচা ছড়িয়ে দেবার নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই মানুষ বার বার তার নমুনা দেখতে পেয়েছে। অনাগতের পূর্ব্বদর্শন হিসাবেই শুধু যাদের তাৎপর্য্য আমি এমন কতকগুলি স্বপ্নের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ স্মরণপথে আনতে চাই।

"১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী স্পেন্‌সার পার্সিভ্যালের বৃত্তান্তটি অতি পরিচিতদের মধ্যে একটি। সেই বৎসরের ১১ই মে তিনি প্রাতর্ভোজন করতে এসে হ্যারোবির আর্লকে গোপনে বলেন যে সেই রজনীতে একটি জল জল স্বপ্ন দেখে তিনি অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত হয়েছিলেন। ঐ আর্ল-এর বাড়ীতেই তিনি ছিলেন। তিনি বলেন তিনি যখন হাউস্ অব কমন্সের লবি দিয়ে যাচ্ছেন, তখন পেতলের বোতামে শোভিত সবুজ কোট পরিহিত এক জন লোক তাঁকে পিস্তল ছোঁড়ে, আর তিনি পড়ে যান। লর্ড হ্যারোবি তাঁকে অনেক ক'রে বারণ করেন যেন সেদিন তিনি পার্লামেণ্টে না যান, কিন্তু তিনি ওর কথা শুনলেন না; ইতিহাস বলে যে বেলিংহ্যাম্ নামে যে উন্মাদটি পিস্তল ছোঁড়ে তার পরণে পেতলের বোতাম-আঁটা সবুজ জ্যাকেট ছিল।

"বোঝা যাচ্ছে যে স্বপ্নের আকারে সতর্ক করে দেবার এটা একটা পরিষ্কার দৃষ্টান্ত। একে অগ্রাহ্য করা হোলো কেন তাই প্রশ্ন।

"এই রকম স্বপ্নের বহু দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু এদের উদ্দেশ্য যে কি তা আমরা অনুমানও করতে পারি না, কারণ ক্বচিৎ কদাচিৎ এদের সূচক ইঙ্গিত অনুসৃত হয়, আর এই সকল স্বপ্নে যা যা দেখান হয় তার গোটাটাই কার্য্যতঃ ফলিত হয়।

"তাঁহার হত্যার কিছু দিন পূর্ব্বে আব্রাহাম লিঙ্কন তাঁর স্ত্রী ও ওয়ার্ড হিল ল্যামন্ নামক জনৈক মিত্রকে গোপনে বলেন যে একটা স্বপ্নে তিনি হোয়াইট হাউসের এক কামরা

থেকে আর এক কামরায় পায়চারি করছিলেন। সেখানটায় জনপ্রাণী ছিলনা, কিন্তু প্রত্যেকটি কুঠরীতেই তিনি চাপাকান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন।

"পূর্বের কামরায় তিনি দেখতে পেলেন একটি বিশিষ্ট শবমঞ্চ যার ওপর শ্মশান-সজ্জায় সজ্জিত একটি মৃতদেহ স্থাপিত ছিল। যে সকল সৈন্য তার পাহারা দিচ্ছিল, তাদের ঘিরে ছিল একদল রোরুদ্যমান শোকাচ্ছন্ন লোক। 'হোয়াইট হাউসে মরে শুয়ে আছে কে?'—প্রশ্ন করেন লিঙ্কন। 'প্রেসিডেণ্ট'—উত্তর দিল তারা। 'তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

"লিঙ্কন স্বীকার করেন যে যদিও এটা স্বপ্ন মাত্র ছিল তথাপি, মনের উপর তার ছাপ এত প্রবল হ'য়েছিল যে বাকী রাতটা তিনি ঘুমোননি এবং আসন্ন অপঘাতের ভয়সহ আতঙ্ক মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি।

"স্পেন্সার পার্সিভ্যাল এবং আব্রাহাম লিঙ্কন নিজ নিজ মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু এমন সব দৃষ্টান্তও আছে যে মানুষ অপরের মৃত্যুস্বপ্নও দেখেছে।"

অতঃপর লেখক মার্ক টোয়েনের জীবনী থেকে এই রকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেন।

এখন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু মনে হয় চিন্তারাজ্যে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তৃগণ ও সমাজের ধুরন্ধরগণ যেন পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক পাশ্চাত্যের অনুকরণশীল হইয়াছেন। খ্যাতনামা নেতৃবর্গের মধ্যে একজন মনীষীকেও দেখা যায় না, যিনি অকপট ও অকুণ্ঠিত চিত্তে বিজিতপূর্ব্ব ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা আয়ত্ত করিয়া স্তূপীকৃত সহস্র বৎসরের জঞ্জাল সরাইয়া দিয়া তাহাকে সুপরিষ্কৃত খাতে প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রদায়বিশেষ তাঁহাদের নিজ নিজ চেষ্টায় অবশ্য সহস্রধা প্রসারিত ভারতীয় বিদ্যার কোনও কোনও শাখা বহুকষ্টে জিয়াইয়া রাখিয়াছেন বটে; প্রাচীন অতিভাস্বর জ্ঞানের আলোক এখনও স্থানে স্থানে টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে বটে; স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার সহকর্ম্মী সন্ন্যাসিগণ পরমহংসদেব কর্তৃক প্রজ্বালিত দিব্য জ্ঞানের বর্ত্তি লইয়া দেশে দেশে তাহার বিমল শিখা দ্বারা সংশয়ক্লিষ্ট মানুষের তমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত করিয়াছেন বটে; প্রোফেসার গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রামাণিক আত্মপ্রচেষ্টায় হঠযোগের মহিমার কিয়দংশ পাশ্চাত্য জগতে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন বটে; সোমেশ বসুর মত অদ্ভুত গাণিতিক তাঁহার অলৌকিক গুণনশক্তি-প্রদর্শনে দেশবিদেশকে চমৎকৃত করিয়াছেন বটে; কিন্তু দেশবাসীর সমাজ ও সামগ্র্যবিশিষ্ট দিব্যদৃষ্টির অভাবে আজ ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ব্যাহত হইতেছে।

অনেক বিদ্যাই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন স্বাধীন ভারত সরকারের কর্তব্য একটি বিশাল গবেষণাগার সৃষ্টি করা যেখানে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্যে লুপ্ত এবং গুপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিশীলিত হইতে পারে।

"বিবেক-বৈরাগ্য না থাকলে শাস্ত্র পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভও হয় না।……বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কথাসংগ্রহ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

এলাহাবাদে অবস্থানকালে ১৯৩৭ সনের ২২শে অক্টোবর পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর পুত্র শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ সাপ্রু আই-সি-এস মহাশয়ের মোটরকারে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বেড়াইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন: "দেখ, এত কারে চড়েছি কিন্তু এমন আরামদায়ক কারে কখনো চড়ি নি।" সেই দিন সন্ধ্যায় সাপ্রুর বাড়ীতে যাইবার কথা উঠিলে তিনি তাঁহাদের সনিবন্ধ অনুরোধে সম্মতি জানাইলেন। যখন তিনি সাপ্রু-ভবনের ফটকে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাদের গৃহবধূগণ পুষ্পমাল্যশোভিত বরণডালা দিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে সম্বর্ধনা ও ভূনত প্রণাম করিলেন। স্যার তেজবাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ সাপ্রু তাঁহার দর্শনলাভের জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি দর্শনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশান্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ সাপ্রু তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রাঞ্জল ইংরেজিতে ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন: 'Oh! He was a very simple and plain man. He used to be constantly immersed in the thought of the Divine Mother, the creatrix of the universe." —আহা! তিনি খুব সরল ও সাদাসিধা লোক ছিলেন। জগন্মাতার চিন্তায় তিনি সর্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন! বিজ্ঞান মহারাজের কথা শেষ হইলে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "এঁর এত বয়স হয়েছে, কিন্তু মস্তিষ্ক সতেজ ও চিন্তাশক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ।" তাঁহার পূত সঙ্গ লাভে তাঁহারা পরম তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন। বিদায়ের পূর্বে তিনি সাপ্রু-ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন: "Be happy in life. Be prosperous in life."—জীবনে তোমরা সুখী ও সমৃদ্ধ হও।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কোন মান্দ্রাজী মন্ত্রশিষ্য নানা দার্শনিক প্রশ্ন তুলিয়া স্বীয় সংশয় প্রকাশ পূর্বক তাঁহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। উহার উত্তরে তিনি অতি অল্প কথায় এই ভাবে লিখিয়াছিলেন: "The mantras themselves will throw light in you. You need not be anxious. Repeat them daily morning and evening; all your doubts will be cleared as mists are cleared on the sun rising and you are certain to be happy."—তোমাকে যে মন্ত্রগুলি দিয়াছি সেগুলি তোমার অন্তরে আলোকসম্পাত করিবে। তোমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন্ত্রজপ করিও। সূর্য্য উঠিলে যেমন কুয়াশা অন্তর্হিত হয় সেইরূপ তোমার চিত্ত হইতে সংশয়গুলি দূর হইয়া যাইবে। নিশ্চয়ই তুমি আনন্দলাভ করিবে।' সিদ্ধ গুরুর এই কয়েকটি বাক্যে শিষ্যের মনের অন্ধকার অচিরে কাটিয়াছিল।

১৯৩৮ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার,

বিন্ধ্যাচলে গঙ্গাতীরে কোন সাধু তপস্যা করিবার সময় নিম্নোক্ত অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন: তাঁহার ঘরের দরজার পাশে রাত্রি তিনটার একটু পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ হঠাৎ কম্বল দেহে আসিয়া বসিলেন। সাধুটি ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখিতে পাইলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। বিজ্ঞান মহারাজ অতি করুণার্দ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন: "তোমার অশুভ বাসনা কিছু রয়েছে।" দৃঢ়তার সহিত দুই বার বলিলেন, "কেটে যাবে, কেটে যাবে। এক দিন আমার কাছে এসো, বলে দিব। দুবার একবার আসবে।" সাধুটি স্বীয় অশুভ বাসনার কথা ভাবিয়া এবং মহারাজের অহেতুকী কৃপা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

এই ঘটনার পরে সাধুটি বিন্ধ্যাচল হইতে চলিয়া আসেন। কিন্তু এলাহাবাদে যাইয়া এই বিষয়ে বিজ্ঞান মহারাজকে কিছু বলিতে পারিলেন না বলিয়া মনে মনে আপশোষ করিলেন। সাধুটির কর্মোপলক্ষে দাক্ষিণাত্যে যাইবার কথা হয়। পাছে তাঁহার সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ না হয় এই আশঙ্কায় তিনি চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সেই বৎসর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির পূর্ব দিন মঠে আসিয়াই শুনিলেন, বিজ্ঞান মহারাজ অপ্রত্যাশিত ভাবে মঠে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া সাধুটি অবাক হইলেন। কিন্তু স্বীয় সমস্যা-সমাধানের সুযোগ পাইয়াও এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। ৩রা মার্চ বৃহস্পতিবার ঘটনাক্রমে সাধুটি একান্তে তাঁহাকে দর্শন করিবার সময় পাইলেন। বিজ্ঞান মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক সাধুটি বলিলেন: "মহারাজ, আপনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের যে ফটো দুটি দিয়েছেন তা ধ্যান করি। কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে।" স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন: "কি বল।" সাধুটি বিনম্র বাক্যে নিবেদন করিলেন: "আমার অশুভ বাসনা কেমন করে কাটবে?" বিজ্ঞান মহারাজ তৃপ্তি ও শুভেচ্ছার সহিত স্নেহপূর্ণ নেত্রে বলিলেন: "ও চলে যাবে। ওদিকে মন না দিলেই হলো।"

সাধু—ঠাকুর ও মায়ের ধ্যান এবং নামজপ করলেই যাবে?

বিজ্ঞান মহারাজ—হাঁ, ওতেই যাবে, ঐ করলেই যাবে।

এই কথার পর তিনি গান করিয়া বলিলেন: "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর। এখন আমি শোব। তুমি এস।" এই বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন।

পূর্বোক্ত সাধু একদিন সকালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে এলাহাবাদে দর্শন করিতে যান। সাধুটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে তিনি তাঁহার সম্মুখে একটি চেয়ারে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ তখন তাঁহার কাছে তুলসীদাসের প্রেতদর্শন এবং রামায়ণ-পাঠান্তে হনুমানজীর সহিত সাক্ষাৎ ও বিন্ধ্যাচলে রামলীলাদর্শন প্রভৃতি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তুলসীদাস সম্বন্ধে বলিলেন: "একবার হনুমান তাঁকে রামায়ণ লিখতে আদেশ করেন। তুলসীদাস উত্তর দেন: 'আমি যে রামায়ণ লিখবো, আমার সে রামভক্তি কই?' এই কথা বলিয়াই বিজ্ঞান মহারাজ ভাবগদগদ চিত্তে অজস্র অশ্রুবিসর্জন করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ ভক্তিবিহ্বল দেখিয়া সাধুটিও আত্মহারা হইয়া অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞান মহারাজ স্বীয় ভাব সংবরণ করিয়া সাধুটিকে হাত তুলিয়া শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রথম দীক্ষাদানের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ সনে তিনি দ্বারকাধাম দর্শনান্তে রাজকোট আশ্রমে একদিন থাকিয়া বোম্বাই আশ্রমে গমন করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দজী তখন অন্যত্র গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামী জপানন্দজী বোম্বাই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন বিজ্ঞান মহারাজের সেবার তত্ত্বাবধানার্থ। বোম্বাইতে কালেকর নামে একজন তরুণ মারাঠী ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন স্বামী গুণাতীতানন্দজীর নিকট। গুণাতীতানন্দজী বিজ্ঞান মহারাজের অনুমতি না লইয়াই বৃদ্ধকে কথা দেন, তাঁহার দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। বৃদ্ধ তদনুযায়ী প্রস্তুত হইলেন এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া ফেলিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ যে দিন বোম্বাই আশ্রমে পৌঁছিলেন, সে দিন সন্ধ্যায় স্বামী গুণাতীতানন্দজী বৃদ্ধকে পরদিবস দীক্ষাদানের জন্য প্রার্থনা জানান। তিনি ইতঃপূর্বে দীক্ষা দেন নাই; তাই গুণাতীতানন্দজীর অনুরোধে ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং দীক্ষা দিতে অস্বীকার করিলেন। স্বামী জপানন্দজী আশ্রমবাসী সাধুদের অনুরোধে মহারাজকে সম্মত করিবার জন্য গেলেন। প্রথমে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন জপানন্দজী তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন: "আপনি ঠাকুরের সন্তান। আপনি ঠাকুরের নাম শুনাইয়া দিবেন। তাহাতেই দীক্ষা হইবে।" তাঁহার অনুনয়-বিনয়ে মহারাজ কিঞ্চিৎ সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "আমি কিন্তু সকালে স্নান করতে, ঠাকুর ঘরে যেতে, বিছানা ছেড়ে অন্য আসনে বসতে বা চা খাওয়া বন্ধ করতে পারবো না।" স্বামী জপানন্দজী বলিলেন: "আপনি সদা শুদ্ধ। আপনার স্নান করা, কাপড় ছাড়া বা অন্য আসনে বসার প্রয়োজন নেই। আপনি যেখানে বসবেন সেইখানেই ঠাকুর ঘর। আপনি বিছানায় বসেই দীক্ষা দেবেন।" বালকবৎ তিনি রাজী হইলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি কাপড় ছাড়িলেন, এবং চা খাইলেন না। দীক্ষার্থী আসিয়া তাঁহার পদতলে বসিলেন এবং বিজ্ঞান মহারাজ বিছানায় বসিয়াই তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম দীক্ষাদান। দীক্ষাদানের পর গুরু শিষ্যকে স্বীয় জপমালা দিয়াছিলেন। উক্ত মালা তিনি নিজে প্রায় চল্লিশ বৎসর জপিয়াছিলেন। তখন তিনি স্বামী জপানন্দজীকে একটি মালা আনিয়া দিতে নির্দেশ দিয়া বলেন, "পনের বৎসর পূর্বে কোন জৈন সাধুর জপমালা দেখেছিলাম। তখন থেকে এই মালা নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তুমি সেরূপ একটি মালা এনে দাও।" এই প্রকার জপমালা রেশমী সূতায় তৈরী করেন জৈন সন্ন্যাসিনীগণ। এই সকল বাজারে পাওয়া যায় না, জৈন সাধুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। স্বামী জপানন্দজী বোম্বাই শহরে যাইয়া একজন জৈন স্ত্রীভক্তের নিকট হইতে অতিকষ্টে সেই মালা যোগাড় করেন। এক জন জৈন সাধু চল্লিশ দিন উপবাসান্তে উক্ত স্ত্রীভক্তের নিকট আহার্য গ্রহণ করেন এবং আশীষ রূপে দুইটি মালা তাঁহাকে দেন। সেই দুইটি মালা আনিয়া স্বামী জপানন্দজীও বিজ্ঞানানন্দজীর হাতে দিতেই তিনি বালকবৎ আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন: "তুমি আমার পনের বৎসরের ইচ্ছা পূর্ণ করলে!" এই বলিয়া তিনি মালা হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ জপ করিতে লাগিলেন।

ইউরোপের প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক সি জে জুং কলিকাতায় আসিয়া বেলুড়মঠে যান এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ জুং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন: "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

এই মন্দিরের পরিকল্পনা কি আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন?" তদুত্তরে বিজ্ঞান মহারাজ বলেন: "হুঁ, তিনি আমাকে ideas (ভাব) দিয়েছিলেন এবং নক্সা করতে বলেছিলেন। প্রথম নক্সাটি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী করে তাঁকে দেখাই। ঐটি তিনি পছন্দ করলেন না। এইরূপে দুই তিনবার নক্সা করে তাঁকে দেখান হয়। শেষেরটি দেখে তিনি বলেন, অনেকটা হয়েছে। মূলতঃ তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে এই মন্দির নির্মিত।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন: "স্বামীজী যখন বেলুড় মঠে থাকতেন তখন মঠটি আমার কাছে জ্যোতির্ময় প্রতীত হত, দূর থেকে তা আমি বেশ টের পেতুম। তিনি মঠে না থাকলে মঠটি নিষ্প্রভ দেখাত। বাহিরে থেকে এসে মঠে ঢুকলেই বুঝতে পারা যেত স্বামীজী মঠে আছেন কি নেই।" বিজ্ঞান মহারাজ বেলুড় মঠের দ্বিতলস্থ ক্ষুদ্র একটি কক্ষে থাকিতেন, যেটিকে 'খোকা মহারাজের ঘর' বলা হয়। উহার দক্ষিণেই স্বামীজীর কক্ষ। একরাত্রে বিজ্ঞান মহারাজ ঘরের বাহিরে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ধারের বারান্দায় তিনি শুনিলেন, স্বামীজীর ঘর হইতে করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি আসিতেছে। ইহা শ্রবণে তাঁহার মনে হইল, স্বামিজীর শরীর বোধ হয় অসুস্থ। তাই তাঁহার মুখ হইতে এই ব্যথিত স্বর আসিতেছে। তিনি স্বামীজীর ঘরে যাইয়া দেখিলেন, স্বামিজী মেজের উপর পড়িয়া করুণ-স্বরে কাঁদিতেছেন। বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "স্বামীজী, আপনার কি শরীর খারাপ?" তখন স্বামীজীর চেতনা হইল। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন: "কে পেসন? আমি ভেবেছিলাম, তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছ।" তখন বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী ব্যথিতচিত্তে সজল নয়নে বলিলেন: "দেশের দুঃখ-দৈন্য দুর্দশার কথা ভেবে ভেবে আমি ঘুমতে পারছি না, মনটা বেদনায় ছটফট করছে। তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, এদেশের সুদিন আসুক, দুর্দিন চলে যাক।" বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া বিছানায় শোয়াইলেন। দেশের দুঃখদারিদ্র্যে স্বামীজীর প্রাণ শেলবিদ্ধ হইত।

হলিউড বিবেকানন্দ হোমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সারনাথ মিউজিয়ামে অলৌকিক দর্শনের বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তদন্তে নিম্নোক্ত অলৌকিক অনুভূতির কথাটি বলিয়াছিলেন। এক শিবরাত্রির দিনে কাশী অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমের সাধুগণ বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজকে কেহ কেহ অনুরোধ করিলেন: "মহারাজ, আপনি যাবেন কি?" তিনি কৌতুক করিয়া বলিলেন: "ঐ পাথর খানা দেখতে আর কি যাব?" কিন্তু পরে তিনি বিশ্বনাথদর্শনে গিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার এই অলৌকিক অনুভূতি হয়। তিনি দেখেন—মন্দিরে শিবলিঙ্গ অন্তর্হিত। ক্রমে মন্দির ও দৃশ্যমান বিশ্ব কোথায় মিলাইয়া গেল। বিশ্বনাথের বিরাট বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ অনুভূত হইল। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আশ্রমে ফিরিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী যখন এলাহাবাদে ছিলেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অন্যত্র যাইবার পথে তথায় উপস্থিত হন। তিনি বলিতেন, "বিজ্ঞান মহারাজ গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি ধরা দিতে চান না।" বিজ্ঞান মহারাজও ঠাকুরের এই মানস-পুত্রকে কত ভক্তি করিতেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে জানা যায়। একজন ভক্ত

এলাহাবাদ মঠে আসিয়া বিজ্ঞান মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহাকে বলেন: "সংঘাধ্যক্ষ এখানে উপস্থিত। তাঁর কৃপা পেলে ঠাকুরের কৃপাই পাওয়া হবে।" তদনুযায়ী ভক্তটি ব্রহ্মানন্দজীর নিকট গেলেন। ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন: "বিজ্ঞান মহারাজ স্থানীয় মঠের অধ্যক্ষ। তিনি গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ। আপনি তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হোন।" ভক্তটির পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় এবং ব্রহ্মানন্দজীর অনুরোধে বিজ্ঞান মহারাজ নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া যান এবং কিছু উপদেশ দেন। পরে ব্রহ্মানন্দজীর একটি ফটো তাঁহাকে উপহার দিয়া বলেন: "এই মূর্তির পূজা ও ধ্যান করলেই আপনার সব হবে। ইনিই আপনার গুরু।" ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের গুরুগিরির বাসনা আদৌ ছিল না। পরদুঃখে কাতর হইয়া মানুষের ভবরোগ দূর করিবার জন্য কৃপাবশে তাঁহারা দীক্ষাদি দিতেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থের যে সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা এলাহাবাদ পাণিনি অফিস হইতে প্রকাশিত। উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি শাস্ত্র। অনুবাদের নানা স্থানে অনুবাদক যে সকল সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন সেগুলিতে সাধনরহস্যের সুগূঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেবতা-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি একটি মন্তব্যে লিখিয়াছেন: "মনোভূমি ও বুদ্ধিভূমিতে দেবগণ কারণদেহে সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত। যখন তাঁহারা নিম্নভূমিতে নামিয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করেন, তখন আংশিক ভাবে তাঁহারা আবৃত হন। কিন্তু তখনই আমরা তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। দেবগণ সকলেই বাস্তব ও সত্য। তাঁহাদের আকৃতি আছে। যদি মানব বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের রূপ দর্শনের ইচ্ছা করে তবে দেবরূপ দৃষ্টিগোচর হয় হৃদয়ে বা আজ্ঞাচক্রে। মন মস্তিষ্কে স্থিত সহস্রারে উত্থিত হইলে দেবরূপ জ্যোতিতে বিলীন হয়। সহস্রারে যে দিব্য জ্যোতি বিরাজিত তাহাই নিম্ন লোকে নামিয়া রূপধারণ করেন। দেবগণ ইচ্ছামত আকৃতি পরিগ্রহ করিতে পারেন। বহির্জগতের বস্তুসমূহ আমরা যে ভাবে দেখি সেই ভাবে দেবমূর্তি দেখা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে, দেবগণ মানুষ, পশু, বৃক্ষ বা প্রস্তরাদি জড় বস্তুর মূর্তিও ধারণ করেন। ভক্তগণ যে ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন ফটোতে, প্রতিমায়, প্রস্তরে, বায়ুতে, জলে বা অগ্নিতে তাঁহার অস্তিত্ব অনেক সময় অনুভূত হয় অদ্ভুত ভাবে লেলায়মান জ্যোতিরূপে। এমন কি, ভক্তগণ দেবগণকে কথা বলিতে শুনেন মৃদু অস্ফুট স্বরে।

"শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়বৃন্দাবনে বাস করেন। তিনি আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রারেও থাকেন। ঊর্ধ্বে দেবলোকেও বৃন্দাবন ধাম আছে। শ্রীমহাদেব কৈলাসবাসী। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয় যেখানে আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারে মিলিত, তথায় কৈলাসধাম অবস্থিত। ব্রহ্মা নাভিদেশস্থ মণিপুর-চক্রে থাকেন। নিম্নস্তরের কয়েকটি দেবতা ও ভক্তগণ দেবগণের পার্ষদরূপে আছেন। মৃত্যুর পর মানবগণ পিতৃলোকে গমনপূর্বক পরমানন্দে পিতৃগণের সহিত বাস করেন। কিংবা তাঁহারা দেবলোকেও যান এবং বিশেষ বিশেষ দেবতা ও দেবলোকের প্রতি আকর্ষণানুসারে স্ব স্ব ইষ্টদেবের সেবকরূপে থাকেন। যাঁহারা স্বর্লোকে যান তাঁহারা ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণাদি দেবগণের সহচর রূপে অবস্থান করেন। দুষ্কৃতির বশে কেহ কেহ প্রেতলোকে বা অন্য নিম্ন লোকে বা নরকেও যাইয়া থাকেন। সেই সকল লোকেই পাপক্ষয় করিতে হয়।

"দেবগণের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে। তাঁহাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও সৃজনক্ষম। তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম বহু দূরে প্রসারিত বা বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ। তাঁহারা যে জ্যোতির্মণ্ডলে বেষ্টিত থাকেন তাহা বিবিধ বর্ণযুক্ত ও বহুদূর বিস্তৃত। তাঁহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ আছে। ইহাদের কাজ অতি সূক্ষ্ম কারণরাজ্যে বা ভাবলোকে প্রকটিত হয়। সেইগুলি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন ইহলোকে আমাদের অবস্থা সূক্ষ্মতর হইয়া সূক্ষ্মতম কারণ-ভূমিতে যায়, যেমন সুষুপ্তিতে, তখন আমরা তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ বা কারণ-শরীর দেখিতে পাই। দেবগণ স্থূল দেহ ধারণেও সমর্থ।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 'নারদপঞ্চরাত্রে'র ইংরেজি অনুবাদে নিয়োদ্ধৃত তিনটি সুচিন্তিত মন্তব্যে পূজাতত্ত্ব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "পূজার উদ্দেশ্য দেহ, মন ও বাক্যের অশুদ্ধি দূর করা এবং অমরাত্মা বা পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। প্রধানতঃ আমাদের দেহবুদ্ধি প্রবল বলিয়া দেহ হইতেই আরম্ভ করা উচিত। পূজায় বা জপে ভক্ত দেহের যে যে অঙ্গ বা করাংশ স্পর্শ করেন সেগুলি অদ্ভুত ভাবে সুষুম্না নাড়ীর তিনটি কেন্দ্রে—নিম্নে মূলাধার, মধ্যে হৃদয় এবং উর্ধ্বে মস্তিকের সহিত সংযুক্ত। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত আর চারটি অঙ্গুলির উপর সেইরূপ দ্বাদশ বার জপ করিতে হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে এইরূপ তিন তিন বার জপ কর। তখন আমরা জপের পূর্ণ সংখ্যা ৯×১২=১০৮ পাইব। অতএব জপ ও পূজা বিশুদ্ধ এবং আত্মস্থ হইবার উপায়মাত্র। বিশুদ্ধ সাধক জীবাত্মার দ্বারা পরমাত্মার প্রকৃত উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহার বাহ্য পূজার প্রয়োজন নাই।

"শ্রীহরির নিত্যপূজা শালগ্রাম শিলায়, দুর্লভ রত্নে, মূল্যবান্ প্রস্তরে, যন্ত্রেও মণ্ডলে করিতে হয়, কখনো ভূমিতে করিতে নাই। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সুনীচ ও সুনম্র হইলে এবং বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে অসৎ সঙ্গের পাপ নষ্ট হয়। শালগ্রাম পূজা করিলে ভবিষ্যৎ জীবনের কামনাও পূর্ণ হয়।"

অন্তর্য্যামীর উদ্দেশে

শ্রীকৌশিকীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

আজি এ নিঝুম রজনীতে
(তুমি) কে এলে হৃদয়-দ্বারে ?
কতো বিনিদ্র নিশায় রুদ্র দুপুরে,
ডাকিয়াছি বসি' প্রাণমন ভ'রে।
সে ডাক তুমি কি শুনিয়াছ প্রিয়
আজি এ নীরব ক্ষণে ?

তোমারে যে আমি খুঁজিয়াছি বিভু,
'মনে বনে আর কোণে'।
লহ তবে মোরে আপনার করি'
তোমার চরণতলে,
ধুইবারে দাও ও রাঙ্গা চরণ
আমার চোখের জলে।

ভারতের উপযোগী বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আয়ুর্বেদ

কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, আয়ুর্বেদাচার্য

যদি অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে এদেশের স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগচিকিৎসা ও ব্যাধিপ্রতিষেধ সম্ভব হয় তবে একমাত্র আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের অনুশীলন, প্রসার এবং গবেষণার দ্বারাই উহা সম্ভব। হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই আয়ুর্বেদ। সংস্কৃত ভাষায় ইহা লিখিত। কত বাধা-বিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, কত রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া এই আয়ুর্বেদ বর্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রই আশ্চর্য না হইয়া পারেন না।

ইহার সবটুকুই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার মত নির্ভুল না হইলেও আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া ইহার কোন কোন অংশের বৈজ্ঞানিকতা আজো স্বীকৃত হইতেছে। কোন ভারতবাসী ইহাতে মুগ্ধ ও আনন্দিত না হইবেন?

'চ্যবনপ্রাশ' আধুনিক বিজ্ঞানে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমলকীতে প্রচুর ভিটামিন্ 'সি' বর্তমান, বংশলোচনে ক্যালসিয়াম্, কুর্চি, বাসক, কালমেঘ, ছাতিম প্রভৃতিতে ক্রিয়াশীল উপাদান বর্তমান—ইহাও আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইয়াছে। কাজেই এই প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদ পুরাতন হইলেও অবৈজ্ঞানিক নয়। আয়ুর্বেদ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বিজ্ঞান ইহার সকল সন্ধান আজ আবিষ্কার করিতে না পারিলেও হয়ত এক দিন ইহার সামগ্রিক বৈজ্ঞানিকতার সন্ধান লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু নব্য বিজ্ঞানের উপাসনায় আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট ধারাকে রক্ষা না করিলে ভবিষ্যতে গবেষণার পথ রুদ্ধ হইবে।

যে চ্যবনপ্রাশ শ্রেষ্ঠ ঔষধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহা কোন বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক দ্বারা লেবরেটারীতে পরীক্ষিত হয় নাই। বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে এদেশের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক দ্বারা তৈরী চ্যবনপ্রাশই নব্যবিজ্ঞান-মতে শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং কতক এলোপ্যাথিক ঔষধ, কতক আয়ুর্বেদীয় ঔষধ লইয়া একটি মিশ্র ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাকেই ভারতীয় চিকিৎসার অবদানরূপে চালান সমীচীন হইবে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে জ্ঞানলাভের জন্য পাশ্চাত্য এনাটমী, ফিজিওলজি, কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, ব্যাক্‌ট্রিওলজি ও সার্জ্জারি ইত্যাদি শিক্ষা করা এবং পারদ গন্ধক কুচিলা বিষ ও মৃগনাভির সহিত ব্রোমাইড, ডিজিটালিস্, কোকেন এস্পিরিন ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া রোগীর উপর প্রয়োগ করা এক কথা নয়। যে দেশের অনুসরণ করিয়া আয়ুর্বেদীয় ঔষধে এই মিশ্র একীকরণ কথাটা উঠিয়াছে সেদেশে এখনো পৃথক পৃথক চিকিৎসা বর্তমান রহিয়াছে। যেমন, হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি। হোমিওপ্যাথির সহিত এলোপ্যাথি মিশ্রিত করিয়া একটি জাতীয় চিকিৎসা প্রবর্তন করার কথা ত সেদেশে ওঠে না!

রোগ যাহাতে না হয় এবং রোগ হইলেও যাহাতে সুচিকিৎসা দ্বারা রোগ দূর করা যাইতে পারে, আয়ুর্বেদে তাহারই নির্দেশ রহিয়াছে। আসল কথা, এই দরিদ্র দেশে কি করিয়া যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগপ্রতিষেধ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তাহার কার্যকর পন্থা আবিষ্কার করা। একমাত্র আয়ুর্বেদ-চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারাই উহা সম্ভব। এমন অনাড়ম্বর অথচ নব্যবিজ্ঞান-অবিরোধী চিকিৎসা পৃথিবীতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, কৌমারভৃত্য (শিশু চিকিৎসা ও প্রসূতিতন্ত্র), ভূতবিদ্যা (মানস রোগ), অগদতন্ত্র (বিষচিকিৎসা, Toxicology), বাজীকরণতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এই আটটি বিভাগে আয়ুর্বেদ এক সময় পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এখনো অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের অনুশীলন একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে ইহা প্রচলিত আছে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য যে অর্থব্যয় হইতেছে, তাহার দশমাংশের একাংশ ব্যয় করিলে আয়ুর্বেদের এই অবহেলিত অংশগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি মহমারী নিবারণে আয়ুর্বেদপ্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিলে অপেক্ষাকৃত অনেক কম খরচে এদেশ হইতে মহামারী-বিতাড়ন সম্ভবপর। জনপদধ্বংসনীয় বিমান নামক বিমানস্থানের একটি অধ্যায়ে মহর্ষি চরক বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—

'বৈগুণ্যমুপপন্নানাং দেশকালানিলাম্ভসাম্।
গরীয়স্ত্বং বিশেষেণ হেতুমৎ সংপ্রবক্ষ্যতে॥
বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালং স্বভাবতঃ।
বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্যত্বাদ্ গরীয়স্তরমর্থবিৎ॥'

বায়ু জল দেশ ও কাল দূষিত হইলে মহামারীরূপে এমন কতকগুলি ব্যাধি দেখা দেয়, যাহা সময় সময় সমগ্র দেশকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই সকল মহামারী হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে আয়ুর্বেদের উপদেশ যেমন কার্যকর তেমনি অল্প ব্যয়সাধ্য।

বায়ু জল ভূমি ও কাল বা আবহাওয়া বিকৃত হইয়া নানাপ্রকার মহামারীর আবির্ভাব হয়। সুতরাং বায়ু জল ভূমি এবং আবহাওয়া-সংশোধন কার্য দ্বারা মহামারী নিবারণ করা যায়।

আয়ুর্বেদের আদর্শ ত্যাগ ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার উদ্দেশ্য জনসেবা। সেইজন্য মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—"নাত্মার্থং নাপি কামার্থং অথ ভূতদয়াং প্রতি"।

আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে রোগনিবারণ-পন্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি গ্রহণ করিলে খুব অল্প ব্যয়ে এদেশের মহামারী নিবারণ ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা সম্ভব হইতে পারে। এক কালে তাহাই হইত। তখন আমাদের গড়পরতা আয়ু ছিল এক শত বৎসর। আজ গড়পরতা আয়ু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ছাব্বিশের কোঠায়।

বায়ুসংশোধনে—যজ্ঞাগ্নি ধূম, গন্ধক, গুগ্গুল্, অগুরু, চন্দনাদির ধূপ। জলসংশোধনে—কর্পূর, কেয়া ব্যবহার: অগ্নিসন্তাপে জল বিশুদ্ধীকরণ। ভূমিসংশোধনে—গোময়, হরিদ্রা, চুন জাতীয় পদার্থের ব্যবহার; আবহাওয়া বা কালসংশোধনে—শুদ্ধাচার, স্থানপরিবর্তন, মহামারীদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির আতুরালয়ে আশ্রয়গ্রহণ (Isolation) ইত্যাদি আয়ুর্বেদের নির্দেশগুলি নব্যবিজ্ঞান-অবিরোধী।

সর্ব রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভের উপায় সম্বন্ধে ঋষি বাগ্‌ভট যাহা বলিয়াছেন তাহা আজও সত্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—

'ব্রাহ্মমুহূর্ত উত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্বর্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ॥'

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য সমাপন, দন্তধাবন, অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দন) ব্যায়াম, স্নান, পরিমিতাহার, বিশ্রাম প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পালন করিবে। অধিকন্তু—

'সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
সুখং চ ন বিনা ধর্মাৎ তস্মাদ্ধর্মপরো ভবেৎ॥'

সকল সুখের মূল ধর্ম; সুতরাং স্বাস্থ্য-লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে সর্বদা ধর্মপথে চলিতে হইবে। আয়ুর্বেদ কেবল ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ দীর্ঘায়ু লাভের কথা বলেন নাই। জীবে দয়া, সদ্‌ব্রতী হওয়া, চিত্তসংযম, পরার্থে স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ—এদিকেও আয়ুর্বেদের দৃষ্টি ছিল।

'আর্দ্রসন্তানতা ত্যাগঃ কায়বাক্‌চেতসাং দমঃ।
স্বার্থবুদ্ধিঃ পরার্থেষু পর্যাপ্তমিতি সদ্‌ব্রতম্॥'

ইহা আয়ুর্বেদেরই কথা। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের অপূর্ব সমন্বয় এই আয়ুর্বেদ। রস রক্ত মলাদির ক্রিয়াবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে শরীরের সহিত আত্মার সম্পর্ক উপলব্ধি করিবার জন্য গভীর জ্ঞানপূর্ণ দার্শনিক মতবাদের এক প্রয়োজনীয় অংশ ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ঔষধবিজ্ঞান সম্বন্ধেও আয়ুর্বেদ তাহার নিজস্ব ধারা বজায় রাখিয়া ঔষধসংরক্ষণ, ঔষধসংগ্রহ এবং ঔষধপ্রস্তুতিবিধি রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম পরিভাষাবিজ্ঞান। সেকালের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক শার্ঙ্গধর এই শাখার বিশেষ উন্নতি করেন। ইহার আধুনিক নাম আয়ুর্বেদীয় ফার্মাকোপিয়া। সুতরাং আয়ুর্বেদের প্রাচীন প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধ আজও আধুনিক বিজ্ঞানের অনুবীক্ষণে কার্যকর বলিয়া প্রমাণিত।

প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া পুনরায় রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত যে বিধি নিয়মের কথা আয়ুর্বেদ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকেই দিনচর্যা বলা হয়। আয়ুষ্কামী ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য ছয়টি ঋতুতে কি করণীয় ঋতুচর্যাধ্যায়ে তাহাও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে—ঋতুবিশেষাচ্ছাহারবিহারসেবনপ্রতিপাদনার্থমৃতুচর্য্যা-রম্ভ ইত্যাহ।

আয়ুর্বেদের এই সকল স্বাস্থ্যবিধি জন-সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা হইলে এখনো এলোপ্যাথি অপেক্ষা বহু অল্প ব্যয়ে এদেশের আধি-ব্যাধি ও মহামারী নিবারণ খুবই সম্ভব।

'নিত্যং হিতাহারবিহারসেবী সমীক্ষ্যকারী
বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবানাপ্তোপসেবী চ
ভবত্যরোগঃ॥'

আয়ুর্বেদ যে স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের বাণী আমাদের শুনাইয়াছেন তাহা দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য, কতিপয় ধনী ব্যক্তির জন্যই শুধু নয়।

"প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা—ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

উৎপাদন-বৃদ্ধিকার্যে মনোবিত্থার প্রয়োগ

হারবার্ট ট্রেসি

'ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট্ অব্ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সাইকলজি' কর্তৃক আহূত একটি সম্মেলনে সম্প্রতি বৃটেনের কয়েক জন সেরা মনোবিৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিন জন শ্রমিকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। শ্রমিকদের মধ্যে এক জন কয়লা-খনিতে, এক জন ইস্পাতের কারখানায় ও এক জন বস্ত্রকলে কাজ করে। এরা সকলেই বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য। শ্রমিকদের যে কাজ করতে হয় সেই সম্বন্ধে তাদের প্রকৃত মনোভাব কি তৎসম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যেই এই মনঃসমীক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল।

ঘটনাটি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়; কিন্তু এর থেকে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনীতির কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তাঁদের অসংখ্য কাজের মধ্যেও ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমশিল্পের অর্থাৎ শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিবিধানকল্পে নীরবে অথচ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রমশিল্পে উৎপাদন-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবার জন্য গভর্নমেণ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন। শ্রমশিল্পে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যথাসম্ভব সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণ পরিষদ এই কমিটির কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। পরিষদের উদ্দেশ্য হল ইউনিয়ন ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের সমস্ত কারণগুলি দূর করা। তা হলে শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, শ্রমিক ও মালিকের যুক্তপ্রচেষ্টার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং ফলে জাতির প্রকৃত কল্যাণ হবে।

উপরোক্ত সম্মেলন আহ্বান ট্রেড ইউনিয়নের অসংখ্য গঠনমূলক কার্যপ্রচেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত। এই সম্মেলনে তিন জন শ্রমিক খোলাখুলি ভাবে বলে, তারা তাদের দৈনন্দিন কাজ সম্বন্ধে কি ভাবে ও অনুভব করে, এই কাজে তাদের দেহ-মনের ওপর কতটা চাপ পড়ে, তারা কি চায় এবং কি পায়।

আঠারো মাস পূর্বে এই কমিটি স্থাপিত হয়। কমিটি ইতোমধ্যেই বহু বিষয়ে মূল্যবান গবেষণাদি করেছেন। প্রাকৃতিক এবং সমাজবিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণা কি ভাবে শ্রমশিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধি-কাযে সহায়তা করতে পারে এবং কিরূপে সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য।

অন্য যে কয়টি প্রতিষ্ঠান এই গবেষণার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করছে তাদের মধ্যে 'ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট্ অব্ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সাইক-লজি'র নাম উল্লেখযোগ্য। 'ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে'র ডিরেক্টর এবং 'কাউন্সিল অব্ দি বৃটিশ ইনষ্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেণ্টের' সভ্য লর্ড পিয়ার্সি উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। এক জন মনস্তাত্ত্বিক প্রথমে শ্রমিকদের নানা প্রশ্ন করে তাদের কাজ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর জেনে নেন এবং পরে য়্যাবার্ডিন বিশ্ববিত্থালয়ের

মনোবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক বিখ্যাত মনোবিৎ অধ্যাপক নাইট শ্রমিকদের সঙ্গে সেই বিষয়ে আলোচনা করেন।

শ্রমশিল্প-উৎপাদন-কমিটির অন্তর্গত 'হিউম্যান ফ্যাক্টর প্যানেলে'র সভাপতি স্যার জর্জ স্যুষ্টারও এই কার্যে বিশেষ সক্রিয় সাহায্য করেন।

'হিউম্যান ফ্যাক্টর প্যানেল' কমিটির অন্তর্ভুক্ত চারটি শাখার মধ্যে একটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এই শাখার সদস্য সংগ্রহ করা হয়। 'য়্যামালগ্যামেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়নের' সভাপতি মিঃ ট্যানার এই প্যানেলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্রমশিল্পউৎপাদন-কমিটির এই শাখা বর্তমানে যন্ত্রপাতি-পরিকল্পনা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি অনুসন্ধানকার্যে ব্যাপৃত আছে।

'হিউম্যান ফ্যাক্টর প্যানেল' আরও নানা ধরনের পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছে। শ্রমিকদের বয়স বৃদ্ধি তাদের কার্যক্ষমতার ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, বয়স্ক শ্রমিকদের কোন নূতন ধরনের শ্রমশিল্পে নিয়োগ করলে কিরূপ ফল পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। শ্রমশিল্পে কার্যভার-বণ্টনের বর্তমান ব্যবস্থা সর্বোচ্চ উৎপাদনের অনুকূল কি না, এ সম্বন্ধেও বিশেষ ভাবে গবেষণা করা হচ্ছে।

তিন জন শ্রমিককে কেন্দ্র করে যে আলোচনাপর্বের অনুষ্ঠান হয় উপরোক্ত বিষয়গুলিও সেই আলোচনার অঙ্গীভূত ছিল।

শ্রমশিল্প-উৎপাদন-কমিটির প্রথম রিপোর্টে উৎপাদনবৃদ্ধি-সংক্রান্ত সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। উৎপাদনবৃদ্ধিই বর্তমানে বৃটেনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানের ওপরই জাতি হিসাবে বৃটেনের অস্তিত্ব, আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা নির্ভর করছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে দুটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে বৎসরে জন পিছু উৎপাদন শতকরা ২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৮ সনে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৮ সালের তুলনায় এই বৎসরের উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল শ্রমিক-সংখ্যার বৃদ্ধি।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে শ্রমশিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই উল্লসিত হবার কারণ নেই। উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষের দ্বারাই শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে, আশু উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নূতন গবেষণা অপেক্ষা পুরাতন জ্ঞানের কার্যকর প্রয়োগই অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

কমিটি আশা করেন, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে খাদ্য-উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তার অর্থ হল এই স্বদেশে উৎপন্ন খাদ্য থেকেই ৪০,০০,০০০ অতিরিক্ত লোকের আহার্যের সংস্থান হবে।

কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, প্রচলিত উৎপাদনপ্রণালীর সংস্কার এবং শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারাই দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। বয়নশিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে যে, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির যথোপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা শতকরা ২০ ভাগ বা ততোধিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদন ও সরবরাহের সমস্ত প্রচলিত উপায়গুলির পরীক্ষা ও প্রয়োজন-মত সংস্কারসাধন অবশ্য কর্তব্য।

আশা ও উৎসাহের কথা এই যে, ট্রেড

ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমশিল্পপতিরাও এই গবেষণার কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। এই গবেষণার ফলাফল শ্রমিকমালিক-সম্পর্ক সম্বন্ধে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনীতির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। *

---

* ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন্ সার্ভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

প্রার্থনা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু দে হাজরা

আমার মনের মাঝে গর্ব্বদ্বারে
যেথায় মনের নিকষ কালো,
সেথায় প্রভু পরশ ছোঁয়াও
অরূপ তোমার রূপের আলো!
যেথায় আমার মনের আঁখি
আমায় শুধু দেয় সে ফাঁকি
সেই নয়নে প্রাণের প্রভু
আঁধার মাঝে প্রদীপ জ্বালো।

আমার প্রাণের মাঝে কলুষ দ্বারে
যেথায় ভরা অহঙ্কারে,
সেথায় দেখাও দীপের শিখা
আমিত্বেরই সেই দ্বারে।
যেথায় মোহ যেথায় মায়া
আলোক-প্রাণে যেথায় ছায়া
সেথায় হে নাথ আঁধার ঘরে
দেখাও তব জ্যোতির আলো।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশিশির কুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ

বর্ত্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ভারতের অন্তরাত্মার বাণী নবযুগের উপযোগী করিয়া নূতন ভাবে প্রচার করিতে। তিনি সারা জগৎকে অভয়ের বাণী শুনাইয়াছেন, আত্মার মহিমা এবং অধ্যাত্ম-সাধনার ভিত্তির উপর সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ চার করিয়াছেন। তাঁহার বাণীর ভিতর আমরা শাশ্বত ধর্ম্মের সন্ধান ও যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত পাই। কর্ম্মজীবনে বা ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ করিয়া যে আমরা লাভবান হইতে পারি একথা স্বামীজির পূর্ব্বে আর কেহ প্রচার করেন নাই। ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্যের পক্ষে ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যার প্রয়োজন আছে, সুতরাং উভয় দেশের মধ্যে কেমন করিয়া মিলনের সেতু রচিত হইতে পারে তিনিই প্রথম তাহার সঙ্কেত দিয়াছেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সাধনা যেন স্বামীজির ভিতর মিলিত হইয়াছিল। ক্ষাত্র-বীর্য্য ও ব্রহ্মতেজের এত বড় সমন্বয় পূর্ব্বে আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই।

মানুষের আত্মাকে তিনি মহত্তম মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। স্বামীজি ঐতিহাসিক যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবী শাসন করিবে, পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবে। অনাগত যুগে যে শূদ্রগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার ইঙ্গিতও তিনি দেখিয়া ছিলেন সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি মতের ভিতর। আজ রাশিয়াতে যে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বীজ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই:

"যাবদ্ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
যোঽধিকমভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥"

অর্থাৎ যে পরিমাণ দ্রব্য উদরপূর্ত্তির জন্য প্রয়োজন, তাহাতেই কেবল জীবগণের অধিকার আছে। যে তাহার বেশী আত্মসাৎ করিতে চায় সে চোর; অতএব সে দণ্ডনায়। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশে যান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য কখনও মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ধনগত বৈষম্য তীব্র না হইলেও বর্ণগত বৈষম্য যে ক্রমান্বয়ে কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া পড়িয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য স্বামীজি সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপ দূরীকরণে সর্ব্বাগ্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থার গলদ, অশুচি ও দুর্নীতিসমূহ দূরীভূত করিতে না পারিলে দেশের ও জাতির মঙ্গল ও জাগরণ যে আসিবে না, স্বামীজি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন: যতদিন পর্য্যন্ত এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, নিত্যকলহশীল জনসাধারণকে ভালবাসিতে না শিখিবে, ততদিন এ ভারত জাগিবে না।

দেশের অগণিত জনগণের সেবার মধ্য দিয়াই যে আসে জাতীয় সংহতি ও মুক্তি, তাহা

স্বামীজি ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন—স্বদেশবাসীর দুঃখ-দৈন্য, অজ্ঞতা ঘুচাইবার চেষ্টা—রুগ্ন, আতুর, আর্ত্ত, অনাথকে ঔষধ পথ্য ও আহার দান—ইহাই বর্ত্তমান যুগোপযোগী মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ। যদি পর-কল্যাণ-কামনায় কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া নরকেও যাইতে হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়? যাহারা নিজের মুক্তি-কামনা ত্যাগ করিয়া দরিদ্র-নারায়ণ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে, আমি তাহাদের ভৃত্য ও ক্রীতদাস। সেবাকেই পরম ধর্ম্ম বলিতে যাইয়া স্বামীজি বলিয়াছেন:

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এক আদর্শ নব্যভারত গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি যে কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহার নিম্নোক্ত বাণী হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি বলিয়াছেন—আমার ইচ্ছা প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু গৌরবময় তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের ভাল জিনিষগুলি স্বাভাবিক ভাবে একত্রীভূত হইয়া নবীন ভারত গড়িয়া উঠুক: আর এই উন্নতিমূলক গঠন ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বপ্রকারে বহিঃশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ধর্ম্মের ভিত্তিতে কর্ম্মের পথকে বাছিয়া লইয়াছিলেন জীবনে। তিনি বলিতেন—মানুষ তৈরী হয় যে ধর্ম্মে, আমি সেই ধর্ম্মই প্রচার করি। আমি চাই মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত-করণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকায় উৎসাহবর্দ্ধন এবং বেদান্ত-ধর্ম্ম জনসমাজে প্রবর্ত্তন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই স্বামীজি স্থাপন করেন বিশ্বের অমর কীর্ত্তি সেবাধর্ম্মের শ্রেষ্ঠকেন্দ্র—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

বর্ত্তমান ভারতের সহিত বিশ্বের আন্তর্জ্জাতিক সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপনে তিনি ছিলেন উৎসাহী অগ্রদূত। তিনি বলিয়াছেন—আজ হইতে সমস্ত ধর্ম্মের পতাকায় লিখিয়া দাও যুদ্ধ নহে, সেবা। প্রত্যেক জাতি অন্য জাতির সহিত পারস্পরিক ভাব-বিনিময় করিবে, অথচ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ অনুসারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

ভারতবাসী আদর্শের সংঘাতে আজ বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত। তাই স্বামীজি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট দেশবাসীকে আত্মপ্রবুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কর্ম্মযোগী বিবেকানন্দ সদা ধ্যানরত জ্ঞাননেত্রে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ দেখিয়াছিলেন সেই অতীত যুগে। তাই ভারতবর্ষের গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনায় বলিয়াছিলেন—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ!" আরও বলিয়াছিলেন—পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইয়াছে, সূর্য্য উঠিবার আর বিলম্ব নাই।

"তোমাদের প্রত্যেকে নিজের প্রতি এই বিশ্বাসসম্পন্ন হও যে অনন্ত শক্তি আমাদের সকলের আত্মার মধ্যে বর্ত্তমান। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

নীলাচল-প্রশস্তি

শ্রীসাহাজী

গৌড়েশ্বর সে গৌরচন্দ্র কৃষ্ণসূর্যসত্বসার,
জয় নীলাদ্রি নিত্যদীপ্ত উদয় শৈল তুমি সে তা'র !
কাঙালীর বেশ বাঙালী নিমাই, দিলে যে তাহারে রাজার মান,
উড়িয়া বাঙালী মিতালি করিল, তুমি সে পুণ্য তীর্থস্থান।
কৃষ্ণের শ্রী সে কৃষ্ণের পুরী, শ্রীক্ষেত্র তাই তোমার নাম,
মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর দীপ্ত তুমি সে পুণ্য ধাম !
যদুর বংশ ধ্বংস করিল তোমার সে 'সংগ্রামের মাঠ',[১]
অর্জুন দিল অগ্নিরে ফিরে গাণ্ডীব শরাসনের পাট।
প্রভাসতীর্থে [২] কৃষ্ণ তোমার যমের যুদ্ধ করিয়া জয়,
সান্দীপণির নষ্টপুত্রে আনিল জিনিয়া সুদুর্জয়।
দুষ্টদৈত্য পঞ্চজন সে, পাঞ্চজন্য সংখোদ্ধার
করিল হেলায় আপনি সে বীর, বধিয়া যুদ্ধে জীবন তা'র।
শ্বেতকি রাজার যজ্ঞকুণ্ড সেথায় তোমার আজিও রয়,
খাইয়া খাইয়া অগ্নির যেথা জন্মিল ব্যাধি নিরতিশয়।
শাম্বের হলে কুষ্ঠ ব্যাধি সে, করিতে শান্তি বেদনা তার,
তোমার অর্কমন্দিরে[৩] এল খুলিয়া দেবতা স্বর্গদ্বার।
কৃষ্ণের তুমি কুশস্থলী সে, অবন্তিকা তোমার নাম,
উজ্জয়িনী সে কালিদাসের, ধন্য বিক্রমাদিত্য ধাম।[৪]
গৌড়েশ্বর সে গৌরচন্দ্র কৃষ্ণসূর্য সত্ব যার,
জয় নীলাদ্রি নিত্যদীপ্ত উদয় শৈল তুমি সে তা'র।

---

১ সংগ্রাম-মাঠ সমুদ্র তীরে; খুব সম্ভব ঐখানেই যদুগণ পরস্পর আত্মকলহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ৩৭।৫ বিষ্ণু ৩, মৌসল, মহাভারত।

২ প্রভাসতীর্থ লবণ সমুদ্রের তীরে। ২৭ অ, আবন্ত্য, স্কন্দ। রাবণের লংকাও দেখা যায় ঐ সমুদ্রের তীরে। ৫৮, কিষ্কিন্ধ্যা, রামায়ণ। লবণ সমুদ্র পূর্ব সমুদ্র। মৌসল যুদ্ধ যে পুরীর ঘটনা, ইহাই সে কথার প্রমাণ।

৩ কনারকের সূর্যমন্দির।

কুশস্থলী কৃষ্ণের রাজধানী। ৮৩।১০,১২।১২,ভাগবত। অবন্তী বা উজ্জয়িনী ঐ কুশস্থলীরই নামান্তর।

বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, সাহিত্যবিনোদ

সেক্সপিয়র যেমন বিশ্বকবি হইয়াও প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ কবি, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে আমরা বিশ্বকবি বলিয়া যতই গর্ব্ববোধ করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি খাটি বাঙালী কবি। বাংলার প্রাণধর্ম্ম ও সাধনাই তাঁহাকে বিশ্বতোমুখী করিয়াছে—এ কথার মর্ম্ম যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহারাই রবীন্দ্রনাথকে বাংলার কবি বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা বাংলাভাষা। তিনি যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইয়াছেন, তাহা খাটি বাঙালী পরিবারের আবহাওয়া। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন।' তাঁহার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে কত গভীর ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বহু দেশ-বিদেশ ঘুরিয়াছেন, বহু ভাব আত্মসাৎ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণধর্ম্ম বাংলার মাটির রসেই চিরসঞ্জীবিত। সেই রসঘন

৩৬, আবন্ত্য, স্কন্দ। ভোজরাজ উগ্রসেনও দেখা যায় সান্দীপনির নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থী রামকৃষ্ণকে উজ্জয়িনীতেই যাইতে বলিতেছেন। ২৭ অ, আবন্ত্য, স্কন্দ। অন্যত্র ২১।৫, বিষ্ণু। ৩৪, বিষ্ণু, হরিবংশ। আবার দেখা যায়, সান্দীপনি অবন্তী-নিবাসী। শিশুবোধেও দেখা যায়—অবন্তীনগরে বাস সান্দীপনি নাম। অবন্তী, উজ্জয়িনী এবং কুশস্থলী যে একই পুরী, ইহাই সে কথার প্রমাণ। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ছাত্রাবস্থাতেই ঐ স্থানটির সহিত রামকৃষ্ণের পরিচয় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় পরবর্তী কালে যে তাঁহারা জরাসন্ধ-ভয়ে উগ্রসেনের ভোজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বাভাবিক নয়। ১৪, সভা, মহাভারত ৩৫, হরি, হরিবংশ।

রৈবতক এবং উজ্জয়ন্ত দুইটিই পাশাপাশি পর্বত। ৪৫, বায়ু ৪৯, ব্রহ্মাণ্ড। কুশস্থলীর উজ্জয়িনী নাম খুব সম্ভব ঐ পর্বতটির অস্তিত্ব হেতু। রৈবতক কুশস্থলীর নিকটবর্তী। ১৪, সভা। মহাভারত। কৃষ্ণের রাজধানী কুশস্থলী এবং উজ্জয়িনী যে একই পুরী, সেকথা সেইজন্যই অস্বীকার করা যায় না। কালিদাসের মেঘদূতকেও বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া তবে অলকায় যাইতে হইয়াছিল দেখা যায়। কৃষ্ণের পুরী বলিয়াই যে অবশেষে উহা পুরী খ্যাতি-লাভ করে, তাহা স্বাভাবিক।

মালব বিক্রমাদিত্যের রাজ্য ; উজ্জয়িনী উহার রাজধানী। ভোজ, কিষ্কিন্ধ্যা, উৎকল (ওড্র) এবং অবন্তী (কুশস্থলী বা উজ্জয়িনী) প্রভৃতির ন্যায় মালবও যে বিন্ধ্যপৃষ্ঠস্থ দেশ, পুরাণে ৪৫, বায়ু, ৪৯, ব্রহ্মাণ্ড—সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের কুশস্থলী, সান্দীপনির অবন্তী এবং মালবরাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী কোথায়, ইহা হইতেই সে কথার প্রতিপত্তি হয়।

রৈবতক কৃষ্ণাগ্রজ বলভদ্রের শ্বশুররাজ্য। ১।২।৪, বিষ্ণু, ৩৭-৩৮ বিষ্ণু, হরিবংশ। কুশস্থলীর উহা অদূরবর্তী। ১৫, সভা, মহাভারত। জরাসন্ধ-ভয়ে রামকৃষ্ণ যে তাঁহাদের শ্বশুরের রাজ্যের সন্নিকটবর্তী স্থানে গিয়া পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও খুবই স্বাভাবিক।

সম্প্রতি ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী স্থানে শিশুপালগড় আবিষ্কৃত হওয়ায় পুরীই যে শিশুপাল-শত্রু কৃষ্ণের রাজধানী, সে কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্যামল কোমলতা তাঁহার বার্দ্ধক্যকেও চির শ্যামায়মান করিয়া রাখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাণের সুরটি ধরিতে পারিয়াছিলেন—সেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সুর—যাহার সমন্বয় শুধু বাংলার প্রতিভাতেই সম্ভব। উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাঙালীর প্রতিভা এই সমন্বয়ের জোরেই বিশ্বজগতে আলোড়ন আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাট যুগধর্ম্মের পরিণতি।

আজ বাংলার সেই প্রতিভা নষ্ট হইয়াছে। বাংলা আজ সর্ব্বভারতীয় সমাজে কার্য্যতঃ অপাঙ্‌ক্তেয়। যে বাঙালীর চিন্তাধারা একদা সর্ব্বভারতে আলোড়ন আনিয়াছে, অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হয়, সেই বাংলা আজ তাহার চিন্তাশক্তি হারাইয়াছে। আজ আমরা বাংলার প্রাণধর্ম্ম কি তাহাই ভুলিতে বসিয়াছি। বর্ত্তমানে আমরা শ্রীভ্রষ্ট, বিপর্য্যস্ত ও পদে পদে লাঞ্ছিত। সর্দার প্যাটেল গত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এক বৈঠকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছেন: "সেদিনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে—সমস্ত ভারতই বাংলার নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে।" প্যাটেলজীর উক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহা আরও অধিক প্রযোজ্য। বাহিরের জগতে বাংলাই ভারতকে পরিচিত করিয়াছে। রামমোহন হইতে সুরু করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথই ভারতের মর্য্যাদা বিশ্বজগতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সারাভারতে বাংলার দান অপরিমেয়। আজ বাংলাদেশ যদি পিছনে পড়িয়া থাকে, বাংলা যদি ছিন্নভিন্ন পঙ্গু হইয়া থাকে, তবে ভারতের এক বৃহত্তর অংশ পঙ্গু হইয়া থাকিবে। আজ বাংলার স্বকীয়তা নানা মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নষ্ট হইতে চলিয়াছে। আমরা আমাদের সেই স্বকীয় প্রাণধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি বলিয়াই আমাদের দুর্দ্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া এই বাংলা দেশকে ভালবাসিতে বাঙ্গালী জাতিকে শিখাইয়াছেন। বাংলার মাটিই তাঁহার প্রাণে উদার বিশ্বপ্রেমের অঙ্কুর জন্মাইয়াছে। বাংলা ভাষাই তাঁহাকে

শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্দর্শনে পুরী যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে সত্যভামা-পুরে রাত্রি যাপন করিতে হয়। সত্যভামা কৃষ্ণের মহিষী; অথচ তাঁহার পুরী কিন্তু দেখা যায় উড়িয়া দেশে।

উড়িয়া দেশেতে সত্যভামাপুর গ্রাম।
একরাত্র সেই গ্রামে করেন বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা কৈল কৃপা করি॥

১, অন্ত্য, চরিতামৃত

সর্ব্বোপরি অবন্তী, উজ্জয়িনী বা কুশস্থলীই যে বর্ত্তমান পুরী বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, বৃহদ্ধর্ম পুরাণের (২৪, মধ্য)

অযোধ্যা রামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিকা।
মায়া চ কামরূপাখ্যা কাশী শিবপুরী ন ভুঃ॥
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী কাঞ্চীযুগ্মঞ্চ সম্মতম্।
অবন্তী চ সমুদ্রস্য তীরে শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥
দ্বারবতী সমুদ্রস্য মধ্যে কৃষ্ণকৃতা পুরী।
আসু পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন॥

ইত্যাদি উক্তিই সে কথায় নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

কাব্যশ্রীর সন্ধান দিয়াছে। তিনি বাংলা ভাষাকেই অনবদ্য রূপে সাজাইয়া বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের সুধী ও মনীষিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার জন্যই বাংলা-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। যে বাংলা ভাষা এমন অপূর্ব্ব সম্পদে সারা ভারতের গৌরব, দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে উহার সেই গৌরব যেন ম্লান দেখা যাইতেছে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব শুধু কবিপূজা বা ব্যক্তি-পূজার অনুষ্ঠান নয়, ইহা জাতির দুর্গতি-মোচনের উৎসব। বাংলার ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেও কখনই চির অন্ধকারে থাকিবে না। আত্মগ্লানি-মোচনের দ্বারা আমরা যেন 'সাহস-বিস্তৃত বক্ষপটে' সমস্ত আঘাত অকুতোভয়ে বরণ করিয়া লইতে পারি। যদি আমরা এই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধির সুযোগ না গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমাদের এই উৎসবের বাহাড়ম্বর মিথ্যা অগৌরবের বোঝা বহিয়া ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা কোন্ অসীম মার্গে বিচরণ করিয়াছে, কোন্ অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান দিয়াছে, সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার স্বাজাত্যবোধ, স্বধর্ম্মানুরাগ ও দেশপ্রীতির যে প্রেরণা তাঁহার কবিতায়, গানে, গল্পে ও প্রবন্ধে বিকীর্ণ হইয়া আছে, তাহারই মধ্যে আজ আমরা শিক্ষা পাইতে চাই। তিনিই আমাদের পরানুকরণসুলভ মনোবৃত্তিকে আমাদের ঘরের দিকে ফিরাইয়াছেন:

'বাংলার মাটি বাংলার জল

ধন্য হউক, ধন্য হউক হে ভগবান।'

এই জাতীয়তাবোধ বাংলার নিজস্ব। এই আত্মস্থ হওয়ার দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দান। যে জাতীয়তাবোধকে তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাই আজ আমাদের ভালো করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। ইউরোপের স্বার্থমূলক সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদকে তিনি সকল সময় পরিহার করিতে বলিয়াছেন। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ তিনি নানাভাবে আমাদের চোখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন:

'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়

ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।'

ধর্ম্মনীতিবোধহীন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ আজ পশ্চিমের দেশগুলিকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইতেছে, তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে অনেকে সেই সাবধানবাণী বিস্মৃত হইয়াছেন। আজ স্বাধীন ভারত পাশ্চাত্য ভাবের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রে ধর্ম্মের কোন স্থান দেওয়া হয় নাই। আজ যদি আমাদের প্রাণধর্ম্মকে ভুলিয়া ধর্ম্মহীন ইউরোপীয় ভাবকে রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া আমরা গ্রহণ করি, তাহা কখনই কল্যাণপ্রসূ হইবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আদর্শের এক উজ্জ্বল আলেখ্য আমাদের চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহার বিখ্যাত—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'—প্রমুখ বহু কবিতায়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ভিত্তি প্রকৃত মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায়। যখনই এই মনুষ্যত্ববোধ ব্যাহত হয়, রাষ্ট্রও তখন ব্যর্থ হইতে থাকে। বাংলাদেশের প্রতিভাই এই মর্য্যাদাবোধকে একদা জীবনধর্ম্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বাঙালী প্রতিভাই ভারতীয় সংস্কৃতিকে অন্তরের সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাংলার যে বৈশিষ্ট্য, যে স্বকীয়তা বাঙ্গালী জাতির জীবন-ধর্ম্মের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাকে অবহেলা করিয়া বিদেশ হইতে আমদানী কতকগুলি বিকৃত ভাবধারাকে জাতীয় জীবনে

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেকে তাঁহাদের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছেন। বাংলার অন্তরের রূপ তাঁহাদের দৃষ্টিহীন চোখের সম্মুখে আর প্রতিভাত হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে রূপকে বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। এই তথাকথিত প্রগতি-বাদিগণ বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে মধ্যযুগীয় বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া থাকেন। রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা যেন তাঁহাদের বীরত্বের পরিচয়! যাহা কিছু সুন্দর সংহত ও শোভন তাহারই বিরুদ্ধে ইহাদের অভিযান। সুন্দর ও শিবের পূজারী রবীন্দ্রনাথের স্মরণে আজ আমাদের এই প্রতিজ্ঞাই করিতে হইবে যে আমাদের জীবনে আমরা সুন্দর ও শিবকে প্রতিষ্ঠা করিব। সুন্দর ও শিবের সাধনাই যথার্থ সংস্কৃতির সাধনা। আমরা যদি এই প্রতিজ্ঞায় অটল না হই, তবে আমাদের সমস্ত আয়োজনই মিথ্যা হইবে।

চিরসাথী

বিভা সরকার

নিত্য সাথী কর,
নামিয়ে নাও এ কঠিন বোঝা,
শেষ কর মোর তোমায় খোঁজা,
পন্থা আমার তোমার আলোয়
দেখিয়ে সহজ কর।

দুয়ার পাশে দাঁড়াও আসি
তোমার আলো পরকাশি,
তোমার দেবালয়ে আমায়
একটি প্রদীপ কর।

তোমার পরশ সকল কাজে
নিত্য যেন চিত্তে বাজে
তোমার মাঝে জীবন আমার
পূর্ণতম কর।

আসুক তোমার বজ্রবাণী
আমার সকল আঁধার হানি,
আলোর প্লাবন আনি প্রভু
হৃদয় আলো কর।

তোমার রভস পরশ রসে
মনের আগল আপনি খসে,
আমায় তোমার সেবার কাজে
নিত্য সাথী কর।

সকাল সাঁঝে তোমার বাঁশী
দ্বার খুলে দেয় আপনি আসি,
আমায় তোমার গানের বীণার
ভৈরবী সুর কর।

যে পথে দাও চরণ প্রভু,
হ'ক্ সে ধূলি, ধন্য তবু,
আমায় তোমার চলার পথে
চরণ ধূলি কর।

চিন্তা ও কল্পনা

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

মননক্রিয়ার সরল পথের কার্য্য স্মরণ ও উদ্ভাবন। মন এখানে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজের মধ্যে বিচরণ করে। নিজের জমিদারী দেখাশুনা করার মতন নিজস্ব বিষয় সম্পত্তি লইয়া লেন দেন করিয়া চলে। এই সম্পত্তির মধ্যে কতক তাহার উপার্জ্জিত; জন্মগতসূত্রে লব্ধ কতক বা পথ চলিতে কুড়াইয়া পাওয়ার মত। ভিতরের সঞ্চিত ভাবধারা লইয়াই তাহার এই জাতীয় কার-কারবার। দেখা শুনার বিষয় বস্তুই তাহার সম্পত্তি এবং তাহা হইতেই গৃহীত তাহার ভাবধারা। মনের এই স্মরণ ও উদ্ভাবন ক্রিয়া চিন্তাপর্য্যায়ের। স্মরণীয় ও উদ্ভাবনীয় বস্তুই তাহার চিন্তনীয় বিষয়। স্মৃতি তাহার উপাদান এবং মেধা সহায়ক। কিন্তু মনন ক্রিয়া এই দুই প্রকারেই সীমাবদ্ধ নহে। তাহার বিশাল রাজ্যের মধ্যে মাত্র দুই প্রকারের ব্যবসায় লইয়াই সে কেনা বেচা করে না। সে আরও এক প্রকার ক্রিয়ায় অভ্যস্ত। মনের কাজ বলিয়া মনন ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু চিন্তা-পর্য্যায়ের নহে। এ ক্রিয়ায় চিন্তনীয় কিছু নাই। আবশ্যকবোধে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট কোন কিছুর অনুসন্ধান অথবা নূতন কাহারও প্রয়োজন-বোধের এখানে অভাব থাকে। এ ক্রিয়ার মধ্যেও মন একটা স্বাভাবিক গতিপথ খুঁজিয়া পায় এবং প্রায়ই একটা আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার মধ্যে আনন্দ আছে, তবে সে আনন্দ আসে পরিণামে; প্রারম্ভে তাহার উদ্বেগ ও সময়ে অশান্তি। এ ক্রিয়ার মধ্যে উদ্বেগ ও অশান্তি নাই: ইহার সবটুকুই মধুর। ইহার মধ্যে সৃজনী শক্তি বিদ্যমান। মনের এখানে ভাঙ্গাগড়ার খেলা, সেই জন্যই ইহা যৌগিক ক্রিয়া। ইহা কল্পনা। স্মরণ ও অনুকরণ ক্রিয়া বাস্তবের সহিত সম্পর্কিত। উদ্ভাবনক্রিয়া বা তাহার ফল সম্পর্কিত না হইলেও অবাস্তব নহে। কিন্তু কল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব। উপাদানসূত্রের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে জগতের সহিত ইহার আর কোন যোগ নাই। ইহা যেন মনের অভ্যন্তরের একটি রাসায়নিক ক্রিয়া। সে ক্রিয়ার শেষ নাই। কল্পনার এলাকাও অপরিসীম।

কল্পনার সাহায্যে মন নিজের মধ্যে এক বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে। সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বদাই তাহার ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলিতে থাকে। ভূলোক, ভুবর্লোকের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ডই তাহার কল্পলোক এবং ভাঙ্গাগড়াকে তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বলা যাইতে পারে। মন সেখানে একচ্ছত্র অধিপতি এবং তাহার অধিকারের কোন সীমানা নাই। বাহিরের জগৎ সেখানে তুচ্ছ ও সামান্য। মন করিতে পারে না এমন কোন কাজ নাই; মন যাইতে পারে না এমন স্থান নাই; মন ধারণা করিতে পারে না এমন কোন অবস্থা নাই, কিন্তু সে সকলই তাহার নিজের মত। বহির্জগতের সহিত তাহার সমতা কি সামঞ্জস্য রহিল কি না সে হিসাব সে রাখে না। আগে সে নিজেই গড়িয়া বসে, তার পর সুযোগ আসিলে জগতের সহিত মিলাইয়া দেখে।

অমিল হইলে ভাঙ্গিয়া যায়, আবার গড়িয়া উঠে। এই ভাবেই তাহার ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলিতে থাকে। স্থান কাল পাত্র রূপ গুণ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের প্রাথমিক অপূর্ণ জ্ঞানের সহিত মন কল্পনার সাহায্যে কিছু সংযোজনার দ্বারা তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলে। ইহা মনের ধর্ম্ম। যেমন দেখা যায়, কোন অজ্ঞাত লোক সম্বন্ধে কোন কিছু সংবাদ শুনিলে, মন সেই সামান্য উপকরণ লইয়াই তাহার রূপগুণ সম্বন্ধে নিজের মত একটা কল্পনা করিয়া লয়। কোন স্থান দেশ বা বাড়ী সম্বন্ধে কিছু শুনিলেই তাহার একখানা কল্পিত চিত্র মনের মধ্যে আসে। যাহারা কল্পনাপ্রিয় তাহারা সেই চিত্রের উপর রঙের কাজ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তোলে। অপর সাধারণের চিত্র আপনা হইতে যতটুকু ফুটিল সেই অবস্থায় সেইখানেই থাকিয়া যায়। মানসফলকে একটা যে রূপ গড়িয়া উঠিবে ইহা স্বাভাবিক এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমান। বাস্তবের সহিত যখন মিলাইবার সুযোগ আসিল তখন হয়তো দেখা গেল ইহা সম্পূর্ণই বিপরীত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কিছু আসে যায় না। মন সারা জীবন ধরিয়া ঐরূপ ভুল জানিতে থাকিলেও তাহার কার্য্যে কখনও নিরস্ত হইবে না। ইহাই তাহার বাহাদুরি, ইহাই তাহার সম্বল এবং ইহার মধ্যেই তাহার আনন্দ।

মানুষ জীবনগঠনের পূর্ব্বে বহুবার জীবনকে গড়িয়া তোলে। ভবিষ্যতের আগে-আগে বহুবার তাহার মধ্যে আগাইয়া যায়। অনূঢ়া মেয়েরা বিবাহের আগে প্রতিটি সম্বন্ধের সময় এক একটি কল্পিত সংসার গড়িয়া নিজেকে তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নেয়। জীবনে স্থায়ী বৃত্তি ধারণের পূর্ব্বে মানুষ সুযোগ মাত্রেরই সূত্র ধরিয়া কল্পনায় এক একটি নূতন নূতন জীবন গঠন করে। শৈশব হইতে সুদীর্ঘ জীবনকাল ধরিয়া তাহার এই গঠনের বিরাম নাই। এই কার্য্যের মধ্যে কারণ বা প্রয়োজনবোধ দেখা যায় না। কেবল গঠনই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ধাক্কা আসিল, ভাঙ্গিয়া গেল, ভ্রূক্ষেপ নাই; আবার গড়িতে থাকে। আবার ভাঙ্গিয়া গেল, আবার গড়ে। ইহাই তাহার কাজ। নদীতটের বালু-ভূমিতে শিশুর খেলার ন্যায়—প্রতিদিনই মন্দির গড়িয়া আসে, প্রতিদিনই ঢেউ আসিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়! তবু তার বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই, ভাঙ্গার জন্য অভিমান নাই, অভিযোগ নাই! ইহাই তাহার খেলা। শিশুমনের ইহাতেই আনন্দ।

এই ভাবে ভিতর দেশে অক্লান্ত শক্তিতে কল্পনার কাজ চলিয়াছে। কল্পনার উপকরণ জ্ঞান; স্মৃতি তাহার সাহায্যকারী। কল্পিত রূপ বাহির বিশ্বের সহিত সকল সময়ে হয় তো মিলে না, কিন্তু বাহির বিশ্বের উপাদানকে সম্বল করিয়াই তাহার যা' কিছু রচনা। কল্পনার পরের পরের স্তর ও সোপানগুলি জাগতিক পদার্থের ভাবধারা লইয়াই গঠিত। পুরাতন কুটিরের বাঁশ খুঁটি ইট কাঠ লইয়াই নূতন কুটির নির্ম্মিত হইল। ইহার সবখানিই নূতন। নক্সা, করণ-কারণ সমস্তই নূতন ধরনের। সে কুটিরখানি হয়তো ভাঙ্গিয়া গেল। আবার তাহার উপকরণগুলি কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া আর একখানা তৈরী হইল। আবার ভাঙ্গে, আবারও গড়ে। এই ভাবেই কাজ চলিতে থাকে। উপকরণ কিন্তু সমস্তই পুরাতন। এক একবার ভাঙ্গনের সুযোগে ঢেউয়ের আঘাতের সহিত হয়তো কিছু নূতন আসিয়াও যাইতে পারে। তাহা ছাড়া আগাগোড়া সমস্তই তার পূর্ব্বেকার সামগ্রী। পূর্ব্বজ্ঞানই তাহার প্রধান সম্পদ। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যে জ্ঞান ভিতরে প্রবেশ করে তাহাই

পূর্ব্বজ্ঞান। কল্পিত রূপ নূতন অদ্ভুত আজগুবি অনেক কিছু হইতে পারে; তাহার উপকরণগুলি সমস্তই এই পৃথিবী হইতে গৃহীত। যাহা দেখা হয় নাই এরূপ চিত্র মনে আসে না; যে শব্দ শোনা যায় নাই এরূপ শব্দের কল্পনা হয় না; যাহা স্পৃষ্ট হয় নাই, তাহার অনুভূতি অসম্ভব; যাহা অভিজ্ঞতায় আসে নাই এমন জিনিষ কল্পনা করা চলে না। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদির আকৃতি লইয়া ভিতরে যাহা প্রবেশ করে নাই, মনের স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে কল্পনা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। কল্পিত রূপ নূতন হইতে পারে, তাহার উপাদান পুরাতন। ভাঙ্গা ঘরের ইঁট-খুঁটি লইয়াই নূতন বাড়ী তৈরী।

কল্পনা রাসায়নিক ক্রিয়া—পাঁচটি উপাদানের মিশ্রণে সংঘটিত। উপাদান পাঁচটি জগতের এবং তাহা হইতে গঠিত বস্তু নূতন ও কল্পিত। কল্পনায় অনেক অদ্ভুতত্বের অবতারণা করা হয়, আকার-প্রকার অদ্ভুত হইলেও তাহার ভিত্তি ও মূল উপাদান সমস্তই এইখানকার। মাটি দিয়া যেমন ইচ্ছা কিম্ভূত প্রকারের জীবজন্তু অথবা বাড়ী-ঘর তৈরী করা যাইতে পারে। গঠিত বস্তু যদৃচ্ছাকৃত হইলেও তাহার মাটি পৃথিবীর সেই পুরাতন মাটিই বটে। কল্পনায় মহিষাকৃতি জন্তুর কণ্ঠ হইতে কুকুরের ন্যায় শব্দ বাহির করা চলে, কিন্তু সেই মহিষ ও তদাকৃতি এই জগৎ হইতেই লইতে হইবে। তাহার মধ্য হইতে কুকুরের অথবা যে কোন প্রকার শব্দ—যে শব্দ জগতে শুনা গিয়াছে, এমন শব্দ বাহির করাই সম্ভব হইবে। বিড়ালের ন্যায় জন্তুর বিরাট আকার, তাহার হয়তো হস্তীর ন্যায় মুণ্ড কিংবা মনুষ্যের ন্যায় কণ্ঠ-সঙ্গীত—কল্পনায় সমস্তই সম্ভব। মন কেবল গঠন-ক্রিয়াতেই অধিকারী—হস্তী বিড়াল সঙ্গীত যাহা কিছু হইতেই গঠন করুক না, সেই উপাদানগুলি সম্পূর্ণই জগৎ হইতে লইতে হইবে। সেই জন্যই যাহা দেখা যায় নাই, যাহা শ্রুত হয় নাই, এমন পদার্থের মিশ্রণে কোন কিছুর কল্পনা একেবারেই অসম্ভব। সেই কারণে পাঁচ বস্তুর সংযোগে সংঘটিত বলিয়া কল্পনা যৌগিক ক্রিয়া এবং বস্তুগুলিকে সময়ে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া গঠন করিতে হয় বলিয়া ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া। ক্রিয়া যেমনই হোক, উপাদান তার অতি পুরাতন ও সমস্তই এই জগতের।

বাস্তবের সহিত অমিল হইলেই কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যত বার ভাঙ্গিবে তত বারই সে ভাঙ্গনসূত্রে নূতন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া কিছু নূতন উপাদান গ্রহণ করিয়া লইবে। এই অবস্থায় উপাদান সামান্য হইলেই নূতন কল্পনা গড়িয়া উঠা সম্ভব। যদি পূর্ব্বকল্পিত অবয়বীর সকল অংশের সহিত বাস্তবের মিলন বা পরিচয় ঘটে এবং সেই মিলন বা পরিচয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অমিল থাকিয়া যায়, তবে মনের মধ্যে যে রূপ গড়িয়া উঠে তাহা আর কল্পনা নয়, মনের সে অবস্থার রূপগ্রহণকে জ্ঞান বলা যায়। মনের সেই সময় বহির্বিষয় হইতে কোন কিছু গ্রহণ ছাড়া অন্য কার্য্য থাকে না। ভিতর ও বাহির দুই স্থানের চিত্তের পরস্পর মিলনের নাম জ্ঞান। আংশিক মিলনের নাম অল্প জ্ঞান। কল্পনাও জ্ঞেয় বস্তুর সামান্য গ্রহণ করিয়া স্মৃতির মধ্য হইতে পূর্ব্বগৃহীত উপাদানের সাহায্যে মনের অভ্যন্তরে কোন রূপ নূতন রূপ পরিগ্রহণেরই নামান্তর-মাত্র।

চিন্তার কার্য্যে—স্মরণ ও উদ্ভাবন ক্রিয়ায় মনকে যেরূপ কষ্টস্বীকার করিতে হয় এবং যে পরিমাণে সে ক্লান্ত হয়, কল্পনার কার্য্যে সেই প্রকার হয় না। কার্য্যের মধ্যে অধীনতা ও বাধ্যতা থাকিলেই পরিশ্রমবোধ। নিজস্ব কাজ বা সখের কাজে পরিশ্রম থাকিলেও শ্রান্তি

অর্থাৎ পরিশ্রমের অনুভূতি সেইরূপ থাকে না। খেলার মধ্যে দেহের পরিশ্রম সময়ে যথেষ্ট হইলেও মন সেখানে কিছু আহার্য্য পায় বলিয়া সে পরিশ্রমকে প্রায়ই অস্বীকার করিয়া চলে। মনের কল্পনা-ক্রিয়া অনেকটা সেই প্রকারের। ক্রীড়ার মত এ ক্রিয়ায় তাহার একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণের জন্যই তাহার মধ্যে স্মরণ ও উদ্ভাবন ক্রিয়ার ন্যায় অবসাদ দেখা যায় না। স্মরণ ও উদ্ভাবন ক্রিয়ায় একটা প্রয়োজনবোধ থাকে। সেই প্রয়োজনবোধের বাধ্যতাই তাহার অধীনতা। মনের ক্লান্তি ও অবসাদের ইহাই কারণ। এই কার্য্যের মধ্যে মনের স্বাধীনতা অনেকাংশে লোপ পায়। তাহার নিয়ন্ত্রণ এখানে স্বয়ং না হইয়া পশ্চাৎ হইতে আর একটা শক্তির ইঙ্গিতের উপর কতকমাত্রায় নির্ভর করে। সেই শক্তির ইঙ্গিতই কার্য্যের ইচ্ছা, তৎপরে তাহার পরিচালনেই চেষ্টা দেখা দেয় বলিয়া মন এখানে যন্ত্রের মত চালিত হইতে থাকে। সেই জন্যই এই কার্য্যে মনের পরিশ্রমবোধ।

কল্পনা-কাজ ক্রীড়া-পর্য্যায়ের। ইহা ছন্দবদ্ধ। এই কাজের মধ্যে মনের একটা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতি আছে এবং বাধ্যতার সেখানে অভাব। শিশুর ক্রীড়াপ্রিয়তার ন্যায় মন এখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যের মধ্যে ছুটিয়া যায়। কখন কখন চেষ্টা এবং ইচ্ছা থাকিলেও মনের তাহা নিজস্ব ব্যাপার। অপর কাহারও ইঙ্গিত সেখানে নাই। সেই জন্য এই কার্য্যের আগাগোড়া সবখানিই আনন্দময়। এখানে মনের যেন কেমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আপনা হইতেই সে এই কাজে অভ্যস্ত। সুযোগ পাইলেই খানিক খেলিয়া লইতে চায়। কোন স্থান, ঘটনা বা পাত্র সম্বন্ধে সামান্য আভাস পাওয়া মাত্রই মন আপন হইতেই তার নিজস্ব উপাদানের সাহায্যে অবশিষ্টাংশ গঠন করিয়া লয়।

কল্পনা-ক্রিয়া তিন প্রকারে সংঘটিত হয়। সেই জন্য কল্পনাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—স্বাভাবিক কল্পনা, ইচ্ছা কল্পনা ও কষ্ট কল্পনা। কখন কখন সূত্র পাইলেই মন স্বয়ং জাল বুনিতে থাকে। ইহা মনের এক রূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে কোন প্রকার আগ্রহ বা বাসনার সংস্রব থাকে না। মন কেবল নিজের কর্ত্তব্যবোধের প্রেরণায় এই কাজে অগ্রসর হয়। এই জাতীয় কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই মন তাহার ভবিষ্যৎ জীবন রচনা করে—একটা কিছুকে অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক বাসা ঘর বাঁধে। তার পর নিজের ইচ্ছামত তাহাতে রং লাগাইতে থাকে। ঝড়-বাতাসে কোনও অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার তাহা আর এক রকম ভাবে সংস্কার করে। ইহা তাহার স্বাভাবিক কাজ। মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে কতকটা সচেতন না হইলে এই প্রকার কাজ অনেক সময় অনুভূতির অতীতেই থাকিয়া যায়।

আর এক প্রকার কল্পনা আছে, তাহা ইচ্ছাকৃত। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই একটা বাসনা ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই কল্পনা অনুমান-পর্য্যায়ের। ইহার মধ্যে প্রয়োজনবোধ থাকে। সাধারণতঃ এই কল্পনায় রঙের কাজ বড় বেশী দেখা যায় না। প্রয়োজনবোধের মাত্রানুসারেই ইহার গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্য। গণিতাদি শাস্ত্রের অনুমিত পদ্ধতির মীমাংসা এই অংশভূত। কবির কল্পনা এই পথে চলিয়া পরে প্রাথমিক পথ গ্রহণ করে। এই কল্পনায় বিষয়বস্তুকে ইচ্ছামত রূপ দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে কঠিন সমস্যা-গুলিকে যখন গ্রহণ করিতে হয় তখনই কল্পনা কষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু কতকটা অভ্যাসের বশীভূত থাকে বলিয়া কবি, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির

পক্ষে ইহা তাদৃশ কষ্টকর নহে। এই প্রকার কল্পনায় মন বিশেষভাবে পরিশ্রান্ত হয় এবং ইহার মধ্যে চিন্তার সাহায্য থাকে। কল্পনার পথে হইলেও মনের ইহা স্মরণ ও উদ্ভাবনের ন্যায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য। এই জাতীয় কল্পনা উদ্ভাবনক্রিয়ার শ্রেণীভুক্ত। ইহাতে কল্পিত বিষয় আবিষ্কৃত না হইলেও জগতে নূতন বলিয়া আদৃত হয়। কাব্য-জগতে বাস্তব ছাড়াইয়া সূক্ষ্মতত্ত্বের কল্পনাই এই কল্পনা। সংজ্ঞা বা বিশেষ্য ছাড়াইয়া কেবলমাত্র বিশেষণ—গুণ ও ভাবের মধ্যেই ইহার গতিবিধি। এই কল্পনায় অভ্যস্ত হইতে পারিলে জগতের ভোগ্য বস্তু তুচ্ছ হইয়া যায়। ইহা যোগসাধনার অঙ্গীভূত। এই কল্পনার সাহায্যে মন ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদি-লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়াইয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। এই অবস্থায় মানুষ কল্পনায় এতদূর আসক্ত হইয়া উঠে যে, সকল সময়ই সে কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে; বহির্জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে পার্থক্য খুঁজিয়া পায় না। বাস্তব ও কল্পনা একাকার হইয়া যায়। সে তখন আহার না করিয়াই বলে আহার হইয়া গিয়াছে এবং খাইয়া বলে খাই নাই। তাহার কিছুই মনে থাকে না। তাহার মনের এতখানি প্রভাব আসিয়া যায়, যদি নিজের জীবনের কোন ঘটনা চিন্তা করে, তবে কিছুকাল পরে তাহা বাস্তব না কল্পিত আর বিচার করিতে পারে না। কল্পনায় তাহারা জগতের স্বাদ এমন ভাবেই গ্রহণ করে যে, ইহার জন্য স্বাভাবিক আকর্ষণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। চিন্তা করিবার পরেই ভুলিয়া যায় তাহা যথার্থ ভোগ করিল কি না। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভূতি ও মনের স্বতন্ত্র অনুভূতি তাহাদের একই প্রকার হইয়া থাকে। এই প্রকার লোকের মানসিক অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া সংসারী লোকেরা অনেক সময় অকারণ তাহাদের অশান্তি ঘটায়। আবার মনে মনে কখনও অশান্তির কথা চিন্তা করিয়া বাস্তবে যেন তাহাই ঘটিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই অবস্থায় জগতের সহিত যে কল্পনার কোন পার্থক্য নাই—অর্থাৎ এই জগৎ যে কল্পিত তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে "The Cultural Heritege of India" নামক যে বিরাট গ্রন্থ তিন খণ্ডে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অমূল্য সংগ্রহ। প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্য এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা অত্যন্ত বেশী। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে "A Survey of the Sree Chaitanya Movement" শীর্ষক প্রবন্ধটী বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। তৎসম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত তাঁহার গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কিন্তু তাঁহার মত মনীষীর নিকট যেরূপ আশা করা যাইতে পারে প্রবন্ধটি তদ্রূপ তথ্যবহুল হয় নাই বলিয়াই আমার ধারণা। সে যাহা হউক, যে সব তিনি লেখেন নাই সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা চলে না, কিন্তু প্রবন্ধে তিনি যে সকল তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় আমি এই আলোচনা করিতেছি। অবশ্য ইহার উদ্দেশ্য তাঁহার ভ্রান্তি-প্রদর্শন নহে। কোন সুধী ব্যক্তি যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার সন্দেহ নিরসন করেন তবেই আমার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

প্রথমেই তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-তারিখ দিয়াছেন ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ

"চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকাল হইল শুভক্ষণ॥"

....

"অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন॥"

চৈঃ চঃ, আদি, ১৩ অঃ

....

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥"

চৈঃ চঃ, আদি, ১৩ অঃ

"চৌদ্দ শত সাত শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
যেই দিনে রাহু আসি গ্রাসিল চন্দ্রমা॥"

....

"সন্ধ্যায় চিন্ময় হরি নাম বলাইঞা॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হৈলা গৌরাঙ্গ হইঞা॥"

অদ্বৈতপ্রকাশ, ১০ অঃ

সুতরাং শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কাল ১৪০৭ শক, ফাল্গুন মাস। শক ও খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ ব্যবধানকাল ৭৮ বৎসর। কিন্তু পৌষ মাসের মধ্যভাগে ইংরেজী নূতন সনের আরম্ভ হইতে চৈত্র-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ব্যবধান হয় ৭৯ বৎসর। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ফাল্গুন মাসে। কাজেই ১৪০৭+৭৯=১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর জন্ম হয়, ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নহে।

নাথ মহাশয় আরোও লিখিয়াছেন ঃ "He left behind his old mother and beloved young wife and embraced asceticism at the age of twenty four and went to Puri to live there. (Page 132, Vol. II) শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'কার লিখিয়াছেন ঃ

"চব্বিশ বৎসর ছিলা গার্হস্থ্য আশ্রমে।
পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রভু কৈলা যতিধর্ম্মে॥"

চৈঃ চঃ, আদি, ৩ ও ৭ অঃ

"চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥"

চৈঃ চঃ, মধ্য, ৩ অঃ

তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিন। যথা ঃ

"ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং
প্রয়াতে মকরান্মনীষী।
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রাদদান্মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো
হরয়ে বিধানবিৎ॥"

মুরারি গুপ্ত-কৃত কড়চা॥

ইহার অনুকরণে লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন ঃ

"মুণ্ডন করিয়া প্রভু বসে শুভ ক্ষণে।
সন্ন্যাস করল শুভ দিন সংক্রমণে॥
মকর লেউটি কুম্ভ আইসে যেই বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু দেন হেন কালে॥"

মধ্যখণ্ড

বিশ্বম্ভরের ২৪ বৎসর পূর্ণ হয় ১৪৩১

শকের ফাল্গুন মাসে। মাঘী সংক্রান্তিতে তাঁহার বয়স হয় ২৩ বৎসর ১১ মাস কয়েক দিন। সুতরাং তাঁহার মতে ১৪৩১ শকের মাঘী পূর্ণিমায় সন্ন্যাস গ্রহণ হয়। ঈশান নাগর রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশে' নিম্নলিখিত পদ হইতে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৩০ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন :

"তবে চৌদ্দ শত ত্রিশ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে।
সীতার যমজ পুত্র তাহে পরকাশে॥

....

"তবে যথা কালে মহা পরসাদ দিয়া।
অন্নপ্রাশন কৈলা দোঁহার আনন্দিত হঞা॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বহু হরিষে ভুঞ্জিলা।
বস্ত্র কৌড়ি পাঞা সভে আশীর্ব্বাদ কৈলা॥
এক দিন প্রভু কৃষ্ণের আরাত্রিক সারি।
ভক্ত সঙ্গে হরিনাম করে উচ্চ করি॥
হেন কালে আসি তাঁহি বৈষ্ণব এক জন।
প্রভুর আগে কহে নদীয়ার বিবরণ॥
বৈষ্ণব কহয়ে নিমাঞি গৃহত্যাগ কৈলা।
কণ্টক নগরে যাঞা মস্তক মুণ্ডিলা॥"

১৫অঃ

"যথাকালে" যদি সীতাদেবীর পুত্রদ্বয়ের অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে, তবে ১৪৩০ শকের মাঘ মাসেই নিমাঞির সন্ন্যাস গ্রহণ সূচিত হয়। তখন তাঁহার ২৩ বৎসর বয়স পূর্ণ প্রায়, কিন্তু ২৪ বৎসরে পদার্পণ করেন নাই। নাথ মহাশয় ২৪ বৎসর বয়স কি রূপে পাইলেন?

উপর্য্যুক্ত মতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-সম্পর্কে ৩টী তারিখ পাওয়া যাইতেছে। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে ১৪৩০ শকাব্দ, নাথ মহাশয়ের মতে ১৪৩১ শকাব্দ এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত'-মতে ১৪৩২ শকাব্দ। "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস" এই পদ দ্বারা বুঝা যায় যে ২৪ বৎসর শেষ হওয়ার পর যে মাঘ মাস। শ্রীগৌরাঙ্গের ২৪ বৎসর শেষ হয় ১৪৩১ শকের ফাল্গুন মাসে। সুতরাং ১৪৩২ শকের মাঘ মাস এই অর্থ না করিলে পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রভু কৈলা যতিধর্মে" এই পদের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। ২৪ বৎসরের শেষ ভাগের মাঘ মাস এই অর্থ করিলে দুই পদে বিরোধ ঘটে। এখন এক প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ১৪৩২ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস হইলে চৈতন্যের বাকী জীবনকাল পূর্ণ ২৪ বৎসর থাকে না। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-জীবনকালকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :

"চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা তার আদি লীলা নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তার যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম॥"

চৈঃ চঃ, মধ্য, ১ম অঃ

সন্ন্যাস-জীবনের ২৪ বৎসরের একটি হিসাবও তিনি দিয়াছেন :

"তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈলা নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইলা ভক্তি॥"

চৈঃ চঃ, মধ্য, ১ম অঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোভাব-কাল ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাস শুক্লা সপ্তমী রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহর। যথা :

"আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করি প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥"

লোচন দাস, চৈঃ মঃ, শেষ

"আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাই হ যাব বৈকুণ্ঠপুরী ॥"

জয়ানন্দ-কৃত চৈতন্যমঙ্গল

জন্মমৃত্যুকাল হিসাবে দেখা যায় মহাপ্রভুর প্রকট লীলাকাল ৪৭ বৎসর ৪ মাস কয়েক দিন। সুতরাং ১৪৫৫ শকের অংশকেই পূর্ণ বৎসর ধরিয়া কবিরাজ গোস্বামী ৪৮ বৎসর জীবনকাল ধরিয়াছেন। কিন্তু কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন ৪৭ বৎসর। যথা:

"ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা শ্রীগৌরাঙ্গ-
হায়নানাং ক্রমেণ।
নানালীলালাস্যমাসাদ্য ভূমৌ ক্রীড়ন্ ধাম
স্বং ততোঽসৌ জগাম ॥"

অতএব শ্রীচৈতন্য-জীবনকে ঠিক সমান চব্বিশ বৎসরের দুই ভাগে বিভাগ করা চলে না, কম বেশী হইবেই। ১৪৩২ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস হইলে ও ঐ শকের বাকী দুই মাস এবং ১৪৫৫ শকের প্রায় ৩ মাসকে বৎসর হিসাবে ধরিয়া ২৪ বৎসর হইতে পারে।

দেখা যাইতেছে যে সন্ন্যাসের কালনির্ণয়ে কয়েকটী জিনিষের ঐক্য প্রয়োজন—(১) মাঘ মাস (২) সংক্রান্তি (৩) শুক্ল পক্ষ। তিথি বা বারের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর শুক্ল পক্ষ থাকিতে পারে। নাথ মহাশয়ের অন্যত্র কথিত মত যদি ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে পূর্ণিমা থাকে, তবে ১৪৩২ শকে কৃষ্ণপক্ষ হইবে, কিন্তু ১৪৩০ শকে শুক্লপক্ষ থাকিবে। সুতরাং তারিখ-সম্বন্ধে সঠিক কিছু নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে চতুর্বিবংশ বর্ষের অর্থাৎ ১৪৩১ শকের উল্লেখ দেখা যায় না।

ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র তারিখের সহিত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র কোন সামঞ্জস্য করা যায় না। তবে ঈশান নাগর তাঁহার 'অদ্বৈত-চরিত' গ্রন্থের ১১ অধ্যায়ে নিজ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতের পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ির দিন তাঁহার মাতা পঞ্চবর্ষীয় তাঁহাকে লইয়া অদ্বৈতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অচ্যুতের জন্ম তারিখ তিনি দিয়াছেন ১৪১৪ শকের বৈশাখী পূর্ণিমা। ঈশান নাগর অদ্বৈতের তিরোধানের পরও কিছু দিন ঐ বাড়ীতেই ছিলেন। অদ্বৈতের সঙ্গে পুরী যাইয়া তিনি একবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাধিকারও লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভুর সন্ন্যাসকালে ঈশান নাগরের বয়স ছিল প্রায় ১৬ বা ১৭। অদ্বৈত-পরিবারের সহিত মহাপ্রভুর নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং সন্ন্যাস-সম্বন্ধে ঈশান নাগর-প্রদত্ত তারিখ একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন: "Sri Chaitanya, however, departed from this world in 1533 A. D. and both Nityananda and Advaita followed him a few years later. In 1519 both Sanatana and Rupa, the main pillars of Bengal Vaisnavism departed." P. 153, Vol II.

৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাংলার ইতিহাসে'র ৩০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে অদ্বৈতাচার্য্যের ১৪৩৪ খৃঃ জন্ম হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে অদ্বৈতাচার্য্য "সূতিকা-গৃহান্তিকে" যাইয়া বলিতেছেন:

"অহে বিভু আজি দ্বি পঞ্চাশ বর্ষ হইল।
তুয়া লাগি ধরা ধামে এ দাস আইল ॥"

১০ অঃ

তাহা হইলে অদ্বৈতের জন্ম হয় ১৩৫৫ শকাব্দে

মাঘী সপ্তমী তিথিতে। সুতরাং ১৪৩৪ খৃঃ তাঁহার জন্ম। মৃত্যুসম্পর্কে দেখা যায়ঃ

"সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথা ক্রমে॥"

২২ অঃ

সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোভাব হয় ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে, মহাপ্রভুর দেহত্যাগের ২৬ বৎসর পর। "a few years" অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বটে, তাহা ৫।৭ বৎসর হইতে পারে, কিন্তু ২৬ বৎসর নিশ্চয়ই "a few years" নহে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লোকান্তর মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর নবম বৎসরে হইয়াছিল। তাহাকে বরং কতকটা "a few years" বলা যাইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধানের বিবরণ ঈশান নাগর রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র দ্বাবিংশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। 'চৈতন্যভাগবত' বা 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তাহার কোন উল্লেখ নাই। 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-মতে শ্রীচৈতন্যের দেহাবসানের পর অষ্টম বৎসর গত হইলে নিত্যানন্দ অপ্রকট হন। সেই সময় অদ্বৈতাচার্য্য ও গ্রন্থকর্ত্তা ঈশান নাগর তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোধানেরও ঈশান নাগর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। কাজেই তাঁহার প্রদত্ত তারিখ উপেক্ষণীয় নহে।

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর যে তারিখ নাথ মহাশয় দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট লীলাবসান হয় ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। রূপ ও সনাতনের তিরোভাব ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের লোকান্তর ঘটে। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীসনাতনের এবং শ্রাবণের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরূপের দেহত্যাগ হয়। সেই ভাবে তাঁহাদের তিরোভাব-তিথিও প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সনাতন ও রূপ গোস্বামীর জন্ম যথাক্রমে ১৪৮৪ ও ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৫৫৮ ও ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। প্রথমে সনাতন ও পরে রূপ লোকান্তরিত হন। যথাঃ

"প্রথমেই সনাতনের হৈল অপ্রকট।
তাহা বহি কতক দিন রঘুনাথ ভট্ট॥
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে হইলা অপ্রকট।
শরীরে না রহে প্রাণ করে ছট্‌ফট্॥"

প্রেমবিলাস, ৫ম বিলাস

শ্রীসনাতন গোস্বামী যে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ঐ সনে তিনি তাঁহার 'বৃহৎ-বৈষ্ণব-তোষিণী' গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া শ্রীজীবের 'লঘু-তোষিণী' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের প্রদত্ত তারিখগুলির মধ্যে সন্ন্যাসের তারিখ সন্দেহজনক এবং অপর তারিখগুলি ভ্রমাত্মক। কোন সুধীব্যক্তি এ বিষয়ে প্রকৃত আলোকপাত করিলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল মনে করিব।

"প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার।...ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহার দ্বারা সকল দুঃখ দূর হয়, একমাত্র পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে ভবব্যাধি দূর হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কথা

জনৈক ভক্ত

সারগাছি। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ—জানুয়ারীর শেষ ভাগ। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথির পরদিন। সন্ধ্যারতির সুর সবেমাত্র মিলাইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ অষ্টমীর অন্ধকারে আশ্রমটি এক মধুর রহস্যে আবৃত। উদার আকাশের নীচে অসীম শান্তি-ধারায় নিস্নাত হইয়া আশ্রমটি যেন ধ্যান-মগ্ন! ব্রহ্মচারী ও ভক্তেরা কেহ কেহ শ্রীশ্রীবাবার * কাছে আসিয়া বসিতেছেন। বাবা ঘরের বাইরে বারান্দায় চেয়ারটিতে বসিয়া ঠাকুর-মন্দিরের ভজন শুনিতেছেন। ভজন শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে করজোড়ে প্রার্থনার স্বরে বলিতেছেন—

'অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।'

একটু পরে বলিতেছেন—ঈশোপনিষদে আছেঃ যারা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করে না তারা আত্মঘাতী। এই চেষ্টায় যদি জীবন যায় ত সে জীবন ধন্য। সেই আত্মা কি? আত্মার বিষয় আগে শুনতে হবে, তারপর মনন করতে হবে, তারপর ধ্যান করতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বোঝাচ্ছেন—আত্মাই সবচেয়ে প্রিয়, আত্মার জন্য সব কিছু প্রিয়ঃ

'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।
ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি॥'

এই আত্মবস্তুই একমাত্র আছে, আর কিছুই নেই। আত্মা থেকেই সব, আত্মাতেই সব। সবার ভেতর এই আত্মা, কোথাও বা সুপ্ত, তাকে জাগাতে হবে। নিয়ত সবাই চেষ্টা করছে আত্মাকে express (প্রকাশ) করবার। সেই চেষ্টাই সাধনা। যা কিছু কর তাই সাধনা—জেনে কর আর না জেনেই কর।

সেই আত্মা যখন অনুভূত হবে, তখন সর্বত্র তাঁর অস্তিত্ব বুঝতে পারবে। তাই হোলো সিদ্ধি। এই অবস্থালাভ করাই হোলো উদ্দেশ্য। সকলকে এই অনুভূতি ফিরে পেতে হবে। কারণ সেই হচ্ছে আমাদের স্বরূপ। মনে কোরো না আমি পারব না, আমি দুর্বল। গীতায় ভগবান বলেছেন—চিরকাল মনে রেখ সেই কথা যখনই বিষাদ আসবেঃ

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥'

অর্জুন ভেবেছিলেনঃ 'আমি পারব না, এ আমার দ্বারা হবে না। এই সব আত্মীয়স্বজনদের দুঃখকষ্ট দেওয়ার চেয়ে মরণও ভাল। ভিক্ষে করে খাওয়াও ভাল।' ভগবান্ তাঁর সারথি, তাঁর গুরু, সখা—এ সব কথা তিনি ভুলে গেছেন; তিনি মায়ায় অভিভূত। তাই ভগবান তাঁকে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য উৎসাহিত করছেন; যুগে যুগে তিনি ত তাই করে আসছেন।

* সারগাছি আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে সকলে বাবা বলিয়া ডাকিত।

তাঁকে পাওয়া কি সোজা কথা? অবতার-পুরুষরা ত সাক্ষাৎ ভগবান্। তাঁদেরই কত চেষ্টা, কত তপস্যা-সাধনা করতে হয়; অন্য লোকের ত কথাই নেই।

কোনও উপায় নেই, শুধু প্রাণ ভরে তাঁকে ডেকে যাওয়া ছাড়া। শুধু বলা—দেখা দাও, দেখা দাও। আমি আর কিছু চাই না, স্বর্গসুখও চাই না, শুধু তোমাকে চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করতে হয়—প্রভু আমার ভোগবাসনা ঘুচিয়ে দাও।

স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতার মধ্যে আত্মোন্নতি অসম্ভব। সুখভোগের এতটুকু ইচ্ছে থাকলে হবে না। প্রভু, সুখ আমি চাইব কোন্ লজ্জায়? তুমি যত বার দেহধারণ করে এসেছ কখনো ত সুখ পাওনি। তুমি ত সব চেয়ে দুঃখের জীবন কাটিয়ে গেছ। রাম-রূপে রাজপুত্র হয়ে সারাজীবন বনবাসে কাটালে, বনবাস যদি ফুরুলো ত অত কাণ্ডের পর যে সীতার উদ্ধার হোলো, সেই সীতাকে হারালে। কৃষ্ণরূপে রাজার ছেলে—জন্ম নিলে কারাগৃহে! তারপর সারা শৈশব নিজের মায়ের দুধ থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত হলে! গোপের ঘরে মানুষ হ'লে! সারাজীবন শুধু যুদ্ধ আর দুষ্ট-দলন! কখনও শান্তি পেলে না: জগতে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করলে, তবু সবাই তোমাকেই দায়ী করে, দোষী করে কুরুক্ষেত্রের অশান্তির জন্য! অভিশাপ তুমি মাথায় পেতে নিয়েছ। সিংহাসন নিয়ে খেলা করেছ, কখনও সিংহাসনে বসনি! নিজের চোখের সামনে আত্মীয়-স্বজনদের সবাইকে মরতে দেখেছ, আর শেষে অতর্কিত ব্যাধশরে প্রাণ দিয়েছ! বুদ্ধরূপে, খৃষ্টরূপে সারাজীবন কত কষ্টই পেয়েছ! কত দিন শোবার জায়গা পর্যন্ত পাওনি!

তারপর তোমার ওই নতুনরূপে কত কষ্টই না করে গেলে শুধু জগৎকে দেখাবার জন্যে যে তোমার পূর্ব পূর্ব বিকাশ কোনটিই ভুল নয়, ধর্মজীবন দিবাস্বপ্ন নয়, ভোগ কখনও লক্ষ্য নয়।

দীনতার অবতার! উদ্ধত জগৎকে দীনতা শেখাতে এসেছিলেন। বাইরের কোন ঐশ্বর্য নেই। ফুলের মালী বলে ভুল করে এক বাবু তাঁর* কাছে ফুল চেয়েছে। তিনি তখুনি গিয়ে ফুল তুলে এনে দিয়েছেন! ঐ রকম আর এক জন চাকর ভেবে তাঁকে তামাক সাজতে বলেছিল। তিনি তখুনি তামাক সেজে দিয়েছিলেন! কাঙ্গালীদের এঁটো পরিষ্কার করেছেন! মেথরের মত পায়খানা সাফ করেছেন!

আমাদের কোনও উপায় নেই—শুধু নাম, আর অবিরত ঐ চিন্তা, ঐ ধ্যান। মন পরিষ্কার করার জন্য নিষ্কাম কর্ম—সেবাধর্ম।

শ্রীচৈতন্যদেব এসেছিলেন নামপ্রচারের জন্য বিশেষভাবে:

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতো নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥'

তোমার বহুনাম, সকলেতে সমান শক্তি। নিয়মিত স্মরণ করার কোন কাল নেই, যখন খুসি করা যায়। প্রভু, তোমার এত দয়া, তবু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে অত নামের একটিতেও অনুরাগ হ'ল না!

শ্রীচৈতন্যদেব এই কথা বলছেন, অন্যে পরে কা কথা। অবতার-পুরুষেরা জীবের ভাবে কথা বলেন, ঐ ভাব আরোপ করে নিয়ে।

বর্তমান যুগধর্ম সকল যুগধর্মের সমন্বয়—জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের। জ্ঞান চাই, ভক্তি চাই, কর্ম চাই। শুধু একটি হ'লে চলবে না—সব চাই,

* শ্রীরামকৃষ্ণের

সব চাই। ঠাকুর-স্বামীজী পরিপূর্ণ আদর্শ। ঐ জ্বলন্ত আদর্শ জীবনের সামনে রেখে যেতে হবে। আর কি বলব ?

ঐ ত্যাগ তপস্যা সাধনা—আবার ঐ প্রেম, সবার দুঃখে কাতরতা, দুঃখ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা—এই ত জীবন, এই ত উদ্দেশ্য। জীবনের প্রতিপদে এই আদর্শ মনে রেখে চলে যাও, তা হলেই সব হয়ে যাবে, নিশ্চয় হবে। আমরা তাঁর দূর নই, পর নই; বলছি তিনি বলেছেন "হবে"।

সমালোচনা

বেদান্তদর্শনম্ (প্রথম খণ্ড)—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত; কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে স্বামী ভাস্বরানন্দ-কর্তৃক প্রকাশিত; প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩; ২১২ পৃষ্ঠা; মূল্য—তিন টাকা।

আলোচ্যমান গ্রন্থে ভগবান্ বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী ব্যাখ্যাত। ইহাতে শাঙ্করভাষ্য এবং 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা'র বঙ্গানুবাদ, অনুবাদক-কৃত বঙ্গভাষায় লিখিত 'ভাবদীপিকা'-নাম্নী ব্যাখ্যা এবং 'ভাষ্যরত্নপ্রভা' টীকা স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার কৌস্তভমণি বেদান্তদর্শন। ষড়্দর্শনের মধ্যে কেবল বেদান্তদর্শনের, বিশেষতঃ অদ্বৈত-বেদান্তের সর্বাধিক আলোচনা হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের নিকট সংস্কৃতজ্ঞানাভাব ও পরিভাষাবাহুল্য শাস্ত্রানুশীলনে প্রবল অন্তরায়। গ্রন্থকারের বঙ্গানুবাদ এত মূলানুগত ও প্রাঞ্জল হইয়াছে যে, জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রই ইহা দ্বারা উপকৃত এবং ভাষ্যের তাৎপর্যনির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। গ্রন্থকারকৃত 'ভাবদীপিকা' সত্যই তত্ত্ববিচারকে বিশ্লেষণপ্রভায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী ও অন্যান্য বেদান্তবিৎ পণ্ডিত এই গ্রন্থের প্রকাশনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রায়শঃ সম্পূর্ণ দুরূহ না হইলেও সুখবোধ্য নহে। বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদ এত সরল ও অনাড়ম্বর হইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকেও অনেকের তত্ত্বপিপাসা নিবারিত হইতে পারে। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, ভারতীয় অমূল্য শাস্ত্ররাজি সহজ অথচ চিত্তাকর্ষক ভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত হউক। এইরূপ গ্রন্থপ্রকাশনে তাঁহার দিব্য আকূতি কার্যে পরিণত হইবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমান যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বেদান্তের আলোকসম্পাত অতি প্রয়োজনীয়। একদিকে জড়বাদের বীভৎস প্রতিক্রিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনকে যেমন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে তেম্নি জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানব নৈরাশ্যের অন্ধতমসে নিমজ্জিত। বৈদান্তিক তত্ত্বালোকে জীবনপথ আলোকিত করিলেই মানব এই বিনষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। সুতরাং এই প্রকার ভাবভূয়িষ্ঠ গ্রন্থ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রের নিকট অপরিহার্য। আমরা আশা করি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার সমগ্র বেদান্তদর্শন প্রকাশ

করিয়া অগণিত উৎসাহী পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন এবং বঙ্গসাহিত্যের পুরিপুষ্টি সাধন করিবেন।

অনন্তের সুরে—প্রিয়রঞ্জন সেন-কর্তৃক অনূদিত; প্রকাশক—ধ্রুব দাস, এশিয়া পাবলিশার্স, ১৫৮বি লিণ্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৪; ১৯৪ পৃষ্ঠা: মূল্য তিন টাকা।

বর্তমান গ্রন্থখানি আমেরিকার র‍্যালফ্ ওয়ালডো ট্রাইন লিখিত 'In Tune with the Infinite' বই-এর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়-কৃত বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ কয়েক বৎসর পূর্বে 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃথিবীর বহুভাষায় ইহার অনুবাদ হইতে পুস্তকখানির অসামান্য জনপ্রিয়তা অনুভূত হয়। ভারতীয় একাধিক ভাষায়ও ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক বঙ্গভাষায় পুস্তকখানির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষা-ভাষিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হইবে না। মানবাত্মা অনন্তশক্তির উৎস: জীবনকে প্রেম, পবিত্রতা ও পরিপূর্ণ শান্তিতে বিমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে চাই এই শক্ত্যাধারের সহিত সংযোগ-সাধন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি চিন্তা ও কর্ম, প্রতি শুভ সংকল্প ও কল্যাণ-প্রচেষ্টা এই 'অনন্তের সুরে' বাঁধা যাইতে পারে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনন্তের অমোঘ প্রভাব কি ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন যুগনায়ক মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় র‍্যালফ্ ওয়ালডো ট্রাইন্ স্বামীজীর ভাবে বিশেষ প্রভাবিত। লেখকের অনুবাদের সাফল্যবিচার করিবার প্রয়োজন বোধ করি না; একখানি পৃথক্ পূর্ণাঙ্গ রচনা হিসাবেই পুস্তকখানিকে দেখিতেছি। যতই পড়িতেছি ততই মনে হইতেছে এই নিরবধি কাল এবং বিপুল পৃথ্বীতে কত প্রাণপ্রদ অমৃতায়মান ভাবের পরিবেশন মানব-মনকে নিত্য নূতন ভাবে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে! অশেষ দ্বন্দ্ব-জর্জরিত জীবনে এই প্রকার কল্যাণপ্রদ চিন্তাধারার অবাধ সঞ্চারণই নরনারীকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারে। "....বিরক্তিকে ধৈর্যের দ্বারা, জিজ্ঞাসাকে সহানুভূতির দ্বারা, বিদ্বেষকে প্রেমের দ্বারা স্পর্শ করিব, সর্বদাই চেষ্টা থাকিবে, যাহাতে সেবার আনন্দ আসে এমন কাজ ভালবাসা দিয়া করিব—শুধু তাহাতেই মানুষ মানুষের মত বাঁচিতে পারে"—উদ্ধৃতিটি অনুবাদ হিসাবেই অনবদ্য নহে, স্বাধীন রচনা হিসাবেও সুসাহিত্য। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

শ্রীরামকৃষ্ণের যারা এসেছিল সাথে—স্বামী অমিতানন্দ প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫২ পৃষ্ঠা; মূল্য দুই টাকা।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত এই পুস্তক-খানিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের পূত আধ্যাত্মিক জীবনকাহিনী ছোট-দের উপযোগী করে লেখার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই ধরনের বইয়ের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের বিশ্বাস বইখানি ছোটদের কাছে খুবই সমাদর লাভ করবে। ছাপা সুন্দর, প্রচ্ছদপট মনোরম। দু-একটি ঘটনার বর্ণনায় ত্রুটি আছে। স্কুলের ছাত্রদের জন্য বইখানি নির্বাচিত হওয়া উচিত।

আগে চলো—**স্বামী** শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত; শ্রীসুনীতিকুমার মণ্ডল কর্তৃক মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১০৫ পৃষ্ঠা; মূল্য ১৷৷০ আনা। এই পুস্তকের উপস্বত্ব সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর জন্য উৎসর্গীকৃত।

'হিন্দুধর্ম্ম-পরিচয়' প্রণেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ইতঃপূর্বেই ছাত্রসমাজে সুপরিচিত। স্বাধীনতা-লাভের পর দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার করা দরকার। ভারতের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের আবশ্যকতা বর্তমানে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। এইজন্য চাই কতকগুলি কার্যকর নির্দেশ। আলোচ্যমান পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার সেই নির্দেশই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন। বইখানি ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত।

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী কালিকানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ—গত ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রি ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী কালিকানন্দজী মহারাজ কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে হৃদ্‌রোগে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ পর দিন পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকায় গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করা হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৯১৩ সনে কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করেন। স্বামী কালিকানন্দজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ১৯২১ সনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন। তিনি বহু বৎসর কাশী সেবাশ্রমের এক জন প্রধান কর্মী ছিলেন এবং পরে কয়েক বৎসর অধ্যক্ষরূপে যোগ্যতার সহিত এই সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা করেন। গত ১৯ বৎসর যাবৎ তিনি কঠোর তপস্যা এবং ধ্যান-ভজনে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক এবং কর্মজীবন আদর্শস্থানীয় ছিল। স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত এইরূপ কর্মযোগী এবং তপস্যা ও ধ্যানভজনে রত এতাদৃশ ত্যাগী মহাপুরুষ বিরল। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব—গত ১লা জানুয়ারী কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা ভজন কীর্তন পাঠ ও সাধু-ভক্ত-সমাগম হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও ভারতের বাহিরের কতিপয় দেশ হইতে আগত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সাধু এবং ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানেও ঐ দিবস শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে পূজা ভজন কীর্তন পাঠ ও ভক্ত-সমাগম হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট্ অব্ কালচার—গত ২৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রদেশপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু দক্ষিণ কলিকাতা ১১১নং রসা রোড রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট্ অব্ কালচারের নূতন ভবনের উদ্বোধন করেন। কর্ণেল দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর স্মৃতিরক্ষার্থ ইনষ্টিটিউটকে এই চতুস্তল-বিশিষ্ট ভবনটি দান করিয়াছেন। এই মহৎ দানের পটভূমিকা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস বলেন: "তরুণ যুবক দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশে লালিত-পালিত হইয়া ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় গ্রাজুয়েট হন এবং তৎপর একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাকালে তিনি ১৯৪৩ সনে মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে লণ্ডনে বৈদ্যুতিক শক্তি-তাড়িত হইয়া দেহত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য পরিবেশে লালিত-পালিত হইলেও ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন এবং লণ্ডনে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, রেডিও-ভাষণ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেন। দেবেন্দ্রনাথের এইরূপ করুণ পরিবেশে মৃত্যু হওয়ার পর হইতে তাঁহার মাতাপিতা এই ভবনটি রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট্ অব্ কালচারকে দান করেন।"

ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গভর্নর ডক্টর কাটজু বলেন: "আমরা যদি আমাদের অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গৌরব বোধ না করি তবে আমাদের জীবনের কোনই অর্থ হয় না। আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা শত সহস্র বৎসর ধরিয়া সঞ্জীবিত রহিয়াছে; ইহাতেই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। যদিও ঐ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অমূল্য এবং আমাদের উহাতে গৌরবান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, তথাপি সময়ে সময়ে মনে হয় যে, ভারতের এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে কোথাও কোন ত্রুটি রহিয়াছে। তাহা না হইলে ভারত তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইত না। ভারত দীর্ঘ সংগ্রামের পর পুনরায় তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ঐ বিরাট ঐতিহ্য সম্বন্ধে গৌরবান্বিত বোধ করা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে যে ত্রুটি আছে তাহা আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিলে চলিবে না।"

ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী তাঁহার কার্যবিবরণীতে ইনষ্টিটিউটের নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্যের উল্লেখ করেন।

মিসেস হাওু, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মহাদেবন, ডক্টর কালিদাস নাগ, কর্ণেল দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত এন্ সি ঘোষ বিভিন্ন বক্তাকে ধন্যবাদ জানান।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৬-৪৮ সনের কার্যবিবরণীও পাইয়াছি। বহুমুখী ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আনয়ন ইহার লক্ষ্য। ভারতেতর দেশের সংস্কৃতিতে যাহা প্রাণপ্রদ ও কল্যাণজনক তাহার সম্যক্, সুচিন্তিত ও তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান মানবসমাজের যথার্থ শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যে ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য স্বাস্থ্যনীতি সমাজকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা এই সংস্কৃতিকেন্দ্রটির বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে এই প্রতিষ্ঠানের একাদশ বর্ষ সমাপ্ত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষ ও অন্যান্য

দেশে একটি উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি-সংসদের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

আলোচ্যমান বর্ষত্রিতয়ে অর্থশাস্ত্র, পাতঞ্জল যোগদর্শন, মহাভারত, বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সনে ডক্টর কালিদাস নাগ 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতি-পুঞ্জ' এবং 'স্বাধীন ভারত ও জাতিপুঞ্জ' সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। ১৯৪৮ সনে প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের কলা-বিভাগের কার্জ আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর একটি হিন্দী ক্লাশও খোলা হয়। এই ক্লাশের ছাত্রগণ হিন্দী প্রারম্ভিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একজন সর্বভারতীয় প্রতি-যোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা-সৃষ্টির জন্য ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি পাঠগোষ্ঠী পরিচালিত হয়। ইহার পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে এতৎসম্বন্ধে আরও আলোচনা হয়। ইহাতে শাসনতন্ত্র-বিশেষজ্ঞ বহু পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৫ সনে ইন্‌ষ্টিটিউট্ একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। উহা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শাস্ত্রি-কর্তৃক পরিচালিত হয়। উহাতে জিজ্ঞাসু ছাত্রগণকে সাংখ্য যোগ ন্যায় মীমাংসা ও সর্ব-দর্শন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৬ সনে এই চতুষ্পাঠীতে ১৯ খানি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা হয়। ৮ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা দান করে; তাহাদের মধ্যে সাত জন কৃতকার্য হয়। ১৯৪৭ সনে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ২১ খানা শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা করেন। এই বৎসর বিভিন্ন বিষয়ে ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই উত্তীর্ণ হয়। তাহাদের মধ্যে ৪ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই ছাত্রদের মধ্যে এক জন সর্বোচ্চ সরকারী বৃত্তিরূপে ২৫৬৲ টাকা লাভ করে। এক জন বেদান্ত-পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া একটি স্বর্ণপদক ও ১৫৲ টাকার লাভ করিয়াছে। সাংখ্য-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করায় আর এক জন ছাত্র ৬০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শাস্ত্রী অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত অধ্যা-পনার জন্য সরকার হইতে ১০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৮ সনে ১৭ খানা শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা হয়। এই বৎসর এক জন সাংখ্যের উপাধি, দুই জন বেদান্তের মধ্য এবং এক জন ছাত্র সাংখ্যের আগ্য পরীক্ষা দেয়। সকলেই ইহাতে কৃতকার্য হয়।

আলোচ্যমান বর্ষত্রিতয়ে ধর্ম দর্শন সমাজ-নীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাপ্তাহিক সভায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন। ১৯৪৬ সনে ইন্‌ষ্টিটিউট্-ভবনে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ যোগদান করেন। এই বর্ষত্রিতয়ে কতকগুলি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ইন্‌ষ্টিটিউট্-হলে প্রদর্শিত হয়। এই তিন বৎসরে কয়েক জন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এবং সংগীতবিষয়ে আলোচনা করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ২৯,১০৭; তৎসংলগ্ন পাঠাগারে ২১টি সাময়িক পত্র ও ৯ খানা সংবাদপত্র আছে। আলোচ্যমান বর্ষগুলিতে ইন্‌ষ্টিটিউট্ তিন জন ছাত্রকে দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার সুযোগ দান করিয়া-ছেন।

এই তিন বৎসরে প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতিকেন্দ্র ও এই বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিগণের সঙ্গে সংযোগ সাধন করিয়াছেন। ১৯৪৭ সনের শেষভাগে ইন্দো-ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও শুভেচ্ছা মিশন

ভারতবর্ষে আসেন। উঁহার সদস্যগণ ইনষ্টিটিউটে অবস্থান করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন।

এই প্রতিষ্ঠান ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি-বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'The Cultural Heritage of India' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনের ব্যবস্থা হইতেছে। এই গ্রন্থখানি ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বকোষস্বরূপ হইবে। ইহার প্রকাশনে ভারত সরকার এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আলোচ্যমান বর্ষত্রিতয়ে ইনষ্টিটিউট্-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে গড়ে ১৬ জন ছাত্র বাস করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে। ছাত্রগণ এই প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। ১৯৪৬ সনে ইনষ্টিটিউট্ কয়েক জন ছাত্রকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। এই তিন বৎসরে কয়েক জন বৈদেশিক অতিথি এখানে অবস্থান করেন।

এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত করিতে আরও বৃহত্তর একটি বাটীর প্রয়োজন। জমিসংগ্রহ কার্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইনষ্টিটিউট্‌কে সাহায্য করিয়াছেন। বালীগঞ্জ লেকের নিকটে ৭ বিঘা জমি মনোনীত হইয়াছে; উহা ক্রয় করিতে সাত লক্ষ টাকার প্রয়োজন। অন্যান্য পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে ২৩,০০,০০০৲ টাকার দরকার। ১৯৪৭ সনে এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১০,০০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ৫,০০,০০০৲ টাকা ইতোমধ্যেই দান করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে কার্যে পরিণত করিবার জন্য ইনষ্টিটিউট্ সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব—গত ১লা জানুয়ারী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়ের কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট-স্থিত বাসভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা ভজন কীর্তন ও ভক্তসমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন ও শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসবের ইতিহাস ও সার্থকতা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত পৌষ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সোসাইটি-ভবনে বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দজী 'পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও নারীজাতির আদর্শ', স্বামী জপানন্দজী 'মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জীবনী ও উপদেশ', স্বামী সাধনানন্দজী 'শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জীবনী', স্বামী মৈথিল্যানন্দজী 'শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের জীবনকথা' এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'ঈশদুত যীশুখৃষ্ট' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এই অধিবেশনান্তে কালীকীর্তন, রামনাম-সংকীর্তন, শিবসঙ্গীত এবং অন্যান্য সময়োচিত ভজনাদি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সাপ্তাহিক ধর্মসভায় শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত স্বামী বিবেকানন্দের 'চিকাগো বক্তৃতা' ও 'শিবানন্দ-বাণী' ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র *

52 Ramkanta Bose's Street
Calcutta 23rd July, 1896

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী এবং অন্যান্য সকলে এবং আপনি স্বয়ং এক্ষণে সুস্থতালাভ করিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ ও সচ্চিদানন্দ মহারাজদ্বয়কে আমার প্রণামাদি জানাইবেন। তাঁহারা কেমন থাকেন মঠে লিখিবেন।

আপনার প্রাণনাথের প্রতি আপনি প্রেমোপহার সর্ব্বদাই দিয়া থাকেন এবং তদ্‌গৃহীতোপহার—নির্ম্মাল্যখণ্ড যে আমাকে মধ্যে মধ্যে প্রদান করিয়া থাকেন তাহার জন্য অবশ্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই এবং তাহার জন্য অবশ্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি যে আপনার প্রিয়তম প্রাণনাথ সদাশিবের সম্বন্ধে অতি প্রগাঢ় প্রেমপূর্ণ গাথাটী আমার "করকমলে" উপহার প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া, তৎরক্ষোপযোগ্য স্থল কুত্রাপি না পাইয়া হস্ত হইতে আর না নামাইয়াই অমনি তৎক্ষণাৎ সহস্রদল কমলোপস্থ আমার সেই মোক্ষদ পরমশিবালয়ে ক্ষেমার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম। সাধারণ লোকে আপনার গাথাটী দেখিলেই বুঝিবেন হয়ত যে ইহা বিবেকোত্থিতাদ্বৈত জ্ঞান! কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত এই বুঝিলাম যে ইহা বিবেকপারস্থ মধুর প্রেমজনিতাদ্বৈত মিলন। যথা—

"জীব আমি শিব তুমি একি লীলা প্রাণনাথ
তুমি ভিন্ন কোথা হতে আমি"
"এস এস বিশ্বনাথ তুমি আমি হই এক (সঙ্গম)
দ্বৈত লীলা কর সম্বরণ" (প্রেমজন্য লয়)

এই কয়টী চরণে আপনি আমাকে ক্রয় করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন—এ কয়টী এত সুন্দর ও মিষ্ট হইয়াছে যে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। আপনি আমাকে "পরম বন্ধু"

* ৺প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত

বলিয়াছেন ঃ তাহা অতি মিষ্ট সম্ভাষণ। আপনিও আমার পরম বন্ধু, তা না হলে আপনি আপনার প্রাণনাথের কথা আপনাদিগের উভয়ের গূঢ় সঙ্গমের কথা আমাকে বলিতেন না। আপনি আমার পরম বন্ধু। আপনি আমাকে যে উপহার দিয়াছেন তাহার প্রত্যুপহারস্বরূপ আমিও আপনাকে আমার প্রাণনাথের সম্বন্ধে আমার হৃদয়স্থ এই সুধাটুকু পাঠাইতেছি, গ্রহণ করুন ঃ—

সল্লোকা বিষয়বিরাগিণো যদর্থং
সন্ত্যক্তঃ সুখনিবহো বুধৈশ্চ বাল্যাৎ।
যল্লব্ধুং কঠিনতপো হি চর্য্যতে জ্ঞৈঃ
লিপ্সন্তে ত্রিদশগণাঃ সদা পদং যৎ ॥ ১

যস্মান্নাস্তি ভগবতো হি কিঞ্চিদূর্দ্ধং
সুপ্রাপ্যশ্চ ন খলু কস্যচিৎ যতোঽন্যঃ।
সোঽসাবেব[1] পরমহংসো রামকৃষ্ণঃ
সর্ববিজ্ঞঃ সকলমনোজ্ঞঃ প্রশান্তঃ ॥ ২

রক্ষার্থং নিজবচনং ত্রিতাপহর্ত্তা
গৌরাঙ্গেন[2] ভগবতা প্রতিশ্রুতং যৎ।
ভক্তার্থং পরমদয়ালুরাগতস্ত্বং
মহ্যাং তে পুরুষ সমর্পয়ামি সর্বম্ ॥ ৩

(ইতি বিশেষকম্)

ছদ্মপ্রসাধনধরোঽসি[3] বিবেত্তি কস্তে
কৃষ্ণাধুনাবতরণস্য নিগূঢ়তত্ত্বং।
স্বেনৈব চেৎ ন কথিতং শিব তৎপ্রিয়েভ্যঃ
গুপ্তাবতার[4] ভগবন্ ভবতঃ কৃপৈবম্ ॥ ৪

উল্লিখিত সংস্কৃত রচনায় ভুল থাকা সম্ভব। অনুগ্রহ করিয়া নিদর্শন করিয়া দিবেন।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ৺কাশীধামে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় কি না, এবং যদি পাওয়া যায় ত, কোথায় পাওয়া যায় আর কত দাম, অনুগ্রহ করিয়া পত্রপাঠ আমাকে কলিকাতার (৫২ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট) ঠিকানায় লিখিবেন। বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কালবিলম্ব না হয়।

১। তৈত্তিরীয় সংহিতা ২। তৈঃ ব্রাহ্মণ ৩। তৈঃ আরণ্যক ৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫। শতপথ ব্রাহ্মণ ৬। গোপথ ব্রাহ্মণ ৭। অথর্ব্ববেদ সংহিতা, অথর্ব্ববেদ ব্রাহ্মণ ৮। শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা মহীধর ভাষ্য সহিত। ৯। পূর্ব্বমীমাংসা শবরভাষ্য সহিত ১০। নিরুক্ত সটীক এবং আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, পারাশর্য্য, লাট্যায়ন প্রভৃতি সূত্র (শ্রৌত, গৃহ্য ইত্যাদি) সটীক।

আমার নমস্কারাদি জানিবেন। ইতি—

দাস ত্রিগুণাতীত

কাশীধামে যদি না পাওয়া যায় ত কোথায় পাওয়া যাবে? }

---

১ সোঽসাবেবঃ—"পূর্ণ ব্রহ্ম" পাঠান্তরম্। ২ ৩ ৪ গৌরাঙ্গেন ভগবতা গৌরাঙ্গমহাপ্রভুস্তদ্ভক্তেভ্যঃ যৎ প্রতিশ্রুতং তদ্যথা—"অহং পুনঃ দ্বৌ বারৌ বঃ আগমিষ্যামি লীলাং করিষ্যামি চ তদা তু যুষ্মদন্যঃ মাং ছদ্মবেশবশাৎ ন কোঽপি জ্ঞাস্যতি ইতি।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান

সম্পাদক

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিশ্বমানব-সভ্যতার সমৃদ্ধিসম্পাদনে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীকে পশুস্তর হইতে মানবতায় উন্নয়নে ধর্মের অবদান অপরিসীম। ধর্মই দর্শন সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা সংগীত প্রমুখ মানুষের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং সত্য ন্যায় নীতি সংযম পরার্থপরতা অহিংসা দয়া প্রেম প্রভৃতি সদ্গুণের একমাত্র উৎস। ধর্মের দান কেবল এই সকল বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু মানুষমাত্রকেই সকল দুঃখ ও অশান্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া শাশ্বত সুখ ও শান্তির অধিকারী করা, মানুষকে তাহার সীমাবদ্ধ অপূর্ণ জীবনের গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া অসীম পূর্ণত্বে উপনীত করা, মানুষের জীবত্ব নাশ করিয়া তাহাকে শিবত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, মানুষকে চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিশ্বজীবের কল্যাণে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রণ করা সকল ধর্মের সার্বজনীন লক্ষ্য। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীকে এই মহান লক্ষ্যে উপনীত করাই সকল ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ। ইহাই মানুষ-মাত্রেরই জীবনসমস্যা-সমাধানেরও একমাত্র উপায় বলিয়া সকল দেশের সকল ধর্মশাস্ত্র সমস্বরে প্রচার করেন।

দেখা যায়—সাধারণ মানুষ দূরের কথা, অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং জাগতিক বিষয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনও ধর্মের এই মহান আদর্শে—সত্য ন্যায় নীতি সংযম পরার্থপরতা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পরিচালিত না হইলে উহা গুণতঃ অতিশয় দরিদ্রতর হইয়া থাকে। মানুষ ধনবান-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ যাহাই হ'ক না কেন এবং যে কাজ করিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক না কেন, ধর্ম ন্যায় নীতি দয়া সংযমাদি বর্জিত হইলে সে স্বার্থপরতা এবং উচ্ছৃঙ্খল ভোগে লিপ্ত হইয়া পরিণামে তাহার নিজের এবং সমাজের অনিষ্টের কারণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, শকুন যতই ঊর্ধ্বে উঠুক না কেন, উহার দৃষ্টি যেমন গো-ভাগাড়েই নিবদ্ধ থাকে, ধর্মহীন উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তির দৃষ্টিও তদ্রূপ লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের প্রতিই আকৃষ্ট থাকে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের স্বার্থপরতাই সকল দেশে সকল কালে মানবসমাজে সর্ববিধ অসাম্য অশান্তি ও দুর্নীতির প্রধান কারণ। ইঁহারাই আপনাদের জাতিগত সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষমাত্রেরই সুখ ও শান্তির একমাত্র আশ্রয় ধর্মের নামে উৎকট সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিয়া মানব-সভ্যতাকে স্মরণাতীত কাল হইতে কলঙ্কিত করিতেছেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীই কোন না কোন ধর্মাবলম্বী বলিয়া গর্বের সহিত পরিচয় দিলেও তাহারা, অন্যান্য ধর্ম দূরের কথা—নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানে না।

এই জন্যই স্বার্থপর ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্মের মুখোশ পরিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে

নানাভাবে উত্তেজিত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের অনলে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে পোড়াইয়া মারা প্রাচীন কাল হইতে বর্তমানেও সময়ে সময়ে সম্ভব হইতেছে।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, মধ্যযুগে কয়েক শতাব্দী যাবৎ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের ভীষণ সাম্প্রদায়িক বিরোধ পাশ্চাত্য দেশগুলিকে নররক্তে প্লাবিত করিয়াছে। তখন ক্যাথলিক-জগতের ধর্মগুরু পোপের প্রতিষ্ঠিত পাষণ্ডদলন বিচারালয়-(Inquisition Court) সমূহ হইতে অগণন অবিশ্বাসী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট নরনারী ভীষণ-ভাবে নির্যাতিত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই ক্যাথলিক-প্রোটেষ্ট্যাণ্ট বিরোধ এবং মুসলমানদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের ভীষণ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে দুরপনেয় কলঙ্ক।

মুসলমানেরা খৃষ্টানদের তীর্থস্থানগুলি অধিকার করিয়া তীর্থযাত্রা বন্ধ করিলে সমগ্র ইয়োরোপের খ্রীষ্টানগণ মিলিত হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রায় তিন শত বৎসর ব্যাপী ধর্মযুদ্ধ (Crusade) পরিচালন করে। ইহাতে যে কত জনপদ উৎসন্ন গিয়াছে এবং উভয় পক্ষের কত নরনারী হতাহত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের সঙ্গে পারসিক ইহুদী বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বিরোধে অগণন নরনারীর জীবন নষ্ট হইয়াছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষেও হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, হিন্দু-বৌদ্ধে এবং হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ কম হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বময় বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তারের ফলে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বুঝি অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হইল। কিন্তু এই অনুমান মিথ্যা বলিয়া পরবর্তী কালে—বিশেষ করিয়া বর্তমানে সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থান হইতে এখনও গোঁড়া খ্রীষ্টানদের সঙ্গে ইহুদীদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ চলিতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর একচ্ছত্র অধিনায়ক হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে জার্মানী হইতে নির্মম ভাবে বিতাড়ন করিয়াছেন। বর্তমানেও মুসলমানগণ প্যালেষ্টাইন হইতে ইহুদীগণকে তাড়াইয়া দিতে এবং ইহুদীগণ মুসলমান-মাত্রকেই উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইংরেজ-রাজত্বের শেষ ভাগে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রাবল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশী বিদেশী রাজনীতিক ধুরন্ধরগণের অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার দাবাগ্নি ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিতে থাকে। ভারতে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা এই উৎকট সাম্প্রদায়িক বিরোধেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পাকিস্তান ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দু ও শিখদের যে প্রলয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক বিরোধ হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ আর দেখা যায় না। এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ তাহাদের জন্মভূমি হইতে নিতান্ত নির্মম ভাবে একেবারে বিতাড়িত হইয়া সর্বহারা অবস্থায় ভারতে আগমন করে এবং প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমান পূর্বপাঞ্জাব হইতে প্রায় ঐরূপ ভাবে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িক বিরোধে যে কত লক্ষ নরনারী হতাহত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ। এতদ্ভিন্ন পূর্ব পাকিস্তান হইতেও প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু নানা কারণে বাস্তুত্যাগ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনও তথায় প্রায় দেড় কোটি হিন্দু রহিয়াছে।

'ইসলামিক ষ্টেট' বলিয়া ঘোষিত পাকিস্তানে ইহাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষিত না হইলে তথায় এবং তৎপার্শ্ববর্তী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহে ভীষণ সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। স্বাধীন ভারতেও হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বহ্নিকে রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিকতা-রূপ ভস্মে আচ্ছাদন করিয়া রাখা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু নির্বাপিত হয় নাই; ইহা উস্কানি পাইলেই যে পূর্বের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে বারংবার সাম্প্রদায়িক বিরোধের অনল জ্বলিয়া উঠা সত্ত্বেও ইহাকে একেবারে নির্বাপিত করা আজ পর্যন্তও সম্ভব হয় নাই।

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, বিশ্বমানব-সভ্যতার মহা কলঙ্ক স্বরূপ এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রধানতঃ চারিটি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে: (১) পৃথিবীর সকল ধর্মের একেবারে উচ্ছেদ করিয়া কোন ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের বিশ্বময় একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা একেবারেই সফল হয় নাই। পৃথিবীর সকল নরনারীকে বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য 'প্যান্ বৌদ্ধ', 'প্যান্ খ্রীষ্টান' ও 'প্যান্ ইসলাম' আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ধর্মই আজও বাঁচিয়া আছে এবং ভবিষ্যতেও যে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে ইহার সকল লক্ষণ সুস্পষ্ট। (২) সকল ধর্মের সারাংশসংগৃহীত সমীকরণ সহায়ে সমগ্র বিশ্বে একটি অভিনব ধর্ম স্থাপন। কবীর দাদু সুরদাস প্রমুখ মধ্যযুগীয় ধর্মাচার্যগণ প্রবর্তিত কবীরপন্থী দাদুপন্থী ও সুরদাসী সম্প্রদায়, সম্রাট আকবর স্থাপিত দীন ইলাহি সম্প্রদায় এবং রাজা রামমোহন স্থাপিত ব্রাহ্মধর্ম ও কেশব সেন প্রবর্তিত নববিধান প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রধানতঃ এই মতবাদের সমর্থক। এই সম্প্রদায়গুলি সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রশমনে অনেকটা সাহায্য করিলেও উহা দূর করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পর্যবসিত। (৩) পরধর্মসহিষ্ণুতা ও পরধর্ম-নিরপেক্ষতা অবলম্বন। অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ের অধিকাংশ নরনারীই এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলিলেও আন্তরিক ভাবে কার্যতঃ ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাসী নয় বলিয়াই উত্তেজনা পাইলেই তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিরোধে মত্ত হইয়া থাকে। এই জন্য বলা যায় যে, এই নীতি সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূরীকরণে সর্বাংশে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। (৪) ধর্মমাত্রকেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের হেতু মনে করিয়া সকল ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন। দেখা যায় যে, বর্তমানেও পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী। কাজেই এই ধ্বংসনীতি এ পর্যন্ত সফল হয় নাই এবং সুদূর ভবিষ্যতেও এই মতবাদের সাফল্যমণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এই চারিটি উপায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মজগৎ হইতে সর্ববিধ সাম্প্রদায়িক বিরোধ সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য এক অভিনব উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ইহা বিশ্বমানবকে ক্রমেই অধিকতর প্রভাবিত করিতেছে। তাঁহার নিজ জীবনে অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সর্বধর্মসমন্বয় এই অভিনব পন্থা। কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ থাকিলেও এতকাল এই মতবাদ যুক্তি-বিচারসহ নির্বস্তুক তত্ত্বমাত্রেই পর্যবসিত ছিল। পৃথিবীর ধর্মাচার্যগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবই বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্য সর্বাংশে রক্ষা করিয়া প্রধান প্রধান ধর্ম নিজ জীবনে কার্যতঃ সাধন করিয়াছেন।

তাঁহার সাধনপ্রভাবে সর্বধর্মসমন্বয় জীবন্ত সত্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি প্রচার করিয়াছেন যে, ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁহার নাম রূপ ও ভাব অনন্ত। এই অনন্ত ঈশ্বরকে অনন্তভাবে উপলব্ধি করিবার স্বাভাবিক উপায়রূপে পৃথিবীতে অনন্ত ধর্মমত ও পথের উদ্ভব হইয়াছে। এই মত ও পথের সকলগুলিই সত্য—যত মত তত পথ। সগুণ নির্গুণ সাকার নিরাকার দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকমনে প্রতিফলিত একই ব্রহ্মের বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং এই মতবাদগুলির কোনটিই মিথ্যা নয়। তাঁহার অভিমত কেবল শাস্ত্র যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নিবস্তক ভাবমাত্র নয়, পরন্তু ইহা প্রত্যক্ষানুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত প্রত্যক্ষ বস্তুগত বাস্তব সত্য। এই লোকোত্তর মহামানবের জীবনে সকল ধর্ম আপন আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও অত্যাশ্চর্য-ভাবে সম্পূর্ণ সম্মিলিত হইয়াছে। তিনি কোন নূতন ধর্ম-সাধন বা প্রচার করেন নাই। তিনি হিন্দুশাস্ত্র-মতে হিন্দু, খৃষ্টান শাস্ত্র মতে খৃষ্টান, মুসলমান শাস্ত্র মতে মুসলমান এবং একাধারে ইহাদের সমষ্টিস্বরূপ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনসহায়ে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ সকল ধর্মকেই সত্য এবং ঈশ্বরলাভের এক একটি পথ বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া উহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত থাকিয়াও নিজ নিজ ধর্মসাধন করিতে পারেন। তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত এই উদার আদর্শ অবলম্বন করিলে কোন মানুষকে তাহার ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোন কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না—পরিত্যাগ করিতে হইবে কেবল তাহার ‘মতুয়ার বুদ্ধি’কে—অর্থাৎ ‘আমার’ ধর্মই সত্য, অন্যান্য ধর্ম সত্য নয়—এই মিথ্যা অহংকারকে। এই অহংকার, এই সংকীর্ণতা, এই কূপমণ্ডূকত্বই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ-বিদ্বেষ সৃষ্টির মুখ্য কারণ। ধর্মধ্বজী ব্যক্তিগণ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের উপর আপন সম্প্রদায়ের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার দুরাশায় এবং রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ আপনাদের দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য অজ্ঞ জনসাধারণের এই সংকীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া এত কাল সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ‘যত মত তত পথ’রূপ অত্যুদার বাণী যতই প্রচারিত হইতেছে, ততই এই ধর্মধ্বজীদের ধর্মের মুখোশ খসিয়া পড়িতেছে এবং রাজনীতিক ধুরন্ধরদের স্বার্থাভিসন্ধি জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছে। এই মহাপুরুষের প্রবর্তিত সর্বধর্মসমন্বয়বাদ বিশ্বময় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইলে যে ইহার প্রভাবে ধর্মসম্বন্ধে জনসাধারণের স্বাভাবিক ঔদার্য ফিরিয়া আসিবে, তাহারা বিভিন্ন ধর্মকে একই ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথ মনে করিয়া উহাদের প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম-পালনে উৎসাহিত হইবে এবং ইহার ফলে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ জগৎ হইতে একেবারে চলিয়া যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ধর্মকে আপন ধর্মেরই বিভিন্ন রূপ মনে করিয়া উহাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণকে একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত জানিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে, বিশ্বমানবের ধর্মরাজ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে সর্বধর্মসমন্বয়ের তুল্য কোন কার্যকর মতবাদ আর দেখা যায় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বিভিন্ন- ধর্মকে যথার্থ গণতান্ত্রিক আকার দান করিতে হইলে এই সর্ব-ধর্মসমন্বয়ই একমাত্র উপায়। কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিভিন্ন ধর্মের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া উহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা অপরি-হার্য। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে সর্বধর্ম-

সমন্বয়ের আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এই সকল কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রচারিত সর্ববিরোধ-বিনয়ন-কারী সর্বধর্মসমন্বয়ই বিভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদায়িক বিরোধ একেবারে দূর করিয়া বিশ্বের ধর্মরাজ্যে যথার্থ শান্তিস্থাপন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সর্ববিধ ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিয়া উহাদের মধ্যে প্রকৃত সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়কে যথার্থ গণতান্ত্রিক আকারপ্রদানের একমাত্র উপায়।

পঞ্চবটী

শ্রীঅমিতকান্তি বসু

ঐ পঞ্চ-আনন পঞ্চাননের পঞ্চবটীর পুণ্যাসন
ঐ নির্ম্মল-শুচি মহান-শান্ত মন্দির প্রাঙ্গণ।
তার পল্লবঘন ছায়া সুশীতল কম্র শ্যামল কান্ত,
তার ভস্ম ভূষিত নগ্ন অঙ্গ ধ্রুব সৌম্য শান্ত,
তার দুর্ভেদ জটা ধূসর বরণ আভূমি লম্বমান,
আর পদতলে তার পাপহারিণী জাহ্নবী করে গান।
ওযে ধেয়ান-মগন ধ্যানীর সাধনে সিদ্ধির সন্ধানী,
তার চিত্তের পটে সত্যের ছটা কণ্ঠে মোহন বাণী।
আর মুক্ত যোগীর পদরেণু তার যাত্রার সম্বল,
আর মোক্ষের লাগি বক্ষ তাহার উদ্বেল, উচ্ছল।
ও সে পল্লবঘেরা পলল মাটির নির্জন কৈলাস,
হোথা শোকের শান্তি, পাপের ক্ষালন, আশা ও বাসনা নাশ।
এই মত্ত-আকুল মদ-মোহময় বিশ্বের কোলাহল,
ঐ পঙ্কিল পথে শঙ্কিল খেলা স্বার্থের হলাহল,
আর তারি একপাশে গম্ভীর ধীর মহান্ সমুজ্জ্বল,
ঐ সত্যসত্তা আত্মবেত্তা প্রজ্ঞা অচঞ্চল।
যবে আত্ম পাশরি পড়িবে গো ঢুলি বিহ্বল কল্লোলে,
ওগো আত্মান্বেষী সত্যসন্ধী হেথায় আসিও চলে।
যবে দুঃসহ শোক, দুর্দম আশা চিত্ত মথিবে হায়,
এসো হেথায় ছুটিয়া সান্ত্বনাকামী পঞ্চবটের ছায়।
হোথা দেব গদাধর ধেয়ান-মগন বটবল্লরী তলে,
ও যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ভাস্বর রূপে জ্বলে।

ভক্ত অধর সেন

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে 'শ্রীম' লিখিয়াছেন ঃ "অধর ঠাকুরের পরমভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি আমার পরম আত্মীয়।" তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন, "অধরের বাড়ী কলিকাতা শোভাবাজার বেনেটোলা। তাঁহার কয়েকটী কন্যাসন্তান এখনও বর্ত্তমান। কলিকাতার বাটীতে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল, শ্রীযুক্ত হীরালাল প্রভৃতি ভ্রাতারা কেহ কেহ এখনও আছেন। তাঁহাদের বাটার বৈঠকখানা ও ঠাকুরদালান তীর্থ হইয়া আছে।" কথামৃতের চতুর্থ ভাগে 'শ্রীম' লিখিয়াছেন ঃ "আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে।" এই পরম ভক্ত অধরের জীবন-সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অনেকেই বিশেষ কিছু জানেন না। ভক্তেরা জানেন তিনি এক জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহারই বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অধর রাজকার্য্য শেষ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যাইতেন। ইহার অধিক আর কিছু জানা নাই। অনুসন্ধানে এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের "সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্ত্তি" পাঠ করিয়া অধর সেনের গৌরবোজ্জ্বল জীবনেতিহাস যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি আজ তাহা সংক্ষেপে পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিব।

অধরের পূরা নাম অধরলাল সেন। জাতিতে সুবর্ণবণিক। হুগলী জেলার সিঙ্গুরগ্রামে ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। কার্য্যব্যপদেশে ঘনশ্যাম সিঙ্গুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ঘনশ্যামের পুত্র কানুরাম, কানুরামের পুত্র রামহরি এবং রামহরির পুত্র মথুরামোহন। মথুরাবাবু অধরলালের পিতামহ। মথুরামোহনের পুত্র রামগোপাল ছিলেন অধরের পিতা। রামগোপাল আরমানী ষ্ট্রীটে সুতার কারবার করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার আহিরীটোলায় ২৯নং শঙ্কর হালদার লেনে তিনি বাস করিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ দোল পূর্ণিমার দিনে অধরলাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধরলালেরা ছয় সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বলাইচাঁদ সুশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী এবং বাংলাভাষায় গদ্যে ও পদ্যে পাঁচখানি বই রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পরোপকারী, সহৃদয় ও ধর্মপ্রাণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। জনসেবায় বলাইচাঁদ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া দরিদ্র জনসাধারণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। অধরের দ্বিতীয়াগ্রজের নাম দয়ালচাঁদ, তৃতীয় শ্যামলাল ছিলেন মেসার্স স্রোডার স্মিথের ক্যাশিয়ার এবং চতুর্থাগ্রজ রামলাল। অধরলাল ছিলেন সহোদরদের মধ্যে পঞ্চম। তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরালাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই জন ভগ্নী ছিলেন।

অধরলালের পিতা রামগোপাল ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া তৎকালে সুবিদিত ছিলেন। তিনি আহিরীটোলা ৯৭নং বেনেটোলা ষ্ট্রীটে নূতন বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বৎসরে বৎসরে দুর্গোৎসব করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। এই বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করিয়া অধরের বৈঠকখানা ও ঠাকুরদালান তীর্থরূপে পরিণত করেন। অধরের আমন্ত্রণে ও অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে এই বাড়ীতেই প্রতিমাদর্শনে আসিয়াছিলেন। 'শ্রীম' ও ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা অনেক নূতন ভক্তদিগকে বলিতেন : অধর সেনের বাড়ী ঠাকুরের পদধূলিতে তীর্থ হইয়া গিয়াছে। কত সংকীর্ত্তন, ভাবসমাধি ও উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভৃতি হইয়াছে। উক্ত গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত লইয়া কত আনন্দোৎসব করিয়াছেন। ঐ গৃহ দর্শন করিবার জন্য তাঁহারা অনেককে বলিতেন।

অধরলালের বয়স যখন বার বৎসর (অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ) তখন তিনি কিশোর বয়সে খিদিরপুরনিবাসী রামচাঁদ শীলের সাতবৎসরবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বয়সে অধরলাল কৃতিত্বের সহিত মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি পান। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ্-এ পড়িতেন। তাঁহার সহপাঠী ছিলেন স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। কলেজে তিনি সকলের সঙ্গেই মিশিতেন এবং সতীর্থেরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। সাহিত্যানুরাগী ও অত্যন্ত মেধাবী ছেলে বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া ইংরেজী সাহিত্যে ডফ্ স্কলারসিপ্ লাভ করেন। এই ছাত্রবয়সে তাঁহার দুইখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথমখানির নাম "ললিতাসুন্দরী", দ্বিতীয়টীর নাম "মেনকা"। "ললিতাসুন্দরী"র ভূমিকায় অধরলাল লিখিয়াছেন—"ললিতাসুন্দরীর প্রথম সর্গের অধিকাংশই দুই বৎসর পূর্ব্বে 'মাসিক প্রকাশিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত্তিত ও সংযোজিত হইয়াছে। ইহার সকল ভাব লেখকের মানস-প্রসূত নহে, মধ্যে মধ্যে অপরাপর ভাষার ও ভাবের অসদ্ভাব নাই। ঘটনাটি অনৈতিহাসিক এবং রচনাচাতুরীর অভিমান করে না।" এই দুইখানি বই একটী ষোলো-সতেরো বৎসরের তরুণ যুবকের লেখা, তাঁহার উনিশ বৎসর বয়সে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে তরুণ অধরলালের গদ্য ও পদ্যের ভাষা পড়িলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে অধরলাল শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে অধরলালের ভাবধারা কিরূপ ছিল, যুবা-বয়সে শিক্ষিত ও সম্মানিত রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট অধরের মনে কল্পনা ও ভাবুকতা কি ভাবে উদিত হইতেছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া অধরের কিরূপ রূপান্তর হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে গেলে তাঁহার রচনাবলীর মধ্যেই দেখিতে হইবে। তাই এই স্থানে আমরা তাঁহার পুস্তকগুলির ভাব ও আখ্যানবস্তু লইয়া একটু আলোচনা করিব।

অধরলালের প্রথম কবিতাপুস্তক "ললিতাসুন্দরী"র প্রথম সর্গ সম্বন্ধে ১২৮১ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন—

"এখানি পদ্য। গ্রন্থকারের অনুরোধ যে আমরা তাঁহার গ্রন্থের প্রতি পঙ্ক্তি, প্রতি শ্লোক

প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক পৃথক সমালোচনা করি। লেখক অতি তরুণবয়স্ক আমরা জানিয়াছি। অতএব তাঁহার এ আশা পূর্ণ না হইলেও তিনি রাগ করিতে পারেন না। যখন তিনি কোন উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন তখনও আমরা প্রতি পঙ্‌ক্তি প্রতি শ্লোক প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক পৃথক সমালোচিত করিতে পারিব না। ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শনে তাহা পাঁচ বৎসরে সম্পন্ন হইতে পারে না—তবে সাধ্যানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব। উপস্থিত কাব্যে নবীনত্বের বিশেষ অভাব, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় বয়োবৃদ্ধি হইলে ইহার রচনা বিশেষ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে।" বাস্তবিকই অধরলাল সুকবি ছিলেন। তরুণ বয়সেই তাঁহার উচ্চ কল্পনা, সুললিত সরল ও সরস পদ্যচ্ছন্দ, ভাষার সাবলীল শৈলী, প্রাকৃতিক বর্ণনা মনোহর ও সুমধুর ছিল। নিম্নের কয়েকটী পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলেই পাঠকেরা তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয় পাইবেন :

"ঝিকিমিকি করে রবি দিবা অবসান,
মৃদুল অনিল গায় বিরামের গান।
শোভাময় চারিদিক শোভাময় বন,
শোভাময় নীলনভ, শোভন ভুবন।
নাহি আর তপনের আতপ প্রখর,
উজলে জাহ্নবী-জল কিরণনিকর।"

বঙ্কিমবাবু যে নবীনত্বের অভাব বলিয়াছেন তাহার কারণ এই তরুণ কবির কাব্যগ্রন্থের আখ্যান বস্তু প্রেম—প্রেমিক-প্রেমিকার হতাশ প্রেম। নায়কের নাম ললিত, নায়িকার নাম ললিতা। বাল্যপ্রেম যৌবনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে নাই। উচ্ছৃঙ্খল নবাব সিরাজৌদ্দলার প্রবৃত্তি মিটাইবার জন্য ললিতা তাঁহার অন্তঃপুরে বন্দিনী—সে এখন জেহানা-বেগম। মুঙ্গেরে গঙ্গাতীরে নবাবের প্রমোদ-কাননে উভয়ের দেখাশুনা হইত। ইংরেজ তখন পলাশীতে প্রবেশ করিয়াছে—প্রতিহিংসায় নায়ক সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন; তাই ললিতার নিকট বিদায় লইতেছেন :

"এই দেখা শেষ দেখা—কেঁদো না, প্রেয়সী,
ক্ষতি নাই, দেখে লই তব মুখশশী।
মরে যাই, বেঁচে থাকি, কিছু দুখ নাই,
সমরে পামরে হেরি, এই ভিক্ষা চাই।"

এই তরুণ বয়সে অধরলালের গভীর স্বদেশ-প্রেম ছিল। জাতির পরাধীনতা ও ভীরুতার প্রতি তাঁহার ক্ষুব্ধ অভিমান রচনায় একটা আকস্মিক তাড়িত প্রবাহ বহাইয়াছে। ললিতের মুখে কবি তাঁহার সেই ক্ষোভ ও আক্ষেপের কথা শুনাইয়াছেন :

"আর তুমি বঙ্গভূমি ভীরুপ্রসবিনী,—
বড় ভালবাসি আমি তোমারে, জননি।
ভালবাসি—বড় দুখ রহিল পরাণে,
নারিলাম উদ্ধারিতে, ধিক এ জীবনে।"

নায়ক আবার বলিতেছেন :

"কাতর হয়েছি নহি জীবন-কাতর,
মরিতে করে না ভয় সাহসী অন্তর!
যেই কর করে প্রিয়ে, প্রেম আলিঙ্গন,
সেই করে করে শত্রু-মস্তক-ছেদন।
চাহি না রাখিতে কভু কাপুরুষ প্রাণ,
থাকিতে এ বাহু আর শাণিত কৃপাণ!"

এই কাব্যগ্রন্থটী যদিও অধরলালের উনিশ বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ষোলো-সতেরো বৎসর বয়সের রচনা। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভূমিকাতেই অধরলাল লিখিয়াছেন ইহার সকল ভাব তাঁহার "মানস-প্রসূত নহে" এবং "অপরাপর ভাষার ও ভাবের অসদ্ভাব নাই"। তাহা ছাড়া আখ্যানবস্তুর বিষয়টী অনৈতিহাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, "নবীনত্বের

অভাব", কিন্তু এই তরুণ কবির মার্জ্জিত সংযত ভাষা, বিলাস-লালসার উদ্দামহীনতা, অপার্থিব প্রেমের আনন্দের কল্পনা উচ্চ রুচির পরিচায়ক।

এই তরুণ বয়সে অধরলালের রচনায় পৌত্তলিকতার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা যায়। ইহা কি তৎকালীন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাব? কবি বলিতেছেন:

"যেমন অবোধ মন হিন্দুর কুমার,
মাটির পুতুলে দেয় পশু উপহার;
হইবে দেবের তুষ্টি, যাইবে ত্রিদিবে,
পূজার পুণ্যের ফল তথায় পাইবে।"

শুধু তাহাই নয়—ত্রিদিব বলিয়া কোনও স্থান আছে তাহা তরুণ বয়সে অধরলাল বিশ্বাস করিতেন না। তিনি লিখিতেছেন:

"কে বলে ত্রিদিব রাজে আকাশ উপরে,
সুধার ভাণ্ডার আছে অমর নগরে?
কে বলে বিরাজে সুখ তাপস-হৃদয়ে,
নাচে বিদ্যাধরী শুধু বাসব-আলয়ে?"

অধরলাল যে তরুণ বয়সেই সংস্কৃত কাব্যনাটক পাঠ করিয়াছিলেন, রামায়ণ ও মহাভারতের অমর কাহিনী তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে রেখাপাত করিয়াছিল, তাহাও কাব্যগ্রন্থ পাঠে জানা যায়। নীচের কয়েকটী পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলেই পাঠক-বর্গের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে—

"ভাবিল সে কালিদাস স্বভাবের কবি
প্রভাতের আরক্তিম তপনের ছবি,
মহাশ্বেতা পুরূরবা শচী পারিজাত
হস্তিনার নরেশের সকুলে নিপাত।"

অথবা নায়ক যখন শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন ললিতার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন:

"পাঞ্চাল কুমারী কৃষ্ণা বিরাট-ভবনে,
ত্যজিয়া রজনী মাঝে পাচক-সদনে,
যেমন ফিরিয়াছিল, তেমনি ললিতা
ফিরিল কানন হ'তে প্রেম-বিষাদিতা।"

ইহার কয়েক মাস পরে অধরলাল 'মেনকা' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইখানি তিনি পিতৃচরণকমলে উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। আখ্যানবস্তুটি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত। অপ্সরী মেনকা দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া মর্ত্তধামে নির্ব্বাসিত হইল। ইন্দ্রের আরাধনা করিতে করিতে আকাশবাণী হইল, যত দিন না সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্ন আহরণ করিয়া স্বর্গের দ্বারীকে অর্পণ করিতে পারিবে, তত দিন তাহার নিকট স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না। হিমাদ্রিশিখরে কুবেরের রত্নভাণ্ডারের কথা মেনকার মনে পড়িল, কিন্তু স্বর্গে কি মণিমাণিক্যের কোন মূল্য আছে? মৃতসঞ্জীবনী লতার কথা তাহার মনে পড়িল, কিন্তু দেবতারা যে অমর; অমরলোকে মৃতসঞ্জীবনী লতার কি আদর হইবে? হতাশ হৃদয়ে মেনকা পৃথিবীতে রত্নের সন্ধানে ফিরিতেছে, কিন্তু:

"নদনদী আর ভূধর সাগর,
হ্রদ উপত্যকা পর্ব্বত গহ্বর,
এ সকল হায় করি দরশন
ঘোচে না পরীর মনের দুখ।"

* * *

মেনকা অনুক্ষণ স্বর্গের আনন্দময় স্মৃতি বহন করিত। তাই আক্ষেপ করিয়া সে ব্যথিত হৃদয়ে বলিতেছে:

"দেখিয়াছি আমি যমুনার জল,
জাহ্নবী-সলিল বিমল উজল,
মানসের সম কেহই নহে।
দেখিয়াছি আমি মানব-লীলা,
বিষাদ আকাশে বিজলী খেলা,
এক চোখে কাঁদে, এক চোখে হাসে,
এক চোখে বাসে, এক চোখে নাশে,

হায়রে কেবল অমরের তরে
জগতের যত আনন্দ রহে !"

রত্নের আশায় মেনকা স্বর্ণলঙ্কায় গমন করিল। সেদিন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণশরে নিহত, চিতাশয্যায় প্রমীলা সহমরণে যাইতেছেন। মেনকা ভাবিল, সতীর এই অন্তিম নিঃশ্বাসটুকুই অপূর্ব্ব রত্ন, ইহা তো স্বর্গেও দুর্লভ! তাহার মনে হইল :

"সতী রমণীর নয়ন জল
এর চেয়ে কিবা অতুল বল,
খুলিবে খুলিবে ত্রিদিবের দ্বার,
চির প্রিয়ধনে দেখিব আবার,
এইরূপ মনে ভাবিয়া সুন্দরী,
ভেটিল মেনকা স্বরগ-দ্বার।"

কিন্তু দ্বার খুলিল না, মেনকা হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। পতিব্রতা রমণীর অন্তিম নয়ন-বিন্দুও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বর্গে গণ্য হইল না! তখন মেনকা হস্তিনার ভীষ্মের বাণী লইয়া স্বর্গদ্বারে উপনীত হইল। সে বাণীটি কি ?

"করিয়াছি পণ জনম মতন
হব ব্রহ্মচারী, বাঁচিতে কখন
হইব না কোন নারীর দাস ;
বসিব না তব আসনে কভু,
ভাইদের তাহা, জানিবে প্রভু।"

শান্তনুর সম্মুখে দাসরাজের নিকট কুমার দেবব্রতের ভীষণ প্রতিজ্ঞা। কি মহান্ আত্মত্যাগ—আজীবন ভোগৈশ্বর্য্যত্যাগের কঠোর প্রতিশ্রুতি, আজীবন ব্রহ্মচারী! ভোগমত্ত দেবতাদের নিকট এই ত্যাগের মহিমা নিশ্চয়ই অমূল্যরত্ন। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া মেনকা স্বর্গদ্বারের দ্বারীর নিকট এই মহিমোজ্জ্বল রত্ন লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু একি ?

"কনকখচিত হীরকভূষণ,
খুলিল না সেই ত্রিদিবতোরণ,—
'এ নহে অতুল রতন, রূপসি,'
কহে দ্বারপাল করুণ স্বরে।"

শ্রীনারায়ণের বামনাবতারে বলি ত্রিভুবন দান করিয়াছিল, সেই দানবীর বলিরাজার কীর্ত্তিরত্ন লইয়া মেনকা স্বর্গদ্বারে উপনীতা, কিন্তু দ্বার খুলিল না। সেই দান অমরের বাঞ্ছিত নয়। সেই দানও অতুলনীয় নয়। এইরূপ স্থান-কালের ব্যবধান, কত যুগ যুগান্তর কোথায় চলিয়া গেল! মেনকা নৈরাশ্যান্ধকারে হতাশ হৃদয়ে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে রত্নের সন্ধানে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সপ্তরথী বেষ্টিত অন্যায় যুদ্ধে নিহত মহারথী অভিমন্যুর বক্ষের রক্ত লইয়া মেনকা স্বর্গদ্বারে চলিয়া গেল। তখন :

"প্রতিহারী পুনঃ সদয়ে কহে,
এ শোণিত কিন্তু অতুল নহে।"

মেনকা নিরুপায় হতাশ হৃদয়ে বাল্মীকির তপোবনে গমন করিল ; মুনি গভীর ধ্যানমগ্ন। মেনকা দেখিল একদিন ধ্যানমগ্ন মুনি—

"দেখেন নয়ন মীলন করি
কিরাত অদূরে ধনুক ধরি।
ক্রৌঞ্চ পাখী এক ভূতলে পতিত,
রোষে দুখে আঁখি হইল লোহিত,
'রক্ষ রক্ষ দেব' বলিতে বলিতে
'মা নিষাদ' এই ঈরিত হইল।"

মেনকা দেখিতে পাইল—

"বিদ্যাধরা বীণা আপনি বাজিল,
হাসিয়ে সারদা মরতে নামিল,
দস্যু-তাপসেরে হরষে বরিল,
ধরায় অসুখ নাহিক আর।"

আবার সাবিস্ময়ে সে দেখিল এই প্রেম-ব্যথিত মহর্ষির কণ্ঠে যাই 'মা নিষাদ' ধ্বনিত হইল, তন্মুহূর্ত্তেই—

"'মা নিষাদ' এই ঈরিত হইল,
স্বরগের দ্বার আপনি খুলিল।

নামিল ভূতলে শতেক পরী,
ভেটিবারে চিরদয়িতা জনে
সম্মিলিয়ে চিত্ররথের সনে,
আসিল ভূতলে উর্ব্বশী সুন্দরী,
চিত্রলেখা আর কত বিদ্যাধরী
পারিজাত-মালে খেলিতে খেলিতে,
মোহিত জগতে মোহিত করি।”

‘মেনকা’র তিন বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধরলাল ‘নলিনী’ নামক আর একটী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই কাব্যে সংসারের দুঃখজ্বালায় দগ্ধ হইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে নায়ক বলিতেছে :

“আছে জগদীশ, তাহা প্রকৃতি লুকায়,
নাই জগদীশ, তাহা মানুষে প্রকাশে ;
কল্পনা কল্পিত করে, কাহারে দেখায়,
নিশির স্বপনে হৃদে কার রূপ আসে।
কে জেনেছে কবে
কোথা আছে জগদীশ কি রূপ তাঁহার ;
উদ্দেশেতে ভক্তিসার, উদ্দেশেতে নমস্কার
উদ্দেশেতে জগদীশে পূজা করি সবে ;
শেষে কে জানে কি হবে।”

ইহা কি যুবা অধরলালের তরুণহৃদয়ের সংশয় উক্তি ? কোথায় ভগবান, তাঁহাকে কে কবে দেখিয়াছে—‘কে জেনেছে কবে ?’

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধরলাল বি-এ পাশ করেন। এই বৎসরেই তাঁহার ‘নলিনী’ ও ‘কুসুমকানন’ এই দুইটী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন তিনি বাইশ বৎসরের যুবক। এই অল্পবয়সে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন বিশেষ ভাবে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ‘কুসুম-কাননে’র ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার ‘মহাবীর’ নামক কবিতাটী বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত। ‘আমি’ অপরাজেয় দুর্ভেদ্য, অপ্রতিহত গতিশীল শক্তি ‘আমি’ দুঃখীর সুখস্বপ্ন, বীরের বীর্য্য ও জয়েচ্ছা, গৃহীর সন্তোষ, পণ্ডিতের জ্ঞানালোক, কবির কল্পনা, ‘আমি’ই সৌন্দর্য্য, কাম আর করুণা। এই “আমি”টী কে ? অধরলাল বলিতেছেন—

“বিজন কাননে
তাপসের মনে
পবিত্র আসনে
পবিত্র ভূষণে
আমিই পরমজ্যোতি করুণানিলয়।”

এই ‘আমি’ই—

“উন্নত শিখরে
গভীর সাগরে,
বিজন প্রান্তরে
অভেদ্য নগরে
বিশাল ভুবন এই মম অধিকার ;
চাঁদের কিরণে
জলদ-গর্জ্জনে
সৌরভ কাননে
চিন্তার ভবনে
মহাবীর আমি, হয় রাজত্ব আমার।”

অনুবাদেও অধরলাল সুনিপুণ কবি। তাঁহার ‘লিটোনিয়ান’ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনের “The Wonderer” নামক ইংরেজী গ্রন্থের ২৮টী কবিতার পদ্যচ্ছন্দে তিনি সুকৌশলে যতদূর সম্ভব মূলানুযায়ী ভাবটি বজায় রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটী কবিতার মূল ও অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

“How firmly hewn from out the inmost heart,
How lightly lifted to the upmost heaven,

The temple rose ! and, ah, by what fond art
With hallow'd names its gracious walls were graven !"

কতই যতনে গড়েছিনু এ মন্দিরে,
হৃদয় হইতে খোদি, উন্নত শিখর
পরশিত ব্যোমতল—অঙ্কিত-প্রাচীরে
কতই পবিত্র নাম হীরক অক্ষর !

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামে চলিয়া যান। ইহাই তাঁহার প্রথম কর্ম্মস্থল। অধরলাল একে ভাবুক ও কবি, তাহাতে আবার চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। নদী পর্ব্বত সমুদ্র ও শ্যামল বিটপিদল এবং গুল্মলতাচ্ছাদিত নিবিড় অরণ্য সব একাধারে বিদ্যমান। পুরাকীর্ত্তি স্থানে স্থানে অনাদরে রহিয়াছে ; হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্ম্মের প্লাবনের চিহ্নরাজি চট্টল ভূমি আজও অঙ্কে ধারণ করিয়া আছে। অধরলাল এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শিবচতুর্দ্দশীর পর্ব্বোপলক্ষে তাঁহাকে সীতাকুণ্ডে রাজকার্য্যে যাইতে হইয়াছিল। তিনি "The Shrines of Sitakund" সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধিৎসা এবং পুরাতত্ত্বের প্রতি গভীর আকর্ষণ দেখা যায়। বাংলার রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ ইহা তিনি পাঠ করেন এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ অধর বাবুর মত ও তথ্যাদি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধরচনায় যে ছত্রিশটী গ্রন্থ শেষাংশে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে সংস্কৃত পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সীতাকুণ্ডের সৌন্দর্য্যে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, উক্ত গ্রন্থে তাহা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বর্ণনা করিয়াছিলেন। উহার অনুবাদ নীচে প্রদত্ত হইল : "পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যশালী স্থান নাই। সৃষ্টিতে যত কিছু পবিত্র ও সুন্দর আছে প্রকৃতি এই স্থানটীকে সেই ভাবে সুশোভিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা দেবতাদের বাসভূমি। সুমহান গিরিশ্রেণী, সুন্দর জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণসমূহ, স্বচ্ছ নদীপ্রবাহ, নিবিড় অরণ্য এবং রাত্রিতে দীপাবলীর মত গিরিশিখরে দাবাগ্নি, অগণিত সুরভিত কুসুমরাশি, গন্ধবাহী মৃদুমন্দপবন এবং বিহগকুলের মধুর কাকলী—যে একবার সেখানে গিয়াছে সে কখনও তাহার অপূর্ব্ব সুষমা ভুলিতে পারিবে না।"

অধর বাবু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই চট্টগ্রাম হইতে যশোহরে বদলী হইয়া আসেন। উহার কয়েক মাস পরেই ১৬ই নভেম্বর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যশোহর হইতে ডেপুটী কালেক্টর হইয়া তিনি ২৬শে এপ্রেল কলিকাতায় আসেন। ইহার প্রায় বৎসরখানেক পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। অধর বাবু তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে "পরমাত্মীয়" বলিয়া মনে করিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

প্রাচীন বাংলার নৌবহর

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ ভারতের নৌবিতান। এই নৌবিতানের সাহায্যে ভারতীয় সভ্যতা ও ভাবধারা বহির্জগতের অন্যান্য সভ্যদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। মানবতার পূজারী রাজর্ষি অশোকের সময় 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া উঠিতে থাকে। বৌদ্ধপ্রচারক-মণ্ডলী নৌবাটের সাহায্যে ভগবান্ তথাগতের উদারবাণী দেশদেশান্তরে প্রচার করিতেন। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ বলেনঃ "When we remember Asoka's relation with Ceylon and even more distant powers, we may credit him with a sea-going fleet as well as an army." ভারতীয় নৌ-গঠন ও বহির্বাণিজ্যের দিগ্দর্শনে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য আমাদের প্রধান উপাদান। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু প্রাচীন সাহিত্যের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা মুশকিল। অধিকন্তু এই অমূল্য গ্রন্থরাজি বৈদেশিক আক্রমণে ভারতের বাহিরে নীত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদেশিক পর্যটক ও ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ হইতে বিস্মৃত প্রাচীন ভারতের নৌবলের অনেক আভাস পাওয়া যায়! Prof. Bhular বলেন "........There are passages in ancient Indian works which prove the early existence of a navigation of the Indian Ocean and the somewhat later occurrence of trading voyages undertaken by Hindu merchants to the shores of the Persian Gulf and its rivers." খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে মিশরীয় সভ্যতার অভ্যুদয় হয়। পিরামিড্ গর্ভে অবস্থিত সমাধি পরীক্ষা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে—মিশরীয়গণ 'মমি'-সংরক্ষণে ভারতীয় মস্‌লিন বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। তাইগ্রীস্ ও য়ুফ্রেতিস্ তীরের সুমেরীয় সভ্যতার সহিত প্রাচীন আর্যভারতের যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। ভূপ্রোথিত মহেন-জো-দাড় ও হারাপ্পার আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে, খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় বাংলার নৌবিতানের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। হাণ্টার সাহেবের মতে খ্রীষ্টপূর্ব আট শত বৎসর পূর্বে কলিংগরাজগণ কর্তৃক সুদূর প্রাচ্যে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। অংগ বংগ কলিংগ শ্যাম ও পুণ্ড্র—এই পাঁচটি রাজ্য লইয়া প্রাচীন কলিংগ সাম্রাজ্য গঠিত। কলিংগপতম্ ইহার রাজধানী ছিল। এই সময় কলিংগ প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। মালক্কা ও সিংগাপুরে বর্তমানে যাহারা ক্লিংস্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে তাহারা ভারতীয় অন্ত্যজজাতি। 'ক্লিংস্' শব্দ কলিংগের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকের মত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথমাদিতে কতিপয় বাংগালী বৌদ্ধ চীন, কোরিয়া ও জাপানে ভগবান অমিতাভের

বাণী প্রচার করিতে গমন করেন। পালবংশীয় নরপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে সবিশেষ বিস্তার লাভ করে। উদ্দন্তপুর ও বিক্রমশিলার সংঘারাম পালগণের বৌদ্ধধর্মানুগের সাক্ষ্য প্রদান করে। বর্তমান বিহারই উদ্দণ্ডপুর নামে প্রসিদ্ধ হয়। পালরাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম সুদূর তিব্বতে বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করে। আচার্য ধর্মপালের নেতৃত্বে একদল বৌদ্ধপ্রচারক ভগবান তথাগতের বাণী প্রচার করিতে তথায় গমন করেন। তিব্বতীয় ধর্ম ও শিল্পের উপর বাঙ্গালীর প্রভাব সবিশেষ বিদ্যমান ছিল। প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে বৌদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুমাত্রা দ্বীপে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত হন। ইঁহার পূর্ব নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সে ইনি বৌদ্ধশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ওদন্তপুরীর মহাসাজ্ঘিক আচার্য শীলরক্ষিত কর্তৃক ইনি দীক্ষিত হন। শীলরক্ষিত তাঁহাকে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধিত করেন এবং তৎকর্তৃক বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত বহু পুস্তক তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। এই জন্য এই বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুর উদ্দেশে কবি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন:

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।"

বাঙ্গালী ভাস্কর্য ও শিল্পকলার প্রভাব তিব্বতীয় বৌদ্ধশিল্পের উপর বিস্তৃত হয়। যবদ্বীপের বোরোবুদুর ও কাম্বোজদেশের অঙ্কোরভাট মন্দির বাংগালী স্থপতির অক্ষয় কীর্তি। বোরোবুদুর মন্দিরগাত্রে যে চিত্রাবলী অংকিত রহিয়াছে তাহাতে বাংগালার নৌবাটের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বাংগালীর বহু প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'মহাবংশ' ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে বাঙ্গালী বীর বিজয় সিংহ সাত শত অনুচরসহ লংকাদ্বীপ জয় করিয়া "সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।" পালযুগের বিখ্যাত বাঙ্গালী ধীমান ও বীটপাল ছিলেন এই সমুদয় ভাস্কর্য শিল্পের জনক। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ধীমান বিরাজ করেন। শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশ-চন্দ্র সেন বলেন: "এদেশের ধীমান্ ও বীতপাল অর্ধ এশিয়ার চিত্রগুরু হইয়া শিল্পজগতে এক অভূতপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন।" বোরোবুদুর সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

"কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন,
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
বিপুল ইঙ্গিতপুঞ্জ পাষাণের সঙ্গীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

* * *

পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে এ তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌন-কণ্ঠে যে বাণী রয়েছে চির স্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র—'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।"

বাংগালীর এই 'বৃহত্তর বংগের' পরিকল্পনা সম্বন্ধে ডক্টর সেন বলেন: "........'পদ্মোৎপল-ঝষাকুলা' শতদীর্ঘিকার পুণ্যতীর্থ—বুদ্ধ, চৈতন্য, পার্শ্বনাথ, দীপংকর, রামকৃষ্ণ, শংকরদেব প্রভৃতি নরদেবতার

পদরজঃপূত এবং বিজয়, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ধর্মপাল, রামপাল, মহীপাল প্রভৃতি সিংহবিক্রান্ত নৃপতিদের কীর্তিভূমি—ধনপতি, চাঁদসদাগর, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বিশ্ব বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্যকেন্দ্র —তুষাম্ফ, ধীমান, বিতপাল, বসন্তপাল, স্থিরপাল প্রভৃতি কীর্তিমান শিল্পীদের নিকেতন ; চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কালীঘাট প্রভৃতি ভারত-বিশ্রুত তীর্থভূমি, জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নব্যন্যায় ও মস্‌লিনের জন্মভূমি—এই মহাদেশই আমাদের বৃহৎ বংগ।" বাংলার এই গৌরবময় যুগের স্রষ্টাদের উদ্দেশে কবি হৃদয়-নৈবেদ্য অর্পণ করিয়াছেন :

"স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভুধরে'র ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম,' মোদের প্রাচীন কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর,
বিটপাল আর ধীমান, যাঁ'দের নাম অবিনশ্বর।"

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমাদিতে পালবংশের শেষ রাজা মদনপালদেবকে পরাজিত করিয়া সেনবংশীয় নরপতি বিজয় সেন বংগদেশে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকটে রাজধানী স্থাপন করিয়া বরেন্দ্রভূমি-বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ তাহার নামকরণ করেন 'বিজয়পুর'। তীরভুক্তি (মিথিলা), কামরূপ, উৎকল, মগধ ও কলিংগ পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। বিজয়সেনের অপরাজেয় নৌবল ছিল। 'পাশ্চাত্য-চক্র' জয় করিতে তিনি নৌবহর প্রেরণ করেন। দেবপাড়া শিলালিপিতে এই বিজয়-অভিযানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :

"পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাবদ্
গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক-
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি॥"

মহাকবি কালিদাস প্রণীত 'রঘুবংশে'র চতুর্থ সর্গে বর্ণিত আছে, রঘুর সৈন্যবাহিনী বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে বাংলার নৌবাহিনী অমিততেজে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া পরাজিত হয় :

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ॥" ৪।৩৬

বাংগালীর এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়যাত্রা সম্বন্ধে ডক্টর বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় বলেন : "........If the early Shaiva cult in the Archipelago and Indo-China originated from South India, the later wave of Mahayana Buddhism should be traced to the influence of Magadha and Bengal........The beautiful temple of Kalasan and many other noble shrines were constructed in Java towards the end of the 8th century by order of the Shailendra kings of Shrivijaya. A short time later rose Borobudur—the most wonderful Buddhist stupa in the world."—India and Java.

বাংগালীর এই গৌরবময় ঐতিহ্য, কীর্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অজস্র নিদর্শন তাহার সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 'পদ্মপুরাণ', 'চণ্ডীমংগল', 'মনসামংগল' প্রভৃতি কাব্যগুলিতে বাংগালীর নৌবিতানের কাহিনী পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী অবলম্বনে বিজয়গুপ্ত 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন। কালকেতু ব্যাধ ও শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী লইয়া 'চণ্ডীমংগল' কাব্য রচিত হইয়াছে। মাধবাচার্য ও কবিকংকণ মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমংগল' রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কবি নারায়ণদেবের পদাংক অনুসরণে ষোড়শ শতকে দ্বিজবংশীদাস 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন। এই সমুদয় কাব্যে তৎকালীন

বাংলার বাণিজ্যগত অবস্থা এবং ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদসদাগর প্রভৃতি বাণিজ্যপটু বণিকগণের নাম জানিতে পারি। 'সপ্তডিংগা মধুকর' একটা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। কবি বিজয়গুপ্ত এই সপ্তডিংগা মধুকরের যে-বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বেশ হৃদয়গ্রাহী ও উপভোগ্য :

"প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
যেই নায় চলিল লক্ষপতি সদাগর ॥
তার পাছে বাওয়াইল নামে বিজুসিজু।
গাঙ্গের দু'কূল ভাঙ্গি বেঁকা করে উজু ॥
তার পাছে বাওয়াইল নামে গুয়ারেখী।
যাহার উপরে চড়ি স্বর্ণলঙ্কা দেখি ॥
তার পাছে বাওয়াইল নামে শঙ্খচূড়।
নদীর দু'কূল ভাঙ্গে পাতালে ঠেকে মূড়া ॥
তার পাছে বাওয়াইল নামে পঙ্খীরাজ।
যে নায়ের উপরে আছে কত বৃক্ষরাজ ॥
তার পাছে বাওয়াইল নামে শঙ্খতালি।
চন্দন-কাষ্ঠেতে তার গুড়া আর ডালি ॥
তার পাছে বাওয়াইল অঞ্জন-কাজল।
বাঁকে বাঁকে রহি খায় শতেক ছাগল ॥"

করোমণ্ডল উপকূল, সিংহল, মালক্কা, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি স্থানের সহিত শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সাতগাঁ এই সময় বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সোনারগাঁ শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয় ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়, তাম্রলিপ্তি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ও বন্দর ছিল। তথা হইতে বণিকসম্প্রদায় সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, চম্পা, কাম্বোজ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাঁহার সময় যবদ্বীপে (জাভায়) ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে সেখানে শাক্যমুনি-প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগের পূর্বেই যবদ্বীপ, চম্পা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দু অধিকার বিস্তৃত হয়। গুপ্তযুগে যবদ্বীপ হিন্দুধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে পালরাজগণের সহিত সুমাত্রা ও জাভার 'শৈলেন্দ্র' রাজবংশের মৈত্রী স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৬৭৩ অব্দে প্রসিদ্ধ চৈনিক তীর্থযাত্রী ই-সিং (I-Tsing) ভারতে আগমন করেন। তিনি বলেন, দশের অধিক এরূপ উপনিবেশে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন এবং হিন্দু আচার-রীতি-নীতি দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু তত্রত্য জনপদবাসীর মধ্যে সংস্কৃতভাষার চর্চা সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। বহু চৈনিক পরিব্রাজক চীনদেশ হইতে জলপথে বরাবর তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করেন। চৈনিক আইনজ্ঞ তাও-লিন (Tao-lin) সমুদ্রপথে যবদ্বীপ ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হইয়া এখানে আগমন করেন। ফা-হিয়েনও এই বন্দরে প্রথমতঃ অবতরণ করেন। পরিব্রাজক ই-সিং এই বন্দর সম্বন্ধে বলেন : "Tamalipti is forty yojanas south from the eastern limit of India. There are five or six monasteries; the people are rich·· ····This is the place where we embarked when returning to China."

বাংলার এই গৌরবময় যুগ আজ আমাদের কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। অনেক প্রগতিবাদী অতীত সম্বন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান, অতীতকে বাদ দিয়া কোন জাতিই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। অতীতের ঐতিহ্যের মধ্যেই জাতির প্রকৃত স্বরূপ নিহিত থাকে। অতীতের মুকুরে আজ বাংগালী স্বীয় মহাজাতিগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি দেখিতে সুরু করিয়াছে। তাই আত্মবিস্মৃত বাংগালী আত্ম-প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা পাইয়াছে বিস্মৃত ইতিহাসের মধ্যে। মিঃ চার্চিল সত্যই বলিয়াছেন : "জাতির

সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইলে উহার সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।" তাই আত্মবিস্মৃত বাংগালীকে লক্ষ্য করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।........বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন বাঙ্গালা মিশর হইতে প্রাচীন অথবা নূতন, বাঙ্গালা নিনেভা ও ব্যাবিলন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন, বাঙ্গালা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। যখন আর্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল।"

প্রাচীন যুগের সুসংহত ও সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক কোন লিখিত ইতিহাস না থাকায় আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু অমূল্য উপাদান আজও হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। শিল্পী, স্থপতি, সাহিত্যিক, মহাকবি, ধর্মাচার্য, দার্শনিক, যাঁহারা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান স্রষ্টা ছিলেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনী ও অবদান সবিশেষ জানিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। আজ ভারত স্বাধীন। সুদূর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের সবিশেষ অবহিত হওয়া একান্ত কর্তব্য।

অ-ধরা

কাব্যশ্রী শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, সাহিত্যসরস্বতী

স্বপনে তোমারে পেয়েছি হে প্রিয়
পেয়েছি গানের সুরে,
তুমি নিশিদিন সকল কর্মে
আছো মোর হিয়া জুড়ে।

মোর চিন্তায়, মোর দুখে সুখে,
নিয়ত জড়ায়ে আছো মোর বুকে,
পরশে তোমার জাগে-শিহরণ
গোপন হৃদয়-পুরে।

পাষাণ-কারার শিলা-বেদী-মূলে
কত জন মরে খুঁজে,
আমি হেরি নিতি মুরতি তোমার
মোর আঁখি দু'টি বুঁজে!

হে বিরাট! তুমি ক্ষুদ্রের রূপে,
সবাকার বুকে আসো চুপে চুপে,
ধরিবারে গেলে দাও না কো ধরা
চ'লে যাও পুন দূরে।

কবি হাফিজের ধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ

কবিবর হাফিজ (শেইখ শমস্-অল্-দীন্ মঃহম্মদ্ ঃহাফিজ্) ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সুফী কবিদের অন্যতম। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে, যখন মোঘল সম্রাট তৈমুরের অভ্যুত্থানবশতঃ পারস্যের সর্ব্বত্র অরাজকতা, হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, সেই সময় হাফিজের ন্যায় কোরানে বিশারদ, জ্ঞানবান ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার সুললিত ও সুমধুর গজল কবিতা দ্বারা পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন ও সমসাময়িক সকলকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি ঘজল্ একটি পুষ্পস্তবক-বিশেষ। ইহার প্রত্যেকটি বয়েৎ (দ্বিপঙ্‌ক্তি) সুফীধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সুফীমতবাদীদিগকে আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিয়াছে। ইহা সকল সময় সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করিবে; অবশ্য গোঁড়া অন্ধ বিশ্বাসীদের সব সময়ই তিনি চক্ষুশূল। তাহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে কাফের বা নাস্তিক বলিতেও দ্বিরুক্তি করে নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ সুফী কবি নুরুদ্দীন্ জামী তাঁহাকে 'লিসান্-অল্-ঘয়িব' ও 'তর্জমান-অল্-অসরার' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই আখ্যাদ্বয়ের অর্থ 'আধ্যাত্মিক রহস্যের বিশেষজ্ঞ ও ব্যাখ্যাকার'। বস্তুতই তাঁহার প্রাণস্পর্শী ঘজল বা প্রেমগীতি সকল দেশের সাহিত্যানুরাগী ও ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার দীবান্ বা কাব্যগ্রন্থের নানা ভাষায় অনুবাদই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কবি হাফিজ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পারস্য-সাম্রাজ্যের শীরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে প্রায় সমসাময়িক বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের সহিত অনেকাংশে তুলনা করা যাইতে পারে। চণ্ডীদাস গাহিয়া গিয়াছেন: 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এত বড় সত্য কথা কয় জন বলিতে পারিয়াছেন? ইহা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তিনিই ত খাঁটি মানুষ! এই সত্য উপলব্ধি করিলে মানুষে মানুষে ঘৃণা-দ্বেষ, ধর্ম্ম নিয়া মারামারি ও কাটাকাটি এবং এক রাজ্যের অন্য রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা কখনই থাকিতে পারে না। হাফিজও গাহিয়া গিয়াছেন—কাহাকেও কোন কষ্ট দিও না, তারপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার; কারণ আমাদের ধর্ম্মে ইহা ছাড়া আর কোন পাপ নাই:

"মবাশ দর্ পায়-ই-আজার্ ব্ হর্ চি খ্বাহী কুন্।
কি দর্ শরীঅৎ-ই-মা ঘঈর্ অজ্ ঈন্ গুনাহী
নীস্ত্॥"

ইহাই প্রকৃত মানুষের ধর্ম্ম। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিবে, তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা করিবে—ইহা কখনই কোন ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না; এই মতবাদ কোন দেশ বা জাতির কৃষ্টির প্রতীক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাই আমাদের সভ্য দেশসমূহ পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সমূল বিনাশের চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টা ফলবতী হওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন মানুষ মানুষকে মানুষ বলিয়া জানিতে পারিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

ধর্ম্মের নামে মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ ও

কলহের মূল কারণ গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা এবং বিশেষ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা। ধর্ম্মের নাম নিয়া সঙ্কীর্ণতা ও হীন মনোবৃত্তির ন্যায় কলঙ্ক আর কি থাকিতে পারে? বস্তুতঃ পৃথিবীর নানা ধর্ম্ম ভগবানকে উপলব্ধি করিবার নানা পথবিশেষ। সকল পথেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, তবে মানুষকে কোন একটা পথ হয়ত নির্ব্বাচন করিয়া নিতে হয়। তাই বলিয়া অন্যের ধর্ম্মকে অবমাননা করিব কেন? কবি হাফিজ এই সম্বন্ধে গাহিয়াছেন: দ্বিসপ্তিতি ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের কলহ ও বিবাদ হইতে অব্যাহতির চেষ্টা কর; কারণ তাহারা সত্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মিথ্যা গল্পের যোজনা করিয়াছে মাত্র—

"জঙ্গ-ই-হফ্‌তাদ ব্ দু মিল্লৎ হমরা 'উজর্ বনিহ্।
চূঁ নদীদন্দ্ ঃহকীকৎ দর্ অফ্‌সনহ্ জদন্দ্॥"

হাফিজ নিজেও কোন বিশেষ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ কবি জামী বলিয়াছেন: "কোন্ আধ্যাত্মিক গুরুর নিকট হইতে হাফিজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা জ্ঞাত না থাকায় তিনি কোন্ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিতে পারি না, তবে তাঁহার কবিতা হইতে ইহা বিশেষভাবে অনুমিত হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিক মার্গের এক জন শ্রেষ্ঠ পথিক ছিলেন। কথিত আছে ৪০ দিন অহোরাত্র নির্জ্জন উপবাস ও সাধনার পর সর্ব্বপ্রথম স্বপ্নাদেশে তিনি ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন এবং ভগবদিঙ্গিতেই ভগবৎপ্রেম মানবসমীপে বিলাইবার জন্য লেখনীধারণ ও প্রেমগীতি গাহিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই ঘটনার উল্লেখ তাঁহার অনেক কবিতায়ই পাওয়া যায়। কবি নিজেই লিখিয়াছেন: আমার লেখনীর সুমধুর ভাবধারা আমার সহিষ্ণুতা ও সুদীর্ঘ আরাধনার পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি।.... সেই দিন আমি পরম জীবন লাভ করিলাম, যখন পার্থিব সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মুক্তির সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম—

"ঈন্ হম শহদ্ ব্ শকর্ কজ সখুনম্ মী রীজদ্।
অজর্-ই স্বরবীস্ত্ কজান্ শাখ্-ই-নবাতম্ দাদন্দ॥
বঃহম্নাৎ-ই-অবদ্ আন্ রূজ রসানীদ্ মরা।
খত্তি-আজদগী অজ্ ঃহস্‌নি মুমাতম্ দাদন্দ্॥"

হাফিজ বৈষ্ণবদের ন্যায় পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি জীবনে শুদ্ধ প্রেমের সাধনাই করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা ভগবৎপ্রেমের নিগূঢ় তত্ত্বই ব্যক্ত করিয়াছে। সুফীদের মতে শুদ্ধ প্রেমই যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়া গুরু বা পীর (ও শেইখ্) রূপে মুরীদ্ বা শিষ্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যিনি সেই শুদ্ধ প্রেমকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অবস্থা বর্ণনাতীত। তিনি সর্ব্ব অবস্থায় পরম সুখ ও শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। কবি গাহিয়াছেন, যিনি শুদ্ধ প্রেমের সাধনাদ্বারা উদ্বুদ্ধ, তাঁহার মৃত্যু নাই—পৃথিবীর ইতিহাসে ভগবদ্‌ভক্তগণ স্থায়ী ভাবে বিরাজ করিবেন:

"হর্‌গীজ্ নমীরদ আন্ কি
দিলশ্ জিন্দ শুদ্ ব-ইশ্‌ক্।
সবৎ-অস্ত্ বর্ জরীদ-
ই-'আলম্ দবা্‌ম্ ই মা॥"

তাঁহার কবিতার ঐশ্বরিক শক্তি সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন: হে হাফিজ, তোমার কবিতা আমাকে জীবনামৃত দান করিয়াছে। যদি শারীরিক ও মানসিক পীড়া হইতে অব্যাহতি চাও, তাহা হইলে পার্থিব বৈদ্যের সাহায্য ত্যাগ কর এবং আমার সুমিষ্ট পানীয়ের আস্বাদ পাইতে চেষ্টা কর—

"ঃহাফিজ্ অজ্ আব্ ই জিন্দগী শর্'-ই তু দাদ্ শর্‌বতম্।
তুর্কি ত্বীব্ কুন্ বিয়া নুস্‌খ-ই-শর্বতম্ ব খ্বান্॥"

অর্থাৎ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া পরমসুখ ও শান্তির চেষ্টা কর।

কোন কোন পণ্ডিত হাফিজের প্রেমকে নিছক পার্থিব প্রেম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুফীমতে ভগবৎস্বরূপ কি সম্যক অবগত নহেন বলিয়াই এইরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ ভগবান ও তাঁহার প্রেম অবর্ণনীয়। ভগবৎস্বরূপ ও তাঁহার প্রেমের গভীর তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা কথনই সম্ভব নহে। যিনি সেই প্রেমের আভাস পাইয়াছেন, তিনিই কেবল তাঁহাকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; এই প্রেম ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। যখন কোন ভক্ত ভগবৎপ্রেম দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন, তখন তিনি এমন অবস্থায় পৌঁছিবেন, যাহা সকল পার্থিব সুখের অনেক উর্দ্ধে; এই অবস্থায় তিনি আর কামনা বাসনায় কখনই জড়িত হইবেন না। কবি হাফিজের কবিতায়ও এইরূপ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে: হে হাফিজ, যদি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে চাও, তবে তাঁহার চিন্তায় মগ্ন থাক; তাঁহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিও না। যখন তুমি তাঁহার দর্শন লাভ করিবে, কেবল তখনই এই পৃথিবী ও ইহার আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে—

"হুজূরী গর্ খ্বাহী অজ্ ঘয়েব্ মশ্ হাফিজ্।
মত্'মা তল্‌ক মন্ তহব দ'অদ্‌নিয়া ব্
অমহিল্ হা॥"

বস্তুতঃ ভগবৎসৌন্দর্য আমাদের এই পার্থিব ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তিনি যে আমাদের খুবই আপন. "আমরা তাঁহা হইতে উদ্ভূত এবং পরে তাঁহার সহিতই মিলিত হইব" (কোরান)। আমরা তাঁহারই বাহ্যিক প্রকাশ-মাত্র। সকল জীবই যে প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ। মানুষ যদি ভগবদনুরাগী হয়, তাহা হইলে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত থাকে। তখনই সে পরম আনন্দ লাভ করে। এই অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য, ভগবৎপ্রেম লাভ করিবার জন্য ভগবদ্-বর্ণনায় (অবশ্য এইরূপ সকল বর্ণনাই আংশিক ভাবে সত্য) আত্ম-নিয়োগ করা দরকার। ভগবান্ আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই পৃথিবী ও মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু যত দিন আমরা নশ্বর সুখ-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট থাকিব, তত দিন ভগবৎ-প্রকাশ সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। যখন আমরা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিব যে তাঁহা হইতেই আমাদের সত্তা, তখনই বলিতে পারিব তিনিই কেবল বিদ্যমান, তাঁহা ছাড়া আর কেহ বা কিছু নাই। কবি গাহিয়াছেন: ভগবান্ আমাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের কাঙ্গাল নহেন; সেই পরম সৌন্দর্য্যময় মুখের বাহ্যিক আকৃতি, বর্ণ, তিল বা চিক্কণ ভ্রূর কি প্রয়োজন? ইউসুফের ক্রমবর্দ্ধমান রূপ সন্দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাঁহার প্রেমই জুলেখাকে আকৃষ্ট করিবে। সুতরাং সৃষ্টিরহস্য জানিবার চেষ্টা না করিয়া ভগবৎ-প্রেম ও চারণের গান গাহিয়া যাও; কারণ এই পার্থিব জ্ঞান দ্বারা সৃষ্টিরহস্য কখনই উদ্‌ঘাটিত হয় নাই বা হইবে না—

"হদিস অজ্ মুত্রিব্ ব্ ময় গো ব্ রাজ-ই-
দহর্ কম্‌তর্ জো।
কি কস্ নকশূদ্ ব্ নকশদ্ বহিক্‌মৎ ঈন্
মু'অম্মরা॥"

সুফী-সাহিত্যের জুলেখা ও ইউসুফ বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের সহিত তুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণের পরমরূপ রাধাকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই যেন সৃষ্ট হইয়াছিল। ইউসুফের অপূর্ব্ব রূপও জুলেখাকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই যেন তাহার নয়নপথে আসিয়া উপস্থিত

হয়। শ্রীরাধা বৈষ্ণব-সাহিত্যে ভক্তের প্রতীক, আর শ্রীকৃষ্ণ সেই পরম পুরুষ। সুফী-সাহিত্যে ইউসুফ-জুলেখার বর্ণনাও তদনুরূপ দেখা যায়।

সুফীমতে আত্মদর্শন হইলেই সৃষ্টিরহস্য উপলব্ধ হইবে। আত্মদর্শন করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুর নির্দ্দেশানুযায়ী ভক্তিমার্গ বা তরীকৎ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। কবি বলিতেছেন: হে আত্মা, গুরুর আদেশ মানিয়া চল, কারণ ভাগ্যবান ব্যক্তিরা জ্ঞানী ও বৃদ্ধের উপদেশ নিজের জীবন হইতেও প্রিয়তর মনে করিয়া থাকেন। সকল শিষ্যেরই কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের গুরুর আদেশ স্থির বিশ্বাসে অনুসরণ করা উচিত; কারণ শিষ্যের উপযুক্ত শিক্ষার জন্যই ভগবৎকর্ত্তৃক তিনি প্রেরিত হইয়া থাকেন। কবি বলিয়াছেন: হে গুরু, তুমি আমাকে মন্দ বলিয়াছ, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট। তুমি আমার মঙ্গলের জন্যই বলিয়াছ—

"বদম্ গুফ্‌তী ব্ খর্সন্দম্ 'অফকাল্লা নিক্ গুফ্‌তী।
জবাব্ ই তলখ্ মীজীবদ্ লবি-ল'ল্-ই শকর্ খারা॥"

সুফীদের পরমদয়ালু ও ক্ষমাশীল ভগবানের বর্ণনা অতি সুন্দর। কবি বলিয়াছেন: যদি ভক্তের পদস্খলনের কোন ক্ষমাই না থাকে তবে আমাদের প্রতিপালকের দয়ার কি অর্থ হয়?

"সহ্ ও খত্বায়-বন্দ অগর্ নীস্ত্ 'ইতি বার।
ম'নী-ই-'অফ্‌ব্ রঃহমৎ ইপরবর্দ্দগার্ চীস্ত্॥"

বস্তুতঃ পরমদয়ালু ভগবান সকল সময় আমাদিগের ক্রমোন্নতির চেষ্টাই করিতেছেন। তিনি সকল সময়ই আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আসিতেছেন; এবং ক্রমশঃই আমরা পবিত্র ও পাপহীন হইয়া ভগবদুপলব্ধির পথেই অগ্রসর হইতেছি। যদি আমরা এই পথে অগ্রসর হইতে না পারি, তাহা হইলে ভগবানকে দোষ দিবার কিছুই নাই। আমাদের মনশ্চক্ষু হইতে পাপকালিমা দূরীভূত হইতেছে না বলিয়াই ভগবৎ-জ্যোতির শুভ্র আভা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইহার জন্য সময় দরকার। আবার তিনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বজ্ঞান দিতে পারেন। আমাদের তাঁহার নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপযুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। এই বিষয়ে কেমন সুন্দর ভাবে কবি বলিতেছেন: যদি বন্ধু আমাদের সঙ্গে একত্র না বসেন, তাহা হইলে রাগান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ তিনি আমাদের প্রভু, সদানন্দময়—

"ইয়ার্ অগর্ ননিশস্ত্ বা মা নীস্ত্
জায়-ই-'ইতিবার্।
পাদ্‌শাহি কাম্‌রান্ বুদ্ অজ্
গদায়ান্ 'আর্ দাশ্‌ত্॥"

হাফিজের কবিতা শুদ্ধ প্রেমদ্বারা ভগবান লাভের উপায় বর্ণনা করিয়াছে। এখানে কোন ধর্ম্মের ভান বা ধর্ম্মের নামে প্রতারণা বা চালাকির স্থান নাই। যে আত্মোৎসর্গ দ্বারা ভগবানকে ভালবাসিতে পারিবে, এবং তাঁহার জন্য সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত, সেই কেবল ভগবান বা প্রেমাস্পদের প্রিয় হইবার উপযুক্ত। ধর্ম্মের নামে চালাকি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন: ভণ্ডামি ও প্রতারণার আগুন ধর্ম্মের গোলাঘরকে অবশ্যই ভস্মীভূত করিবে; হাফিজ, এই দরবেশী পোষাক পরিত্যাগ কর ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও—

"আতিশ্-ই-জ্‌রক্ ব্ রিয়া
খর্‌মন্-ই-দীন্ খ্‌াহদ্ সুখ্‌ৎ।
ঃহাফিজ্, ঈন্ খর্‌ক-ই-পশ্‌মীন্
ব-অন্দাজ্ ব্ বরু॥"

হাফিজ কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাই করেন নাই,

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও অমায়িক ছিলেন। তাঁহার জীবনযাত্রা অতি সরল ছিল। তিনি সর্ব্বদা অতি অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অনেক রাজা মহারাজা হইতে তিনি যথেষ্ট আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতেন না এবং পার্থিব জাকজমক হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। ভগবৎপ্রেমের জন্য তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং তাহার ফলেই তাঁহার সাংসারিক দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনি সেইজন্য কখনও দুঃখ করেন নাই, পরন্তু পৃথিবীর ধনসম্পদকে সব সময় ভগবৎপথের বাধা বলিয়াই গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন: এই ক্ষণস্থায়ী সংসার হইতে কোন প্রতিদানের আশা করিও না। এই গোলাপের স্মিতহাস্যের (পার্থিব ধনসম্পদের) উপর নির্ভর করার কোন অর্থ হয় না। হে বুলবুল (ভগবৎপ্রেমিক), তাই ক্রন্দন কর, কারণ ইহা (পৃথিবী) ক্রন্দনেরই স্থান—

"নিশান্-ই-'আহদ্-উফা
নীস্ত দর্ তবস্সুম্-ই-গুল্।
বনাল্ বুলবুল্ ই-বীদীল্ কি
জায়-ই-ফরিয়াদ্ অস্ত্।।"

সুফীদের মতে এই কুটিল সংসার অর্থাৎ পার্থিব আবহাওয়া প্রেমাস্পদকে আমাদের নিকট হইতে দূরে রাখে। আবার, এই পৃথিবীই ভগবানকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ স্থান। যখন কেহ তাঁহাকে লাভ করিবে, তখন তাহার নিকট স্বর্গীয় সুখ অতি তুচ্ছ। সুফীদের মতে স্বর্গ ও নরক ভগবৎপথে উন্নীত হইবার অথবা ভগবৎপথ হইতে বিচ্যুত হইবার দুইটি উপায়মাত্র। ভগবৎসান্নিধ্য মানববর্ণনার বাহিরে। কবি কেমন সুন্দরভাবে সেই অবর্ণনীয় অবস্থার বর্ণনা করিতেছেন: তোমার মিলন-উদ্যান হইতে স্বর্গীয় উদ্যান জ্যোতি প্রাপ্ত হয়, তোমার বিরহযন্ত্রণা নরকযন্ত্রণা হইতেও অধিকতর কষ্টকর—

"জি রাঘ্-ই-বস্ল্-ই-তূ ইয়াবাদ্ রিয়াজ্-ই-
রিজ্বান্ আব্।
জি তাব্-ই-হিজ্রি তূ দারদ্ শরার্-ই-
দোজখ্ তাব্।।"

প্রত্যয়

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

জানি তুমি
পথপ্রান্তে রহ বসি
পথিকের গতি সদা
কর নিরীক্ষণ।
তবু মোর মন
কোলাহলে মেতে রহে সদা,
পথপ্রান্তে চাহে না কখন।
কোলাহলে ঘাতপ্রতিঘাতে
সরে আসি যবে
পথের আড়ালে,
তুমি এসে ধরো মোরে।
দু' বাহু বাড়ায়ে
কর আলিঙ্গন—
প্রেমে মোর ভরে যায় মন
সেই শুভক্ষণ
এনে দেয় দু'জনার মাঝে
একাত্মের নিবিড় প্রত্যয়।

কদলী-রাজ্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে কদলী-রাজ্য একটি বিখ্যাত স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এ সম্বন্ধে বাংলা গীতিকাব্যগুলির মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের 'গোরক্ষবিজয়', ঢাকা সাহিত্য পরিষদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'ময়নামতীর গান', 'মীনচেতন' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কদলীরাজ্যের অন্য নাম নারীরাজ্য। ইহা সমগ্র নাথ-সম্প্রদায় এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটও সুপরিচিত। গীতিকাব্যগুলিতে কদলী-রাজ্যের যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে জ্ঞাত হয়ঃ

" * * এহি রাজ্য বড় হএ ভালা।
চারিকড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা।
লোকের পিধন পাটের পাছড়া।[১]
প্রতিঘর চালে দেখে সোণার কোমড়া॥
কার পথরির পানি[২] কেহ নাহি খাএ।
মণি-মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখাএ॥

*　　*　　*

স্থানে স্থানে দেখে সব অমরা নগর।
সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর॥
সুবর্ণের ঘর সব পতাকা রচিত।
সকল দেশের লোক রত্তনে ভূষিত॥
রাজ্যের সকল দেখে তার ভাল রঙ্গ।
প্রতিঘর দ্বারে দেখে হিরণ্যের টঙ্গ॥
ধন্য ধন্য রাজনগর করিয়া বাখানি।
সুবর্ণের কলসে সর্ব্বলোকে খাএ পানি॥"

—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'গোরক্ষবিজয়' ৫৫-৫৬ পৃঃ

কদলীরাজ্য সুজলা, সুফলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল। এখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক। সে তুলনায় পুরুষের সংখ্যা নগণ্য ছিল। প্রতি পুরুষের গৃহে দুই চারজন স্ত্রী থাকিতেন। ষোল শত নারী লইয়া কদলীরাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ছিল। কমলা ও মঙ্গলা নামক দুই বোন ইহার সিংহাসনাধিকারিণী ছিলেন।

পরমসিদ্ধা মীননাথ তদীয় শিষ্য গোরক্ষনাথ সহ কদলীরাজ্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া এই রাজ্যের রূপলাবণ্যবতী কমলা ও মঙ্গলার প্রেমজালে নাথযোগী মীননাথ আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। গোরক্ষনাথ বহু চেষ্টাতেও স্বীয় গুরু মীননাথকে জাল-মুক্ত করিতে না পারিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে মীননাথ নারীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সিদ্ধি হারাইলেনঃ

"ধরিয়া ব্রাহ্মণ রূপ কদলীতে জাএ।
একদিষ্টে কদলীর সভা সবে চাএ॥

গোরক্ষবিজয়, ৫১ পৃঃ

ষোল'শ কদলী আইল করি নানা সাজ।
বসিলেক চারি পাশে মীনে করি মাঝ॥"

গোরক্ষবিজয়, ১৫৬ পৃঃ

১ পাছড়া—কাপড় অর্থে অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত।

২ পুষ্করিণীর জল।

এই কদলীরাজ্যের স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পণ্ডিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গবেষণার গহন বনে প্রবেশ করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আসামের প্রাচীন কাছাড় জেলাই যে সে কদলীরাজ্য, আমরা এস্থলে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুমান—স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ কামরূপ, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশই কদলীরাজ্য।[৩] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার বলেন—এ রাজ্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোথাও হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।[৪] প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রীয়ার্সন বলেন, ডেরাডুন হইতে আরম্ভ করিয়া হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম এবং ইহার উত্তরে হিমালয় প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই কদলীবন।[৫] একটি নারীরাজ্য তিব্বতের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল। গরবাল ও কুমায়ুনের মধ্য দিয়া যে পাঁচটি গিরিপথ ভোটরাজ্যাভিমুখে গিয়াছে নারীরাজ্য তাহার প্রান্তভাগে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে এখানে পূর্বে নারীরাই রাজত্ব করিত।[৬] তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত "পাগ্ স্যাম জোন্ব জান্" গ্রন্থে ও কদলীক্ষেত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে আছে বঙ্গেশ্বর গোপীচাঁদ সিদ্ধা বালপাদকে (সিদ্ধা জালন্দর বা হাড়িপানাথ) জীবন্ত অবস্থায় মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিলেন। বার বৎসর পরে হাড়িপার শিষ্য কানুপা সিদ্ধা বা কৃষ্ণাচার্য্য কদলীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে স্বীয় গুরুকে মুক্ত করেন; পরে গোপীচাঁদ হাড়িপা সিদ্ধার নিকট দীক্ষিত হইয়া বনে যান।[৭] গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী সিদ্ধা গোরক্ষনাথের শিষ্যা। এই মাতাপুত্রের কাহিনীই বহু গীতিকাব্যের উপজীব্য। মহাভারতেও কদলীক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। নানকরচিত 'প্রাণসংগলী' গ্রন্থের ৩১শ অধ্যায়ে কজরী বনের বিবরণ দেখা যায়। শিখগুরু নানক যোগতন্ত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহাতে নাথ-গুরুদের বন্দনা করিয়াছেন।[৮] মহাভারতে এবং বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' স্ত্রীরাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'বিশ্বকোষ' এবং 'সন্তলীলামৃতে' নারীরাজ্যের বিবরণ আছে। 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে' কোদালি শহরের বিবরণ পাওয়া যায়। এসব কদলীরাজ্যের বা নারীরাজ্যের নামান্তর। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র আচার্য্য বলেনঃ "মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগমার্গভ্রষ্ট হইয়া নারীরাজ্যের অধীশ্বরী রাণী প্রমীলার প্রেমাস্পদ হইয়া পড়েন।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী—পৌষ, ১৩২৯) গুরুমুখী ভাষার "গোরক্ষ-অবদেশে" আছে গোরক্ষনাথ কামাখ্যা গিয়া অনেক শিষ্য করেন। 'গোবিন্দচন্দ্র গীতে' দৃষ্ট হয় কদলী বন কামরূপের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। কদলীতে প্রেমাবদ্ধ মীননাথকে উদ্ধার করার জন্য সিদ্ধা গোরক্ষনাথ তথায় গিয়াছিলেন। এই কদলীরাজ্যের রাজধানী কদলী নগর। অধিবাসীরা পর্য্যন্ত কদলী নামে খ্যাত। এরাজ্যে নাথসম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা অধিক ছিল। এখানকার পুরুষদিগকে

৩ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের 'ময়নামতীর গান'—১২২ পৃঃ, পাদটীকা ৩

৪ Social Life in Ancient India, pp -60

৫ প্রবাসী, ফাল্গুন ও চৈত্র—১৩২৮, 'নাথপন্থ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬ বিশ্বকোষ—১০ম ভাগ, ৫৫ পৃঃ, 'নারী'শব্দ দ্রষ্টব্য।

৭ J. R. A. S. of Bengal 1898, Part I, page 20. Rai S. C. Das's Note on Antiquities of Chittagong. Compiled from Pag Samjon Jhan of Sumpa Khanpo and Kahbab Dundan of Lama Taranath.

'রার্ডল' বলা হইত। এখানকার মেয়েরা 'চিকন সুতি' কাটিয়া 'পাটের পাছড়া' ও ধুতি বুনিত, এবং তাহা হাটে নিয়া বিক্রয় করিত। তাহারা সুবর্ণের বাটা ভরিয়া তাম্বূল খাইত। এই রাজ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মগ্য প্রদান করিয়া সম্মান করা হইত।

আসাম পূর্ত্ত বিভাগের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয় তৎপ্রণীত গ্রন্থে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে আসামের নওগাঁ জেলার 'কন্দলী'ই প্রাচীন কদলীরাজ্য এবং কমলা দেবী পর্ব্বতই এ রাজ্যের রাজধানী ছিল। নওগাঁ জেলার নওগাঁ শহর হইতে এগার মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে কন্দলী নামক একটি মৌজা আছে। ডবকা ও কন্দলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ২৫৪৬ ফুট উচ্চ কমলা দেবী পর্ব্বত আছে। কন্দলী মৌজার স্থানে স্থানে প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন এবং হরপার্বতীর মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় জনসাধারণ আজও এই পর্ব্বতকে ভক্তিবিমিশ্র ভীতির সহিত প্রণাম করিয়া থাকে। 'কালিকা-পুরাণে'র (বঙ্গবাসী, ৭৯।১৬৫) কমলা দেবীর স্থানকে রক্ত দেবীর পীঠ বলা হইয়াছে। কন্দলী পর্ব্বতের অপর অংশের নাম বামুনী পর্ব্বত। এখানে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত, প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ও গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। কন্দলী ও বামুনী পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী মিকির পাহাড়ে আজও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চন্দন পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা এ স্থানের চন্দন দেশবিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকেন। এখানকার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও চার কড়ায় একতোলা চন্দন কাষ্ঠ পাওয়া যায়। কন্দলী মৌজার নিকটবর্ত্তী দীঘলদড়ি, ননই, পেটভরা প্রভৃতি গ্রামে বহু নাথযোগীর বাস। উহারা বর্ত্তমানেও 'পাটের পাছড়া' তৈরী করিতে সিদ্ধহস্ত এবং নারীরা পাটের 'চিকন সুতি' কাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। সে অঞ্চলে পাটের সুতার পোকার চাষ নাথযোগী জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি করে না বা করিতে জানে না।[৮] খ্রীষ্টীয় ১৪-১৫শ শতাব্দীতে কন্দলীর বিশিষ্ট অধিবাসিগণের পদবী 'কন্দলী' ছিল। অনন্ত কন্দলীর মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ সুপরিচিত; মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ অসমীয়া ভাষার অমূল্য সম্পদ। কন্দলী মৌজায় মাধব কন্দলীর বাড়ী এখনও আছে। নওগাঁবাসীরা একটু আনুনাসিকত্বপ্রিয়, তাঁহারা বহুলা আতা নামক বৈষ্ণব গুরুকে 'বন্দুলা আতা' বলেন, বাদুলীকে (বাদুড়) বান্দুলী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট যে প্রাচীন কদলী কন্দলী হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

গুরু গোরক্ষনাথ কদলীপ্রেমাসক্ত মীন-নাথকে উদ্ধার করিয়া কদলীরাজ্য ত্যাগকালে শাপ দিয়াছিলেন:

"মুখে খাও মুখে বর্হ মুখে জাও সঙ্গ।
গোর্খের শাপেতে উঠ হইয়া পতঙ্গ॥
বিক্ষে'র ফলমুল বসি,কর পান।
এহি শাপ দিল তোরে করি সমাধান॥
এ বলিয়া জতি নাথ হাতে দিল তুড়ি।
বাদুড় হইয়া সব কদলী গেল উড়ি॥"

গোরক্ষবিজয়, ১৯৭ পৃঃ

কন্দলী চা বাগানের তিন মাইল দূরে ঈশান কোণে পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপরিভাগে বাদুলী কুরুং নামক একটি গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কঠিরাতলী-আমলকী

৮ কন্দলীর পাটের সুতা আজকাল ও বিখ্যাত—District Gazetter, Nowgong, Page 144 দ্রষ্টব্য।

সরকারী রাস্তা হইতে দেড় মাইল দূরে। গুহাটি শিলাময় পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবস্থিত। সম্মুখ ভাগে বৃহৎ প্রস্তর যেন গুহার প্রাচীরের কাজ করিতেছে। গুহার ভিতর খুব প্রশস্ত এবং ঘোর অন্ধকারময়। এই গুহার ভিতরে লক্ষ লক্ষ বাদুড় বাস করিতেছে। মানুষের আগমনের শব্দ পাইলে ইহারা বিচলিত হইয়া হৈ চৈ করে। স্থানীয় জনসাধারণ গুহাটিকে দেবস্থান বলিয়া সম্মান করে এবং বাদুড়গুলিকে গোরক্ষনাথের শাপভ্রষ্ট কমলার আশ্রিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

বাংলা গীতিকাব্যে কদলী-রাজ্যের যে সব বিবরণ পাওয়া যায়, সে সব বিবরণের সহিত বর্ত্তমান কন্দলীর বিবরণের বেশ সাদৃশ্য আছে। অতএব নওগাঁ জেলার বর্ত্তমান কন্দলীই যে প্রাচীন কদলী রাজ্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। ডক্টর শহীদুল্লাহ অনুমান করেন, কাছাড় জেলাই কদলী রাজ্য। তাঁহার অনুমানের যথেষ্ট মূল্য আছে। কারণ প্রাচীন কাছাড় জেলা বর্ত্তমান নওগাঁ জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যে কন্দলীকে শ্রদ্ধেয় রাজমোহন বাবু এবং আমরা কদলী রাজ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে কন্দলী প্রাচীন কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিবসাগর জেলার গোলাঘাট মহকুমা এবং কোহিমা (নাগাপাহাড়) প্রাচীন কাছাড়ের সহিত যুক্ত ছিল।

কৃষ্ণদাস বাবাজী (কাহারও কাহারও মতে লালদাস বাবাজী) হিন্দী 'ভক্তমাল গ্রন্থ' ও তাহার টীকা অবলম্বনে বাংলা 'ভক্তমাল গ্রন্থ' সম্পাদন করেন। তাহাতে সিদ্ধা মীননাথের রাজত্বলাভের বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে আছে মীননাথ ও গোরক্ষনাথ ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও অবৈষ্ণব রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজার দাম্ভিকতা ও বিষয়মত্ততা দেখিয়া মীননাথ সেখানে থাকিয়া রাজাকে সৎপথে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ এই অবৈষ্ণব রাজার রাজ্যে থাকিতে চাহিলেন না। মীননাথ—

"রাজার সহিত রাজ বিষয়ী হইলা।
রাজা নিজ কন্যা তারে বরণ করিলা॥
গোর্খনাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলা।
ছাড়াইতে না পারিয়া পলাইয়া গেলা॥

*   *   *

কতক দিবসে রাজ্যে কাল প্রাপ্তি হইলা।
মীননাথ রাজ সিংহাসনেতে বসিলা॥
রাজ্য মত্ত হৈলা এক পুত্র জনমিল।"

ভক্তমাল গ্রন্থ

মীননাথ কোন্ রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন উক্ত গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। বিবরণ বিচার করিলে মনে হয় ইহা কদলীরাজ্য হইবে।

স্বীয় গুরুর অন্বেষণে গোরক্ষনাথ আবার সে রাজ্যে আসিলেন। গোরক্ষনাথের উপদেশে মীননাথের সুমতি জন্মিল। তিনি বলিলেন—

"আরে গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু।
আপনার মুখেতে অনল জ্বালি দিনু॥
ধিক ধিক মোরে এবে কি করিব কহ।
গোর্খ নাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ

গোরক্ষনাথের প্রস্তাবে মীননাথ সম্মত হইলেন এবং কিছু ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। অনাবশ্যক বোধে গোরক্ষনাথ পথিমধ্যে গুরুর অজ্ঞাতসারে এসব ধন ফেলিতে ফেলিতে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ মীননাথ বলিলেন—

"হারে গোর্খা কি করিলে এহেন পদার্থ।
টানিয়া ফেলিলি সব বহুমূল্য অর্থ॥"

তখন—

"গোর্খনাথ কহে প্রভু এ কোন পদার্থ।
আমি বুঝি এতো মাত্র কেবল অনর্থ॥
অতি তুচ্ছ দ্রব্য এত প্রস্রাব করিতে।
ইহা হইতে উত্তম নিকশে কত মতে॥"

তদুত্তরে ক্রোধান্বিত স্বরে—

"মীননাথ কহে গোর্খা প্রলাপ কি কহ।
মণি মুক্তা ঝরে তব প্রস্রাবের সহ॥
গোর্খ নাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে।
এত কহি প্রস্রাব কর করয়ে ধীরে ধীরে॥
মণি মুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল।
মীননাথ দেখি আপনারে ধিক দিল॥"

এসব দেখিয়া সিদ্ধা মীননাথ নিজের শোচনীয় অধঃপাতের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়া—

"আরে গোর্খা তুঞি মোরে উদ্ধার করিলি।
শিষ্য হইয়া গুরুবৎ কার্য্য যে কৈলি॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গোরক্ষবিজয়ে'র বিবরণে দেখা যায় মহামায়াকে দেখিয়া মীননাথের মনে কুভাবের উদয় হওয়ায় দেবী শাপ দিলেন—

"এবমস্তু বলি দেবী পাইলা এহি বর।
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্বর॥
ষোল শত নারী লয়ে তুমি কর কেলি।
কদলীর রাজা হইয়া ঝাটে যাও চলি॥"

দেবীর শাপে মীননাথ কদলীতে গেলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্ম প্রচার করা, কিন্তু সেখানে গিয়া নারীমায়া-জালে পড়িয়া তিনি সিদ্ধি হারাইলেন। জপতপ দূরে গেল, মীননাথ ভোগ-বিলাসে মাতিয়া উঠিলেন। মীননাথের অন্বেষণে সিদ্ধা গোরক্ষনাথ সে রাজ্যে গেলেন। সেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। গোরক্ষনাথ নর্ত্তকীর বেশে তথায় গিয়া—

"নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর।
মাটীতে না লাগে পদ আলগ উপর॥
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাগরীর রোলে।
কায়াসাধ কায়াসাধ মাদলী হেন বোলে॥
হাতের ধমাক নাচে পদ নাহি লড়ে।
গগন মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চারে॥"

গোরক্ষবিজয়

মীননাথ নাচগানে একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু—

"মাদলের তাল শুনে ভোলে মীন রায়ে।
মাদলের বায়ে কেনে গুরু মোরে কহে॥
নাট করে নাটুয়া তাল বহে ছলে।
তোহ্মার মর্দিলে কোন গুরু গুরু বোলে॥
এক শিষ্য আছে মোর যতি গোরখাই।
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই॥
দুই শিষ্য আছে মোর আমি জানি ভাল।
তুহ্মি কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে॥"

গোরক্ষবিজয়

সায়ণাচার্য্য-কৃত "শঙ্করবিজয়ম্" গ্রন্থের ৯ম অধ্যায়ে দেখা যায় শঙ্করাচার্য্য কোনও মৃত রাজার শরীরে প্রবেশকালে তাঁহার শিষ্য সনন্দন তাঁহাকে একটি প্রাচীন ইতিহাস বলিয়াছিলেন। তাহা এই—পূর্ব্বকালে মৎস্যেন্দ্র (মীন) নাথ নামক এক যোগী আপনার শরীর রক্ষা করিবার জন্য আপনার শিষ্য গোরক্ষনাথকে আজ্ঞা দিয়া কোনও এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করেন। যোগী সিংহাসনে আরোহণ করার পর প্রজাবর্গের মঙ্গল হইতে লাগিল। সুবিজ্ঞ সচিবমণ্ডলী নৃপশরীরে কোনও এক দৈবশক্তি প্রবিষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে বশীভূত করার নিমিত্ত নারীগণকে আদেশ করেন। তাহাদের সুললিত সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়াদিতে সংলগ্নচিত্ত থাকিয়া মুনিবর সমাধি

বিস্মরণপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

সাহিত্যাচার্য্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন: "পার্ব্বতী শিবের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মায়ার নিকট যোগার সাধনা কোন ছার! অন্যান্য যোগীরা রূপের জালে পড়িয়া ধৃত হইলেন; মীননাথ স্বয়ং মীনের মত জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট পার্ব্বতীর উচ্চশির হেঁট হইল। গোরক্ষনাথ কিরূপে নর্ত্তকী সাজিয়া কদলীপত্তনে তাঁহার গুরুকে উদ্ধার করেন, মৃদঙ্গের ধ্বনিতে গুরুর উদ্বোধন কিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, 'কায়াসাধ' উপদেশ বারংবার মৃদঙ্গ হইতে ধ্বনিত হইয়া কিরূপে কদলীপত্তনের রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল তাহা পাঠক নিজে পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবেন" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন—

"হে গুরু গোরক্ষনাথ, মোহমুগ্ধ গুরুর পতনে
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তব দীর্ঘ তাপসজীবনে,
মহাজ্ঞান হতে তাই ঢের বড়! বিরূপা শক্তির
পাষাণ হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিলে বাৎসল্যের ক্ষীর।

* * *

মনে জাগে সেই চিত্র, যত্নভরে ধরি দুটি হাতে
পঙ্কিল পল্বল হ'তে উদ্ধারিছ গুরু মীননাথে।
গুরু হতে শিষ্য বড় এই সত্য জাগে তার সনে,
জগতের জ্ঞানালোকে যুগে যুগে ক্রম-বিবর্তনে,
শিষ্যপরম্পরা-ক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়,
শিষ্যধারা মগ্নপ্রায় ভগ্নজানু গুরুরে বাঁচায়।
শ্রান্ত হয়ে গুরু যদি ব্রতভঙ্গে সুখশয্যা গত,
শিষ্য করে উদ্‌যাপন গুরুত্যক্ত অসমাপ্ত ব্রত।"

(ভারতবর্ষ—কার্তিক, ১৩৫০)

জ্বালাও হৃদয়খানি

শ্রীশান্তশীল দাশ

রুদ্র তোমার বহ্নি-শিখায়
জ্বালাও হৃদয়খানি;
ঘুচাও মনের মলিনতা,
ঘুচাও মনের গ্লানি।

বাসনা মোর বারে বারে,
নিয়ে যে যায় অন্ধকারে,
আঁধার মাঝে পাই যেন গো
তোমার আলোর বাণী।

এই ধরণীর দিকে দিকে
কতই কোলাহল;
মিথ্যে মায়ার মোহে আমায়
করে যে চঞ্চল।

তোমার বজ্র বাঁশীর সুরে,
হৃদয় আমার থাকুক্ জুড়ে,
আসন হ'তে নামাও আমায়
পথের ধুলায় টানি'।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

কাশীধামে পাঁড়ে হাউলীর বাড়ীতে অবস্থান-কালে এক দিন বেলা প্রায় একটা দেড়টার সময় জনৈক ভক্ত সদর দরজার কড়া নাড়া দিতেই লাটু মহারাজ উপর হইতে বলিয়া উঠিলেন—"কে ও?" নীচ হইতে উত্তর আসিল—"আমি রামেশ্বর, রেঙ্গুন হ'তে আসছি।" মহারাজ ইহা শুনিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং জনৈক সেবককে আদেশ করিলেন—"ওরে, রামেশ্বর এসেছে, শীঘ্র দোর খুলে দে।" বহুকাল পর সন্তান দূরদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মাতা-পিতার মন যেরূপ স্নেহ ও আনন্দ মিশ্রিত ব্যস্ততায় ভরিয়া উঠে, মহারাজের প্রতিটি কথায় ও হাবভাবে সেইরূপ ভাব দেখা যাইতে লাগিল। ভক্তটি ইহার পূর্ব্বে এইরূপ স্নেহমাখা সম্ভাষণ কাহারও নিকট হইতে পান নাই। তিনি উপরে আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন রাস্তায় তাঁহার কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্ট হয় নাই। বরং যাত্রিগণের নিকট হইতে তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য পাইয়াছেন। লাটু মহারাজ ভক্তটির কোনও কষ্ট হয় নাই জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। মহারাজের চরণপ্রান্তে রামেশ্বর বাবু সেবার প্রায় একমাস কাল অবস্থান করেন। তিনি বাড়ী যাইবার কথা বলিলে মহারাজ বলিতেন—"এখনই বাড়ী যাবি কেনরে? কাশীতে থাক, বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন কর, সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ কর। কাশী শিবক্ষেত্র। এখানে এসে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হয়।" লাটু মহারাজ এক দিন তাঁহাকে অদ্বৈতাশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজের সঙ্গ করিতে এবং তাঁহার উপদেশ লইয়া আসিতে আদেশ করেন। রামেশ্বর বাবু আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিলে লাটু মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপদেশ নিয়ে এলিরে?" রামেশ্বর বাবু তদুত্তরে বলিলেন—"মহারাজ, চন্দ্র মহারাজ বল্‌লেন যে এই সংসারে কর্ম্মফল ভুগতেই হবে।" মহারাজ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন—"ও খোঁড়া কিনা (চন্দ্র মহারাজের বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল) ও ক্ষমা পাচ্ছে না কি না, তাই বলছে কর্ম্মফল ভুগতেই হবে! ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি অবশ্যই দয়া করেন এবং মায়াবদ্ধ জীবকে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত করে দেন। জীবকে তখন আর কর্ম্মফল ভুগতে হয় না। যিনি জগৎ করেছেন, আইন করেছেন, তিনি আইন ভাঙ্গতেও পারেন। তাঁর ইচ্ছায় সব হয়। তিনি ইচ্ছাময়। জীবকে কর্ম্মফল হতে মুক্ত করতে পারেন এইজন্যই ত' তাঁর নাম কপালমোচন।"

এক দিন প্রসঙ্গক্রমে লাটু মহারাজকে রামেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, মাছ-মাংস খাওয়া কি ভাল?" মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"মাছ, পান কি দোষ করেছে রে? যত দিন মন চায় খেয়ে যা। যখন মন আর চাইবে না তখন খাবি না। আসল

কথা হচ্ছে ঈশ্বরে ভক্তি-বিশ্বাস ও ভালবাসা। তিনিই আমাদের আপনার জন। তিনি ত' সবারই হৃদয়ে রয়েছেন। শরীররক্ষার জন্য যা প্রয়োজন হবে তা গ্রহণ করলে দোষ হয় না। তাঁর প্রতি যার ভক্তি ভালবাসা আছে মাছে, পানে তার কি করতে পারে রে?"

মহারাজ একদিন কথাচ্ছলে রামেশ্বর বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—"হ্যাঁরে, তোর বৌ কেমন লোকরে?" রামেশ্বর বাবু বলিলেন—"মহারাজ, সে লোক খুবই ভাল, তবে তার ধর্ম্মজ্ঞান নেই বলে মনে হয়।" লাটু মহারাজ ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে, ওর ধর্ম্মজ্ঞান নেই, আর তোরই ধর্ম্মজ্ঞান হয়েছে! যা যা, ও যা করবার করে নিয়েছে! তুই তোর কাজ করে নিগে যা।" রামেশ্বর বাবুর স্ত্রী অতিশয় পতিভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লাটু মহারাজ তাহা জানিতেন। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এই ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই রামেশ্বর বাবুর স্ত্রী সজ্ঞানে তাহার স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়াই দেহত্যাগ করেন।

১৯১৮ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে ফিরিয়া জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসেন। মিলিটারী পোষাক ব্যতীত অন্য কোনও পোষাক তাঁহার সঙ্গে ছিল না। লাটু মহারাজের নিকটে ঐরূপ পোষাক পরিয়া আসিতে তাঁহার অতিশয় সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ হইতেছিল। এইজন্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে বাজারে গিয়া একটি ধুতি কিনিয়া আনিবেন। ভক্তটি এইরূপ চিন্তা করিয়া লাটু মহারাজের নিকটে একটু বাহিরে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আমি ১৫-২০ মিনিটের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। এখনই ফিরে আসব।" মহারাজ উহাতে একটু নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়া জনৈক সেবককে বলিলেন: "ওরে, একে একখানা নূতন ধুতি বের করে দে। এ মিলিটারী পোষাকে আছে, তায় লজ্জা হচ্ছে।" ভক্তটি লাটু মহারাজের ঐরূপ কথায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন এবং মহারাজকে বারংবার বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ, এ কি বলছেন? কোথায় আমরা আপনাকে দিব, না আপনি আমাদের খেতে পরতে দিচ্ছেন?" মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন—"হ্যাঁরে, এসবতো তোদেরই জন্য, আমার আর কতটুকু দরকার হয়?" লাটু মহারাজের শ্রীচরণতলে কয়েকদিন বাস করিয়া ভক্তটি বিদায় গ্রহণ কালে মহারাজের সেবার জন্য আটটি টাকা প্রদান করিতে যান। মহারাজ তাহাতে তাঁহাকে বলিলেন—"দেশে বহু লোকের অভাব, তাদের অভাব পূরণ কর। তাঁর দয়াতে আমার কোনও অভাব নেই।" লাটু মহারাজ তাঁহার টাকা গ্রহণ করিলেন না।

লাটু মহারাজ এক দিন কতিপয় ভক্ত-পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন—"হ্যাঁরে, যাঁরা (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ) জীবকে মোক্ষ দিতে পারেন, তাঁরা কি তুচ্ছ ধনসম্পদ দিতে পারেন না? ধনদৌলত তো অতি তুচ্ছ রে। তাঁরা ইচ্ছামাত্র সব দিতে পারেন। তাঁদের ইচ্ছাই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবি। ঈশ্বরের বিশেষ শক্তির প্রকাশ তাঁদের জীবনে।"

কতিপয় ভক্ত এক দিন লাটু মহারাজের চরণসমীপে বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন—"মহারাজ, সকলের প্রচুর ধনাগম হয় না কেন?" ভক্তটির এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া লাটু মহারাজ বলেন—"কলকাতায় নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় দেখা যায় ছেলেদের দেখিয়ে পরিবেশনকারীকে ডেকে বলে—মশায়, এখানে একটি সন্দেশ দিন, ওখানে

দুটো রসগোল্লা দিন ইত্যাদি. পরিবেশনকারীরা জানে যে ছেলেরা বেশী খেতে পারে না। বেশী করে খেলে তাদের অসুখ করবে। তাই এদের চেঁচামেচি সত্ত্বেও সবকে আন্দাজ মতই দেয়। আবার দেখা যায় যদি পরিবেশনকারী কোনও ছেলেকে দেখে বেশ খেতে পারছে, তখন সে নিষেধসত্ত্বেও তার দুহাত গলিয়ে রসগোল্লা-সন্দেশ দেয়। ঈশ্বরও তেমনি যার যতটা সইবে, তাকে ততটাই দেন। হ্যাঁরে, তিনি যে দয়াময়! তিনি তো তোদের দুহাত দিয়ে দিতে চান। কিন্তু বেশী খেলে যে তোদের অসুখ করবে, তাইতো বেশী দেন না।

কাশীধামে হাড়ার বাগে অবস্থানকালে জনৈক ভক্ত অন্যান্য ভক্তগণের সহিত গল্প-গুজব ও তামাক সেবন করিতেছেন জানিতে পারিয়া লাটু মহারাজ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"কাশী এসেছে কোথায় একটু সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ করবে, না শালারা হুমড়ী খেয়ে বসে আছে। ডাক শালাকে।" ভক্তটি লাটু মহারাজের নিকটে আসিলে তিনি অতিশয় স্নেহভরে তাঁহাকে বলিলেন—"পা টেপ, কাশীতে এসেছিস, কোথায় একটু সাধুসঙ্গ সাধুসেবা করবি, না যত গল্পগুজব আর হৈ-চৈ করে সময় কাটাচ্ছিস।" ভক্তটি মহারাজের কথায় অতিশয় নিষ্ঠার সহিত কিছুক্ষণ লাটু মহারাজের পদসেবা করেন। মহারাজ সকলের সেবা গ্রহণ করিতেন না। কাহারও কাহারও প্রতি অহেতুক দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এই ভাবে জোর করিয়া তাহার দ্বারা সেবা করাইয়া লইতেন।

লাটু মহারাজের নিকট ভগবদ্‌বিষয়ক কথা ব্যতীত অন্য কথা হইবার উপায় ছিল না। জনৈক ভক্ত এক দিন কোনও বৈষয়িক কথা উত্থাপন করিলে লাটু মহারাজ অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ঐ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির কথা আরম্ভ হইলে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এক দিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় ঠাকুর-স্বামীজির প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গ করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া আহারাদির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহার কোনও খেয়াল হয় নাই। প্রায় আড়াইটার সময় জনৈক সেবক তাঁহাকে বলিলেন যে ভক্তগণের আহারাদি হয় নাই। ইহাতে মহারাজের খেয়াল হইল।

লাটু মহারাজ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা পছন্দ করিতেন না। কেহ নীচ হইতে দরজার কড়া নাড়িলে যদি তিনি বুঝিতেন যে স্ত্রীলোক আসিয়াছে তাহা হইলে বিশেষ ভক্তিমতী না হইলে উপরে আসিতে দিতেন না। যাহারা বিশেষ ভক্তি-মতী মহারাজ তাহাদের রন্ধিত দ্রব্যও গ্রহণ করিতেন।

কাশীধামে হাড়ার বাগে অবস্থানকালে লাটু মহারাজকে একটি অল্পবয়স্কা গয়লানী দুধ দিয়া যাইত। এক দিন সন্ধ্যাকালে জনৈক ভক্ত উক্ত গয়লানীটির সহিত রহস্য করিতেছে জানিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার দুধ বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করেন। মহারাজের আদেশে সেই দিন হইতে তাহার দুধ বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি সেবাশ্রম হইতে দুধ লইয়া আসিতে আদেশ করেন। যিনি সন্ধ্যাবেলায় মেয়েটির সহিত গল্প করিতেছিলেন, তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সন্ধ্যাবেলায় সাধুর কাছে এসে একটু ঈশ্বর-চিন্তা করবে, তা না করে ঐ ছুঁড়িটার সাথে ফচকামি করছো?"

কোনও ভক্ত এক দিন লাটু মহারাজকে প্রশ্ন করেন—"মহারাজ, বারো বছর সত্য কথা বললে নাকি লোক সত্যবাক্ হয়ে যায়? সে

তখন যা বলে তাই নাকি সত্য হয়? সে যদি অসম্ভব কিছু বলে তবে তাও কি সম্ভব ও সত্য হবে?" লাটু মহারাজ ভক্তটির কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন: "যারা বারো বছর সত্য কথা বলেছে, তারা সত্য চিন্তাও করেছে জানবে। তা না হলে সে বারো বছর সত্য কথা বলতে পারে না। অসম্ভব কথা বলা তো দূরের কথা, তারা তা ভাবতেও পারে না। তারা সত্যই বলে, অসম্ভব কিছু বলে না। বারো বছর সত্য কথা বলে বলে তাদের Nerves (স্নায়ুগুলি) সংযত হয়ে যায়। পরে তাঁরা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু বলতে পারেন না।"

একদিন জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজকে ঠাকুরের একটি ছবি আনিয়া দেখান। ছবিতে ঠাকুর বসিয়া আছেন এবং জগন্মাতা কালী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ঠাকুরের ঐরূপ ছবি ভক্তটি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। উহা সবেমাত্র বাজারে বাহির হইয়াছে। ঠাকুরের ঐরূপ ছবি দেখিয়া ভক্তটি মুগ্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ একটি ক্রয় করিয়া লাটু মহারাজকে দেখাইবার জন্য আনয়ন করেন। লাটু মহারাজ ঐ ছবিটি দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং বারংবার বলিতে থাকেন: "ও শিল্পী ঠাকুরকে কি ঐ ভাবে দেখেছে? এখনি নিয়ে যাও এ ছবি আমার সামনে থেকে।" মহারাজের কথায় উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যান!

আলোকময়

শ্রীইলা ঘোষ

কাকলীর রব অন্তে প্রভাত-কিরণ
যবে আসি কিশলয়ে করে পরশন,

রঙ্গিন আলোক জাগে তোমার ভুবনে,
আমি চলি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ চরণে,
তোমার মন্দিরে যেথা আনন্দ-মহিমা
প্রসারিত করিয়াছে আপনার সীমা।

সকল প্রয়াস মাঝে, সর্ব কলরবে,
উজলি উঠিছে যেন তোমারি বিভবে।
বহুরূপে শতধারে হে আলোকময়,
তোমার মাঝারে দেখি আমার বিস্ময়।

তোমার আলোক-দীপ্ত এ ভুবন পরে
সকল প্রকাশ যেন সৌন্দর্য অক্ষরে,
তোমারি অধিক সত্য করিছে ঘোষণা,
আলোক-সঙ্গীতে চলে তোমার বন্দনা!

সমাধান

শ্রীঅশোককুমার সেন

বিবর্তনশীল নীহারিকার উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ কোন্ শক্তির বলে এক দিন জমাট বেঁধে ঘটাল গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম, যুক্তিশীল বিজ্ঞান তার মীমাংসার জন্য বিভিন্ন মত পোষণ করছে। সঞ্চরণশীল বিশ্বের সাধারণ নিয়ম লংঘন করে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনাচক্রে যে তাদের সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। ভূতত্ত্ব-বিদ্‌গণের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী গবেষণা পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করেছে, আর স্থির করেছে পৃথিবীর বুকে নবজীবনের প্রথম আবির্ভাবের দিন। ঘটনা-বৈচিত্র্যে নানা শক্তির সংমিশ্রণের ফলে যে দিন প্রথম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকোষ সৃষ্ট হ'লো, নিঃশব্দে সে দিন পৃথিবীর অজানা ভবিষ্যতের প্রতি এক সুনিশ্চিত ও সুমহান্ ইংগিত করা হয়েছিল—তারই ফলে বর্তমান মানবজাতি পৃথিবীর বুকে এসেছে; আর এসেছে জীবশ্রেষ্ঠের জয়টিকা নিয়ে ক্রমপরিবর্তনের (Evolution) শেষ অবদানরূপে। কিন্তু তার জন্মের রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি, বিজ্ঞানের অন্তর্ভেদী চক্ষুও তার বিশ্লেষণ করতে পারেনি। জীবনী শক্তির অফুরন্ত উৎসের সন্ধান বৈজ্ঞানিক আজও পায়নি খুঁজে। জীবের দৈহিক কাঠামোসৃষ্টির উপাদান মানুষ জানতে পেরেছে; কিন্তু স্থিরনিশ্চিত হয়ে আজও সে বল্‌তে পারে না ঐ উপাদানের গর্ভেই নিহিত আছে জীবনী শক্তি কিংবা কোনও বহিরাগত বৃহত্তর শক্তি সেই দৈহিক কাঠামোর মধ্যে সঞ্চার করেছে প্রাণের স্পন্দন।

এমন জটিল রহস্যপূর্ণ পৃথিবীতে মানুষ তার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করে' যখন কোনও সমাধান খুঁজে পায় না, তখন বিহ্বল হয়ে স্বভাবতই নিজস্ব সাধারণ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর তার কোনও উপায় থাকে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ—নিঃস্ব, দুর্বল, অসহায়—অধিকতর শক্তিশালী জীবের সংঘর্ষে এসে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিকে আশ্রয় করেছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রুদ্রতার সম্মুখীন হ'য়ে প্রয়োগ করেছিল স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তিকে, জীবনযুদ্ধে সে হয়েছিল জয়ী। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর রহস্যময় প্রশ্নের সমাধানে অপারগ হয়ে সে অদৃশ্য অস্পৃশ্য অলভ্য এক নৈর্ব্যক্তিক বৃহত্তর শক্তির কল্পনা করে' তাকেই আপনার অমীমাং-সিত প্রশ্নসমূহের একক সমাধানরূপে গ্রহণ করে-ছিল। কঠিন পরীক্ষার দুর্বিপাকে প'ড়ে যখন সে নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর হারিয়ে ফেল্‌তো আস্থা, তখন সে ব্যাকুল হয়ে আবেদন করতো সেই অব্যক্ত মহাশক্তির নিকট শক্তিলাভের আশায়, সামর্থ্যকে ফিরিয়ে পাওয়ার আশায়। যুক্তিতর্ককে সে করতো অগ্রাহ্য, স্বীয় বিশ্বাসকে একমাত্র অবলম্বন করায় মহাশক্তির বিভিন্ন কল্পনা তার কাছে এসে দাঁড়াতো শক্তির উৎসরূপে, প্রেমের উৎসরূপে, কখনও বা প্রলয়ংকর রূপে। নিরাকার এই মহাশক্তিকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করার জন্য সে তাঁকে দিয়েছিল এক বাস্তব রূপ—রক্তমাংসে গড়া এই মানুষেরই রূপ। তাঁর নাম হলো ঈশ্বর; অলৌকিকতার আবরণে আবৃত হলো তাঁর বাসস্থান 'স্বর্গ'।

ভবিষ্যতের মানুষ এসে অতীতের জ্ঞানহীন মানুষের সরল বিশ্বাসের মাঝে সন্ধান পেলো পরম সত্যের নিশ্চিত বীজ ; আলোকপ্রাপ্ত মন নিয়ে যুক্তিবিচার দ্বারা যাচাই করে' সেই বিশ্বাসের সারবত্তা প্রমাণ করলো। দর্শনশাস্ত্র সেই মহা-শক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লো তাকে পৃথিবীর মানুষ পারলো না অস্বীকার করতে। কিন্তু দার্শনিকের বিভিন্ন মতবাদ সূত্রপাত করলো বিবাদের। দর্শনের সাথে সাথে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হ'লো ; তবে বিজ্ঞান তখন ছিল অনেক পশ্চাতে। কালের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে' দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞান দর্শনের সাথে সমতালে পদক্ষেপ করলো। বাস্তববাদী বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদী দর্শনের মাঝে বাধলো তীব্র সংঘর্ষ। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মধ্যে গড়ে তুললো রেশারেশির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর : পারস্পরিক যুক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে' তাঁরা যে সব বিচিত্র মত পোষণ করতে লাগলেন, সেগুলো মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুকেই গ্রাস করতে উদ্যত হ'লো। ক্রমে কালের রথচক্রে নিষ্পেষিত হ'তে লাগলো মানুষের যাত্রাপথের অজস্র প্রতিবন্ধক ; দৃষ্টির সম্মুখ হ'তে অপসৃত হ'তে লাগলো রহস্যের সূক্ষ্ম কুয়াসার যবনিকা। তাই মানুষ আজ উপলব্ধি করছে বিজ্ঞান ও দর্শন কোন ক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে বিরাজ করতে পারে না ; বিজ্ঞান-সচেতন মানুষ আজ দর্শনকে দিয়ে স্বীয় গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করছে, দর্শনও আজ বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করছে বিশেষ ভাবে। কারণ, সৃষ্টির উৎস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত বিজ্ঞান যে আলোকরেখার সন্ধান পেয়েছে, তার ভেতর দিয়ে লাভ করেছে দর্শনের মূলকথার সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলনের অভাবনীয় সম্ভাবনা।

প্রাচীন দর্শনের মূল সুর হচ্ছে ঐক্যানুভব। সৃষ্টির পূর্বে একটি বস্তুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা' হচ্ছে 'শক্তি'। সেই শক্তি থেকেই পদার্থের জন্ম। প্রাচীন দার্শনিকের মতে বিশ্বের রচনা হয়েছে পাঁচটি উপাদানে—পঞ্চ ভূতে ; অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমে। পঞ্চ ভূতই ঐ মহাশক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-রূপে বিকীর্ণ হয়েছিল। বিজ্ঞান বলে শুধু শূন্য হ'তে কোন কিছুর জন্ম হ'তে পারে না, কারণ বস্তুবিশেষের সংগঠন অপর কোন বস্তুর বাহ্যিক বা রাসায়নিক পরিবর্তনেই একমাত্র সম্ভব। তা' ছাড়াও কোন শক্তি শূন্যের মাঝে বিচরণ করতে পারে না, কোন পদার্থকে তার আশ্রয় করতেই হবে। শক্তির উৎস পদার্থ, কিন্তু পদার্থের উৎস শক্তি নয়—বিজ্ঞানের মূল বক্তব্য ছিল এই।

বিজ্ঞানের অতি-আধুনিক আবিষ্কার এই সমস্যার সমাধান-সম্ভাবনার সূত্রপাত করেছে। বিজ্ঞান জড়পদার্থ বিশ্লেষণ করে এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যেটা সাধারণ লোকের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। পদার্থের গঠন অগণিত অদৃশ্য অণুপরমাণুর মিলনে : মানুষের সাধারণ ইন্দ্রিয়বোধের সাহায্যে এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। সারা বিশ্ব পুনরায় চমকিত হলো যখন বিজ্ঞান ঘোষণা করলে অণু-পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হলেও সেটাই তার চরম কথা নয়—অণু-পরমাণুর উৎস কোন পদার্থবিশেষ নয়। বিপরীতধর্মী কতকগুলো বৈদ্যুতিক শক্তিকণা শাশ্বত গতি নিয়ে এক নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমণ করে এবং অন্তরাকর্ষণের জন্য তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'তে পারে না। এই বিদ্যুৎকণাই অণুর নির্মাতা। অর্থাৎ পদার্থের উৎস 'শক্তি'। দার্শনিকও বলেন সৃষ্টির মূলে এক অদ্বৈততত্ত্ব। তাই আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনের মূল সত্যকে স্বীকার করে নিচ্ছে। মহাশক্তির কল্পনাকে বিজ্ঞান আর

বিদ্রূপের ফুৎকারে কোন ক্রমেই উড়িয়ে দিতে পারে না। তাই আজ দর্শনের মূলসুর গতিশীল বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত ক'রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা মনীষী আইন্‌ষ্টাইন বিজ্ঞানের গভীরতম অন্তস্তলে প্রবেশ করে অগণিত প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র অনির্ণেয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাদের মৌলিক কারণ ঐ অজ্ঞাত মহাশক্তিকেই নির্দেশ করেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে কোনই সম্ভাবনার ইংগিত দিতে পারে না। সম্প্রতি আণবিক শক্তির উদ্ভাবনের ফলে মানুষের সম্মুখে এক নূতন জগতের দ্বার খুলে গেছে; সে এক বিরাট শক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু মানুষ এই শক্তির ধ্বংসকর রূপই দেখেছে, তাই আজ তার সুকুমার বৃত্তি ও শুভবুদ্ধির অগ্নি-পরীক্ষা! সংযমের কঠোর অনুশাসনে এই ধ্বংসকরী শক্তির আতংককর গতির অবসান ঘটাতে হবে; উচ্চতর বৃত্তির ছাঁচে সেই শক্তিকে গঠনশীল করে তুলে সৃষ্টির মূলসূত্রের উদ্দেশে ধাবমান মানুষের পথকে প্রশস্ততর ও মসৃণতর করে দিতে হবে; বাত্যাহত অবদমিত চেতনার মাঝে আনতে হবে নবীন শক্তির পূর্ণ প্লাবন।

মানুষের জীবনের প্রথম ও শেষ কথা তার 'ধর্ম'। ধর্ম অর্থে হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম নয়; ধর্ম অর্থে মানুষের সুপ্ত মহান্ শক্তি-গুলোর নিবিড় প্রকাশ, তার সহজাত সুকুমার বৃত্তির স্নিগ্ধ দীপ্তি। সেই ধর্মই তার জীবনের প্রতি কর্মসাধনার মূলে সিঞ্চন করেছে প্রেরণার স্বচ্ছ বারি। মস্তকোপরি অধিষ্ঠিত ঐ মহাশক্তির স্থিতি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ ক'রে সে অগ্রসর হচ্ছে স্বীয় উদ্দিষ্টের পানে, তার জীবনের পরম সত্য, চরম সার্থকতাকে জান্‌বার জন্যে। দুঃখজর্জরিত জীবনের মাঝে সুখ-স্পর্শানুভূতি তার কাছে 'স্বর্গ'—ব্যর্থতার দুর্বার অশনি, দারিদ্র্যের ক্লিন্ন আবেষ্টনী, বেদনার নির্মম আঘাত তার জীবনকে করে তোলে রুদ্র নরক, জীবন্ত শ্মশান। মননশীলতার মাঝেই স্বর্গের স্থিতি—মানুষের মনই তাকে দিয়েছে রূপ। মানুষের এই সরল বিশ্বাস কালের ধারা বেয়ে চলে এসেছে তার অস্থিমজ্জার সঙ্গে এক হয়ে। বিজ্ঞানের কোন যুক্তিতর্কই তার সেই অটল বিশ্বাসকে আজও টলাতে পারে নি। এটা যে তার সম্পূর্ণ অন্তরের সম্পদ, যে সম্পদ আদি মানবের আদিম নগ্নতা নিয়েই অপরিবর্তিত হয়ে রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক, কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি, সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের অস্ত্রধারণ সম্পূর্ণ অনুচিত।

দার্শনিকের নব দৃষ্টিভংগীতে আজ মানুষের সনাতন ধর্মবোধকে অস্বীকার করতে চাইছে। এর ফলে যুক্তি-তর্কের সহায়তায় এই মতবাদ মানুষের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনের ওপর ভিত্তি ক'রে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নিবিড়তর ভাবে অনুভব করার চেষ্টা করেছে। ধর্মের অন্তরালে থেকে দুর্বলের ওপর সবলের যে অত্যাচার চলে নির্বিচারে, তাকে ব্যাহত করার জন্যই এই মতবাদের সৃষ্টি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানুষের মাঝেই; সেই বিরাট একক শক্তি খণ্ডখণ্ডরূপে বিকীর্ণ হয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছে প্রতি মানুষের মাঝে। মানুষের উন্নতি-বিধানে মানুষের সেবাই হবে ঈশ্বরের সেবা। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছিলেন এই ভাবকে ছোট দুটি ছত্রে—

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই মতবাদের সুপ্রসারিত দৃষ্টি ও আদর্শ মানুষের জীবনে বিপ্লবের সূচনা করেছে, মানুষের আদর্শবাদকে আরও বস্তুতান্ত্রিক সহজবোধ্য রূপ দিয়েছে। এই মতবাদ সংকীর্ণ আত্ম-চেতনাকে ছাড়িয়ে মানুষকে বহু উর্দ্ধে নিয়ে যেতে চেয়েছে, তার অন্তরের সুপ্ত দেবত্বকে জাগরিত করে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিকে আরও উন্নত করেছে। মানুষের বিশ্বাসের ওপর কোনও হস্তক্ষেপ করেনি, ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও করেনি অস্বীকার। ঈশ্বরপ্রীতিকে শুষ্ক ব্যবহারিকতার গণ্ডীর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ঔদাসীন্য ও তার স্বার্থপরতা তাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তপথে চালিত করছিল: সেই জড়ীভূত ঈশ্বরপ্রীতির অস্পষ্ট অপার্থিবতাকে একটা বাস্তব কার্যকর রূপ দিয়েছে এই বিশ্বপ্রসারী মানব-ধর্ম। তার ফলে মানুষের কর্মসাধনার যে বিশাল লক্ষ্য উদ্দিষ্ট হয়েছে, তাই ঈশ্বরকল্পনার প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করবে।

জীবসৃষ্টির পশ্চাতে কোন্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্য রয়েছে আজও তা' উদ্‌ঘাটিত হয় নি। প্রথম জীবনের প্রভাতে কোন অভিব্যক্তির অদৃশ্য হস্তের নিঃশব্দ সঞ্চালনে ঐ প্রাথমিক জীবন ক্রমে ক্রমে চরম পর্যায় জীবশ্রেষ্ঠ মানুষে এসে দাঁড়িয়েছে, তার অন্তে কোন্ অজানা পরিসমাপ্তি অপেক্ষা করছে আজও তা জানা যায় নি। আজও মানুষ জানতে পারে নি সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়, জীবনের সার্থকতা কোথায়? কোন্ সুদূর অতীতে অণুপরমাণুর আকস্মিক মিলনে জীবনী শক্তির উদ্ভাবন হয়েছিল কালের ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে, হৃদয়ের ধুক্ ধুক্ স্পন্দনের সাথে সাথে? দৃঢ় অথচ নিরুপায় পদক্ষেপে সেই জীবন হয়তো অগ্রসর হয়ে চলেছে নিশ্চিত ধ্বংসের পানে। অদৃশ্য ভাগ্যনিয়ন্তা যদি সৃষ্টির ললাটে এই অলিখিত অভিশাপই এঁকে থাকেন, যদি জন্ম-মৃত্যুর অনতিক্রম্য নিয়মের চিরাচরিত ধারাকে নতমস্তকে মেনে নেয় বিশ্বজীব, তবে সেই আশাহীন ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে মানুষের মন ভগ্ন হয়ে যাবে। অর্থহীন প্রচেষ্টার মাঝে খুঁজে পাবে না কোন সার্থকতার আস্বাদন। কিন্তু এই নৈরাশ্যকর সম্ভাবনার নির্দেশকে মেনে নিতে আশাবাদী মন চায় না। চিরপরিক্রমণশীল বিশ্বজগতের অজস্র নীহারিকাপুঞ্জ হতে নিঃসৃত অবোধ্য সুরতরংগ যখন ইথার-বক্ষ কম্পিত করে ভেসে আসে, যখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকার মাঝে এক অপ্রকাশ্য সুসংবদ্ধতা লক্ষ্য করি, যখন পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহল ছাপিয়ে এক অলক্ষিত জয়গান সুদূর নক্ষত্রলোকের পানে ছুটে যায় মানুষের অন্তর্নিহিত সুগভীর স্বর্গীয়তার বার্তা নিয়ে, তখন মানুষের ভবিষ্যতের তমিস্রা ভেদ করে খুঁজে পাই এক দুর্লভ মণি—যার মাঝে একান্ত ভাবে মিশে রয়েছে জীবনের শুদ্ধ সত্য। এত যুক্তি, এত তর্ক সত্ত্বেও নির্বিকার চিত্তে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিই। সেই ঈশ্বর মানুষের অন্তরের উচ্চতর বৃত্তির মাঝে মূর্ত, তাঁর প্রেম, দয়া মানুষের জীবনকে ঘিরে পেয়েছে রূপ। বিশ্বব্যাপী যে রক্তপাতের প্রবল বন্যা বয়ে চলেছে, মানুষের অন্তরের গহন গুহা থেকে হিংস্র পশু বহির্গত হয়ে পৃথিবীকে দলিত-মথিত করে চলেছে, বেদনার্তের অশ্রুলাঞ্ছনায় সিক্ত হয়েছে মাটির বুক—

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে;
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

—এই সব দুর্যোগের অবসান হবে সেদিন, যে দিন মানুষের জ্ঞানের সুসম্পূর্ণতা এসে তাকে নিয়ে যাবে

চরমশীর্ষে, মানুষ তখন জীবনের জয়পতাকা উড়িয়ে স্বর্গীয় চেতনায় সমগ্র মানবজাতিকে একত্বের 'বন্ধনহীন গ্রন্থিতে' বেঁধে রাখবে—'একজাতি এক পৃথিবীর' স্বপ্ন সেদিন হবে সফল।

আজ সর্বপ্রশ্নের সমাধান এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের মাঝে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে—জীবনের বাস্তবতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাবৈচিত্র্য স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে প্রকাশ করছে সেই সমাধানকে। আদি মানবের স্থূল দৈনন্দিন প্রয়োজন তাকে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল করেছিল। সংকীর্ণ মানুষের মন তর্কের আহ্বানে দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হয়ে স্বীয় দৃষ্টিকেই গ্রহণ করেছে একক মানদণ্ডরূপে, প্রতিপক্ষকে করেছে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা। কিন্তু নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভংগীরও ঘটেছে পরিবর্তন। সেই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভংগী মানুষের জীবনের সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছে, শক্তি ও বস্তুর উৎসকে করেছে পারস্পরিক নির্ভরশীল। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন, সৃষ্টি-ধ্বংসের আবর্তন, সাফল্য-ব্যর্থতার আবর্তনের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে এই শক্তি ও বস্তুর আবর্তন। অশেষ এই জীবনের রহস্য, অশেষ এই সৃষ্টির রহস্য! যুগকবির গভীর অন্তস্তল উন্মথিত করে এই সুগভীর উপলব্ধি সুরের অঝোর ধারায় ভেঙ্গে পড়ে প্লাবিত করে নিয়ে গেছে অধ্যাত্মলোক ও বস্তুলোকের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে—

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সু'রে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া;
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়-সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

ভেবো না নিজের কথা

(Think not of self)

স্বামী পরমানন্দ

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভাবিও না নিজ কথা,
ভালবাস অপর সকলে,
টানিও না আমারেখা,
প্রেমে তব কোনরূপ ছলে;
অসীম আকাশ দেখ সবারে টানিয়া লয়
আপনার স্নেহময় কোলে।

পৃথিবীতে খনিজ তৈলের সরবরাহ-অবস্থা *

মাইকেল গ্রাণ্ট

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূল্য এবং পরিমাণ উভয় দিক দিয়েই খনিজ তৈল এবং তৈলজাত পদার্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। সমগ্র পৃথিবীতে খনিজ তৈলের দৈনিক চাহিদা ১০,০০,০০০ টন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর মোট তৈলশক্তির শতকরা ৭ ভাগ মাত্র ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ২৫ ভাগ এবং আজ তার পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশী।

খনিজ তৈলের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অনুমান হয় ১৯৫২ সনের মধ্যে পৃথিবীতে তৈল এবং তৈলজাত পদার্থের চাহিদা হবে দৈনিক ১৫,০০,০০০ টন। অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ ভাগে পৃথিবীতে এক পিপা তৈলের প্রয়োজন হয়ে থাকলে আজ প্রয়োজন ১৮ পিপা।

পৃথিবীর তৈলসরবরাহ-ব্যবস্থায় বৃটিশ-পরিচালিত তৈলকেন্দ্রগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে, ভবিষ্যতেও তার গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে এতে সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্র এক সময় পৃথিবীর প্রধান তৈল রপ্তানিকারক দেশ ছিল, কিন্তু আজ সেও তৈল আমদানি করতে বাধ্য হয়েছে এবং মনে হয় এই ভাবে খনিজ তৈলের জন্য আরও কিছুকাল তাকে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে। কৃষিব্যবস্থায় এবং শ্রমশিল্পে নূতন করে তৈলের চাহিদা হয়েছে তার প্রধান কারণ। যন্ত্রশক্তি-উৎপাদনে অন্য উপকরণের অভাব, তা ছাড়া তৈলব্যবহারের সুবিধাও অনেক। কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। তা ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকেই সামুদ্রিক যানে কয়লার পরিবর্তে তৈলের ব্যবহার শুরু হওয়ায় তৈলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বত্র বিমানব্যবস্থা সম্প্রসারের চেষ্টা চলেছে, তাতেও বহু পরিমাণে খনিজ তৈল এবং তৈলজাত পদার্থের চাহিদা হয়েছে। বহু প্রকার অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক এবং কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুতি কার্যে খনিজ তৈল মৌলিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রসজ্জিত আধুনিক সৈন্যবাহিনী পরিচালনার কাজেও তৈলের প্রয়োজন। এই সকলের অর্থ এই যে জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে তৈল সঞ্চয় করা আজ অবশ্য কর্তব্য।

পৃথিবীর তৈল উৎপাদন ব্যবস্থায় বৃটেনের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন বর্তমান শতকের প্রারম্ভে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়। একদিকে ব্রহ্মদেশের তৈলভূমি অন্যদিকে ক্যারিবিয়ান এলাকা, ইরাণ ইজিপ্ট্ এবং বোর্ণিওর তৈলক্ষেত্রে সুবিধা লাভ বৃটেনকে তার তৈলস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ তৈল-প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথিবীর মোট তৈলক্ষেত্রের এক-দ্বাদশাংশের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভ করে এবং ১৯৪৮ সনে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পৃথিবীর মোট উৎপাদন পরিমাণের এক অষ্টাংশ পরিমাণ তৈল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন্ সার্ভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। উঃ সঃ

পৃথিবীর মোট অবিশুদ্ধ তৈলের ৪/৫ অংশ উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে হয় ৩/৫ অংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বৃটিশ রাজ্যে হয় তার প্রায় ১/৫ অংশ। বাকি পরিমাণ উৎপন্ন হয় প্রধানতঃ মধ্যপ্রাচ্যে; এখানে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন পরিমাণের ১/১০ অংশ বা ততোধিক তৈল উৎপন্ন হয়। অপর পক্ষে রাশিয়ায় হয় ১/১৬ অংশ মাত্র।

বহু বিশেষজ্ঞের মতে তৈলের ব্যবহার যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে পৃথিবীর তৈলশক্তি শীঘ্র নিঃশেষিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেন যে ভূগর্ভ থেকে আর মাত্র ৭০০০ কোটি পিপা তৈল সংগ্রহ করা সম্ভব। পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর চাহিদা বাৎসরিক ৩০০ কোটি পিপারও বেশী হবে বলে মনে হয় এবং তাতে পৃথিবীর তৈলসম্পদ ২৩ বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা।

এই সব অনুমানের মধ্যে অবশ্য অনাবিষ্কৃত তৈলাঞ্চলগুলিকে ধরা হয় নি। যুক্তরাষ্ট্রের তৈলভাণ্ডার ১২ বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হতে পারে এমন কথারও উল্লেখ হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সনে সেখানে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে তার তৈলসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র-গর্ভে এখনও তৈলপ্রধান বহু এলাকা রয়েছে যার সদ্ব্যবহার হয় নি। তাছাড়া নূতন কৌশলে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈল উৎপাদন সম্ভব। তাতে তাদের প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। তাদের উদ্যম যথেষ্ট, যোগ্যতা অসামান্য, তারই সহায়তায় এক দিন তারা সাফল্য লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই। 'শেল' প্রস্তর (Shale) থেকে এবং এমন কি রাসায়নিক পন্থায় কয়লা থেকে কৃত্রিম তৈল উৎপাদন করাও কঠিন নয়, এতে তারা আরও কয়েক শত বৎসরের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

অনেকের মতে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় পশ্চিম গোলার্ধে খনিজ তৈল দ্রুততর নিঃশেষিত হয়ে আসছে। তাঁরা বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমগ্র চাহিদার ৩/৫ অংশ বা ততোধিক তৈল উৎপাদন করে এলেও তার ভূগর্ভ-ভাণ্ডারে আছে মাত্র ৩/১০ অংশ এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে সমগ্র চাহিদার ১/৫ অংশ উৎপাদন হলেও তার ভূগর্ভ-ভাণ্ডারে আছে মাত্র ২/৫ অংশ, অপর পক্ষে মধ্যপ্রাচ্য পৃথিবীতে মোট সরবরাহ-পরিমাণের ১/১০ অংশ তৈল সরবরাহ করে এসেছে, কিন্তু সেই অনুপাতে পৃথিবীর তৈলভাণ্ডারের ৪/১০ অংশ তার। সেইজন্যই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তৈলসরবরাহ-ব্যবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যের দায়িত্ব অপরিসীম।

ক্যারিবিয়ান আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তৈলাঞ্চল, পৃথিবীর তৈলসরবরাহ ব্যবস্থায় তারও দায়িত্ব কম নয়, বিশেষতঃ ইউরোপীয় পুনর্গঠন-পরিকল্পনার অন্তর্গত দেশসমূহে তার তৈল এবং তৈলজাত পদার্থের চাহিদা প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সমগ্র অবিশুদ্ধ তৈল (Crude Oil) ভাণ্ডারের ১/৪ অংশ বৃটিশনিয়ন্ত্রিত, সেই জন্য পুনর্গঠন-ব্যবস্থায় বৃটেনের সহযোগিতা অপরিহার্য।

যুক্তরাষ্ট্রের পরই পৃথিবীর মধ্যে কমন-ওয়েলথেই সর্বাপেক্ষা বেশী খনিজ তৈলের ব্যবহার দেখা যায়। ১৯৪৭ সনে কমনওয়েলথে মোট ৪,৫০,০০,০০০ টন তৈল ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে ১,৬০,০০,০০০ টন আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বৃটিশ-অধিকৃত বিভিন্ন তৈলকেন্দ্র কমন-ওয়েলথে যে পরিমাণ তৈল ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী তৈল উৎপাদন করে, অথচ কমনওয়েলথে সেই তুলনায় উৎপাদন-পরিমাণ অনেক কম। ১৯৪৮ সনে কমনওয়েলথে প্রকৃতপক্ষে ৭৫,০০,০০০ টনেরও কম তৈল-উৎপাদন হয়; তার মধ্যে ত্রিনিদাদে হয়

৩০,০০,০০০ টন, বৃটিশ বোর্নিওতে ২৭,০০,০০০ টন এবং কানাডাতে ১৪,০০,০০০ টন।

বৃটিশ তৈল-প্রতিষ্ঠানগুলি পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তৈলকেন্দ্রগুলির উন্নতি করা ছাড়াও কমনওয়েলথের অন্তর্গত তৈল-এলাকা থেকে অধিকতর তৈল-উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং সেখানে নূতন নূতন তৈল-উৎস আবিষ্কারে উদ্যোগী হয়েছে। তার প্রমাণ আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে তাদের কর্মতৎপরতা। ত্রিনিদাদের উপকূল ছাড়িয়ে 'প্যারিয়া' উপসাগরের মধ্য পর্যন্ত যে অনুসন্ধান-কার্য চলেছে তার ফলে হয়ত এক দিন ত্রিনিদাদের তৈলভাণ্ডার পুষ্ট হয়ে উঠবে। ক্যানাডার লেডাক অঞ্চলে, এডমনটনের নিকটে, তৈল-উৎস আবিষ্কারের সম্ভাবনা পৃথিবী জুড়ে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। কয়েক মাস পূর্বে লেডাকের ২০ মাইল উত্তরে রেডওয়াটারে আর একটি তৈলভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। 'আলাস্কা রাজপথ' নির্মাণের সময় পশ্চিম বৃটিশ কলাম্বিয়ায় যে তৈলভূমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

উত্তর আ্যালবার্টার আথাবাস্কায় অবিশুদ্ধ তৈলের এক বিরাট ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। তার পরিমাণ আনুমানিক ১০,০০০ কোটি পিপা। কমনওয়েলথের অন্যান্য অংশে, যথা পূর্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকা, সাইপ্রাস এবং নিউগিনির অন্তর্গত পাপুয়ায় তৈলের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান চলেছে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াতেও সম্প্রতি তৈলভূমি আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে, এবং এমন কি কুইনস্ল্যাণ্ডে এই সম্পর্কে যে পরিকল্পনা হয়েছে তাতে খনন ইত্যাদি প্রারম্ভিক কার্যের জন্য ১,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৃটেনেও অবিশুদ্ধ তৈলের আকরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি সেখানে একটি বৃটিশ ফার্মকে স্থানীয় পেট্রোলিয়াম বোর্ড ইয়র্কশায়ারের উপকূলে হুইটবির চতুর্দিকে ১৬৯ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকায় তৈলসন্ধান-সম্পর্কে প্রাথমিক কার্যের জন্য বিশেষ লাইসেন্স প্রদান করেছেন। পৃথিবীর খনিজ তৈলের এই হল বর্তমান পরিচয়।

"রামকৃষ্ণ যেন গঙ্গা। গঙ্গার মতোই গভীর; গঙ্গার মতোই তাঁহার বুকে প্রতিবিম্ব পড়ে; গঙ্গার মতোই বাহিরে তিনি তরল। তাঁহারও স্রোত আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে বহন করিয়া পোষণ করিয়া চলে।... রামকৃষ্ণ যখন ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের মধ্য দিয়া শিখরদেশে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তিনি উত্থান-পথের বেদনা, আনন্দোচ্ছ্বাস এবং আকস্মিক বাধা-বিপত্তির কিছুই ভুলিলেন না। সেগুলি শিখররাশির শোভাকে বিচিত্র করিয়া তুলিল।"

—রোমাঁ রোলাঁ

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি *

মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লাউড্
অনুবাদক— অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

১৮৯৫ সনের ২০শে জানুয়ারী আমি আমার ভগিনীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কের 54 West 33rd Street-এ যাই। সেই বাড়ীর বৈঠকখানায় স্বামী বিবেকানন্দের কথা প্রথম শুনি। ১৫।২০ জন ভদ্রমহিলা এবং দু'তিন জন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘরটি ছিল জনাকীর্ণ। ঘরের সব আরাম-কেদারা সরান হয়েছিল, সেইজন্য আমি মেজেয় প্রথম সারিতে বসলাম। স্বামীজী কোণে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি একটা কিছু বলেছিলেন, ঠিক কথাগুলি আমার মনে নেই; তবে সঙ্গে সঙ্গেই তা' আমার নিকট সত্য বলে প্রতিভাত হ'ল। তাঁর দ্বিতীয় কথাটি, তাঁর তৃতীয় কথাটিও সত্য মনে হয়েছিল। এভাবে আমি সাত বছর তাঁর বাণী শুনেছিলাম। যা' কিছু তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা-ই আমার নিকট সত্য। তখন হতেই আমার কাছে জীবনের অর্থ হ'ল অন্য রকম। তিনি যেন আমাকে অনুভব করালেন—তুমি অনন্তে বিরাজমান। এই অনন্ত ত বদলায় না, এর ত বৃদ্ধি নেই। এ সূর্যের মত; একবার অনুভব করলে একে তুমি কখনও ভুলবে না।

সেই সারা শীতকাল আমি তাঁর উপদেশ-বাণী শুনেছিলাম—সপ্তাহে তিন দিন, সকাল এগারটায়। আমি কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি. কিন্তু আমরা এত নিয়মিত ভাবে আসতাম যে স্বামীজীর ঐ বসবার ঘরে সব সময়ই আমাদের জন্য সামনে দুটি আসন থাকত। এক দিন আমাদের দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন: "তোমরা কি বোন্?" "হাঁ"—আমরা উত্তর করলাম। তিনি আবার জিজ্ঞেস্ করলেন: "তোমরা কি অনেক দূর থেকে আস?" "না, বেশী দূর নয়—হাড্‌সনের ৩০ মাইল up-এ এসেছি।" "এত দূর? আশ্চর্যের বিষয়।" তাঁর সঙ্গে আমার ঐ প্রথম কথা।

আমি তখন মনে করতাম অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বিবেকানন্দের পরই মিসেস্ রোয়েথ্‌লিস্ বার্জারের স্থান। এই ভদ্রমহিলাই আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে যান। স্বামীজীর কাছে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এক দিন মিসেস্ বার্জার ও আমি স্বামীজীর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলাম: "স্বামীজী, কি রকম ধ্যান করতে হয় আমাদের শেখাবেন কি?" তিনি উত্তর দিলেন: "এক সপ্তাহ 'ওম্' ধ্যান করে আমার নিকট এসো।" এক সপ্তাহ পরে আমরা আবার গেলাম। মিসেস্ রোয়েথ্‌লিস্ বার্জার বললেন: "আমি একটি জ্যোতি দেখি।" স্বামীজী উত্তর দিলেন: "ভাল কথা, লেগে থাক।" "হৃদয়ের মধ্যে একটা কিছু জ্যোতির মত দেখি—"

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত "Reminiscences of Swami Vivekananda" শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

মিসেস্ বার্জর বললেন। "বেশ'ত, লেগে থাক।" স্বামীজী ঐমাত্রই শিখিয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে আমরা ধ্যান অভ্যাস করছিলাম, আর গীতাও পড়ে ছিলাম। আমার মনে হয় তা' আমাদের স্বামীজী-রূপ মহাশক্তিকে চিন্‌তে সাহায্য করেছিল। আমার বিশ্বাস অন্যকে সাহসদানেই ছিল তাঁর শক্তি। তাঁকে নিজ সম্বন্ধে একেবারেই সজাগ মনে হ'ত না। অন্যের প্রতিই ছিল তাঁর দৃষ্টি। তিনি বল্‌তেন: "যখনই জীবনের বইখানি খুল্‌তে আরম্ভ করে, তখনই তামাসা শুরু হয়।" আরও বলতেন, জীবনে অনাধ্যাত্মিক পার্থিব-ভাবাপন্ন কিছুই নেই; সবই পূত, আধ্যাত্মিক। "সব সময়ই মনে করবে দৈবাৎ তুমি আমেরিকাবাসী—একজন স্ত্রীলোক, কিন্তু সর্বদাই অপরিবর্তনীয় রূপে তুমি ভগবানের সন্তান। দিনরাত নিজেকে বল তুমি কে—তোমার স্বরূপ কি কখনও ভুলে যেয়ো না।" এ কথাই তিনি আমাদের শেখাতেন। তাঁর উপস্থিতি ছিল সক্রিয় ও উদ্দীপক! এ শক্তি যদি তোমার না থাকে তবে এটা তুমি অন্যে সঞ্চারণ করতে পারবে না, টাকা না থাকলে যেমন অন্যকে দান করতে পার না। তুমি তা' কল্পনা করতে পার, কাজে দেখাতে পার না।

আমরা কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম না, তাঁর সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু করবারও ছিল না। সেই বছর বসন্তের এক রাত্রিতে আমরা মিঃ ফ্রান্সিস্ এইচ্ লেগেট্ এর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। মিঃ লেগেট্ পরে আমার ভগ্নীপতি হন। আমরা তাঁকে বল্‌লাম: "আমরা আপনার সঙ্গে খেতে পারি বটে, এই অপরাহ্ণ কিন্তু আপনার বাড়ীতে কাটাতে পারি না।" তিনি উত্তর দিলেন: "খুব ভাল কথা, আমার সঙ্গে কেবল আহারই করুন।" খাওয়া শেষ হ'লে তিনি জিজ্ঞেস্ করলেন: "এই বিকেলে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" বললাম, আমরা এক বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস্ করলেন: "আমি কি আসতে পারি?" আমরা বল্‌লাম: "হাঁ"। তিনি এলেন, বক্তৃতাও শুনলেন। বক্তৃতা শেষ হ'লে মিঃ লেগেট স্বামীজীর নিকট গিয়ে তাঁর করমর্দন করে বললেন: "স্বামীজী, আমার সঙ্গে কবে আপনি আহার করবেন?" ইনিই আমাদিগকে সামাজিক ভাবে স্বামীজীর নিকট পরিচিত করিয়ে দেন।

ক্যাট্‌স্‌কিল পর্বতের রিজ্‌লি ম্যানর মিঃ লেগেটের বাসস্থান। এখানে এসে স্বামীজী কয়েক দিন ছিলেন। স্বামীজীর কয়েক জন ছাত্র বল্লেন: "স্বামীজী, আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। ক্লাশগুলো চল্‌ছে।" স্বামীজী অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত ভাবে উত্তর দিলেন: "এগুলো কি আমার ক্লাশ? আমি যাবই।" তিনি সত্যই চলে গেলেন। সেখানে থাকাকালে আমার বোনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয়েছিল। তাদের তখন বার ও চৌদ্দ বছর বয়স। স্বামীজীর নিউইয়র্কে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশগুলো যখন আবার আরম্ভ হ'য়ে গেল, তখন তাদের কথা তাঁর মনে ছিল বলে বোধ হ'ল না। তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বল্লে: "আমাদের কথা স্বামীজীর মনে নেই!" আমরা তাদের সান্ত্বনা দিলাম: "ক্লাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" যখনই স্বামীজী বক্তৃতা দিতেন, তখনই তিনি তাঁর বক্তৃতার বিষয়ে পুরোপুরি ডুবে যেতেন। বক্তৃতার শেষে তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে এসে বল্লেন: "তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় আমার খুব আনন্দ হ'ল!" তা'হলে তাদের কথা তাঁর মনে ছিল! তারাও খুব খুশী হয়ে গেল।

সম্ভবতঃ ঐ সময়ে তিনি নিউইয়র্কে আমাদের অতিথি ছিলেন। এক দিন তিনি বেশ স্থির ধীর প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বাড়ী ফিরলেন। কয়েক ঘণ্টা কোন কথা বলেন নি: শেষে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলাম: "স্বামীজী, আজ আপনি কি করলেন?" তিনি বল্লেন: "আজ আমি এমন একটি জিনিষ দেখেছি যা' কেবল আমেরিকায়ই সম্ভব। আমি বাসে ছিলাম: হেলেন গোল্ড্ এক পাশে বসেছেন, আর এক পাশে বসেছে একটি নিগ্রো ধোপানী —কোলে তার ধোয়া জামা কাপড়। আমেরিকা ছাড়া কোন দেশ এ দৃশ্য দেখাতে পারে না!"

ঐ বছরের জুন মাসে স্বামীজী ক্রিশ্চিন্ লেকের ক্যাম্প্ পার্সিতে যান। ওখানে তিনি মিঃ লেগেটের মাছ ধরবার ক্যাম্পে অতিথি হ'ন। আমরাও গিয়েছিলাম। সেখানে মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে স্থির হ'ল; স্বামীজীকে বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি যে কটা দিন ক্যাম্পে ছিলেন সাদা সুন্দর বার্চ গাছের নীচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতেন। আমাদের কিছু না বলে স্বামীজী বার্চ গাছের ছাল দিয়ে দু'খানি সুন্দর বই তৈরী করে তাতে সংস্কৃত ও ইংরেজীতে কিছু লিখে ফেল্লেন। বই দু'খানি দিয়েছিলেন আমাকে আর আমার বোনকে।

তারপর আমার বোন এবং আমি যখন বিয়ের পোষাক কিনতে প্যারিস্ গেলাম, তখন স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে যান। সেখানে দেড় মাস কাল তিনি তাঁর চমকপ্রদ উদ্দীপনাময় উপদেশবাণী প্রদান করেন যা' 'Inspired Talks' নামে অভিহিত। আমার কাছে ঐ কথাগুলি সবচেয়ে সুন্দর! একদল অন্তরঙ্গ শিষ্যদের উদ্দেশে তা' প্রদত্ত হয়েছিল। তাঁরা স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন, আমি কিন্তু কখনও তাঁর বন্ধু ছাড়া কিছুই ছিলাম না। আমার মনে হয়, কিছুই তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তল তেমন উদ্‌ঘাটিত করেনি, ঐ অবিস্মরণীয় দিনগুলি যেমন করেছিল!

তিনি আগষ্ট মাসে মিঃ লেগেটের সঙ্গে প্যারিস্ আসেন। সেখানে আমার বোন ও আমি 'হোল্যাণ্ড্ হাউসে' ছিলাম। স্বামীজী ও মিঃ লেগেট অন্য হোটেলে থাকতেন। অবশ্য আমরা প্রতিদিনই তাঁদের দেখা পেতাম। মিঃ লেগেটের একটি পিয়ন ছিল। সে সব সময়ই স্বামীজীকে বলত 'আমার রাজা'! স্বামীজী বল্তেন: "কিন্তু আমি ত রাজা নই, আমি এক জন হিন্দু সন্ন্যাসী।" পিয়নটি উত্তর দিত: "আপনি তা বল্তে পারেন বটে, কিন্তু আমি রাজ-রাজড়াদের সঙ্গে চলে অভ্যস্ত। কাউকে দেখেই আমি বুঝতে পারি ইনি সত্যই কি।" স্বামীজীর তেজোদ্দীপ্ত ভাব প্রত্যেককেই আকৃষ্ট করত। একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বল্লেন: "স্বামীজী, আপনি এত রাজোচিত মহত্ত্বপূর্ণ!" তিনি উত্তর করলেন: "না, আমি নই, আমার হাঁটার ধরন।"

৯ই সেপ্টেম্বর মিঃ এবং মিসেস্ লেগেটের বিয়ে হয়। পরদিন স্বামীজী লণ্ডন রওনা হন। লণ্ডনে স্বামীজী মিঃ ই টি ষ্টার্ডির অতিথি হন। এর আগেই মিঃ ষ্টার্ডি ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েক জন সন্ন্যাসী শিষ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি এক জন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। ওখানে থাকার কিছু দিন পরেই স্বামীজী আমাদের চিঠি লিখেন: "এখানে চলে এসে ক্লাশগুলোতে যোগ দাও।" আমরা যখন গেলাম, তখন তিনি কিছু দিন ধরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি প্রিন্সেস্ হল্-এ বক্তৃতা দিয়ে বাগ্মিতার পরিচয় দেন। পরদিন সংবাদ-পত্রগুলি খবরে ভ'রে গেল—"একজন বিশিষ্ট

ভারতীয় যোগী লণ্ডনে এসেছেন” ইত্যাদি। সেখানে তিনি অত্যন্ত সম্মান লাভ করেছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা লণ্ডনে ছিলাম। তারপর স্বামীজী আমেরিকায় চলে এলেন ওখানে তাঁর কাজ চালাবার জন্য। পরের বছরের এপ্রিল মাসে তিনি আবার ফিরে যান। ঐ সময় তিনি ক্লাশ নিতে লাগলেন এবং সত্যিকার সুনির্দিষ্ট কাজ আরম্ভ করলেন ১৮৯৬ সনে। জুলাই মাস পর্যন্ত সমস্ত গ্রীষ্মকাল তিনি ওখানে কাজ চালান। তারপর চলে যান সুইটজারল্যাণ্ড—সেভিয়ার-দের সঙ্গে।

স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, অতি বিস্ময়কর। একবার আমার বোনঝি য়্যালবার্টা ষ্টারজেস—পরবর্তী কালে লেডি স্যাণ্ডুইচ—স্বামীজীর সঙ্গে রোমে যায়। য়্যালবার্টা তাঁকে রোমের দর্শনীয় সব দেখাচ্ছিল। বড় বড় স্মৃতিস্তম্ভগুলির অবস্থান সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান দেখে সে অবাক হয়ে গেল। সে তাঁর সঙ্গে সেণ্ট পিটার্স-এ গেল। সেখানে রোমের গির্জার প্রতীকগুলির প্রতি, মণিমাণিক্যের প্রতি, সাধু-সন্তদের সুন্দর পোষাক প্রভৃতির প্রতি স্বামীজীর অভাবনীয় সশ্রদ্ধ ভাব দেখে সে আরও অবাক্ হয়ে গেল। সে বলল: ‘স্বামীজী, আপনি ত সগুণ সবিশেষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন: তাহ'লে এসবকে এত সম্মান দিচ্ছেন কেন?” তিনি উত্তর করলেন: “কিন্তু য়্যাল্‌বার্টা, তুমি যদি সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে থাক, তা' হ'লে ত এতে তোমার অন্তরের সবটুকু ভক্তিই দিতে হবে।”

সেই বৎসর শরৎকালে স্বামীজী মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার এবং জে জে গুড্‌উইন্-এর সঙ্গে সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। সেখানে সমগ্র জাতির সাগ্রহ অভিনন্দন তাঁর প্রতীক্ষায় উন্মুখ ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত জানা যেতে পারে ‘Lectures from Colombo to Almora’ নামক বই-এ। মিঃ গুড্‌উইন্ তাঁর অনুলেখক ছিলেন। 54 West 33rd Street-এ তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের সব বক্তৃতার অনুলেখনের জন্য। মিঃ গুড্‌উইন্ বিচারালয়ের অনুলেখক ছিলেন—প্রতি মিনিটে তিনি দু'শ শব্দ লিখতে পারতেন। সেইজন্যই তাঁর পারিশ্রমিকও ছিল অত্যন্ত বেশী। তবুও স্বামী বিবেকানন্দের কোন কথাই আমরা হারাতে চাই নি বলে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলাম। প্রথম সপ্তাহের পর মিঃ গুড্‌উইন্ আর কোন পারিশ্রমিক নিলেন না। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলাম: “এর মানে কি মিঃ গুড্‌উইন্?” তিনি বল্লেন: “বিবেকানন্দ যদি তাঁর জীবন দিতে পারেন, আমি অন্ততঃ আমার সেবাটুকু দিতে পারি।” তিনি সমগ্র পৃথিবী ঘুরেছেন স্বামীজীর অনুবর্তী হিসেবে। সাত খণ্ড বই-এ আমরা পেয়েছি স্বামীজীর মুখনিঃসৃত বাণী। মিঃ গুড্‌উইন্-ই তা লিখে নিয়েছিলেন।

স্বামীজীর ভারতবর্ষে চলে যাবার পর আমি তাঁর কাছে চিঠি লিখিনি। প্রতীক্ষা করছিলাম, তিনি নিশ্চয়ই লিখবেন। শেষে একটি চিঠি পেলাম: তাতে লিখেছেন; “তুমি চিঠি লেখ না কেন?” আমি উত্তর দিলাম: “আমি কি ভারতবর্ষে আসব?” তিনি লিখলেন: “হাঁ, দুঃখ, দুর্গতি, দারিদ্র্য, নোংরা আবর্জনা; নেংটি পরা লোক ধর্মের কথা বল্‌ছে—এসব সত্ত্বেও যদি আসতে চাও, তবে এসো। অন্য কিছু যদি চেয়ে থাক তাহ'লে এস না। বিরুদ্ধ সমালোচনা আর আমরা সহ্য করতে পারি না।” প্রথম জাহাজেই আমি রওনা হলাম। ১২ই জানুয়ারী মিসেস্ অলি বুল ও স্বামী সারদানন্দের সহিত আমি যাত্রা করি। পথে আমরা লণ্ডনে নেবেছিলাম, সেখান থেকে

সোজা রোমে এলাম। ১২ই ফেব্রুয়ারী আমরা বম্বে পৌছি। সেখানে মিঃ আলাসিঙ্গা আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর কপালে ছিল বৈষ্ণবের সোজা লাল তিলক! একবার কাশ্মীর যাওয়ার পথে স্বামীজীকে প্রসঙ্গতঃ বললাম: "মিঃ আলাসিঙ্গা দেখছি কপালে বৈষ্ণবের ফোঁটা-তিলক কাটেন।" বলামাত্রই স্বামীজী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে অত্যন্ত তীব্রস্বরে বল্লেন: "তোমাদের কিছু বলতে হবে না। তোমরা এত দিন কি করেছ?" আমি কি অন্যায় করেছিলাম তা' আমি তখন বুঝতে পারিনি। অবশ্য আমি কোন উত্তর দিইনি। আমার চোখে জল এল, আমি বসে রইলাম। পরে জানতে পেলাম মিঃ আলাসিঙ্গা পেরুমল্ একজন ব্রাহ্মণ যুবক। মাদ্রাজের কোন কলেজে তিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মাইনে ১০০৲; তা' দিয়েই পিতা মাতা স্ত্রী এবং চারটি শিশুসন্তানের ভরণপোষণ করতেন। বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যদেশে পাঠাতে তিনিই টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে যান। সম্ভবতঃ উনি না হ'লে আমাদের কখনও বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হ'ত না। তখন বুঝা গেল আলাসিঙ্গার প্রতি মৃদু কটাক্ষেও স্বামীজী কেন বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

দিশা

রবি গুপ্ত

তোমারি চরণে নব-জীবনের বাঞ্ছিত দিশা পেয়েছি আমি
নিশীথ-গভীরে চন্দ্র-আভায় ভরিয়া অমল বার্তা নব:
তোমারি স্বর্ণ-স্বপ্নাঞ্চলে জাগর আমার নিখিল-স্বামি
সে-মধুরে মম সুর-সাধনায় চির প্রসন্ন কণ্ঠে কব।

নিবিড়-নিলীন পরশনে তব উজলি ওঠে কালের শিখা,
ছায়া-আবরণ করি আহরণ কী বাণী বিলাও হিরণ্ময়ী:
তারি আহ্বানে গীতি-সৌরভে জাগে জীবনের মঞ্জরিকা,
প্রস্রবণের চলে বাজি বীণা অনাহত কোন সুরাশয়ী!

গতিরে আমার চলেছ সাধিয়া তব চরণের মঞ্জু-তালে,
তব প্রশান্তি বিধৃত ভুবনে জাগে মোর তাই মর্ম-গান:
আমি সে অতলে করেছি পরশ সে-মন্ত্রে মোর জ্বেলেছি ভালে,
তারি আদিত্য-স্পন্দন-ধারে পূর্ণ করি এ রিক্ত প্রাণ।

মোর জীবনের প্রতিপলে তার ঝংকার চির বিজয়ে ধ্বনি'
তাহারি লীলায় ওঠে প্রস্ফুটি'—প্রস্থনিকা কার কিরণ-মণি!

স্বাধীন ভারতে প্রজাতান্ত্রিক শাসন-প্রতিষ্ঠা

তূর্যনিনাদ, কামানের গর্জন, ব্যাণ্ড-যোগে জাতীয় সঙ্গীত, বাদ্য, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি, দেশব্যাপী আনন্দকোলাহল ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতিরূপে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কার্যভার গ্রহণ করিলে ভারতে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল শ্রীরাজাগোপালাচারী নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপালরূপে কার্যভারত্যাগের প্রাক্কালে তৎকর্তৃক প্রথম রাষ্ট্রপতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ভারতের শান্তি ও অহিংসার আদর্শের প্রতীক হিসাবে দরবারকক্ষে রাষ্ট্রপতির সিংহাসনের পশ্চাতে সভামঞ্চোপরি একটি বিরাট প্রস্তরনির্মিত বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত ছিল। কার্যভার গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রপতি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে মহাত্মা গান্ধীর এবং ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যে অগণিত নরনারী ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করেন এবং প্রজাতন্ত্রী ভারতের নাগরিক হিসাবে জনসাধারণের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেন। এই ঐতিহাসিক দিবস উপলক্ষে রাজধানী নয়াদিল্লীতে জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল।

সংকল্প-বাক্য

এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত সংকল্প-বাক্য পঠিত হয়:—

আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে সংগঠিত করিবার ও ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মমত ও উপাসনায় স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগলাভের সমানাধিকার প্রদানের এবং ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্যের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনগণের মধ্যে সৌভ্রাত্র উন্মেষের পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি।

এতদ্দ্বারা ১৯৪৯ সনের নভেম্বর মাসের ছাব্বিশে তারিখে ভারতীয় গণপরিষদে আমাদের জন্য এই শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ করা হইল।

মৌলিক অধিকার

আইনের সমদৃষ্টি ও ভারতরাষ্ট্রে আইনের আশ্রয়ে সমভাবে থাকিবার সুযোগ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইবে না। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, জন্মস্থান অথবা উহাদের যে কোন একটি কারণে কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করিবেন না। রাষ্ট্রের অধীনে যে কোন কার্যে নিয়োগ অথবা চাকুরীতে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে। অস্পৃশ্যতার বিলোপ-সাধন এবং যে কোন ভাবে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইল। অস্পৃশ্যতার দরুন কাহারও উপর অযোগ্যতা আরোপিত হইলে তাহা আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সামরিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত রাষ্ট্র কোন প্রকার খেতাব প্রদান করিবেন না।

সকল নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকার থাকিবে:

(ক) বক্তৃতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সমাবেশ, (গ) সমিতি অথবা সঙ্ঘ গঠন, (ঘ) ভারত-রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধে পর্যটন, (ঙ) ভারত-রাষ্ট্রের যে কোনো অংশে অবস্থান ও বসবাস, (চ) সম্পত্তির অধিকার, রক্ষা ও বিলিব্যবস্থা, (ছ) যে কোন বৃত্তিগ্রহণ অথবা জীবিকা, বাণিজ্য কিংবা ব্যবসায়চালনা।

আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাহার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইবে না। যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ না জানাইয়া কোন ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হইবে না। নিজ মনোনীত ব্যবহারজীবীর সহিত পরামর্শ ও আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইবে না। ধৃত হইবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধৃত ও পুলিশ হেফাজতে আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিষ্টেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাইবার সময় ঐ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধরা হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ ব্যতীত ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে উক্ত সময়ের বেশী পুলিশ-হেফাজতে রাখা হইবে না।

মনুষ্যক্রয়-বিক্রয়, বেগারপ্রথা এবং অনুরূপ ধরনের বলপূর্বক শ্রম করাইবার রীতি নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহা আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে কোন কারখানা, খনি কিংবা অন্য কোন বিপদসঙ্কুল কার্যে নিয়োগ করা চলিবে না।

জনগণের শৃঙ্খলা, নীতি ও স্বাস্থ্য সাপেক্ষে সকল ব্যক্তিরই বিবেকের স্বাধীনতা, তথা ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অবাধ অধিকার থাকিবে। সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় অর্থ হইতে পরিচালিত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হইবে না।

ভারতীয় রাষ্ট্রে অথবা উহার কোন অংশে অধিবাসী নাগরিকগণের মধ্যে যে কোন শ্রেণীর নিজস্ব সুনির্দিষ্ট ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার থাকিবে। ধর্ম অথবা ভাষার দিক দিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও তাহাদের সকলের নিজ ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকিবে। আইন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব— আগামী ৬ই ফাল্গুন, শনিবার, বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চদশাধিকশততম জন্মতিথি-পূজাদি এবং ১৪ই ফাল্গুন, রবিবার, সাধারণ আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

নিম্নলিখিত স্থানে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে :

বেলুড় মঠ—গত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার বেলুড় মঠের পবিত্র পরিবেশে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহকারে যুগাচার্য স্বামী

বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে মঠে সারাদিন প্রার্থনা পূজা হোম স্তোত্রপাঠ ভোগরাগ ধর্মসঙ্গীত ও কীর্তন হইয়াছিল। এই সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রত্যুষ হইতে সন্ধ্যা অবধি ধনী, নির্ধন এবং জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহু নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়া স্বামীজীর প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

অপরাহ্নে স্বামী মাধবানন্দজীর সভাপতিত্বে মঠপ্রাঙ্গণে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। আমেরিকার হলিউড বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় প্রথম ভাষণ আমেরিকায় প্রদান করেন, তাহার একটি সুগভীর তাৎপর্য আছে। ইউরোপের বিভিন্ন অংশের লোকজন আমেরিকায় গিয়া বসতি স্থাপন করে এবং তথায় একটি নূতন জাতি গড়িয়া উঠে। কিন্তু তাহা হইলেও আমেরিকার সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল গ্রীস ও ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে নিবদ্ধ এবং এই কারণেই আমেরিকাকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মণিকোঠা বলিয়া অভিহিত করা যায়। আমেরিকায় স্বামীজীর বাণীপ্রচার জগদীশ্বরের অভিপ্রেত ছিল। স্বামীজী নিজেই উক্ত ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন ঘটে তাহা হইলে জগতে পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় হইতে পারে। ঐহিক উন্নতিসাধন ও মানসিক উৎকর্ষলাভ পাশ্চাত্যের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ এক্ষণে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে যে, কেবলমাত্র কর্মানুষ্ঠান ও উহার ফললাভ এবং মানসিক শক্তিবৃদ্ধির দ্বারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত হয় না। স্বামীজী পাশ্চাত্যকে বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছেন, ঐহিক সামর্থ্য ও মানসিক উৎকর্ষের দ্বারা তাঁহাকেই প্রস্ফুট করা আবশ্যক। ভারতবর্ষকেও স্বামীজী এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের মধ্যেই ভারতের শক্তি নিহিত আছে, কিন্তু জগতে ঐহিক ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষকে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া সার্থকতা অর্জন করিতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিকট তাঁহার ইহাই নির্দেশ যে, কর্মের জীবন ও চিন্তার জীবন সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্যজী বলেন, স্বামীজী ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে। ভারতবর্ষের দুর্গতির প্রতিকার কোন পথে তাহারও তিনি ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। ভারতের জাতীয় জীবনের মূল সুর ধর্ম; যত দিন ধর্মভাব প্রবল থাকিবে, তত দিন ভারতের সমাজে অথবা রাষ্ট্রে দুর্বলতা প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়াই তিনি মনে করেন। স্বামীজী বলিতেন যে, দেশবাসীর নিকট বেদান্তের প্রাণদ বাণী প্রচার করিতে হইবে এবং এই বাণীর দ্বারাই জাতির প্রাণশক্তি উদ্বোধিত হইবে। স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বাণীর সহিত সমগ্র জাতি যাহাতে পরিচিত হয় তদুদ্দেশ্যে স্বামীজীর গ্রন্থসমূহ তরুণদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া দরকার।

সভাপতি স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে বলেন যে, স্বামীজী বেদান্তের সত্য সারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সত্যকার ধর্ম যে কি, তাহা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এই ধর্মের বলে বলীয়ান হইয়া তিনি আমেরিকায় শাশ্বত সত্য প্রচার করিয়াছেন। ধর্মের সত্যকার অর্থ কি,

আমেরিকার নিকট স্বামীজী তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আজ পাশ্চাত্যের দৃষ্টি ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকা আজ ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইলে ঐহিক উন্নতি ছাড়াও আরও কিছু লাভ করা আবশ্যক। স্বামীজী তাঁহার দেশবাসীর উপর গুরু কর্তব্যভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীকে তিনি যে সকল বাণী দিয়া গিয়াছেন, নিজ নিজ জীবনে কে তাহা কতদূর অনুসরণ করিতে পারেন তাহা আজ তাঁহাদের নির্ণয় করা উচিত। স্বামীজীর বাণীসমূহ তাঁহারা যদি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে জগদ্বাসীকেও তাঁহারা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মর্মবাণী দান করিতে পারিবেন।

স্বামী অবিনাশানন্দজী এবং শ্রীকাননবিহারী মুখার্জিও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথা আলোচনা করেন। স্বামী চণ্ডিকানন্দজীর উদ্বোধন এবং স্বামী বীতশোকানন্দজীর সমাপ্তি সঙ্গীতে সকলে মুগ্ধ হন।

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—এই আশ্রমে গত ২৬শে পৌষ হইতে ২রা মাঘ পর্যন্ত স্বামীজীর জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের কয়দিনই আশ্রমে বহু লোক-সমাগম হইয়াছিল। প্রথম দিবস উপনিষদ-পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, কালীকীর্তন, ভজন-সঙ্গীত ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। একটি সম্মেলনে কয়েক জন বক্তা স্বামীজীর জন্ম ও বাল্যকথাদি আলোচনা করেন। ২৭শে হইতে ২৯শে পৌষ তিন দিন রামায়ণের তিনটি পালা গীত হয়। শহরের খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীমেঘনাদ বসাক ও তাঁহার দলের কালীকীর্তন এবং ভজনসঙ্গীত সকলকে আনন্দ দান করে। ২৯শে পৌষ অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় অন্যান্য শিক্ষায়তনের কতিপয় ছাত্র এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন। বিবেকানন্দ বালকসঙ্ঘ কর্তৃক সভার উদ্বোধন ও সমাপ্তিসঙ্গীত গীত হয়। ৩০শে পৌষ মহিলা-সভার অধিবেশনে শ্রীশোভনা রায়ের সভানেত্রীত্বে ও শ্রীবিভা সেনের পরিচালনায় সভার কার্য পরিচালিত হইয়াছিল। কয়েক জন শিক্ষিতা মহিলা ও ছাত্রী স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১লা মাঘ দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার অনুষ্ঠান হয়। অপরাহ্নে শ্রীবসন্তকুমার দাস, এম্-এল্-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বৃহৎ সভায় মাননীয় মন্ত্রী হবিবুল্লাহ্ বাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর সরোজেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী, ডক্টর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ও আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। উৎসবের শেষদিন ২রা মাঘ আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের এক সভায় স্বামীজীর জীবনকথা ও বাণী আলোচিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা-নগরীতে এই ধর্মানুষ্ঠানটি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ২৬শে পৌষ হইতে ১লা মাঘ পর্যন্ত এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পূজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, রামায়ণগান ও বক্তৃতা উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। স্বামীজীর উৎসবে এত বিপুল লোক-সমাগম এই শহরে বহুকাল দেখা যায় নাই। ১লা মাঘ শ্রীপ্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী জনসভা হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীঅন্নদা

চরণ ভৌমিক, শ্রীউৎফুল্ল রায়, শ্রীমতিলাল পুরকায়স্থ, শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দে ও স্বামী বিমলানন্দজী স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গত ২৬শে পৌষ, এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজার্চনা, ভজনসঙ্গীত, প্রসাদবিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ও জনসভা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন রায়, শ্রীশশীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দজী স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবধারা সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের স্বামীজির মৌলিক রচনাবৃত্তি খুবই মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন আশ্রম—গত ২৬শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, শাস্ত্রপাঠ, ভজন, প্রসাদবিতরণ ও জনসভা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দজী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। পরদিন আশ্রম-বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দের নিকট স্বামী জপানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ২৮শে পৌষ সন্ধ্যায় খাগড়া সবুজসঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভারতে তথা জগতে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্বন্ধে স্বামী জপানন্দজী এক বক্তৃতা করেন। পরদিন গোরাবাজার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী ও স্বামী জপানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সম্বন্ধে বলেন। ৩০শে পৌষ লালবাগে আহূত এক জনসভায় উক্ত স্বামীজীদ্বয় দেশসেবায় স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা এবং পরদিন বহরমপুর গান্ধীপার্কে জনাব রেজাউল করিম ও স্বামীজীদ্বয় বিশ্বরাষ্ট্রে স্বাধীন ভারতের স্থান এবং পাশ্চাত্য জগতে স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষ দিন স্বামী জপানন্দজী স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রগণের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে উৎসবকার্য সমাপ্ত হয়।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ২৬শে পৌষ হইতে তিন দিন এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবস বিশেষ পূজা, কীর্তন, বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যায়াম ও নানাবিধ ক্রীড়াদি হয়। সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র সহযোগে জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিবস স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রছাত্রীদের একটি বিরাট সভা হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের প্রবন্ধ, বক্তৃতা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সর্বশেষে সভাপতি এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজী বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যার পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান সভ্যতা বিষয়ে আলোকচিত্রে বক্তৃতা দেন। তৃতীয় দিবস জেলা জজ শ্রীরেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীরামহরি রায়, অতিরিক্ত জেলা জজ ডক্টর মতিলাল দাশ এবং স্বামী পরশিবানন্দজী স্বামীজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও অবদান বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী—এই প্রতিষ্ঠানে ২৩শে পৌষ হইতে তিন দিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন জাতীয় কংগ্রেসের

ভূতপূর্ব সভাপতি ও ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পৌরোহিত্যে এক সভা হয়। মাননীয় আজাদ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। ক্লান্তিবশতঃ তিনি উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতপের উপর সভাপরিচালনার ভার অর্পণ করেন। পুরী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী, অধ্যাপক শ্রীজয়রমণ, শ্রীঅশ্বিনী চৌধুরী ও পণ্ডিত বাসুদেব মিশ্র যথাক্রমে উড়িয়া, ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

পরদিন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ক্রীড়া ও রচনা প্রতিযোগিতা হয়। রচনার বিষয় ছিল 'বিশ্বশান্তিস্থাপনে স্বামীজীর অবদান'। কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ছাত্র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বেহেরা ও পুরী সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শ্রীচক্রধর দাস যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় বালকবালিকাদিগকে পুরী এমার মঠের মোহান্ত শ্রীমং গদাধর রামানুজ দাস ৪০টী পুরস্কার বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় মহাবীরপূজা ও রামনাম-সংকীর্তনের পর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোচনা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী জগন্নাথানন্দজী ও স্বামী বুদ্ধানন্দজী যথাক্রমে উড়িয়া ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন। শেষদিন বিশেষ পূজা ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবাদি হইলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

বিবিধ সংবাদ

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৩০শে পৌষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে স্বামী পবিত্রানন্দজী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। তৎপর ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধ্রুপদ-সঙ্গীত গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তবিনোদন করে।

রাড়ীখাল (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—গত ২৬শে পৌষ এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীনিবারণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা এবং শ্রীপ্রাণকুমার গাঙ্গুলী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে শ্রীবিষ্ণুপদ সেন ও সভাপতি মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাসমাপ্তির পর ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে পদাবলীকীর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ২৬শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা,

ভজন ও প্রসাদবিতরণ হইয়াছে। আহূত জনসভায় শ্রীশান্তিলাল দেশাই, পণ্ডিত শ্রীছোটেলাল পরবার প্রভৃতি বর্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তৎপর শ্রীনীহার দেবী 'সমূহ-নামকীর্তন' এবং শ্রীকালিদাস ভগৎজী তদ্দেশীয় কীর্তন পরিচালনা করেন।

চেতলা (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপ সমিতির (১৯৪৮-৪৯) কার্যবিবরণী—চেতলা নিবাসী পরহিতপরায়ণ ৺বামাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ ৺অকিঞ্চন চক্রবর্তীর (স্বামী অমৃতানন্দজীর) অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় ১৯১৫ সনে এই মণ্ডপ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে এই মণ্ডপে প্রতি সপ্তাহেই কয়েকবার শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধুভক্তসমাগম, ধর্মালোচনা এবং ভজন-কীর্তন ইত্যাদির অনুষ্ঠানও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীঠাকুরের রথযাত্রা, মণ্ডপপ্রতিষ্ঠারবার্ষিকী, দুর্গোৎসব, কালীপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ভক্তগণ এবং জনসাধারণ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। মহিলাদিগের জন্য ও বিশেষ সম্মেলনের ব্যবস্থা ছিল। মণ্ডপের গ্রন্থাগারে আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে মোট ৭১৩ খানি গ্রন্থ ছিল। তন্মধ্যে ৫৬৭ খানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং ১৪৬ খানি ইংরেজী। ৫৮৬ খানি গ্রন্থ বাহিরে পড়িতে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারে কয়েকখানি মাসিক পত্রিকাও রাখা হইয়াছে।

এই মণ্ডপ কর্তৃক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে ইহাতে মোট ১১,৬৪৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করেন; ১৯৪৭-৪৮ সনে ৬০৪০ এবং ১৯৪৮-৪৯ সনে ৫৬০৮ জন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির সাহায্যে মণ্ডপ-কর্তৃক ২৬,৪২৫টি শিশুকে দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে।

১৯৪৭-৪৮ সনে বিভিন্ন খাতে এই প্রতিষ্ঠানের আয় পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত সহ মোট ২৫০৫৯৮৫ পাই এবং ব্যয় ২৪,৪৯১।/৩ পাই। ১৯৪৮-৪৯ সনে পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত সহ মোট আয় ৬৯৭৩৸৶২ পাই এবং ব্যয় ৬৬৮৯৸/৩ পাই। দাতব্য চিকিৎসালয় বিভাগে ১৯৪৮-৪৯ সনে পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত সহ মোট আয় ৪১৬॥৶৬ পাই এবং ব্যয় ৪১০/৯ পাই।

প্রাচ্যবাণী মন্দির—১৯৪৩ সনে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী ও ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরীর প্রচেষ্টায় এবং ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতির উৎসাহে 'প্রাচ্যবাণী মন্দির' নামক সংস্কৃতবিষয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত সার্বজনীন গ্রন্থমালা, গবেষণা গ্রন্থমালা, সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা, তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থমালা এবং সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানদের দান গ্রন্থমালা—এই পাঁচটী গ্রন্থমালায় মন্দির হইতে প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং একটী ইংরেজী গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য দুইটী টোল স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতা গভর্নমেণ্ট হাউসে ভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণী-সংহার' নাটক মূল সংস্কৃতে বহু বিশিষ্ট দর্শকের সম্মুখে প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। মাননীয় প্রদেশপাল ডক্টর কাটজু মহোদয় এই অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। আমরা প্রাচ্যবাণী মন্দিরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়

আবেদন

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্ত অবস্থায় আছেন—সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।" এই উদ্দেশ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্পা ও ব্রতধারিণী, গুরুগতপ্রাণা, পরমবিদুষী ভগিনী নিবেদিতা সকল প্রকার দুঃখদৈন্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া ভারতীয় নারীর মধ্যে যথার্থ শিক্ষার বিস্তারকল্পে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল দেহাবসানে এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করেন। ভগিনী নিবেদিতার পূতজীবনের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যা-প্রভাবে এই শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সঞ্চিত আছে, তাহার পরিচয় গত পঞ্চাশৎ বর্ষের কার্য্যসাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক বালিকার জীবন বিদ্যার পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে ও হইতেছে। অনেক অন্তঃপুরচারিণী মহিলা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং বহু দরিদ্র কুলবধূ এখানে শিল্পশিক্ষা লাভ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পাঠ-সমাপনান্তে এই বিদ্যালয়েই শিক্ষাকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এখানে আটশত ছাত্রীর মধ্যে পাঁচশত ছাত্রীকে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটি মাতৃজাতির সেবা করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ১৯৪৬ সন পর্য্যন্ত তীব্র অভাব-অনটনের মধ্যেও ইহার পরিচালনা করিতে হইয়াছে। ১৯৪৭ সন হইতে এই জন্য উচ্চ শ্রেণীগুলিতে বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ বেতন (যদিও গভর্নমেণ্টনির্দ্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা কম) লইতে বাধ্য হইতেছেন। ভারতীয় শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত এই শিক্ষায়তনের পক্ষে শিক্ষার্থিনীর সহিত এরূপ আর্থিক সম্পর্ক অবাঞ্ছনীয়। অবশ্য এখনও প্রাথমিক এবং শিল্পবিভাগে কোন বেতন লওয়া হয় না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে শিল্পবিভাগের বহু দরিদ্র নারীকে যথোচিত সাহায্য করা যাইতেছে না। এই সকল বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য আরও অন্ততঃ ৬০০০৲ টাকার বাৎসরিক আয় প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াও বৎসরে ৪০০০৲ টাকার ঘাটতি পড়িতেছে।

ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিতা হইয়া এবং স্বামীজী-প্রবর্ত্তিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া বহু বিদুষী নারী এই বিদ্যালয়সংলগ্ন সারদামন্দিরে ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপন করিতে আগ্রহান্বিতা। সারদামন্দিরে বর্ত্তমানে এইরূপ কয়েক জন মহিলা অবস্থানপূর্ব্বক কাজ করিতেছেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য আরও এইরূপ নারীকর্ম্মীর প্রয়োজন। সারদামন্দিরের বিশেষ কোন স্থায়ী তহবিল না থাকায় এই প্রকার কর্ম্মীর সংখ্যা বাড়ান সম্ভবপর হইতেছে না।

সারদামন্দির ছাত্রীনিবাসে স্থানাভাবহেতু বহু ছাত্রীকে স্থান দেওয়া যাইতেছে না। নিবেদিতা বিদ্যালয় গৃহটি সুদৃশ্য, কিন্তু অবিলম্বেই উহার

ছাদের স্থানে স্থানে বহুলপরিমাণে সংস্কার আবশ্যক। ইহাতে অন্যূন ২০,০০০৲ টাকার দরকার। এতদ্‌ব্যতীত ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগ স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন। উহার জন্য জমিক্রয় ও গৃহনির্ম্মাণে লক্ষাধিক টাকা লাগিবে। যাঁহারা উনবিংশ শতকের শেষভাগ ও বর্ত্তমান শতকের প্রথমাংশের ভারতেতিহাসের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা, চারুকলা এবং রাষ্ট্রিক আন্দোলনক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার দান কিরূপ মহিমময় ও সুদূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে ভগিনী নিবেদিতা উমার ন্যায় তপস্যা করিয়া ভারতের আত্মস্বরূপ শিবকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। সেই মহিমময়ী নারীর প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাঁহারা কি বিদ্যালয়ের এই আর্থিক অনটনের দিনে নিবেদিতার সর্ব্ব-প্রধান সাধনক্ষেত্র ও একমাত্র স্মৃতিমন্দিরের রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না? এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে দেশবাসী যাহা দান করিবেন তাহা শতগুণ বর্দ্ধিত সামাজিক কল্যাণরূপে ফিরিয়া পাইবেন।

নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বা নিবেদিতা বিদ্যা-লয়ের সম্পাদিকার নিকট (৫নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩) সাহায্য প্রেরণ করিলে উহা সাদরে গৃহীত হইবে।

নিবেদক
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজতন্ত্রবাদ

সম্পাদক

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গ্রন্থাবলী বক্তৃতাবলী ও পত্রাবলীর বহু স্থানে সমাজতন্ত্রবাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। দেশের ভূমিজ ও শিল্পজ প্রমুখ সকল সম্পদের উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা সাম্যভিত্তিতে জনসাধারণের হিতার্থে পরিচালন করাই সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি। স্বামীজী এই নীতি মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করিয়াছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষে সকলকে সমান সুযোগ দান তাঁহার একান্ত কাম্য ছিল। তিনি কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি জাতি শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের 'একচেটিয়া ভোগাধিকার'-এর অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, "একচেটিয়া ভোগাধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তির কর্তব্য—নিজের সমাধি নিজেই খনন করা; যত শীঘ্র তাঁহারা ইহা করিবেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল, যত বিলম্ব করিবেন ততই পচিবেন এবং সে মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর হইবে!" দেশের অভ্যুদয় ও উন্নতির জন্য তিনি আপামর জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া অবনত অনুন্নত পদদলিত দরিদ্র কৃষক শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় ও উন্নতি বিধানের আবশ্যকতা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সমষ্টির উন্নতিতেই ব্যষ্টির উন্নতি, সমষ্টির সুখেই ব্যষ্টির সুখ। সমষ্টিকে ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে তাহাদের সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।"

স্বামী বিবেকানন্দ সমষ্টি জনসাধারণ হইতে নবভারতের অভ্যুদয় কামনা করিয়াছিলেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে।" তিনি অভিজাত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার

উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।" ইহা অতি স্পষ্ট সমাজতন্ত্রবাদ।

স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, "আমি সমাজতন্ত্রবাদী।" তাঁহার প্রচারিত বেদান্তেও সমাজতন্ত্রবাদ বিশেষ ভাবে সমর্থিত। তিনি প্রচার করিয়াছেন যে, বেদান্তমতে মানুষ কেবল মানুষের ভাই নয় অধিকন্তু আত্মার দিক দিয়া সম্পূর্ণ এক ও অভেদ—সকল নরনারী একই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত এবং সকল জ্ঞান শক্তি ও পবিত্রতার আধারস্বরূপ একই আত্মার বহুরূপ। মানুষে মানুষে পার্থক্য ও ভেদ-বৈষম্য কেবল তাহাদের আত্মশক্তি-বিকাশের তারতম্যে। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাম্য-মৈত্রী কোন মানুষ কল্পনায় স্থান দিতেও অসমর্থ। স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্তবেদ্য কল্পনাতীত সাম্য-মৈত্রীকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র অর্থনীতি সমাজ প্রভৃতি মানবজীবনের সকল বিভাগ গড়িয়া তুলিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বেদান্তের মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা যে যে-কাজই করুক না কেন, যে যে-অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্ব্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। * * যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—'তুমিও যেমন আমিও তেমন ; তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরেও সে ঈশ্বর আছেন।' আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।"

স্বামীজী-প্রচারিত বেদান্তবেদ্য সমাজতন্ত্রবাদের দার্শনিক ভিত্তি যেমন দৃঢ় এবং যুক্তি-বিচারসম্মত, তেমন ইহাতে শারীরিক ও মানসিক এবং ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ উন্নতি-সাধনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপিত, কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ-সমূহের দার্শনিক ভিত্তি একেবারেই দৃঢ় ও যুক্তি-বিচারসহ নহে এবং ইহাতে কেবল শারীরিক ও ঐহিক উন্নতিসাধনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। গভীর পরি-তাপের বিষয় ভারতবাসী বেদান্তের চূড়ান্ত সাম্যকে তাহাদের জীবনের মুখ্য আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াও ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহারক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। এই জন্য বেদান্ত অধিকাংশ নরনারীর নিকট এখনও নির্বস্তুক (abstract) ও কাল্পনিক (Utopian) তত্ত্ব মাত্রেই পর্যবসিত! কিন্তু যদি পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি-গুলিকে ভারতবাসীর জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্টতর বেদান্তবেদ্য সমাজতন্ত্রবাদকে তাহাদের জীবনে প্রয়োগ করা কেন সম্ভব হইবে না? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রবাদ ভারতবাসীর সমধিক উপযোগী এবং ইহা তাহাদের পক্ষে কার্যে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এই সমাজতন্ত্রবাদ তাহাদের কর্মজীবনের সকল-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিলে ভারতের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় বৈশিষ্ট্য—ধর্ম এবং সংস্কৃতিও অব্যাহত থাকিবে। পাশ্চাত্য সমাজ-তন্ত্রবাদের মূলনীতিকে বৈদান্তিকভাবাপন্ন করিলে অর্থাৎ জড়বাদের স্থলে চেতনবাদ বা আত্মবাদ অবলম্বন করিলেই ইহা ভারতের জনসাধারণের পক্ষে কার্যে পরিণত করা অত্যন্ত সহজ হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের চূড়ান্ত একত্ব অভেদত্ব সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনকে রাষ্ট্র অর্থনীতি সমাজ ধর্ম প্রভৃতি মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে—এমন কি দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইতে উপদেশ দিয়াছেন। সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিকে ভারতীয়ভাবাপন্ন করিয়া উহা ভারতবাসীর জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

বর্তমানে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি বিশেষতঃ ইহার অর্থনীতিক সাম্য কমবেশী পরিগৃহীত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রও যে এই আদর্শের অনুসরণ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের সমাজতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে নিছক জড়বাদী অত্যুগ্র বৈপ্লবিক মার্ক্সপন্থী সাম্যবাদিগণ (Communists) শ্রমিকবিপ্লব-সহায়ে অভিজাত ধনিকশ্রেণীকে (Bourgeoisie) বলপূর্বক একেবারে উৎসন্ন করিয়া একতান্ত্রিক শ্রমিকপ্রাধান্যপূর্ণ রাষ্ট্র (Dictatorship of Proletariat) স্থাপন করিতে যে গোপনে চেষ্টা করিতেছে, ইহা এই দলের আইন ও শৃঙ্খলা-বিরোধী কার্যকলাপে সুস্পষ্ট। ইহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম সংস্কৃতি এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা একেবারে নষ্ট হইবে। ভারতের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলগুলি উহাদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করিয়া গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ বৈধ ভাবে ক্রমশঃ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট। ইহাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও কর্মপ্রণালী। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে গণতন্ত্রমূলক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরম পরিণতিরূপে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবেই। এইজন্য সমাজতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতবাসীর প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালীর সমাজতান্ত্রিক আকার প্রদান অপরিহার্য। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুসারে বেদান্তের চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রীকে সকল নরনারীর জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

"সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অপর কার্য্য করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি এক জোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্য্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না; তুমি খুন করিলে তোমার প্রশংসা করিতে হইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমার ফাঁসি দিতে হইবে এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকারতারতম্য উঠিয়া যাইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শব্দবিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমালা

শ্রীচিন্তাহরণ বিশ্বাস, বি-এ, কাব্যতীর্থ, কাব্যনিধি

বস্তুমাত্রকেই মানব কোন না কোন শব্দ বা ধ্বনি দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকে। সেই নাম এবং বস্তুর অভেদকল্পনাই ভাষার প্রাণ। "বস্তুরূপী ইহাকে শব্দরূপী বলিয়া বুঝিবে"—এই স্থির সঙ্কল্প যখন ভুল হইয়া যায় তখন ভাষা অর্থহীন ধ্বনিতে পরিণত হইয়া ভাবের অভিব্যক্তি এবং উপলব্ধিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। নাম এবং নামীর, বস্তু এবং ধ্বনির যে সম্পর্ক তাহা কল্পনা। একটি কল্পিত অর্থ না থাকিলে ভাষা কিছুই বুঝাইতে পারে না। এই অর্থের বন্ধন যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সার্ব্বজনীন শক্তিলাভ করিতে পারে না তাহা সকলেরই সুবিদিত। এক দেশের ভাষা অপর দেশে অর্থহীন, এক জাতির ভাষা অপর জাতির নিকট অবোধ্য। আবার কল্পনার ইতরবিশেষে একই ভাষাভাষীর মধ্যে একের প্রযুক্ত বাক্য অপরের মধ্যে বিপরীত ভাবের যোজনা করিতেও দেখা যায়। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

"মানবের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে
বদ্ধ চারিধারে, ঘুরে মানুষেরই চারিদিকে।"

ভাষার এই দুর্ব্বলতা এবং সঙ্কীর্ণতা কিরূপে মানবের ভাবকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা যিনি আপন অন্তরের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাঁহার নিকট কবির উপরোক্ত আক্ষেপোক্তি অরণ্যে রোদন মাত্র। যিনি ভাবময়ী প্রকৃতির সর্ব্বত্র আপন অভিব্যক্তিকে বিলাইয়া দিয়া প্রাণের আনন্দে আত্মহারা হইতে চাহেন, যিনি বিশ্বরাজের গোপন অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক আকাশের মৌনমুখর নিস্তব্ধতা, মলয়হিল্লোলের ধীরমন্থর সঙ্গীত এবং পশুপক্ষীর সুমধুর তানের মধ্য দিয়া সেই বিরাট প্রাণময়ের ভাব গ্রহণ করিতে চাহেন, তিনিই বুঝিতে পারেন মানবের কল্পিত ভাষা কতই দুর্ব্বল, কতই না কষ্টকল্পিত!

ভাষার এই ত্রুটি দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের সত্যানুসন্ধিৎসা যে অপূর্ব্ব শব্দবিদ্যার আবিষ্কার করিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই বিদ্যা যে কেবল ভারতীয় সাহিত্যকেই সজীব করিয়াছিল তাহা নহে, ভারতের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি যে ইহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া কেবল ভারতের নয়—সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হইয়াছিল তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণসমূহে ভারতীয় বর্ণমালার উচ্চারণস্থাননির্ণয় বিষয়ক আলোচনার বড়ই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতিক ধ্বনিগুলির অর্থ-সংস্কারবিহীন অবস্থার স্বরূপনির্ণয়ই উক্ত আলোচনা-সমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিবার বহু কারণ রহিয়াছে। তবে উপযুক্ত আগ্রহশীল গবেষকের অভাবে সেই বিদ্যার ধারাবাহিক আলোচনা যে আজ একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের কয়েকটি অনাদৃত অংশ হইতেই জানা যায়। গুরুগীতার একাংশে লিখিত আছে—

"গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ॥"

ইহাতে বুঝা যায় যে 'গ'কার 'উ'কার প্রভৃতি

ধ্বনিগত এক একটি শক্তি মানবের দেহমনের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ— ইহা তাঁহারা যুক্তি-তর্কের দ্বারাই বিশ্বাস করিতেন।

ভারতের বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আজকাল সর্ব্বত্রই শুনা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই বৈজ্ঞানিকতা কি তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। মানবদেহনিঃসৃত যে স্বাভাবিক ঊনপঞ্চাশৎ ধ্বনি রচনানৈপুণ্যে কত মধুময় কাব্য-রসের সঞ্চার করিয়া জগৎ বিমোহিত করিতেছে, যে তন্ত্রীলয়সমন্বিত, বীণানিক্বণশিঞ্জিত শব্দমালা সঙ্গীতরূপে কঠিন প্রস্তরেরও চেতনাসঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই ধ্বনির বিশ্লেষণ বা পর্য্যালোচনা যে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চার বহির্ভূত রহিয়া গেল তাহা সত্যই গভীর পরিতাপের বিষয়।

ঊনপঞ্চাশৎ ধ্বনির স্বরূপ এবং উৎপত্তি-কাহিনী আলোচনা করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টি প্রথমেই কল্পিতার্থবিহীন স্বাভাবিক ধ্বনিসমূহের উপর পড়ে। আমাদের বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা, কার্য্য-কলাপ সমস্তই শব্দের কল্পিতার্থ অবলম্বনে নিষ্পন্ন হইতেছে। পিতা মাতা ভাই আম কাঁটাল প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলে ঐ শব্দানুরূপ এক একটা বিশেষ বিশেষ বস্তুর কল্পিত আকার মনে উদিত হইয়া প্রাণে ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতি ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে। আম বলিলে একটা বিশিষ্ট ফলের আকৃতি মনে আসিয়া আহার করিবার স্পৃহা জাগাইয়া দেয়, কিন্তু এ স্থলে দেখা যায় যে ঐ আমের আকৃতি এবং আম শব্দটীর পরস্পর সম্বন্ধ আমার কল্পিত। আমি কল্পনাবলে এই সম্বন্ধ স্বীকার করি বলিয়াই আম শব্দ উচ্চারণে আমাতে লোভের সঞ্চার হইয়া থাকে। আর যাহারা কল্পনা দ্বারা ঐ নামনামী সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে 'আম' শব্দ লোভের উদ্বোধক হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় এক জন বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ইংরেজের নিকট 'আম' উচ্চারণ করিলে তাঁহার মনে কোন বস্তুর আকৃতি জাগিবে না। এইরূপে দেখা যায়, ধ্বনির কল্পিতার্থবোধক মানব-কল্পিত ভাষা সার্ব্বজনীন শক্তিলাভ করিতে পারে না। বঙ্গভাষায় লিখিত ভাবরাশি বাঙ্গালীকেই ভাবান্বিত করিতে পারে। ফরাসী ভাষার শব্দাবলী ফরাসীগণেরই বোধগম্য। ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রের ভাষাতেই ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে এবং মানুষ মানুষের কথাই বুঝিতে পারে। সুতরাং প্রকৃতি যে নিগূঢ় ভাষায় মানবের নিকট আপন অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাকে অমৃতের পুত্ররূপে পরিণত করিতে চাহে, যে ভাষার আভাস মাত্র লাভ করিয়া ইংরেজ কবি Words-worth প্রকৃতির পরম শান্তির সহিত মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান দুঃখদৈন্যময় জীবনের তুলনা করিয়া গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন "What man has made of man", যে ভাষার বর্ণ শিক্ষা করিয়া ভারতীয় ঋষিগণ বনভূমির সজীবতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি পূর্ব্বক উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"ভো ভো তপোবনতরবঃ,
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং
সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

সেই ভাষাকে আশ্রয় করিতে হইলে আমা-দিগকে অ আ ই প্রভৃতির স্বাভাবিক ধ্বনির অনুধাবন করিতে হইবে। বর্ষার প্রাণমাতান ঝির্ ঝির্ শব্দে কি আনন্দ, পক্ষীর কলরবে মুখরিত প্রভাতের রবিকিরণে কি অপরূপ বিহ্বলতা বিদ্যমান, তাহা জানিতে হইলে আমাকে

গণ্ডীবদ্ধ মানব-কল্পনার অতীতে গমন করিয়া স্বভাবের সহিত যোগ দিতে হইবে।

পাণিনি-ব্যাকরণের অবতরণিকায় বর্ণমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা এই গল্প শুনিতে পাই—

"নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো
ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধান্
এতদ্বিমর্ষে শিবসূত্রজালম্॥

অ ই উ ণ্॥ ঋ ৯ ক্॥ এ ও ঙ্॥ ঐ ঔ চ্॥ হ য় ব র ট্॥ ল ণ্॥ ঞ ম ঙ ণ ন ম্॥ ঝ ভ ঞ্॥ ঘ ঢ ধ ষ্॥ জ ব গ ড দ শ্॥ খ ফ চ ট ত ব্॥ ক প য়্॥ শ ষ স র্॥ হ ল্॥"

মহর্ষি পাণিনি শব্দব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে দীর্ঘকাল দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া নটরাজ আপন ঢক্কাযন্ত্রে চতুর্দ্দশবার আঘাত করিয়া 'অ ই উ ন্' প্রভৃতি চৌদ্দটি ধ্বনি সৃষ্টি করেন। এই চৌদ্দটি ধ্বনিই জগদ্বিখ্যাত পাণিনি-ব্যাকরণের মূল উপাদান রূপে গৃহীত হইয়া শিবসূত্র আখ্যা লাভ করিয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এই শিব-সূত্রে অ ই উ ঋ ৯ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই সুকৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা এই পাণিনি-ব্যাকরণকে কল্পনালেশবিহীন বিশুদ্ধ ধ্বনিশাস্ত্র বলিয়াও অভিহিত করিতে পারি। তাই দেখিতে পাই ভাষাবিদ্ বৈয়াকরণগণ পাণিনি-গ্রন্থকে ব্যাকরণসূত্রাবলী রূপে অধ্যয়ন এবং আলোচনা করিলেও দার্শনিক ও যোগানুরক্ত ব্যক্তিগণ পাণিনি-ব্যাকরণকে উপনিষদ্‌জ্ঞানে পাঠ করিয়া ইহা হইতে গভীর যোগের উপদেশ এবং অমৃতময় অধ্যাত্মজ্ঞান-রাশি সঞ্চয় করিতেছেন।

মানবের মুখনিঃসৃত বাক্যলহরী শ্রবণ করিতে থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহার দেহরূপী বীণার এক এক অংশে ঝঙ্কার দিয়া এক এক সময়ে এক এক রূপ ধ্বনি নির্গত হইতেছে। যখনই দেহের কোন অংশ হইতে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তখনই ঐ স্থলে কোন প্রকার স্পন্দন বা আলোড়ন ক্রিয়া চলিতে থাকে, আবার দেহের বিভিন্ন স্থলের স্পন্দন কাম ক্রোধ দয়া দাক্ষিণ্য স্নেহ ধীরতা চঞ্চলতা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব এবং অনুভূতির কারণ। মনস্তত্ত্ববিদ্যার গবেষকগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে স্নায়ুতন্তুর বিভিন্ন অংশের স্পন্দন যে কেবল বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধক তাহা নহে, আমরা যে শব্দস্পর্শাদিসমন্বিত দৃশ্যজগৎ বুঝি এবং অনুভব করি তাহার কারণও এই স্পন্দনসমূহ। তাই শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে নির্গত ধ্বনি বা বর্ণ অতি সূক্ষ্মরূপে আমাদের দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ—এই কথা সেই যুগের ঋষিগণের সুবিদিত ছিল। অর্থহীন অনুভূতিময় শব্দশাস্ত্রের গবেষণাবলে তাঁহারা মানবের মনোগত এবং দেহগত অস্বাভাবিক বেগসমূহকে সংযত এবং স্বাভাবিক করিবার উত্তম কৌশল আবিষ্কার করিয়া জগতের যে মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহা যে আজ সমাজের চিন্তাশীল-নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুসন্ধান করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে মানবসমাজে দেহগত স্পন্দনের বেগ স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করিলেই কুটিলতা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন প্রভৃতি নৈতিক অধঃপতন মানবজাতির মজ্জাগত হইয়া পড়ে। মানবের উচ্চারিত অব্যক্ত শব্দরাশির বিশেষ জ্ঞান যে এই অবনতি প্রতিবিধান করিতে সমর্থ তাহা আজ আমাদের শিক্ষা এবং গবেষণার অঙ্গ নহে। এই ধ্বনিসাধনার বলে এক দিন

ভারতের তরুতলাশ্রয়ী সাধু-সন্ত ছিন্ন কন্থায় আবৃত হইয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসে হরিনামগুণ করিতেন। আর সেই আনন্দোচ্ছ্বাস ঐশ্বর্য্যমত্ত সম্রাট্‌গণকেও শান্তির সন্ধানে উন্মুখ করিয়া তুলিত। সমাজের অনুকরণীয় ব্যক্তিগণের এই আদর্শ সমগ্র দেশে প্রভাববিস্তার করিয়া দুর্নীতি এবং অন্যায়কে ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। দেশের নৈতিক অধঃপতনের মূলে যে ধ্বনিবিদ্যার অভাব তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। অধিকাংশ মানুষ যে নিবিষ্টচিত্তে দুই ঘণ্টা কাল কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না, স্কুলের অনেক ছাত্র যে অল্প বয়সেই অধ্যয়নবিমুখ ভবঘুরে এবং আত্মোন্নতিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে, কামক্রোধাদির প্রবল উত্তেজনা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক যুবক যে উচ্ছৃঙ্খল এবং সমাজের সর্ব্বপ্রকার বিদ্রোহাচরণে উৎসাহী হইয়া উঠে, তাহার প্রধান হেতু মানবের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধক ধ্বনিবিদ্যার অপ্রচলন। দেহের স্পন্দন আমাতে যখন যেমন অনুভূতি এবং ভাবধারা সৃষ্টি করে আমি স্বভাবের নিয়মেই সেই ভাবের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য। কৌশলপূর্ব্বক সেই স্পন্দন এবং দেহক্রিয়ার যে পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় তাহাই আজ আমাদের ধারণাতীত। শব্দবিদ্যার সাধক অর্থহীন ধ্বনির মৌলিকশক্তিবলে স্পন্দনের পরিবর্ত্তন সাধন পূর্ব্বক বস্তুপরতন্ত্রতার কবল হইতে সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। অন্যায়ের অন্ধ অনুপ্রেরণা মানবকে যে অনেক স্থলে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া আত্মগ্লানির নরকযন্ত্রণায় ডুবাইয়া রাখে ইহার মূলেও শব্দসাধনার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। ধনী ভোগবিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াও যে শান্তির সন্ধান পাইতেছে না, প্রচুর জ্ঞানার্জন করিয়াও যে বৈজ্ঞানিক আপন জ্ঞানের অপূর্ণতা দূর করিতে পারে না তাহার মূল হেতু ও ধ্বনিসাধনায় অনাসক্তি।

পূর্ব্বোক্ত 'অ ই উ ন্' প্রভৃতি ধ্বনির বিশ্লেষণ হইতে মহর্ষি পাণিনিবর্ণিত দেহগত স্পন্দনের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। মহর্ষি কঠোর তপস্যায় নিরত। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দেহের স্পন্দনসমূহ প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া মূর্দ্ধা তালু ও ভ্রূমধ্যের দিকে গমন করিতেছে; আর প্রতিক্রিয়ায় মাঝে মাঝে কণ্ঠ বক্ষ উদর প্রভৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতেছে। আবার, ক্রিয়া অপর স্থান হইতে আরব্ধ হইয়া ঊর্দ্ধমুখী ধাবমান হইতেছে। এই উৎকট তপঃক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত যখন কণ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল তখন ধ্বনি হইল 'অ'। তৎপর তালুতে প্রতিহত হইয়া 'ই' এবং তাহার প্রতিঘাতে ওষ্ঠ, নাভি এবং ভ্রূমধ্য সক্রিয় হইয়া বাজিয়া উঠিল 'উণ্'। এইরূপে মূর্দ্ধা ও কণ্ঠের অভিঘাতে 'ঋ৯ক্'; তালু ওষ্ঠ কণ্ঠ এবং নাসিকার স্পন্দনে 'এওঙ্' ধ্বনির সৃষ্টি হইল। শিবসূত্রের অপরাপর ধ্বনিগুলিও অনুরূপভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের স্পন্দনের ফলমাত্র। পাণিনিব্যাকরণ-মতে ভারতীয় বর্ণমালা ঐ চতুর্দ্দশটি শিবসূত্রের অন্তর্গত মৌলিক ধ্বনিগুলির পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশ মাত্র।

ভারতীয় বর্ণমালার ক্রম হইতে আভাস পাওয়া যায় যে মানবের দেহগত স্পন্দনকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং স্বাভাবিক রাখিবার কৌশল ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।[১] ঋষিগণ সেই যুগে কোমলমতি বালকবালিকাগণকে প্রণবের সপ্তস্বর, সামগান প্রভৃতি ধ্বনির সাধনপদ্ধতি শিক্ষা দিয়া তাহাদের দেহগত অস্বাভাবিক ক্রিয়া-

১ বিষয়টির বিশদ আলোচনা মৎপ্রণীত 'শব্দবিদ্যা' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

সমূহকে শান্ত এবং শিথিলভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেন।[২] ফলে সেই যুগে ছাত্রমহলে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত বজায় থাকিত গভীর বিদ্যাচর্চ্চায় আগ্রহ, অটুট চরিত্র, নিরাময় স্বাস্থ্য এবং প্রাণে নিবিড় শান্তি। আর্য্য জাতির যে উপনয়ন-সংস্কার আজ সার্থকতাবিহীন অনাবশ্যক সামাজিক আচারমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে সেই উপনয়ন-সংস্কারই একযুগে ভারতের জ্ঞানোন্মেষের হেতু ছিল বলিয়াই তৎকালে ছাত্রগণকে বিদ্যাভ্যাসের ভূমিকাস্বরূপ এই বিদ্যা উপনয়ন বা জ্ঞাননয়নরূপে গ্রহণ করিতে হইত। অদ্যাপি সেই আচার দেশের উচ্চবর্ণে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন ভারতে এই বিলুপ্ত শব্দসাধন-বিদ্যার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

ঋষিগণ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেন যে দেহগত উদ্দাম স্পন্দনবেগসমূহকে ইচ্ছামাত্র প্রশান্ত অথবা উদ্দীপিত করিবার কৌশল বাল্যবয়সেই অভ্যাস না করিলে মানবের চরিত্র, স্বাস্থ্য ও জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতা কোনটিই জন্মে না। এই শিক্ষা-ব্যতিরেকে যদিও কোন কোন ব্যক্তিকে চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান বা জ্ঞানবান হইতে দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ ভাগ্যের জোর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। তাই গুরুগৃহে বাসকালে ছাত্রগণের এই বিদ্যাই প্রধান অভ্যাসের বিষয় ছিল। বাল্যবয়সে ধ্বনিসাধনার ফলে উদ্দাম যৌবনেও তাঁহাদের দেহস্থ স্পন্দনবেগ-সমূহ স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করিত না। এইজন্যই দুরন্ত লালসাবহ্নি, ভোগ-তৃষ্ণা, পরপীড়ন প্রভৃতি কলুষিত ভাব তাঁহাদের সমাজকে দূষিত এবং বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিত না। সমাজের দুর্নীতিদমনের জন্য বহুবিধ আইন প্রণয়ন এবং আইনকে ফাঁকি দিবার নানারূপ কৌশল-শিক্ষা কোনটিরই প্রয়োজন ছিল না।

প্রাচীন ভারতের শব্দবিদ্যা যে কেবলমাত্র সমাজের মানসিক উৎকর্ষবিধান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত তাহা নহে, বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের ন্যায় সেই যুগের শব্দবিদ্যা বস্তুজগতের নানারূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনসাধনেও সমর্থ ছিল। দেশের অনভ্যস্ত বিদ্যা বলিয়া ইহার কোন কার্য্যকর উদাহরণ আজ নাই বটে, কিন্তু পৃথিবীর নানাবিধ পরিবর্ত্তনসাধনের সম্ভাবনা এই বিদ্যায় কত অধিক তাহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপ-খণ্ডের যাদুবিদ্যা (Casting the roons),[৩] মধ্য ভারতের ভোজবিদ্যা এবং কামাখ্যা তীর্থের মায়াবিদ্যা যে এককালে নীতিভ্রষ্ট মানবের হাতে পড়িয়া সমাজকে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণের জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক-মাত্রেরই সুবিদিত। ঋষিগণের শব্দবিদ্যা দেশের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা দূর করিয়া কিরূপে জগতের ব্যাপক মঙ্গলের বিধান করিত তাহা চিন্তা করিলে প্রাণ স্বতই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের পদে শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের প্রদর্শিত শব্দসাধনপদ্ধতি অনুসরণের ফলে প্রথমেই মানবের দেহস্থ স্পন্দনসমূহ

২ হিমালয়স্থিত সিদ্ধাশ্রম হইতে প্রত্যাগত মদীয় গুরুদেব ৺স্বামী পূর্ণানন্দ মহারাজের উপদেশ এবং শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আমি এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি।

৩ অনেকে মনে করেন অতি প্রাচীন-কালে ইউরোপে বস্তুর অনুভূতি উৎপাদনের শক্তিবিশিষ্ট রুন্ (Roon) নামে একপ্রকার ভাষার প্রচলন ছিল। যাদুকরগণ সেই ভাষার শব্দাবলীকে মন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া বিরাটকায় আকাশজ দৈত্য প্রভৃতির সৃষ্টিপূর্ব্বক আপন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারিত। এই সকল কার্য্যের সাধারণ নাম ছিল casting the roons.

স্বাভাবিক মৃদু এবং সুসংযত হইয়া পড়িত। তাই প্রাণের শান্তি এবং নিবিড় আনন্দে সমাজের মনোরাজ্য পরিপুষ্ট ছিল। এই পরিপূর্ণ শান্তির অবস্থায় জগতের অশেষ কল্যাণ ভিন্ন অপর কোন স্বার্থপর কামনা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পাইত না। চিত্তের এই সুদৃঢ় ভূমিকালাভের পর বিশ্বকে স্বেচ্ছায় অবলীলাক্রমে পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের করায়ত্ত হইত। তখন সেই বীরপুঙ্গবগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বুঝিতে পারিতেন—

"সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্।
শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্বী ধনুসি চাততা॥"

অর্থাৎ তাঁহারা রাজ্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিতেন যে সেনা তাঁহাদের পরিচ্ছদ বা রাজৈশ্বর্য্য বিকাশের উপকরণ মাত্র। কার্য্যসাধনের জন্য শত্রুর প্রতিকূলে বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের অন্তর্নিহিত মানবমঙ্গলের পরিপূরক অনন্ত জ্ঞানরাজি এবং তাহার পরিপোষক ধনুর্ব্বেদ এই দুইটিই জগতের অনেক সমস্যার সমাধানে সমর্থ। এই পবিত্র মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন তখন সেই উদার বিশ্বপ্রেম এক মহান শক্তির আবির্ভাবে জাগরিত হইয়া জগৎকে অমৃতসিক্ত করিয়া তুলিত। আজ অবনত ভারত সেই বিলুপ্ত মহাবিদ্যার দ্বারোদ্‌ঘাটনে বদ্ধপরিকর হইবে কি?

পৃথিবীর ভাষাসমূহের আদি ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বভাব হইতে উদ্ভূত প্রাকৃতিক ধ্বনিসমূহ হইতেই মানবের কল্পিত নামসমূহের সৃষ্টি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ওয়াটার' শব্দের উদ্ভাবনতত্ত্ব আলোচিত হইতে পারে। সেই আদি যুগের মানুষ ছিল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং ভাবে আত্মহারা। অরণ্যের প্রতি বৃক্ষপল্লবের মর্ম্মর-ধ্বনি, নীল আকাশে বিহগের কূজন, কুলুনাদিনী তটিনীর মধুর তান তাহাদের সরল, অবিকৃত প্রাণে এক একটি আনন্দের শিহরণ জাগাইয়া দিত। এই সরল মানবশিশু একদিন পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর বিজন শোভায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ জলের মধ্যে বুদ্‌বুদের 'ওয়াট্ ওয়াট্' রবে যে সুমধুর নিসর্গ-সঙ্গীতের সৃষ্টি হইল তাহা সেই ভাবপ্রবণ আদি মানবের মনে গভীর রূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। সে আপনার সেই অপূর্ব্ব অনুভূতির কথা আজও ভুলিতে পারে নাই। জল দেখিয়া জলের স্মৃতি মনে জাগিবা মাত্রই সেই পূর্ব্বপরিচিত সুরটুকু 'ওয়াট্ ওয়াট্' রবে তাহার সমগ্র দেহবীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া দিত। তাই আদিম ইংরেজীভাষাভাষী জলের নাম দিল 'ওয়াটার'।

আবার কেহ বা ভরা বাদরে বেতসকুঞ্জে ডাহুক-ডাহুকীর প্রাণস্পর্শী কোয়াক কোয়াক রবের তন্ময়তায় বিহ্বল হইয়া জলকে অভিহিত করিল 'একোয়া'; আর একদিন সেই সরল কবি মানবশিশুর এক সরোবরের সান্ধ্য শোভা তৃষিত নয়নে পান করিবার সময় কুল-বধূদের জল আনয়নের দৃশ্য তাহার মন আকর্ষণ করিল। কলসী নামাইবার সময় বধূর কাঞ্চন-বলয়ের আঘাতে মলয়সমীর রী রী করিয়া বাজিতে লাগিল অং....ং....ং। আর সেই শব্দায়মান কলসী জলে পূর্ণ করিবার সময় শব্দ হইল 'ভস্ ভস্'। তাই কবি জলের স্বরূপ স্থির করিল 'অম্ভস্' শব্দ দ্বারা। কোন বস্তুর প্রত্যক্ষকালে যে শব্দ অনুভূত হয়, তাহা দ্বারাই ঐ বস্তুকে নির্দ্দেশ করিবার প্রবৃত্তি মানবচরিত্রে স্বাভাবিক।

প্রাচীন ভারত ঐহিক ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ থাকায়

ভারতীয়গণ সহজেই বুঝিতে পারিতেন, মানবের প্রাণ যে সর্ব্বাবস্থায় কোন্ এক অদৃষ্ট অজ্ঞাত সুখের বস্তুর অভাব বোধ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, সেই সুখের বস্তুটি কোন জাগতিক পদার্থ নহে। কারণ দেখা যায় প্রধানতঃ স্থূল কামনার তৃপ্তিসাধন নিয়াই এই সংসার। "জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্"; কিন্তু জগতে ভোগতৃপ্তির প্রচুর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কেহ 'তৃপ্তোঽস্মি' এই কথা বলিতে পারিতেছে না। সুতরাং জগতের অতীত, স্থূল ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ কোন চরম বস্তুর অভাব বোধ করিয়াই মানবাত্মার এত হা হুতাশ। এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়াই প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ সৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা আত্মস্থ থাকিয়াই বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এই আত্মস্থদৃষ্টি-বলেই তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে যখন আমরা কোন বস্তু দেখি বা অনুভব করি তখন ঐ বস্তুর ছায়া ইন্দ্রিয়পথে আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া একটা ক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ক্রিয়ানুযায়ী একটা শব্দ ও সৃষ্ট হয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শিশু ও মা

শ্রীরবি গুপ্ত

মায়ের পানে আকুল শিশু বাড়ায় দুটি হাত
আঁধার ছায়ে ব্যাকুল হিয়া যাচে শরণ তার,
ভাবে মায়ের পরশে ভোর কখন হবে রাত,
শেষ হবে এই অতল নিশা নিঝ্‌ঝুম নিঃসাড়।

আকাশ-বুকে সূর্য্য তো নাই নাই তো চাঁদের আলো,
শিশু খোঁজে মাকে খোঁজে মাকে যে তার চাই,
দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে শুধু রাতের ছায়া কালো,
ভাবনা শুধু অঙ্কটি তার কেমন করে পাই।

রজনী-দিন শিশুর সাথে মা যে সদাই থাকে,
শিখায় তারে—"শক্তি যে তোর তোরি চলায় জাগে;"
চির শুভ পরশে তার সদাই ঘিরে রাখে,
শুধায় প্রাণে জ্বালিয়ে আলো উদয়-অরুণ-রাগে:

"চির মায়ের অমল আশীষ ঘিরিয়া যায় রাজে
জীবন-পথে তার কি কিছু ভয় করা আর সাজে?"

মুক্তি বা জ্ঞান

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

মুক্তির ধারণা বন্ধন আছে বোলেই আসে, যেমন অন্ধকার আলোর অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। বন্ধন দর্শনের দৃষ্টিতে অজ্ঞান বা মোহ। অজ্ঞানের নাম 'না-জানা', এ জ্ঞানের অভাব নয়। আমরা নিজেরা যে কি, নিজেদের স্বরূপ যে কি সে সম্বন্ধে জানি না বোলেই অজ্ঞানী। বেদান্তে এই অজ্ঞানকে বলা হয়েছে মিথ্যা প্রত্যয়—প্রত্যয় বা জ্ঞান, কিন্তু মিথ্যা। মিথ্যাপ্রত্যয় বা অজ্ঞান এজন্যে জ্ঞানই, তবে সত্য বা যথার্থ জ্ঞান নয়, মিথ্যা জ্ঞান। যেমন কাশী আমি কখনো যাই না, সুতরাং কাশী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আমার নেই; এখানে একথাই বুঝ্‌তে হবে যে, আমি 'জানি' যে, কাশী সম্বন্ধে আমি জানি না। অর্থাৎ কাশীর অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি সচেতন। সুতরাং অজ্ঞানও জ্ঞান, তবে মিথ্যা জ্ঞান। এই মিথ্যা জ্ঞানকে দূর করার উপায়ের নামই সাধনা এবং মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হোলে যে সত্য জ্ঞানের প্রকাশ হয় তার নামই মুক্তি।

দর্শনশাস্ত্রে এই মুক্তির দু'রকম রূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি। শরীর থাকা কালে যে মুক্তির আশীর্বাদ লাভ হয় তার নাম জীবন্মুক্তি; জীবনকালেই মুক্তি। তত্ত্ববিচারের দ্বারা সত্যনির্ণয় করতে করতে শরীর পাত হবার পর যে মুক্তি লাভ হয় তার নাম বিদেহমুক্তি। দর্শনকারদের মধ্যে এই বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন অত্যন্ত অল্পই; 'ব্রহ্মসিদ্ধি'কার মণ্ডন মিশ্র, 'সংক্ষেপশারীরক'কার সর্বজ্ঞাত্ম মহামুনি প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র বিদেহমুক্তিকে যথার্থ মুক্তি বোলে মানেন। তাঁদের যুক্তি হোল—গীতায় যে স্থিতপ্রজ্ঞের উল্লেখ আছে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ অনেকের মতে মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী রূপে স্বীকৃত হোলেও আমরা কিন্তু স্থূলশরীর ধ্বংসের পরই মুক্তি লাভকে সত্যিকারের মুক্তি বা বন্ধনহীনতা বলি। সেজন্যে স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্চ ধরনের সাধক ছাড়া অন্য কেউ নন। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ উন্নত স্তরের সাধক; তিনি সত্যনির্ণয়ের পথে দেহনাশের পর যে জ্ঞান লাভ করেন, তাই যথার্থ মুক্তি। কিন্তু আচার্য শংকর ও অধিকাংশ শংকর-অনুবর্তী সে মুক্তি স্বীকার করেন না। শংকর স্পষ্টই বলেছেন: 'অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদঃ কঞ্চিৎ কালং ধ্রিয়তে ন ধ্রিয়ত ইতি' (ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য—৪।১।১৫); অর্থাৎ—ব্রহ্মজ্ঞানী যথার্থ জ্ঞানলাভ করার পর শরীর ধারণ করেন কি না করেন তা' বিবাদ বা বিচারের বিষয়ই নয়। শরীর থাকা কালে ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করা যায় —একথা শংকর স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি, বাচস্পতিমিশ্র, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি আচার্য শংকরের মতবাদকেই সত্য বোলে মেনেছেন। এছাড়া বর্তমান ধর্মনায়ক ও আচার্যগণ—শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতিও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন। সুতরাং বিদেহ-মুক্তির অবতারণা তাঁদের কাছে নিরর্থকই।

আসলে ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ পার্থিব জ্ঞানের বিরোধ হোল জ্ঞানের দিক থেকে নয়, জ্ঞানের বিষয়ের দিক থেকে। জ্ঞান এক ও অভিন্নই, সেই জ্ঞানকে বিষয় করে যখন বিরোধী পদার্থসকল তখনই তাদের জ্ঞানের প্রকাশে হয় বিরোধী। যেমন, ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম ও একটি চেয়ারের জ্ঞানের বিষয় পার্থিব স্থূল চেয়ার; এদের উভয়ের জ্ঞানাংশে বিরুদ্ধ ভাব নেই, বিষয়াংশ ব্রহ্ম ও চেয়ারের মধ্যেই যা বিরোধ; সুতরাং বিষয়ভেদে জ্ঞান দুটি আলাদা।

এখন প্রশ্ন তা হোলে হবে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান তো নির্বিষয়। সুতরাং ব্রহ্ম আবার ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় কি ভাবে হবেন? কারণ বিষয় থাকলেই বিষয়ী অবশ্যই থাকবে, আর বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান দ্বৈতজ্ঞানেরই নামান্তর; সুতরাং যা ব্রহ্মের জ্ঞান তাই দ্বৈতজ্ঞান। জ্ঞান আধার ও ব্রহ্ম আধেয়। কিন্তু অদ্বৈতদর্শনের মতে ব্রহ্মজ্ঞান বলতে ব্রহ্মই জ্ঞান বা জ্ঞানই ব্রহ্ম, ব্রহ্মের জ্ঞান বা আধার-আধেয় সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান নয়। ব্রহ্মজ্ঞানের বিচারে বিষয় ও বিষয়ীর প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। তবে পার্থিব জ্ঞানের বেলায় সে যুক্তি দেখানো যেতে পারে।

এখানে প্রশ্ন অবশ্য ঠিকই করা হয়েছে, কারণ ব্রহ্মজ্ঞান একটি মাত্রই জ্ঞান যা' উপলব্ধি বা সত্যনির্ণয় মাত্র; সেখানে জ্ঞানলিপ্সু সাধক নিজের থেকে ভিন্ন একটি বিষয়রূপে জ্ঞানকে ক্রিয়ারূপ জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের জানাজানির ধারা বা প্রণালী বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব নেই, থাকে মাত্র বোধ বা জ্ঞান। এই জ্ঞানই যথার্থ প্রত্যয়, যা 'আছে' মাত্র বোঝা যায়, কিন্তু দেশকাল-নিমিত্তযুক্ত হোয়ে 'আছে' বা অস্তি নয়, উপলব্ধি রূপে 'আছে' বা থাকে মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান নয়, পার্থিবসম্পর্ক-বিহীন অদ্বৈত জ্ঞান, সুতরাং জ্ঞানের বিষয়ের দিক থেকেই এক জ্ঞানের সঙ্গে অন্য জ্ঞানের বিরোধ হয়—এ কথারই বা যাথার্থ্য কি ভাবে তা হোলে প্রমাণিত হয়?

এর উত্তরে একথাই বলতে হয় যে, পার্থিব জ্ঞানের দিক থেকেই বিরোধ-ভাবের সামঞ্জস্য করা যায়, অপার্থিব জ্ঞানের দিক থেকে নয়। আমরা ব্রহ্মজ্ঞান থেকে অন্যান্য পার্থিব বিষয়-জ্ঞানের যখন ভেদ করি, তখন পার্থিব দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক যুক্তি-বিচারের দিক থেকে কোরে থাকি। সৃষ্টিকে মেনে নিয়ে এই সব কমবেশীর বা ভেদের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়, সৃষ্টি বা মায়ার অতীত অবস্থায় ভেদই যেখানে থাকে না, এক ও অদ্বৈত-মাত্রই থাকে, সেখানে কম-বেশী বা উঁচু-নীচু বোলে বিচার করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাই একটি চেয়ারের জ্ঞানের চেয়ে ব্রহ্মজ্ঞান যে অনেক বড় চৈতন্যের দিক থেকে এটা নির্ণয় করার জন্যে আমরা বলি জ্ঞানের বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলেই ভেদ, মাত্র জ্ঞানের দিক থেকে অভেদ। জ্ঞান আসলে একটা, তাতে আধেয় বা বিষয় হচ্ছে চেয়ার ও ব্রহ্ম দুইই, সুতরাং একটি আধেয় পরিবর্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর, আর অপরটি শাশ্বত ও নিত্য, কাজেই এ দুটিতে ভেদ যথেষ্ট। মাটি একটিই, কিন্তু সেই একই মাটিতে তৈরী ঘট ও বাটীর মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' এই বিষয়টি পরিষ্কার কোরে বুঝিয়ে বলা হয়েছে মৃত্তিকাই সত্য, কিন্তু মৃত্তিকা থেকে তৈরী সকল জিনিস নাম-রূপে ভিন্ন, সুতরাং অসত্য। এখানে বিষয়কে ভিন্ন মেনে নিয়েই আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হই কেবল উঁচু-নীচু, পার্থিব-

অপার্থিব বা নিত্য-অনিত্য বোঝাবার জন্যে। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত যখন বিচারের বিষয়ীভূত তখন তাকে ঠিক ঠিক জ্ঞান বলা যায় না, এক দিক থেকে তাকে বৃত্তিজ্ঞান বোল্লেও অন্যায় করা হবে না। বরং সমীচীনই হবে।

সাধক যখন তৎ-ত্বম্ বা জীব-ব্রহ্মের স্বরূপ বিচারের দ্বারা বলেন "অহং ব্রহ্মাস্মি" তখনও ঠিক সমস্ত জিনিসের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা সাধিত হয় না। 'এটাই আমরা সাধারণভাবে বুঝি, তাই একাত্মতা বা সর্বভূতে নিজেকে অভিন্ন ভাবে দেখার জন্যে তাঁকে উপলব্ধি করতে হয় "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" বা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বোলে। পার্থিব বিচারের দৃষ্টিতে যেন মনে হয় প্রথমক্ষণে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', ও দ্বিতীয়ক্ষণে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। কিন্তু আসলে দুটি জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির মধ্যে কোন স্থান বা কালের ভেদ ও ব্যবধান নেই, দুটি অভিজ্ঞতা বা অনুভূতিই সমন্বিত, একই সময়ে উৎপন্ন হয়। সুতরাং 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' বা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সর্বাত্মক অখণ্ড ব্যাপক জ্ঞান উপলব্ধি হবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বক্ষণে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ব্যক্তিক অনুভূতি হোলেও তথাকথিত দুটি অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য বা ভেদ কিছু নেই, সেজন্যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অনুভূতিই ব্রহ্মজ্ঞানের তথা যথার্থ মুক্তির প্রমাণ, আর এতে বিষয়-বিষয়িরূপ ভেদজ্ঞানও থাকতে পারে না। তবে এই চরমজ্ঞানকে সাধারণ দ্বৈত ও পার্থিব জ্ঞানের সঙ্গে বাহ্যতঃ ও ব্যবহারতঃ পৃথক দেখাবার জন্যেই আমরা এক ও অখণ্ড জ্ঞানের আধেয়-ভেদে জ্ঞানভেদ স্বীকার করি। নচেৎ জ্ঞানের ভেদ কল্পনা মাত্রই করা যায়, বস্তুতঃ কোন দিনই হয় না। কিন্তু দেশকাল-অবচ্ছিন্ন পার্থিব জ্ঞানে ভেদ সর্বদাই থাকে। মুক্তি কখনও উৎপন্ন হয় না, মুক্তি স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রকাশ। কোন-কিছুর মাধ্যমে বা কোন কিছুকে অপেক্ষা কোরে মুক্তির আলোক প্রকাশ পায় না, মুক্তির আলোক সর্বদাই প্রকাশমান, কেবল আমরাই তা উপলব্ধি করতে পারি না এই যা। এই উপলব্ধি না করার জন্যে আমরাই দায়ী, আমাদের সংস্কারই দায়ী। দর্শনশাস্ত্র এই সংস্কারকে বলেছে 'মায়া', যার সত্তা পরিমাপ বা নির্ধারণ করা যায় না, অথচ তা আছেও বটে, নেইও বটে, আবার আমাদের ভ্রমেও ফেলে। আচার্য শংকর এজন্যে অনির্বচনীয় মায়াকে 'কার্যানুমেয়া' বলেছেন: স্বরূপতঃ তা নেই, কিন্তু তার কার্য আছে, কেননা আমাদের ওপর তার প্রভাব পড়ে, আর সেজন্যেই আমরা মায়ার সত্তা জানতে পারি। শাস্ত্র ও শাস্ত্রদর্শীরা বলেন মানুষ জ্ঞানস্বরূপ, অথচ আমরা অজ্ঞানীর মতন ব্যবহার করি। এ অনেকটা কুহেলিকা বা বা ভোজবাজীর মতন। এই কুহেলিকার সৃষ্টি হয় ভ্রমজ্ঞানের জন্যে তা' আগেই বলেছি। নিজের স্বরূপের যথার্থ অবধারণের মাধ্যমে যখন শুভবুদ্ধির বিকাশ হয়, তখনই বিবেকের আলোকে আমরা আমাদের ভুল বা ভ্রমজ্ঞান বুঝতে পারি, আর যখনই তা বুঝি তখনই তা দূর হয় ও জ্ঞানের প্রকাশ হয়। বেদান্তে এই অজ্ঞাননাশ (আবরণভঙ্গ) ও জ্ঞানের প্রকাশ একই সঙ্গে হয় বলা হয়েছে। অথবা একথাই সত্যি যে, অজ্ঞানের নাশ বলতেই জ্ঞানের প্রকাশ বোঝায়। সূর্য আকাশে থাকে, কিন্তু মেঘের দ্বারা আবৃত হয় বোলে তাকে দেখা যায় না, 'মেঘ সরে গেলেই' তা আবার প্রকাশ পায়। সূর্যের এই প্রকাশ পাওয়া নূতন কোরে সৃষ্টি হওয়া নয়, সূর্য আকাশে প্রকাশিত ও দেদীপ্যমান থাকেই, বাধা বা আবরণরূপ মেঘ থাকার জন্যে দেখা

যায় না। মেঘ সরে গেলেই তা দেখা যায়। সুতরাং সূর্যের এই প্রকাশের অর্থই মেঘের অপসারণ। সেরকম ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ বলতে ভ্রম, মিথ্যাপ্রত্যয় বা অজ্ঞানের নাশ হওয়া বোঝায়, আর এই অজ্ঞানের নাশ হওয়ার অর্থ অজ্ঞান বা ভ্রমের সংশোধন। যে মুহূর্তে ভ্রমের সংশোধন হয় ঠিক সেই মুহূর্তেই শুদ্ধ ও পূর্ণজ্ঞানের প্রকাশ হয়। পূর্ণজ্ঞানের প্রকাশের তথা নিজের স্বরূপের উপলব্ধির নামই মুক্তি। এ মুক্তি আমাদের আছেই, তাকে পুনরায় জানার নামই সাধারণ ভাবে 'লাভ' বলা হয়। মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান একার্থক।

আবার যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই, বন্ধনও নেই, কারণ বন্ধন ও মুক্তি পরস্পর আপেক্ষিক, একটি থাকলে অপরটির থাকাকেও বাধ্য হোয়ে কল্পনা করতে হয়। এজন্যে আচার্য শংকর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানকে বন্ধন-মুক্তির অতীত দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত বলেছেন; সে এক অচিন রাজ্য, সে রাজ্যে যিনি যান তিনি মাত্র বুঝেন, অপরে কল্পনার জাল বুনে মাত্র। সাধনার ও অজ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বৈতও থাকে, অদ্বৈতও থাকে, বন্ধনও থাকে, মুক্তিও থাকে, শাস্ত্রও থাকে, বাদানুবাদও থাকে। কিন্তু সত্যিকারের ব্রহ্মানুভূতি যে ভাগ্যবানের হয় একমাত্র তিনিই বুঝেন যে, ব্রহ্মবস্তু দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়; ব্রহ্ম দ্বৈতবাদেরও প্রতিপাদ্য নয়, আবার অদ্বৈতবাদেরও প্রাপ্য নয়। ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাই অনুভূতিই পেয়েছে একমাত্র সম্মান, কিন্তু ভারতেতর দেশ দিয়েছে বুদ্ধিবিচারকেই গৌরবের আসন। অবশ্য ভারতীয় দর্শনেও বুদ্ধিবিচার পেয়েছে শ্রদ্ধা, কিন্তু তা নিরাবরণ জ্ঞানেরই নির্ধারণের জন্যে। বুদ্ধি ও বোধি ভারতীয় দর্শনের চোখে আলাদা, আবার একথাও তার মতে সত্যি যে, বুদ্ধিই পরে বৃত্তি বা সংস্কারবিহীন হোয়ে বোধিতে হয় পর্যবসিত। যেমন মন মুক্তির অন্তরায়, আবার শুদ্ধমন মুক্তিরই পথপ্রদর্শক। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন—ব্রহ্ম মনবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর; কারণ শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধমন এরা সকলেই ব্রহ্মাবগাহী। মুক্তি বা জ্ঞানই মানুষের কেন, সকল প্রাণীরই একমাত্র কাম্য বা চরম কামনা। মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই তার দরকার। এই দরকারের চাহিদা মেটাবার জন্যেই তো এত শাস্ত্র, এত দর্শন, এত বিচার ও অধ্যাত্ম-উপদেশ ও এত সাধনা। এই মুক্তিকে কেন্দ্র কোরেই যত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। মতবাদ আসলে চরমসত্যকে বোঝার পরিমাপ মাত্র, যিনি যে রকম ভাবে সত্যকে দর্শন বা উপলব্ধি করেছেন তিনি সেই ভাবেই তাকে পাবার উপায় সম্বন্ধে বলেছেন; আসলে কোন্‌টি সত্য তা ঠিক ঠিক নির্ধারিত হবে যখন চরমসত্যের পাদপীঠে গিয়ে আমরা আমাদের প্রণতি জানাব। এই প্রণতি জানাবার নামই মুক্তি বা জ্ঞান যা আমরা সকলেই চাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে।

নাথযোগি-সম্প্রদায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যতীর্থ

অতি প্রাচীনকাল হইতে পরমার্থনিষ্ঠ আর্য্য-সমাজে মুমুক্ষুগণের মোক্ষলাভের জন্য দ্বিবিধ সাধনমার্গ প্রচলিত আছে। উহাদের মধ্যে একটির নাম জ্ঞানমার্গ, অপরটির নাম যোগমার্গ। মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বেও সম্ভবতঃ বৈদিক যুগ হইতেই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে অতৃপ্ত জ্ঞানমার্গাবলম্বী ও যোগমার্গাবলম্বী দুইটি প্রধান সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল এবং তাহাদের মধ্যে স্ব স্ব মতের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্ক হইত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন ঃ

"সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসন্তি
যোগাঃ যোগং দ্বিজাতয়ঃ।
বদন্তি কারণং শ্রেষ্ঠং স্বপক্ষোদ্ভাবনায় বৈ॥"

—সাংখ্যমতাবলম্বী দ্বিজাতিগণ সাংখ্য বা জ্ঞান-মার্গের এবং যোগমতাবলম্বিগণ যোগমার্গের প্রশংসা করেন এবং নিজ নিজ পক্ষের উৎকর্ষ-প্রদর্শনের জন্য তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যুক্তিসকলের অবতারণা করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের অনিত্যত্ব, অশুচিত্ব, দুঃখকরত্ব, মোহজনকত্ব প্রভৃতি দোষ এবং আত্মার নিত্যত্ব, অসঙ্গত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, সুখ-দুঃখ-বিহীনত্ব, কার্য্যকারণাতীতত্ব, সত্য-জ্ঞানানন্ত-স্বরূপত্ব প্রভৃতি গুণ পর্য্যালোচনা করিয়া বিষয়-সম্পর্ক বর্জ্জনপূর্ব্বক চিত্তকে আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে সমাহিত করিবার ঐকান্তিক চেষ্টাই জ্ঞানমার্গাবলম্বীদিগের মোক্ষলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। যোগিগণ বলিয়া থাকেন, কেবল বিচার দ্বারা বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, পরম তত্ত্বে স্থিতিলাভও হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত অনিয়মিত ভাবে প্রাণের স্পন্দন চলিতে থাকে, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল থাকে এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল তরঙ্গ তুলিতে থাকে ; যতদিন ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে প্রাণকে আয়ত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়-গণকে স্থির এবং চিত্তবৃত্তিসমূহকে নিরুদ্ধ করিতে পারা না যায়, তত দিন বাসনা নির্ম্মূল হয় না, চাঞ্চল্য দূর হয় না, অন্তঃকরণ আত্ম-স্বরূপে সমাহিত হয় না, সুতরাং মোক্ষলাভও হয় না। এইজন্য যম ও নিয়ম রূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহেন্দ্রিয় ও মনের পবিত্রতা সম্পাদন পূর্ব্বক আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই সকল সাধনা দ্বারা দেহেন্দ্রিয় স্থির, প্রাণ-স্পন্দন নিয়মিত ও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সেই নির্ম্মল, নিস্তরঙ্গ, বিষয়সঙ্গরহিত, আত্মসমাহিত অন্তঃ-করণে স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাই মোক্ষের প্রকৃষ্টতম উপায়।

অপর পক্ষে জ্ঞানমার্গাবলম্বিগণ বলেন যে, বিষয়ের অনিত্যত্বাদি দোষ দর্শন করিলে এবং দৃশ্য জগতের সহিত আত্মার বাস্তবিক যোগ-রাহিত্য বিচার দ্বারা দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইলে চিত্ত স্বভাবতই বিষয়-বিমুখ হইয়া প্রশান্ত হয়, কর্ম্মপ্রবৃত্তি নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়সকল স্থির হয়। দেহেন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্যের মূলে বাসনা এবং বাসনার মূলে অজ্ঞান। আত্মাতে বিষয়ের

অধ্যাস ও দেহাদি-বিষয়ে আত্মার অধ্যাস রূপ অজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। তত্ত্ববিচারজনিত জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবারিত হয়। অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে সকল প্রকার চাঞ্চল্যেরই নিবৃত্তি হয়। আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই আত্মস্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয়। জ্ঞানী প্রকৃতি বা মায়া এবং তজ্জাত সকল পদার্থে অনাসক্ত হইয়া তদতীত আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে চাহেন। আর যোগী প্রকৃতি বা মায়া ও তদুৎপন্ন দেহেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতির উপর আধিপত্য লাভ করিয়া মুক্ত হইতে ইচ্ছুক। উভয়ের মতেই আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। কিন্তু সাধনপ্রণালীতে উভয়ের পার্থক্য রহিয়াছে। জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের সাধনপ্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও ফল সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্
যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি
স পশ্যতি॥"

—সাংখ্যমার্গাবলম্বিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যোগমার্গাবলম্বিগণ সেই স্থানই প্রাপ্ত হন। অতএব সাংখ্য ও যোগকে ফলতঃ এক বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি যথার্থই দর্শন করেন। মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন :

"উভে চৈতে মতে জ্ঞানে নৃপতে শিষ্টসম্মতে।
অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্॥"

—হে নৃপতি, উভয় সাধন-জ্ঞানই শিষ্টসম্মত বলিয়া শ্রদ্ধার্হ; যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ই পরম গতি প্রদান করে।

মধ্যযুগে জ্ঞানসাধনা ও যোগসাধনার বৈজয়ন্তী লইয়া দুই জন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রে ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—একজন বেদান্তাচার্য্য শঙ্কর, আর এক জন যোগাচার্য্য গোরক্ষনাথ। শঙ্কর হইতে বৈদান্তিক জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় যেমন নবজীবন লাভ করিয়াছে, গোরক্ষনাথ হইতেও তেমনি যোগসাধনা ও যোগিসম্প্রদায় নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানি-গুরু শঙ্কর বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার ও জ্ঞানসাধনার প্রচলনের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পুনর্গঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করিলেন এবং প্রধান প্রধান স্থানে মঠ স্থাপন পূর্ব্বক সেই সব স্থান জ্ঞানসাধনার কেন্দ্রে পরিণত করিলেন। এই রূপে তিনি দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় দ্বারা সমগ্র ভারতে বেদান্তের তত্ত্ব ও সাধনা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যোগিগুরু গোরক্ষনাথও যোগসাধনার প্রচলনোদ্দেশ্যে যোগিসম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করিয়া তাঁহাদিগকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করেন, বিভিন্ন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক যোগশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং স্বকীয় অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়া শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা সমগ্র ভারতে যোগধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। মোক্ষাভিলাষী সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদিগের জন্য শঙ্কর যেমন জ্ঞানসাধনার বিধান করিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথও তেমনি যোগসাধনার ব্যবস্থা করেন।

শঙ্কর ও গোরক্ষনাথ কেহই সাকার উপাসনার বিরোধী ছিলেন না। ভক্তি ও আচারনিষ্ঠার সহিত দেবতার উপাসনা করিতে করিতেই দেহেন্দ্রিয় ও মন বিশুদ্ধ হয়, হৃদয়ও ধর্ম্মানুরাগী হয়, ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মে এবং যোগসাধনা বা জ্ঞানসাধনার অধিকার আসে। এইজন্য লোকোত্তর মহাপুরুষগণ লোকশিক্ষার জন্য প্রথমতঃ

সাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ লোকের মত দেবতার সাকার মূর্ত্তির পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। গীতায়ও বলা হইয়াছে :

"যদ্ যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকও সেইরূপই আচরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজের আচরণ ও উপদেশ দ্বারা যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করেন, সাধারণ লোকও সেই শাস্ত্রেরই অনুবর্ত্তন করে।

যোগাধিকারী সাধকগণকে মোক্ষপ্রদ যোগ-পথে আনয়ন করিবার জন্যই যোগিগুরু গোরক্ষ-নাথ নাথসম্প্রদায়ের সংগঠন করিয়াছিলেন। নাথযোগি-সম্প্রদায় দ্বাদশ পন্থ বা শাখায় বিভক্ত; যথা—সত্যনাথী, ধর্ম্মনাথী, রামপন্থ, নাটেশ্বরী, কন্থড়, কপিলানি, বৈরাগ, মীননাথী, আইপন্থ, পাগলপন্থ, ধ্বজপন্থ ও গঙ্গানাথী। শঙ্করের দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারা বারপন্থী যোগি-সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যাত। প্রত্যেক পন্থেরই এক একটি মুখ্য স্থান আছে এবং এক এক অঞ্চলে এক এক পন্থের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। পন্থসমূহের প্রায় প্রত্যেকটিই কোন দেবতা বা পৌরাণিক মহাপুরুষকে আপনার মূল প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করে। নিম্নে এই সব পন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :

(১) সত্যনাথী পন্থ যোগিগুরু সত্যনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। উড়িষ্যা প্রদেশে পাতাল ভুবনেশ্বর এই পন্থের মুখ্য স্থান বলিয়া কথিত। (২) ধর্ম্মনাথী পন্থের মূল প্রবর্ত্তক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ইহার মুখ্যস্থান নেপালরাজ্য-স্থিত ডুল্লুদেলক (বর্ত্তমান কপিলবস্তু হইতে একশত মাইল উত্তর-পশ্চিমে)। (৩) রামপন্থের প্রবর্ত্তক ত্রেতাযুগের শ্রীরামচন্দ্র। ইহার মুখ্যস্থান চৌকতাপ্পে পাচোয়াড়া (গোরক্ষপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত)। (৪) নাটেশ্বরপন্থিগণ লক্ষ্মণের যোগী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহাদের মুখ্য স্থান গোরক্ষটিলা (পাঞ্জাবের জেলম্ জেলার অন্তর্গত রোতস্‌গড়ের নিকট একটি পাহাড়ে অবস্থিত)। (৫) কন্থড় যোগিগণ গণেশের যোগী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদের মুখ্য স্থান মানকাড়া (কচ্ছভুজরাজ্যে অবস্থিত)। (৬) কপিলানি—এই পন্থ কপিল-মুনি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইহার মুখ্য স্থান গঙ্গা-সাগর। কলিকাতার নিকটস্থ দমদমায় এই পন্থের প্রধান স্থান। (৭) বৈরাগপন্থ রাজা ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইহার মুখ্যস্থান রাতাডুঙ্গা (আজমীরের নিকটবর্ত্তী পুষ্কর হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে)। (৮) মীননাথী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহারাজ গোপীচাঁদ। ইহার মুখ্যস্থান অজ্ঞাত। যোধপুরের মহামন্দির মঠ এই পন্থের প্রসিদ্ধ স্থান। (৯) আইপন্থ ভগবতী বিমলা হইতে প্রবর্ত্তিত বলিয়া কথিত। ইহার মুখ্যস্থান যোগিগুফা বা গোরক্ষ কুঁই। ইহা প্রাচীন গৌড়ের অন্তর্গত বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। (১০) পাগলপন্থ যোগিগুরু চৌরঙ্গিনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ইহার মুখ্যস্থান বোহর (প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত)। (১১) ধ্বজপন্থ হনুমানজী হইতে প্রবর্ত্তিত। এই পন্থের প্রসিদ্ধ স্থান অজ্ঞাত। (১২) গঙ্গানাথী পন্থের প্রবর্ত্তক গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব। ইহার মুখ্যস্থান জখবার (পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত পাঠান-কোট হইতে ছয় মাইল দূরে)।

এই বারটি পন্থ ব্যতীত নাথযোগি-সম্প্রদায়ের আরও অনেক শাখা-প্রশাখা আছে এবং তাহাদের বড় বড় আশ্রমও রহিয়াছে। যথা :

(১) সিদ্ধকেরানা—এই স্থান বর্ত্তমানে

পাঞ্জাবের সারগোদার অন্তর্গত। পূর্ব্বে ইহা পাঞ্জাবের সাহপুরে ছিল। (২) পেশাওয়ার—এই স্থান রতননাথের নামে প্রসিদ্ধ। এই পন্থের নাম রতননামী। স্থানটি কুরুক্ষেত্রের নিকট। (৩) ভেড়া—ইহা পীর কায়ানাথের নামে প্রসিদ্ধ। এই শাখার নাম পীরকায়ানাথী। (৪) দিনোদর—কচ্ছরাজ্যে অবস্থিত। এই শাখা ধর্ম্মনাথী পন্থের অধীনতা স্বীকার করে। (৫) গোরক্ষমণি—জুনাগড়রাজ্যে (প্রভাসক্ষেত্র হইতে চার মাইল দূরে) অবস্থিত।

এই সব স্থান ব্যতীত সিদ্ধযোগিগণ আপনাদের তপস্যা-প্রভাবে অনেক প্রসিদ্ধ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই নাথযোগি-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারত-বহির্ভূত অনেক স্থানেও নাথযোগীদের স্থান ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

নাথযোগি-সম্প্রদায় যত শাখাতেই বিভক্ত হউক এবং কোন বিষয়ে তাহাদের মতে ও আচারে অবান্তর পার্থক্য যাহাই থাকুক, সাধ্য-সাধন-সম্বন্ধীয় প্রধান বিষয়ে তাহাদের সকলেরই মত ও আচার-ব্যবহার প্রায় একপ্রকার। তাহারা সকলেই যে এক বিরাট্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাহার পরিচয় প্রত্যেক শাখার মতে ও আচারে জাজ্বল্যমান। সকল পন্থই শ্রীআদিনাথকে সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করে। সকল সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, আদিনাথ স্বয়ং শিব বা স্বয়ং শিবই আদিনাথ। মূলতঃ সমগ্র নাথযোগি-সম্প্রদায়ই শৈব-সম্প্রদায় ও সকলের মূল উপাস্য শিব। গোসেবা ও গোরক্ষার প্রতি সকল নাথযোগীরই বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। নাথসম্প্রদায়ের মতে গোজাতির সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি গোরক্ষ-নাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলিয়াই তিনি গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, সমগ্র হিন্দুসমাজের উপর গোরক্ষ-নাথের প্রভাব অসাধারণ।

দশনামী সন্ন্যাসিগণ যেমন তীর্থ আশ্রম সরস্বতী পুরী ভারতী বন অরণ্য গিরি পর্ব্বত ও সাগর—এই দশপ্রকার উপাধির মধ্যে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক বিভাগ অনুসারে কোন একটি উপাধি গুরুপ্রদত্ত নামের সহিত গ্রহণ করিলেও, সকলেরই সাধারণ উপাধি 'স্বামী', সেইরূপ যোগিগণের সাধারণ উপাধি 'নাথ'। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বার পন্থায় বিভক্ত হইলেও তাঁহাদের নামের বা উপাধির মধ্যে স্ব স্ব পন্থার বিশেষ কোন নিদর্শন রাখেন না। ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া তাঁহারা স্বীয় দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের উপর এবং কর্ম্মভোগময় সংসারের উপর নাথত্ব বা আধিপত্য লাভ করেন বলিয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ উপাধির অধিকারী হন।

নাথসম্প্রদায়ের সাধকগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দীক্ষা প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ মন্ত্রদীক্ষা; ইহাতে গুরু শিষ্যের কর্ণে শক্তিসমন্বিত পবিত্র সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করেন। এই দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের অধিকার-অনুসারে ভগবানের এক বা একাধিক নাম অথবা হংসমন্ত্র জপ করিতে দিতে পারেন। গুরু গোরক্ষনাথের মতে 'হংস' মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—"নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় 'হং' শব্দের সহিত বায়ু বহির্গত হয় এবং 'স' শব্দের সহিত বায়ু পুনরায় প্রবেশ করে। জীব স্বভাবতঃ এই 'হংস' মন্ত্র জপ করিতেছে। দিবারাত্র ২১৬০০ বার জীব এই মন্ত্র জপ করে। কারণ প্রতি মিনিটে ১৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস হয় এই হিসাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ২৪ ঘণ্টায় ২১৬০০ (২৪×৬০×১৫) বার হয়। 'হংস' মন্ত্রের তাৎপর্য্য 'অহং সঃ'—

'সোঽহম্'—অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। শ্বাস-প্রশ্বাস সর্ব্বদা তাহা (সোঽহম্) আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগের মধ্যক্ষণে স্বভাবতঃ আমরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হই। বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুসরণ করিয়া সেই ভাবটি স্মরণ করিতে করিতে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করাই এই সাধনের উদ্দেশ্য।" এই মন্ত্রদীক্ষা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী সকল সাধকই সদ্গুরুর নিকট গ্রহণ করিতে পারেন। ধর্ম্মপিপাসু গৃহী শিষ্যকে অন্তর্দর্শী গুরু সাধারণতঃ নামজপের উপদেশ দিয়া থাকেন; বিশেষভাবে সাধনে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছুক ও যোগ্য শিষ্যকে তিনি 'হংস' মন্ত্রের উপদেশ দেন। নাম-জপই সহজতম সাধন।

যে সাধক সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন পূর্ব্বক সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করেন, তাঁহার একটি বিশেষ দীক্ষা আছে। গুরু তাঁহাকে কোন একটি বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ সাধনের উপদেশ দেন। গুরু স্বহস্তে কাঁচি দিয়া শিষ্যের শিখা কাটিয়া দেন। ইহার নাম 'ঝুঁটিকাটা'। এই ঝুঁটি-কাটা মুণ্ডনের অনুকল্প। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু শিষ্যের মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক পূর্ব্ব জীবনের অবসান ও নবজীবনের আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন সাধকের পুনর্জন্ম; তখন হইতে গুরুই শিষ্যের পিতা মাতা আশ্রয় পরিচালক ও অভিভাবক। ঝুঁটিকাটার সঙ্গে সঙ্গেই গুরু দুই তিন অঙ্গুলি পরিমিত একটি কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত বাঁশীর মত যন্ত্রবিশেষ রেশমী সূত্রে বাঁধিয়া শিষ্যের গলায় মালার মত পরাইয়া দেন। ঐ বাঁশীটির নাম 'নাদ' ও ঐ সূত্রমালার নাম 'সেলি'। নাদটি ঠিক হৃদয়যন্ত্রের উপর লম্বিত থাকে। যোগিগণ বলেন "হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বদা অনাহত নাদ ধ্বনিত হইতেছে। ভিতরের সেই নাদের কথা স্মরণ করাইয়া সর্ব্বদা সেই দিকে চিত্তকে সমাকৃষ্ট করিবার জন্যই বাহিরে এই কাষ্ঠবিলম্বিত নাদযন্ত্রের বিধান।" শিষ্য গুরুকে বা দেবতাকে প্রণাম করিবার সময় ঐ নাদে ফুঁ দিয়া প্রণবধ্বনি এবং 'আদেশ' উচ্চারণ করে।

নাথযোগীদিগের মধ্যে আর এক প্রকার দীক্ষা আছে। এই দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের দুই কর্ণে দুইটি বৃহৎ ছিদ্র করিয়া তাহাতে দুইটি কুণ্ডল পরাইয়া দেন। ঐ কুণ্ডল সাধারণতঃ প্রস্তর বেলেয়ার শঙ্খ বা গণ্ডারের শৃঙ্গে প্রস্তুত হয়। ঐ কুণ্ডলকে যোগিগণ শিবের কুণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস করেন। নাথসম্প্রদায়ের আদি-পুরুষ আদিনাথ হইতে শিষ্যপরম্পরাক্রমে যোগি-সম্প্রদায়ে কুণ্ডলধারণ-প্রথা প্রচলিত আছে। ইহার নাম 'মুদ্রা'। মুদ্রার অন্য একটি নাম 'দর্শন'। এই দীক্ষাই নাথযোগীদিগের শেষ দীক্ষা। এই চরমদীক্ষাপ্রাপ্ত যোগিগণ 'কনফট' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা কর্ণে দর্শন ধারণ করেন বলিয়া 'দর্শন-যোগী' নামেও আখ্যাত হন। উদাসীন যোগী হইলেই যে 'কনফট্' হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। যোগে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যও ইহার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

ঝুঁটিকাটা, কানফাটা ব্যতীত 'উপদেশী' দীক্ষা নামক আর এক প্রকার দীক্ষা যোগীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই দীক্ষা সাধারণতঃ ঝুঁটিকাটার পর হয়, কখন কখন বা কানফাটার পরও হইয়া থাকে। কেহ ঝুঁটিকাটার অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে কোন যোগীর নিকট 'উপদেশ' লাভ করিলেও সন্ন্যাস-গ্রহণের পর পুনরায় 'উপদেশী' দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। 'উপদেশী' দীক্ষাকালে একরাত্রি নানা প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়; যথা—মন্ত্রপূত প্রদীপ-প্রজ্বালন, হর-পার্ব্বতী ব্রহ্মা বিষ্ণু গণেশ ও গোরক্ষনাথের পূজা, মদ্যমাংসাদি দ্বারা

আকাশ-ভৈরবের পূজা, মন্ত্রপাঠ ভজন ইত্যাদি। যাঁহারা শুধু উপদেশী, তাঁহাদেরই তথায় প্রবেশাধিকার থাকে, অন্যের নহে। উক্ত তিন প্রকার দীক্ষা যে একই গুরুর নিকট গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এক জন গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অপরের নিকট ঝুঁটি কাটাইয়া নাদ ও সেলি গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়া যায়; আবার তৃতীয় গুরুর দ্বারা কর্ণে ছিদ্র করাইয়া দর্শনযোগী হওয়াও সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

শুনেছি সমুদ্রব্যাপ্তি নাহি আসে কভু ধারণায়,
তটিনীর কত ধারা কেবা জানে সেথা হয় লয়।
হৃদয়-সমুদ্র তব আরো বড়, কূল কে বা পায়,
অনন্ত প্রবাহ সেথা লভিয়াছে মহা সমন্বয়।

মিলেছে পাশ্চাত্য সেথা—ভ্রম-অন্ধ জড়ের পূজারী,
চেতনার রত্নরাজি সযতনে আহরণ লাগি;
মিলেছে সৌভাগ্য-মত্ত ধনলুব্ধ স্বার্থ-কামাচারী,
জীবনের শ্রেষ্ঠ-ধন কাছে আসি' লইয়াছে মাগি।

নাস্তিক তোমার কাছে নত হ'য়ে লয়েছে শরণ,
আস্তিকে দিয়েছ তুমি অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ সন্ধান,
অজ্ঞেয়বাদীরে তুমি জ্ঞান-আলো ক'রি বিতরণ,
জীবনের ধ্রুব লক্ষ্যে ধ্রুব সত্য করেছ প্রমাণ।

ভক্তেরে দিয়েছ তুমি ভালবাসা প্রেম অকপট,
দুঃখীরে করেছ দান চিরদুঃখ নিবৃত্তির ধন,
ভয়ার্ত্তে দিয়েছ শক্তি আত্মবলে লঙ্ঘিতে সঙ্কট,
ভ্রান্তেরে নিয়েছ সাথে করিবারে পথ-উত্তরণ।

কর্ম্মবীরে শিখায়েছ জীব মাঝে সেবা ঈশ্বরের,
আচণ্ডাল প্রিয় তব কেহ নয় এ জগতে পর,
নিরাকার ব্রহ্মবাদী—পথ যা'র নিবৃত্তি-মার্গের,
তারি পাশে সাকারের ঘুচে গেছে ভেদ ও অন্তর

ভোগীরে দিয়েছ তুমি একাধারে গৃহ ও সন্ন্যাস,
বন্ধনের মাঝে দেছ চির-মুক্ত উদার জীবন।
সন্ন্যাসীরে শিখায়েছ ত্যজিবারে ত্যাগের বিলাস,
দিয়েছ মহান্ মন্ত্র করিবারে বিশ্বেরে আপন।

মস্‌জিদ্ দেউল গির্জ্জা—ধর্ম্মগত জাতিগত ভেদ—
তোমার মিলন-শঙ্খে ঘুচায়েছে সকল সংশয়।
"যত মত তত পথ"—এই তব জীবনের বেদ,
অসাম্যের বুকে তুমি দেখিয়াছ বিশ্ব-সমন্বয়।

নিপীড়িত মানুষের আঁখিজল, দুঃখ ও বেদনা
তোমার বুকের মাঝে তুলিয়াছে ব্যথা-আলোড়ন!
মানুষের প্রেমে তাই পরিণত তোমার সাধনা—
আলোক-ইঙ্গিত পায় তব মাঝে ভবিষ্য-ভুবন।

পরশুরাম কুণ্ড

ব্রহ্মচারী অটল চৈতন্য

আসামের উত্তর পূর্ব-সীমান্তে সাইকোয়াঘাট শেষ রেল-ষ্টেশন। ষ্টেশনটি বড় না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; এখানে কয়েকটি ভাল দোকান বিদ্যমান। সপ্তাহান্তে একদিন হাট বসে। হাটের দিন পাহাড় থেকে অহম নাগা কুকি নেপালী লুসাই মিকির মিস্‌মি প্রভৃতি বহু জাতি সমবেত হয়। সাইকোয়াঘাটে খেয়া পার হতে হলে একবার অনুমতিপত্র নিতে হয়, আর ব্রহ্মপুত্রের খেয়া পার হয়ে সীমান্তে এক পা বাড়াতে হলেই সরকারের আর একবার বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। অবশ্য প্রথমটিতে তেমন অসুবিধা কিছু নেই, বিশেষতঃ তীর্থযাত্রীদের পক্ষে। থানার দারোগাই ছাড়পত্র লিখে দেন।

আমি ১২টার সময় এই ষ্টেশনে নেমে সীমান্তপারের যাত্রা সুরু করলাম। তখন ফাল্গুন মাস, প্রচণ্ড মার্তণ্ডদেবের দুর্দান্ত প্রতাপ থাকা সত্ত্বেও প্রথমে হেঁটে চলেছি; প্রকৃতি-রাজ্যের সৌন্দর্য বিশেষভাবে দেখবার জন্য আমি হেঁটেই রওনা হলাম। কিছু দূর যাবার পরই পেলাম ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষোপরি মরুভূমিসদৃশ বালুকাময় প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী এক মাইল প্রশস্ত জলপ্রবাহ। দূর হতে শুভ্র যজ্ঞোপবীতের মতো দেখায়! ছোট ষ্টিমারে এই নদ পার হয়ে বালির চর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চললাম। সেই চরেই আবার রাস্তার দুধারে মরূদ্যানের মত অসংখ্য ছোট ঝোপ আর কুলের গাছ। গাছে অগণিত কুল পেকে আছে। এমনি ভাবে ৩।৪ মাইল অতিক্রম করে যখন ওপারে একটি শহরে পৌছলাম তখন বেলা দুটো।

এই ছোট শহরটির নাম সদিয়া। এখানে থেকে এক জন রেসিডেণ্ট উপজাতীয় এলাকা শাসন করেন। শহরটি ছোট হলেও জিনিষপত্র সবই পাওয়া যায়। এর পর ওদিকে সুদূর চীন পর্যন্ত আর হাট বাজার নেই। মধ্যে দু'এক জায়গায় সামান্য পরিমাণে চাল ডাল নুন ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখানে একটি সৈন্যাবাস আছে। প্রায় ১০ হাজার সৈন্য থাকে।

আমি একটি বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুলাম—পথশ্রান্তি দূর হল। সন্ধ্যার পূর্বে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরুলাম। সেকি প্রাণ-মাতান দৃশ্য! প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তে অংকিত অদৃষ্টপূর্ব চিত্রাবলীর কি আর তুলনা হয়? শুক্লা চতুর্দশী—চন্দ্রমা তার পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে পূর্বাকাশে উদিত, আর তারই পাশে গগনস্পর্শী পর্বত যার পদতল ধৌত করে চলেছে ব্রহ্মপুত্র।

আমার গন্তব্যস্থল হলো সদিয়া হতে আরো ৬০ মাইল দূরে মিসমি পাহাড়ের নিবিড় অরণ্যের এক নিভৃত কোণে অবস্থিত পরশুরাম কুণ্ড। ভৃগুবংশধর পরশুরাম দশাবতারের অন্যতম। ঋষিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি স্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্র রামকে মাতৃহত্যার আদেশ দেন। পরশুরাম পিতৃ-আদেশ মুহূর্ত্তে পালন করে পিতৃ-সন্তুষ্টির বরস্বরূপ মাতৃপ্রাণ ভিক্ষা করে মাকে পুনর্জীবিত করে তোলেন। তবু মাতৃহত্যাজনিত পাপ পিতৃ-আশীষেও একেবারে শেষ হয়নি।

ফলে তাঁর অপরাজেয় অস্ত্র কুঠারটি হাতে লেগে রইলো—কিছুতেই খসতে চাইলো না। সকল তীর্থ দর্শনান্তে পরশুরাম সর্বশেষ এই কুণ্ডে এসে স্নান করার পরই কুঠারটি হঠাৎ খসে যায়। সে হতেই এর নাম পরশুরাম কুণ্ড।

সেই দিন রাত্রেই বেড়িয়ে এসে রেসিডেণ্ট ও বড় বাবুর বাড়ীতে ঘোরাফেরা করে সীমান্ত-পারের ছাড়পত্র সংগ্রহ করলাম। পরদিন সকাল ৮টায় যাত্রা করলাম। সদিয়া থেকে একটি মাড়োয়ারী কোম্পানীর বাস সার্ভিস আছে। শুধু বাস সার্ভিস নয়, এই ভারতের সুদূর শেষ প্রান্তে যত সব বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে, সবই মাড়োয়ারীদের। যাই হউক, মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমার প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করলেন। মোটরে তিন শ্রেণীতে ভাড়ার কোন তারতম্য নেই। আমাকে তাঁরা যেতে ও আসতে সম্মুখের আসনেই বসতে দিলেন। যাত্রিগণের 'পরশুরাম কি জয়' ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হয়ে উঠল। কয়েক মিনিট পর্যন্ত তার রেশ থেকে পরে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। কত দেশ, কত গ্রাম, কত ঘরের লোক সবই এই বাসে এক। এক পথের যাত্রী, এক মন এবং সবার ডাকই যেন একই অন্তরের ডাক!

জয়ধ্বনির মধ্যে মোটর ছাড়ল ধর্মশালা হতে। প্রথম শহর, পরে প্রান্তর, তারপর ঝোপ জঙ্গল নদী নালা অতিক্রম করে চলল তীব্রবেগে। প্রথম যে নদী পাওয়া গেল তার নাম সুনপোরা। এখানে একটি বিশ্রামস্থান আছে। খানিক বিশ্রাম করে মোটর ছাড়ল নানারূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে। সুনপোরার পর পাহাড় বা পর্বত বলতে কিছু নেই। ভূমি সমতল, কিন্তু গভীর জঙ্গল ও ঘন বৃক্ষরাজিতে চারিদিক আচ্ছন্ন। প্রকাণ্ড গাছগুলি যে কত শত বৎসরের পুরানো তা কে বলবে? কত শত গাছ যে বার্ধক্যে আপনি মরে পড়ে পচে আছে তারও ইয়ত্তা নেই। কে কত কাঠ চালান দেবে—আর কি করেই বা দেবে? বর্ষায় ব্রহ্মপুত্র বা অন্য কোন নদীর আশেপাশে যে গাছগুলি আছে, কেবল সেইগুলি নদীতে ভাসিয়ে নীচে নিয়ে আসে। এমনও হয়েছে যে বর্ষায় গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে, কিন্তু গাছটি সরিয়ে আর রাস্তা করা হয় নি, রাস্তাটিকেই সরিয়ে অন্যদিকে নিতে হয়েছে—কারণ গাছ সরিয়ে নেওয়ার চেয়ে রাস্তাটিকে সরানই সহজ-সাধ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই রাস্তাটি শুধু ৪ মাস থেকে ৫ মাস পর্যন্ত চালু থাকে। বর্ষার প্রথম ভাগেই বন্ধ হয়ে যায়।

সুনপোরা ছেড়ে আসার পর আমরা বিশ্রাম করলাম পায়া নামক জায়গায়। এখানে একটি ডাকবাংলা, দু'এক জন চৌকিদার ও পুলিশ আছে। বেচারাদের নির্জন অরণ্যে বাস করে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার কি উৎসাহ! মোটর দেখলেই এগিয়ে এসে চিরপরিচিতের মত আকুল আবেগে কথাবার্তা বলে থাকে। এখানে একটি পায়া নামক নদীও আছে। এখান থেকে মোটর ছাড়ল—বনরাজি আরো ঘনতর রূপ ধারণ করল। তারপর আর লোকালয় নেই। মধ্যে মধ্যে শুধু জানা ও অজানা পশুপক্ষীর ডাক। এমনি করে আরো দুটি ষ্টেশন পার হলাম—ঐসব স্থানে নদী, ডাকবাংলা ও দু'চারজন সরকারী লোক আছে। "ডিগারো" ও "তেজো" অতিক্রম করে গাড়ী এসে যখন মিসমিঘাট বা টিমাই পৌছল তখন বেলা ৩৷৹টা। এই জায়গাটি অন্য জায়গার তুলনায় বেশ বড়। দুটি দোকান, এক জন উচ্চ সরকারী কর্মচারী এবং কয়েক জন সেপাই আছে। তাছাড়া বহু মিসমি ছেলে মেয়ে

বুড়ো এখানে বাস করে। মোটরের রাস্তা এখানেই শেষ। তারপর গভীর বন এবং এত উঁচু পাহাড় যে, বেলা ১০ টার পূর্বে আর ৪ টার পরে সেখানে সূর্যের দর্শন ক্বচিৎ কোথাও মেলে। এই পাহাড়ের নাম মিসমি পাহাড়। এরই কোন এক নিভৃত কোণ আমাদের গন্তব্যস্থল।

অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আমিও চললাম হেঁটে নদী-নালা ও পাহাড় বেয়ে; মুটে হল সেই মিসমি জাতি। বাংলা হিন্দি আসামী কোন ভাষাই তাদের এখনও অধিগত হয়নি। তবে অতি অল্পসংখ্যক আছে যারা হিন্দি বললে বোঝে, কিন্তু নিজেরা বলতে পারে না একেবারেই। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার ব্রহ্মপুত্র পার হলাম। কাণ্ডারী সেই মিসমি মুটে আর নৌকা হ'ল ভেতর খোদাই একটি গাছের কাণ্ড। ব্রহ্মপুত্রের কি মনোরম দৃশ্য! স্বয়ং প্রকৃতিদেবী ছাড়া এই বর্ণচ্ছটা ফুটিয়ে জনসমাজে ধরার অধিকারী আর কেহ নেই! দক্ষিণবাহিনী নদীর পশ্চিমাকাশে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য প্রকৃতির সেই গোপনরাজ্যে তার পূর্ণ সম্পদ বিতরণ করছে। আবার তারই সেই ছটা এসে পড়েছে প্রশস্ত চরের শত রঙ্গে চিত্র-বিচিত্র ছোট বড় অসংখ্য নুড়ি পাথরের উপর। ব্রহ্মপুত্র নদের জল আর সেই পাথরেরই বা মহিমা কত! ৮।১০ হাত জলের নীচেও পাথরগুলি ঝলমল করছে দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জল হবে হাত-দুয়েক। কিন্তু পরে দেখলাম মাঝির বৈঠায় কুলুচ্ছে না। মাটি নেই, আছে শুধু ছোট বড় পাথর। জলস্রোত যাচ্ছে সেই পাথর গড়িয়ে, তাই কল্‌কল্ ধ্বনি মিলে এমন এক শব্দ উঠছে যার তুলনা মিলতে পারে যদি কতকগুলি পাঞ্জাব মেল একসঙ্গে ছাড়া হয়। সেই শব্দ এত গুরুগম্ভীর যে দু'মাইল দূর থেকেও শোনা যায়—অবশ্য সম্মুখে যদি পাহাড় বাধা না দেয়। নদ পার হয়ে নানারকম পশুপক্ষী দেখে এমন একস্থানে পৌছলাম যেখানে সূর্যের আলো লজ্জায় ম্লান হয়ে এসেছে চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণধারার সম্মুখে। সেইদিন শিবচতুর্দশী, চাঁদ পূর্ণতা প্রাপ্ত না হলেও আলো বিতরণ করতে কার্পণ্য করেনি। শুভ্র জ্যোৎস্না পাহাড়ের বৃক্ষরাজির ওপর ঝলমল করছে—আর সান্ধ্য সমীরণ শোঁ। শোঁ। শব্দে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। সেই রাতে ধর্মশালায় যে যার জায়গা নিয়ে খাওয়া পরার দিকে মনোযোগ দিলেন। ধর্মশালার পাশেই একটি আশ্রম আছে। সেখানে বাসুদেব-বিগ্রহ স্থাপিত। সীতানাথদাস নামে এক জন সাধু ব্রহ্মধারা থেকে এখানে এসেছেন বহুদিন পূর্বে। তিনিই এই আশ্রম ও ধর্মশালা তৈরী করেছেন। তাছাড়া নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের উপর স্বহস্তে অতি যত্নের সহিত একটি সুন্দর বাগানও করেছেন। বৎসরের অধিকাংশ সময় এ জায়গাটি যদিও সমতল ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তবুও তিনি সেখানেই বারমাস বাস করেন। আশ্রম থেকে কুণ্ড প্রায় দুই ফার্লং দূরে।

পরদিন ভোরে উঠেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে কুণ্ডদর্শনে গেলাম। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মানসসরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মপুত্র পূর্বমুখী প্রবাহিত হয়েছে এবং তিব্বত ঘুরে পরে আসামের সীমানায় ব্রহ্মকুণ্ডে প্রবেশ করেছে। এই ব্রহ্মকুণ্ডেরই পশ্চিমাংশ দিয়ে যে উষ্ণ জলধারা নেমে আসছে তা-ই পরশুরামকুণ্ড নামে অভিহিত। পরে উভয় স্রোত মিলে উত্তরমুখী হয়ে আশ্রমের পূর্বপ্রান্তে বয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদ। কুণ্ডের প্রায় চতুর্দিক সু-উচ্চ পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত, কেবল ব্রহ্মপুত্রের আগমন ও নির্গমন পথ দু'টি খোলা আছে। কুণ্ডে নেমে স্নান করবার জন্য এক জন

মাড়োয়ারী ভক্ত সিঁড়ি বাঁধিয়ে ঘাট তৈরী করে দিয়েছেন, এতে যাত্রীদের স্নানের সুবিধা হয়েছে। যাত্রীরা সবাই কুণ্ডে ও উষ্ণ প্রস্রবণে স্নানতর্পণাদি করেন। ঘাটের ওপর প্রশস্ত প্রস্তরমালাতে বসে অনেকেই ধ্যানজপে মগ্ন। প্রায় ঘণ্টাচারেক সেখানে কাটিয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম। আশ্রমটি ভাল করে দেখার পর পাহাড়ের সানুদেশে সাধু বাবার বাগানটি দেখলাম। প্রায় ১২ টার পর আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে হেঁটে এলাম মিসমিঘাট। সেখান থেকে মোটর-যোগে সন্ধ্যা ৭টায় এসে সদিয়া পৌছলাম।

নিমাই-সন্ন্যাস

শ্রীসাহাজী

গত মাঘ মাসের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্ মহাশয় লিখিত 'শ্রীচৈতন্যপ্রসংগে' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। শ্রদ্ধেয় নাথ মহাশয় যে সকল তথ্যের উপর আলোকপাত করেন নাই, তিনি অতি অল্প কথায় সেগুলির উপর সুন্দর আলোকপাত করিয়াছেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-সম্পর্কে তিনি তিনটি অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন: 'অদ্বৈতপ্রকাশের' মতানুযায়ী ১৪৩০ শকাব্দ একটি, নাথ মহাশয়ের মতানুযায়ী ১৪৩১ শকাব্দ আরেকটি এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতের' মতানুযায়ী ১৪৩২ শকাব্দ তৃতীয় আরেকটি।

বলা বাহুল্য, ঐ তিনটি মতের মধ্যে শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয়ের মতটিই ঠিক এবং ওটি 'চরিতামৃত' অথবা 'অদ্বৈতপ্রকাশের' মতের বিরোধীও নয়।

'চরিতামৃতের' পয়ারটি এইরূপ:

"চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥"

ইহার অর্থ এই যে, যে মাঘ মাসে প্রভুর বয়স ২৪ বৎসর শেষ অর্থাৎ পূর্ণ হয়, সেই মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, এই মাত্র। তাঁহার জন্ম ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে; কাজেই, ১৪৩১ শকাব্দের মাঘ মাসেই তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর পূর্ণ হইবার কথা।

'অদ্বৈতপ্রকাশের' উক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য আবার এই যে, ১৪৩০ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে অদ্বৈতগৃহিণী সীতা দেবী যমজপুত্র প্রসব করেন। সুতরাং ঐ পুত্রদ্বয়ের যখন অন্নপ্রাশন হয়, তাঁহাদের বয়স তখন অন্ততঃ ৬ মাস; অতএব তখন অন্ততঃ পৌষ মাস! অতঃপর, সহসা এক দিন গৃহাগত কোনও বৈষ্ণবের মুখে শ্রীঅদ্বৈত-কর্তৃক শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদশ্রবণ। খুব সম্ভব সময়টা তখন ফাল্গুন মাস। শকাব্দের বর্ষগণনা হয় অগ্রহায়ণ, নয় মাঘ হইতে আরম্ভ। কাজেই, তখন যে ১৪৩১ শকাব্দ তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ১৪৩০ শকাব্দে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, এমন কথা 'অদ্বৈতপ্রকাশ'কার বলেনও নাই।

যাহা হৌক, আমার এই অভিমত ভৌমিক মহাশয়ের সন্দেহভঞ্জনে সমর্থ হইলে বাধিত হইব।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র

মিঃ এস এন মুখোপাধ্যায়

* * এই শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে, ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হইবে। মুখবন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে, ভারতের জনসাধারণই এই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ন্যায়-বিচার স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠাই এই শাসনতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শাসনতন্ত্রের রূপ সাধারণতান্ত্রিক, কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে কেহ ভারতের সর্বময় শাসন-কর্তা হইবেন না।

প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতেই এই শাসনতন্ত্র রচিত। ইহাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব-সম্পন্ন ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট ও উপরাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্ট এই দুই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে ভারতকে কতকগুলি উপরাষ্ট্রের 'ইউনিয়ন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 'ফেডারেশনে'র পরিবর্তে 'ইউনিয়ন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা মার্কিন অথবা কানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন চুক্তিবদ্ধ কতকগুলি রাষ্ট্রের লীগ নহে কিংবা প্রধান কর্মকর্তা ও প্রতিনিধির মধ্যে যে সম্পর্ক, ইউনিয়ন ও উপরাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্টের সম্পর্ক সেরূপ নহে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, যুক্তরাষ্ট্র হইয়াও এখানে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থা বিদ্যমান বটে, কিন্তু ইউনিয়নের সংহতি-বিধানকল্পে সমস্ত মৌলিক ব্যাপারে সমতাবিধানই ইহার উদ্দেশ্য। তাই ইহাতে দ্বৈত নাগরিক অধিকার দানের ব্যবস্থা নাই। ইউনিয়নের সর্বত্র একটি মাত্র নাগরিক অধিকার আছে—ভারতীয় নাগরিক অধিকার। উপরাষ্ট্রের পৃথক নাগরিক অধিকার নাই। শাসনতন্ত্রে একটি বিচারবিভাগ, একরূপ ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ও উপরাষ্ট্রের জন্য একই রূপ ব্যবস্থা আছে। ইউনিয়নকে চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থাও শাসনতন্ত্রে রহিয়াছে। কোন উপরাষ্ট্রের ইউনিয়নের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার কিংবা নিজস্ব শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার নাই।

পরিবর্তনীয় ফেডারেশন

সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্র যেরূপ কঠোর ভাবে বিধিবদ্ধ কিংবা সম্প্রসারণের অযোগ্য হয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সেরূপ নহে। রক্ষণশীলতা কিংবা আইনগত বিতর্কের দুর্বলতাও ইহাতে নাই। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র এরূপভাবে রচিত হয় যে, কোন অবস্থায়ই ইহার পরিবর্তন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পরিবর্তনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতাবণ্টন ইহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং উপরাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্ট একে অন্যের অধিকারক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিলে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয়। এই অবস্থায় বিচারবিভাগের ব্যাখ্যাই চরম বলিয়া গৃহীত হয়। এই কঠোরতা এবং আইনগত বিতর্কের অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অষ্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রের ন্যায় কতকগুলি সর্ত করা হইয়াছে। ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট আইনের দ্বারা অনুরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এই সর্তগুলি বলবৎ থাকিবে এবং পার্লামেণ্টকে যুক্ততালিকার অন্তর্ভুক্ত অন্যূন ৪৭টি বিষয়ে আইনপ্রণয়নের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্র-সংশোধন-ব্যাপারে অন্যান্য শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর সুযোগ রহিয়াছে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রয়োজনবোধে ইহা ঐকিক রাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাষ্ট্র হইতে পারিবে। স্বাভাবিক অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে কাজ করাই ইহার উদ্দেশ্য, কিন্তু যুদ্ধ এবং অন্যান্য জাতীয় জরুরী প্রয়োজনে সমগ্র দেশ একটি ঐকিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইবে। সঙ্কটমুহূর্তে পরস্পরবিরোধী স্বার্থ দেখা দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বিভক্ত হইতে পারে না। তখন সমগ্র দেশের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই এই আনুগত্য বজায় রাখিতে সক্ষম। এই সুপরিজ্ঞাত নীতির ভিত্তিতেই ইহা করা হইয়াছে।

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র

যদিও রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ককে 'প্রেসিডেণ্ট' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তথাপি মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের পদ্ধতিতে এই গভর্নমেণ্ট গঠিত হয় নাই। পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গভর্নমেণ্ট-গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ইহা লোকায়ত্ত গভর্নমেণ্ট হইবে। ইউনিয়নের সর্বময় শাসনকর্তৃত্বসম্পন্ন প্রেসিডেণ্ট (রাষ্ট্রপতি) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শানুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। এই ভাবে গভর্নমেণ্টের সমস্ত কার্যের পশ্চাতে দেশ-বাসীর সমর্থন থাকিতেছে। ভারতীয় প্রদেশ-সমূহে গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্মুখে রাখিয়াই শাসনতন্ত্রপ্রণেতাগণ পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট গঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক অথবা দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট গঠন, মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শানুসারে রাজা-কর্তৃক রাজ্যশাসন এবং এমন কি জনগণের অভিপ্রায়ানুসারে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিবর্তনসাধন যে প্রাচীন ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল না—শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ এই বিষয়ে অবহিত। শাসনতন্ত্রে ৩১৫টি নিবন্ধ এবং ৮টি তপশীল আছে। ভারতবর্ষের অবস্থাসম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গণপরিষদ-কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র সুদীর্ঘ মনে হইতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অনেক সর্ত-সম্পর্কেই অপরাপর শাসনতন্ত্রে সাধারণ আইন দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের ব্যাপকতা, অধিবাসীর বিভিন্নতা ও বিভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মনে রাখিলে এইরূপ সর্তাবলীর বিশ্লেষণের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাইবে। অনেকগুলি সর্তই সাময়িক। শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত না থাকিলে সুচারুভাবে শাসনতন্ত্র-পরিচালনে শিশু গণতন্ত্র অসুবিধা ভোগ করিতে পারে, এই কথাও বিবেচনা করা হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্য সমস্যা

শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে, ভারত কতকগুলি উপরাষ্ট্রের ইউনিয়ন হইবে। ২৭টি উপরাষ্ট্র এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত। শাসনতন্ত্রের প্রথম তপশীলের ক খ ও গ ভাগের বর্ণনা অনুযায়ী এই সকল

উপরাষ্ট্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ এর পূর্বের গভর্নরশাসিত প্রদেশ, ভারতীয়, দেশীয় রাজ্য এবং চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশসমূহও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত)। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় স্বাধীনতা আইন বলবৎ হইবার সময় এখানে ৯টি গভর্নরশাসিত প্রদেশ, ৫টি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ এবং পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। এই দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতের সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কোন কোনটির আয়তন ব্রিটেনের অনুরূপ, আবার কোন কোনটির আয়তন মাত্র কয়েক একর। এই সকল রাজ্যের মোট আয়তন ভারত ডোমিনিয়নের আয়তনের প্রায় অর্ধেক এবং মোট অধিবাসিসংখ্যাও ভারত ডোমিনিয়নের অধিবাসিসংখ্যার শতকরা ২৭ ভাগ। এই রাজ্যগুলি ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে ইংলণ্ডের রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। ইহাদের সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়নের অধিকার ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের ছিল না। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন প্রবর্তনের ফলে রাজার আধিপত্য হইতে ইহারা মুক্ত হইল বটে, কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সহিত সম্পর্ক অস্পষ্টই রহিয়া গেল। ডোমিনিয়ন অধিকার লাভের পর ভারতে বহু সামন্ত রাজ্য থাকিয়া গেল। ইহাদের অধিকাংশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাই স্বৈরতান্ত্রিক। সংঘর্ষ এড়াইয়া এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিক্রমে কি ভাবে এই সকল রাজ্য লইয়া একটি সুসংহত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতীয় সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব, ইহাই কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের এক সমস্যা হইল। ইহা একটি বিরাট জটিল সমস্যা; পৃথিবীর অন্য দেশের ইতিহাসে ইহার তুলনা বিরল। দেশের নেতৃত্ব এই ব্যাপারে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। কি ভাবে ভারতের নেতৃবর্গ সাফল্যের সহিত এই বিরাট সমস্যার সমাধান করিয়াছেন তাহা এখন ইতিহাসের বিষয়। দ্রুত অন্তর্ভুক্তি ও একের সহিত অপরের সংযোগসাধন করিয়া এই পাঁচ শতাধিক রাজ্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ষোলটিতে পরিণত করা হইয়াছে। প্রথম তপশীলের 'খ' ভাগে ইহাদের ৯টি এবং 'গ' ভাগে ৭টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অন্তর্ভুক্তির কথা এখন সর্বজনবিদিত; ইহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র ইহাই উল্লেখযোগ্য যে, এই শাসনতন্ত্রের অধীনে ইহারা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত অন্যান্য উপরাষ্ট্রের প্রায় সমমর্যাদাসম্পন্ন।

পার্লামেণ্টের আইনবলে ইউনিয়নে নূতন রাষ্ট্র গ্রহণ অথবা নূতন রাষ্ট্রগঠনের ব্যবস্থা এই শাসনতন্ত্রে আছে।

নাগরিক অধিকার

পূর্বেই বলা হইয়াছে সমগ্র ভারতের জন্য মাত্র একরূপ নাগরিক অধিকার থাকিবে। এই সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে বিস্তৃতভাবে কিছু না বলিয়া পার্লামেণ্টের হাতে আইনবলে ইহার ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের প্রবর্তনকালে কাহারা নাগরিক হইবেন, সাধারণভাবে কেবল তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে। ৫নং নিবন্ধে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিলে এবং ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত যে কোন গুণের অধিকারী হইলেই শাসনতন্ত্র-প্রবর্তনের কালে তিনি ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন:— (১) কোন ব্যক্তি নিজে অথবা তাহার পিতা-মাতার যে কেহ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে কিংবা (২) শাসনতন্ত্র-প্রবর্তনের পূর্বে কেহ অন্যূন ৫ বৎসর ভারতে বাস করিয়া থাকিলে।

পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত ব্যক্তিগণের এবং প্রবাসী ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার সম্পর্কেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মৌলিক অধিকার

অতঃপর শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বলা হইয়াছে। মৌলিক অধিকার সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা বহু লিখিত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে যে সকল রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশের শাসনতন্ত্রে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই অধিকারকে মহান উদ্দেশ্যসাধনের পূত সঙ্কল্প বলিয়া মনে করা হয় এবং ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জনমত গঠিত এবং গভর্ণমেণ্টের কর্তব্যাকর্তব্যের নৈতিক মান নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এইরূপ অধিকারগুলির সুস্পষ্ট উল্লেখ আরও বেশী করিয়া দেখা যাইতেছে। স্থায়ী আন্তর্জাতিক সমাজ-গঠনের পক্ষে মানবিক অধিকারের সর্বসম্মত নিরাপত্তাব্যবস্থা এখন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, শাসনতন্ত্রেই মানবিক অধিকার সম্পর্কে এরূপ ব্যাপক ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এ পর্যন্ত অন্য কোন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এরূপ দেখা যায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রানুসারে মৌলিক অধিকারের আতিশয্য সংযত করার জন্য অনেক সময়ে সুপ্রীম কোর্টের শরণাপন্ন হইতে হয়। এই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রাখিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচয়িতৃগণ মৌলিক অধিকারের সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ না করিয়া সরাসরি ভাবে রাষ্ট্রকেই ইহা সীমাবদ্ধ করার অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য হয় নাই। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি নিম্নোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত—ক্ষমতালাভের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার, ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতার অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার, সম্পত্তির উপর অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারলাভের অধিকার।

অস্পৃশ্যতা-উচ্ছেদ

১৭নং নিবন্ধে অস্পৃশ্যতা চিরতরে লোপ করা হইয়াছে এবং অস্পৃশ্যতার প্রয়োগ অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইহা সাম্যের অধিকার-সম্পর্কে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯নং নিবন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের অধীনে নাগরিকগণকে বক্তৃতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা, গতিবিধি ও বসবাসের স্বাধীনতা, সম্পত্তি-অর্জন, ভোগ ও দান-বিক্রয়ের স্বাধীনতা, যে কোন বৃত্তি-গ্রহণ কিংবা যে কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য করার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা

২১নং নিবন্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা রহিয়াছে। অনেক সময় পরিষদ অধিকারবহির্ভূত আইন রচনা করে, কেবল তাই বলিয়াই নয়, এই আইনে ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়—এই যুক্তিতে অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে, বিচারবিভাগের উপর আইনের বৈধতা-সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু শাসনতন্ত্র-রচয়িতৃগণ এই অভিমত সমর্থন করেন নাই। পরিষদের অভিপ্রায়-সম্পর্কে বিচার-বিভাগকে রায়দানের ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে তাঁহারা পার্লামেণ্টকে এই মৌলিক অধিকার নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। ২২নং নিবন্ধে রাষ্ট্র-কর্তৃক যথেচ্ছ গ্রেপ্তার ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য

আটকের বিরুদ্ধে নাগরিকের নিরাপত্তাব্যবস্থা আছে।

আইন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। ৩১নং নিবন্ধে এই মূলনীতিই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আইনে সরকারী কাজে দখলীকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ-দানের ব্যবস্থা থাকিবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কিংবা কি নীতিতে ও কি উপায়ে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত ও প্রদত্ত হইবে, আইনে ইহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৩২নং নিবন্ধে শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে তাহার প্রতিকারব্যবস্থা আছে। ইহার জন্য এমন কি সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত আবেদন করার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই নিবন্ধ না থাকিলে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত। কারণ, শাসনতন্ত্রে প্রতিকারব্যবস্থা না থাকিলে কোন অধিকারই অধিকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মৌলিক অধিকার রক্ষার যথোচিত দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্ট এবং হাই কোর্টকেও প্রয়োজন মত 'হেবিয়াস কর্পাস', 'মান্দামুস্', 'সার্টিওরারি' ও 'কুয়ো ওয়ারেন্টো' ইত্যাদি আদেশ জারীর বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রপরিচালন-নীতি

রাষ্ট্রব্যবস্থা-নির্ধারণকল্পে শাসনতন্ত্রে কয়েকটি নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সর্তাবলীতে গভর্নমেণ্টকে কতকগুলি কাজ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই সকল নীতিতে রাষ্ট্রের কি কি কাজ করা কর্তব্য তাহাই বলা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে বর্ণিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই এইগুলি রচিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এইগুলি পরিষদ এবং শাসন-বিভাগের কর্তব্যনির্ধারণ সম্পর্কে উপদেশ। বিচারালয়ের মারফত এই নীতিগুলি বলবৎ করা যাইবে না। কিন্তু দেশশাসন-ব্যাপারে ইহারা ভিত্তিস্বরূপ। আইনপ্রণয়ন-কালে গভর্নমেণ্টের এইগুলি প্রয়োগ করা কর্তব্য। জনসাধারণের নিকট দায়ী কোন গভর্নমেণ্টই এইগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না। ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত-গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; যথা—জনসাধারণের কল্যাণসাধনে রাষ্ট্রের সতত চেষ্টা ও নাগরিকগণের জীবনযাত্রা নির্বাহের যথোচিত সুযোগদান ; শিক্ষা এবং কর্মের সুযোগদান ; বেকার বৃদ্ধ রুগ্ন এবং পঙ্গুদিগকে সরকারী সাহায্য দান ; কারখানার শ্রমিকদের মনুষ্যোচিত ভাবে কাজ করার জন্য ব্যবস্থা এবং প্রসূতিদের মঙ্গলবিধান ; ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ; স্বাস্থ্যহানিকর ঔষধ ও মাদকদ্রব্য বিক্রয় নিবারণ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা।

ইউনিয়নের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ; যথা—শাসনবিভাগ, আইনপরিষদ এবং বিচারবিভাগ সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের ৫ম খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট

পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রেসিডেণ্ট (রাষ্ট্রপতি) ইউনিয়নের রাষ্ট্রনায়ক। ইউনিয়নের সমস্ত শাসনক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পিত এবং শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত আদেশ তাঁহার নামে বলবৎ হইবে। ঐকিক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন উপরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি

লইয়া গঠিত 'নির্বাচনী পরিষদ' কর্তৃক (ইলেক্টোরেল কলেজ) প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইবেন। যাহাতে সমস্ত উপরাষ্ট্রীয় পরিষদের মোট ভোটারের সংখ্যা কেন্দ্রীয় পরিষদের ভোটারের সংখ্যার সমান হয়, এই উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল ৫ বৎসর এবং তিনি পুনরায় নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারিবেন। শাসনতন্ত্র-লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইবে।

ইউনিয়নের একজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট (সহ-রাষ্ট্রপতি) থাকিবেন; আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগণ-কর্তৃক তিনি নির্বাচিত হইবেন। তাঁহারও কার্যকাল ৫ বৎসর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভাইস প্রেসিডেণ্ট (সহ-রাষ্ট্রপতি) পদাধিকারবলে পার্লামেণ্টের 'রাষ্ট্রসভার' চেয়ারম্যান হইবেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ প্রেসিডেণ্টের পদ শূন্য হইলে প্রেসিডেণ্টের কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য যেমন ভাইস প্রেসিডেণ্টই প্রেসিডেণ্ট হন, এখানে সেইরূপ হইবে না। এইরূপ অবস্থায় নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্তই মাত্র তিনি প্রেসিডেণ্টের কার্য করিবেন। প্রেসিডেণ্টের সাময়িক অনুপস্থিতিকালেও ভাইস প্রেসিডেণ্ট প্রেসিডেণ্টের কাজ করিবেন।

ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে, পার্লামেণ্টারী গভর্নমেণ্টের পদ্ধতিতেই কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠিত হইবে। প্রেসিডেণ্টের পদমর্যাদা ইংলিশ শাসনতন্ত্রের রাজার অনুরূপ। 'লোকসভা'র নিকট দায়ী মন্ত্রিসভা তাঁহাকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবেন। প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছার উপরই মন্ত্রিসভা বহাল থাকা না থাকা নির্ভর করিবে। প্রেসিডেণ্টের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক ইংলণ্ডের রাজার সহিত তাঁহার মন্ত্রিসভার সম্পর্কের অনুরূপ বলিয়া তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারে চলিতে বাধ্য। প্রেসিডেণ্ট সর্বদাই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কার্য করিবেন—শাসনতন্ত্রে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত নাই। কিন্তু শাসনতন্ত্র-রচয়িতৃগণ বৃটেনের অনুরূপ প্রথারই পক্ষপাতী।

পার্লামেণ্ট

ইউনিয়নের একটি পার্লামেণ্ট থাকিবে। 'রাষ্ট্রসভা' (কাউন্সিল অব ষ্টেটস্) এবং 'লোকসভা' (হাউস অব পিপল)—এই দুইটি পরিষদ ও প্রেসিডেণ্টকে লইয়া এই পার্লামেণ্ট গঠিত। রাষ্ট্রসভায় সদস্যসংখ্যা ২৫০এর অধিক হইবে না। ইঁহাদের মধ্যে ১২জন প্রেসিডেণ্ট-কর্তৃক মনোনীত এবং অবশিষ্ট বিভিন্ন উপরাষ্ট্রের প্রতিনিধি। সাহিত্য বিজ্ঞান চারুকলা সমাজসেবা অথবা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ কিংবা কার্যকর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই এই সকল সদস্য মনোনীত হইবেন। উপরাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে আসনবণ্টন-সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের ৪র্থ তপসিলে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। জনসংখ্যার অনুপাতে ইহা নির্ধারিত হইয়াছে। যে সমস্ত উপরাষ্ট্রে আইনপরিষদ বিদ্যমান, তথায় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রসভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। যে সমস্ত উপরাষ্ট্রে আইনপরিষদ নাই সেখানে পার্লামেণ্ট-নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি গৃহীত হইবে। রাষ্ট্রসভা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান; ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না। কিন্তু প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসরগ্রহণ করিতে হইবে। লোকসভার সদস্যসংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হইবে না। উপরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারগণের দ্বারা এই সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। প্রতি পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ পর্যন্ত জনসংখ্যার জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক

নির্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্যা ও প্রতিনিধির অনুপাত যথাসম্ভব একরূপ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন উপরাষ্ট্র এবং যে সকল অঞ্চলে উপরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নাই তথা হইতে লোকসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য পার্লামেণ্ট-কর্তৃক আইনবলে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় লোকসভার আয়ুষ্কাল ৫ বৎসর।

বৈধ নির্বাচনের ব্যবস্থা

বৈধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিবেন। পার্লামেণ্ট ও উপরাষ্ট্রীয় আইন-পরিষদের (নির্বাচনী ট্রাইবুনাল নিয়োগসহ) সর্বপ্রকার নির্বাচন পরিদর্শন, এই সম্পর্কে নির্দেশ-দান ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এই কমিশনের উপর অর্পিত হইবে। যাহাতে তিনি শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কার্যপরিচালন করিতে পারেন তজ্জন্য চীফ ইলেকশান কমিশনারকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির অনুরূপ মর্যাদাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী শাসনতন্ত্রানুযায়ী ভারতে বহু বৎসর ধরিয়া যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপদ্ধতি বলবৎ ছিল তাহার অবসান করা হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই লোকসভা এবং উপরাষ্ট্রসমূহের আইনপরিষদের সর্বপ্রকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

আইনপ্রণয়ন বিধি

পার্লামেণ্টের উভয় সভা আহ্বান অথবা স্থগিত রাখার ক্ষমতা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট 'লোকসভা' ভাঙ্গিয়াও দিতে পারিবেন। পার্লামেণ্টের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রারম্ভে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট-কর্তৃক বক্তৃতাদান এবং এই সম্পর্কে বিতর্কের এক বিশেষ ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা বৃটিশ পার্লামেণ্টে রাজার বক্তৃতার অনুরূপ।

বিল উত্থাপন সম্পর্কে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, অর্থবিল ভিন্ন অন্য যে কোন বিল পার্লামেণ্টের যে কোন সভায় উত্থাপন করা যাইবে। উভয় সভা কর্তৃক গৃহীত এবং প্রেসিডেণ্ট-কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর ইহা আইনে পরিণত হইবে। অর্থবিল ভিন্ন অন্য কোন বিল সম্পর্কে উভয় সভার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে প্রেসিডেণ্ট উভয় সভার যুক্তবৈঠক আহ্বান করিতে পারিবেন এবং যুক্তসভার অনুমোদিত সংশোধনাবলী সহ বিলটি উভয় সভায় উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হইলে উহা উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। অর্থবিল কেবলমাত্র লোকসভায়ই উত্থাপন করা যাইবে। লোকসভায় ইহা গৃহীত হইলে ৪ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ ফেরৎ পাঠাইবার জন্য বিলটি রাষ্ট্রসভায় প্রেরণ করা হইবে। রাষ্ট্রসভার কোন সুপারিশ লোকসভা-কর্তৃক গৃহীত না হইলে রাষ্ট্রসভার সুপারিশ অনুযায়ী কোনরূপ সংশোধন ব্যতিরেকেই যে আকারে অর্থবিলটি লোকসভায় গৃহীত হইয়াছিল সেই আকারেই উভয় সভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইনের আমলে অর্থনৈতিক ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসৃত হইত এখানে উহার বিশেষ পরিবর্তন করা হইয়াছে। ব্রিটেন কানাডা অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে লোকসভা-কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়বরাদ্দ প্রেসিডেণ্টের সার্টিফিকেট-বলে খরচ করার অধিকার না দিয়া একটি আইনের বলে তাহা করার ব্যবস্থা

হইয়াছে। বৃটেনের অনুরূপ এখানেও অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ হিসাব ঋণ ইত্যাদি সম্পর্কে ভোট-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। হিসাবসম্পর্কে ভোট-গ্রহণপদ্ধতির প্রচলন হওয়ায় 'লোকসভা' বাজেট-বরাদ্দসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ পাইবেন এবং আর্থিক বৎসরের শেষে সমস্ত বরাদ্দ-সম্পর্কে সভার ভোটগ্রহণ আর এখন প্রয়োজন হইবে না।*

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

* 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সৌজন্যে প্রকাশিত'—উঃ সঃ

পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

অজর অমর নিত্য শাশ্বত মহান্,
অজেয় অপরাজেয়, আমি লোকাতীত,
অক্লেদ্য অশোষ্য আমি, অচ্ছেদ্য অব্যক্ত,
অচল, ব্যোমরূপে পরিব্যাপ্ত আমি
চরাচরে। আমি রত্নাকর, দৃষ্টিহীন
তলদেশে রতননিচয় কত শোভে
সারি সারি আপনারে আপনি উজলি'।
বাসনার বজ্রাঘাতে সদা রে সুশান্ত
প্রশান্ত সমুদ্র সম তটিনী প্রবেশে।
কানন-কন্দর-গিরি পয়োধির বুকে
পরম হরষে ফিরি আমি রে পবন,
আমি পৃথ্বী, পৃথ্বী সম ধৈরয-ক্ষমায়
ভূষিত, পাবক আমি, ভস্ম করি পাপ
যত আপনার তেজে। আমি উল্কা, উল্কা
সম সুখে ভ্রমি সারা নভঃ মাঝে। রবি
আমি, তমঃ বিদূরিত করি আপন
প্রভায়। চপলা চঞ্চলা আমি, পলকে
পুলকে চলি সারা নভতলে, রূপের
ঝলকে লোকের ঝলসি নয়ন। নিশা-
নাথ হই আমি, সুশীতল সমুজ্জ্বল
আমার পরশ! গন্ধর্ব্ব কিন্নর আমি।
আমি মহাদেব, দেবের ঈশ্বর—মোর
নৃত্যে ভীতা ত্রস্তা হলো বসুন্ধরা। কৃষ্ণ
আমি, মোর তানে যমুনা মোহিত। ঘন-
কৃষ্ণ রূপধারী আমি মহাকালী—এক
হস্তে নর মুণ্ড, অভয় অপরে। আমি
দুর্গা দশপ্রহরণধরা। আমি ছিন্ন-
মস্তা, নিজরক্ত-পানে তৃপ্ত, আমি ভয়-
ঙ্কর। ধর্ম্মের পালক আমি, সমুদ্যত
দণ্ড মোর পৃথ্বী শিরোপরি। মারুতির
মত সাগর গিরি উল্লঙ্ঘিয়া আনন্দে
বিদারিতে পারি বক্ষ আপনার।
নরশ্রেষ্ঠ হই আমি মনুষ্যসমাজে। আমি
বাসনার বহ্নিকুণ্ডে বৈরাগ্যের পূত
সলিল সিঞ্চিয়া আত্ম সমর্পিতে পারি
বিশ্ব-পদ-মূলে। বিপদে চরণপ্রান্তে
দলিয়া নির্ভয়ে কর্ত্তব্য করমে আমি
সদা অচঞ্চল অটল গিরীন্দ্র সম।
অন্যায়ের শিরোদেশে করি পদাঘাত—
ন্যায়-পদপ্রান্তে করি বিনীত প্রণতি,
বারিদ তটিনী সম আমি রে মহান্!

গ্রীষ্মপ্রধানদেশীয় রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

স্যার ফিলিপ ম্যানসন-বাহ্‌র

গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্য যে সমস্ত বিশেষ ধরনের রোগ জন্মে থাকে তার বিরুদ্ধে বৃটেন বহু কাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য রোগ উচ্ছেদের জন্য সেখানে ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ম্যালেরিয়া, নিদ্রারোগ এবং পীতজ্বর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে যে ভাবে প্রসার লাভ করে তা সত্যই আশংকাজনক। এই তিনটি রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই সর্বপ্রধান। এই রোগের জন্য সেদিন পর্যন্ত ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন রকম উন্নয়নমূলক কাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বহুলাংশে ম্যালেরিয়া নিরোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তা সমূলে ধ্বংস করা কঠিন হবে না।

৫০ বৎসর পূর্বে যখন প্রথম জানা যায় যে ম্যালেরিয়া মশার সাহায্যে বিস্তার লাভ করে, তখন সকলেই অনুমান করেছিল যে ম্যালেরিয়া দমন সহজ হবে। কারণ যেখানেই ম্যালেরিয়া দেখা দেবে সেখানেই মশা ধ্বংস করে তার উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল তা অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব।

নানাদেশের কীটতত্ত্ববিদ্‌দের ব্যাপক গবেষণার ফলে ক্রমশঃ যে সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় তা থেকে জানা যায় যে জীববিদ্যা-সংক্রান্ত বিশেষ কারণে সমস্ত রকম মশার মধ্যে একমাত্র অ্যানোফিলিস্ মশাই ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করতে পারে এবং তাদের আক্রমণ থেকেই মানুষের দেহে রোগের বীজাণু সংক্রমিত হয়। এই সব মশা বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুষ্টি লাভ করে। সেইজন্য পরবর্তী কালে তাদের বিরুদ্ধে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পন্থায় সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালানোর পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়।

এই সংগ্রাম-পরিকল্পনা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থায় মশার রকমভেদ অনুযায়ী রচিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মালয়ের জলা জায়গায় এক ধরনের মশা বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সাধারণতঃ বংশবৃদ্ধি করে থাকে। দেখা গিয়েছে যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মশার বৃদ্ধি সংযত বা বিনাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই মশার মধ্যে কতকগুলি ছায়াঘন ঝোপঝাপড়া পছন্দ করে, আবার কতকগুলি সূর্যালোক ভালবাসে। তা যাই হোক বর্তমান যুগে ডি-ডি-টি নামক ঔষধের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া-নিরোধ-সংগ্রাম সম্পূর্ণ অন্য ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। এই কীটঘ্ন ম্যালেরিয়ার সর্বপ্রধান শত্রু।

আফ্রিকার সমগ্র বিষুবরেখা অঞ্চলে অ্যানোফিলিস গ্যামবিয়া (**Anopheles gambiae**) নামে এক রকম সাংঘাতিক মশা ম্যালেরিয়া-বিস্তারের প্রধান নায়ক হিসাবে বহুকাল ধরে দুর্নাম অর্জন করে এসেছে। যে কোন নোংরা জলা জায়গায় তারা এতদিন বংশ বৃদ্ধি করছে। দু'বৎসর পূর্বেও আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল থেকে এই সব ক্ষুদ্রাকৃতি মশা উচ্ছেদ

করার চিন্তা পর্যন্ত অসম্ভব ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সুদান এবং উত্তর ইজিপ্টে অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র আফ্রিকা থেকে ম্যালেরিয়া নির্বাসিত করা কঠিন হবে না। এই কাজে বর্তমানে ডি-ডি-টি ছাড়া গ্যামেক্সেন (Gammexane) নামে আরও একটি নূতন কীটঘ্ন প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গিয়েছে।

ম্যালেরিয়া আজ ধ্বংসোন্মুখ। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে ডি-ডি-টি অভিযানের ফলে সাইপ্রাস দ্বীপ সম্পূর্ণ ভাবে ম্যালেরিয়ামুক্ত। এই দ্বীপটি সমগ্র বিশ্বের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছে।

বৃটিশ গায়নায় ডাঃ জর্জ গিগ্লিওলিও এই কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁকে বিরাট পলিমাটি অঞ্চলে ধান্য এবং বেতভূমি, জলা জায়গা এবং শত শত মাইল ব্যাপী জলপ্রণালী সম্পর্কে কাজ করতে হয় বলে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাঁর এই অভিযান প্রধানতঃ দু'রকম মারাত্মক মশার বিরুদ্ধে চলে—য়্যানোফিলিস্ ডার্লিংগি (A. Darlingi) এবং য়্যানোফিলিস য়্যাকোয়াসালিস্ (A. Aquasalis), এই সময় তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে সর্বপ্রকার বসত-বাটিতে ডি-ডি-টি নিক্ষেপ করতে হয়। যদিও এই দুরকমের মশার প্রজননক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন—একটি পরিষ্কার জলে এবং অপরটি ঝোপ-জঙ্গলে—তবু দু'বৎসরের মধ্যে তাদের প্রায় সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়। তার ফলে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ম্যালেরিয়ার পর ট্রাইপানোসোমিয়াসিস্ (Trypanosomiasis) বা নিদ্রারোগের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ট্রাইপানোসোম এক রকম ক্ষুদ্র ব্যাঙাচির মত জীব যা মানুষের বা পশুর দেহের মধ্যে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে এবং ভয়াবহ সেট্‌সি মক্ষিকার সাহায্যে তা এক দেহ থেকে আর এক দেহে সংক্রামিত হয়। এই মক্ষিকাগুলি আফ্রিকার বিষুবরেখা-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, এদের আক্রমণে মানুষ বা গৃহপালিত পশু যে কেবল কঠিন নিদ্রারোগে আক্রান্ত হয় তা নয়, তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মোট ৬,৫০,০০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে কম করেও ২,০০০,০০০ লোক ভয়াবহ নিদ্রারোগে ভুগছে। সেই জন্য টাঙ্গানাইকার দুই-পঞ্চমাংশ মাত্র বসবাস বা চাষের উপযোগী, বাকি অংশ সেট্‌সি মক্ষিকার উপদ্রবে একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য। বৈজ্ঞানিকদের মতে ২১ রকমের সেট্‌সি মক্ষিকা আছে, তার মধ্যে ছয় রকমের মক্ষিকা নিদ্রারোগ-বিস্তারে সক্ষম। সেই সঙ্গে এও জানা গিয়েছে যে কয়েক রকমের গাছপালা এবং বিশেষ ধরনের আবহাওয়ার মধ্যে তারা প্রসার লাভ করে।

এই রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালানো সহজসাধ্য নয়, তা সময়সাপেক্ষ। বহু কীটতত্ত্ববিদ্ এ সম্পর্কে বহু গবেষণা করেছেন। বর্তমানে মক্ষিকাগুলির প্রজনন-ক্ষেত্র ধ্বংস করে তার বিস্তার রোধ করার পরিকল্পনা হয়েছে। বিমান-সাহায্যে ঊর্ধ্ব থেকে ডি-ডি-টির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে সাময়িক ভাবে সাফল্য লাভ করা গিয়েছে। সেই সঙ্গে নবাবিষ্কৃত শক্তিশালী প্রতিকারক ভেষজ, যথা—য়্যান্ট্রিপোল্ (Antrypol) এবং ট্রাইপার-সামাইডের (Tryparsamide) ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ব্যাপক ব্যবস্থা সত্ত্বেও মক্ষিকার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

উত্তর নাইজেরিয়ার আনচাউ শহর নিদ্রা-রোগের জন্য বহুকাল ধরে কুখ্যাতি অর্জন

করে এসেছে; শহরটি যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি অস্বাস্থ্যকর। এই শহরটিকে নিদ্রারোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে তার প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল এলাকা থেকে সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করে নূতন ভাবে শহর পত্তন করা হয়। এখন তা পুরোপুরি স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এর সমস্ত কৃতিত্ব হল ডাঃ এইচ এম লেস্টার, ডাঃ টি এ এম ন্যাশ এবং ডাঃ কেনেথ মরিস-এর।

পীতজ্বরের বিরুদ্ধেও এক দিন এই ভাবে জয়লাভ করা সম্ভব হয়; সে জয়লাভের ইতিহাসও তেমনি রোমাঞ্চকর। ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণ নিজের জীবন বিপন্ন করে কি ভাবে রোগের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন তা আজ কারো অজানা নেই। একশ বৎসর পূর্বে একবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই দুর্ধর্ষ পীতজ্বরের মড়কে সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল এবং এমন কি পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকাও এই মড়কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি।

যে বীজাণু থেকে এই রোগের উৎপত্তি তা এক রকমের অতিক্ষুদ্র 'ভাইরাস'। জ্বরের প্রথম তিন দিন তা রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে রোগীর দেহ থেকে অন্য দেহে 'এডেস এজিপ্‌টি' (Aedes aegypti) নামে এক রকমের 'বাঘা মশা'র দ্বারা সত্বর সংক্রমিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় যে এই ধরনের মশার বাস লোকালয়ে হওয়ায় ডি-ডি-টির সাহায্যে তা দূর করা সম্ভব হয়েছে। তার ফলে পীতজ্বরও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকার জনবহুল এলাকা থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রধান প্রধান রোগের বিরুদ্ধে কি ভাবে এত কাল সংগ্রাম হয়ে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে দেওয়া হল। এ কথা আদৌ অতিরঞ্জিত নয় যে একমাত্র কুষ্ঠরোগ ছাড়া সমস্ত রকম গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় রোগের প্রতিকার সম্ভব হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক আজ অকাল মৃত্যু বা অকারণ রোগ-ভোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নব জীবনের স্বাদ লাভ করেছে। এই দুরূহ কর্তব্য পালনের জন্য বৃটেনের 'কলোনিয়াল মেডিক্যাল সার্ভিসে'র সদস্যগণ বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। তাঁরা সর্বরকম অন্যায় সমালোচনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জনকল্যাণে যে ভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন তা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। *

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস্‌-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

অসীমের আহ্বান

(Voice of Infinite)

স্বামী পরমানন্দ

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাতাস শুধুই কয় না কথা কানে কানে,
ভরে দেয় হৃদয় মোদের অসীমেরই গানে গানে।
পৃথিবী যে গন্ধ বিলায়, জল যে তৃষ্ণা নাশে,
নদী যে যায় বয়ে যায় পাহাড়েরই আশে পাশে,
পশু যে ছুটিয়া চলে, পাখী যে পাখনা মেলে,
গাছে যে লতাটি জড়ায়, কুসুমের আঁখি যে খোলে
প্রভাতের সোনার কিরণ, সকলেই দেয় গো আনি
আমাদের মনের কোনে অসীমের বারতা খানি।

দার্শনিক পিথাগোরাসের একটি মত

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীস এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য্য এবং দর্শন চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। আজ আমরা বহুদূর এগিয়ে এসেছি। আমাদের কাছে প্রাচীন অতীত ক্রমেই যেন প্রাচীনতর হয়ে উঠছে। হয়ত এমন এক দিন আসবে যেদিন বইএর পাতায় কালির আঁচড়ে আমরা আর অতীতের প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে পারব না। জড়বাদের কুয়াসায় আমাদের দৃষ্টি চারদিক থেকে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তখন অতীতের চলে যাওয়া মানুষের পদধ্বনি আর আমাদের কানে বাজবে না। আমরা ভুলে যাব তাঁদের সাধনাকে, তাঁদের তপস্যাকে আমরা মনে করব অর্থহীন। আজ জড়বাদের মোহে যে পৃথিবীর মায়ার মাঝে আমরা স্বর্গীয় সুখ লাভ করতে চাইছি, সে পৃথিবীর আসল রূপ সম্বন্ধে চিন্তা করবার মত মানসিক শক্তি আমাদের নেই। আপাতমধুর জড়ত্বের বাইরে আমরা আর কিছু বিশ্বাস করতে চাই না, কারণ আমরা নির্বীর্য্য হয়ে পড়ছি। তাই বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতকে যখন দেখি তখন মনে হয় একটা বিরাট আত্মপ্রবঞ্চনার ওপর আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গ্রীসকে দেখে পিথাগোরাসের গ্রীসকে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর, কারণ আমরা জড়বাদী সভ্যতার অঞ্জনমাখা চোখে হোমার থালেস্ আনেক্‌জিম্যাণ্ডার আনেকজামোনস এবং পিথাগোরাসের গ্রীসকে দেখবার চেষ্টা করি। আমরা ভুলে যাই, এই সব মনীষীর অবদানে এক দিন গ্রীসের কৃষ্টি উর্ব্বর হয়ে উঠেছিল। জগতের আদিম উপাদান খুঁজে বের করবার জন্য এঁরা আজীবন সাধনা করেছেন। হোমার বলে গেছেন, আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা হলেন ওশেনাস দেবতা; থালেস্ প্রমাণ করতে চাইলেন জগতের আদিম উপাদান হ'ল তরল পদার্থ। আনেক্‌জিম্যাণ্ডার বলেছেন, মরুৎই হ'ল এই পৃথিবীর আদিম উপাদান। আর পিথাগোরাস্ প্রমাণ করেছেন, জগতের আদিম মূল কারণ হ'ল সংখ্যা। তিনি বলেন, সৃষ্টির আগে সর্ব্বত্র আগুন ছিল। এই আগুন যখন ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে যেতে লাগল তখন ভেঙ্গে যাওয়া আগুনের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠল আমাদের এই পৃথিবী এবং আরো অনেক জিনিষ, যেগুলোকে আমরা সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করতে পারি। অর্থাৎ প্রথমে ছিল এক। এই এক বিভক্ত হয়ে দুই-এ রূপান্তরিত হ'ল। পিথাগোরাস্ বলেন, প্রত্যেকটি জিনিষের মাঝে আনুগুণ্য এবং অনুক্রম রয়েছে। তিনি অসীম এবং সসীম এই দুটো উপাদানের ওপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে জগৎসৃষ্টির পেছনে রয়েছে এই দুটো উপাদানের সংযোগ। অর্থাৎ তিনি তাপকে বলেছেন সসীম এবং মরুৎকে বলেছেন অসীম। আগুন যখন

মরুৎ-এর সংস্পর্শে এল তখন বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে জগৎসৃষ্টির কাজ আরম্ভ হ'ল।

ইতিহাসের পাতায় পিথাগোরাসের চিন্তা-ধারার সঙ্গে আমরা যখন পরিচিত হই, তখন শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন সে যুগ আমাদের চোখে নিয়ে আসে এক বিরাট বিস্ময়।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি

মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্‌লাউড্

অনুবাদক—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

(২)

আমরা বম্বে পৌছলাম। ওখানকার বন্ধুরা থাকবার জন্য আমাদের সাগ্রহ অনুরোধ করলেন। আমরা কিন্তু প্রথম ট্রেণেই কল্‌কাতা রওনা হলাম। পরদিন সকাল চারটায় ১০৷১২ জন শিষ্যসহ স্বামীজী আমাদের নিতে এলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েক জন লাল পাগ্‌ড়ি-পরা বিশিষ্ট ভারতীয়, আমেরিকায় যাঁদের মিসেস্ ওলি বুল আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেছিলেন। তাঁরা মালা দিয়ে আমাদের অভিভূত করে ফেল্লেন। আমরা সত্যসত্যই ফুলে ঢাকা পড়ে গেলাম। কেউ আমাকে মালা পরিয়ে দিলে আমি ভীষণ ঘাব্‌ড়ে যাই। মিসেস্ ওলি বুল এবং আমি একটি হোটেলে উঠলাম। মিঃ মোহিনী চ্যাটার্জি হোটেলে এলেন; তিনি বিকেল পাচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকলেন। আমি বল্লাম: "আশা করি আপনার স্ত্রী চিন্তা করবেন না।" তিনি উত্তর দিলেন: "বাড়ী গিয়ে আমি মাকে বুঝিয়ে বল্‌ব।" ওর মানে কি আমি বুঝতে পারিনি। মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে যখন বেশ জানাশোনা হয়ে গেছে—বোধ হয় বছর খানেক পরে—তখন তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলাম: "ঐ প্রথম দিন আপনি বলেছিলেন—'মাকে বুঝিয়ে বল্‌ব।' এর মানে কি?" তিনি বল্লেন: "ও, সে কথা! মার ঘরে গিয়ে সমস্ত দিন যা ঘটেছে সবই তাঁকে না বলে আমি রাত্রে নিজের ঘরে ঢুকি না।" "কিন্তু আপনার স্ত্রী? তাঁকে সব বলেন না?" আমি জিজ্ঞেস্ করলাম। তিনি উত্তর দিলেন: "আমার স্ত্রী? এ ঘনিষ্ঠতা তিনি তার ছেলের কাছে পান।" তখনই আমি বুঝতে পারলাম ভারতীয় এবং আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলীভূত পার্থক্য। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি মাতৃত্ব, আমাদের সভ্যতার ভিত্তি পত্নীত্ব—এতেই হয়েছে অভাবনীয় পার্থক্য।

দুএক দিনের মধ্যে বেলুড় নীলাম্বর মুখার্জির বাগান বাড়ীতে আমরা স্বামীজীকে দেখতে

গেলাম। ওখানে ছিল অস্থায়ী মঠ। বিকেলের দিকে স্বামীজী বল্লেন: "নতুন মঠে তোমাদের নিয়ে যাব। ওটা আমরা কিন্‌ছি।" আমি জিজ্ঞেস্ করলাম: "কিন্তু এ বাড়ী কি যথেষ্ট বড় নয়?" বাগানবাড়ীটি ছিল ভারী সুন্দর—ছোটখাট; বিঘে তিনেক যায়গা; একটা ছোট পুকুর ও অজস্র ফুল। আমি মনে করলাম, যে কোন লোকের পক্ষে ঐ বাড়ীটা যথেষ্ট বড়। কিন্তু স্বামীজী সবকিছুই অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি ছোট গলির ভেতর দিয়ে আমাদের এক যায়গায় নিয়ে এলেন যেখানে বর্তমান মঠ অবস্থিত। নদীতীরের পুরনো ঘরটিকে শূন্য দেখে মিসেস্ ওলি বুল্ এবং আমি বল্লাম: "স্বামীজী, ঘরটি আমরা ব্যবহার করতে পারি?" "এটা সারান হয়নি।" স্বামীজী উত্তর দিলেন। "আমরা সারিয়ে নেব।" তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। ঘরটিকে আমরা নতুন ক'রে চুণকাম করিয়ে নিলাম। বাজারে গিয়ে মেহগনি কাঠের পুরনো সরঞ্জাম কিনে একটি বৈঠকখানা করে নিলাম। ঘরটির অর্ধেক সাজান হল ভারতীয় রীতিতে, বাকি অর্ধেক পাশ্চাত্য রীতিতে। বাইরের দিকে ছিল আমাদের খাবার ঘর আর শোবার ঘর। অতিরিক্ত আর একখানা ঘর ছিল ভগিনী নিবেদিতার জন্য। আমাদের কাশ্মীর না যাওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের অতিথি ছিলেন। পুরোপুরি দুমাস আমরা সেখানে ছিলাম। বোধ হয় স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ঐ সময়টাই সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য হয়েছিল। প্রতিদিন সকাল বেলা তিনি চা খেতে আসতেন—বড় আমগাছের তলায় তিনি চা খেতেন। সেই গাছটি এখনও আছে। গাছটি আমরা কাটতে দিই নি। গঙ্গার ধারের বাড়ীতে আমরা বাস করছি, এতে তিনি খুশীই ছিলেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁদের সকলকেই তিনি নিয়ে আসতেন। যেটাকে তিনি বাসের অযোগ্য মনে করেছিলেন সেটাকে আমরা কি চমৎকার বাড়ী করে তুলেছি! বিকেল বেলা ঘরের সামনে আমাদের চায়ের মজলিস্ বসত। নদীটি ওখান থেকে ভাল করে দেখা যেত। দেখা যেত সব সময়ই মালভর্তি নৌকোগুলি স্রোতের বিপরীত দিকে যাচ্ছে, আর আমরা নিজেদেরই বৈঠকখানায় যেন অতিথিদের অভ্যর্থনা করছি! যে সব জিনিষ সকলে নিতান্ত সাধারণ মনে করে তাদেরও আমরা খুঁটিনাটি ব্যবহার করছি দেখে স্বামীজী আনন্দিত হতেন। এক দিন রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হল—মনে হচ্ছিল যেন সব জলাকার। তিনি আমাদের খাবার ঘরের বাইরে বারাণ্ডায় পায়চারি করে কৃষ্ণ সম্বন্ধে, তাঁর প্রেম ও জগতে সেই প্রেমের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। তাঁর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল—যখন তিনি ভক্ত, প্রেমিক, তখন কর্মযোগ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগকে একেবারে বাদ দিয়ে দিতেন; যেন সেগুলোর কোন মূল্যই নেই! আর যখন তিনি কর্মযোগী তখন কর্মকেই প্রধান আলোচ্য করে তুলতেন। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক তাই-ই। কখনও কখনও তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটি বিশেষ ভাবে থাকতেন; একটু আগে যে ভাবে ছিলেন তার দিকে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ নেই! মনে হত চিত্তের একটি বিস্ময়কর একাগ্রতা-শক্তিতে তিনি পূর্ণ; মনে হত যে মহান্ বিশ্বাত্মক ভাবরাশি আমাদের চারদিকে বিরাজ করছে, সেগুলির প্রকাশন-শক্তিতে তিনি ভরপুর! ঐ একাগ্রতাশক্তিই বোধ হয় তাঁকে এত সতেজ, এত কর্মচঞ্চল করে রাখত। মনে হত তিনি কোন কিছুর অনুবৃত্তি করছেন না, সবই যেন তাঁর নিকট নিত্য নবাকারে প্রতিভাত। একটি সাধারণ ঘটনা—যার বিশেষ মূল্য নেই—

তাও তাঁর নিকট নূতন পথ উদ্ভাসিত করে দিত। তাঁর নিকট পাশ্চাত্যবাসী আমাদের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল; আমাদের তিনি বলতেন 'জীবন্ত বেদান্তী'। তিনি বলতেন: "তোমরা কোন কিছু সত্য বলে যদি বিশ্বাস কর তবে তা কর, সে সম্বন্ধে তোমরা স্বপ্ন দেখো না। ঐটিই তোমাদের শক্তি।"

এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে স্বামীজী সিংহলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনাগারিক ধর্মপালকে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন'। মিসেস্ ওলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা আর আমি ঐ ঘরে এত স্বচ্ছন্দে বাস করছিলাম যে স্বামীজী বিশেষ গৌরবের সহিত তাঁর অতিথিদের দেখাতেন—পাশ্চাত্য মেয়েরা কি রকম সহজ অনাড়ম্বর ভাবে বাস করে সত্যিকার একটি গৃহপরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

১২ই মে, ১৮৯৮ আমরা কাশ্মীরের পথে যাত্রা করলাম। আমরা নৈনিতালে নাব্‌লাম, নৈনিতাল যুক্তপ্রদেশ গভর্নমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস। সেখানে শত শত ভারতীয় তাঁর সঙ্গে দেখা করত। তারা তাঁকে একটি ঘোড়ার ওপর বসিয়ে তাঁর সামনে ফুল ফল ইত্যাদি ছড়িয়ে দিত। খৃষ্ট যখন জেরুজালেম্ প্রবেশ করেন লোকরা ঠিক এই রকমই করেছিল। আমার তক্ষুনি মনে হল—তাহলে এটা একটা প্রাচ্য প্রথা।

তিন দিন আমরা একাই ছিলাম। তাঁকে আমরা একেবারে দেখতে পাইনি। আমরা একটা হোটেলে বাস করছিলাম। শেষে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। ছোট ঘরগুলোর একটিতে আমরা ঢুকলাম। সেখানে দেখতে পেলাম তিনি বিছানার ওপর বসে আছেন, মুখখানি যেন হাসিতে মাখান! আমাদের আবার দেখে তিনি এত খুশী! তাঁকে আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমরা কোন আগ্রহ প্রকাশ করিনি। তিনিও আমাদের উপস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। আদর-আপ্যায়নের অনুভূতিও কারো ছিল না।

ওখান থেকে আমরা আলমোড়া রওনা হই। আলমোড়াতে স্বামীজী মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ারের অতিথি হন। আমরা নিজেদের জন্য একটি বাংলো ভাড়া করে এক মাস থাকলাম। স্বামীজী সব সময়ই আলমোড়াকে তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের হিমালয়-আবাস বলে মনে করতেন, আর আশা করতেন ওখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হবে। মিঃ সেভিয়ার মঠ-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব খুব গভীর ভাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিদিন চায়ের মজলিসে লোকজনের এত ভিড় হতে লাগল যে তিনি উত্ত্যক্ত হয়ে হিমালয়ের অভ্যন্তরে আরও চল্লিশ মাইল চলে যাওয়া ঠিক করলেন। এইভাবে হল মায়ামতী আশ্রম—রেলষ্টেশন থেকে ৮০ মাইল দূরে; সেখানে যাওয়ার ভাল রাস্তাও ছিল না।

আমরা যখন সেখানে ছিলাম খবর এল মিঃ গুড্‌উইন্ ওটকামণ্ডে মারা গেছেন। স্বামীজী যখন খবরটি শুনলেন, তিনি অনেকক্ষণ তুষারাবৃত হিমালয়ের দিকে নির্বাক নিস্পন্দভাবে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বল্লেন: "লোকের কাছে আমার শেষ কথাটি বলা হয়ে গেল।" তারপর তিনি সাধারণ্যে বিশেষ বক্তৃতা দেননি।

২০ জুন আমরা আলমোড়া থেকে কাশ্মীর রওনা হই। রাওয়লপিণ্ডি পর্যন্ত ট্রেনে গেলাম। সেখানে পাশাপাশি তিন ঘোড়াওয়ালা টোঙ্গা পেলাম; ঐগুলো আমাদের টেনে নিয়ে যাবে দু'শ মাইল ওপরে কাশ্মীর পর্যন্ত। প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলান হলো; আমরা ঐ চমৎকার রাস্তা দিয়ে সবেগে ওপরের দিকে

উঠতে লাগলাম। রাস্তাটি ছিল রোমানদের তৈরি যে কোন রাস্তার মত চমৎকার। তারপর পৌঁছলাম বারামুলাতে। সেখানে পেলাম চারখানা ঘরনৌকা (house boat)। নৌকোগুলির নাম ডুঙ্গা, প্রায় ৭০ ফুট লম্বা এবং দুটি বিছানার পক্ষে এবং মধ্যে একটি টানা বারাণ্ডার পক্ষে যথেষ্ট চওড়া। ওপরে মাদুরের ছাউনি। জানালার দরকার হলে মাদুর গুটোলেই হত। সমস্ত ছাদটি দিনের বেলা তুলে ফেলা যেত; সুতরাং আমরা খোলা যায়গায়ই থাকতাম যদিও সব সময় মনে হত মাথার উপর একটি ছাদ আছে। আমাদের চারটি ডুঙ্গা ছিল; একটি মিসেস্ ওলিবুল ও আমার জন্য, একটি মিসেস্ প্যাটারসন ও ভগিনী নিবেদিতার জন্য এবং একটি স্বামীজী ও আর একজন সন্ন্যাসীর জন্য। খাবারঘরওয়ালা নৌকোও ছিল। সেখানে খাওয়া দাওয়া করবার জন্য জড় হতাম। আমরা কাশ্মীরে চার মাস ছিলাম। প্রথম তিন মাস কাটালাম ঐ সাদাসিধে ছোট নৌকোর মধ্যে। সেপ্টেম্বরের পর এত ঠাণ্ডা পড়ল যে আমরা একটা সাধারণ ঘরনৌকো ভাড়া করলাম। তাতে ঠাণ্ডার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আগুনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে সত্যিকার ঘরের আরাম উপভোগ করলাম। আমরা ওখানে যে সব বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম সেই সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা যথেষ্ট লিখেছেন। স্বামীজী ভোর প্রায় ৫।।০ টায় উঠে পড়তেন। তিনি ধূমপান করছেন এবং মাঝিদের সঙ্গে কথা বলছেন দেখে আমরাও উঠে পড়তাম' তারপর লম্বা দুঘণ্টা ধরে বেড়ানর পালা। সূর্যের আলো গরম হওয়া পর্যন্ত চলত ভ্রমণপর্ব। বেড়িয়ে বেড়িয়ে স্বামীজী ভারতবর্ষের কথা বলতেন—মানবজীবন-নিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষের আদর্শ কি, ইসলাম কি করেছে, কি করেনি—ইত্যাদি আলোচনা চলত। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কথা বলতেন—ওসব আলোচনায় যেন ডুবে যেতেন। আমরা শুনতাম আর forget-me-not ফুলভরা মাঠের মাঝ দিয়ে যেতাম। আমাদের মাথার উপর পাহাড়ী পথে ফুলগুলির শোভা হলদে ও নীল রঙ্গে যেন ফেটে বেরিয়েছে।

বারামুলা অনেকটা ভেনিসের মত। অধিকাংশ রাস্তাই খাল। আমাদের নিজেদের ছোট নৌকো ছিল। তাতেই আমরা শহর থেকে বেরতাম, আবার শহরে ফিরে যেতাম। দোকানীরা ছোট ছোট নৌকো করে আমাদের নৌকোর আশেপাশে আসত। আমরা নৌকোর রেলিং-এ ভর করে দরকারী জিনিষ কিনতাম। আমাদের প্রত্যেক নৌকোর মাসিক ভাড়া মাঝির মাইনে শুদ্ধ ছিল ৩০৲। মাঝিরা নিজেদের খরচায় খাওয়াদাওয়া করত। তারা বাপ, মা, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকত। তাদের থাকবার মত একটু যায়গা থাকত নৌকোর এক কোণে। অনেকবার আমরা তাদের খাবার স্বাদ গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম, তাদের রান্নার ঘ্রাণ ছিল এত লোভনীয়! নৌকোটিকে স্রোতের বিপরীত দিকে টেনে নেওয়া হয়। টানবার সময় মাঝি নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে এগোয়; দাঁড় টেনেও নৌকো চালান হয়। যেভাবেই নৌকো চালাক না কেন তার জন্য অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয় না। বিতস্তা নদীর up-এ কয়েকটি হ্রদে যাবার ইচ্ছা হলে আগের দিন রাত্রে আমাদের চাকরদের বলতাম। তারা হাঁস মুরগী তরিতরকারী ডিম মাখন ফল দুধ ইত্যাদি যোগাড় করত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতাম নৌকোটি চলছে; এত নিঃশব্দ যে তার গতি সম্বন্ধে

আমরা সব সময় সজাগ থাকতাম না। আমাদের চাকর যেটি খাবার যোগাড় করতে আগে বেরিয়ে পড়েছিল, সে তখন সুস্বাদু খাবার নিয়ে হাজির। খাবার সে একটি ট্রে-তে করে আনল; ট্রে-টি তিনটি প্যান্-ধরবার পক্ষে যথেষ্ট লম্বা, আবার বেশী চওড়াও নয়। প্যান্-গুলোতে থাকত সুপ্, মাংস, আর ভাত। ঐসব লোকের নিপুণতা ছিল বিস্ময়ের বস্তু; এ সপ্রশংস ভাব আমরা কোন দিন কাটিয়ে উঠতে পারিনি। গোঁড়া হিন্দুরা মুরগীকে পবিত্র খাদ্য মনে করে না; সেই জন্য যে সব মুরগী আমরা কিনেছিলাম তা যে আমরা খেতে চাই তা লোকদের বলিনি। আমরা যখন নদীর up-এ যাচ্ছিলাম নৌকোর নীচের দিকটায় শব্দ করছিল ৬।৭ টি মুরগী। যে সব পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁরা কোথেকে সেই শব্দ আস্‌ছে জানবার জন্য চারদিকে তাকাতেন। স্বামীজী জান্‌তেন ঐগুলি নীচে লুকনো আছে; সেইজন্য তাঁর চোখের মিট্ মিট্ দৃষ্টিতে একটু আশঙ্কার ভাব ফুটে উঠ্‌ল; তবুও তিনি কিছু প্রকাশ করে আমাদের অপ্রস্তুত করেননি। পণ্ডিতরা বল্লেন: "স্বামীজী, এই মেয়েদের দিয়ে আপনি কি করবেন? এঁরা ত ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য।" কখনও বা কয়েক জন পাশ্চাত্যবাসী এসে আমাদের বলতেন: "আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না স্বামীজী আপনাদের সম্মান দিচ্ছেন না? মাথায় পাগড়ি না পরেই তিনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলেন।" এই ভাবে পরস্পরের সভ্যতার অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করে হাস্যকৌতুকে আমাদের দিন কাটত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

সংসার ভোগ কর্মের ভূমি, অপর কিছুই নয়,
দুঃখের মূল ভোগের-তৃষ্ণা, উহারে করহে জয়।
করো তাড়াতাড়ি করো!
জেনো এ সংসার দু'দিনের তরে—স্থায়ী গৃহ নয় কারো।
সবারই আছে শাশ্বত গেহ—সেখানে ঈশ্বর রাজে,
ভুলো নাকো সেই পরমানন্দে শত সংসার-কাজে।

তাঁরে অনুখন স্মরো,
তাঁরে মনে রেখো—তাঁরি সব জেনে নিষ্কাম কাজ করো।
ধনীর গৃহের দাসীর মতন থেকো সংসার-মাঝে;
কেউ নয় এরা, কাছে আছে যারা, মনে রেখো সব কাজে।

মনে রেখো চির আপনার জন এক সেই ভগবান,
সকল কর্মে অনুখন যেন তাঁরি প্রতি রয় টান।
যেন স্বৈরিণী মেয়ে,
সব করে তবু প্রেমিকের প্রতি রয় তার মন চেয়ে।
তেমনি সকল মন যেন রয় তাঁর প্রতি নিশিদিন,
তাঁরি সুগন্ধ পরমানন্দ চরণপদ্মে লীন।

হোয়ো না বদ্ধ কাজে,
গুটিপোকা সম বদ্ধ থেকো না আপন গুটিকা-মাঝে।
বদ্ধ জীবেরা সংসার-মাঝে গুটিপোকারই তুল্য,
আপন আপন কর্মে বদ্ধ, জানে না মুক্তির মূল্য।
বিবেক-বৈরাগ্য-পাখা তাদের যখন বাহির হয়,
প্রজাপতি সম মুক্ত যে তারা বিচরে আকাশময়।

তাই বলি ত্যাগ করো—
এই ক্ষণিকের ভোগ-সুখ আশা মনে প্রাণে যত পারো।
মনে রেখো এই সংসার তব কখনো সুখের নয়,
দুখ-ভরা এ সংসার জেনে, বাসনারে করো জয়।
যত দিন আছে বাসনার বীজ তত দিনই সংসারে,
জেনো এ জন্ম-মৃত্যুর পথে আসা-যাওয়া বারে বারে।
করো করো ত্যাগ ভোগ,
ত্যাগ বিনা কভু তাঁর সাথে জেনো হবে না—হবে না যোগ
অনেকেই বলে আমি সংসারী জনকরাজার মত,
মনে ভেবো নাকো জনক হওয়াটা একেবারে সোজা অত!

তার ছিলো নাকো ভয়,
আগে জ্ঞান লভি' করেছিলো সে যে সকল বাসনা জয়।
সেইরূপ আগে সব ত্যাগ করি' কিছু দিন অন্তত—
নির্জনে থাকি নিশিদিন তাঁর চিন্তায় হও রত।
তারপর মন তাঁর 'পরে রাখি যাও সব কাজ করে,
তা'হলে কর্ম করেও বদ্ধ হবে নাকো সংসারে।
দুধ হ'তে যদি ননী তুলে নাও তারপর তার শেষে—
জলেতে দিলেও মিশিবে না কভু থাকিবে উপরে ভেসে।
সেইরূপ আগে মনরূপ দুধ মন্থন করা চাই,
তার পরে খুসি যেখানেই থাকো ভয় নাই—ভয় নাই।

ভক্ত অধর সেন

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

(২)

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সীতাকুণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নির্জ্জনতা ও শান্তগম্ভীর পরিবেশ অধরের ভাবুক হৃদয়ে একটি স্নিগ্ধগভীর আধ্যাত্মিক রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল। কবির কবিত্ব এইখানে স্তব্ধ হইল, তাঁহার কল্পনা এখন সুদূর অতীতের সন্ধানে ছুটিল। তাঁহার মনে হইল ইহা দেবতাদের যোগ্য আবাসভূমি। সীতাকুণ্ডের পুরাবৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া তিনি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ তন্ত্র ও অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ একাগ্রমনে পাঠ করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিয়া সীতাকুণ্ড সম্বন্ধে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ তিনি রচনা করিলেন। সরকারী কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি এই বিষয়ে কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। একটু সুযোগও ঘটিল। সীতাকুণ্ড তীর্থদর্শনের কয়েক মাস পরে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অধর যশোহরে বদলি হইলেন। যশোহর কলিকাতার সন্নিকটে, সুতরাং পুস্তকাদি সংগ্রহেরও সুবিধা হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। টনি সাহেব বঙ্গের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সহ সভাপতি ছিলেন। অধর উক্ত সোসাইটির সদস্য হইলেন। ১৮৮১ সনের ২রা মার্চ্চ তারিখে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে অধরলাল ইংরেজিতে—'The Shrines of Sitakund' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সোসাইটির সুধী সদস্যবৃন্দের অনেকেই তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিচার, নানা তথ্যের গবেষণা এবং অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কয়েক জন সদস্য ঐ অধিবেশনে প্রবন্ধটির বিষয়-সম্বন্ধে বিতর্ক ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি পরে কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহপাঠী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঐ বইখানির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন: "মাঝে মাঝে সে (অধরলাল) ইংরেজি ও বাংলাতে বই লিখিত ও আমাকে পাঠাইয়া দিত। একখানি বইয়ের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। সেখানি ইংরেজিতে লেখা। বইখানির নাম 'The Shrines of Sitakund'। অধরের স্মৃতিস্বরূপ বইখানি এখনও আমার লাইব্রেরীতে আছে।" প্রায় পচিশ বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় 'সুবর্ণবণিক সমাচারে' অধরলাল সম্বন্ধে ইহা লিখিয়াছিলেন। ১৮৮২ সনের ২৬শে এপ্রিল অধর কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিলেন। তিনি তাঁহাদের বেনেটোলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। অধর যখন যশোহরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন ১৮৮০ সনের ১৬ই নভেম্বর তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি ধনী ও ব্যবসায়ী হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মত 'বারমাসে তের পার্ব্বণ' অনুষ্ঠিত হইত।

বেনেটোলায় তাঁহার নবনির্ম্মিত বাসভবনে একটি ঠাকুরদালান ছিল। উহাতে প্রতিবৎসর যথারীতি সমারোহে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, অধরলাল ইহাতে যোগদান করিতেন।

অধরের রচনা হইতে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে প্রতিমাপূজায় তরুণ বয়সেই তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল আন্দোলনের ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানে, সামাজিক আচারব্যবহারে এবং পূজাপদ্ধতিতে ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে প্রদর্শিত যুক্তি শিক্ষিত যুবকদের হৃদয় স্পর্শ করিত। যাঁহারা শিক্ষিত চরিত্রবান পবিত্র সংযত এবং ধর্ম্মপ্রাণ, তাঁহারা কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতেন। আবার অনেকেই হিন্দু পরিবারে থাকিয়া গতানুগতিক ভাবে হিন্দু পালপার্ব্বণে যোগদান করিলেও মনে প্রাণে হিন্দু দেবদেবী ও শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধাহীন ছিলেন। স্বীয় কাব্যগ্রন্থে স্বাধীন ভাব প্রকাশ করিলেও অধর পারিবারিক জীবনে সাধারণ নিষ্ঠাবান হিন্দুর মতই জীবন যাপন করিতেন। বিশেষ, সীতাকুণ্ডে কিছু দিন বাস করিয়া পরে হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠ করায় তাঁহার অন্তরে প্রকৃত সত্যানুসন্ধান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই সময়ে যুবক অধরের নাম বিদ্যা যশ ও প্রতিভার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, সুপণ্ডিত প্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সতীর্থ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কৃষ্ণদাস পাল এবং অন্যান্য প্রতিভাবান সাহিত্যরথী ও মনীষীর সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ হইলেও অধরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেন। কলিকাতায় বদলি হইয়া একদিকে তিনি যেমন বিদ্বান মনীষী ও প্রতিভাবান পুরুষদের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইলেন, অপরদিকে সাধনভজনশীল সাধক বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে আসিয়া 'চৈতন্য-চরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থেরও অনুশীলন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানলাভে তৃপ্ত হয়, হৃদয় ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে কি প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়? যুক্তিবাদী অধরের প্রশ্ন —এ কি কল্পনা, কবির স্বপ্ন বা ভক্তের অতিরঞ্জন? বাস্তবিকই—"কে জেনেছে কবে, কোথা আছে জগদীশ কি রূপ তাহার?" এই সময়ে অধর এক জন যুবকের সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে এই ভদ্রলোক পবিত্রচরিত্র ধার্ম্মিক ও সাধনভজনশীল। অধর তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি বন্ধুর ভজন-কীর্ত্তন একান্তমনে শ্রবণ করিয়া তন্ময় হইতেন এবং বন্ধুটির ভাব বা দশা উপস্থিত হইলে তাহা নিরীক্ষণ করিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে সংশয় উদিত হইল। এই প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস শুধু ভাববিলাসিতা না মনের বিকার? দেখিলে মনে হয় ইহাতে যেন কত কষ্ট, কত দুঃখ-যন্ত্রণা হইতেছে! ইহা কি ভগবৎপ্রেমের বিকাশ, না কষ্টকর ভাবের অভিব্যক্তি? অধরের মন নানা সংশয়ে বিচলিত হইল। সত্য বস্তু কি কেহ দেখিয়াছে—কে তাঁহার এই সংশয় মোচন করিবে?

এই সময়ে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকেই দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মুহুর্ম্মুহু সমাধি ভাব মহাভাব প্রভৃতির কাহিনী এবং তাঁহার অমৃতময় উপদেশ 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল। অধরচন্দ্রও সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ করিতেন এবং তৎকালে এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের নেতা ছিলেন আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

তিনি বিজয়কৃষ্ণ শিবনাথ প্রভৃতির ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতে সর্ব্বদা যাইতেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিগণও দলে দলে তথায় যাইতে লাগিলেন। অধর কলিকাতায় বদলি হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে ব্যাকুল হইলেন। তিনি একাকী বা সঙ্গী সহ শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় ১৮৮৩ সনের মার্চ মাসে কোনও এক দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার সকল সংশয় দূরীভূত এবং তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া অধর তাঁহার পাদপদ্মে সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও সস্নেহে অধরের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে 'আপনার জন' বলিয়া চিনিতে পারিলেন। শ্রীযুক্ত কথামৃতকার ১৮৮৩ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে অধরের শ্রীরামকৃষ্ণকে দ্বিতীয়বার দর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ, ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন, ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট। শ্রীযুত অধর সেন কয়টি বন্ধুর সঙ্গে আসিয়াছেন। অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ঠাকুরকে এই দ্বিতীয় দর্শন করিতেছেন। অধরের বয়স ২৯।৩০; অধরের বন্ধু সারদাচরণ পুত্রশোকে সন্তপ্ত। তিনি স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, পেন্সন লইয়া আগেও তিনি সাধন-ভজন করিতেন। বড় ছেলেটি মারা যাওয়াতে কোনরূপে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাই অধর ঠাকুরের নাম শুনাইয়া তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। অধরের নিজের ঠাকুরকে আবার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।" অধর প্রথম বার দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চিত্তপটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন এই মহাপুরুষের পূতসঙ্গে মানুষের সকল সংশয়-তিমির তিরোহিত হয়, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়—অশান্তচিত্ত শান্তি লাভ করে। তাই পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ সাধক বন্ধুকে অধর শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে আনিয়া উপনীত করিলেন। ঠাকুর অধরের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বৃদ্ধের নিদারুণ পুত্রশোকের কথা ঠাকুরকে জানাইলেন। ঠাকুর তখন আপন মনে গাহিলেন—

"জীব সাজ সমরে।
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।"

নানাভাবে ঠাকুর জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলিলেন "তাঁকে আম্মোক্তারি দাও। ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করুন।" পরে ঠাকুর তাঁহার ঘরের উত্তরের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া অধরকে একান্তে বলিলেন, "তুমি ডেপুটী। এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্য, সংসার কর্ম্মভূমি। এখানে কর্ম্ম করতে আসা।" সেই কর্ম্ম কি? শ্রীরামকৃষ্ণ অধরকে বলিলেন, "কিছু কর্ম্ম করা দরকার—সাধন। তাড়াতাড়ি কর্ম্মগুলি শেষ করে নিতে হয়।" অধরের মনে হইল—সাধন কি, কি ভাবে সাধন করিতে হইবে? সংসারী গৃহস্থের পক্ষে কি তাহা সম্ভব? ঠাকুর বলিলেন, "খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাঁর নামবীজের খুব শক্তি; অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকলে মন বড় টেনে লয়।

সাবধানে থাকতে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সর্ব্বদা মন রাখতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী—যারা সর্ব্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে তারা মৌমাছির মত—কেবল ফুলে বসে, মধুপান করে। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে; আবার কখনও কখনও কামিনী-কাঞ্চনে মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে আর পচা ঘায়েও বসে।" পরে অভয়দান করিয়া ঠাকুর অধরকে বলিলেন, "ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তারপর পেন্সান ভোগ করবে।"

অধর প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে যাইতেন। একদিন ঠাকুর অধরের জিহ্বায় কি যেন লিখিয়াদিলেন—অধর দিব্যানন্দে বিভোর হইলেন! তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীকে দর্শন করিতেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহার অমৃতময়ী বাণী একাগ্রচিত্তে শুনিতেন। কোন পর্ব্বোপলক্ষে ছুটি থাকিলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বৃদ্ধ সারদাচরণ অধরের এক জন ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। এক দিন অধর শ্রীরামকৃষ্ণের মুহুর্মুহু সমাধি ও ভাব-মহাভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলেন "তোমাদের ভাব দেখে ভাবের উপর আমার একটা ঘৃণা হয়েছিল। তোমাদের ভাব দেখে মনে হত যেন ভিতরে কত যন্ত্রণা হচ্ছে। ভগবানের নামে কি যন্ত্রণা থাকে? ঠাকুরের আনন্দঘন মধুর হাসি ও তাঁর মাধুর্য্যময় ভাব দেখে আমার চোখ ফুটল। যদি তাঁর কাছে গিয়ে তোমাদের মত ভাব দেখতাম—তবে আর দক্ষিণেশ্বরে আসতাম না।" পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলিতেন, "ঠাকুরকে দর্শন না করলে—তাঁর কাছে আসা যাওয়া না করলে অধর বাবুর মনের সংশয় কখনও ঘুচতো না।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বেনেটোলার বাসভবনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রামলাল এবং মাষ্টার মহাশয়। অন্যান্য ভক্তও উপস্থিত ছিলেন। রাখাল (ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) উপস্থিত ছিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে অধরের বাড়ীতে উপস্থিত না দেখিয়া অধরকে প্রশ্ন করিলেন—"কৈ, রাখালকে খবর দাওনি?" অধর উত্তরে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, তাঁকে সংবাদ দিয়েছি।" অধর ঠাকুরকে রাখালের জন্য ব্যস্ত দেখিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য এক জন লোক সহ গাড়ী পাঠাইলেন। কথামৃতকার লিখিয়াছেন, "অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া-ছিলেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পূর্ব্বে কিছু ঠিক ছিল না—ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন।" অধর বলিলেন, "আপনি অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম—এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "বল কি গো।"

ঠাকুরের অধরের বাড়ীতে আসিবার কথা পূর্ব্বে কিছু ঠিক ছিল না। অথচ ঠাকুর রাখালকে না দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন রাখালকে খবর দাও নাই? পূর্ব্বে ঠিক না থাকিলে ঠাকুর অধরকে এই প্রশ্ন করিবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল অধরের দ্বিতীয় দর্শন বলিয়া উল্লেখ আছে, অথচ এখানে অধর ঠাকুরকে বলিতেছেন—"আপনি অনেক দিন আসেন নাই।" ইহাতে স্পষ্ট বোধ

হইতেছে ঠাকুর ইহার পূর্ব্বে অধরের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয় ঠাকুরকে অধর কবে দর্শন করিয়াছেন এবং কতবার অধরের বাড়ী তিনি গমন করিয়াছেন ইহার সঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারেন না। অধরের সঙ্গে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। অধর সাহিত্যে প্রেমের কবি ছিলেন—'হিন্দু পেট্রিয়ট এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রভৃতি তাঁহার কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় বলিয়াছিলেন—প্রেমই তাঁহার কবিতার প্রধান সুর। তিনি কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিতেন এবং ভক্তিধর্ম্মের আলোচনা করিতেন। কখনও কখনও চন্দ্রনাথতীর্থ ও সীতাকুণ্ডের গল্প করিতেন। সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার মত লক লক করে; এই দৃশ্যের কথা এক দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেও বলিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এ কেমন করে হয়?" অধর অমনি বলিলেন, "জলে ফস্‌ফরাস্ আছে।"

এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে অধরকে বলিলেন, "আপনাদের যোগ ও ভোগ দুইই আছে।" বাস্তবিকই অধরের ভোগমুখী বৃত্তি ছিল। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদ খালি হইলে অধর উক্ত পদের জন্য দরখাস্ত করেন। অধর মাত্র ৪।৫ বৎসর যাবৎ ডেপুটীর পদ পাইয়াছেন—তখন তিনি তিন শত টাকার গ্রেডে ছিলেন। কিন্তু যে পদের চেষ্টা করিতেছেন তাহার মাসিক বেতন হাজার টাকা। তিনি এই পদ প্রাপ্তির জন্য কমিশনারদের ও বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যদু মল্লিক তখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিপত্তিশালী কমিশনার। অধরের কর্ম্মের জন্য ঠাকুর তাঁহাকেও বলিয়াছিলেন। এক দিন মাষ্টার ও নিরঞ্জনের সম্মুখে অধরকে এই কাজের চেষ্টা করিবার জন্য বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করেন। ঠাকুর নিরঞ্জন ও মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "হাজরা বলেছিল—অধরের কর্ম্ম হবে, তুমি একটু মাকে বল। অধরও বলেছিল। মাকে একটু বলেছিলাম—মা, এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে যদি হয় তো হোক না। কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম, মা, কী হীনবুদ্ধি! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে।" পরে অধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শুনলে! সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্য্যে।" অধর উত্তরে বলিলেন, "সংসার করতে গেলে এসব না করলে চলে না। আপনি ত বারণ করেন নি।" ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন "নিবৃত্তিই ভাল—প্রবৃত্তি ভাল নয়।" ঠাকুর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে নিবৃত্তি কি বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু অধর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম্ম করবে না?" পিতৃবিয়োগে নরেন্দ্র অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন—অর্থাভাবে তাঁহার মাতৃদেবী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের গ্রাসাচ্ছাদন কোন কোন দিন কঠিন হয়। ঠাকুর অধরের প্রশ্নে বলিলেন "হুঁ, নরেন্দ্র করবে। মা ও ভাইরা আছে।" অধর বলিলেন, "আচ্ছা, নরেন্দ্রের পঞ্চাশ টাকায়ও চলে, একশ টাকায়ও চলে। নরেন্দ্র একশ টাকার জন্য চেষ্টা করবে কি না?" ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "বিষয়ীরা ধনের আদর করে—মনে করে এমন জিনিব আর হবে না। শম্ভু বল্লে—এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে যাব, এইটি ইচ্ছা। তিনি কি বিষয় চান? তিনি চান জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য।"

ঠাকুর নিজের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে মথুরবাবু একখানা তালুক শ্রীরামকৃষ্ণের নামে লিখিয়া দিবেন এইরূপ বলিতেছিলেন। ঠাকুর

বলিলেন, "আমি কালীঘর থেকে শুনলাম। সেজবাবু আর হৃদে এক সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিল। আমি এসে সেজবাবুকে বল্লাম—গ্যাখো, অমন বুদ্ধি করো না। ওতে আমার ভারী হানি হবে।" অধর বলিলেন, "যা বলেছেন, সৃষ্টির পর থেকে ছটি সাতটি হন্দ ওরূপ হয়েছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ তদুত্তরে অধরকে বলিলেন, "কেন, ত্যাগী আছে বৈ কি। ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করলেই লোকে জানতে পারে। এমনি আছে, লোকে জানে না।" অবশেষে ঠাকুর যথার্থ ত্যাগী ভক্তের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া অধরকে বুঝাইলেন—"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘে জল বই আর কিছু পান করবে না। সাত সমুদ্র নদী ভরপুর। সে অন্য জল খাবে না। কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না, কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে না, পাছে আসক্তি হয়।" কিন্তু ঠাকুরের এই প্রাণস্পর্শী ত্যাগের মহিমার কথা শুনিয়াও অধরের সংশয় গেল না। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন।" অধরের এই কথায় ঠাকুর চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভোগ করেছিলেন?" অধর বলিলেন, "অত পণ্ডিত! অত মান!" ঠাকুর বলিলেন, "অন্যের পক্ষে মান—তাঁর পক্ষে কিছু নয়। তুমিই আমায় মান, আর নিরঞ্জনই মানে, আমার পক্ষে এক—সত্য করে বলছি।" পরে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমি যে রাখাল, নরেন্দ্র এদের ভালবাসি, সে কি কোন নিজের লাভের জন্য?" মাষ্টার মহাশয় তখন বলিলেন—"মার ভালবাসার মত।" ঠাকুর তাহাতে বলিলেন "মা তবু চাকরি করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাসি, সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি; কথায় নয়।" পরে তিনি অধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোনো, আলো জ্বাললে বাদুলে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন—কোন অভাব রাখেন না। তিনি এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে।" এই ভাবে ঠাকুর নানা উপদেশ দিয়া অধরকে বলিলেন "ঠিক ঠিক সাধু, ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না। তাঁকে পেতে হলে যা দরকার সব যোগাড় করে দেন।" সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুরের দিব্যভাবের—ত্যাগী ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অহেতুকী কৃপার কথা স্থির চিত্তে শুনিতে লাগিলেন। পরে অধরের প্রতি চাহিয়া ঠাকুর বলিলেন "আপনি হাকিম, কি বলবো! যা ভাল বোঝ তাই কোরো। আমি মূর্খ।" এইবার অধর হাসিয়া উপস্থিত ভক্তদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "উনি আমাকে একজামিন্ কচ্ছেন।" ঠাকুর বুঝিলেন ঔষধ ধরিয়াছে, তাই আবার সহাস্য বদনে অধরকে বলিলেন, "নিবৃত্তিই ভাল। গ্যাখো না আমি সই কল্লাম না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।" শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-তহবিল হইতে মাসিক সাত টাকা মাসহারা পাইতেন। খাজাঞ্চী ঠাকুরের উক্ত টাকা প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য তাঁহাদের খাতায় তাঁহাকে সহি করিতে বলেন। ঠাকুর সহি করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি খাজাঞ্চীকে বলিলেন "তা আমি পারবো না। আমি ত চাচ্ছি না। তোম্যাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও। এক ঈশ্বরের দাস—আবার কার দাস হব?" অধরকে ঠাকুর মিউনিসিপ্যালিটির কাজের চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যার কর্ম্ম কচ্ছ তারই করো। লোকে পঞ্চাশ টাকা একশ টাকার মাইনের জন্য লালায়িত—

তুমি তিন শ টাকা পাচ্ছ। ও দেশে (কামার-পুকুরে) ডিপুটি আমি দেখেছিলাম। ঈশ্বর ঘোষাল। মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে! ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডিপুটি কি কম গা? যার কর্ম কচ্ছ, তারই করো। এক জনের চাকরি কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের!”

ঠাকুর অধরকে ভর্ৎসনা করিলেন বটে কিন্তু পরে শ্রীযুত যদু মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৈ, অধরের কর্ম্ম হল না?” যদু বাবু তখন দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাটীতে বন্ধুগণ-পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারা সমস্বরে ঠাকুরকে বলিলেন, “অধর যুবক, তার কর্ম্মের বয়স যায় নি।” ঠাকুর আর কিছু বলিলেন না।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্য অধরের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বিদ্যালয়ের সভা-সমিতিতে প্রায়ই যোগদান করিতেন। সরকারী কার্য্যে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভা-সমিতিতে ব্যস্ত থাকায় তিনি কয়েক দিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর তাঁহার জন্য চিন্তিত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অধর আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিগো, এতদিন আস নাই কেন?” অধর উত্তরে বলিলেন, “আজ্ঞা, অনেকগুলো কাজে পড়ে গিছলাম। স্কুলের দরুন মিটিংএ যেতে হয়েছিল।” ঠাকুর বলিলেন, “মিটিং ইস্কুল এই সব নিয়ে একেবারে ভুলেছিলে?” অধর বিনীত ভাবে বলিলেন, “আজ্ঞা, সব চাপা পড়ে গিয়েছিল।” পরে তিনি অধরকে বলিলেন, “ত্যাখো, এ সব অনিত্য—মিটিং ইস্কুল আফিস এ সব অনিত্য। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত।” অধর নীরবে নিরুত্তরে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার মেঘমন্দ্রস্বরে বলিলেন, “এ সব অনিত্য। শরীর এই আছে এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।” ঠাকুর দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছেন অধরের মৃত্যু সন্নিকট। ঠাকুর তাই তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। হায়! ইহার কয়েক মাস পরেই অধর দেহত্যাগ করেন।

এই সময় অধর ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের মনোনয়নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts এর তিনি এক জন সদস্য মনোনীত হইলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

“ঋষিকৃষ্ণ (যীশুখ্রীষ্ট) একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলেন। একটি ভক্ত এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘প্রভো, কি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?’ তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে জলের ভেতর নিয়ে ডুবিয়ে রাখলেন। খানিকক্ষণ পরে হাত ধরে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার কিরূপ অবস্থা হচ্ছিল?’ ভক্তটি উত্তরে বললে, ‘প্রাণ যায় যায়—আটু পাটু কচ্ছিল।’ প্রভু যীশু তখন তাকে বললেন, ‘যখন তোমার ভগবানের জন্ত প্রাণ এমনি আটু পাটু করবে তখন তাঁর দর্শন লাভ হবে।’ ...... ছেলে যেমন পয়সার জন্য মার কাছে আব্দার করে, কখনও কাঁদে, কখনও মারে; সেইরূপ আনন্দময়ী মাকে আপনার হতে আপনার জেনে তাঁকে দেখবার জন্ত যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করেন, তাঁকে সচ্চিদানন্দময়ী মা দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।”

—শ্রীরামকৃষ্ণ

য়্যুকেলিপ্টাস

প্রণব ঘোষ

ঋতুরাজ এসেছে আবার,
তুহিন-পরশ-স্নিগ্ধ কুহেলীর আবরণ খানি
সরায়ে দিয়েছে আজ
দূর দিগন্তরে।
নব-সৃষ্টি-স্বপ্ন-ভরা
শ্যামলা পৃথিবী,
চূত-মুকুল-ভারনম্র বনস্পতি
আপন-সৌরভ-মগ্ন নিথর বনানী-বুকে।
পলাশের রঙে রঙে
বনান্তরে অগ্নিনৃত্য চলে....
এসেছে ফাল্গুন।

এসেছে ফাল্গুন,
সাথে লয়ে মর্ত্যের মাটির পেয়ালা
রূপে রসে গন্ধে পূর্ণ করি'।
উন্মুক্ত আলোর জোয়ারে
লীলায়িত ছন্দে নেচে ওঠে কিশলয়!
দূর হ'তে দেখো তুমি শুধু
আর মাঝে মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস....
য়্যুকেলিপ্টাস!

তোমার শাখার 'পরে
দু'দিনের তরে আজি
বাঁধিয়াছে বাসা
বসন্তের দূত।
অবিশ্রান্ত সঙ্গীতের লহরী-লীলায়
গোপন প্রাণের মর্মের শিহর-পুলকে
প্রভাতের রৌদ্রস্নাত ধরণীর বুকে
উলসি' তুলিতে চাহে
যৌবনের বাধাবন্ধহারা
প্রাণের উচ্ছ্বাস!

শান্ত শুভ্র দীর্ঘ দেহ তব
　　করিয়া বেষ্টন
　　সৃজন করিতে চাহে নব স্বপ্ন-লোক!
তোমার চিকণ পত্রে
　　তুলিছে মর্মর
　　দক্ষিণের মৃদু সমীরণ—
ঝরিয়া পড়িছে মধু-অরুণ-আলোক
　　অজস্র ধারায়....
তুমি শুধু ধ্যানমগ্ন মৌন সমাহিত
　　আপন-মাঝারে তুমি
　　আপনা বিস্মৃত—
তুমি আছ আর আছে অসীম আকাশ
　　য়্যুকেলিপ্টাস!
তুমি তো চাহনি হ'তে
　　বিরাট অসীম—
অনন্তের পানে শুধু বাড়ায়েছ বাহু
　　চাহিয়াছ স্পর্শ করিবারে....
লভিতে চেয়েছ তার প্রাণের পরশ....
　　বৈশাখের মত্ত বায়ু
　　তোমারে দিয়েছে দোলা....
　　তুলেছে মর্মর
　　শ্রাবণের বারি ঝর ঝর....
　　শরতের স্বর্ণমেঘস্তূপ
　　পরায়েছে তব শিরোপরে
　　মণিদীপ্ত জয়ের মুকুট।
　　তোমার শাখার পরে দোলা দিয়ে যায়
　　হেমন্তের শিহরণ বায়....
ধ্যানমৌন হে তাপসরাজ!
তোমারে ঘিরিয়া শুধু
　　ঋতু-আবর্তন-নৃত্য
　　চলে নিত্যকাল....
অনন্তের তপোমগ্ন
　　হে চির উদাস!
　　য়্যুকেলিপ্টাস!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-পূজা ও উৎসব—গত ৬ই ফাল্গুন, শনিবার বেলুড় মঠে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১১৫তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সারাদিন পূজা হোম শাস্ত্রপাঠ ভজন-সঙ্গীত ও আরাত্রিকাদি হয়। এই দিন রাত্রিতে ১৪ জন সন্ন্যাস ও ১১ জন ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন।

এই দিন অপরাহ্ণে এক মহতী জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জীবনকথা ও বাণীর আলোচনা হয়। বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের মহতী শিক্ষা ও কল্যাণময় আদর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। হলিউড (আমেরিকা) বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ বলেন, "দেশ এখন একটা নিদারুণ সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। এই সময় তাঁহার জীবন-বেদের আলোচনার প্রয়োজন সমধিক। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের মধ্যে পরম ঐক্য সাধন করিয়াছিলেন। আজিকার দিনে তাঁহার অপূর্ব সমন্বয়ের বাণী জীবনে অনুধাবন করার সময় আসিয়াছে।"

সিয়াটেল (আমেরিকা) বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী বলেন, "বিজ্ঞান আমাদের প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান পৃথিবীকে হয়ত আরও অনেক কিছু দান করিবে এবং পৃথিবী তাহাতে উন্নত ও সমৃদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে ভাবিতে হইবে কি এক ধ্বংসের দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমার জীবিতকালে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ দেখিতে পাইয়াছি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক তিক্ততা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া বিচিত্র নহে। আমি মনে করি, আধ্যাত্মিক জ্ঞানস্পৃহা হইতে মানবজাতি বিচ্যুত হইতেছে বলিয়াই এই ধ্বংসের অনল চতুর্দিকে জ্বলিয়া উঠিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র জীবন গভীর-ভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একমাত্র তাঁহার বাণী ও আদর্শই এই ঘোর অন্ধকারে আশার আলোকবর্তিকা জ্বালাইতে পারে। এই সঙ্কটসঙ্কুল পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন এবং মানব-জাতিকে পরিচালিত করার জন্য নিষ্ঠার সহিত তাঁহার জীবন ও বাণী অনুধ্যান করিতে হইবে।"

স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু এক জন সাধক এবং প্রচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অবতার। ঘোর দুর্দিনে তিনি দেশে একটা পরিবর্তন আনিতে চাহিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের প্রয়োজনে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি যেন বিশেষ বাণী লইয়া এই জগতে আসিয়াছিলেন।"

সভাপতি স্বামী প্রভবানন্দজী বলেন, "হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর চিন্তাশীলদের মনে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। পৃথিবী যে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা চাহেন পৃথিবীতে আজ পরম শান্তি বিরাজ করুক। কিন্তু এই শান্তি আসিবে কি প্রকারে? দেশ তো আজ মহা-পুরুষদের জীবনের মহান নীতি ও আদর্শ পালন করে না! পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত হইতে

রক্ষা করিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।"

স্বামী বীতশোকানন্দজী প্রারম্ভে ও শেষে দুইটি সঙ্গীত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েক জন ইউরোপীয় ও মার্কিন্ ভক্ত সমেত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র দিনই মঠে উৎসব-অনুষ্ঠান চলে। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও প্রার্থনায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

১৪ই ফাল্গুন, রবিবার বেলুড় মঠে সাধারণ আনন্দোৎসব বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হয়। এই দিন সকাল হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত দর্শনার্থী অগণিত নরনারীর ভিড় হইয়াছিল। প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক উৎসব উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন এবং সকালে বিশেষ পূজা ও ভজন-কীর্তনাদি হইয়াছিল। বেলা দশটার পর বিভিন্ন কীর্তন-দল কালীকীর্তন করেন। বক্তৃতা এবং ভজন-গানের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী কীর্তিত হয়। পরমহংসদেবের ব্যবহৃত জিনিষ ও হাতের লেখার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় আতসবাজি পোড়ান হয়। ষ্টীমার, নৌকা ও বাসযোগে বহু ভক্ত নরনারী যাতায়াত করেন। ভিড়ের চাপে প্রায় ২৫ জন আহত হইলে তাহাদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। সেণ্ট জন য়্যাম্বুলেন্স ও ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটি মঠপ্রাঙ্গণে চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করেন। জনতানিয়ন্ত্রণে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বিশেষ সাহায্য করেন। এ বৎসর প্রসাদবিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

স্বামী যতীশ্বরানন্দজী—স্বামী যতীশ্বরানন্দজী দীর্ঘকাল ইউরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে অতিশয় কৃতিত্বের সহিত বেদান্ত-প্রচারকার্য পরিচালনা করিয়া গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি বেলুড় মঠেই অবস্থান করিবেন।

কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে তদীয় জন্মস্থান পুণ্যভূমি কামারপুকুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৬ই ফাল্গুন বিশেষ পূজা হোম শাস্ত্রপাঠ ভজন-কীর্তন নরনারায়ণ সেবা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশাবলী আলোচিত হইয়াছে। তিন দিন বহু ভক্ত নরনারীর সমাগমে আশ্রম আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—গত ৬ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথি উৎসব এই প্রতিষ্ঠানে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ বিরাট শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, শাস্ত্রপাঠ, ভজন-কীর্তন ও প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল।

করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৪ঠা মাঘ মদনমোহন মাধবচরণ বালিকা বিদ্যালয়ে এক জনসভার অধিবেশন হয়। মহকুমার শাসনকর্তা শ্রীযুক্ত ধর্মানন্দ দাস পৌরোহিত্য করেন। ইহাতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দেব কর্তৃক উদ্বোধনসঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীমান্ অখিলবন্ধু দাস 'জাতীয় জীবন গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ' ও শ্রীমান্ মতীন্দ্র ভট্টাচার্য 'স্বামীজীর জীবনালোকে ভারতের স্বরূপ ও তাহার রূপায়ণ' সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ দুইটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। অতঃপর স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী সমিতির ১৯৪৯ সনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ দেব ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

অশোকবিজয় রাহা স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতির বক্তৃতান্তে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব গত ২৮শে মাঘ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় জেলা-জজ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভানেতৃত্বে বেলুড় মঠের স্বামী মৈথিল্যানন্দজী, উকিল শ্রীযুক্ত হরিপদ গাঙ্গুলী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভায় সহস্রাধিক নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন। পর দিবস এই সম্পর্কে জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে প্রায় দুই সহস্র নরনারীর সম্মুখে উক্ত স্বামীজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দজীর বক্তৃতা—বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত দুর্লভপুর, বাঙ্গীটোলা, পঞ্চানন্দপুর, মথুরাপুর, নাজীরপুর, শোভানগর, পুরাতন মালদহ, আড়াইডাঙ্গা, মারণায়, বড়গাঁও, চূড়ামন, বগচড়া, চাঁচোল প্রভৃতি স্থানে আলোকচিত্র সহযোগে মোট ২৬টি বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা', 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান', 'শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ', 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'সেবাধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রভৃতি।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী—গত ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্তী বহুবাজার সারপেন্টাইন্ লেন স্থিত তাঁহার বাসভবনে ৬৯ বৎসর বয়সে ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্যাদিতে আজীবন তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি এক জন পুরাতন সভ্য ছিলেন এবং কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি, পার্শিবাগান রামকৃষ্ণ সমিতি, বহুবাজার রামকৃষ্ণ সমিতি ও অনাথভাণ্ডার, চণ্ডীচরণ হাইস্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

সুপ্রকাশ বাবুর মধ্যমাগ্রজ শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তৃতীয় সহোদর স্বামী প্রকাশানন্দজী আমেরিকায় দীর্ঘকাল বেদান্ত-প্রচারকার্য করিয়া সেখানেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুপ্রকাশ বাবু তাঁহার পিতা ৺আশুতোষ চক্রবর্তীর ষষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

পরলোকে শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী—গত ১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত বিখ্যাত নাট্যাচার্য বাণীবিনোদ শ্রীযুক্ত

নির্মলেন্দু লাহিড়ী ৫৮ বৎসর বয়সে রক্তের চাপাধিক্য, ইউরিমিয়া ও হৃদ্‌রোগে তাঁহার বাগবাজারস্থ বাসস্থানে পরলোকগমন করিয়াছেন।

নির্মলেন্দু বাবু দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার পিতা সরকারী ডাক্তার ছিলেন। সিভিল সার্জনের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শান্তিপুরে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহাদের আদিম নিবাস ছিল কৃষ্ণনগরে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নির্মলেন্দু বাবুর মাতুল ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পর্যন্ত পড়িয়া তিনি কিছু কাল কলিকাতা করপোরেশনে প্রুফ্‌ রীডারের কাজ করেন, কিন্তু অভিনয়ের আকর্ষণ অদম্য হওয়ায় স্বীয় প্রতিভাবলে অতি শীঘ্রই বাঙ্গলার নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লাহিড়ী অতিশয় অমায়িক, মিষ্টভাষী ও সুদর্শন ছিলেন। তিনি আমরণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ছিলেন এবং প্রায়ই সন্ধ্যায় বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে আসিয়া বহুক্ষণ ধ্যানজপে রত থাকিতেন। অবসরকালে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত এবং সন্ন্যাসীদের সৎসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন। রোগশয্যায় থাকিয়াও তিনি ভগবৎচিন্তায় বিরত থাকেন নাই। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এবং কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন।

নির্মলেন্দু বাবু অতি উদার অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। অনেক দীন-দুঃখী, দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন সর্বদা তাঁহার সাহায্য লাভ করিত।

নির্মলেন্দু বাবু জীবনের বিভিন্ন সময়ে নাট্যমন্দির, মনোমোহন, মিত্র, নিউ কোহিনুর, আর্ট, মিনার্ভা, রঙ্গমহল প্রভৃতি থিয়েটারের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। 'প্রতাপ', 'শিবাজী', 'ভাস্কর পণ্ডিত', 'সিরাজদ্দৌলা', 'শাজাহান', 'ঔরঙ্গজেব', 'বসন্ত' প্রভৃতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি প্রভূত সুখ্যাতি ও কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। চিত্রাভিনেতৃরূপেও তাঁহার সুনাম ছিল। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বসু— গত ৭ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র বসু ৫২ বৎসর বয়সে চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং চির-কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিয়া চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতির সহকারী সম্পাদক ও প্রধান কর্মিরূপে বহু বৎসর যোগ্যতার সহিত কার্য পরিচালনা করেন। অনিল বাবু কালীঘাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অন্যতম সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার ধর্মানুরাগ, সেবাপরায়ণতা, সারল্য ও মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি— গত ফাল্গুন মাসে এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্তচিন্তামণি 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান যুগ', শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তান্ত্রিক সাধনা ও ভৈরবী যোগেশ্বরী' এবং 'বাংলার দুই প্রেমাবতার—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব সাপ্তাহিক ধর্মসভায় ধারাবাহিক রূপে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ব্যাখ্যা এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'চিকাগো বক্তৃতা' ও 'শিবানন্দ-বাণী' আলোচনা করেন।

আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম— এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ

জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৬ই ফাল্গুন শহরের আদর্শ-নগর পল্লীস্থ আশ্রমের নবনির্মিত নিজস্ব ভবনের দ্বারোদঘাটন হইয়াছে। ৭ই ফাল্গুন স্থানীয় টাউন হলে দেওয়ান শ্রীযুক্ত ওয়াজিরচাঁদ মেহ্‌রা মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর দুইখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি পত্র পুষ্প ও মাল্যাদিতে সুশোভিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রগুপ্ত বার্ষ্ণের, শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চবে প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের অলৌকিক জীবন ও অমূল্য বাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় এই আশ্রমটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট আবেদন জানান। আজমীরের বিশিষ্ট গায়কদিগের ভজন শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্ধন করিয়াছিল।

ইটাচুনা (হুগলী) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ—গত ২২শে মাঘ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্বামী জপানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়, মহকুমা-শাসক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি মহারাজের মনোজ্ঞ বক্তৃতার পর সভার কার্য শেষ হয়।

টুণ্ডী (মানভুম) বিবেকানন্দ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২০শে মাঘ হইতে তিন দিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রথম দিন পূজা ভজন প্রসাদ-বিতরণ এবং টুণ্ডীর জমিদার মাননীয় রাজারণ শ্রীশ্রীবিজয়নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের নেতৃত্বে স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। দ্বিতীয় দিন প্রায় ১২০০ সাঁওতাল এবং হরিজন প্রসাদ গ্রহণ করে। তৃতীয় দিবসে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রজাপতি মিশ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে কয়েক জন ভদ্রলোক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ৬ই ফাল্গুন এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা ও শাস্ত্রপাঠ হয়। পূর্বাহ্ণে ছাত্র-ছাত্রীদিগের এক সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত রসিকলাল বাসুদেব মেহতা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত পুরাতন বুচ এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রতনলাল ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় প্রখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীযুক্ত পুণিত মহারাজ তাঁহার মণ্ডলীসহ বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে মনোজ্ঞ কীর্তন এবং রাত্রিতে স্থানীয় বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ ভজন-সঙ্গীত ও রামনাম সংকীর্তন করেন।

যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—এখানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে বিশেষ পূজা ভোগরাগ ইত্যাদি হয়। বৈকালে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় আশ্রমাধ্যক্ষ গীতা ও কঠোপনিষৎ পাঠ করিলে বালিকাবৃন্দের ভজনগান-অন্তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বক্তৃতা দেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন

সম্পাদক

ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের মহান্ উপদেশাবলী তাঁহার জীবদ্দশায় সংগৃহীত হয় নাই। খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিলে তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ তদীয় উপদেশসমূহ সংকলন এবং লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ অনুভব করেন। এতদুদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্ম-সংগীতি বা বৌদ্ধসন্ন্যাসি-সম্মেলন আহূত হয়। শ্রীবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণলাভের পর এইরূপ চারিটি সম্মেলনের মধ্যে প্রথম সম্মেলনের অধিবেশন হয় রাজগৃহে। তাঁহার সন্ন্যাসি-শিষ্যগণ ইহাতে যোগদান করেন। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় সাত মাস যাবৎ এই সভার কার্য চলে। প্রায় আট শত ভিক্ষু এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু ইহার সকল ব্যয়ভার বহন করেন। স্থবির মহাকাশ্যপ এই মহতী সভার সভাপতি পদে বৃত হন। তাঁহার অনুরোধে স্থবির আনন্দ 'অভিধম্ম' (দার্শনিক তত্ত্ব) ও স্থবির উপালী বিনয় (বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী) ব্যাখ্যা করিলে সভাস্থ সকলে সংগীতের ধরনে সমবেত ভাবে উচ্চারণ করিয়া উহা গ্রহণ করেন। এইজন্য প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষু-সম্মেলন পালিগ্রন্থে 'ধম্ম-সংগীতি' নামে অভিহিত। এইরূপে ধর্ম ও বিনয় সংগৃহীত এবং থেরবাদের উদ্ভব হয়। সংগৃহীত বুদ্ধ-উপদেশাবলী পরবর্তী কালে ত্রিপিটক নামে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করে।

প্রথম সংগীতির একশত বৎসর পর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে ধর্ম এবং বিনয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ সৃষ্ট হয়। ভিক্ষু-সংঘের পরস্পরবিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সমসাময়িক প্রধান প্রধান ভিক্ষুগণ বৈশালী নগরে সমবেত হন। তথায় স্থবির রেবতের পৌরোহিত্যে ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসভায় সকলে থেরবাদ সমর্থন করেন। কিন্তু একদল ভিক্ষু মতদ্বৈধবশতঃ উহাতে যোগদান না করিয়া কৌশাম্বীতে অপর একটি সভায় সমবেত হন। এই সভা হইতে মহাসংঘিক মতবাদের উদ্ভব হয়। পরবর্তী কালে উভয় মতবাদের দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া আঠারটি বিভিন্ন সম্প্রদায় জন্ম লাভ করে। থেরবাদ বা স্থবিরবাদ হইতে বৎসপুত্রীয় মহীশাসক ধম্মগুপ্তিক সূত্রান্তিক সর্বাস্তিবাদী কাশ্যপীয় সংক্রান্তিবাদী সাম্মতীয় সান্নাগরিক ভদ্রযানিক ও ধর্মোত্তরীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মহাসংঘিক

মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া একব্যবহারিক গোকুলিক বহুশ্রুতীয় চৈত্তিক এবং প্রজ্ঞাপ্তবাদী প্রমুখ বহু মহাযান সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্ তথাগতের জীবনের বিভিন্ন দিক ও উপদেশ অবলম্বনে এই বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। শ্রীবুদ্ধকে ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এই সময় হইতে বহু পৌরাণিক গল্প লিখিত এবং তাঁহার অতিমানবতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতে থাকে।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্যসম্রাট্ অশোক ভগবান অমিতাভের প্রকৃত ধর্মমত নিরূপণ ও সংঘভেদ দূর করিবার জন্য পাটলিপুত্র নগরে অশোকারাম বিহারে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু-সম্মেলন আহ্বান করেন। ইহা ইতিহাসে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম-সংগীতি নামে অভিহিত। স্থবির মৌদ্গলীপুত্র তিস্য এই সংগীতির পৌরোহিত্য করেন। একাদিক্রমে কয়েক মাস যাবৎ ইহার অধিবেশন চলে। মতানৈক্য-বশতঃ বহু বৌদ্ধভিক্ষু সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া নালন্দার ঐতিহাসিক বিহারে এক পৃথক্ সম্মেলনের আহ্বান করেন। এই সভা হইতে সর্বাস্তিবাদের উদ্ভব হয়। এই মতবাদ উত্তরকালে মহাযানের অন্তর্গত এক সম্প্রদায়রূপে খ্যাতি লাভ করে।

মৌর্য সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী ছিলেন এবং ইহার প্রসারকল্পে যথাশক্তি চেষ্টা করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ভারতের সর্বত্র শতসহস্র স্তূপ ও বিহার গড়িয়া উঠে। মৌর্যবংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে তদীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র-কর্তৃক নিহত হন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ইতিহাসে বৈম্বিক—মতান্তরে শুঙ্গ বংশ নামে অভিহিত। পুষ্যমিত্র এবং তাঁহার পরবর্তী নৃপতিগণের শাসনকালে ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত-সাহিত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানে বিবিধ স্মৃতি ও সংহিতাদি রচিত এবং এই সকলকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুসমাজ গড়িয়া উঠে। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ প্রতিকূল অবস্থার চাপে স্বধর্ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া মগধের সীমার বাহিরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। থেরবাদিগণ সাঁচি ও সর্বাস্তিবাদিগণ মথুরার অন্তর্গত উরুমুণ্ড নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। থেরবাদিগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থের কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া মূল মাগধী বা পালি ভাষাতেই উহা সংরক্ষণ করেন। কালক্রমে এই মতবাদ মূল মাগধী সর্বাস্তিবাদ হইতে পৃথক আকার ধারণ করে। ইহাই আর্য সর্বাস্তিবাদ নামে পরিচিত।

মথুরা ও তক্ষশিলার গ্রীক্‌রাজগণ বৌদ্ধধর্মানু-রাগী ছিলেন। তাঁহারা প্রাগুক্ত উভয় মতবাদই সমর্থন করিতেন। কুশান-সম্রাট কনিষ্ক গোঁড়া সর্বাস্তিবাদী ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। তাঁহার শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বিশেষ ভাবে বিস্তৃত হয়। গান্ধার এবং কাশ্মীরের বৌদ্ধভিক্ষুসম্প্রদায়ের দলাদলি নিবারণ এবং ধর্মগ্রন্থসংকলন-মানসে তিনি এক মহতী সভা আহ্বান করেন। ইহাই সর্বশেষ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র এবং অশ্বঘোষ এই সভায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। সভায় বিভাস নামক বিখ্যাত টীকা সংকলিত হয় এবং সর্বাস্তিবাদিগণ বৈভাসিক নামে অভিহিত হন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে উত্তর প্রদেশে এবং দক্ষিণে বিদর্ভদেশে (বেরারে) বৈভাসিকগণের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। এই সময় সুবিখ্যাত

বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন শূন্যবাদ প্রবর্তন করিয়া বৌদ্ধজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। মহাযান-ধর্মমতপ্রচারে শূন্যবাদ যথেষ্ট সাহায্য করে। এই মতবাদ ভারতের বাহিরেও নানাস্থানে বিস্তৃত হয়। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' মহাযান-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু 'অভিধর্মকোষ' নামক পুস্তক রচনা করেন। তিনি সৌত্রান্তিক মতবাদের প্রবর্তক। তাঁহার ভ্রাতা অসঙ্গ যোগাচার মত প্রবর্তন করেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে সৌত্রান্তিক বৈভাসিক মাধ্যমিক এবং যোগাচার মতবাদ বৌদ্ধধর্মে সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমোক্ত মতবাদ দুইটি—'বুদ্ধজ্ঞান' 'প্রত্যক্-বুদ্ধজ্ঞান' এবং 'অর্হৎ-জ্ঞান'কে নির্বাণলাভের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করে। শেষোক্ত দুইটি সম্প্রদায় বুদ্ধজ্ঞানকেই বুদ্ধত্বলাভের একমাত্র আলম্বন-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধ্যমিক-যোগাচারপন্থিগণ আপনাদিগকে সৌত্রান্তিক-বৈভাসিক সম্প্রদায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহারা মহাযানপন্থী বলিয়া খ্যাত। এই মতবাদ তিব্বত চীন জাপান মঙ্গোলিয়া কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। সৌত্রান্তিক-বৈভাসিক সম্প্রদায় হীনযানপন্থী বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হয়। সিংহল ব্রহ্মদেশ শ্যাম কম্বোজ প্রভৃতি দেশের অধিবাসিবৃন্দ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ধগণ মৌদ্গল্যায়ন অবলোকিতেশ্বর মঞ্জুশ্রী অমিতাভ আকাশগর্ভ প্রমুখ বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি কল্পনা করিয়া তাহাতে দেবত্ব আরোপ করেন। এই মূর্তিগুলি বৌদ্ধ-বিহারে বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞাপারমিতা তারা বিজয়া ও হিন্দু দেব-দেবীর সহিত সমভাবে পূজিত হইতে থাকে। এই সময় বেদান্ত-কেশরী আচার্য শংকরের আবির্ভাবে হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থান হয়। শংকর বৌদ্ধ দেবদেবীগণকে পরব্রহ্মের বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি-জ্ঞানে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং ভগবান বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করেন। এইরূপে হিন্দুধর্মে মূর্তি-পূজা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কালক্রমে মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এবং খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। এই সময় বজ্রযান মন্ত্রযান কালচক্রযান সহযান নামক বহুবিধ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে ভারতে বিশেষ করিয়া বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম বলিতে এই তান্ত্রিক মতবাদকেই বুঝাইত। এই সময় ভারতে মহাযান ধর্মমত তান্ত্রিক মতবাদে পর্যবসিত হয়। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত কবি এবং অর্হৎ এই বহুবিস্তৃত তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালীতে হিন্দু তান্ত্রিক মতবাদের অত্যন্ত প্রাধান্য ছিল। হিন্দু তান্ত্রিক মতবাদ বিশেষতঃ বাংলার তান্ত্রিক উপাসনায় এই সম্প্রদায়ের প্রভাব সুস্পষ্ট।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে উড়িষ্যারাজ ইন্দ্রভূতির সহায়তায় স্থবির অনঙ্গবজ্র বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন। এই সময়ে উপাসনা-প্রণালীর গূঢ় তত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য সান্ধ্য-ভাষা নামক এক প্রকার অবোধ্য ভাষা প্রবর্তিত হয়। এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সিদ্ধাচার্য নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারা অদ্ভুত ধরনের পোষাক পরিধান এবং নরকপাল পানপাত্র রূপে ব্যবহার করিতেন। শ্মশানভূমি ইঁহাদের আবাসস্থল ছিল। এই তন্ত্রোক্ত সাধনে পঞ্চ মকার ব্যবহৃত হইত। এই সাধনপ্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া বামাচার সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে বাংলার

পালরাজগণ বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের একান্ত পক্ষপাতী হন। তাঁহারা উদন্তপুরীতে এক বিরাট তান্ত্রিক মন্দির নির্মাণ করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র বিশেষভাবে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ভারতের রাজন্য-বৃন্দের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্মের একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম মস্তক উত্তোলন করে। কালক্রমে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত ও ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক মতবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। বিদ্যা চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতায় ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকগণ বাংলা ও উড়িষ্যার বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ফলে জনগণের উপর বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে। অবশেষে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদের আক্রমণে বৌদ্ধভিক্ষুগণ দলে দলে তিব্বত ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে পলাইয়া যান। ইহার ফলে বৌদ্ধপ্রধান পূর্ববংগের অধিবাসিগণ দলে দলে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। নবাগত মুসলমান আক্রমণকারীদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর ফলে বাংলার হিন্দুগণ বিধ্বস্ত হইয়াও অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বোশেখের প্রথম প্রভাতে

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

বরষের নিশাশেষে আসিয়াছে
প্রভাতের নব অভ্যুদয় ;
নূতনের স্বপ্নালোকে চলিবে না
পুরানোর ব্যঙ্গ অভিনয়।

গ্লানির গ্লানিমা নিয়া দুইমুঠা ভরি'
অপগতা গর্বস্ফীতা উদ্ধতা শর্বরী ;
দুঃস্বপ্নের অমা-প্রান্তে ওগো বন্ধু মিতা,
সে যে পরাজিতা।
মহামিথ্যা বিসর্জিয়া মরণের পঙ্কিল পল্বলে
মর্ম-সত্য বিকশিয়া তোল তব প্রাণপদ্মদলে।
শুদ্ধ আলোকের স্নানে,
শুভ্র নূতনের গানে
স্বচ্ছ সকলের প্রাণে
কুসুম হাসুক্ শুধু—দিকে দিকে
জীবনের হউক বিজয়।

মহত্ত্ব-মুখোসে ঢাকা
বঞ্চনার বালুর বিলাস
নিভে গিয়ে জ্যোতির্দীপ্ত
মনুষ্যত্ব হো'ক্ সুবিকাশ।
নবালোকে অভিষিক্ত হউক জীবন ;
নূতনের অনাগতে লহ বন্ধু, লহ স্বর্ণাসন।
বোশেখের পুণ্য প্রথম প্রভাতে
গাহি গান এই প্রাণময়।
নবীন প্রত্যূষে এলো জীবনের
স্মরণীয় স্বর্ণ সূর্যোদয়।

গৌড়পাদাচার্য্য

(মৈত্রেয়নাথ ও শংকর)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

অস্মদীয় দশনামী সম্প্রদায়ের মহাগুরু শ্রীশ্রীগৌড়পাদাচার্য্য মহারাজ বিখ্যাত বৈদিক অজাতিবাদী দার্শনিক, ইনিই মাণ্ডুক্যোপনিষদের উপর মাণ্ডুক্য-কারিকার লেখক। এই কারিকাই হলো শাংকর দর্শনের মূল ভিত্তি। এই কারিকা-ভাষ্য রচনার পরিশিষ্টে শ্রীমদাচার্য্যপাদ তা স্বীকার করেছেন। ভগবান শ্রীমচ্ছংকরাচার্য্যের গুরু শ্রীশ্রীগোবিন্দপাদ এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দপাদের গুরু মহামহিম শ্রীশ্রীগৌড়পাদাচার্য্য। ভাষ্যকারের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁর 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' (৪।৪৪) নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

"এবং গৌড়ৈর্দ্রাবিড়ৈর্নঃ পূজ্যৈরর্থঃ প্রভাষিতঃ।
অজ্ঞানমাত্রোপাধিঃ সন্নহমাদিদৃগীশ্বরঃ॥"

অর্থাৎ "আমাদের পূজ্য গৌড়দেশীয় গৌড়পাদ এবং দ্রবিড়দেশীয় শংকর কর্ত্তৃক বেদার্থ প্রভাষিত" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা গৌড়পাদ যে গৌড়দেশীয় ছিলেন তা সম্যক পরিস্ফুট। অনেকে এ সম্বন্ধে সন্দেহ করলেও এখনও কেহ এর বিরোধী সুস্পষ্ট হেতু দেখাতে পারেন নি। আচার্য্যপাদের সহিত তাঁর সাক্ষাৎকারের প্রবাদ যদি সত্য হয় এবং আচার্য্যপাদ যদি সত্যসত্যই মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামীর শোধিত তারিখে (৬৩২-৪৬ খৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন, তা হলে কুপ্পুস্বামি-নিরূপিত গৌড়পাদের অনুমিত স্থিতিকাল (৫২০-৬২০ খৃঃ অঃ) আর একটু বাড়িয়ে ৫৪০-৬৪০ খৃঃ অঃ করতে হয় এবং তাঁর দীর্ঘজীবিত্ব সম্বন্ধে প্রবাদও আছে।

মণ্ডনমিশ্রের 'ব্রহ্মসিদ্ধি'র ইংরেজী উপক্রমণিকাতে শংকরের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব ও পর আচার্য্যগণের খৃষ্টাব্দীয় স্থিতিকাল যা মঃ মঃ কুপ্পুস্বামী উপস্থাপিত করেছেন, অনুসন্ধিৎসুদের অবগতির জন্য তা আমরা নিম্নে দিচ্ছি—

গৌড়পাদ ৫২০-৬২০; গোবিন্দপাদ ৫৬০-৬৫০; ধর্মকীর্ত্তি (বৌদ্ধ) ৬০০-৬৫০; ভর্ত্তৃহরি ৫৯১-৬৫১; ভগবান শংকর ৬৩২-৬৬৪; পদ্মপাদ ৬২৫-৭০৫; বিশ্বরূপ মণ্ডন (সন্ন্যাসনাম সুরেশ্বর) ৬২০-৭০০; কুমারিল ভট্ট ৬০০-৬৬০; গুরু প্রভাকর ৬২০-৬৯০; মণ্ডন মিশ্র (স্ফোট ও শব্দাদ্বৈতবাদী এবং ব্রহ্মসিদ্ধি-রচয়িতা) ৬১৫-৬১৫; উম্বেক ভট্ট (মণ্ডন) বা ভবভূতি ৬৪০-৭২৫; শালিকনাথ ৬৫০-৭৩০; বাচস্পতি মিশ্র ৮৫০। পরন্তু পাশ্চাত্য মতাবলম্বীদের মতে শ্রীশংকরের জন্মকাল ৭৮৮-৮২০ খৃঃ অঃ এবং গৌড়পাদ সপ্তম শতকে জীবিত ছিলেন।

গৌড়পাদাচার্য্যের 'সাংখ্যকারিকা' ও মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বস্থ 'উত্তরগীতার' ভাষ্য পাওয়া যায়। অনেকে ভাষা দেখিয়া মনে করেন ঐ সকল ভাষ্যকার বিভিন্ন লোক। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা, দীর্ঘজীবী খুব বড় দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের পূর্ব্বকালীন এবং উত্তরকালীন লেখায় ভাষার ও মতের অনেক পার্থক্য থাকে। তা ছাড়া গৌড়পাদের সাংখ্যভাষ্যের উপর শ্রীশংকরের 'জয়মঙ্গলা' নামক একটি টীকা পাওয়া যায়। লেখাটি বোধ হয় আচার্য্যপাদের

সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি। অধ্যাপক হরদত্ত শর্ম্মা 'জয়মঙ্গলা' টীকার ইংরেজী উপক্রমণিকাতে ঐ টীকাটি শংকরকৃত কিনা বলে সন্দেহ করেছেন। সন্দেহের হেতু ঐ নামক টীকাকার এক জন বৌদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন। শংকর বেদান্তী, 'সাংখ্যকারিকা'র টীকা তিনি কেন করতে যাবেন? এ সকলের উত্তরে আমরা বলি, 'সাংখ্যকারিকা' বৌদ্ধদর্শনবিরোধী, বৌদ্ধেরা 'সাংখ্যকারিকা'র টীকা করতে যাবেন কেন? আর প্রথম যুক্তিটিও প্রাজ্ঞোচিত নয়, কারণ 'বালবোধিনী', 'সুবোধিনী', 'মনোরমা', 'প্রভা' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন বিষয়ের টীকার নামকরণ করেছেন দেখা যায়। অতএব সেগুলি যে একই ব্যক্তির তা বলা চলে না। আচার্য্যপাদের 'বিষ্ণুসহস্রনাম', 'ললিতা-ত্রিশতী', 'শ্বেতাশ্বতর', 'নৃসিংহতাপনী', 'হস্তা-মলক', 'সনৎসুজাতীয়-ভাষ্য'গুলিও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক বেদে কেন্দ্রীভূত করবার জন্য বোধ হয় পরবর্ত্তী কালের অনুরোধিত এবং ক্ষিপ্রলেখা। আর তা ছাড়া শাংকর-ভাষ্য 'ষোড়শ-ভাষ্য' বলে দশনামীদের মধ্যে প্রচলিত; পূর্বোক্তগুলি গ্রহণ করলে তবেই 'ষোড়শ-ভাষ্য' হয়। যাহোক 'সাংখ্যকারিকা' ভিন্নমতাবলম্বী হলেও উপনিষৎশাস্ত্র বুঝবার সুবিধার জন্য গৌড়পাদ 'নব্যসাংখ্যকারিকা-ভাষ্য' রচনা করেন এবং আচার্য্যপাদ তার উপর 'জয়মঙ্গলা' টীকা লেখেন। ভাষ্যকার এখানে স্বয়ং গৌড়পাদ বলে আচার্য্যপাদ এখানে টীকাকার বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। যেমন বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও বল্লভাচার্য্যের 'ন্যায়-লীলাবতী', বাচস্পতি মিশ্রের বেদান্ত ভিন্ন অপরাপর দর্শনের টীকা, সাক্ষাৎ শংকরাচার্য্যের 'পদার্থ-প্রবেশ' নামক একখানি সংক্ষিপ্ত ন্যায়গ্রন্থ, শংকরশিষ্য পৃথ্বীধরাচার্য্যের 'রত্নকোষ' নামক ন্যায়গ্রন্থ এবং তার উপর 'রত্নকোষকার-মতবাদ', 'রত্নকোষ-কার-পদার্থ', 'রত্নকোষকারিকা-বিচার' প্রভৃতি অনামা বেদান্তীদের টীকা, তথা হরিরাম নৈয়ায়িক রচিত 'রত্নকোষমত-রহস্য', 'রত্নকোষ-বাদ বা বিচার' এবং গদাধরের 'রত্নকোষবাদ-রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যায় ('ভাষাপরিচ্ছেদ' ও 'তর্কসংগ্রহ' উপক্রমণিকা—গুরুনাথ বিদ্যানিধি); নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নবন্যায়-নেতা হয়েও শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের' উপর অদ্বৈতপক্ষে একটি টীকা রচনা করেন; বৈদিক সন্ন্যাসী আচার্য্যপাদের লিখিত 'প্রপঞ্চ-সারতন্ত্র' এবং তার উপর পদ্মপাদাচার্য্যের টীকাও দেখা যায়; 'সিদ্ধান্ত-লেশ'কার একজীব-বাদী অপ্পয় দীক্ষিত অদ্বৈতবাদী হয়েও শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈত-পক্ষে 'শিবার্কমণিদীপিকা', প্রতিবিম্বা-দ্বৈতবাদী মাধবাচার্য্য 'জৈমিনীয়-ন্যায়-মালা' এবং 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার মধুসূদন 'ভক্তিরসায়ন', 'রাস-পঞ্চাধ্যায়-টীকা', 'শাণ্ডিল্যসূত্র-টীকা' প্রভৃতি রচনা করেন।

অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধপ্রভাব হেতু গৌড়পাদ মাণ্ডূক্য উপনিষদের "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং....প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে"—এই সপ্তম মন্ত্রটি নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিকশাস্ত্র-কারিকা অবলম্বনে জুড়ে দিয়েছেন। তা হলে বলতে হয় মৈত্রেয়নাথ-শিষ্য অসঙ্গের "ন সন্ন চাসন্ন তথা ন চান্যথা" শ্লোকটিও ব্যাসদেব ঋগ্বেদের 'নাসদীয়সূক্তে' জুড়ে দিয়েছেন। পরন্তু আমাদের স্থির নিশ্চয় নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক শাস্ত্রের—

"অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্।
অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্॥
যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্"
(১।১)

—এই শ্লোকটি নাগার্জ্জুন মাণ্ডুক্যোপনিষদব-

লম্বনে আত্মপক্ষ ত্যাগ করে শূন্যপক্ষে রচনা করেছেন। পণ্ডিতদের এরূপ বাক্‌ছলাদি অদ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রথা। যেমন ভগবান বুদ্ধ মীমাংসকদের কর্ম্মকাণ্ডীয় 'ধর্ম্ম' শব্দটি মূঢ় মানবের কর্ম্মপ্রিয়তা-দর্শনে 'মোক্ষার্থে' ব্যবহার করে বললেন, মদীয় পথই যথা 'ধর্ম'। 'অলাতশান্তি' শব্দটি দেখে গৌড়পাদের উপর বৌদ্ধ আলয়বিজ্ঞানী মৈত্রেয়নাথের প্রভাব অনুমিত হয় বটে, কিন্তু তাঁর 'অলাতশান্তির' অবষ্টম্ভ 'স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা', 'শূন্যতা' নয়, কাজে কাজেই তাঁকে নাগার্জ্জুনের ন্যায় অসৎখ্যাতিবাদী বলা চলে না, তথা মৈত্রেয়নাথের ন্যায় আত্মখ্যাতিবাদীও বলা চলে না। কারণ মৈত্রেয়নাথের আত্মা হলো কতকটা বেদান্তের বিজ্ঞানাত্মা বা অলাতচক্রবৎ সাক্ষিবিজ্ঞানধারা এবং এই বিজ্ঞানাত্মার অবষ্টম্ভও 'শূন্যতা', পরন্তু গৌড়পাদের বিজ্ঞানাত্মা বা আন্তর জগৎ 'চিত্ত-কালাঃ' (মাণ্ডুক্যকারিকা ২।১৪), অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্বক্ষণ মাত্র স্থায়ী এবং সেটি মাত্র ব্যক্তিরই অনুভূতি হয়, তদ্ভিন্ন অপরের হয় না, এবং তার আশ্রয়ও শুদ্ধচৈতন্য। মৈত্রেয়নাথের বহির্জগৎ ও সাক্ষি-আলয়-বিজ্ঞানাত্মধারাচক্রের উপর অপর সপ্তবিধ বিজ্ঞান কল্পনাধারা মাত্র (গত ভাদ্রের 'উদ্বোধনে'র, 'আলয়-বিজ্ঞান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য); কাজে কাজেই তাও গৌড়পাদের 'চিত্তকালাঃ'-এর ভেতরই পড়ে, পরন্তু গৌড়পাদ বাহ্যজগৎকে "দ্বয়কালাঃ" (মাণ্ডূক্য কাঃ ২।১৪) বলেছেন, অর্থাৎ বহির্জগৎ যেমন আমারও চিত্তকাল-সাহায্যে প্রত্যক্ষ, সেইরূপ উহা অপরেরও প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ বাহ্যজগৎ জ্ঞানকাল এবং জ্ঞানের পরবর্ত্তী কালেও বিদ্যমান থাকে। পরন্তু মৈত্রেয়নাথের বাহ্যজগৎ, গৌড়পাদের অন্তর্জগতের ন্যায় চিত্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং জ্ঞানবৃত্তি-সমূহের নাশের সহিতই নাশ হয়ে যায়।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গৌড়পাদের দ্বয়কালীন জগতের সহিত আচার্য্যপাদের ব্যবহারিক সত্তার ভেদ কোথায়? এবং গৌড়পাদকে 'অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদী' না বলে 'অজাতিবাদী' বলে শাংকর দর্শন হতে একটু বিশেষিত কেন করে রাখা হয়েছে? গৌড়পাদাচার্য্য দ্বয়কালাত্মক বাহ্য জগৎকেও স্বপ্নেরই তুল্য মিথ্যা বলেছেন। জাগ্রৎকালে স্বপ্নাবস্থা যেরূপ বাধিত হয়, স্বপ্নকালেও সেইরূপ জাগ্রদ-বস্থা বাধিত হওয়ায় তারা উভয়েই তুল্য মিথ্যা (মাণ্ডুক্য কাঃ ২।৬-৭)। দৃশ্যত্ব হেতু জগতের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে উভয়মতে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আচার্য্যপাদ স্বপ্ন (প্রাতিভাসিক সত্তা) এবং জগৎ বা বাহ্যজগৎ (ব্যবহারিক সত্তা) তুল্য মিথ্যা স্বীকার করেননি, কারণ—(১) একই স্বপ্ন দুই বার কেউ দেখে না, (২) স্বপ্নে প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' অথবা অভিজ্ঞা 'তদিদম্' এইরূপ বর্ত্তমানের দ্বারা অতীত এবং অতীতের দ্বারা বর্ত্তমান জ্ঞান (continuance of memory) থাকে না, (৩) দ্বিতীয় স্বপ্নে প্রথম স্বপ্নের ব্যবহারিক কার্য্যকারণসম্বন্ধিত অনুবৃত্তি দেখা যায় না, (৪) স্বপ্নে জাগ্রতের স্মরণ হয় না, (৫) বাহ্যস্পর্শ অতিসূক্ষ্ম-ভাবে স্বপ্নধারার ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটায়, (৬) স্বাপ্ন বিচারে স্বাপ্নিক বাহির্জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না, (৭) স্বাপ্নদৃশ্যে বাহ্যেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না, পরন্তু স্বাপ্নেন্দ্রিয় বাহ্য ব্যবহারিক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষজন্য সংস্কার-স্মৃতি মাত্র, যেমন জাগ্রৎস্মৃতি, (৮) স্বপ্ন স্মৃত্যাত্মক, (৯) কার্য্যকারণসম্বন্ধ-জ্ঞান স্বপ্নে হয় না, (১০) কাজে কাজেই স্বাপ্ন ও জাগ্রতে প্রাতি-ভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তার ভেদ না হলে এবং উভয়েই যদি স্বপ্নবৎ বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক বা তুচ্ছ সত্তা হয়, তা হলে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয়

স্বর্গনরকাদি, গতাগতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, যজ্ঞোপাসনা এবং সর্ব্বোপরি দার্শনিক প্রমাণপ্রমেয়াদিব্যবহারের কোন তাৎপর্য্য থাকে না এবং (১১) স্বপ্ন অবস্থা চৈত্তিক জ্ঞান এবং সুষুপ্তি অবস্থাও চৈত্তিক জ্ঞান।

পরন্তু (১) সুষুপ্তির পরও জাগ্রতে একই দৃশ্য জগৎ দেখছি বলে প্রতীয়মান হয়, (২) প্রত্যভিজ্ঞা (বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের দ্বারা অতীতের নির্ণয়) ও অভিজ্ঞা (অতীত স্মৃতির দ্বারা বর্ত্তমানের নির্ণয়) জ্ঞান জাগ্রতে থাকে, (৩) সুষুপ্তির পর জাগ্রতে পূর্ব্বজাগ্রৎ ঘটনাকে আশ্রয় করেই আমরা জীবনপ্রবাহে অগ্রসর হই' (৪) জাগ্রৎকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃষ্ট স্বাপ্ন ঘটনার স্মরণ হয়, (৫) জাগ্রৎকালে স্বাপ্নস্পর্শ দৃশ্যপট অকস্মাৎ বা ক্রমাগত পরিবর্ত্তন করায় না, (৬) জাগ্রদ্বিচারে স্বাপ্ন ও বহির্জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়, (৭) জাগ্রতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ঘটে, পরন্তু স্বাপ্নদৃশ্যে বাহ্যেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হয় না, পরন্তু বাহ্যেন্দ্রিয়সংস্কার জন্য চিত্ত ঐরূপ প্রতিচ্ছবিসম্পন্ন হয় এবং মনে হয় যেন চক্ষুরাদির দ্বারা দেখছি, যেমন জাগ্রতে অনুপস্থিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সংযোগে দর্শনাদি ক্রিয়ার স্মরণ, স্বপ্ন যদি ইন্দ্রিয়দৃশ্য হয়, তা হলে জাগ্রৎকালীন স্মরণও ইন্দ্রিয়দৃশ্য বলা যেতে পারে এবং তাতে স্মৃতিজ্ঞানের একেবারে উচ্ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষভিন্ন স্মৃতিজ্ঞান বলে আর কিছু স্বীকার করাই চলে না, (৮) সব্যাপার কার্য্যকারণসম্বন্ধজ্ঞান জাগ্রতে হয়, পরন্তু স্বপ্নে হয় না, (৯) জাগ্রৎ অনুভবাত্মক, পরন্তু স্বপ্ন স্মৃত্যাত্মক এবং (১০) বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বর্গনরকাদি, গতাগতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রমাণ-প্রমেয়াদির ব্যবহার যজ্ঞোপাসনাদির ব্যবহারিক তাৎপর্য্য জাগ্রতেই সম্ভব এবং (১১) জাগ্রৎ সবস্থা চৈত্তিক জ্ঞান।

এই জন্য আচার্য্যপাদ "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৯) সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "বৈধর্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ" এবং "নাভাব উপলব্ধেঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।২৮) সূত্রের ভাষ্যে বলছেন, "ন খলু অভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ····ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্যমর্থং নাহমুপলভে, ন সোঽস্তীতি ব্রুবন্ কথমুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।" গৌড়পাদের "স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা" (মাণ্ডূক্য কাঃ ২।৩১), অথবা "অসতো মায়য়া জন্ম····বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন·······" (মাণ্ডূক্য কাঃ ৩।২৮) অবলম্বনে যদি বাহ্য জগৎও "চিত্তকালাঃ" হয়, তা হলে, তাঁর বহির্জগৎও মৈত্রেয়নাথের প্রতীত্যসমুৎপাদেই পর্য্যবসিত হয়। তবে তিনি ঐ প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থাৎ অলীক চিত্তকল্পিত জগতের অধিষ্ঠানকে ব্রহ্ম বলে স্বীকার করায় তাঁর মতকে অজাতি (মাণ্ডূক্য কাঃ ৪।৬, ২৯) বিজ্ঞানায়খ্যাতিবাদ বা অস্পর্শযোগ (মাণ্ডূক্য কাঃ ৩।১) বলা চলে; পরন্তু শংকরের 'অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ' বলা চলে না। অজাতি শব্দের অর্থ যে ব্রহ্মাধিষ্ঠানে ব্যবহারিক কার্য্যকারণ-সম্বন্ধিত জীব ও জগৎ-রূপ বিবিধজাতির গন্ধর্ব্বনগরবৎ অভাব অথবা তুচ্ছ সত্তা মাত্র। কিন্তু আচার্য্যপাদ ব্যবহারিক সত্তা মূলতঃ মিথ্যা, একথা মাণ্ডুক্যকারিকাব্যাখ্যা-কালে বলতে ভোলেন নি। যথা—"জাগ্রদ্দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞা, দৃশ্যত্বাদিতি হেতুঃ; স্বপ্নদৃশ্যভাববদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং, তথা জাগরিতেঽদৃশ্যত্বমবশিষ্টমিতি হেতূপনয়ঃ (ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমৎপক্ষঃ=হেতুপনয়ঃ)। তস্মাজ্জাগরিতেঽপি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি নিগমনম্। অন্তঃস্থানাৎ সংবৃতত্বেন চ স্বপ্নদৃশ্যানাং

ভাবানাং জাগ্রদ্দৃশ্যেভ্যো ভেদঃ। দৃশ্যত্বমসত্যত্বং চাবিষ্টমুভয়ত্র"—(মাণ্ডূক্য কাঃ-২।৪ ভাষ্য)।

মাণ্ডুক্যকারিকায় গীতাশ্লোকের স্পর্শও পাওয়া যায়। যথা—"প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতামিতি" (মাণ্ডুক্যকারিকা, ১।৬) শ্লোকটি পড়ে গীতার "নাসতো" (গীতা, ২।১৬) শ্লোকটির স্মরণ হয়। তথা "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি"—(মাণ্ডুক্য কাঃ ১।৬) পড়ে গীতার "অব্যক্তাদীনি" (গীতা, ২।২৮) শ্লোকটি মনে পড়ে। "প্রাণাদিভিরনন্তৈশ্চ" (মাণ্ডুক্য কাঃ, ২।১৯) কারিকাটি গীতার "ত্রিভির্গুণময়ৈঃ" (গীতা, ৭।১৩) শ্লোকটি স্মরণ করিয়ে দেয়। কারিকার "বীতরাগভয়ক্রোধৈর্মুনিভিঃ" (মাণ্ডুক্য কাঃ, ২।৩৫) শ্লোকটি গীতার "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ....বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে" (গীতা, ২।৫৬) এবং "বীতরাগভয়ক্রোধাঃ" (গীতা, ৪।১০) শ্লোকদ্বয়ের স্মারক। কারিকার ২।৩৭ শ্লোকের সহিত গীতার ১২।১৯ এবং ৪।২২ শ্লোক তুলনা করুন।

আয়ুষ্মান নন্দের অর্হত্বলাভ

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

কপিলবাস্তু নগরের রাজা সিংহহনুর আট পুত্র; তন্মধ্যে শুদ্ধোদন জ্যেষ্ঠ। তিনিই শাক্য-রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিপতি হইবেন এই আশায় পিতা তাঁহাকে সৎশিক্ষা, সদাচার ও বীরধর্মে সুশিক্ষিত করিলেন। বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দেবদহরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা মায়ার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসে। কিন্তু দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন রাজকুমারী মায়ার কনিষ্ঠা ভগিনী মহামায়ার গর্ভে হয় রাজচক্রবর্ত্তী নয় মহা-অর্হৎ জন্মগ্রহণ করিবেন। এই জন্য সিংহহনু এই কনিষ্ঠা কন্যার সহিত শুদ্ধোদনের বিবাহ দিলেন। সন্তান হইবার সময় চলিয়া গেল, কিন্তু শুদ্ধোদনের কোনও সন্তান হইল না। ইতোমধ্যে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যজাতিদের সহিত শাক্যদের যুদ্ধ বাধিল এবং কুমার শুদ্ধোদন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অমিত বিক্রমে তাহাদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন শাক্যরাজ্যে নিয়ম ছিল—এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে কেহ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং যদি কোনও বিশেষ কারণে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করার প্রয়োজন হইত, তবে প্রজাসাধারণের সম্মতিক্রমে তাহা করিতে পারিত, অন্যথা নহে। শুদ্ধোদনের অদ্ভুত বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ ও তাঁহার অপত্যহীনতা বিবেচনা করিয়া প্রজাগণ সিংহহনুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্মত হইল। তখন সিংহহনু মহামায়ার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মায়ার সহিত শুদ্ধোদনের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাঁহারও অনেকদিন কোনও সন্তান হইল না। পরে কুমার সিদ্ধার্থ মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার কিছু পরেই মাতা

ইহলীলা সংবরণ করিলেন; তখন অপত্যহীনা মায়া পুত্রনির্বিশেষে সিদ্ধার্থের লালনপালন করিতে লাগিলেন। মায়ার আর এক নাম ছিল গোতমী। তৎকর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া লোকে সিদ্ধার্থকে গৌতম বলিয়াও ডাকিত। এই অসীম স্নেহ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার-স্বরূপই যেন বিধাতা এই অপত্যহীনাকে মাতৃত্বে ভূষিত করিলেন। এক সর্ব্বগুণযুক্ত সুন্দর বীর পুত্র তাঁহার জন্মগ্রহণ করিল। সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করিবার পর শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছিল। এখন তাঁহার কনিষ্ঠ সুঠাম রূপবান ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করায় শুদ্ধোদন আনন্দের নিলয়স্বরূপ সেই পুত্রের নাম রাখিলেন নন্দ। নন্দ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন।

বুদ্ধত্ব-লাভ করিবার পর ভগবান জিন্ যখন পিতার নিমন্ত্রণে কপিলবাস্তুতে আগমন করিয়া ন্যগ্রোধারামে বিহার করিতেছিলেন, তখন অন্যান্য শাক্যরাজকুমারদের সহিত নন্দও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বুদ্ধ নন্দের মধ্যে পারমার্থিকতার শ্রেষ্ঠ বীজ প্রত্যক্ষ করিলেন। নন্দ তখন বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্ত্রীও পরমসুন্দরী ছিলেন। পরস্পরকে ছাড়িয়া তাঁহারা অল্প সময়ও থাকিতে পারিতেন না। বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া নন্দ ঝটিতি স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন। বুদ্ধ এক দিন নন্দের গৃহে ভিক্ষা করিতে গেলেন। নন্দ পরম সমাদরে ও ভক্তি-ভরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে গৃহে আহ্বান করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলে নন্দের স্ত্রী রাজবধূ ভদ্রা তাঁহাকে সসম্ভ্রমে শত শত প্রণাম করিয়া কতকগুলি সুমিষ্ট ফল উপহার দিলেন। নিকটে কোনও ভৃত্য না থাকায় ভগবান জিন্ নন্দকে সেইগুলি লইয়া ন্যগ্রোধারামে আসিতে বলিলেন। নন্দ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ফলগুলি লইয়া তাঁহার সহিত চলিলেন। অজ্ঞাত ভীতিতে কোমলহৃদয়া ভদ্রার বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। তিনি নন্দের সহিত দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া নিম্নস্বরে তাঁহাকে কিছু বলিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা যায় ততক্ষণ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্তঃপুরে গিয়া স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বীরকন্যা ও বীরজায়া; সহজেই নিজেকে সংযত করিলেন। সর্ব্ববিধ ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকাই ক্ষত্রিয় রমণীর স্বভাব।

ন্যগ্রোধারামে পৌছিয়া শ্রীবুদ্ধ উপবেশন করিলে নন্দ ফলগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিলেন; তৎপর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক গৃহ-গমনোদ্যত হইলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিলেন—"নন্দ, তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর, আর গৃহে ফিরিয়া যাইও না। তোমার মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রভূত সম্ভাবনা রহিয়াছে, বৃথা গৃহবাসী হইয়া তাহা নষ্ট করিও না। জাগতিক সুখ দুদিনের জন্য, তাহার জন্য চিরস্থায়ী সুখ নষ্ট করা উচিত নয়। প্রেম ক্ষণস্থায়ী, যৌবনেই ইহা রমণীয় কিন্তু অনিত্য; পরে ইহা থাকে না। ইহা সত্যও নহে, চিরস্থায়ীও নহে।" এই প্রস্তাব শুনিয়া নন্দ আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বিনয়ের সহিত বলিলেন—"ভন্তে, আমি সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছি, তাহা ছাড়া সংসারসুখের প্রতি আমার দুর্দ্দমনীয় আসক্তি; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার যোগ্য নহি। মন যদি সংসার-সুখের দিকে পড়িয়া থাকে, তবে মিথ্যা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা কেবল ভান, ছলনা বা আত্মবঞ্চনা-মাত্র হইবে। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মিথ্যাচারে অভিরুচি হয় না।" বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে বলিলেন—"যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক, কিন্তু চেষ্টা ছাড়া কিছু হয় না। পরম ও চরম সত্যের জন্য চেষ্টা

করিবে, ইহাতে ছলনার কথা আসে না। যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন দেখিবে সংসারসুখ তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। তুমি শীঘ্রই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। দুর্লভ এমন কোনও বস্তুই জগতে নাই যাহা উদ্যমশীল ধীরগণের যত্নে সিদ্ধ হয় না। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি।"

বুদ্ধদেব যখন বার বার এইরূপে নন্দের পরম মঙ্গল কামনা করিয়া সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন বীরধর্ম্মী রঘুকুলজাত নন্দ ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞানুবর্তিতার বশে অগ্রজের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু হইলেন এবং ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া স্বীয় প্রজাগণের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মাতা মহাপ্রজাপতি গোতমী মায়া) পুত্রের এই প্রব্রজ্যা গ্রহণে বোধ হয় প্রীতই হইলেন এবং সম্ভবতঃ শ্রীবুদ্ধের উপদেশই তাঁহাকে পরে ভিক্ষুণীসংঘ-স্থাপনে প্ররোচিত করে। তখন নির্ব্বাণ-আকাঙ্ক্ষার এক প্রবল বন্যা দেশে আসিল এবং সংসারবৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলিয়া বিবেচিত হইল।

কিছুকাল গত হইলে পর এক সময় যখন ভগবান জিন্ শ্রাবস্তিপুরে জেতবন অনাথ-পিণ্ডারামে বিহার করিতেছিলেন, তখন এক দিন আয়ুষ্মান নন্দ এক ভিক্ষুকে বলিলেন—"আবুস, আমি মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মচর্য্য-সাধন করিতে পারিতেছি না, ব্রহ্মচর্য্য আয়ত্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে না। আমি এই সব অনুশীলন ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছি।"

তখন এক ভিক্ষু ধীরে ধীরে বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন-পূর্ব্বক বলিলেন—"ভন্তে, আপনার মাতৃস্বসৃপুত্র আয়ুষ্মান্ নন্দ জনৈক ভিক্ষুকে বলিতেছিলেন যে ব্রহ্মচর্য্য আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইতে চাহেন।" এই কথা শুনিয়া ভগবান সেই ভিক্ষুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"দেখ, আমার নাম করিয়া আয়ুষ্মান্ নন্দকে গিয়া বল—'আবুস, বুদ্ধ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।'" তিনি গিয়া ভিক্ষু নন্দকে এই কথা বলায় "আবুস, আচ্ছা, আমি যাইতেছি" বলিয়া নন্দ ভগবান বুদ্ধদেব-সমীপে গিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

ভগবান তখন নন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"নন্দ, ইহা কি সত্য, তুমি কোন ভিক্ষুকে বলিয়াছ যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে? তুমি গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইবে?"

নন্দ বলিলেন—"হাঁ ভন্তে, ইহা সত্য।"

"নন্দ, তুমি মনোযোগ-সহকারে ব্রহ্মচর্য পালন করিতেছ না কেন? ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে তুমি কেন পারিতেছ না? শিক্ষা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইতে কেন চাহিতেছ? তুমি কুলপুত্র, গৃহত্যাগ করিয়া পরম সত্যলাভের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ। এখন গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া গেলে অতিশয় নিন্দার কথা হইবে, বংশ পতিত হইবে। কেন তুমি ব্রহ্মচর্য্য-সাধন করিতে পারিতেছ না? ইহার কারণ কি?"

নন্দ ধীরভাবে অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন—"প্রভু, আমি সংসারসুখভোগ-স্পৃহা মিটাইবার অবসর পাই নাই। তাহা ছাড়া আমি যখন ফলহস্তে আপনার সহিত ন্যগ্রোধারামে যাই, তখন আলুলায়িতকুন্তলা শাক্যানী জনপদকল্যাণী (নন্দ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সম্মুখে স্বীয় পত্নীর নাম উচ্চারণ করিলেন না) সপ্রেম দৃষ্টিতে আমার দিকে

চাহিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে নিম্নস্বরে বলিলেন, 'প্রিয়, শীঘ্র ফিরিয়া আসিও'। তাঁহার সেই সানুরাগ আহ্বান ও কমনীয় মূর্ত্তি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। আমার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সম্ভব নহে।"

বুদ্ধ সত্যভাষী বীর ভ্রাতার স্পষ্ট কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইতে না দিয়া বলিলেন—"নন্দ, আপাত-মধুর অনিত্যবস্তুর প্রলোভনে স্থায়ী সুখের অবশ্যপ্রাপ্তি ত্যাগ করা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে সত্বর ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুব সম্ভব। তুমি এখন হইতে খুব মনোযোগের সহিত চেষ্টা কর। শ্রেয়ঃ ত্যাগ করিও না।" এই বলিয়া তিনি ভ্রাতাকে বিদায় দিলেন।

নন্দ স্বীয় কুটিরে ফিরিয়া গেলেন ও ভ্রাতার কথামত চেষ্টা করিতে লাগিলেন : কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই মানিতে চায় না। নন্দ পূর্ব্বাশ্রমে আচার্য্যদিগের নিকট বহুবিধ শিল্পকলা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা একটি। তিনি একখানি প্রস্তরের উপর স্বীয় ভার্য্যা ভদ্রার একটি অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অনুচ্চস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কত কথাই বলিতেন ও কত আক্ষেপ করিতেন এবং প্রেম-বিহ্বলচিত্তে অশ্রুপাত করিতেন। তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া কৃপাকুল কোনও বয়ঃস্থ ভিক্ষু তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইতেন, কেহ বা কৌতুকানুভব করিতেন। এই অবস্থায় একজন ভিক্ষু বুদ্ধদেবের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক একপার্শ্বে উপবেশনান্তর এই সব ব্যাপার তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি আমার নাম করিয়া আয়ুষ্মান্ নন্দকে বলুন যে বুদ্ধ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।" ভিক্ষু গিয়া নন্দকে তাহা বলিলে তিনি এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভগবান যেখানে ভিক্ষুগণসহ বসিয়াছিলেন সেখানে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বুদ্ধ তখন তাঁহাকে তাঁহার চিত্রাঙ্কন-ব্যাপার ও চিত্তের অসংযমের কথার উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অমনোযোগী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নন্দ বলিলেন—"ভন্তে, আমি পূর্ব্বেই ইহার কারণ আপনাকে বলিয়াছি। এই প্রবল বিষয়তৃষ্ণার জন্যই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চাই নাই। শাক্যকল্যাণী আমার স্মৃতি এরূপ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছেন যে, আমি ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতিলাভ করিতে পারিতেছি না। আপনি অনুমতি করুন আমি গৃহে যাই।"

এই কথা শুনিয়া ভগবান বুদ্ধ নন্দের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে লইয়া গেলেন। ঐ সময়ে তথায় শক্রের সেবা করিবার জন্য পাঁচশত সুন্দরী অপ্সরা সুসজ্জিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহা-দিগকে দেখাইয়া ভগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নন্দ, অপ্সরাদের দেখিতে পাইতেছ?" নন্দ বলিলেন—"ভন্তে, দেখিতেছি।"

শ্রীবুদ্ধ—"নন্দ, তুমি কি মনে কর শাক্যানী জনপদকল্যাণী এই অপ্সরাদিগের অপেক্ষা বেশী সুন্দরী, না এই অপ্সরাগণ শাক্যানী জনপদ-কল্যাণী অপেক্ষা বেশী সুন্দরী?" নন্দ—"এই অপ্সরাদের তুলনায় শাক্যানী জনপদকল্যাণীকে নাসিকাকর্ণহীন পর্য্যুষিত মর্কটীর মত দেখায়। ইহাদের সহিত একবিন্দুও তাঁহার সাদৃশ্য নাই, অতএব তুলনা করা সম্ভব নহে।"

শ্রীবুদ্ধ—"নন্দ, বিশ্বাস কর, যদি তুমি মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তাহাতে স্থিত হও, তবে আমি তোমাকে এই পাঁচশত অপ্সরা লাভ করাইয়া দিব এই প্রতিশ্রুতি

দিতেছি। এখন যাও, গিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস কর।”

নন্দ—“ভন্তে, যদি আপনি আমাকে এই পাঁচশত অপ্সরা প্রদান করাইবার প্রতিশ্রুতি দেন, তবে অবশ্য আমি মনোযোগ সহকারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিব।”

তখন ভগবান আয়ুষ্মান নন্দের হস্ত ধরিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া জেতবনে প্রকাশিত হইলেন। তথায় ভিক্ষুগণ শুনিলেন যে ভগবান বুদ্ধের ভাই নন্দ পাঁচশত অপ্সরালাভের আশায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন, আর ভগবান নিজে উক্ত পাঁচশত অপ্সরা প্রদান করাইবার প্রতিশ্রুতি নন্দকে দিয়াছেন। তখন নন্দের সঙ্গী ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—“ভাল রে নন্দ, পাঁচশত অপ্সরারূপ পারিশ্রমিক লাভের জন্য নন্দ খুব ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে; হাঁ, মজুরী বটে, একেবারে পাঁচশত অপ্সরা!” কেহ বলিলেন—“অপ্সরালাভের মূল্য ত বেশ—ব্রহ্মচর্য্য!” আবার কেহ বলিলেন: “অপ্সরা নহিলে আর ব্রহ্মচর্য্যের পুরস্কার কি? ভাল হে নন্দ, যেরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিতেছ, তাহাতে পাঁচশত অপ্সরা ত হস্তামলকবৎ তোমার করায়ত্ত হইল বলিয়া, আর দেরী নাই!”

আয়ুষ্মান নন্দ এই সব ঠাট্টা-তামাসায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া, বিন্দুমাত্রও রুষ্ট বা নিরুৎসাহ না হইয়া বা কাহারও প্রতি কোনরূপ দ্বেষভাব মনে না আনিয়া প্রচণ্ড উৎসাহ, অদম্য অধ্যবসায় ও একাগ্রতা সহকারে সত্যাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। তপশ্চরণ ও কঠোর আত্মসংযমের ফলে যে উদ্দেশ্যে কুলপুত্রের মত গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সার, শ্রেয় সত্য-ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যসাধন সফল হইল, তিনি জানিলেন যে ইহার পর আর কিছু করিবার নাই। আয়ুষ্মান নন্দ অর্হৎপদ লাভ করিলেন।

নন্দের এই অবস্থালাভের অব্যবহিত পরে যখন রাত্রির শেষ যামে ঊষার অরুণচ্ছটা দিগ্বলয়ে উঁকি মারিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ জেতবন স্বর্গীয় স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভরিয়া গেল এবং এক দীপ্তিমান দেবতা যেখানে বুদ্ধদেব উপবেশন করিয়াছিলেন সেখানে আবির্ভূত হইয়া ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করণান্তর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন—“ভন্তে, ভগবানের মাতৃস্বসৃপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ আজ ক্ষীণাশ্রব হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি অবগত হইয়া তৎসাক্ষাৎকার করিলেন।” ভগবানও স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তিনি শিরঃকম্পনদ্বারা তাহা জ্ঞাপন করিলে দেবদূত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ও জেতবন পুনশ্চ পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল।

পরে ঊষার কোমল আলোকপাতে জেতবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে পক্ষিগণ নব প্রভাতে জাগরিত হইয়া মধুর স্বরে কলরব করিতে লাগিল এবং যখন ভিক্ষুগণ ধ্যানান্তে প্রাতঃ-কৃত্যের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন নন্দ লঘুপদবিক্ষেপে পরমানন্দচিত্তে, অর্হৎ-জীবনের প্রথম নবীন প্রভাতে আসিয়া ধীরে ধীরে বুদ্ধ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভগবান ধ্যানস্তিমিত লোচন উন্মীলন করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আয়ুষ্মান নন্দ অপরিসীম বিনয়ের সহিত নিম্নস্বরে নতমস্তকে ভগবান জিনকে বলিলেন—“ভন্তে, আজ আমার

প্রব্রজ্যাগ্রহণের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, আপনাকে আর অধিক কি বলিব ?"

ভগবান শিরঃকম্পন করিয়া জানাইলেন যে তিনি সব ব্যাপার অবগত আছেন এবং স্নিগ্ধ-মধুর করুণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন। তাহাতে নন্দের মনের সকল সংশয়, সকল তাপ দূর হইয়া গেল। তখন নন্দ বলিলেন—"ভন্তে, আপনি ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের পূর্ব্বে আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।" ভগবান বলিলেন—"দিয়াছিলাম।" তখন নন্দ বলিলেন—"প্রভু, সেই প্রতিশ্রুতি-অনুসারে আমার প্রাপ্য পাঁচ শত অপ্সরার আর আমার প্রয়োজন নাই।"

তখন ভগবান জিন স্বীয় চিরপ্রসন্ন মুখ নন্দের দিকে ফিরাইয়া মধুরস্বরে বলিলেন—"আয়ুষ্মান্ নন্দ, যখন আমি দেখিলাম তুমি ক্ষীণাশ্রব এবং চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি অবগত হইয়া উহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিলে এবং দেবদূত আসিয়া আমাকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া গেলেন, তখন তোমার সাংসারিক আসক্তি হইতে মুক্তি প্রত্যক্ষ করিলাম। তখন বুঝিলাম আমারও প্রতিশ্রুতি হইতে অব্যাহতি হইয়া গেল।" অতঃপর ভগবানের মুখ দিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি স্বতই বাহির হইতে লাগিল—

"গভীর পঙ্কের হ্রদ পার হ'য়ে যেবা কেহ
কামের কণ্টক দূর করে,
নিঃশেষে করিয়া ক্ষয় মোহ, আর সুখদুখে
নহে লিপ্ত, আনন্দে বিহরে ;
সেই মহা পুণ্যবান, সেই সত্যাশ্রয়ী সাধু
সেই পূজ্য জগৎ ভিতরে।"

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

কোন্‌টা কর্ম্ম কোন্‌টা অকর্ম্ম এসব যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝে বা জেনে বিশেষ লাভ হয় না—অযথা পণ্ডশ্রমই হয়। সাধন-ভজন করলে নিজে নিজেই সব বুঝা যায়। কর্ম্ম অর্থাৎ সাধন-ভজন দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ হয়, কর্ম্মই কর্ম্মকে জানিয়ে দেয়।

যে প্রীতির সঙ্গে পূজা ধ্যান-জপ ও স্মরণ মনন করে—অর্থাৎ ভাল লাগে বলে করে, তার খুব তাড়াতাড়ি হবে। কেননা তার মধ্য হতে স্বার্থবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। গোপীদের এই ভাব ছিল—'অহেতুকী ভালবাসা।'

কিছুদিন নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর দেওয়া মন্ত্রের সাধন করলে মনে দানা বাঁধে। তখন বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সাধন করে যে বিশ্বাস আসে সেটিই ঠিক বিশ্বাস। একবার দানা বেঁধে গেলে দেহ ও মনে শান্তি আসে। সুতো দিয়ে যেমন মিছরীর দানা বাঁধে, সাধন করে সেইরূপ মনে দানা বাঁধে। তখন ভাব গাঢ় ও দৃঢ় হয়, কর্ম্মশক্তি খুব বেড়ে যায়। সব কাজেই আনন্দ ও বল পাওয়া যায়, এত সহজে সাধন-ভজন ছাড়া এমনটি আর কিছুতেই হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণমি তোমারে হে রামকৃষ্ণ, মহান্ আর্য্য ঋষি,
রাম ও কৃষ্ণ দুয়েরই স্বরূপ তোমাতে রয়েছে মিশি।
অনাচার আর ব্যভিচারে রত যখন মানব-কুল,
পবিত্রতার মাধুরী দেখায়ে ভাঙ্গিলে তাদের ভুল।
বালকের মতো সরলতা নিয়ে খুসী ভরা নিয়ে মন,
মা মা বলে ডাকি মুদি দুটি আঁখি সমাধিতে নিমগন।

বেদ বেদান্ত গীতা ভাগবত যে বাণী বহিয়া আনে,
মুর্খ জনেরে সে ভাষা বোঝালে সহজ কথার ভানে।
সত্যই তব কথা অমৃত, অমর জীবনখানি,
বিবেকানন্দে জ্যোতি দান করি পূর্ণ করিলে আনি।
ভবতারিণীর ভুবন ভোলানো রূপের মোহন ঠামে,
নাচিল চন্দ্র সূর্য্য তারকা, জগৎ ভরিল নামে।

রাণী রাসমণি মণিদীপ জ্বালি আরতি করিল আসি,
আঁখি ভরা জলে তুমি নিহারিলে মার মুখ ভরা হাসি।
শুধু দেখিলে না, অপরে দেখালে পিয়াসী ভক্ত জনে,
সর্ব্ব জীবেরে কারবারে ত্রাণ বিলাইলে প্রেমধনে।

জপধ্যানে নয়, দেহে মনে প্রাণে ফুটালে জ্যোতির রেখা,
তাহারই শুভ্র কিরণ আজিকে ভারত-ভাগ্যে লেখা।
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বাধীন আত্মার হ'লো জয়,
প্রতিটি জীবন-কেন্দ্র আজিকে হউক জ্যোতির্ম্ময়।
আজি এসো তুমি ধর্ম্ম রাখিতে কর্ম্মেরে দিতে মান,
মানব-জাতির ক্লীবতা ঘুচায়ে শৌর্য্য করিতে দান।

দূরে যাক্ দ্বিধা সঙ্কোচ ভয়, অলসতা অভিমান,
বিজয়-শঙ্খ ফুকারি এসো হে পতিতের ভগবান।
কলুষ-কালিমা দূর করো প্রভু দূর করো যতো ভয়,
আনন্দময়ী মার সুত স'বে হোক্ আনন্দময়।
সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সত্য সার যে তুমি,
বিশ্বের যতো অনাথ আতুরে স্নেহ ভরে লও চুমি।

তোমারই ইচ্ছা, তোমারই শক্তি, তোমারই তরে এ প্রাণ,
তোমারই সেবায় হোক্ নিয়োজিত, তুমিই করহে ত্রাণ।
নিঃস্ব এ দীন শিষ্য তোমারি, তুমি যে বিশ্বময়,
জগৎ-গুরু হে প্রণমি তোমারে, তোমারই হউক জয়।

শব্দবিজ্ঞানে ভারতীয় বর্ণমালা

শ্রীচিন্তাহরণ বিশ্বাস, বি-এ, কাব্যতীর্থ, কাব্যনিধি

(২)

আর্য্যগণ গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া কোন্ বস্তু কি কি শব্দের সৃষ্টি করে তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন। কৃত্রিমতালেশ-বিহীন অনেক শিশুর মধ্যেও আমরা এই স্বাভাবিক ধ্বনির অনুসন্ধানস্পৃহা দেখিতে পাই। যেমন দেখা যায়—কোন বস্তুকে অন্যে কি নামে অভিহিত করে তাহার অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহারা উহাকে আপন ইচ্ছানুসারে নাম দিয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, বহির্ব্বস্তু তাহাদের দেহে ক্রিয়া বা স্পন্দন-সৃষ্টিপূর্ব্বক যে শব্দের অবতারণা করে, সেই শব্দের দ্বারাই তাহারা ঐ বস্তুকে বুঝিবার বা নাম দিবার চেষ্টা করে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের নামকরণ-পদ্ধতিকে এই প্রচেষ্টার চরম উৎকর্ষ বলা যায়।

এক একটি বস্তু যে দেহের এক এক স্থানে ক্রিয়ার সঞ্চার করে, তাহা সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। মিষ্টান্ন, রসগোল্লা প্রভৃতি লোভের বস্তু দেখিলেই জিহ্বায় ক্রিয়ার সঞ্চার হইয়া রস আসে এবং ক্ষুধা অনুভূত হয়। অত্যন্ত প্রিয়বন্ধুকে দেখিলে বুকের ভিতর স্পন্দন হইতে থাকে। রোগীর দেহে প্রবল ক্রিয়ার সঞ্চার হইলে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে বলিয়াই চিকিৎসকগণ সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত আগমন নিষেধ করিয়া দেন। এই সকল ব্যাপার আমাদের নিয়ত প্রত্যক্ষ। এইরূপ ছোট বড় মৃদু মধ্য অধিমাত্র হিসাবে প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই দেহের কোন না কোন স্থানে আঘাত করিয়া এক এক রূপ ভাব উৎপাদন করে।

আবার যেখানে ক্রিয়া বিদ্যমান সেখানে ঐ ক্রিয়ানুরূপ একটা শব্দ ও থাকে। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানকেও স্বীকার করিতে হয়। গাছের পাতা নড়িতে থাকিলে এক প্রকার শোঁ শোঁ শব্দ হয়। হাত দু'খানি পরস্পর ঘর্ষণ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা খস্ খস্ শব্দ হইল। তবে ক্রিয়ার মৃদুতাবশতঃ শব্দটি অত্যধিক মৃদু হওয়াতে আমাদের শ্রুতিগোচর নাও হইতে পারে। অবশ্য শব্দটার স্বরূপ যে ঠিক শোঁ শোঁ বা খস্ খস্ তাহা নহে। শব্দটা যেমন, ক্রিয়াটা তেমন তাহার অনুরূপ। তবে পাখী কি শব্দ করিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও কেহ কেহ অনুমান করে 'বউ কথা কও', কেহ বা শুনিতে পায় 'রাধা মাধব'। এই অনুমিত শব্দগুলি কল্পনাপ্রসূত হইলেও তাহাদের সবগুলির ভিতর দিয়া একটা মূল সুর বাজিয়া উঠে, যাহা ঐ পাখীর সুরের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। এইরূপ মূল সুরগুলি লইয়া যদি অনুভূত বস্তুগুলির নামকরণ করা যায়, তবে সেই নামাবলীর ভাষা যে সার্ব্বজনীন ভাষা হইবে, অর্থাৎ সেই ভাষা দিয়া যে সর্ব্বপ্রাণীর সঙ্গে ভাববিনিময় করা চলিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গভীর ধ্যাননিষ্ঠ আর্য-ঋষিগণ দেখিলেন যে প্রভাতে সূর্য্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবের দেহে ঋ র প্রভৃতি ধ্বনির বিকাশ হয়। জলীয় পদার্থ, শীতলতা প্রভৃতি অনুভব-কালে মূর্দ্ধার নিম্নাংশে স্পন্দন হইয়া ৯ ল ত প্রভৃতি ধ্বনির উদ্ভব হয়। তাই তাঁহারা আলোক সূর্য্য তেজ প্রভৃতির ঋং রং প্রভৃতি ধ্বনি যোগে নামকরণ করিলেন, আর বৃষ্টি জল প্রভৃতি শীতলতাব্যঞ্জক পদার্থকে অভিহিত করিলেন ৯ লং প্রভৃতি ধ্বনিসমষ্টি দ্বারা। অর্থাৎ মূর্দ্ধায় আঘাত করিয়া যখন দেহস্পন্দন ভ্রূমধ্যের দিকে গমন করিতে থাকে, তখনই আলোক অগ্নি জল প্রভৃতির জ্ঞান হয়। আর ঋ র ৯ ল প্রভৃতি ধ্বনির উচ্চারণ এবং জপ দ্বারা সেই সমুদয় বস্তু কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এই সমুদয় গুপ্ত ভাষাই ছিল ভারতীয় ঋষিগণের আবিষ্কার। ইহারাই ছিল ভারতীয় ঋষিগণের প্রাণের প্রাণ এবং ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতা-গণের তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক আপন কার্য্যসাধনের মূলমন্ত্র।

'দেবদেবী' শব্দের উল্লেখ-মাত্রেই হয়ত অনেক পাঠকের মনে কুসংস্কার বলিয়া একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিবার কথা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এ স্থলে ধ্বনিবিজ্ঞান নিয়াই আলোচনা চলিতেছে। ধ্বনির দ্বারাই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট। সুতরাং সেই মূল ধ্বনির ইতর-বিশেষ সাধনপূর্ব্বক যে এই জগৎসংস্কারকে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে তাহা একটা উদ্ভট কল্পনা বলিয়া মনে করা এস্থলে শোভা পায় না। আলোকজ্ঞানের উদয়ে যে 'ঋ র' ধ্বনির বিকাশ হয়, ইহা এমন যে ইহার অভাব হইলে আলোকজ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আবার নিদ্রিতাবস্থায় ঐ ধ্বনিগুলি দেহে বিকাশ পাইলে এমন কি স্বপ্নাবস্থায়ও আলোকজ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় 'ঋং রং'কে আলোকের দেবী বলিলে দোষ কি?

এখন প্রশ্ন উঠিবে—তবে আমরা 'ঋ র' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া আলোকসৃষ্টি করিতে পারি না কেন? ইহার কারণ আমরা বহু ধ্বনির মধ্যে ডুবিয়া আছি। এই জগতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের বহুজ্ঞান নিষ্পন্ন হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এবং বহু কম্পন একযোগে উদিত হইয়া আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিরাট কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে কোন নির্দ্দিষ্ট শব্দ বা ধ্বনি বর্ত্তমান অবস্থায় অনুরূপ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই আর্দ্র দেশলাই-এর কাঠি দ্বারা যেমন অগ্নিপ্রজ্বালন অসম্ভব, সেই রূপ আমাদের উচ্চারিত 'ঋ র'-এর দ্বারা ও অগ্নি প্রজ্বালন সম্ভব হইতেছে না। এই উনপঞ্চাশৎ ধ্বনির প্রত্যেকটির একতানতা অভ্যাস করিতে পারিলেই ভারতীয় বর্ণবিজ্ঞানের সজীবতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং বাস্তবিক মন্ত্রবলে অগ্নিসৃষ্টি হয় কিনা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখন সেই একনিষ্ঠ সাধক কোথায়? সর্ব্বদা বহির্জগৎ নিয়া ব্যস্ত থাকায় আমাদের সেই অন্তর্ম্মুখী দৃষ্টি সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে। তাই দেহের স্বাভাবিক স্পন্দন আমাকে যখন যে রূপ বুঝায়, আমি সেই রূপ বুঝিতে বাধ্য। এক একটি ধ্বনির সূক্ষ্ম সৃজনী শক্তিতে সন্দিহান হইয়াই আমরা দুর্ব্বল এবং বস্তুপরতন্ত্র হইয়া পড়িতেছি; ইচ্ছাশক্তি আজ বিজ্ঞানজগতে উপহাসের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। কোন বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে না পারিলে তাহার উপর একাগ্রতা আসিতে পারে না। সংক্ষেপতঃ এই জন্যই এক একটি মৌলিক ধ্বনিকে এক একটি দেবতা বলিয়া কল্পনা করিবার ব্যবস্থা। বিশেষতঃ মহাপুরুষ-প্রদর্শিত কৌশল-অবলম্বনে সাধননিরত হইলে যখন প্রত্যক্ষভাবে এই

দৃশ্যমান বাস্তব জগৎকেও ক্ষণস্থায়ী নৈশ স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না, তখন সাধক নিজেই স্থির করিতে পারেন না বাস্তবিক পক্ষে এই দৃশ্যমান জগৎই কি ঠিক অথবা তৎকালে একটি বীজমন্ত্রের একতানতা অভ্যাসের ফলে যে অলৌকিক দিব্য বস্তু দর্শন হয় তাহাই ঠিক। বস্তুতঃ যে কারণে আমরা বর্ত্তমানে এই দৃশ্যমান জগৎকে ঠিক এবং বাস্তব মনে না করিয়া পারিতেছি না, সেই কারণেই সাধকগণ তৎকালে ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারিতেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আমার দেহে ক্রিয়ার সঞ্চার করিয়া আমিই না হয় আগুন দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু অপরে কেন আমার সেই মনঃকল্পিত আগুন দেখিবে? আমি উন্মাদ হইয়া বৃক্ষকে ভূত, রজ্জুকে সর্পরূপে অনুভব করিলাম বলিয়া জগৎ কেন তাহাদিগকে সেরূপ দেখাইবে?

সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কতকগুলি নীরস যুক্তি পরিহার-পূর্ব্বক শব্দবিদ্যার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির মূল সূত্রের উল্লেখ করিতে হয়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভব না হইলেও বিষয়ের পরিপুষ্টির জন্য সেই সূত্রের একটি আভাস মাত্র দেওয়া গেল।

মনোবিজ্ঞান এবং শরীরবিদ্যাবিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, দেহগত সূক্ষ্ম স্পন্দন বা vibration আমাদের জগদ্‌জ্ঞানের কারণ। আমরা যে বৃক্ষ লতা আকাশ প্রভৃতি বিবিধ বস্তু দেখি এবং তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করি, তাহার কারণ আমাদের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর স্পন্দনমাত্র। শব্দতরঙ্গ রূপতরঙ্গ স্পর্শতরঙ্গ-সমূহ যখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে আঘাত দিয়া দেহের স্নায়ুমণ্ডলীকে কম্পিত করিতে থাকে, তখন আমরা বহির্জগতে বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব না করিয়া পারি না। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে স্পন্দনের মূলে শব্দ বিদ্যমান। কাজেই দেহে স্বাভাবিক নিয়মে উৎপন্ন কোন বিশেষ শব্দকে বিপরীত শব্দের দ্বারা বাধা প্রদান করিতে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কম্পন বা স্পন্দন ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতে থাকে। অবশেষে দেহে কম্পনরহিত অবস্থা উৎপন্ন হয়। যিনি এই অভ্যাসে নিরত হন, তিনি স্পন্দনের মৃদুতার সঙ্গে সঙ্গে আপন অনুভূতিতেই বুঝিতে পারেন যে জগৎ অস্পষ্ট ছায়াময় একটি স্বপ্নরাজ্য-মাত্র। বর্ত্তমানে দেহস্থ স্পন্দনসমূহকে নিরুদ্ধ বা মৃদুতর করিবার কৌশল আমাদের অজ্ঞাত বলিয়াই আমরা জগৎকে বুঝি অকাট্য সত্য বা বাস্তব পদার্থ। কিন্তু শব্দসাধকের জ্ঞানে এই জগৎ স্বপ্নমাত্র এবং এই স্বপ্নের মূলে দেহস্থ কতগুলি স্পন্দন এবং শব্দ বিদ্যমান।

ঘুমন্ত অবস্থায় মানবের ইন্দ্রিয়সকল যখন নির্জ্জীব থাকে, তখন স্নায়ুতন্ত্রে যে মৃদু স্পন্দন হইতে থাকে তাহার ফলে একটি অলীক স্বপ্নরাজ্য দৃষ্ট হয়। এই স্থলে স্পষ্টতঃ দেখা যায় স্বপ্নরাজ্যদর্শনের সময় যিনি দ্রষ্টা থাকেন, তিনি ঐ ঘুমন্ত ব্যক্তি হইতে এক জন পৃথক ব্যক্তির মত। কেন না নিদ্রিত ব্যক্তি তখন নিষ্ক্রিয়, অচল; কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা তখন সচল এবং বিভিন্ন ভাব ও কর্ম্মপ্রেরণায় সক্রিয়, চঞ্চল। অর্থাৎ একটি অলীক কল্পনা বলে ঘুমন্ত অবস্থায় একই ব্যক্তির মৃদু দেহস্পন্দনসমূহ দ্রষ্টৃ-দৃশ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একভাগ দৃশ্য জগৎ রূপে পরিণত হইয়া শৈল-নগর-কাননাদিসমন্বিত এক মায়াপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে এবং অপর ভাগ 'আমি' রূপে বা দ্রষ্টারূপে পরিণত হইয়া সেই আলোকচিত্র দর্শন করিতে থাকে। এ স্থলে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, ঐ দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়েই ঐ ঘুমন্ত অখণ্ড দেহের স্পন্দন দ্বারা

পরিচালিত হয়। ঘুমন্ত ব্যক্তির দেহ যদি পিত্ত-প্রকুপিত হয় তবে স্বপ্নদ্রষ্টা তাহার দৃশ্যাবলীতে অগ্নিকাণ্ডের স্বপ্ন দেখিবেই। কিন্তু ঐ মূল দেহের সেই পিত্ত-প্রকোপজনিত স্পন্দন পরিবর্ত্তিত না হইলে স্বপ্নদ্রষ্টা আপন কোন চেষ্টাতেই উক্ত অগ্নিকাণ্ডের প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি গভীর অন্তর্দৃষ্টিবলে সেই ঘুমন্ত দেহের সহিত আপন দেহের একাত্মবোধ (identity) উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলেই সেই দেহের ক্রিয়ার প্রতিবিধান করিয়া স্বপ্নগত অগ্নিকে ইচ্ছামাত্রেই নির্ব্বাপিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার করায়ত্ত হইবে। অর্থাৎ যিনি শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বপ্নসৃষ্টির মূল অবলম্বন নিদ্রিত দেহটিতে ক্রিয়াসৃষ্টি করিতে পারিবেন, কেবল মাত্র তাঁহার ইচ্ছাই সেই স্বপ্নজগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে।

বর্ত্তমান জাগ্রদবস্থার জগৎও আত্মার এক দীর্ঘ স্বপ্ন মাত্র। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর বহু কষ্টেও শিষ্যগণকে এই সত্য বুঝাইতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন—

"ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মে।
দীর্ঘং স্বপ্নমিমং বিদ্ধি দীর্ঘং বা চিত্তবিভ্রমম্॥"

যে মূল দেহ অবলম্বনে বর্ত্তমানে এই সার্দ্ধ-ত্রিহস্তপরিমিত দেহ এবং দেহ-দৃষ্ট দৃশ্যমান জগৎ অনুভূত হইতেছে, সেই মূল দেহ ভিন্ন এই জগতের পৃথক সত্তা কিছুই নাই। সুতরাং সেই দেহে শব্দের দ্বারা ক্রিয়ার পার্থক্য সৃষ্টি করিতে পারিলে এই দৃশ্য জগতের স্বতই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্র স্বপ্নদ্রষ্টার নিজেরই একটা অংশমাত্র। এক অখণ্ড 'আমিই' মোহগ্রস্ত অবস্থায় নিজকে বহুরূপে দেখিতেছেন। তবে স্বপ্নজগতে তিনি নিজকে যে অপর একটা ক্ষুদ্র 'আমি' মনে করিতেছেন বাস্তবিক পক্ষে তিনি সেই 'আমি' নহেন। তাই ঐ স্বপ্নগত 'আমি' আপন দেহের স্পন্দন পরিবর্ত্তন করিয়া সেই ব্যাপ্ত স্বপ্নজগৎকে আলোড়িত করিতে পারে না। পাশ্চাত্য 'মোনাড্'-বাদের ব্যাখাতাগণও বলেন যে এই জগতের জীবগণ এক অখণ্ড ঈশ্বর বা সর্ব্বব্যাপ্ত আত্মার (সমষ্টি অজ্ঞানের) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু (Monad) বা অংশ মাত্র। এই জন্যই সেই সমষ্টি অজ্ঞান বা পরমেশ্বরের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি বা স্পন্দনের যোজনা হয়, তদংশভূত জীবগণ তাহাকেই অপরিহার্য্য সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারে না। যে মূল দেহ অবলম্বনে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ অনুভূত হইতেছে, সেই দেহ বর্ত্তমানে আমার অদৃশ্য—যেমন দেখা যায় স্বপ্নদর্শনকালে ঘুমন্ত ব্যক্তি পর্য্যঙ্কোপরি শায়িত আপনার মূল দেহটি দেখিতে পায় না। যিনি শব্দবিদ্যার কৌশলপ্রয়োগে জগদতীত সেই মূল দেহে স্পন্দনের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ, তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি জগতের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। অপরপক্ষে যিনি আপনার স্বপ্নদৃষ্ট দেহের পরিবর্ত্তনের সহিত বাস্তব জগতের সমন্বয় করিতে না পারিবেন, তিনি ব্যবহারিক জগৎ হইতে বহু দূরে গমন পূর্ব্বক উন্মাদরোগী বলিয়া বিবেচিত হইবেন মাত্র।

এখন দাঁড়াইল এই যে, এক একটি মৌলিক শব্দই ইহার বিশুদ্ধ অবস্থায় এক একটি প্রাকৃতিক ঘটনার উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাই উক্ত ধ্বনির এক একটিকে এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া ধরা হইয়াছে, এই দেবদেবী-কল্পনা বিজ্ঞানসম্মত কি না তাহা এক মাত্র ক্রিয়াবান সাধকগণই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন।

এই বিশাল জগতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যত পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে তাহা দেখিয়া আমরা মনে করি বিভিন্ন বস্তু দেখিতেছি! কিন্তু ঋষিগণ মনে করিতেন—ইহারা বস্তু নহে, ক্রিয়া বা শব্দ মাত্র। আমাদের দেহে এক এক প্রকার ক্রিয়া হইয়া এক এক রূপ ধ্বনির উদ্ভব হইতেছে। আর সেই ক্রিয়া বা ধ্বনিকে আমরা দৃশ্য বস্তু বলিয়া মনে করিতেছি, এই শব্দকে বস্তুরূপে বুঝাই আমাদের ভ্রান্তি বা বন্ধন। স্বপ্ন-কালে দেখি আগুন জ্বলিতেছে, আমি জলে সাঁতার কাটিতেছি অথবা একটা ব্যাঘ্র আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। জাগিয়া উঠিবার পর দেখিতে পাই—বাস্তবিক পক্ষে অগ্নি জল বা ব্যাঘ্র কিছুই নাই। তবে এই যে দেখিতেছিলাম তাহা কি? সোজাসুজি উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয় তাহা আর কিছুই নয়, আমার দেহগত স্পন্দন ও স্পন্দন-জাত শব্দমাত্র। আমি হয়ত পিত্তের প্রকুপিত অবস্থা নিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় দেহে পিত্তের ক্রিয়া চলিতে থাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া 'ঋ র' প্রভৃতি ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছিল। আর আমি ঐ ক্রিয়ার অনুরূপ একটা অগ্নিকাণ্ডের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। এই জাগ্রদবস্থায় আমরা যত পদার্থ দেখিতে পাই, তাহারা দৃশ্যপ্রপঞ্চের অতীত কোন দেহীর দেহগত ক্রিয়ার এবং এক অখণ্ড শব্দের অভিব্যক্তি-মাত্র। মৃত্যুর পর আমাদের যে অবস্থা হইবে, তাহার সহিত তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান জাগ্রদবস্থাও একটা অলীক স্বপ্নমাত্র। সেই শাশ্বত চিন্ময় চির জাগ্রদবস্থায় যাইয়া আমরা নিজেই দেখিতে পাইব যে যাহাকে এত কাল একটা সত্যজগৎ মনে করিতেছিলাম তাহা কতগুলি ক্রিয়ার আলোড়ন বা স্পন্দন ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং সেই স্পন্দনরাজির মূলে শব্দ বা ধ্বনি বিদ্যমান। ঐকতান-সঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিগুলি মিলিত হইয়া একই মূল সুরের অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ এই বস্তুস্পন্দনজাত সহস্রপ্রকার ধ্বনি একটিমাত্র মূল সুরের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। অথবা একটিমাত্র ধ্বনিই স্পন্দনের পার্থক্যে সহস্রধা বিভক্ত হইয়া সহস্র প্রকার বস্তুরাজি সৃষ্টি করিয়াছে। সেই শব্দ হইতেই বর্ত্তমান জগৎ সৃষ্ট, স্থিত এবং বর্দ্ধিত হইতেছে। এই চরম মীমাংসায় উপনীত হইয়াই ভারত-ঋষিগণ বলিয়াছেন যে ওঁকার বা শব্দব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি। এই প্রণব-ধ্বনি যে কেবল ভারতীয়গণের আবিষ্কার তাহা নহে। বাইবেলেও দেখিতে পাই পরমকারুণিক যীশু শিষ্যগণকে বলিতেছেন—"In the beginning there was word and the word was with God. And the word was God."

এই জাগতিক বস্তুনিচয় শব্দের প্রকারভেদ বলিয়া উপলব্ধ হওয়ায় ভারতীয় মনীষিগণ জগতের সৃষ্টি এবং শ্রেণীবিভাগের জন্য শব্দের স্বাভাবিক উৎপত্তি এবং শ্রেণীবিভাগ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। এই গবেষণার ফলে যে ঊন-পঞ্চাশৎ মৌলিক ধ্বনির আবিষ্কার হয়, উহারাই ভারতের ক্রমিক বর্ণমালা। সংস্কৃতব্যাকরণ-শাস্ত্রে বর্ণের উৎপত্তিস্থান-নির্ণয় নিয়া যে এত বিস্তারিত আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাই এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করে। স্বাভাবিক বর্ণের কার্য্য-কারিতাশক্তি-বিষয়ক তথ্যসংগ্রহই যে এই সকল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাহার অন্য প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

মানবের শিক্ষা সভ্যতা কার্য্যকলাপ পর্য্য-বেক্ষণ করিতে গেলে দেখা যায় যেন তাহার চরিত্রে তৃষ্ণা, হাহাকার, এক অফুরন্ত অভাব-বোধ বিরাজ করিতেছে। এত জ্ঞান লাভ

করিয়া, সভ্যতায় এত উন্নত হইয়া, এত সুখ-ভোগ করিয়াও যেন তাহার তৃপ্তি নাই—কেবল আরো চাই, আরো চাই। এই অতৃপ্তিবোধ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তৃষ্ণা এবং ছুটাছুটি মানবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে। অর্থাৎ জ্ঞান আদিতে কোন এক নিবিড় শান্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিপূর্ণতার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। সেই পূর্ব্বানুভূত অভাবপরিশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভের জন্যই মানবাত্মার এই জীবনজোড়া হাহুতাশ। তৎকালে অভাব বলিয়া কোন বস্তু মোটেই অনুভূত হইত না। অভাব না থাকিলে কোন ক্রিয়া বা ছুটাছুটি থাকে না। নিজের বর্ত্তমান অবস্থা যদি পূর্ণ হয় তবে কোন অপূর্ণতা দূর করিবার জন্য সে ছুটাছুটি করিবে? আবার যে স্থলে স্পন্দন, ছুটাছুটি বা ক্রিয়া নাই সে স্থলে শব্দও নাই। তাই বলা হয় যে আদি পূর্ণতার অবস্থাটি স্পন্দনহীন, নিস্তরঙ্গ অবস্থা—"অশব্দমস্পর্শম-রূপমব্যয়ম্"। সেই নিস্তরঙ্গ অবস্থা হইতেই বর্ত্তমান শব্দময় জগতের উৎপত্তি। তাই শব্দের পরিণতির ক্রমগুলি আমরা সেই অবস্থা হইতেই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ঐ অশব্দ অস্পর্শ অরূপের অবস্থা হইতে পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা-লাভের জন্য পুনঃ চেষ্টা জাগিতে লাগিল। জগতে সকল বস্তুই আপন স্বাভাবিক অবস্থা হইতে চ্যুত হইলে আবার সেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অল্পবিস্তর সচেষ্ট হয়। এস্থলেও জ্ঞান একবার অভাবময় বর্ত্তমান অবস্থায় পতিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকায় দেহে যে ক্রিয়ার সঞ্চার হইতে লাগিল তাহাই মানবের বর্ত্তমান শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া। এই শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে বলিয়াই আমার এই 'আমিত্ব'-বোধ বজায় রহিয়াছে। এই ক্রিয়াদ্বয়ের রোধ হইলেই আমার 'আমি' বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সব চলিয়া যাইবে। অর্থাৎ তখন আমার মৃত্যু। এই ক্রিয়াদ্বয় রুদ্ধ হইলেই আমার দেখাশুনা সব বন্ধ হইয়া দৃশ্যমান জগৎ চলিয়া যায়। তবে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি, আমার দৃষ্ট জগৎ, আমার সুখদুঃখ সবগুলিকে এই ক্রিয়াদ্বয় হইতে সৃষ্ট বলিলে দোষ কি?

আমাদের সমগ্র দেহবীণায় শ্বাসপ্রশ্বাস রূপ সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়া স্থানে স্থানে আঘাত দিয়া বহুবিধ ধ্বনির ঝঙ্কার তুলিতেছে এবং সেই বিভিন্ন ধ্বনিই আমাদের দৃষ্ট বহুবিধ জাগতিক পদার্থের কারণ। বীজ যেমন বৃক্ষ লতা শস্য পুষ্প প্রভৃতির সৃষ্টির কারণ, সেইরূপ আমাদের দেহগত ধ্বনিসমুদয়ও জাগতিক বস্তুসমূহের সৃষ্টির কারণ। তাই এই সমস্ত শব্দকে এক একটি বীজমন্ত্র বলে। এই ধ্বনি-বীজসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই ভারতীয় বর্ণমালার বিশেষত্ব।

প্রথমে নিস্পন্দাবস্থা হইতে জ্ঞানের যখন বর্ত্তমান সক্রিয়, চঞ্চল অবস্থায় গমনাগমন হইতে লাগিল, তখন 'উং'কারের ন্যায় একটা সঙ্কোচনাত্মক অখণ্ড ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। ক্রিয়াসৃষ্টির পর মুহূর্ত্তে যখন ঐ ক্রিয়াজনিত-শব্দব্যাপ্ত বায়ুমণ্ডলে মিলাইয়া যাইতে থাকে তখন উংকার ধ্বনির সৃষ্টিই স্বাভাবিক। স্থূল দৃষ্টিতেও দেখিতে পাই, যখন একটা ঘণ্টায় আঘাত দেওয়া হয় তখন একটা 'ঢং' শব্দ হইয়া 'উং' 'উং' রবে কোন অনন্ত ব্যোম-রাজ্যে বিলীন হইতে থাকে। যখন একখানা গতিশীল রেলগাড়ী থামিবার চেষ্টা করে, তখন তাহা হইতে একটা 'উং' ধ্বনির ন্যায় শব্দ নির্গত হয়। সৃষ্টির আদিতেও গতিশীল সৃষ্টিক্রিয়া হইতে প্রতিগমন করিবার চেষ্টায়

যে 'উং' বা 'ওঁ' ধ্বনির উদ্ভব হয় তাহাকে ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে অভিহিত করা হয় প্রণব বা নাদবিন্দু। ইহাই বাইবেলের "In the beginning there was word."

এইরূপে বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়, প্রণব প্রথমে একটি যুক্ত নাদবিন্দু বা 'ং'-এর ন্যায় উচ্চারিত হইতেছিল। যখন জীবদেহে ক্রিয়াবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার জোয়ারভাঁটা কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনঃ সেই আদি নিস্পন্দ অবস্থায় ফিরিতে লাগিল, তখন সেই প্রণবধ্বনি কণ্ঠে আসিয়া কণ্ঠ্য বর্ণ 'অ'—তৎপর দ্বিতল বা ভ্রূমধ্যস্থলে 'উ' এবং আপন পূর্ব্বাবস্থার অতি নিকটে গিয়া 'ঁ' বা 'ং' ধ্বনির ন্যায় শুনাইতে লাগিল। অর্থাৎ বিক্ষেপণের আধিক্যবশতঃ প্রণবধ্বনি 'অ-উ-ম্' তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল।

প্রণবের 'অ-উ-ম্' এই ত্রিধা বিশ্লেষণ যে আরম্ভেই সুস্পষ্টরূপে সম্পাদিত হইয়াছে তাহা নহে। ইহার পূর্ব্বেও অতি মৃদু ক্রিয়া হইয়া বহুবিধ ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছে। যথা—জ্ঞানের প্রথম বিচ্যুতিতে ঈষৎ বিক্ষেপণের পর আবার প্রবল বেগে পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তির সময় যে ধ্বনির বিকাশ হয় তাহা 'ঔ'। ক্রমে ক্রিয়ার আরও বিকাশ-অবস্থায় যথাক্রমে 'ও ঐ এ ৯ ঋ' প্রভৃতি ধ্বনির বিকাশ হইয়া কণ্ঠে আসিয়া প্রকৃষ্ট 'অ' ধ্বনির উদ্ভব হয়। বলা বাহুল্য যে এই বিষয়গুলি ঠিক কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য অপরের উক্তি অপেক্ষা আপন অনুভবই বৃহত্তর প্রমাণ। আমরা যে বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের গৌরব অনুভব করিতে পারি না, তাহার মূল কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অভাব। ইতিহাসপাঠে জানা যায় মধ্যযুগে শুনিয়া বিশ্বাস করার প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মধ্যে অতিশয় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাই অন্ধ-বিশ্বাসের আবরণে ঢাকা পড়িয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞানরাজি আজ সভ্যজগতের শিক্ষা এবং গবেষণা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। সেই যুগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আজ দুর্ব্বল থিওরিতে পরিণত। কিন্তু শিক্ষা সভ্যতায় ভারতবাসী আজও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনুন্নত নহে। তাই আশা করা যায়, এই ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভববলে ভারতবাসী একদিন বিজ্ঞানজগতে নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে প্রকৃত শান্তি এবং মহিমাঅর্জ্জনের পথ-প্রদর্শন করিবে।

এইরূপে কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াই মানবদেহে ক্রিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান বুদ্ধি এবং দৃশ্যমান জগৎ এই কণ্ঠের ক্রিয়ার সহিত জড়িত। তাই প্রবল ক্রোধ বা একান্ত অনিচ্ছায় অথবা পরের প্রতি বাধ্য-বাধকতায় কোন কাজ করা প্রভৃতি কারণবশতঃ নিজের আত্মবোধের অভাব হইবার উপক্রম হইলে কণ্ঠে একটা প্রবল বেদনা অনুভূত হয়। ইহা যে কোন ব্যক্তিই আপন দৈনন্দিন জীবনে সামান্য আত্মদৃষ্টিবলে অনুভব করিতে পারেন। মোটের উপর কণ্ঠেই মানবের স্থিতি। তাই মানবের বর্ত্তমান 'অহং জ্ঞান' বা 'আমি'-বোধ এই কণ্ঠের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতেছে। মুখ খোলা অবস্থায় চক্ষু মুদিয়া উক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কণ্ঠে আকর্ষণক্রিয়া-বলে 'অ' এবং বিক্ষেপণক্রিয়া-বলে মূলাধার (দেহকাণ্ডের নিম্নতম স্থান) হইতে তাহা প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় উচ্চারিত হয় 'হ'। অর্থাৎ সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্রিয়ামূলে দেহে অনবরত 'অহ' 'অহ' এইরূপ শব্দ উঠিতেছে। পরিশ্রান্ত কুকুর হাঁপাইতে থাকিলেও দেখা যায় পরিস্কাররূপে তাহার কণ্ঠ হইতে 'অহ' 'অহ' ধ্বনি নির্গত হইতেছে। এই স্বাভাবিক

'অহ'-ধ্বনি হইতে আমাদের বর্ত্তমান আমি-জ্ঞান এবং তৎসংশ্লিষ্ট এই জগদ্‌জ্ঞান নিষ্পন্ন হইতেছে বলিয়াই সংস্কৃত ভাষায় 'আমি' শব্দকে 'অহং' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দৃশ্যমান জগৎকেও এই 'অহং'-এর অন্তর্গত বলা যায়। কারণ কণ্ঠ হইতে ক্রিয়া উপরে উঠিয়া মূর্দ্ধা তালু প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গেলে জগৎ আর অনুভূত হয় না। ইহা যোগিগণের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়। আর যখন ক্রিয়া প্রবলতাবশতঃ কণ্ঠ হইতে নামিয়া নীচে চলিয়া যায় তখনও যে 'আমি' এই জগৎকে অকাট্য সত্য বস্তু বুঝিতেছি সেই আমিই আর এই জগতের সত্যতা বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে পারিব না। অর্থাৎ তখন আমি নিদ্রাভিভূত হইয়া 'জগৎ নাই' এইরূপ অনুভব করিব। তাই বলা যায় এই 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত যে সমুদয় শব্দ বর্ত্তমান তাহারাই দৃশ্যমান জগতের কারণ বা বীজ। কোন বৈয়াকরণ বলিয়াছেন—

"অকারাদিহকারান্তা বর্ণমালা যয়া পুনঃ।
সমগ্রং বাঙ্‌ময়ং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা॥"

মানব কণ্ঠের জীব। তাই মানব যদি বর্ণগুলিকে তাহাদের উৎপত্তির ক্রমানুসারে বুঝিতে যায় তবে তাহাকে ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে আদিতে মৃদু মৃদু ক্রিয়ার সঙ্গে ক্রমশঃ উদ্ভব হয় ঔ ও ঐ........আ অ। কিন্তু মানব কণ্ঠের জীব বলিয়া তাহারা কণ্ঠ হইতে গণনা করিতে লাগিল—অ আ ই ঈ........ ও ঔ—এই ক্রমানুসারে। ইহাদিগকে বলা হয় স্বর বর্ণ বা স্বতঃ উচ্চারিত বর্ণ। কারণ কণ্ঠ হইতে স্বরূপ বা পূর্ব্ববর্ণিত নিষ্ক্রিয় অবস্থার স্বাভাবিক টানে ইহারা স্বতই উচ্চারিত হয়। এই স্বরবর্ণ-সমূহের উচ্চারণে স্বভাবতঃ কণ্ঠের ক্রিয়া উপরে উঠিয়া নিষ্ক্রিয় প্রণবের দিকে ধাবিত হয়। আবার দেখান হইয়াছে যে কণ্ঠের ক্রিয়াই আমাদের বর্ত্তমান 'আমি'-জ্ঞানের কারণ। সুতরাং স্বরবর্ণের অভ্যাস মানবের প্রাণকে আনন্দের অতিশয্যে আত্মহারা করিয়া ফেলে—'আমি'-জ্ঞানের বিলোপ সাধন করিয়া। কবি যখন চন্দ্রোদয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যদর্শনে আপন-ভোলা হইয়া পড়েন তখন স্বরবর্ণের টানে তাঁহার কণ্ঠগত ক্রিয়া উঠিয়া মূর্দ্ধা তালু প্রভৃতি স্থানে লীন হইতেছে মনে করিতে হইবে। তাই তাঁহার এত আনন্দবোধ।

আবার কণ্ঠের পর হইতে যে ধ্বনিসমূহের উদ্ভব হয় তাহাদিগকে উচ্চারণ করিতে হইলে কণ্ঠ হইতে নীচের দিকে ক্রিয়া সঞ্চালিত করিতে হয়। ক হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি এই পর্য্যায়ভুক্ত। ইহারা ব্যঞ্জন বর্ণ। উচ্চারণকালে কণ্ঠ হইতে নীচের দিকে ক্রিয়াসঞ্চালন করিতে হয় বলিয়া এই বর্ণগুলি মানবের কণ্ঠাত্মক 'অহ' ক্রিয়ার অন্তর্গত এবং এইজন্য ইহাদের উচ্চারণে মানবের কর্তৃত্ব আছে। সুতরাং ক খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণ মানবের অহং-জ্ঞানবিশিষ্ট অবস্থার যত ইতিভাব এবং অনুভূতির উদ্বোধক। এই বর্ণগুলিকে প্রণবের দ্বারা বিভিন্ন রূপে চালিত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াই একযুগে ভারতের ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ জগৎকে ইচ্ছামাত্রেই পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেন।

ব্যঞ্জনবর্ণ ও সৃষ্টিতত্ত্বের একযোগে সম্যক্‌-বিশ্লেষণ করিতে হইলে এক বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করিতে হয়। বর্ণের কার্য্যকারিতাশক্তি-বিষয়ক গবেষণাধারা বর্ত্তমান যুগে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিতে হইল।

ক্রিয়া এক স্থানে বার বার গমন করিয়া ফিরিতে থাকিলে ঐ স্থানে একটা গ্রন্থি, গাঁট

বা ঘাটের (knot) সৃষ্টি হয়। অহ ক্রিয়া ও সেইরূপ কণ্ঠ বক্ষ উদর নাভিমূল এবং লিঙ্গমূলে বার বার গমনাগমন পূর্ব্বক এক একটি ঘাটের সৃষ্টি করিয়া যথাক্রমে অ য র ল ব ধ্বনির সৃষ্টি করিল। এই পাচটি প্রধান ঘাটের প্রত্যেকটিতে আবার মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রা-ভেদে পাচটি করিয়া ধ্বনির উদ্ভব হইল। যথা—

অ—ক খ গ ঘ ঙ।
য—চ ছ জ ঝ ঞ।
র—ট ঠ ড ঢ ণ।
ল—ত থ দ ধ ন।
ব—প ফ ব ভ ম।

দেহের বিভিন্ন অংশের স্পন্দনে বিভিন্ন রূপ বস্তু অনুভূত হয়— পূর্ব্বেই এই কথার আভাস দেওয়া হইয়াছে। তাই এস্থলে ইহা বুঝা কঠিন হইবে না যে, এক এক ঘাটের অং যং প্রভৃতি ধ্বনি এক এক প্রকার জাগতিক বস্তু ও ভাবের কারণ। আবার সেই এক একটি ঘাটই ক্রিয়ার আধিক্যে পাঁচ পাঁচটি ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া সেই এক এক জাতীয় সৃষ্ট বস্তুকে পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিল। এই রূপে বর্ণমালাগত ধ্বনিগুলি সমগ্র সৃষ্ট জগৎকে মানবের বশবর্ত্তী করিবার এক একটি যন্ত্রস্বরূপ। শিক্ষিত হস্তে পড়িলে ইহাদের বলে যে মানব মহাশক্তি অর্জ্জন করিতে পারে তাহা ক্ষণকাল অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ক খ........ য র ল ব প্রভৃতি ধ্বনির বিকাশের পর সর্ব্বশেষে মূলাধারের শেষ প্রান্তে আসিয়া 'হ' ধ্বনির উদ্ভব হইল। তৎপর যে ধ্বনির বিকাশ হয় তাহা মানবদেহে ধারণার অযোগ্য। এই বর্ণের বিকাশ হইতে গেলে ক্রিয়া দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া মানবের মৃত্যু ঘটায়। তাই এই শেষ বর্ণের নাম বিসর্গ (ঃ) বা বিসর্জ্জনীয়।

বর্ত্তমান জগতে বহু ভাব এব বহু শব্দের আলোড়নে নিয়ত আলোড়িত মানবের নিকট এই ধ্বনি-বিজ্ঞান নিরর্থক এবং কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই ধ্বনিবিজ্ঞানই এক কালে ভারতের শ্রেষ্ঠ গবেষণার বিষয় ছিল। ধ্বনির একতানতা অভ্যাস করিতেন বলিয়া প্রাচীন ঋষিগণ প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন যে ধ্বনির দ্বারাই জগৎকে যদৃচ্ছা পরিবর্ত্তিত করা যায় এবং প্রয়োজন বোধ হইলে বিপরীত ধ্বনি অভ্যাস দ্বারা নিষ্ক্রিয় প্রণবে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক দুঃখময়, ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত জগদ্জ্ঞান হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার বিপদ এবং ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপৎপাত তৃণজ্ঞানে উপেক্ষা করিবার কৌশল তাঁহাদের করায়ত্ত ছিল।

সেই অপূর্ব্ব ধ্বনিশাস্ত্রের কথা আর কি বলিব! দেহের ব্যাধিপ্রশমন-ব্যাপারেও এই বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য ফল পরিলক্ষিত হইত। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ বুঝিতেন যে কামক্রোধাদি বিভিন্ন মনোবৃত্তির আধিক্যবশতঃ দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে ক্রিয়ার প্রবলতা হেতুই শরীরের অস্বাভাবিক ক্ষয় এবং রোগাদি হইয়া থাকে। তাই তাঁহারা ঐ সকল স্থানের ক্রিয়া-জনিত শব্দগুলির সহিত নাদবিন্দু যোগে মন্ত্র-রচনা পূর্ব্বক রোগীকে সেই মন্ত্রের জপ অভ্যাস করাইতেন। এইরূপে ঐ সকল অংশের অস্বাভাবিক বেগ কমিয়া গিয়া রোগীর দেহ সুস্থ ও নিরাময় অবস্থা লাভ করিত। সেই ধ্বনি-চিকিৎসা বা মন্ত্রচিকিৎসা এখন আর নাই। বর্ত্তমানে অজ্ঞ অশিক্ষিত এবং নিজবিদ্যার বিজ্ঞান-সম্মত সত্যতা প্রমাণ করিবার সামর্থ্যবিহীন বেদে এবং সাপুড়িয়াদের মধ্যে সেই মহাবিজ্ঞানের যে অতি সামান্য আভাস পাওয়া যায় তাহাও বর্ত্তমান ক্রিয়াবহুল এবং বহুধ্বনির স্পন্দনে স্পন্দিত মানবসমাজে তাদৃশ ফল প্রদর্শনে সমর্থ নহে।

শব্দবিদ্যার অভাবে ভারত আজ হৃতসর্ব্বস্ব সৌধমালার আকার ধারণ করিয়াছে। গবেষণা এবং অনুসন্ধিৎসার বিলোপে আজ শাস্ত্রাদির ধ্বনিবিষয়ক অনাদৃত পৃষ্ঠাসমূহ কাহারও প্রাণে কৌতূহল বা অনুভূতিসঞ্চারে অসমর্থ। শব্দের এই অপরিসীম শক্তির কথা যিনি শ্রবণ-মনন দ্বারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিবেন না তাঁহার নিকট ধ্বনির প্রভাব 'হিং টিং ছট্' রূপে প্রতিভাত হইবে মাত্র। বস্তুজগতের স্পন্দনসমূহ অবাধভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া স্বভাবের নিয়মে মানবদেহে বৃদ্ধি লাভ করার ফলে দৃশ্য জগৎ বর্ত্তমানে আমাদিগকে যখন যে রূপ বুঝায় তখন তদ্বিপরীত স্পন্দন দেহে উৎপাদন করার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাই বস্তুজগতের নিয়মাবলী রোগ শোক বিপদ আপদ রূপে মানবসমাজকে অনবরতই গ্রাস করিয়া মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তি এবং নিরাময় অবস্থাকে অবাস্তব কবিকল্পনায় পর্য্যবসিত করিতেছে। জড়বিজ্ঞানে সহস্রমুখী কর্ম্মধারা আজ প্রতিকারের বহু উপায় উদ্ভাবন করিয়াও মানবের এই দৈন্য ঘুচাইতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এক একটি পুরাতন রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শত শত নূতন রোগ দেখা দিয়া দেশকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। এই প্রগাঢ় বস্তুপরতন্ত্রতার কবলে পড়িয়া মানবের ইচ্ছাশক্তি দিন দিন হীনবল এবং ধ্বংসোন্মুখ—ইহা দেখিয়াও কি আমরা দেখিব না? শব্দবিদ্যার অভ্যাসে এই বস্তুপরতন্ত্রতার মোহজাল কাটিবে সত্য, কিন্তু সেই বিদ্যা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্পূর্ণ নূতন রূপে অভিনব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে অনাদৃত পুঁথিগত ধ্বনিশাস্ত্রে পরিণত হইবে; দুধের স্বাদ ঘোলের দ্বারাই মিটিয়া যাইবে। যাঁহারা আপন চক্ষুদ্বারা জগৎ দর্শন করিয়া থাকেন তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা-বলে বলীয়ান হইয়া আজ এই যুগ-সন্ধিক্ষণে লাঞ্ছিত ভারতবাসী আপনার বিলুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক এক মহান্ তেজোদৃপ্ত নব-জাতিতে পরিণত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

নিঃশব্দ পদক্ষেপ

(Noiseless Tread)

স্বামী পরমানন্দ

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যার হৃদয় দুয়ার বন্ধ থাকে না কোন দিন,
পদ-ধ্বনি তাঁর সেই শুধু পায় শুনিতে;
যার বাহির শ্রবণ রুদ্ধ রহে গো চিরদিন,
শব্দবিহীন তাঁর আগমন সেই পারে শুধু জানিতে।

বৈজ্ঞানিক ভ্যাণ্ট্ হফ্

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্-এস্‌সি

এই প্রবন্ধে আমরা এক জন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচিত হইব। ইনি রসায়নশাস্ত্রের এক জন প্রধান কর্ণধার ছিলেন। দুঃখের বিষয় অনেক ভারতবাসী আজও এই বৈজ্ঞানিকের নাম পর্য্যন্তও জানেন না। মহাত্মা ভ্যাণ্ট্ হফ্ ১৮৫২ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন রটারড্যাম্-এর (Rotterdam) একজন ডাক্তার। স্কুলে তিনি প্রথম না হইলেও উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার আর একটি প্রশংসনীয় গুণ ছিল, তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়া বহু পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ভ্যাণ্ট্ হফের রসায়নের প্রতি প্রীতি জন্মে অতি অল্প বয়স হইতেই। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইংরেজ রসায়নী ওয়াকার সাহেব লিখিয়াছেন: "স্কুলে যদি রসায়নসম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইত, ভ্যাণ্ট্ হফ্ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেন। তিনি রবিবার দিন পর্য্যন্ত গোপনে স্কুলে যাইয়া রসায়নসম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। সে সময় ভ্যাণ্ট হফের মধ্যে শিশুসুলভ চাপল্য অত্যন্ত বেশী ছিল; এজন্য তাঁহার পরীক্ষণের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল বিস্ফোরকের কাজ। কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার এই চঞ্চলতা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু ভ্যাণ্ট্ হফ্ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, তিনি নিজবাড়ীতে এ সমস্ত পরীক্ষণ চালু রাখিয়া কিছু কিছু অর্থও রোজগার করিতেন।"

স্কুল ছাড়িয়া কিছুদিন তিনি ডেলফ্‌ট্ পলিটেকনিক্ ইনষ্টিটিউট্-এ (Delft Polytechnic Institute) শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় একদিন স্থানীয় চিনির কারখানায় তাঁহার যাওয়ার সুযোগ হইয়াছিল। শিল্পকারখানায় একঘেয়ে যান্ত্রিক কার্য্যাবলী তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার মধ্যে অনেক ভাবধারা ছিল। তিনি বায়রন্ (Byron), বার্ণস্ (Burns) প্রভৃতি কবিদের কবিতা খুব পছন্দ করিতেন এবং মাঝে মাঝে তাহাতে ডুবিয়া থাকিতেন। এমনকি তাঁহার লেখনী হইতে কখনও কখনও সুন্দর সুন্দর কবিতা নির্গত হইত। ডেলফ্‌ট্ এর পুরাতন রাসায়নিক ও যান্ত্রিক ভাবধারা তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে এবং তিনি নূতন আলোর সন্ধান নিতে লিডেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যান; কিন্তু সেখানেও একই ভাব পরিলক্ষিত হওয়াতে বন্ (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কেকিউলির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে কবি-বৈজ্ঞানিকের স্বাভাবিক আনন্দ অনেকটা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। রাইন্ নদীর অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহার কবিহৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চার করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানেও তাঁহার থাকা সম্ভবপর হইল না। পণ্ডিত কেকিউলির ব্যবহার তাঁহার মনঃপূত না হওয়াতে তিনি এস্থান ত্যাগ করিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে প্যারিসে যাইয়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওয়ার্জ (Wurtz)-এর শিষ্য হন্। ওয়ার্জের অধীনে তাঁহার কাজ কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল বলা কঠিন। একজন সহপাঠী বলিয়াছেন: "গবেষণা-

গ্যারে ভ্যাণ্ট্ হফ্ কাজ এত কম করিতেন যে কেহই সে সময় তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না, কিন্তু এই শান্ত ধীর স্থির বালকের মধ্যে যে একটি বিরাট বিশ্ব-আলোড়নকারী সিদ্ধান্ত রূপায়িত হইতেছিল ওয়ার্জের সহকর্মী লা বেল পর্য্যন্ত তাহা একেবারে কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ভ্যাণ্ট্ হফ্ তাঁহার মতবাদ সুধীসমাজে প্রচার করিলে বড় বড় ধুরন্ধরগণ তাহা অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রসিদ্ধ শিক্ষকদ্বয় কেকিউলি ও ওয়ার্জ পর্য্যন্ত তাঁহার সূত্রকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও স্বীকৃত হন নাই। ভ্যাণ্ট্ ভাবিয়াছিলেন তাঁহার ওলন্দাজ ভাষায় লিখিত প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ সকলের বোধগম্য হইতেছে না। এজন্য তিনি ইহা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতেও কেহ তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন না হওয়ায় দীন যুবক প্রায় হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং রসায়ন হইতে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হতভাগ্য ভ্যাণ্ট্ হফ্ অবশেষে ইউট্রেক্টের পশু-চিকিৎসা বিদ্যালয়ে সামান্য সহকারিরূপে কাজ গ্রহণ করেন।

কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই স্রোত ফিরিয়া দাঁড়াইল। ১৮৭৫ খৃঃ একদিন হঠাৎ তিনি প্রসিদ্ধ জার্ম্মান রসায়নী ভিল্‌সেনাস্ (Wilcenus) এর নিকট হইতে একখানা পত্র পান। ভিলসেনাস্ ভ্যাণ্ট্ হফ্‌কে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রবন্ধের একটি জার্ম্মান সংস্করণ লিখিয়া নিজে অনুবন্ধ লিখিয়া দিতে স্বীকৃতি জানাইলেন। ১৮৭৬ খৃঃ সেই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পরও ধুরন্ধর ফরাসী বৈজ্ঞানিক কোল্‌বি (Kolbe) ভ্যাণ্ট্ হফ্‌কে আঘাত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি একবার লিখিলেন যে ভ্যাণ্ট্ হফ্ যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন তাহা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। এমন কি কোল্‌বি এও লিখিয়াছিলেন যে ভ্যাণ্ট্ হফের প্রতিপাদ্য বিষয় কোন দিন প্রমাণিত হইবে না। এই ফরাসী ধুরন্ধর ভিল্‌সিনাস্‌কেও আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আসলে ভিল্‌সিনাসের হস্তক্ষেপে খুবই কাজ হইয়াছিল। ২৬ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই মহাজ্ঞানী ভ্যাণ্ট্ হফ্ আমস্‌টারডাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম বক্তৃতায় 'বিজ্ঞানে কল্পনার স্থান' এই বিষয়টা আলোচনা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় সকলেই কতকটা ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন : "মানুষের মনে স্বতই উক্ত ভাবধারা প্রস্ফুটনোন্মুখ থাকে। ইহা সময় সময় ভবিষ্যতের মহান্ চিত্র মুখামুখি আনিয়া দেয় এবং তাহাদিগকে সত্যের দিকে ধাবিত করে।" ভ্যাণ্ট্ হফের এই অপূর্ব্ব মানসিক ভাব তাঁহার মানস মহিমা প্রচার করে। প্রায় অষ্টাদশ বৎসর তিনি আম্‌সটারডাম্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আবহাওয়ার কথা আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারি। যিনি আম্‌সটারডাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশেষ করিয়া যুক্ত তিনি জানেন সেখানে কোন কাজই গতানুগতিক পন্থায় অনুষ্ঠিত হয় না। সে স্থানের আবহাওয়া একটি অপূর্ব্ব রহস্যময় ভাবধারায় পরিপূর্ণ। এই গুহ্য অর্থময় বিষয়টি আর কিছুই নহে—একটা অনাবিল বিশ্বাস, যে বিশ্বাসকে কেহ কেহ অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া ঠাট্টা করিতে পারেন" ইত্যাদি।

এ সময় আমাদের এই মহাপণ্ডিত যুব-রসায়নী যে সত্য পথ নির্দ্দেশ করেন তাহা অনুসরণ করিয়াই ক্রমশঃ বর্ত্তমান ফিজিক্যাল

কেমিষ্ট্রির জন্ম হয়। রসায়নে ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি এক বিরাট শাস্ত্র। একমাত্র এই শাস্ত্রটির দ্বারা মনুষ্যসমাজের যে কল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহা কল্পনাতীত। একজন সুইডেনবাসী বলিয়াছেন: "ভ্যাণ্ট্ হফ্ প্রকৃতির আড়াল হইতে সত্য উদ্ঘাটন করিতে অনেক পূর্ব্বেই সফলকাম হইয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান প্রয়াস তাঁহার পূর্ব্ব চেষ্টাকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তিনি পৃথিবীর নিকট এক বিরাট গবেষণার চিত্র উন্মুক্ত করিয়াছেন।"

এ সময় জার্ম্মেনীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যাণ্ট্ হফ্‌কে নেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের ঐকান্তিক আহ্বান তিনি অবহেলা করিতে পারেন নাই। ১৮৯৬ খৃঃ তিনি তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আম্‌স্টারডামের একঘেয়ে খাটুনীতে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। প্রুসিয়ান্ সরকার তাঁহার সুখসুবিধার জন্য বিরাট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 'প্রুসিয়ান্ একাডেমী অব্ সায়েন্স'এ তিনি একঘণ্টা মাত্র বক্তৃতা করিতেন, অপর সমস্ত সময় তিনি গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন। এজন্য বার্লিনের মনোরম শহরতলীতে একটি বিরাট গবেষণাগার তাঁহার জন্য সুসজ্জিত ছিল। এখানে আসিয়া তিনি মহা শান্তিতে কাজ করেন এবং বহু ছাত্রের পথপ্রদর্শকরূপে বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এ সময় ষ্টাসফার্ট (Stassfurt) এ যে বিপুল স্তূপীকৃত লবণ ছিল, তাহা নিয়া তিনি যথেষ্ট গবেষণা করিয়া সম্পত্তিটি বিশ্ববাসীর জন্য উদ্ধার করেন।

ক্রমশঃ যুবক ভ্যাণ্ট্ হফ্ প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা যেন একটু মলিন হইতে লাগিল। ৫০ বৎসরে উপনীত হইলে তাঁহার বৈজ্ঞানিক উদ্দীপনা প্রায় নির্ব্বাপিত হইল। ইহার পরে তিনি অধিকাংশ সময় বিদেশভ্রমণে অতিবাহিত করিতেন। মনীষী ভ্যাণ্ট্ হফ্ ১৯১১ খৃঃ দেহরক্ষা করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ওয়াকার বলিয়াছেন: "আমার মতে ভ্যাণ্ট্ হফ্ সমসাময়িক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। যদি কেহ এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে চান, আমি বলিব ইহাতে আমাদের বিজ্ঞানের আরও উপকার হইবে।"

প্রকৃতপক্ষে কেহ যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না তাহার প্রমাণ নোবেল পুরস্কারটিই নির্দ্দেশ করিয়াছে। ভ্যাণ্ট্ হফের সময়ে সর্ব্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয় এবং ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া এই জয়মাল্যে ভূষিত হন।

ভ্যাণ্ট্ হফের প্রধান সমাধান সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। বিষয়টি অত্যন্ত গভীর। ভ্যাণ্ট্ হফের যেন দিব্য দৃষ্টি ছিল, তিনি আত্মার পরমাণুর রূপটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সেই রূপটিই ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। আজ বৈজ্ঞানিক জগৎ রসায়নী ও পদার্থবিদ্ উভয়ে নানা পরীক্ষণের মধ্য দিয়া ভ্যাণ্ট্ হফ্‌কে সমর্থন করিতেছেন।

এখানে অপর এক জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ওয়ার্জের সহকারী লা বেল-এর নাম উল্লেখ না করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। ইনিও স্বাধীনভাবে একই সূত্র আবিষ্কার করেন। এজন্য উক্ত সূত্রটিতে প্রায়শঃ উভয়ের নাম যুক্ত থাকে, কিন্তু ইনি সম প্রতিভাবান ছিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা

৺শরৎচন্দ্র বসু, বার-য়্যাট্-ল

অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। এ বিষয়ে কিছু বলিবার যোগ্যতা আমার নাই। যাহা হউক, তাঁহার শিক্ষার মধ্যে যাহা আমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইব। তাঁহার বাণী ও উপদেশাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য জাতির বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এগুলি আমাদের সকলের নিকটই অল্প-বিস্তর সহজলভ্য।

এই মহান্ ধর্মাচার্য গত শতাব্দীতে জগতের নিকট বাংলার বিশিষ্ট অবদান ছিলেন। সকলেই অবগত আছেন, এক শতাব্দী পূর্বে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মানবলীলা সংবরণ করেন। আমরা ভারতীয়গণ ও ভারতেতর দেশগুলির অধিবাসিবৃন্দ এই মহামানবের জীবদ্দশায় এবং আরও অধিক, লীলাবসানের পর তাঁহার মহতী শিক্ষাদ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছি।

যোগ্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় গুরুর শিক্ষা বিভিন্ন দিক হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলরও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশসমূহ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই সেদিন, ইদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—কলিকাতায় আহূত এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে মহাপুরুষের শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের উপর আরও নূতন কিছু বলা দুঃসাধ্য।

আমার মতে, জগতের বিভিন্ন ধর্মে উপদিষ্ট বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ও সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকৃতপক্ষেই বর্তমান যুগে ধর্মের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট দান।

পণ্ডিতগণের মধ্যে রাজা রামমোহনই নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনা-মূলক অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যথার্থই 'ধর্মবিজ্ঞানের জনক' বলা যায়। রামমোহন এইরূপে জ্ঞান আহরণ করিতে গিয়া বিভিন্ন ধর্মের সাধারণ তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামমোহনের এই তুলনামূলক অধ্যয়নের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই প্রত্যেক ধর্মের উৎপত্তি ও পতনের ক্রমিক স্তরসমূহ। প্রত্যেক ধর্মের নিম্নস্তরকে পরিবর্জন করিবার বিধি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে ইহা শোনা কিছুই আশ্চর্য নহে—'অতএব সকল ধর্মের মধ্যেই অসত্য বিদ্যমান আছে।'

এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার কথা আলোচনা করা যাক। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-সাধকরূপে বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, রামমোহনের মতো পণ্ডিতরূপে নয়। বিভিন্ন ধর্মের পৃথক উপাসনা প্রণালী ও অনুশাসনসমূহকে

আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যলাভের নিমিত্ত তিনি কঠোর তপস্যা করেন এবং প্রত্যেক মত ও পথে সাধন করিয়া ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন মত, এমন কি ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক ধর্মের যাবতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া এবং কোন একটি স্তরকেও পরিবর্জন না করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—"প্রত্যেক ধর্মই সত্য ; যত মত তত পথ"। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের প্রচারিত "প্রত্যেক ধর্মে সত্য আছে"—এই মতের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে ভুল করিলে চলিবে না।

রামমোহন যদি আমাদিগকে ধর্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্মের বিভিন্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়া ভগবদুপলব্ধির সাধনা শিক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ক্ষুদ্র অভিমতে, বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও শেষ পাদে যে দুই জন ধর্মাচার্য বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষার মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা জগতের কোন ধর্মের প্রতিই অসহিষ্ণু ছিল না। অন্যান্য মহান্ ধর্মাচার্যগণ নিজেদের মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নিজস্ব নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেন নাই। তিনি দায়স্বরূপ আমাদের জন্য কোন নূতন ধর্ম রাখিয়া যান নাই। ঈশ্বরলাভের জন্য তিনি কাহাকেও তাহার ধর্ম পরিবর্তন করিতে বলেন নাই এবং এরূপ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই। তাঁহার ধর্মোপদেশপ্রদান-প্রণালী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, অভিনব ও অদ্ভুতরূপে মৌলিক। তাঁহার শিক্ষা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ধর্মই ভগবদুপলব্ধির যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা দিয়া থাকে। উহাই ছিল তাঁহার শিক্ষার জলন্ত বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের কিছুকাল পূর্বে তদীয় অন্যতম শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ একদিন তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছিলেন—"জগদম্বে, যাহারা শুধু মতবাদে বিশ্বাসী তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে দিও না। আমার কথার ভিতর দিয়া ধর্মবিশ্বাস ব্যাখ্যা করিও না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অতি প্রারম্ভেই পূর্ববঙ্গীয়া মহীয়সী নারী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্রভাব তরুণ ভক্ত-সাধকের উপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কায করিয়াছিল। এই মহীয়সী সাধিকা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ভৈরবী কেবল বিদুষী ছিলেন না, তাঁহাকে মূর্তিমতী বিদ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" এই ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে চৌষট্টিখানা বিভিন্ন তন্ত্রের সাধনসকল এবং তৎসঙ্গে চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত-নির্দিষ্ট পঞ্চরস-উপলব্ধির শিক্ষা দিয়াছিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটি বঙ্গদেশের প্রধান ধর্ম। মতবাদ ও অনুশীলনে ইহারা বহুলাংশে পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী অনুসরণ করিয়াও চরম উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সহজেই পৌঁছিয়াছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী এই আপাতপ্রতীয়মান অসম্ভব কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাহায্য করিয়াছেন।

বিভিন্নধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে পরস্পর অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে—অনেক সময় এগুলি অবশম্ভ ও লজ্জাকর বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ হইতে আমরা

এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য এক ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণের অপর ধর্মাবলম্বীদের সহিত বাদ-বিসংবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হইবার কোনই কারণ নাই। বর্তমান বাংলায় তথা বর্তমান ভারতে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আমি কি ইহা আশা ও প্রার্থনা করিতে পারি, যে লোকোত্তর মহাপুরুষের দিব্য জীবনে সহস্র সহস্র বৎসরের কোটি কোটি মানবের অনুষ্ঠিত ধর্ম-সাধনা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহার সেই সমন্বয়মূলক সার্বভৌম শিক্ষা অনাগত ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর আরও ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হইবে? *

* বিগত শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আহূত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

নাহি ভুলি যেন

শ্রীউমারাণী দেবী

জীবন আমার জাগিবে তোমার পরশে,
মধুর পরশে—
এই বিশ্বাস এই অভিলাষ
চিত্তে রহুক হরষে,
গভীর হরষে।

নাহি ভুলি যেন তুমি আছ মোর,
রূপে রসে গানে করিয়া বিভোর,
নাহি ভুলি যেন পরাণে তোমার
পরম করুণা বরষে—
নিয়ত বরষে।

এই সংসার-সঙ্কট-পথে
যেতে হবে দুর্জ্জয় ;
শত বিঘ্নের কত বিভীষিকা
নিত্য দেখাবে ভয়।

বাস্তবতার কঠিন আঘাতে
নিত্য চাহিবে বেদনা জাগাতে
তবু যেন জানি তব জয়ে মোর
হবে জয় নিশ্চয়—
মোর হবে জয় নিশ্চয়।

জীবন-নাট্য ভাঙ্গিবে যখন
সমাপ্তিকার বাঁশী,
শিয়রে আমার সকরুণ সুরে,
বাজিবে নিভৃতে আসি।

মহা উল্লাসে সেদিন হৃদয়
স্মরিয়া তোমার চরণ অভয়
চলি যেন প্রভু পাইতে বিলয়
স্নিগ্ধ মধুর হাসি—
স্নিগ্ধ মধুর হাসি।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র

মিঃ এস এন মুখোপাধ্যায়

(২)

বিচারব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে বিচারকগণ এক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। কারণ, একমাত্র আদালতের মারফতেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা থাকিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এখানে দ্বৈতবিচার-ব্যবস্থা নাই। সুপ্রীম কোর্টকে সর্বোচ্চে রাখিয়া ভারতের সমস্ত আদালত লইয়া একটি বিচারপ্রতিষ্ঠান গঠিত। সুপ্রীম কোর্টের অধীনে প্রত্যেক উপরাষ্ট্রে এক একটি হাইকোর্ট এবং হাইকোর্টের অধীনে বহু নিম্ন আদালত আছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রত্যেক বিচারপতি প্রেসিডেণ্ট-কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকিতে পারিবেন। অন্যূন পাঁচ বৎসর ধরিয়া কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত অথবা ১০ বৎসর ধরিয়া আইন-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ভারতীয় নাগরিক সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্য। প্রেসিডেণ্টের মতে কোন ব্যক্তি আইনশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বিবেচিত হইলে তিনি তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অনাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে কিংবা তিনি অযোগ্য বিবেচিত হইলেও প্রেসিডেণ্টের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইবে না। প্রথমে পার্লামেণ্টের উভয় সভার প্রত্যেকটিতে অপসারণের আবেদন উত্থাপন করিয়া ঐ সভার মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত সদস্যগণের অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশের ভোটে সমর্থিত হইলে ঐ অধিবেশন-কালেই উহা প্রেসিডেণ্টের নিকট পেশ করিতে হইবে। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট এই সম্পর্কে যথাবিহিত আদেশ জারী করিবেন। শাসনতন্ত্রেই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন নির্ধারিত আছে। অবসরগ্রহণের পর সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি ভারতের কোন আদালত কিংবা অন্য কোন বিচারপ্রতিষ্ঠানে আইনব্যবসায় করিতে পারিবেন না। এই ভাবে দেখা যায় যে শাসনতন্ত্ররচয়িতৃগণ সর্বোচ্চ বিচারপ্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বিচারবিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে প্রেসিডেণ্টের সম্মতিক্রমে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি-গণকে সুপ্রীম কোর্টে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা

অন্য যে কোন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় অপেক্ষা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সুপ্রীম কোর্ট ব্যাপকতর ক্ষমতার অধিকারী। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টও সাধারণ আপীল

আদালত নহে। ইউনিয়ন গভর্নমেণ্ট এবং এক বা একাধিক উপরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে অথবা দুই কিংবা ততোধিক উপরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টই তাহার একমাত্র বিচারের অধিকারী; বিভিন্ন হাইকোর্টের যাবতীয় মামলায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া আইনের জটিলতা দেখা দিলে একমাত্র সুপ্রীম কোর্টই তাহার মীমাংসার স্থান। ১৯৪৭ সনের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন বলবৎ হইবার পূর্বে প্রিভি কাউন্সিলের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, দেওয়ানী মামলা এবং অপরাপর শ্রেণীর কতকগুলি মামলা-সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাও তদ্রূপ। কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর ফৌজদারী মামলায় উপরাষ্ট্রীয় হাইকোর্টসমূহের বিচারের বিরুদ্ধেও আপীল শুনিবার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের আছে। কেবলমাত্র ভারতের সমস্ত আদালতের নয়, ট্রাইব্যুনালের (সাধারণতঃ আদালত বলিতে যাহা বুঝায় এইগুলি সেই শ্রেণীর নয়) বিচার-সম্পর্কেও পুনর্বিবেচনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। ইহা ছাড়া শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত মৌলিক অধিকাররক্ষার ব্যাপারেও সুপ্রীম কোর্টকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কানাডার সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ইহার পরামর্শদানেরও বিশেষ অধিকার আছে।

হাইকোর্ট

সাধারণতঃ সুপ্রীম কোর্ট গঠনের পদ্ধতিতেই হাইকোর্টসমূহ গঠিত। এখানেও বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক নিযুক্ত এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের ন্যায়ই ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী। তবে হাইকোর্টের কোন বিচারপতির ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলেই তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে।

শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে হাই-কোর্টের অধিকার ও ক্ষমতা যে রূপ ছিল, এখনও সেই রূপই আছে; অধিকন্তু পূর্বে যে সমস্ত বিধিনিষেধের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইত তাহা অপসারিত হইয়াছে। এখন হইতে প্রত্যেক হাইকোর্টই স্বীয় এলাকায় বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী আদেশ জারী করিবার অধিকারী। রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রয়োগের যে সমস্ত বাধা ছিল, তাহা অপসারিত হইয়াছে এবং মাত্র স্বীয় এলাকার সকল আদালতের উপর নয়, ট্রাইব্যুন্যালের কার্যের উপরও ইহাকে পরিদর্শনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

উপরাষ্ট্র

শাসনতন্ত্রের প্রথম তপসিলের 'ক' ও 'খ' বর্ণিত উপরাষ্ট্রসমূহের (পূর্বেকার গভর্নর-শাসিত প্রদেশ ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্য) গভর্নমেণ্ট প্রায় কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টেরই অনুরূপ। প্রথম তপসিলের 'ক' ভাগে বর্ণিত কোন উপরাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা একজন গভর্নর। সাধারণতঃ রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি নিযুক্ত হইবেন; উক্ত তপসিলের 'খ' ভাগে বর্ণিত কোন উপরাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা প্রেসিডেণ্টের অনুমোদিত এক জন রাজপ্রমুখ। এই সকল উপরাষ্ট্রেও পার্লামেণ্টারী গভর্নমেণ্ট থাকিবে। ফলে গভর্নর কিংবা রাজপ্রমুখকে উপরাষ্ট্রীয় পরিষদের নিম্নতন সভার (ব্যবস্থাপরিষদ) নিকট সম্মিলিতভাবে দায়ী মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারেই কাজ করিতে হইবে।

প্রত্যেক উপরাষ্ট্রেই একটি করিয়া আইন পরিষদ আছে। গভর্নর অথবা রাজপ্রমুখ এবং কোন কোন উপরাষ্ট্রের নিম্নতন সভা (ব্যবস্থা-পরিষদ) ও উর্ধ্বতন সভা (ব্যবস্থাপক সভা) এবং কোন কোন উপরাষ্ট্রের কেবলমাত্র নিম্নতন সভা (ব্যবস্থাপরিষদ) লইয়া এই আইন-পরিষদ

গঠিত। পার্লামেণ্ট আইনবলে উর্দ্ধতন সভা (ব্যবস্থাপক সভা) ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন কিংবা নূতন গঠন করিতেও পারেন। উপরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়াই তথাকার ব্যবস্থাপরিষদ গঠিত হইবে। জনসংখ্যার প্রতি ২৫ হাজারের জন্য মাত্র একজন প্রতিনিধি হইবেন। কিন্তু ব্যবস্থাপরিষদের মোট প্রতিনিধির সংখ্যা পাঁচ শতের বেশী কিংবা ৬০ জনের কম হইতে পারিবে না। উপরাষ্ট্রের সর্বত্র প্রত্যেক নির্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্যা এবং প্রতিনিধির অনুপাত যথাসম্ভব একই রূপ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবস্থাপরিষদের আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসর। কোন উপরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা তথাকার ব্যবস্থাপরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী হইতে পারিবে না; তবে কোন অবস্থাতেই এই সংখ্যা ৪০ জনের কম হইতে পারিবে না। আইনবলে পার্লামেণ্ট অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার মোট সদস্যসংখ্যার অর্দ্ধেক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও শিক্ষকগণ লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; এক-তৃতীয়াংশ উপরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ-কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন (ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নহেন এইরূপ ব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে হইবে) এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ গভর্নর-কর্তৃক মনোনীত হইবেন। সাহিত্য বিজ্ঞান চারুকলা সমবায়-আন্দোলন সমাজসেবা অথবা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে ব্যুৎপন্ন কিংবা কার্যকর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতেই গভর্নরকে এই সকল সদস্য মনোনীত করিতে হইবে। রাষ্ট্রসভার ন্যায় ব্যবস্থাপক সভাও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না। রাষ্ট্রসভার ন্যায় ইহারও এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবেন।

উপরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের এক কিংবা উভয় সভার আইনপ্রণয়ন, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ব্যাপারের কার্যপদ্ধতি অল্পবিস্তর ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের উভয় সভার পদ্ধতির অনুরূপ। দুইটি সভা (ব্যবস্থা পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভা) বিশিষ্ট কোন উপরাষ্ট্রে কোন বিল সম্পর্কে উভয় সভার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তাহার মীমাংসার্থ যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের কোন ব্যবস্থা নাই। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নিম্নতন সভায় (ব্যবস্থাপরিষদ) কতকগুলি সর্তাধীনে দ্বিতীয় বার বিলটি গৃহীত হইলে, সেই সিদ্ধান্তই বলবৎ হইবে।

চীফ্ কমিশনার শাসিত প্রদেশ

শাসনতন্ত্রের প্রথম তপসিলের 'গ' ভাগে বর্ণিত উপরাষ্ট্রসমূহ ১৯০৫ সনের ভারত শাসন আইন আমলের চীফ্ কমিশনার শাসিত প্রদেশসমূহের অনুরূপ। রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট)-মনোনীত চীফ্ কমিশনার কিংবা লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর অথবা পার্শ্ববর্তী উপরাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্ট মারফত কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক শাসিত হইবে। এই সকল উপরাষ্ট্রে অধিকতর আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার দানের উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আইন সভা অথবা উপদেষ্টা পরিষদ কিংবা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে পারেন।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন থাকিবে। এই সকল অঞ্চলে শান্তি ও সুশাসনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি আইন করিতে পারিবেন।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের রক্ষাব্যবস্থা

তপশিলী ও উপজাতীয় এলাকা নামে অভিহিত কতকগুলি অনুন্নত অঞ্চলের শাসন-

পরিচালনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপসিলে উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের শাসনপরিচালনের নিমিত্ত কতকগুলি বিস্তৃত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলের শাসনকর্তৃপক্ষ এবং অধিবাসীদের (শাসনতন্ত্রে তপসিলী উপজাতি বলিয়া বর্ণিত) মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনই ইহার মূল নীতি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের জন্য শাসনতন্ত্রে কতকগুলি বিশেষ সংরক্ষণব্যবস্থা আছে। তপসিলী সম্প্রদায় ও তপসিলী উপজাতিগণের নিমিত্ত জনসংখ্যার অনুপাতে দশ বৎসরের জন্য লোকসভা এবং উপরাষ্ট্রীয় আইনসভাসমূহে আসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তপসিলী সম্প্রদায়, তপসিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় এবং য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নিমিত্ত শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত বিশেষ সংরক্ষণব্যবস্থা আছে, তাহা কি ভাবে কার্যে পরিণত করা হইতেছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি এক জন স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিবেন। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় সভায় এই সকল রিপোর্ট দাখিল করিবেন। ইহা ছাড়া এই ব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে, তপসিলী এলাকার শাসনব্যবস্থা ও উপজাতিগণের উন্নতি-বিধান সম্পর্কে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়ে এবং শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের তারিখ হইতে দশ বৎসর পরে একটি কমিশন নিয়োগ করিতে পারিবেন। অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা এবং অভাব-অভিযোগের তদন্ত করিয়া যথোচিত প্রতিকারের উপায় নির্ধারণকল্পেও রাষ্ট্রপতি মধ্যে মধ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কমিশনের রিপোর্ট পাইবার পর রাষ্ট্রপতি এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন পার্লামেণ্টকে তাহা জানাইতে হইবে।

ইউনিয়ন ও উপরাষ্ট্রের সম্পর্ক

এখন আইনপ্রণয়ন-অধিকারবণ্টন সহ ইউনিয়ন ও উপরাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক আলোচনা করা যাক। শাসনতন্ত্রের সপ্তম তপসিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা, উপরাষ্ট্রীয় তালিকা এবং যুক্ত তালিকা নামক তিনটি তালিকায় আইন প্রণয়নের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্গত যে কোন বিষয়ে পার্লামেণ্টের এবং উপরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্গত যে কোন বিষয়ে প্রথম তপসিলের 'ক' ও 'খ' ভাগে বর্ণিত উপরাষ্ট্রসমূহের পরিষদের আইন প্রণয়নের নির্ব্যূঢ় অধিকার রহিয়াছে। যুক্ত তালিকার অন্তর্গত বিষয়সম্পর্কে পার্লামেণ্ট ও এই বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদের আইনপ্রণয়নের অধিকার আছে। প্রথম তপসিলের 'গ' ভাগে বর্ণিত যে কোন উপরাষ্ট্র কিংবা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে কোন ব্যাপারেও (উপরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সহ) পার্লামেণ্টের আইনপ্রণয়নের অধিকার আছে।

ব্যবস্থাপক তালিকা

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় দেশরক্ষা, আণবিক শক্তি, পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়, নাগরিক অধিকার, রেলওয়ে, জাহাজী ব্যবসায়, বিমান-পরিচালন, ডাক ও তার বিভাগ, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স ইত্যাদি ৯৭টি বিষয় আছে; উপরাষ্ট্রীয় তালিকায় জননিরাপত্তা, পুলিশ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষা, কৃষি ও বন ইত্যাদি ৬৬টি বিভিন্ন বিষয় আছে এবং ফৌজদারী আইন, ফৌজদারী কার্যবিধি, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ,

চুক্তি, দেওয়ানী কার্যবিধি, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, ট্রেড্ ইউনিয়ন, শ্রমিককল্যাণ, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও ফ্যাক্টরী ইত্যাদি ৪৭টি বিষয় যুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কানাডার ন্যায় অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ যুক্ত তালিকা কিংবা উপরাষ্ট্রীয় তালিকায় যে সকল বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অপ্রত্যাশিত জাতীয় সঙ্কট দেখা দিলে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপে রাষ্ট্রসভা উপস্থিত সদস্যগণের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, জাতীয় স্বার্থরক্ষাকল্পে এই রূপ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন অথবা যুক্তিসঙ্গত, তবে ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট উপরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। যুদ্ধ অথবা বহিরাক্রমণ কিংবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ভারত কিংবা ইহার অন্তর্গত যে কোন অঞ্চলের নিরাপত্তা বিপন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে উপরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্গত যে কোন বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। দুই বা ততোধিক উপরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদে গৃহীত প্রস্তাববলে উপরাষ্ট্রীয় তালিকার যে কোন বিষয়ে পার্লামেণ্টকে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইলে, সেই সম্পর্কেও পার্লামেণ্ট আইনপ্রণয়ন করিতে পারিবেন। কোন বিষয় উপরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, সেই সম্পর্কে সন্ধি অথবা আন্তর্জাতিক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেও পার্লামেণ্ট আইনপ্রণয়ন করিতে পারিবেন।

যুক্ত তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয়ে পার্লামেণ্ট ও উপরাষ্ট্রীয় আইনপরিষদ-কর্তৃক রচিত আইনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনই বলবৎ হইবে; কিন্তু এই রূপ কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির বিবেচনা-সাপেক্ষে কোন উপরাষ্ট্রীয় পরিষদ-কর্তৃক রচিত আইনে এই সম্পর্কে ইতঃপূর্বে পার্লামেণ্টের রচিত অথবা বর্তমান আইনের বিরোধী কোন সর্ত থাকিলেও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিলে সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রে তাহা বলবৎ হইবে।

যে সকল ব্যাপারে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের অধিকার আছে তাহাদের সমস্তের উপরই ইউনিয়নের শাসনাধিকার আছে এবং উপরাষ্ট্রীয় পরিষদের আইন প্রণয়নের এলাকাভুক্ত যাবতীয় বিষয়ে উপরাষ্ট্রের শাসনাধিকার আছে। কিন্তু পার্লামেণ্ট ও উপরাষ্ট্রীয় পরিষদ উভয়েরই আইনপ্রণয়নের অধিকারভুক্ত কোন বিষয়ের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে কিছু উল্লিখিত না থাকিলে কিংবা পার্লামেণ্টে রচিত কোন আইনবলে ক্ষমতা না দেওয়া হইলে উহার শাসনব্যাপারে ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টের কোন ক্ষমতা থাকবে না।

রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার

বৃটেন কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার অনুকরণে ভারত এবং প্রত্যেক উপরাষ্ট্রের জন্য যথাক্রমে একটি রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার ও উপরাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্ট ও উপরাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত সমস্ত রাজস্ব যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার ও সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে জমা হইবে। পার্লামেণ্ট অথবা উপরাষ্ট্রীয় পরিষদে (অবস্থাবিশেষে যেখানে যেরূপ প্রয়োজন) গৃহীত যথাবিহিত আইনবলে মঞ্জুর ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় অথবা উপরাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের অর্থ খরচ করা যাইবে না—এই ভাবে আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেণ্টের

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পার্লামেন্ট অথবা সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রীয় পরিষদের মঞ্জুরী-সাপেক্ষে আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে ভারত এবং প্রত্যেক উপরাষ্ট্রের জন্য একটি করিয়া 'বিশেষ তহবিল'-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

ইউনিয়ন ও উপরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনব্যাপারে ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইনের প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থাই আছে। অধিকন্তু শাসনতন্ত্রে একটি অর্থনৈতিক কমিশন (ফাইন্যান্স কমিশন) গঠনের ব্যবস্থা আছে। এই কমিশন কতকগুলি করের নিট আয় ইউনিয়ন ও উপরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বণ্টন এবং কোন উপরাষ্ট্রকে কত দেওয়া হইবে তাহার পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবেন। রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার হইতে কোন্ নীতি অনুসারে উপরাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য দেওয়া হইবে সেই বিষয়েও কমিশন রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব পেশ করিবেন।

নিরপেক্ষ হিসাবপরীক্ষক

ইউনিয়ন এবং উপরাষ্ট্রের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক একজন 'কণ্ট্রোলার' এবং 'অডিটর জেনারেল' নিয়োগের ব্যবস্থা এই শাসনতন্ত্রে আছে। ইউনিয়ন ও উপরাষ্ট্রসমূহের রাজস্ব এবং বিশেষভাবে পার্লামেন্ট অথবা উপরাষ্ট্রীয় পরিষদ কর্তৃক যথাবিহিত আইনবলে মঞ্জুরীকৃত পরিমাণ অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ কমবেশী না হয় ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখাই 'কণ্ট্রোলার' এবং 'অডিটর জেনারেলে'র প্রধান কাজ। এই হেতু তাঁহার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতরাষ্ট্রের সর্বত্র স্বাধীনভাবে ব্যবসাবাণিজ্য এবং আদানপ্রদান করা যাইবে। কিন্তু প্রয়োজন-বোধে জনস্বার্থের খাতিরে পার্লামেন্ট এবং উপরাষ্ট্রীয় পরিষদসমূহ এই সম্পর্কে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রভাষা

হিন্দীই ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রে প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষা অথবা হিন্দী ভাষাকে তথাকার সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক উপরাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্র-প্রবর্তনের তারিখ হইতে ঊর্ধ্বপক্ষে ১৫ বৎসর পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাই সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকিবে। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের কার্য পরিচালনে এবং বিল নির্দেশ-নামা ও অন্যান্য আইন রচনায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জরুরী ক্ষমতা

যুদ্ধ বহিরাক্রমণ কিংবা আভ্যন্তরীণ গোল-যোগের ফলে সমগ্র ভারত কিংবা উহার কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে শাসনতন্ত্রে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। দুই মাসের মধ্যে এইরূপ ঘোষণা-সম্পর্কে পার্লামেন্টের উভয় সভার অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; অন্যথায় দুই মাস পর এই জরুরী অবস্থা ঘোষণার আদেশ বাতিল হইয়া যাইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এইরূপ ঘোষণার ফলে এই আদেশ বলবৎ থাকাকালে উপরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়-সম্পর্কেও পার্লামেন্ট আইনপ্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং কি ভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইবে সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে কোন উপরাষ্ট্রকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

বহিরাক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের হাত হইতে প্রত্যেক উপরাষ্ট্রকে রক্ষা করা এবং শাসনতন্ত্রানুযায়ী তথাকার গভর্নমেন্ট-পরিচালনের

ব্যবস্থা করার ভারও ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। কোন উপরাষ্ট্রের গভর্নর কিংবা রাজপ্রমুখের নিকট হইতে কিংবা অন্য কোন সূত্রে রিপোর্ট পাইয়া শাসনতন্ত্রানুযায়ী গভর্নমেণ্ট-পরিচালনের অযোগ্য অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে রাষ্ট্রপতি ঘোষণাবলে সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রের হাই কোর্টের ক্ষমতা ব্যতীত তথাকার গভর্নমেণ্টের সমস্ত অথবা আংশিক ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে পার্লামেণ্ট কর্তৃক কিংবা ইহার কর্তৃত্বে সংশ্লিষ্ট উপরাষ্ট্রীয় পরিষদের কার্যনির্বাহ হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। এই রূপ প্রত্যেক ঘোষণাই জারীর তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে পার্লামেণ্ট-কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং পার্লামেণ্টের পুনরনুমোদন ভিন্ন ইহা ছয় মাসের বেশী বলবৎ থাকিবে না এবং কোন অবস্থায়ই ইহা তিন বৎসরের বেশী বলবৎ থাকিতে পারিবে না। কোন উপরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলে স্বাভাবিক অবস্থায় উপরাষ্ট্রীয় এলাকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্র হইতে তথায় দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এই ব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব কিংবা ভারত অথবা উহার যে কোন অংশের সুনাম নষ্ট হইবার কোনরূপ কারণ দেখা দিলে অর্থনৈতিক ব্যাপার নির্দেশে বর্ণিতরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত যে কোন উপরাষ্ট্রের উপর রাষ্ট্রপতি নির্দেশ জারী করিতে পারিবেন।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

উপসংহারে শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধনপদ্ধতি অপরাপর শাসনতন্ত্রের পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক সহজ। প্রতিনিধি-সভা কিংবা গণভোটের সাহায্যে সংশোধনের শ্রমসাধ্য ব্যবস্থা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেবল মাত্র কতকগুলি বিধানের, যথা—সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট সংক্রান্ত বিধান, কেন্দ্র ও উপরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা বণ্টন, আইনপ্রণয়ন-সংক্রান্ত তিনটি তালিকা, পার্লামেণ্টে উপরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিত্ব এবং শাসনতন্ত্রসংশোধন-পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধানাবলীর সংশোধন সম্পর্কে উপরাষ্ট্রীয় পরিষদসমূহের মোট সংখ্যার অন্ততঃ অর্ধেকের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। ইহা ছাড়া শাসনতন্ত্রের অন্য সমস্ত বিধান পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সভার মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের এবং প্রত্যেক সভার উপস্থিত সদস্যগণের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের বলে পার্লামেণ্টই সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের আমল হইতে নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে রূপান্তরিত হইবার প্রয়োজনীয় বিধানও শাসনতন্ত্রে করা হইয়াছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ নয়। এখানে ইহার মাত্র কয়েকটি মুখ্য বিষয়ের আলোচনা করার চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ হইতে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের রচয়িতৃগণ জগতের অধিকাংশ আধুনিক শাসনতন্ত্রের কার্যকারিতায় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হইয়াই ইহা রচনা করিয়াছেন। এই শাসনতন্ত্রে কেবলমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তিই প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই, যেরূপ গভর্নমেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা ইহাতে আছে, সুচারুরূপে পরিচালিত হইলে এই গভর্নমেণ্ট সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন এবং দেশের সংহতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতিকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

পয়লা বৈশাখ

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত

পয়লা বৈশাখের কী যাদু! মাসের প্রথম, বৎসরের প্রথম—যুগের শতাব্দীর মন্বন্তরের প্রথম দিন কী বৈশিষ্ট্য নিয়েই না আসে! দিনের প্রথম উষা, রাত্রির প্রথম সন্ধ্যা পায়নি কি মানুষের কাছে বিশেষ এক অর্থ—অনন্য-সাধারণ এক মূল্য ?

নবগতির সূত্রপাতকে, নষ্টের পুনরুদ্ধারকে, হারানোর ভূয়ঃ আবিষ্কারকে আমরা বারবার অভিনন্দিত করি—পয়লার মধ্যে। এই পয়লা, এই প্রথমের এক মূর্ত্তিকে বৈদিক ঋষিরা 'অহনা' বা 'উষা' নামে অভিহিত করেছিলেন—"আত্মারুণাম্ উষঃ" (ঋগ্বেদ)। এই দেবীকে আহ্বান করে বলেছিলেন—"উদীর্ধ্বং গীতো অসুর্ন আগাৎ অপ প্রাগাৎ তম আ জ্যোতিরেতি" —ওঠ, ওঠ জীব, বীর্য্য আমাদের এসেছে, দূরে চলে গিয়েছে তম, এসেছে আবার জ্যোতি।

নূতন দিন আমাদের পক্ষে নবজন্মের, নবোন্মেষের প্রতীক। কালের নিরবচ্ছিন্ন গতির মুখে আমাদের আশা-ভরসা, শক্তি-সামর্থ্য, ঐতিহ্য-সিদ্ধি সব ম্লান হয়ে, ক্ষয় পেয়ে, লুপ্ত হয়ে চলেছে। নূতন দিনের সংকল্পবীর্য্যে আমাদের মধ্যে যা কিছু মুমূর্ষু তা সঞ্জীবিত, যা কিছু ক্ষয়িষ্ণু তা বর্দ্ধমান হয়ে উঠুক।

বৈশাখের রুদ্রবাণীতে পুরাণো বছরকে বিদায় জানিয়ে কবিগুরুর ভাষায় নববর্ষকে আহ্বান করি :

"হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে,
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।"

কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে আরো বলি :

"ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক্ ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।"

পৌর্ণমাসী রজনীর জ্যোৎস্না-প্লাবনের মধ্যে পুরাতন বর্ষ শেষ হয়ে গেল—তুঙ্গ রবির দীপ্ত প্রাখর্য্যের মধ্যে আরম্ভ হল নূতন বর্ষ। মহাব্যোম যেমন করে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে তেমনি মহাকালের বুকেই চলেছে মন্বন্তর শতাব্দী যুগ বৎসর প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন বিভক্ত খণ্ডিত কালের অনন্ত প্রবাহ। অনন্তকে সান্ত না করে আমরা ধারণা করতে পারি না, অরূপকে রূপের মধ্যে না দেখলে আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। হজরত মহম্মদ বলেন : "আল্লার বহু নিদর্শনের মধ্যে দুটি—চন্দ্র ও সূর্য্য।" গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন :

"জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্
নক্ষত্রাণামহং শশী।"

আজিকার নববর্ষের প্রভাতে একটা অতিক্রান্ত যুগের ধ্বংসের মহাশ্মশানে বসে দেখছি, দিগন্তপথ বিদীর্ণ করে মহাকালের কত অভাবনীয় আবির্ভাব! যে দেশে বহু সহস্র বৎসর ধরে উত্তরায়ণের অসংখ্য অভিযাত্রীর সাধনায় আবিষ্কৃত হয়েছে—কত ঋষি সাধু ও প্রবক্তার বিরাট জ্যোতির্বাহিনীর মুখে ধ্বনিত,

ঘোষিত হয়েছে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" রূপ মহাসত্যমন্ত্র, সেই দেশেই আজ অনীশ নাস্তিক্যবাদের কী নির্লজ্জ প্রসার! নববর্ষে আমরা বিশেষরূপে কামনা করব আমাদের মধ্য হতে বহিরাগত এই নাস্তিক্য-বাদের পূর্ণ অপসারণ। মার্ক্সবাদের নামে আমাদের দেশে ভগবানের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য্য চলেছে তার মধ্যে যথেষ্ট গোঁড়ামি রয়েছে—বৈজ্ঞানিকের মনোভাব এ আদৌ নয়। কর্ত্তাভজার সংখ্যা এই হতভাগ্য দেশে একেবারেই স্বল্প নয়। মার্ক্সবাদের পতাকা উড্ডীন করে দেশে যদি নূতন একদল কর্ত্তা-ভজার আবির্ভাব হয় তবে সেটা হবে জাতির পক্ষে পরম দুর্ভাগ্যের কথা। দেশের প্রগতি-বিরোধী, ঐতিহ্যবিরোধী সেই অপপ্রচার জাতি কখনো ক্ষমা করবে না! রাশিয়ার আকাশতলে যে শ্লোগান উচ্চারিত হবে—ভারতবর্ষের আকাশে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি না তুললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে—এমন মনে করবার কোনই কারণ নেই। ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষ, রাশিয়া নয়। মার্ক্সের বাণীর হুবহু প্রতিধ্বনি করবার জন্য ভারতবর্ষ বেঁচে নেই। সে বেঁচে আছে তারই তপোবনের মৃত্যুহীন বাণী দিয়ে জগতকে রূপান্তরিত করবার জন্য। অপরের অন্ধ অনুকরণ করবার বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত হয়ে কবে আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শিখব?

বর্ষারম্ভে আমরা শ্রীঅরবিন্দের নিম্নোদ্ধৃত বাণীর মধ্যে মহাকালের অব্যর্থ পথের নির্দ্দেশ খুঁজে পেয়ে তারই আলোকে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টি-গত জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করবার সংকল্প গ্রহণ করব: "দীর্ঘ যুগের বহু পরীক্ষা ও সমীক্ষার পর আজ আমরা পৌঁছেছি আদর্শবাদের দুটি প্রত্যন্ত কোটির সামনে এসে, অন্যোন্যবিরোধী এই দুটি লক্ষ্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে মানুষ অক্লান্ত তপস্যায় তার অনুভবকে করেছে শাণিত, কিন্তু কঠোর সাধনার চরমে সে যা পেল, সে যে সম্যক দর্শনের অনুকূল, বিশ্বমানবের সহজবুদ্ধি আজ তা স্বীকার করতে চাইবে না। অথচ এ বিষয়ে তার রায়ই চূড়ান্ত, কেন না এই সহজবুদ্ধিই বিশ্বসত্যের রক্ষক ও প্রতিভূ। ইউরোপে আর ভারতে যথাক্রমে জড়বাদীর 'নাস্তিবাদ' আর বৈরাগীর 'নেতিবাদ' উদাত্তকণ্ঠে হয়েছে ঘোষিত, তারস্বরে উভয় পক্ষই বলেছেন, এই তো মানুষের জীবন-বেদ, এছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। ভারতবর্ষ নেতিমন্ত্রে কুবেরের ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত করেছে অধ্যাত্মলোকে, একথা মিথ্যা নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে তার জীবন হয়েছে দেউলিয়া। তেমনি ইউরোপ উপকরণের বাহুল্যে, পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যের অকুণ্ঠিত উপায়ে পৌঁছেছে ঋদ্ধির চরমে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার আত্মা হয়েছে ফতুর; জড়বাদে জীবনসমস্যার সকল সমাধান খুঁজতে গিয়ে তার বুদ্ধিও আজ অতৃপ্ত, অশান্ত।

অন্যোন্যবিরোধী দুটি জীবনাদর্শ এমনি যে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ, একে শুভ লক্ষণই বলতে হবে, কেন না এতে দুয়ের মাঝে যে ন্যূনতা ছিল, আজ তা ধরা পড়েছে বিবেকীর দৃষ্টিতে। 'নেতি' বা 'নাস্তি'—কোনও মন্ত্রেই এখন মানুষের মন শান্ত হবার নয়; তার অন্তরের অভীপ্সা এবার মহত্তর, নূতনতর 'ইতি'র পানে, অন্তরের অনুভবে এবং জীবনের কর্ম্মে সে চায় প্রাণের প্রসার, এবং তাই দিয়ে, কি ব্যক্তিতে কি জাতিতে সে খুঁজছে অখণ্ড মানবতার সার্থক আত্মরূপায়ণ।" ('দিব্যজীবন'—১ম খণ্ড, পৃঃ ১১)

আজ নবযুগের তোরণদ্বারের পানে মহা-কালের এই অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত আমাদের নব-প্রেরণায় উজ্জীবিত, নূতন আশায় উদ্বোধিত করুক।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি

মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্লাউড্

অনুবাদক—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

(৩)

স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে লিখলেন। আমাদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে লাহোর দিল্লী আগ্রা কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেখাতে তিনি সারদানন্দজীকে আদেশ দিলেন। স্বামীজী এদিকে সোজা কলকাতা রওনা হলেন। আমাদের পৌছবার পূর্বেই তিনি বেলুড়ে আমাদের ঐ ছোট ঘরটিতে মঠ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। আমাদের পক্ষে ঐ বাড়ীতে আর যাওয়া সম্ভব ছিল না; তাই আমরা আরও দু'মাইল দূরে বালিতে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করলাম। পাশ্চাত্য দেশে ফিরে যাবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ওখানে ছিলাম।

মঠপ্রতিষ্ঠার জন্য মিসেস্ অলি বুল অনেক হাজার ডলার দিয়েছিলেন। আমার খুব অল্পই ছিল; আট শ ডলার সঞ্চয় করতে আমার বেশ কয়েক বছর লেগেছিল। একদিন আমি স্বামীজীকে বল্লাম: "আমার কাছে অল্প কিছু আছে; আপনি তা' কাজে লাগাতে পারেন।" তিনি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন: "বল কি? আছে না কি?" আমি বল্লাম: "হাঁ, আছে।" "কত আছে তোমার?" তিনি জানতে চাইলেন। আমি উত্তর দিলাম: "আট শ ডলার।" তক্ষুণি তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: "যাও, একটা ছাপাখানা কিনে ফেল।" তিনি ছাপাখানা কিনলেন; তাতে রামকৃষ্ণ মিশন-প্রকাশিত বাংলা মাসিকপত্র 'উদ্বোধন' বেরতে লাগল।

১৮৯৯, জুলাই মাসে স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ইংলণ্ডে আবার এলেন। সেখানে ভগিনী ক্রিশ্চিন্ আর মিসেস্ ফাঙ্ক্ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ওখান থেকে তিনি আমেরিকা চলে আসেন। ঐ বছর সেপ্টেম্বরে তিনি রিজ্‌লি ম্যানরে আমাদের কাছে আসেন। এখানে আমরা তাঁর জন্য এবং তাঁর দুই সন্ন্যাসী গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের জন্য একটি কুটির ছেড়ে দিলাম। নিবেদিতাও সেখানে ছিলেন, মিসেস্ অলি বুলও ছিলেন। যাঁরা স্বামীজীকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন তাঁদের নিয়ে হল দস্তুরমত এক গোষ্ঠী। তিনি আমার বোন্ মিসেস্ লেগেট্‌কে 'মা' বলে ডাক্‌তেন; সব সময় খাবার টেবিলে তাঁর পাশে বসতেন। স্বামীজী বিশেষ করে চকলেট্ আইস্ ক্রীম্ পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন: "আমি চকলেট্ ভালবাসি, কারণ আমিও ত চকলেট্।" একদিন আমরা ষ্ট্রবেরি (strawberry) খাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে এক জন তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলেন: "স্বামীজী, আপনি কি ষ্ট্রবেরি পছন্দ করেন?" তিনি উত্তর দিলেন: "এর স্বাদ আমি কখনও নিই নি।" "আপনি কোন দিন খাননি! তবে এখন রোজ খাচ্ছেন কেন?" তিনি বল্লেন: "এর ওপর ক্রীম্ লাগানো আছে যে। ক্রীম্ লাগালে পাথরও ভাল লাগবে!"

বিকেল বেলা রিজ্‌লি ম্যানরের হলঘরে বেশ বড় একটা উনুনের পাশে বসে, তিনি আলাপ-আলোচনা করতেন। একবার কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী যখন কোন বিষয়ে তাঁর মত প্রকাশ করলেন,

তখন একজন মহিলা বলে উঠলেন: "স্বামীজী, আমি এবিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত নই।" "একমত নও? তা'হলে এ তোমার জন্য নয়" —তিনি উত্তর দিলেন। আর একজন বল্লেন: "আমি কিন্তু এ বিষয়েই আপনাকে সত্য মনে করি।" "তা হলে এটি তোমার জন্যই।" ভদ্রলোকটির মতকে চূড়ান্ত সম্মান দিলেন স্বামীজী। একদিন বিকেলের আলোচনাসভায় দশবার জন শ্রোতা ছিলেন; স্বামীজী এত উচ্ছ্বসিত আবেগে বলছিলেন যে স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল হয়ে সুদূরে বিসর্পিত হয়ে পড়েছে! বিকেলের পর রাত্রির অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল তখন মন্ত্রমুগ্ধ আমরা পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এমন অভাবনীয় পূত প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে! এর পর আমার বোন্ মিসেস্ লেগেট্ একটি ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন, নিমন্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে এক ভদ্রমহিলা—তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদিনী—কাঁদছেন। "ব্যাপার কি?" আমার বোন জিজ্ঞেস্ করলেন। মহিলাটি বল্লেন: "ইনি আমাকে অনন্ত জীবনের সন্ধান দিলেন। আমার সব শোনা হয়ে গেছে—আমি আর তাঁর কথা শুনতে চাই না।"

স্বামীজীর রিজলি ম্যানরে অবস্থানকালে আমাদের নিকট এক ভদ্রমহিলা চিঠি লিখলেন। তাঁকে আমরা চিনতাম না। তিনি লিখেছেন, আমাদের একমাত্র ভাই লস্ এঞ্জেলেস্-এ পীড়িত; পত্রলেখিকার আশঙ্কা সে মারা যাবে, আমাদের তা জানা দরকার। আমার বোন আমাকে বল্লেন: "আমার মনে হয় তোমার যাওয়া উচিত।" আমি উত্তর দিলাম: "নিশ্চয়ই।" দু'ঘণ্টার মধ্যে আমি তৈরী হয়ে পড়লাম; ঘোড়ার গাড়ী দরজার সামনে এসে উপস্থিত হল; চার মাইল গাড়ী হেঁকে রেল ষ্টেশনে যেতে হবে। আমি যখন ঘর থেকে বেরলাম, স্বামীজী হাত তুলে একটি সংস্কৃত আশীর্বাণী উচ্চারণ করে আমাকে বল্লেন: "ওখানে কয়েকটি ক্লাশের বন্দোবস্ত কর, আমিও আসব।" আমি সোজা লস্ এঞ্জেলেস্-এ গেলাম। শহরটির প্রান্তে একটি ছোট শুভ্র পরিচ্ছন্ন কুটিরে অসুস্থ ছিল আমার ভাইটি। কুটিরটি অজস্র গোলাপে পূর্ণ। ভাইয়ের বিছানার ওপর দেখলাম স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি। দশ বছর ভাইটিকে আমি দেখিনি। এক ঘণ্টা তার সঙ্গে কথা বলার পর, তার অসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস্ করা হয়ে গেলে আমি গৃহকর্ত্রী মিসেস্ ব্লজেটের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে বল্লাম: "আমার ভাইটি ত খুব অসুস্থ।" তিনি উত্তর দিলেন: "তা ত বটেই।" "আমার মনে হয় সে বাঁচবে না।" তিনি উত্তর দিলেন: "হাঁ, তাইই।" "সে যেন এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে—" আমি বল্লাম। তিনি উত্তর দিলেন: "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" তার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম: "আচ্ছা, আমার ভাইয়ের বিছানার উপর যাঁর প্রতিকৃতি রয়েছে উনি কে?" সপ্ততিবর্ষোচিত গাম্ভীর্যে নিজকে সামলে নিয়ে সেই বর্ষীয়সী মহিলা বল্লেন: "পৃথিবীতে যদি কোন ভগবান থাকেন, তবে এই ব্যক্তিই।" "তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?" আমি জিজ্ঞেস্ করলাম। তিনি উত্তর দিলেন: "১৮৯৩ সনে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন সেই যুবক দাঁড়িয়ে বল্লেন 'আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতাগণ', তখন অজ্ঞাত একটা কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে সাত হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে দেখতে পেলাম দলে দলে মেয়েরা তাঁর কাছে আসবার জন্য বেঞ্চগুলি ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছেন। আমি মনে মনে নিজকে

বল্লাম 'তুমি যদি এই দুর্দম ভাবোচ্ছ্বাস সামলে নিতে পার তা হ'লে তুমি নিশ্চয়ই একজন দেবতা'।" তখন আমি মিসেস্ ব্লজেট্‌কে বল্লাম: "আমি তাঁকে চিনি।" "আপনি তাঁকে জানেন?" তিনি জিজ্ঞেস্ করলেন। আমি উত্তর দিলাম: "হাঁ, নিউ ইয়র্কের ক্যাট্‌স্‌কিল পর্বতে ষ্টোন্ রিজ একটি ছোট গ্রাম। গ্রামটিতে দু'শ লোকের বাস। ওখানে আমি তাঁকে রেখে এসেছি।" তিনি আবার বল্লেন: "আপনি তাঁকে জানেন?" আমি জিজ্ঞেস্ করলাম: "তাঁকে এখানে আসতে অনুরোধ করেন না কেন?" তিনি সবিস্ময়ে বল্লেন: "আমার কুটিরে আসতে বলব?" "তিনি নিশ্চয়ই আসবেন"—আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যে আমার ভাই মারা গেল; ছয় সপ্তাহের মধ্যে স্বামীজী ওখানে এলেন; তিনি তাঁর ক্লাশ আরম্ভ করলেন প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল-স্থিত ক্যালিফোর্নিয়ায়।

আমরা কয়েক মাস মিসেস্ ব্লজেটের অতিথি ছিলাম। তাঁর ছোট বাড়ীটিতে ছিল তিনটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি খাবার ঘর, আর একটি বৈঠকখানা। প্রতি দিন সকাল বেলা আমরা শুন্‌তাম স্বামীজী স্নানের ঘরে সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করছেন। স্নানের ঘর ছিল রান্নাঘর থেকে একটু দূরে। তিনি উস্কখুস্ক চুল নিয়ে বেরিয়ে প্রাতরাশের জন্য তৈরী হতেন। মিসেস্ ব্লজেট্ উপাদেয় কেক্ তৈরী করতেন; রান্নাঘরের টেবিলে তা আমরা খেতাম; স্বামীজী আমাদের সঙ্গে বসতেন। মিসেস্ ব্লজেটের সঙ্গে তাঁর কত আলোচনাই হত, কতই না কথা কাটাকাটি, কতই না হাস্যকৌতুক! মিসেস্ ব্লজেট্ বলতেন পুরুষদের বদমায়েসী বুদ্ধির কথা, আর স্বামীজী পাল্টা বলতেন মেয়েদের আরও বেশী দুষ্টুমির কথা! মিসেস্ ব্লজেট স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে বড় একটা যেতেন না; তিনি বলতেন: "আপনারা ফিরে এলে আপনাদের উপাদেয় তৃপ্তিকর খাবার দেওয়াই আমার কাজ।" স্বামীজী অনেক বার হোম্ অব্ ট্রুথ্-এ এবং অন্যান্য হলে অনেক গুলো বক্তৃতা দেন, কিন্তু 'ন্যাজারথের যীশু সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তা আমি জীবনে যে সকল বক্তৃতা শুনেছি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঐ বক্তৃতার সময় মনে হত যেন তাঁর আপাদমস্তক একটি শুভ্র জ্যোতি বিকিরণ করছে, খৃষ্টের বিস্ময়বিমিশ্র ভাবানুধ্যানে ও মহিমাকীর্তনে তিনি এত তন্ময় ও বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন! আমি ঐ বিস্পষ্ট জ্যোতিতে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ফেরবার পথে তাঁকে কিছুই বলিনি, ভয় ছিল পাছে তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়। আমার বোধ হচ্ছিল তখনও ঐ মহান্ খৃষ্টবিষয়ক ভাবরাশি তাঁর অন্তরে বিরাজমান। হঠাৎ তিনি আমাকে বল্লেন: "আমি জানি এটা কি ভাবে তৈরী হয়।" আমি জিজ্ঞেস্ করলাম: "কি ভাবে কী তৈরী হয়?" "কি ভাবে তারা মালিগাটনি সুপ্ তৈরী করে, তা আমি জানি। তাতে তারা লাল রঙের একটি পাতা মিশিয়ে দেয়"—তিনি বল্লেন। আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-গৌরববোধের ঐকান্তিক অভাব ছিল তাঁর উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম। তিনি যেন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সামর্থ্য ও গৌরব চোখে দেখতে পেতেন; যেই তাঁর নিকট-সংস্পর্শে আসত সেই যেন অনুভব করত সাহস বল ও বীর্যের অনুপ্রবেশ, আর ফিরে যেত সতেজ সঞ্জীবিত হয়ে—নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। যখনই কোন লোক আমাকে জিজ্ঞেস্ করেছে: "আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন কি?" তখনই আমি বলেছি: "কোন পূতচরিত্র সাধু ব্যক্তির সান্নিধ্য মানুষের মধ্যে যে সাহস

উদ্দীপিত করে তাই আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন।" স্বামীজী বলতেন: "ত্রাণকর্তা যাঁরা তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের পাপতাপ বিপদ-বিপর্যয় নিজের ওপর নিয়ে তাদের স্বাধীন সানন্দ ভাবে বিচরণ করতে দেবেন। সাধারণ মানুষ ও মহাপুরুষদের মধ্যে এই হল পার্থক্য। ভার বহন করবেন পরিত্রাতা দেবমানবগণ।"

রিজলি ম্যানরে তিনি আর একটি কথা আমার বোন্‌ঝিকে বলেছিলেন: "অ্যালবার্টা, জীবনে যা কিছু তুমি কল্পনা কর, বাস্তব কোন কিছুই তার সমকক্ষ হবে না।"

একদিন মিসেস্ ব্লজেট্ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করাবার জন্য তিন জন ভদ্র মহিলাকে নিয়ে আসেন। আমি তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর নিকট থেকে চলে গেলাম, যাতে নবাগতাদের সঙ্গে তিনি নিভৃতে আলাপ করতে পারেন। আধ ঘণ্টা পরে তিনি এসে আমাকে বল্লেন: "এই মহিলারা হচ্ছেন তিন বোন। তাঁদের ইচ্ছা আমি প্যাসাডেনায় তাঁদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করি।" আমি বল্লাম: "যান্।" তিনি বল্লেন: "সত্যিই যাব কি?" "হাঁ, যান"—আমি আবার বল্লাম। তাঁরা ছিলেন মিসেস্ হ্যান্সবরো, মিস্ মিড্ ও মিসেস্ ওয়াইকফ্। মিসেস্ ওয়াইকফের বাড়ী এখন হয়েছে হলিউডের 'বিবেকানন্দ-ভবন'। মিসেস্ ওয়াইকফ্ এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন এখন সেখানে আছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যালামেডা থেকে তিনি ১৯০০, ১৮ই এপ্রিল আমার নিকট একখানা চিঠি লেখেন। আমার মনে হয় তাঁর সব চিঠির মধ্যে ঐটিই সব চেয়ে সুন্দর। চিঠিখানি রয়েছে **'Inspired Talks'** এর সর্বশেষে।

পরে ১৯০০ সনে আমার বোন ও মিঃ লেগেট প্যারিসে একটি বাড়ী ভাড়া করেন। আমরা ওখানে যাই জুন মাসে; স্বামীজী এলেন আগষ্ট মাসে। তিনি কয়েক সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। শেষে তিনি চলে যান অবিবাহিত মিঃ জেরাল্ড নোবেল এর নিকট। পরে স্বামীজী মিঃ নোবেলের সম্বন্ধে বলেছিলেন: "মিঃ নোবেলের মত লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করবার জন্য জন্মগ্রহণ করা পরম সৌভাগ্যের কথা।" আমাদের এই বন্ধুকে তিনি এত বেশী সম্মান দিতেন! এই ছ'মাসের মধ্যে আমরা স্বামীজীকে অনেক আপ্যায়িত করেছি। স্বামীজী প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে খেতে আসতেন।

একদিন প্যারিসে লাঞ্চ খাবার সময় গায়িকা মাদাম এমা কাল্‌ভে বল্লেন, শীতের সময়টা তিনি মিশর যাবেন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে যাবার প্রস্তাব করলাম তক্ষুণি তিনি স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন: "আমার অতিথি হিসেবে আপনি কি মিশরে আসবেন?" তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আমরা ভিয়েনা, কনষ্টান্টিনোপল ও এথেন্স হয়ে মিশরে গেলাম। আমরা ছিলাম ভিয়েনাতে দু'দিন, কনষ্টান্টিনোপ্‌ল-এ ন'দিন, এথেন্স-এ চার দিন। ওখানে পৌঁছে কয়েক দিন পরে স্বামীজী বল্লেন: "আমি চলে যেতে চাই।" "চলে যাবেন? কোথায় যাবেন?" আমি জিজ্ঞেস্ করলাম। "ভারতবর্ষে ফিরে যাব"—তিনি উত্তর দিলেন। আমি বল্লাম: "আচ্ছা, যান।" "যেতে পারি ত?" তিনি জিজ্ঞেস্ করলেন। "নিশ্চয়ই"—আবার উত্তর দিলাম। আমি মাদাম কাল্‌ভের নিকট গিয়ে বল্লাম: "স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চান।" তিনি বল্লেন: "যাবেন বৈ কি।" তিনি তাঁর জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামীজী দেশে সময় মতই পৌঁছে ছিলেন। পৌঁছে শুনতে পেলেন মিঃ সেভিয়ারের মৃত্যুসংবাদ। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিঠি দিয়ে জানালেন—লিখলেন কি অপূর্ব প্রশান্ত গাম্ভীর্যে মিসেস্ সেভিয়ার তাঁর স্বামীর দেহত্যাগকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মায়াবতী আশ্রমে একই ভাবে থেকে গেলেন, যেন তাঁর স্বামী সেখানেই আছেন!

সমালোচনা

বন্দে মাতরম্ — নিশিকান্ত প্রণীত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত। ৫৫ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা।

কবি নিশিকান্ত বাংলাকাব্যানুরাগী মাত্রেরই নিকট পরিচিত। আলোচ্যমান পুস্তকখানি কবির রচিত আঠারটি কবিতা ও গানের সংগ্রহ। এগুলিতে পরিণত লেখনীর সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং ভাষা-ছন্দ-ভাবের মধুর মিলনের অনিন্দ্য পরিচয় পাওয়া যায়। 'বন্দে মাতরম্', 'প্রার্থনা', 'উদ্বোধন' ও 'মহাকালী' কবিতা-চতুষ্টয়ে কবির বলিষ্ঠ আধ্যাত্মিক মন ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগের দ্যোতনা মুদ্রিত রহিয়াছে। 'কালো রক্ত' কবিতায় বিনা রক্তপাতে ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে কবিচিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাস এবং স্বদেশপ্রেমিক সাধু-মহাত্মা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন অভিব্যক্ত হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর। কবির এই বাণী-শিল্প রসজ্ঞ-মাত্রেরই নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে করি।

মর্মবাণী—তারাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। জ্যোতি প্রকাশালয়, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৫৭ পৃষ্ঠা; মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানা কবির রচিত একচল্লিশটি ছোট বড় কবিতার সুন্দর সংগ্রহ। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু বিবিধ এবং পাঠকের মনে চিন্তার খোরাক পরিবেশন করে। ভাষা, ছন্দ ও ভাবের মাধুর্যে কবিতাগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে; সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এগুলি বুঝিতে বেশী কষ্ট হইবে না। কবিচিত্তের এই ভাবব্যঞ্জনা কাব্য-রসিকমাত্রেরই চিত্তবিনোদন করিবে, আশা করি।

পড়িতে পড়িতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি চোখে পড়িল। পরবর্তী সংস্করণে বইখানি নির্ভুল মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। পুস্তকের প্রচ্ছদপট মনোরম, কাগজ ও মুদ্রণ ভাল কিন্তু মূল্য অত্যন্ত বেশী।

বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন পত্রিকা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, ১৩৫৬—শ্রীমান্ দেবীচরণ খাঁ ও শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন, ১০৭, খুরুট রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। ৬৫ পৃষ্ঠা।

আমরা হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন পত্রিকার ত্রয়োবিংশ বর্ষ-সংখ্যা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। পত্রিকাখানি ছাত্র-লেখকগণের রচিত মহাপুরুষদের চরিতাখ্যান, ভ্রমণকাহিনী, কাব্যালোচনা, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতাসম্ভারে বেশ সমৃদ্ধ হইয়াছে। ছাত্রদের এই সাহিত্য-প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়; তাহাদের জীবন-প্রভাতের এই উদ্যম উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কালে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পত্রিকাটি পরিচালনা করিতেছে—প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে সহজেই পাঠকদের মনে এই ধারণা হইবে। আমরা পত্রিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

হিন্দুবোধন—স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত। হালিসহর দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪২; মূল্য বার আনা।

গ্রন্থকার এই পুস্তিকায় সাতটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে একদা শৌর্য-বীর্য-আধ্যাত্মিকতায় গরীয়ান হিন্দু জাতির বর্তমান অবনতিতে ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্ম-তেজের উদ্বোধনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা যুক্তি-বিচার সহায়ে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া-ছেন। বাস্তবিক, অন্তর্নিহিত শক্তিকে, সুপ্ত সিংহ আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তোলাই বর্তমান হিন্দুজাতির একমাত্র সাধনা। বোধন-বাণীগুলি হিন্দুমাত্রকেই শক্তিসাধনার প্রেরণা প্রদান করুক।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী—স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—ভজন আশ্রম, ১৪২নং আউধ গর্বী, কাশীধাম। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য আড়াই টাকা।

অন্ধ্র প্রদেশের মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তৎশিষ্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার যে জীবনী লিখিয়াছিলেন তাহা এখন আর পাওয়া যায় না। গণেশ মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনীসংগ্রহে' ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ আছে। আলোচ্যমান পুস্তকে এই যোগিবরের বিস্তৃত জীবনী এবং তৎশিষ্য উমাচরণ ও শিষ্যা শঙ্করী মাতার জীবনকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ভিজিয়ানা-গ্রামের নিকটবর্তী এক পল্লীতে নরসিংহ রাও ও বিদ্যাবতী দেবী নামক এক ধনী ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহাদের পুত্র শিবরামই ত্রৈলঙ্গ স্বামী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ১০১৪ সালে (১৬০৭ খ্রীঃ) পৌষ মাসে হোলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ এবং ১২৯৪ সালে (১৮৮৭ খ্রীঃ) কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী এবং বহু বর্ষ মৌন ছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কালই কাশীধামে অতিবাহিত হয়। যোগসাধনার ফলে তাঁহার দেহ কখনও ব্যাধিগ্রস্ত হয় নাই।

১২৭৬ সালে (১৮৬৯ খ্রীঃ) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তীর্থভ্রমণকালে কাশীধামে উপস্থিত হন তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীরটাকে আশ্রয় করে রয়েছেন।" আত্মভাবে আরূঢ় থাকায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দেহবোধ ছিল না। তিনি রৌদ্রতপ্ত বালুরাশির উপর শায়িত ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পায়স খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর এক, না অনেক?" মৌন জ্ঞানী ইঙ্গিতে উত্তর দিয়া-ছিলেন, "সমাধিস্থ হয়ে দেখতো এক। নচেৎ যতক্ষণ আমি তুমি দেহ প্রভৃতির নানা জ্ঞান থাকে তখন তাঁকে অনেক বলে মনে হয়।" যোগীর জ্ঞানগর্ভ বাক্যশ্রবণে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের কয়েক জন শিষ্যও তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানা-নন্দজী মহারাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যদিও শুনেছিলাম তাঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ, তথাপি আমি তাঁকে জ্যোতির্ময় দেখেছিলাম।"

এইরূপ মহাপুরুষের জীবনী আরও সুষ্ঠুরূপে লিখিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইলে পাঠক-পাঠিকার সুপাঠ্য হইত। কেবল ঘটনাবলীর সমা-বেশ বা শাস্ত্রীয় বাক্যোদ্ধৃতি দ্বারা জীবনী রচিত হয় না। জীবনী-রচনার আধুনিক প্রণালী পূর্বা-পেক্ষা বহু গুণে উন্নততর। পুস্তকের ছাপা কাগজ ছবি ও বাঁধাই আদৌ আকর্ষণীয় নহে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার আভাস (ছোটদের জন্য)—স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দজী কর্তৃক লিখিত এবং কলিকাতা ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ

ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগুরু লাইব্রেরী হইতে ভুবনমোহন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন সাইজ, ১৯ পৃষ্ঠা, দাম চার আনা মাত্র।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শিশু-বিভাগে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শিশুদের কাছে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার আভাস দিবার জন্য লেখক শিশুদের উপযোগী করে বইখানি লিখেছেন। তিনি এতে 'বৈদিক যুগ ও আর্য্যগণ', 'বৈদিক যুগে চাষবাস এবং ব্যবসা', 'আহার ও পরিচ্ছদ', 'শিল্প-কলা', 'যুদ্ধ-বিগ্রহ', 'সামাজিক জীবন', 'ধর্ম', 'শিক্ষা', 'রাষ্ট্রব্যবস্থা' প্রভৃতি বিষয়গুলি শিশুদের ধারণাযোগ্য করে চমৎকার ভাবে তাদের সামনে ধরেছেন। ছাপা এবং প্রচ্ছদপটটিও বেশ মনোরম হয়েছে। সমস্ত স্কুলেই শিশু-বিভাগে বইখানি পাঠ্য হওয়া উচিত মনে করি।

জ্যোতিরূপ

বিপ্লবী বিবেকানন্দ—শ্রীবিজয় গোপাল লিখিত। প্রকাশক—শ্রীঅতুলচন্দ্র বিশ্বাস, ১৪, অনাথ দেব লেন, কলিকাতা। ৫১ পৃষ্ঠা ; মূল্য এক টাকা।

বঙ্গের নবীনদের মনের খোরাক এই বই-খানিতে বেশ আছে। স্বামিজীর বহু অগ্নিময়ী বক্তৃতা ও পত্রাবলীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত থাকায় ইহা বেশ প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। লেখক নিজে কবি, তাই তাঁহার লেখায় ভাষার প্রাঞ্জলতার মোটেই কৃপণতা নাই। বিজয়গোপাল বাবুর 'বিপ্লবী বিবেকানন্দ' বহু যুবকের অন্তরে বিপ্লব এনে দিলে আমরা সুখী হইব। বইখানির প্রথমে বা প্রচ্ছদপটে স্বামিজীর একখানি মনোরম ছবি থাকিলে খুবই শোভন হইত। দামও একটু কম হইলে সাধারণের—বিশেষ করিয়া তরুণদের পক্ষে ইহা সুলভ হইত।

স্বামী অভয়ানন্দ

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব সুবোধিনী (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যতীর্থ প্রণীত। প্রকাশক—সাধারণ সম্পাদক, "বাঙ্গালী সংঘ", ৬এ, যতীন দাস রোড, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—১৭বি, শ্রীমোহন লেন, কালীঘাট, কলিকাতা। ১০১ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সহিত যাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারাই লেখকের গভীর অনুভূতি, লিখনশৈলী, উচ্চভাব ও ভাষার রসাস্বাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উভয়খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, সাধনার সহায় ও অন্তরায়, ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক। ষোলটি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-রহস্য, পুরাণ ভাগবত গীতা ও গায়ত্রীর সহিত তুলনা, সপ্তশ্লোকী, দুর্গাতত্ত্ব, অর্গলাস্তোত্র, মূর্তিপূজারহস্য ইত্যাদি। রাসপঞ্চাধ্যায়ের সহিত চণ্ডীর বিভিন্ন চরিত্রের তুলনা আমাদের কষ্টকর বোধ হইল। সকল দিক বিচার করিলে মনে হয় সাধকগণের পক্ষে পুস্তকখানি একটি প্রয়োজনীয় সঙ্গী।

আত্মসমর্পণ যোগ বা সরল যোগপন্থা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ৫৫নং সুবারবন স্কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—সাধনসমর কার্যা-লয়, ২০১ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২১৩ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

সুখ-দুঃখ কি ও কেন, দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি—প্রশ্নদ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়া গ্রন্থকার দুইখণ্ডে গীতাতত্ত্ব, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ, গোপীদের আত্মসমর্পণ পূজাতত্ত্ব জপতত্ত্ব প্রাণতত্ত্ব প্রাণায়াম

জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন গীতাতত্ত্ব হইতে আত্মসমর্পণযোগের আরম্ভ, চণ্ডীতত্ত্বে উহার পূর্ণতা। পাঠকদিগকে বইখানি নূতন আলোক দিবে।

অগ্নিহোত্রী—বিজয় গোপাল প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসারদাপ্রসাদ বিশ্বাস, ১১এ হালদার লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৭ ; মূল্য এক টাকা।

কবি বিজয় গোপালের নূতন কবিতাপুস্তক 'অগ্নিহোত্রী' পাঠে বুঝিলাম কবির মন বসিয়া নাই, যুগের তালে তালে আগাইয়া চলিয়াছে। কোথাও ভাঙনের কোথাও গড়নের গান, কোথাও নতুন ভারতের জনজাগরণের অস্ফুট ঝঙ্কার আমাদের কানে আসিয়া প্রাণে দোলা দিয়া যায়। সবল ভঙ্গীতে লেখা এই সরল সঙ্গীতের বহুল প্রচার কামনা করি।

বনফুল (প্রথম খণ্ড)—সম্পাদক ও প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ সান্ন্যাল। বনফুল সাহিত্যসমিতি, শ্রীরামপুর। ১৬০ পৃষ্ঠা ; দাম এক টাকা।

কতকগুলি গল্প প্রবন্ধ ও কবিতার সুন্দর সমাবেশ। খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের দু-একটি গল্প আনন্দপরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তাও উদ্দীপিত করে। যথা, আশাপূর্ণা দেবীর 'নীলরক্ত', শ্রীবিরূপাক্ষের 'অযাচিত উপদেশ'। এই সংগ্রহপ্রচেষ্টার বিশেষ বিভাগ হইল "হুগলী জেলার কথা"। ইহার মধ্যে আছে ঐ জেলার কুটিরশিল্প, সংঘ-সংবাদ, শ্রীরামপুরের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা এবং জেলার ঐতিহাসিক তথ্য। যাঁহারা হুগলী জেলার বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ইহার মধ্যে অনেক কিছু পাইবেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক 'বনফুল'কে এই সকলের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

দক্ষিণেশ্বর (প্রথম খণ্ড)—ধীরেন্দ্রনাথ প্রণীত। প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ৫১সি, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তোষ-সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরাহনগর। ৩২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

এই পুস্তকখানি বহুভাবের বহু কবিতার বিচিত্র সমষ্টি। বেশির ভাগ কবিতা শ্রীরামকৃষ্ণ, তদীয় ভক্ত, লীলা ও লীলাস্থান সম্বন্ধীয়। বোধ হয় সেইজন্য দক্ষিণেশ্বর নাম নির্বাচিত হইয়াছে। কয়েকটি কবিতার ভাব উচ্চাঙ্গের, কতকগুলি কবিতা গানের আকারে লিখিত। "ওগো বাংলার মেয়ে" ও "নারী"—এই কবিতা দুইটিতে কবিচিত্তের যথেষ্ট পরিচিতি আছে। "জাতীয় পতাকা", "১৫ই আগষ্ট" প্রভৃতি কবিতা পৃথক খণ্ডে সন্নিবেশিত হইলে ভাল হইত। বহুস্থানে ছন্দের ও বাক্যবিন্যাসের ত্রুটি চোখে পড়িল। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি অন্তর্হিত হইবে।

শ্রী—

হে সূর্য উদয় হও—শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক—কে সি আচার্য, ২বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৪ ; মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানি মুখ্যতঃ মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। মহাত্মাজীর জীবনাদর্শের এই স্বচ্ছ ভক্তিবিনম্র কাব্যরূপায়ণ আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। ভারতের প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা ; গান্ধীজীর নিরলস স্বার্থৈষণাশূন্য জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু পর্যন্ত সেই তমোবিদারী ঋতের প্রভায় সমুজ্জ্বল। লেখক তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া এই মৃত্যুঞ্জয় মহামানবের যে চরিতালেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন তাহা স্বদেশপ্রাণ,

ভারতের চিরন্তন সত্যাশ্রয়ী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আদৃত হইবে। 'মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণ'-রূপ পুস্তক-পরিচিতি গান্ধীজীর প্রতি নিবেদিত অতি সুলিখিত শ্রদ্ধার্ঘ্য। অধিকাংশ কবিতার নীচে কয়েকটি উদ্ধৃতি স্থান পাইয়াছে; সেগুলিও গান্ধীজীর শিক্ষার পরিপোষক। বইখানির শেষে প্রদত্ত মহাত্মাজীর ভাবসঙ্কলন পুস্তকের বৈশিষ্ট্য।

মঞ্জুষা—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মাসিক পত্র। ৮১, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৪ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৬৲ মাত্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুভাষাবিৎ বিবিধ-শাস্ত্রনিষ্ণাত অধ্যাপক ডক্টর ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত ভাষায় এই মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞানবিস্তারকল্পে সুযোগ্য অধ্যাপক মহাশয়ের অধ্যবসায় অতুলনীয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার গৌরবেও ইহা গৌরবান্বিত। এই মাসিকপত্র বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রগীতি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মাতৃমন্দির, শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম, শিমুলতলা (ই আই আর) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬। মূল্যের উল্লেখ নাই।

পুস্তিকাখানিতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব-বিষয়ক কয়েকটি বাংলা ও সংস্কৃত স্তোত্র সন্নিবেশিত। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান-রচিত স্তোত্র ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

হিন্দুধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সমাজ—শ্রীশ্রী১১০৮ দণ্ডিস্বামী জগন্নাথাশ্রম প্রণীত। ৺তারকেশ্বর মঠ, জেলা হুগলী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩১; মূল্য অনুল্লিখিত।

আলোচ্যমান পুস্তিকাখানিতে লেখক সাধারণ ভাবে হিন্দুসমাজের বিবিধ সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সংস্কারবিমুখ প্রাচীনপন্থী এবং অতি-আধুনিক সংস্কার-কামীদের বিরোধী। তাঁহার লেখায় শাস্ত্রানুরাগ আছে, কিন্তু তিনি অন্ধ গোঁড়ামির অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছেন। হিন্দু সমাজের কল্যাণকর কোন বিষয় পুস্তিকাখানিতে পাওয়া গেল না।

জাতিভেদ—শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী প্রণীত। হিন্দুগৌরব কার্যালয়, রানীবাড়ী, পোঃ নিলাম বাজার, জেলা কাছাড়, হইতে শ্রীরমেন্দ্র কুমার ব্যাকরণশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৮; মূল্য এক টাকা মাত্র।

হিন্দুসভ্যতার প্রারম্ভ হইতেই জাতিভেদ যে গুণগত ছিল তাহাই লেখক শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকেও যে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করা যায় সে সম্বন্ধেও লেখক নিঃসন্দেহ এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণাস্ত্র দ্বারা সন্নদ্ধ। লেখকের সুচিন্তিত যুক্তি শাস্ত্রালোকে উদ্ভাসিত।

স্বামী শ্যামলানন্দ

বর্ষ-প্রার্থনা

প্রণব ঘোষ

রাত্রির আঁধার হতে প্রভাতের শুভ্র অভ্যুদয়
দুঃখের তপস্যা দিয়ে তিলে তিলে করে নেব জয়,
　　　　এই বর দাও,
এ প্রাণের বীণাতন্ত্র ঝঙ্কারি বাজাও,
বৈশাখের অগ্নিতপ্ত দীপক-সংগীত
প্রাণে আনো পরমের চরম ইংগিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৪ই চৈত্র হইতে ২১শে চৈত্র পর্যন্ত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও নবনির্মিত মন্দির-প্রতিষ্ঠাকার্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা হোম ও আনুষঙ্গিক কার্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত কাশী ও অন্যান্য স্থান হইতে বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ডাভিজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনীত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী, কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দজী, বহু সাধু ও ভক্ত এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৪ই চৈত্র সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত স্বামী ওঁকারানন্দজীর তত্ত্বাবধানে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্তৃক গ্রহ ও বাস্তমণ্ডল-পূজা ধ্বজারোপণ হোম লঘুরুদ্র-যাগাদি যথাবিধি সম্পাদিত হয়। সন্ধ্যায় স্বামী রামানন্দজী কালীকীর্তন করিয়া সকলকে আনন্দদান করেন। ১৫ই চৈত্র আশ্রমপ্রাঙ্গণে সম্মিলিত ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত বিপুলজয়ধ্বনি ও মাঙ্গলিক উলু ও শঙ্খধ্বনি মধ্যে বেলুড় মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত মন্দিরের বেদীপীঠে সিংহাসনোপরি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপটমূর্তি স্থাপন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্তনবিশারদ প্রসিদ্ধ বেতারশিল্পী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মধুরকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কীর্তন করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। ১৬ই চৈত্র স্থানীয় কতিপয় বিশেষজ্ঞকর্তৃক বাদ্য ও কণ্ঠসঙ্গীত এবং ১৭ই চৈত্র হইতে ১৯শে চৈত্র পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গা-নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্তনকলাবিদ্ শ্রীযুক্ত সূর্যনারায়ণ ঠাকুর কর্তৃক হিন্দী ভাষায় যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত সহকারে 'কথকতা' গাত হয়। ২০ ও ২১শে চৈত্র স্বামী ওঁকারানন্দজী শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন। এই উৎসব উপলক্ষে ন্যূনকল্পে আড়াই হাজার দরিদ্রনারায়ণ এবং প্রায় আড়াই হাজার ভক্তনরনারী আশ্রমে প্রসাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের শুভাগমনে ভক্ত-বৃন্দের হৃদয়ে অভূতপূর্ব আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনে ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে টমসন ষ্ট্রীটস্থ রামকৃষ্ণ মিশন হলে গত ৭ই ফাল্গুন একটি মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী থাকিন্ নু। ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী আউঙ্ সানের পত্নী মিসেস্ আউঙ্ সান্, মিঃ সি আর্ এন্ স্বামী, মিঃ এম্ এ রসিদ এবং স্বামী অকুণ্ঠানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন।

প্রধান মন্ত্রী থাকিন্ নু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন: "সর্বপ্রাণীর প্রতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অপরিসীম ভালবাসা। উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র, সাধু-অসাধু

সকলের প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এমন এক আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন যেখানে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়; সেই ভূমিতে নামরূপের পার্থক্য থাকে না বলিয়া সাধক সর্বজীবের সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভব করেন। এই ঐক্যানুভূতিই অধ্যাত্ম-জীবনের শ্রেষ্ঠতম পরিণতি। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব-ধর্মের মূলীভূত ঐক্য অনুভব করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের প্রবৃদ্ধ জড়বাদ এবং হীন ধর্মান্ধতার অন্ধতমসে শ্রীরামকৃষ্ণের এই লোকপাবনী বাণী স্নিগ্ধ প্রদীপস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর সর্বত্রই সুপরিচিত। ইহার সংস্কৃতি সেবা ও শিক্ষামূলক কার্যাবলী রেঙ্গুন তথা ব্রহ্মদেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে সৌহার্দ্যস্থাপনেও এই প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব অতুলনীয়। যে ভাবাদর্শে উদ্দীপিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মিগণ বিশ্বমানবের সেবায় উৎসৃষ্টপ্রাণ হইয়াছেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের অমানব জীবন ও শিক্ষার মধ্যে নিহিত।”

রেঙ্গুনস্থ ভারতীয় দূত ডাঃ এম এ রউফ, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারিবৃন্দ, রেঙ্গুনের লর্ড বিশপ্ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব— এই উপলক্ষে গত ১৮ই ফাল্গুন প্রাতে বালকগণ বেদ ও গীতা আবৃত্তি করে। ৮ ঘটিকায় ‘অগ্নিযুগের’ নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গঙ্গো-পাধ্যায়, এম্-এল্-এ মহোদয় কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। বালকগণ ব্যাণ্ড বাজাইয়া পতাকা অভিবাদন করিলে বিপিন বাবু একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বাংলার যুবশক্তিকে সংহত হইতে বলেন। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গে দুর্গত ভ্রাতা-ভগিনীদের দুঃখকষ্ট লাঘব করিতে সকলকে বিশেষতঃ ছাত্রসমাজকে অনুরোধ জানান। আশ্রমসম্পাদক স্বামী পুণ্যা-নন্দজীও একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগ-রাগাদি হয়। সন্ধ্যায় শিশু-সাহিত্যলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সভাপতিত্বে একটি ছাত্রসভায় চারিজন ছাত্র স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা ও একটি ছাত্র স্বরচিত কবিতা পাঠ করে। পরে সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় ছাত্রদিগকে দেশমাতৃকার চরণে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে বলেন। রাত্রিতে প্রফেসার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকারের হাস্য-কৌতুকে সকলে আনন্দ উপভোগ করেন।

দ্বিতীয় দিবস ১৯শে ফাল্গুন সকালে ও দ্বিপ্রহরে বালকগণের ক্রীড়া ও সঙ্গীত প্রতি-যোগিতা হয়। তাহাতে বালকেরা বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। সন্ধ্যায় বহু সুরশিল্পী আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হন এবং চিত্তাকর্ষক ভজন-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

তৃতীয় দিবস ২০শে ফাল্গুন ৮ ঘটিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা হয়। ১০৷৷০ ঘটিকায় স্বামী মাধবানন্দজী বালকাশ্রমে একটি নবগৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অপরাহ্ণে তাঁহারই সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত সুললিত ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সমস্যাবহুল ভারতের জাতীয় জীবনে তাঁহাদের উদারবাণী কিরূপে কার্যকরী হইতে পারে তাহাও বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনের মূল সূত্রগুলি বিশদভাবে

আলোচনা করিলে সভার কার্য পরিসমাপ্ত এবং সন্ধ্যায় আশ্রমে নবাগত বালকগণ কর্তৃক 'নরনারায়ণ' নাটিকা অভিনীত হয়।

চতুর্থ দিবস ২১শে ফাল্গুন ৯ ঘটিকায় কলিকাতার সুহৃদক্লাবের সভ্যগণ কালীকীর্তন করেন। দ্বিপ্রহরে বহু সাধু ও ভক্তগণের সমাগমে আশ্রমপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। উৎসবে বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই দিন ৩া০ ঘটিকায় বালকগণ কর্তৃক ব্রতচারী নৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল মাননীয় ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু মহোদয় আশ্রমের পুরস্কারবিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন। ইহার পূর্বে তিনি আশ্রম-বালকদিগের সহিত হোলি খেলিয়াছিলেন। বালকগণ তাঁহাকে আবির ও কুঙ্কুম দিয়া প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগের মাথায় আবির দিয়া আশীর্বাদ করেন। পরে পুরস্কারবিতরণী সভার কার্য আরম্ভ হয়। বালকগণ-কর্তৃক শান্তিবাচন উচ্চারিত হইবার পর তাহারা কয়েকটি আবৃত্তি করে। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশানুসারে শ্রীযুক্তা চন্দ্রাকুমারী হাণ্ডু, এম্-এ ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি মহোদয় পরে ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটি ভাষণ দেন। বর্তমানে বিক্ষুব্ধ বাংলার নিদারুণ ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি উহার আশু সমাধান-কল্পে সমগ্র দেশবাসীর সমবেত চেষ্টা ও সহানুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সন্ধ্যায় বালকগণ 'মেবার পতন' অভিনয় করে।

পঞ্চম দিবস ২২শে ফাল্গুন ১২ ঘটিকায় 'নারায়ণসেবা' হয়। সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী ছায়াচিত্র সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম দিবস ২৬শে ও ২৭শে ফাল্গুন 'রহড়াসংঘ' ও কলিকাতার 'গড়পার নাট্যসমাজ' কর্তৃক যথাক্রমে 'জয়দেব' ও 'নামের বল' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হইলে আশ্রমের সপ্তদিবসব্যাপী উৎসব সমাপ্ত হয়।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতি-উৎসব—গত ১৩ই চৈত্র সোমবার এই প্রতিষ্ঠানে পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা হোম চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি হয়। অপরাহ্নে জনসভায় স্বামী প্রেমেশানন্দজী স্মৃতিপূজা উৎসবের ইতিহাস এবং পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের অলৌকিক জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন। ইহাতে প্রায় ৫০০ নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

1. **Stotraratna or The Hymn-Jewel of Sri Yamunacāryā**—Svāmi Adidevānanda. Published by the President, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras. Sanskrit verses in Devanagari with English translation. Pages 75.

2. **Sri Ramakrishna—The Voice of Our Age**—Published by Ramakrishna Mission Society, Rangoon. Sri Ramakrishna Birth-day Anniversary Presentation, 1950. Pages 24.

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা—শাশ্বত মানবতার প্রতীক যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধানিবেদনার্থ গত ১৯শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাস ইহাতে পৌরোহিত্য করেন।

শ্রদ্ধা-নিবেদন-প্রসঙ্গে বেলুড় মঠের স্বামী রাঘবানন্দজী বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ। এই আধ্যাত্মিক সাধনাকেই তিনি ভারতের অগ্রগতির প্রধান ভিত্তিস্বরূপ মনে করিতেন। তাঁহার পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট তিনি এই সম্পর্কে সম্যক শিক্ষা লাভ করেন। স্বামীজী ছিলেন প্রভূত জ্ঞানের আধার, তাঁহার বিচারবুদ্ধি ছিল সূর্যের ন্যায় ভাস্বর। পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে তিনি ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক। বর্তমান দুর্দিনে তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও কর্মজীবনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।"

অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলেন, "আজ বাংলা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। এই দিনে আমরা বিবেকানন্দের ধ্যানগম্ভীর মূর্তিকে প্রণাম জানাইয়া তাঁহার তেজস্বিতাকে আমাদের মধ্যে আহ্বান করি এবং সেই সঙ্গে তাঁহার 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' বাণীকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি। আজ বাংলা খণ্ডিত—তাহার সাংস্কৃতিক জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত। এই সঙ্কটের মুহূর্তে বিবেকানন্দের শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়।"

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ বলেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুগত স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি এক জন বীর্যবান পুরুষ ছিলেন এবং কর্ম ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। প্রেম ও ঐক্যের বাণী প্রচারের দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে জয় করিতে সমর্থ হন। জীবসেবাকেই তিনি ভগবৎসেবা মনে করিতেন। তাঁহার ধর্ম ছিল বিশ্বজনীন। আজ বাংলার বড় দুর্দিন—এই সময়ে বাঙ্গালীকে বিবেকানন্দের কর্মের আদর্শ সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু বৎসরান্তে স্মৃতিসভায় তাঁহার জীবনী আলোচিত হইলেই চলিবে না; দেশের সর্বত্র পাঠচক্র খুলিয়া বিবেকানন্দের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।"

বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী বলেন, "ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। তিনি সত্য ধর্ম ও ন্যায়ের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। আজ দেশের সর্বত্র দুর্নীতি ও অধর্মের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। ইহার প্রতিকারকল্পে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক জীবন একান্তভাবে অনুসরণীয়। তিনি ভারতের জাতীয় জীবনের গৌরবোজ্জ্বল বিশেষত্ব—ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সর্ববিধ সংস্কার সাধন করিতে দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই উপদেশ পালন করাই আমাদের জাতীয় সমস্যাসমূহ-সমাধানের একমাত্র উপায়।"

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অতীত ভারতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের যোগসূত্র। অতীত ভারত সাত্ত্বিকতার উপর দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু স্বামীজী তৎস্থলে রজোগুণের আহ্বান জানান। তাঁহার দুর্জয় সাহস ও অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ছিল। বর্তমান সময়ে স্বামীজীর তেজ ও বীর্যবত্তাকে আমাদের ভিতরে জাগ্রত করিতে হইবে।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাস শ্রদ্ধা-নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন, "ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের দেশ ও জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। ধর্মবিবর্জিত হইলে আমাদের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটিবে—ভারতীয় ঋষিগণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ইহাই মূলকথা। স্বামীজীর মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন উজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তিনি ছিলেন এক জন নির্ভীক পুরুষ এবং তাঁহার চরিত্রবল ছিল অসাধারণ। পাশ্চাত্য জগৎকে তিনি এক মানবতার বাণী দিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদের চতুর্দিকে ঘোর বিপর্যয় বিদ্যমান। এই দুর্দিনে যুবসমাজকে আমি আহ্বান জানাইয়া বলিব, তাহারা যেন স্বামীজীর উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে ব্রতী থাকে।"

মিঃ সুধীর চন্দ্র মিত্র, বার-য়্যাট্-ল সভাপতি-নির্বাচনী বক্তৃতা দেন এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘোড়াই 'বন্দে বিবেকানন্দম্' নামক উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করেন। সোসাইটির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত কর্তৃক ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

পুরুষোত্তমপুর (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ সেবাসদন—১৯৪৩ সনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় স্থানীয় সেবকগণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে সেবাকার্য পরিচালন করেন। ইহার অমৃতপ্রসূ ফলস্বরূপে ১৯৪৪ সনের এপ্রিল মাসে এই সেবাসদন স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বর্তমানে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি দাতব্য হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় ও একটি ধর্মগ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা শতাধিক। চিকিৎসালয় হইতে প্রত্যহ শতাধিক রোগী ঔষধ গ্রহণ করেন। পশু-চিকিৎসা ইহার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ, প্রত্যেক বৎসর সহস্রাধিক গবাদি পশু এই চিকিৎসালয়ের সাহায্যে আরোগ্যলাভ করে। সেবাসদনে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব প্রমুখ মহাপুরুষগণের জন্মোৎসব এবং জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, কালীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল উৎসবে পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দজী ও স্বামী সুন্দরানন্দজী পূর্ব পূর্ব বৎসর সেবাসদনে আসিয়া ধর্মবক্তৃতাদি দান করিয়াছেন। গত বৎসর আলোকচিত্র-সাহায্যে ধর্মবক্তৃতাদি হইয়াছিল। এই বৎসর তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ভাস্করানন্দজী ও স্বামী হেরম্বানন্দজী এবং বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী আসিয়া ধর্মসঙ্গীত এবং চণ্ডী ভাগবতাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চেতলা (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতি—এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ট্রাষ্টি, সহ-সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত চিরকুমার আজীবন সেবাকর্মী শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র বসু অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গত ২১শে ফাল্গুন একটি সভা আহূত হয়। ইহাতে বেলুড়

মঠের স্বামী রাঘবানন্দজী, স্বামী সুন্দরানন্দজী, স্বামী বোধাত্মানন্দজী, কুমারী বেলারাণী সিংহ এবং স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেশ প্রসাদ দাস, শ্রীযুক্ত জহরলাল সিংহ, শ্রীযুক্ত পশুপতি বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র চার প্রভৃতি এবং পূর্বোক্ত স্বামীজীত্রয় পরলোকগত অনিল বাবুর বহু গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা দান করিলে সভার কার্য শেষ হয়।

পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের

আবেদন

জনসাধারণ অবগত আছেন যে রামকৃষ্ণ মিশন শরণার্থীদের জন্য নানাস্থানে সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বনগাঁও রেল ষ্টেশনের নিকট জয়ন্তীপুর, কুচবিহার হইতে ১৩ মাইল দূরে গীতালদহ, আসামের অন্তর্গত করিমগঞ্জ, শিলচর, লামডিং এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা প্রভৃতি স্থানের সেবাকেন্দ্রে এখন পূর্ণোদ্যমে কাজ চলিতেছে।

জয়ন্তীপুর কেন্দ্রের কার্য গত ১৬ই মার্চ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬শে মার্চের মধ্যে মিশনের সেবকগণ ৩০ হাজার শরণার্থীকে ১১ মণ দুধ, ৩৬ মণ ৩৫ সের চিঁড়া এবং ৪ মণ ৭½ সের গুড় বিতরণ করিয়াছেন।

পাকিস্তানের সীমানা হইতে মাত্র দুই মাইল দূরবর্তী কুচবিহারের অন্তর্গত গীতালদহে গত ১৫ই মার্চ হইতে মিশন সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই কেন্দ্র প্রায় ৫ শত শরণার্থীর আহার এবং শিশুদের দুগ্ধ বিতরণের ভার লইয়াছেন।

আসামের লামডিং কেন্দ্র হইতে বিশেষ অভাবগ্রস্ত শরণার্থিগণকে নানাভাবে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। অল্প মূল্যে চাল দান, রোগীদের চিকিৎসা, শিশু ও রোগিগণকে দুগ্ধ বিতরণ এবং ছোট-খাটো ব্যবসা ও গঠনমূলক কুটিরশিল্পের জন্য সামান্য পরিমাণে সাহায্য দান এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য।

শিলচর কেন্দ্রে প্রত্যহ প্রায় ৫।৬ শত শরণার্থীকে দৈনিক আহার্য এবং শিশু ও রোগীদের পথ্য দেওয়া হইতেছে। গত ১২ই মার্চ হইতে ২৪শে মার্চের মধ্যে এই কেন্দ্রে ১০১১ জন শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে ৪৬৬ জন অন্যান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতায় এই কার্য পরিচালিত হইতেছে।

করিমগঞ্জে মিশন গভর্নমেণ্টের সহযোগিতায় তিনটি আশ্রয়-শিবির পরিচালনা করিতেছেন। এখানে আহার্যবিতরণের জন্য রন্ধনশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ ৬ হাজারের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে দুই বেলা আহার এবং শিশু ও রোগিগণকে ঔষধ দুধ ও বার্লি দেওয়া হইতেছে। শহর হইতে ৮ মাইল দূরে ভারত-সীমান্তে অবস্থিত সুতারকান্দি গ্রাম হইতে মিশনের কর্মিগণ মোটরবাস ও লরীযোগে শরণার্থিগণকে আনয়ন করিতেছেন এবং তাহাদিগকে রেলে বিনা মাশুলে ভ্রমণের জন্য অনুমতিপত্রও দিতেছেন।

আগরতলা কেন্দ্রে মিশনের কর্মিগণ ১৯শে মার্চ হইতে ২৫শে মার্চের মধ্যে ৪৬৪ জন রোগীকে (৪১১ জন পূর্ণ বয়স্ক ও ১৫৩ জন শিশু) চিকিৎসা করিয়াছেন। যে সকল শরণার্থী ভারতের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মিশন একটি ছোট বসতিও গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই কার্যের বিস্তৃতি আবশ্যক।

মিশনের ঢাকাকেন্দ্রে ১৮৯ জন শরণার্থীকে আশ্রয় ও আহার্য দেওয়া হইতেছে।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে যে সকল শরণার্থী ভারতে আসিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন, গত ১১শে মার্চ হইতে মিশন তাঁহাদের সেবার ভার লইয়াছেন এবং ১০ হাজার শরণার্থীকে তিনটি শিবিরে স্থান দিয়াছেন।

বস্ত্রাদি ও ঔষধের প্রয়োজন এখন সর্বাপেক্ষা অধিক। শরণার্থিগণ অতি শোচনীয় অবস্থায় ভারতসীমানায় প্রবেশ করিতেছেন। অনেক সময়েই তাঁহাদের ব্যবহার্য দ্বিতীয় একখানা বস্ত্রও থাকে না। তাঁহাদিগকে যদি প্রতিষেধক টিকা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

শরণার্থিগণের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। অন্যথা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যাধি ও মৃত্যুর কবলে পতিত হইবেন। শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্ট অবর্ণনীয়। তাঁহাদের সেবাকার্যে সাহায্য করিবার জন্য আমরা সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় কৃতজ্ঞতা-সহকারে সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে:

(স্বাঃ) **স্বামী বীরেশ্বরানন্দ**
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
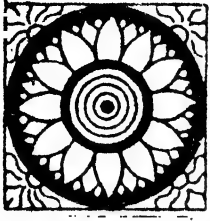
প্রজাতান্ত্রিক ভারত-রাষ্ট্রের ধর্মনীতি

সম্পাদক

ভারতীয় গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ ঐহিক (secular) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, সার্বজনীন ন্যায়-নীতি ও আইনশৃঙ্খলা-বিরোধী না হইলে এই রাষ্ট্রে সকল নরনারীরই যে কোন ধর্মানুষ্ঠান ধর্মশিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচারে স্বাধীনতা থাকিবে বটে, কিন্তু এই সকল বিষয় সম্বন্ধে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবে। জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতের সকল অধিবাসীর সর্ববিধ ঐহিক উন্নতিসাধনই হইবে এই ঐহিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ করিবার পক্ষে যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে পরস্পর-বিরোধী বহু ধর্মমত বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে কোন মতবিশেষকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গ্রহণ করিলে অন্যান্য মতবাদীদের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মমতকে রাষ্ট্র-ধর্মে পরিণত করিলে উহা হইবে মধ্যযুগীয় ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের প্রাধান্যপূর্ণ রাষ্ট্র (Theocratic State)! প্রজাতান্ত্রিক যুগে এইরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা একেবারে অচল। কারণ ইহাতে দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠগণের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষিত হইবে না; এইজন্য তাহারা চিরকাল অসন্তুষ্ট থাকিবে। কাজেই ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে কখনও শুভকর হইবে না! এই মতের সমর্থনকারিগণ সমস্বরে বলেন, "The secular state is not an idealistic luxury for the Indians, but an essential safeguard for their integrity." 'ভারতবাসীর পক্ষে ঐহিক রাষ্ট্র আদর্শগত বিলাসিতা নয়, পরন্তু তাহাদের অখণ্ডত্ব-সংরক্ষণের পক্ষে অত্যাবশ্যক।' গণতান্ত্রিক নীতির মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলেও ধর্ম হইতে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা দরকার। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন, "It (secular state) simply means the the repetition of the cardinal doctrine of modern democratic practice, that is separation of the state from religion and the full protection of every religion." 'আধুনিক গণতান্ত্রিক নীতির মূলসূত্রের পুনরাবৃত্তি—ধর্ম হইতে রাষ্ট্রকে পৃথক রাখা এবং প্রত্যেক ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করাই ঐহিক রাষ্ট্রের একমাত্র অর্থ।' তাঁহার মতে ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতাই

স্মরণাতীত কালের বিভিন্ন ধর্মের সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত রাখিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। এতদ্ভিন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতার সমর্থনে আরও বলা হয় যে, প্রচলিত ধর্মমাত্রই জাগতিক বিষয়-বৈরাগ্য এবং পারলৌকিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করে, পক্ষান্তরে সর্ববিধ ঐহিক উন্নতি-বিধানই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই পরস্পর-বিরোধী নীতি-জনিত সংঘর্ষ হইতে দেশকে মুক্ত রাখিতে হইলেও উভয়কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই যুক্তিসমূহের বিরুদ্ধে অনেকে বলেন, ভারতের পনরো আনা নর-নারীই কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী। সুতরাং ধর্মবিশ্বাসী ভারতবাসীর রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ ঐহিক বলিয়া ঘোষণা করা কি ভাবে সম্ভব হইল? ইহাতে দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর সম্মতি কার্যতঃ গ্রহণ করা হয় নাই। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যথার্থ গণতান্ত্রিক উপায়ে এই ঘোষণা করা হয় নাই। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ-দের ন্যায্য অধিকার উপেক্ষা করিয়া সংখ্যা-লঘিষ্ঠগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার আগ্রহাতিশয্যে এই ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে অধিকাংশ ধর্ম-বিশ্বাসী নরনারীই সন্তুষ্ট হন নাই।

পক্ষান্তরে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণকে স্ব স্ব ধর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়া তাঁহাদের পরিচালিত রাষ্ট্রকে একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখা কি সম্ভব? প্রজাতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রের কর্মচারি-গণ নিশ্চয়ই নানাবিধ ধর্মাবলম্বী হইবেন; তাঁহারা সকলেই যতক্ষণ সরকারী কাজ করিবেন, ততক্ষণ কি ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন? স্বগৃহে ধর্মপালন করিয়া সরকারী কাজের সময় মন হইতে ধর্মকে একেবারে নির্বাসন করা কোন ধর্ম-বিশ্বাসীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সকল ধর্মশাস্ত্রেই ধর্ম-বিশ্বাসীকে সর্বদা সকল কাজের মধ্যেও ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ থাকিতে উপদেশ দেন। কাজেই ইহা নিশ্চিত যে, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের অধিকাংশ যে ধর্মাবলম্বী হইবেন সেই ধর্ম দ্বারা রাষ্ট্রের সকল বিভাগ অল্পাধিক প্রভাবিত হইবেই। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে দেশের সকল অধিবাসীকে ধর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রাষ্ট্রকে একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখা সম্ভব হইতে পারে না।

দেখা যাইতেছে যে, ভারতের কোন কোন স্বনামপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির মর্যাদা রক্ষা করিবার আগ্রহাতিশয্যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্ম-নিরপেক্ষ মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ ব্যাখ্যার তুল্য অযৌক্তিক। কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিই ভারতের ধর্ম। ভারতের ধর্মকে রূপায়িত করিয়া দেখাইবার প্রচেষ্টা হইতেই ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা সঙ্গীত প্রমুখ সাংস্কৃতিক সম্পদের উদ্ভব। কাজেই ধর্ম-ভাব বা ঈশ্বরীয় ভাবকে বাদ দিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির নিছক জড়বাদমূলক ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা কষ্টকল্পিত এবং পাশ্চাত্য জড়বাদসর্বস্ব মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্ত্ব কীর্তন করিতে হইলে ভারতীয় ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য। কারণ, শেষোক্তকে বাদ দিয়া প্রথমোক্তটি দাঁড়াইতেই পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ ঐহিক রাষ্ট্র বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের স্থাপিত সাঁচিস্থিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মভাবাত্মক স্তম্ভের উপরিভাগকে ভারতের জাতীয় শিলমোহর রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং উক্ত সম্রাট কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত সারনাথের বিখ্যাত শিলাস্তম্ভ হইতে নিছক বৌদ্ধধর্মদ্যোতক চক্রটিকে ভারতের জাতীয় পতাকায় ও ভারতের ধর্মভাব-ব্যঞ্জক বিখ্যাত অনেক স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলাদিকে বিবিধ ষ্ট্যাম্পে স্থান দিয়াছে। এই সাংস্কৃতিক প্রতীকসমূহকে ধর্ম-নিরপেক্ষ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এই সকল কারণে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াও ধর্মোদ্ভূত সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করায় স্পষ্টতঃ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না।

ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধ-বাদিগণ বলেন, ভারতের ধর্ম বলিতে প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম বুঝায়। বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম শিখধর্ম প্রভৃতি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এই মহান ধর্ম জাগতিক বা ঐহিক উন্নতিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া সকল নরনারীকে সর্বাবস্থায় কেবল পারলৌকিক উন্নতি সাধন করিতে বলেন, ইহা একেবারেই সত্য নহে। হিন্দুশাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, এই শাস্ত্র অতি মুষ্টিমেয় নিবৃত্তিপন্থী মোক্ষার্থীর পক্ষে সর্ববিধ বিষয়-বিরাগের ব্যবস্থা দিলেও আপামর জনসাধারণকে প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম সাধন করিয়া ইহকাল ও পরকালে সুখভোগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যাহা ইহকাল ও পরকালের সুখ খোঁজায় তাহাই ধর্ম; আর যাহা শিক্ষা দেয় যে, ইহ ও পর উভয় কালের সুখ-দুঃখই অস্থায়ী এবং ইন্দ্রিয়ের গোলামি, সুতরাং এতদুভয় হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তিলাভেই শান্তি, তাহাই মোক্ষ। স্পষ্ট দেখা যায় যে, সকল দেশে এবং সকল কালেই মোক্ষকামীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য; পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীই ভোগ-সুখের পশ্চাতে উন্মত্তের ন্যায় প্রধাবিত। ইহ ও পর উভয় কালে আপনাদের এবং আত্মীয়-স্বজনগণের দুঃখ-বিমুক্তি ও ভোগ-সুখ তাহাদের সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টা এবং ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাই আপামর জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। হিন্দুধর্মে এই প্রবৃত্তিপন্থী ধর্মকামী নরনারী উপেক্ষিত নহে। সংসারিগণের পক্ষে বিষয়-বিরাগ এবং ভোগ-সুখ-চেষ্টা-হীনতা হিন্দুশাস্ত্রে তামসিকতা বলিয়া অত্যন্ত নিন্দিত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবৃত্তিপন্থী সংসারী নরনারীকে উপদেশ দিয়াছেন, "সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক।" তিনি "অহিংসার" উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াও হিন্দুশাস্ত্রসার গীতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রবৃত্তিপন্থী সংসারীর পক্ষে আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোগসুখের জন্য বৈধ হিংসাও সমর্থন করিয়াছেন। কাজেই হিন্দুধর্মকে ঐহিক উন্নতি ও ভোগসুখ-বিরোধী মনে করা একেবারে অমূলক।

পক্ষান্তরে আস্তিক-মাত্রের পক্ষে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, ধর্ম অপেক্ষা মোক্ষের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত। সাধারণ নরনারীর উচ্ছৃঙ্খল ভোগলিপ্সা ও অসংযত স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে দমন করিয়া রাখিতে এবং তাহাদিগকে শাশ্বত শান্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিতে হইলে তাহাদের সম্মুখে ত্যাগ সেবা সংযম পরার্থপরতা ও মোক্ষের মহনীয় আদর্শ ধারণা করিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ধর্ম-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সকল সার্বজনীন কল্যাণকর আদর্শ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও দেশে অধর্ম অসত্য দুর্নীতি অসংযম স্বার্থপরতা উচ্ছৃঙ্খলতা পরস্বাপহরণ সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গা-হাঙ্গামা গৃহদাহ হত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি ঐ সকল বিশ্ব-

শাসন আদর্শসমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান না করিয়া ঐহিক রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কেবল ঐহিক ভোগ-সুখের উপরই গুরুত্ব আরোপিত হইতে থাকে, তাহা হইলে ঐ অনর্থগুলি এরূপ মাত্রায় বাড়িয়া যাইবে যে সমগ্র দেশ শান্তিপ্রিয় নরনারীর বাসস্থানের অনুপযোগী হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ ঐহিক বলিয়া ঘোষণা করার পর হইতে ঐ অনর্থসমূহ দেশময় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, সময় থাকিতে এই অবস্থার প্রতীকার করা সম্ভব না হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহা সমগ্র জাতির উৎসাদনের কারণ হইবে। ধর্মের আশ্রয় গ্রহণই এই সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায়। কারণ, ধর্ম হইতেই সত্য ন্যায় নীতি ত্যাগ সংযম পরার্থপরতা সাম্য মৈত্রী সমদর্শন প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদ্ভব। এই সদ্‌গুণাবলীই সর্ব-ধর্মসমর্থিত সার্বজনীন ধর্ম। ইহা সর্বজন-স্বীকৃত যে, এই ধর্ম দ্বারা দেশের জনসাধারণ যত প্রভাবিত হইবে, দেশ হইতে অসত্য অন্যায় দুর্নীতি অসংযম স্বার্থপরতা অসাম্য, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ প্রভৃতি ততই বিলুপ্ত হইবে এবং ইহার ফলে দেশময় শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিবে। এই কারণে কেবল ব্যক্তিগত জীবন নয়, পরন্তু জাতীয় জীবনও সার্বজনীন ধর্ম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে বটে, কিন্তু সার্বজনীন ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখা চলিবে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের গুরুত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "Secular state does not mean that religion ceases to be an important factor in the private life of the individual." 'ঐহিক রাষ্ট্রের অর্থ ইহা নহে যে ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইবে না।' ধর্ম-নিরপেক্ষ ঐহিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মবিশেষ যদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইতে পারে, তাহা হইলে ব্যক্তির সমষ্টি জাতির জীবনে বা জাতীয় জীবনে সার্বজনীন ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হইতে কেন পারিবে না? সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন ধর্মের নির্দেশে জাতীয় জীবন পরিচালন করিতে গণতন্ত্রের দিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য কোন বাধা দেখা যায় না। ভারতের জাতীয় জীবন সার্বজনীন ধর্মের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হইলে ভারতবাসীর সকল সমস্যার সম্যক সমাধান সুনিশ্চিত। এই সকল কারণে ভারতীয় রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ না রাখিয়া সার্বজনীন ধর্মাদর্শে পরিচালিত করা দরকার এবং ইহাই ভারতের জাতীয় জীবনে ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ সার্বজনীন ধর্মকে মানব-জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছে। এই ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই ভারতবর্ষ বহু প্রলয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লব প্রতিহত করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। সুতরাং তাহাকে বাঁচিতে হইলে ভবিষ্যতেও এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, সমগ্র ভারতবর্ষে কোন কালেই কোন ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষ বা কোন একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মমত একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অনেক প্রভাবশালী ধর্ম-প্রবর্তক এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মকে কোন একটি ধর্মমত, দার্শনিক মত বা সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা এ পর্যন্তও সম্ভব হয় নাই। হিন্দুধর্ম বলিতে কোন একটি ধর্মমত বা সম্প্রদায় বুঝায় না। ষড়দর্শন রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্ডী

পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রাশ্রিত বহু ধর্মমত ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমষ্টির নাম হিন্দুধর্ম। ইহাতে সগুণ নির্গুণ সাকার নিরাকার দ্বৈত অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত শুদ্ধাদ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত অচিন্ত্যভেদাভেদ বহুঈশ্বরবাদ একেশ্বরবাদ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিরীশ্বরবাদ এবং ভক্তিযোগ কর্মযোগ রাজযোগ জ্ঞানযোগ প্রমুখ বহু পথের সম্মানিত স্থান আছে। বহুত্বের মধ্যে একত্ব এবং একত্বের মধ্যে বহুত্ব দর্শন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মর্মবাণী। হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেয়—বহুর অন্তরালে এককে এবং একের মধ্যে বহুকে দর্শন করিতে। ইহা তত্ত্বের দিক দিয়া দেশ কাল ও জাতির গণ্ডী স্বীকার করে না। হিন্দুধর্ম মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা ঈশ্বর যেমন অনন্ত, তাঁহার নাম রূপ ভাব ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ও তেমন অনন্ত। অনন্ত ঈশ্বরকে অনন্ত ভাবে দর্শন করিবার স্বাভাবিক চেষ্টার ফলে হিন্দুধর্মে অনন্ত মত ও পথের মাহাত্ম্য স্বীকৃত। এই ঔদার্যের জন্য হিন্দুগণ পারসিক ইহুদী খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি অ-ভারতীয় ধর্মের প্রতিও যথার্থই আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এই ভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধন হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্য যে কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র বা নির্বস্তুক নয়, ইহা বর্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্দেহাতীত ভাবে দেখাইয়াছেন। কেবল ভারতীয় ধর্মসমূহ নয়, অধিকন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম আপন আপন বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও কি উপায়ে একাধারে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে—স্বাভাবিক বৈচিত্র্য অব্যাহত রাখিয়াও কিরূপে সকল ধর্মের সমন্বয় সম্ভব, তাহা তিনি নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সর্বধর্মসমন্বয়ে গণতান্ত্রিকতা পূর্ণমাত্রায় প্রকট। ধর্মজগতে ইহা অপেক্ষা উন্নততর গণতন্ত্র কেহ কল্পনায় স্থান দিতেও অসমর্থ। স্বাধীন ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্ম কিরূপ হওয়া সঙ্গত, তাহা দেখাইবার জন্যই যুগধর্মাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয় সাধন ও প্রচার। সর্বধর্মসমন্বয় যথার্থ সার্বজনীন ধর্মও বটে। কারণ, ইহাতে সকল ধর্মমতেরই সম্মানিত স্থান আছে, অথচ সাম্প্রদায়িক ভাবের কোন স্থান নাই। এই মতবাদ কোন ধর্মশাস্ত্র-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের নামের সঙ্গে যুক্ত নহে। ইহাতে প্রজাতান্ত্রিকতাও বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। ইহা কোন ধর্মবিশেষকে সমর্থন না করিয়া সকল ধর্মকেই সমভাবে সমর্থন করে। এই সকল কারণে সর্বধর্মসমন্বয় ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রের ধর্মনীতি হওয়া যুক্তিযুক্ত। ইহা কার্যে পরিণত হইলে রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ ঐহিক নীতি অবলম্বনের কুফল-স্বরূপে ইহাতে যে সকল সাংঘাতিক দোষ প্রবেশ করিয়াছে, উহা হইতে সমগ্র জাতি মুক্ত হইবে, রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করার অবশ্যম্ভাবী সুফল-স্বরূপে জনসাধারণ নিশ্চয়ই অধিকতর ধর্ম-ন্যায়-নীতি-পরায়ণ হইবে, ইহাতে ভারতের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় বৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে। দেশের সকল ধর্মকে সংরক্ষণ করিবার প্রতিশ্রুতি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণকে স্ব স্ব ধর্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াও তাহাদিগকে ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ঐক্যবদ্ধ থাকিতে উপদেশ দিয়া ভারতীয় রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে সর্বধর্মসমন্বয়-নীতিই সমর্থন করিতেছে বটে, কিন্তু এই নীতি প্রত্যক্ষ ভাবে সমর্থন করিলে জনসাধারণ উহা দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইত, পরোক্ষ সমর্থন তদ্রূপ ফলপ্রসূ হইতেছে না।

সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে, জড় বিজ্ঞানের এই পূর্ণ প্লাবনের যুগেও পৃথিবীর

অধিকাংশ নরনারী সাধারণতঃ একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং ঐহিক নহে। তাহারা স্ব স্ব ধর্মের প্রতি কমবেশী অনুরক্ত—অন্ততঃ সামাজিক ভাবে। এই শ্রেণী পরধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতার মনোরম আবরণে আবৃত নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু এই নীতি আজ পর্যন্তও সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটাইতে পারে নাই। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণের তথাকথিত পরধর্ম-নিরপেক্ষতা ও পরধর্ম-সহিষ্ণুতাকে উৎকট সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করা স্বার্থপর সাম্প্রদায়িকতা বাদীদের পক্ষে খুব কঠিন নহে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অধিকাংশ নরনারীকে কেবল পরধর্ম-নিরপেক্ষ ও পরধর্ম-সহিষ্ণু হইলেই চলিবে না, স্ব স্ব ধর্মের ন্যায় পরধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত হইতেই হইবে। রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বধর্ম-সমন্বয়নীতির আশ্রয় গ্রহণ সকল নরনারীকে স্ব স্ব ধর্মের প্রতি অনুরক্ত এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, বিভিন্ন ধর্মের এবং ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সৃষ্টিরও ইহাই একমাত্র পথ। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহাত্মা গান্ধীও আজীবন এই সর্বধর্ম-সমন্বয় নীতি কার্যতঃ অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে সর্ববিরোধ-বিনয়ন-কারী সর্বধর্মসমন্বয় স্বাধীন ভারতের প্রজা-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতিরূপে পরিগৃহীত হওয়া একান্ত সঙ্গত।

রিক্ততা

শ্রী—

আমার জীবন ভ'রি তুমি শুধু আছ,
ওতপ্রোত আছে মোর ভুবনের মাঝে।
আমার সকল ভার তুমি ত' নিয়াছ,
তবু কেন রিক্ততার ব্যথা বুকে বাজে?

তোমার চলার পথে নাহি কোন ভয়,
ধ্রুবলক্ষ্য জেগে আছে নাহিক সংশয়,
আমার দুঃখেরে তুমি ক'রে লও জয়,
তবু কেন কাঁদি আমি ব্যর্থতার লাজে?

আমার নয়ন মাঝে সদা দৃশ্যমান,
রূপে রূপে রূপময় তুমি সুমোহন,
শ্রবণে ধ্বনিছে তব আনন্দের গান,
হৃদয় ভরিয়া আছ হৃদয়-রতন!

তবু আমি তোমা হারা—পাইনা খুঁজিয়া,
ভাবি আমি বড় একা—রিক্ত দীন হিয়া,
যেন কোন্ অন্ধকারে রয়েছি ডুবিয়া,
সম্বল-বিহীন বুঝি আমার জীবন!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্‌ডি

পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন কয়েক জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা মনুষ্য-জাতিকে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সত্তার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে সত্যের অব্যর্থ সন্ধান দিয়াছেন এবং সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিবার পথ দেখাইয়াছেন। এই সব মহাপুরুষের আবির্ভাব মানুষের কল্যাণের জন্য ও মনুষ্যসমাজ রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। সাধারণ মানুষের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তিরই প্রাবল্য দেখা যায়। তাহারা হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত দ্বন্দ্বকলহে লিপ্ত থাকে। এ অবস্থায় মানুষের জীবনে সুখশান্তির সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু তথাপি মনুষ্যসমাজে যদি কোন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়, তবে তাহা এসব মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফল বলিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে ভাগবত সত্তার যে প্রকট রূপ দেখা যায় তাহাই সাধারণ মানুষের জীবনপথ আলোকিত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে সত্য, ধর্ম ও নীতির পবিত্র পথে পরিচালিত করিয়াছে। তাঁহাদের জীবনদৃষ্টে মনে হয় যেন যে প্রকৃতিরূপে পরম পুরুষ জীবজগৎ ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনিই আবার নররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যসমাজের রক্ষা ও কল্যাণ বিধান করিতেছেন। এ জন্যই আমরা তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ অথবা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ এমনি একজন দেব-মানব বা অবতার পুরুষ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের অতি সঙ্কটকালে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রায় সহস্রবর্ষব্যাপী বৈদেশিক শাসনের ফলে ভারতের নিজস্ব কৃষ্টি ও ধর্ম বিপন্ন হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে মুসলিম্ শাসনকাল অনেক দীর্ঘস্থায়ী হইলেও তাহাতে সংস্কৃতির দিক দিয়া ভারতবর্ষের যতটা ক্ষতি হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী ইংরেজশাসনে তদপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্ট হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের মাতৃভূমি যে পরাধীনতার পাশে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ভারতমাতার অনেক সন্তান ধনপ্রাণ হারাইয়াছে এবং ধর্মান্তরিত হইয়াছে একথা সত্য। তথাপি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের মূল শিথিল হইয়া পড়ে নাই। ইংরেজ-শাসনের আমলে কিন্তু আমাদের দেশে অনেকটা শান্তি বিরাজমান থাকিলেও, আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, আমাদের জাতীয় জীবনের উৎস হারাইয়া গিয়াছে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া ভারতের শিক্ষিত সমাজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস হারাইয়া পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ফলে হিন্দুধর্ম, দর্শন ও সমাজব্যবস্থা সবই বিপর্যস্ত হইয়া যায়। আমাদের ইংরেজ প্রভুদের শিক্ষামত অনেক ভারত-সন্তান ভাবিতে লাগিলেন যে হিন্দুধর্ম একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকতামাত্র এবং হিন্দুদর্শন অযৌক্তিক ও তমসাচ্ছন্ন মতবাদের নামান্তর এবং ভারতীয় কৃষ্টি কোন কৃষ্টি-নামেরই যোগ্য নহে। যখন

আমাদের ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টির এইরূপ সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া একেবারে ধ্বংস ও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ও প্রতিপত্তির কেন্দ্রস্থল কলিকাতা নগরীর উপকণ্ঠেই তাঁহার সাধনা ও শিক্ষার পীঠ স্থাপন করেন। তাঁহার পাদস্পর্শে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও উদ্যানে আজ যেন সকল তীর্থের উদয় হইয়াছে এবং সকল জাতি ও দেশের লোকই সেই তীর্থ-সঙ্গমে আসিয়া নিজেদের জীবন ধন্য করিতেছেন। হিন্দুধর্মের মহাসঙ্কটকালে এই দেবমানবের আবির্ভাব-দৃষ্টে মনে হয় যেন শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত তাঁহার আশ্বাসবাণী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য আবার ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হিন্দুধর্মের গ্লানি দূর করিতে, হিন্দুর সনাতন ধর্মের পুনঃসংস্থাপন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। কিন্তু হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য বিপথগামী অবিশ্বাসী হিন্দুর নিজ ধর্মে বিশ্বাস ফিরাইয়া আনাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাই করিয়াছেন। যে দিন স্বামী বিবেকানন্দ (তখন তিনি শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে পরিচিত) শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন—'মহাশয়, ভগবানকে কি দেখা যায়? আপনি কি দেখেছেন?' সেদিন তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হিন্দুর মনের কথাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আর যখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পবিত্র স্পর্শে বিবেকানন্দকে ঈশ্বরদর্শন করাইয়া তাঁহার সকল সংশয় দূর করিয়া দিলেন, তখন যেন অবিশ্বাসী শিক্ষিত হিন্দুসমাজ তাহার লুপ্তপ্রায় ঈশ্বরবিশ্বাস ফিরাইয়া পাইল। কথামৃতের লেখক অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন, 'মহাশয়, ঈশ্বর যখন নিরাকার তখন মাটীর প্রতিমা পূজার যৌক্তিকতা ও সার্থকতা কোথায়? এটাত বড় ভ্রান্ত পথ।' ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলেন যে ঈশ্বর নিরাকার ও সাকার দুই-ই; যাঁহাকে লোকে মৃন্ময়ী প্রতিমা বলে তিনিই চিন্ময়ী দেবী। আর ঐ মাটীর প্রতিমা পূজা করাতে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, ঈশ্বর কি জানেন না তাঁকেই পূজা করা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। মহেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইল এবং তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রবৃত্তি চলিয়া গেল। যুক্তিবাদী ইংরেজী শিক্ষাভিমানী নব্য সম্প্রদায় আজ আর প্রতিমাপূজাকে পূর্বের মত ঘৃণার চক্ষে দেখেন না বা বিদ্রূপ করেন না। এখন উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই প্রতিমাকে মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী বলিয়া ভক্তিবিনম্র চিত্তে পূজা করেন এবং সযত্নে ও শ্রদ্ধাসহকারে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই ভাবে হিন্দু-ধর্মে প্রতিমাপূজার পুতুলপূজা অপবাদ অপগত হইল এবং হিন্দুর নিজ ধর্মে ভক্তি-বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে হিন্দুধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদের (polytheism) উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু-ঈশ্বরবাদ হিন্দুধর্মে কোন কালে ছিল কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। এমন কি বৈদিক যুগেও অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি যে বহু দেবতার স্তবস্তুতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আর্য ঋষিরা এই বহু দেবতাকে এক পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা শক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে এক ষড়ৈশ্বর্যশালী ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার মূর্তি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। অন্যান্য দেব-দেবীর সম্বন্ধেও এই এক কথাই প্রযোজ্য। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত হিন্দুধর্মে এক ঈশ্বরকে মানিবার আগ্রহে বহু দেবতাকে অস্বীকার করা হয় নাই, পরন্তু এক

ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির প্রকাশরূপে বহু দেবতাকে স্বীকার করা হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার অদৃশ্য প্রভাবে হিন্দু এককালে একথা ভুলিতে বসিয়াছিল। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় বাণী সে ভ্রান্তি দূর করিয়া তাহার আত্মপ্রত্যয় ও ধর্মবিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে।

একালে হিন্দুধর্মের আর একটা সংস্কার বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দী হইতে অন্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও মানুষের জীবনধারা অতি জটিল ও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে এবং তাহার অভাব-অনটনের মাত্রাও শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন আমাদের জীবিকা অর্জন ও আহার-বিহারের সংস্থান করিতেই দিন কাটিয়া যায়। এ অবস্থায় আর হিন্দুধর্মের নির্দেশমত পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি করিবার সময় কোথায়? অতএব এখন আমাদের ধর্মজীবনের একটা সহজ ও সুগম পথ অত্যাবশ্যক, যে পথে চলিলে ধর্মের সার সত্য ও মাহাত্ম্য আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হইবে, কিন্তু উহার বাহ্যিক আড়ম্বর রক্ষা করিবার জন্য আমাদের বেগ পাইতে হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের জন্য এমন একটি যুগোপযোগী পথ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন, 'কলিতে লোকে অন্নগত প্রাণ, কলিতে নাম-মাহাত্ম্য, সত্যই কলির তপস্যা'। এসব কথার অর্থ এই যে একালে লোকের যাগ, যজ্ঞ, পূজা ও হোম করিবার সামর্থ্য ও সময় নাই; যিনি ভক্তিভরে ভগবানকে স্মরণ করেন, তাঁহার নাম-কীর্তন করেন, সত্যপথে থাকিয়া সংসারের কর্তব্য পালন করেন তিনিই ধার্মিক এবং ভগবৎ-কৃপালাভের যোগ্য ব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিতেন যে ভগবান লোকের অন্তঃকরণ দেখেন, তাহার বাহ্যিক অবস্থা বা কাজ দেখেন না; কুস্থানে যাইয়াও যদি কেহ সৎ-চিন্তা করেন তবে তিনি ভগবানের প্রিয়পাত্র হন, পক্ষান্তরে যদি কেহ মন্দিরে থাকিয়া কুচিন্তা করেন তবে ভগবান তাঁহার প্রতি বিরূপ হন। এজন্য তিনি কোন কোন সময় বলিতেন যে অজ্ঞানী পণ্ডিত শকুনের মত, অনেক উপরে উঠে বটে, কিন্তু তাহার নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে। এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের একটা যুগোপযোগী রূপ দিয়াছেন এবং উহা পালন করিবার জন্য একটা সহজ পথ নির্দেশ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থানে তাঁহার বিধি-ব্যবস্থাকে একটা নব্য আধুনিক স্মৃতিশাস্ত্র বলা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাজীবন ও গুরুরূপে শিক্ষার বিষয় লক্ষ্য করিলে আমরা তাঁহাকে সমন্বয়ের আচার্যরূপে দেখিতে পাই। তিনি পৃথিবীর ধর্মদ্বন্দ্ব নাশ করিতে, মানবমনের সন্দেহ দূর করিতে এবং সকলের ইষ্ট পূরণ করিতে জগদ্‌গুরুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্মের দ্বন্দ্ব ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ হইতে মানুষের যে কত দুঃখ ও কষ্ট, দুর্দশা ও দুর্ভোগ হইয়াছে তাহার পরিমাপ করা কঠিন। অবশ্য এজন্য ধর্ম বোধ হয় তত দায়ী নহে, যতটা ধর্মগুরু ও ধর্মনেতারা দায়ী। আজ আমাদের দেশে এবং আমাদের চক্ষের সম্মুখে আমরা একথার নিদারুণ সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি। বর্তমান যুগে ভারতে ধর্মের নামে যে অধর্মের আচরণ হইয়াছে ও হইতেছে এবং কোন এক ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বরের নামে যে বর্বরতা ও পৈশাচিকতার তাণ্ডব নৃত্য আমরা দেখিতেছি, বোধ হয় মানবের ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলিবে না। কিন্তু মানুষ যদি পশু না হইয়া মানুষের মতই চিন্তা করে, তবে সে বুঝিতে পারিবে যে ধর্মদ্বন্দ্ব ধর্মোন্মত্ততার ফল মাত্র, প্রকৃত ধর্মের কার্য নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ধর্মান্ধ ব্যক্তিরাই এক ধর্মের সহিত অন্য ধর্মের ঐক্য দেখিতে না পাইয়া

ধর্মরাজ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীতে নানা ধর্ম আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের একটি মূলগত ঐক্যও আছে। এগুলি যেন একই গন্তব্য-স্থলে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়া একই সমুদ্রবক্ষে মিলিত হয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম এক ঈশ্বরকে লাভ করিবার বিভিন্ন পথ দেখাইয়া দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'অনন্ত মত, অনন্ত পথ', 'আন্তরিক হ'লে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়'। এসব তাঁহার মুখের কথামাত্র নহে, সাধনালব্ধ ও প্রত্যক্ষীভূত জীবন্ত সত্য। তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার এবং খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সাধনপদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গাহিয়াছেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে ইহারই পুনরুক্তি দেখিতে পাই। তিনিও বলিয়াছেন, "একই তত্ত্বকে কেহ ঈশ্বর, কেহ আল্লা, কেহ গড্ বলে, যেমন একই বস্তুকে কেহ জল, কেহ ওয়াটার, কেহ পানি বলিতেছে।" তিনি এইভাবে এই সর্বধর্মের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের ও শিক্ষার এই দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় শ্রীচৈতন্য যেমন "প্রেমের অবতার", শ্রীরামকৃষ্ণ তেমন "সমন্বয়ের অবতার"।

ধর্মের দ্বন্দ্ব মিটাইতে হইলে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদগুলির সমন্বয়সাধন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এসব সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন ও কতকটা বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাই। মায়াবাদী বেদান্তীরা বলেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মস্বরূপ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব বটে, কিন্তু তিনি জীবজগদ্‌বিশিষ্ট অশেষ কল্যাণগুণযুক্ত ও জীব-জগৎ হইতে কতকটা ভিন্ন পরমার্থ সত্তা। আবার দ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন ও পৃথক সত্তা। তিনি জগতের স্রষ্টা হইলেও উপাদান নহেন; স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এসব দৃষ্টে সত্যই আমাদের মনে প্রশ্ন উঠে, 'তবে কি ঈশ্বর সাকার না নিরাকার; সগুণ না নির্গুণ; জীবজগৎ সত্য না স্বপ্নবৎ মিথ্যা ও মায়াময়?' শ্রীরামকৃষ্ণ দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে যে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে এসব প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় এবং আমাদের মনের সন্দেহও দূর হয়। তিনি বলিতেন, 'নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য; জ্ঞানীর কাছে তিনি নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্ম; যোগীর কাছে শুদ্ধ আত্মা আবার ভক্তের কাছে সগুণ ও সাকার ভগবান। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান, একই বস্তু, নামভেদমাত্র। অদ্বৈতবাদীরা জীব-জগৎকে মায়াশক্তির খেলা বলে, আর বলে বিচারে এসব স্বপ্নবৎ অবস্তু, শক্তিও অবস্তু; একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বস্তু। কিন্তু যতক্ষণ 'আমি' আছি, ততক্ষণ শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, একটি ছেড়ে অপরটিকে ভাবা যায় না। জীব-জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাহলে ওজনে কম পড়বে। যেমন বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়। তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজন করার সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন

তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি ; নামরূপ ভেদ।'

শ্রীরামকৃষ্ণের এসব অতি সরল ও সাধারণ কথার মধ্যে যে কি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা চিন্তাশীল সাধক দার্শনিকমাত্রে বুঝিতে পারিবেন। যে সব দার্শনিক সমস্যার মীমাংসা করিতে অতিবড় দার্শনিকেরও বিচারবুদ্ধি হার মানিয়াছে, তাঁহার উপদেশের আলোকে যেন সেগুলির সুষ্ঠু সমাধান করা যায়। যাহাকে মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) বলে আমাদের ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে তাহার স্থান নাই। ভগবানের অনন্ত শক্তি, অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপ, তিনি অনন্তভাবে প্রকাশিত হন। মানুষের মনও যখন যে ভূমিতে থাকে এবং তাহার জ্ঞান যে স্তরে উঠে, সেই অনুসারে ভগবান তাহার কাছে প্রকাশিত হন। বেদে মনের সপ্ত ভূমির কথা আছে, সেইরূপ হিন্দুদর্শনে জ্ঞানের চারি স্তর স্বীকার করা হইয়াছে। যখন মন নিম্নস্তরে থাকে এবং আমাদের জ্ঞান বিষয়মুখী হয়, তখন আমরা এই জড়-জগৎকেই সৎ বা সত্য বলিয়া মনে করি। আবার যখন মন কতকটা উচ্চে উঠে এবং জ্ঞান একবার বিষয়মুখী ও আর একবার আত্মমুখী হয়, তখন জড় ও চিৎ, জীব-জগৎ ও ভগবান দুইটি ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। মন আরও উচ্চ ভূমিতে উঠিলে আমাদের জ্ঞান যুগপৎ অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী হয় এবং আমরা ভগবানকে চিদচিদ্‌বিশিষ্ট সগুণ ও সাকার তত্ত্ব বলিয়া বুঝি। এস্থলে চিদাত্মা ও চিৎ-শক্তি দুইটি মিলিয়া একতত্ত্ব এরূপ বোধ হয় ; ইহাই সবিকল্প সমাধির অবস্থা। শেষে যখন মন সপ্তম ভূমি শিরোদেশে উঠে তখন জ্ঞান একেবারে অন্তর্মুখী বা আত্মমুখী হয়। এইটি নির্বিকল্প সমাধি বা তুরীয় জ্ঞানের অবস্থা। এ অবস্থায় জীব-জগৎ বলিয়া কিছু থাকে না, শুধু চিদাত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে বা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মানুভূতি হইয়া থাকে। মনের বিভিন্ন ভূমিতে অবস্থান, জ্ঞানের স্তরভেদ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিবেচনা করিলে বুঝা যায় কেন দর্শনে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কেনই বা উহাদের কোনটাই একেবারে অগ্রাহ্য নহে। সেই এক পরম তত্ত্ব মানব-মনের ও জ্ঞানের অবস্থাভেদে ভিন্নরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। অতএব অধিকারি-ভেদে দার্শনিক মত ও শাস্ত্রের অনুশাসন ভিন্ন ভিন্ন হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মূলে এই গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে এবং সেইজন্যই তিনি সর্ব-ধর্মের ও দর্শনের সমন্বয় করিয়াছেন।

উপসংহারে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বাণীর মধ্য দিয়া মানবের জীবনসমুদ্রে ধ্রুবতারার মত কোন্ কোন্ পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার আভাস দিতে পারা যায়। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। মনুষ্য ভগবানের অংশ। সমুদ্রের জল যেমন মেঘ হইয়া সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও বৃষ্টিরূপে আবার সমুদ্রে ফিরিয়া আসে, তেমনি মানুষ সংসারাবস্থায় বদ্ধজীব হইলেও ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিই তাহার জীবনের চরম পরিণতি। তাহার পর, সত্য কথা ও জীবসেবা মানুষের পরম ধর্ম। আমরা অনেক সময় ভাবি যে বিষয়কর্ম করিতে গেলে সত্য কথা বলা চলে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইলে যাহারা বিষয়কর্ম করে তাহাদেরও সত্যে থাকা উচিত। কেহ কেহ বলেন গরীব-দুঃখীকে দয়া করা কর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মানিতে হইলে তাহাদের দয়া করিতেছি না ভাবিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতেছি এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া পরোপকার করিতে

হইবে। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। অতএব লোকে যাহাকে জীবে দয়া বলে তাহা জীবরূপী ভগবানের সেবা। কোন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ উপদেশ শুনিয়া তাঁহার তরুণ ভক্ত শ্রীনরেন্দ্রনাথের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। আজ যে রামকৃষ্ণ মিশন নানারূপে ও নানাভাবে অনেক সমাজ-কল্যাণকর কাজ করিতেছে তাহার উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবে দয়া নয়, জীবসেবা' এই বেদ-বাণী, যাহাতে ধনী দাতার অজ্ঞান ও অহঙ্কার দূরীভূত হয়। তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত জীবনপথে দ্বন্দ্বকলহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিরোধের কণ্টক নাই। এপথ সত্য ও সাধুতার পথ, মিথ্যাচার বা প্রবঞ্চনার পথ নয়; উহা উদারতার পথ, সঙ্কীর্ণতার পথ নয়; উহা মিলনের পথ, বিরোধের নয়; প্রেমের পথ, হিংসার পথ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ হইতে আরও একটা পথের নির্দেশ পাওয়া যায়। কোন কোন সাধুপুরুষ নিজের মুক্তির সন্ধানে সংসার ও সমাজ ত্যাগ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে তপশ্চর্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভাবিলে মনে হয় যাঁহার হৃদয়ে দেবী জাগ্রতা আছেন, যিনি নিষ্কামভাবে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করেন, যিনি নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পাপি-তাপীকে মুক্তির পথে আকর্ষণ করেন তিনিই প্রকৃত সাধুপুরুষ এবং তাঁহারই সার্থক তপস্যা। ইহাই বিশ্বহিতে সমাহিতচিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকৃত শিক্ষা।

ভগ্নবংগের পল্লী-বধূ

শ্রীসাহাজী

'লালমাটি' সে বাপের ভিটে,'সয়রাতলি' শ্বশুর-ঘর,[১]—
পাশাপাশি দুইখানি গাঁ, মাঝে 'ময়নামতির' চর!
আজ শুনি সই, ওরা না কি আপন নয় আর পরস্পর,
কেউ কারু নয়, বিদেশ বিভুঁই ছন্নছাড়া স্বতন্তর!
হোথায় হাটে চাল বিকায় পাঁচসিকাতে আড়াই সের,
টাকায় পাঁচপো হেথায় তবু মিলবে না তা, এমনি ফের!
তিনপো চিনি হেথায় টাকায়, সেথায় আড়াই টাকা দর,
আস্কে পিঠে হেথায় গড়ি, সেথায় শরা শিকের পর!
তাও যে দু'খান আসব দিয়ে, উপায় তাহার নাইকো হায়!
'বডার গাডের অডার' কড়া, এগাঁ ওগাঁ করাই দায়।[২]

---

১ লালমাটি পূর্ব-দিনাজপুরের দক্ষিণ এবং 'সয়রাতলি' পশ্চিম-উত্তর সীমানা।

২ Border guardএর order.

রাড়ীখালে (ঢাকা) স্বামী প্রেমানন্দ *

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত রাড়ীখাল গ্রাম। তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ব্রহ্মচারী হরিহর, বিমল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ১৯১৫ সনের ২৯শে ও ৩০শে মে দিবসদ্বয় অবস্থান করেন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাসভবনে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। জগদীশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশ বাবু এবং গ্রামের মুকুন্দলাল বসু প্রমুখ ভদ্রলোকগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সেবাযত্ন করিয়াছিলেন। রাড়ীখালে স্বামী প্রেমানন্দের নিকট দিনরাত লোকের ভিড় লাগিয়া থাকিত। দলের পর দল হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-স্ত্রীলোক, বালক-বৃদ্ধ তাঁহার কাছে আসিতেন। সকলেই ভাবিতেন, ইনি আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। ঢাকা পোগোজ হাই স্কুলের পণ্ডিত শ্রীসূর্যকান্ত ভট্টাচার্য রাড়ীখালের অধিবাসী। তিনি প্রেমানন্দজীর নিকটে বসিয়া নিজের পারিবারিক দুঃখকাহিনী বলিতেছেন। তাঁহারা তিন ভাই ছিলেন। উপার্জনক্ষম কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পবয়স্কা পত্নী রাখিয়া সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার মাতা শোকসন্তপ্তা। স্বামী প্রেমানন্দ উক্ত শোকসংবাদ-শ্রবণে দুঃখিত হইলেন এবং সান্ত্বনাদানের জন্য বলিলেন, "মণি মল্লিক নামে এক ব্রাহ্ম ভক্ত ঠাকুরের কাছে আসতেন। তাঁর বড় ছেলে কেশব বাবুর সমাজে ঠাকুরকে দেখে বাপকে বলেছিল, 'বেশ সাধু দেখেছি, আপনি দেখতে যাবেন?' তারপর মণি মল্লিক এলে তাঁকে প্রথম দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমিই না অমুকের বাপ? তোমায় দেখে এই মনে হচ্ছে।' তারপর সেই ছেলেটি মারা গেল। মণি মল্লিক খুব শোকার্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে এলেন। তাঁকে শোকার্ত দেখে ঠাকুর প্রথম বল্লেন, 'তাই ত। কি করবে? পুত্রশোক কি কম?' ইত্যাদি। তারপর একটু স্থির হয়ে থেকে বাঁ হাতে ডান হাত চাপড়ে গান ধরলেন—

'জীব সাজ সমরে।
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে॥
ভক্তি-রথে চড়ি লয়ে জ্ঞান-তূণ
রসনা-ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ।
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে॥
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথরথী শত্রুনাশে
জীব হয়ে সুসঙ্গতি।
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥'

যাবার সময় মণি মল্লিক বলেছিলেন, 'আমার মন একেবারে শান্ত হয়েছে। এখন আর শোক নেই'।"

পরদিন স্বামী প্রেমানন্দ বিমল প্রভৃতি সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, এই যুবকদের উৎসাহ দেখে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। ঠাকুর আমাদের কত রসগোল্লা খাইয়েছেন, কত ভালবেসেছেন। তবে আমরা তাঁর কাছে গেছি। আর এরা কি পেয়েছে? শুধু বইয়ে তাঁর কথা পড়েছে। এদের কি উৎসাহ, কি আনন্দ! এই রোদে

* ঢাকার ভক্ত স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি হইতে সংকলিত।

পুড়ে ষ্টেশনে গেছে, নিজেরা সব জিনিষ বয়ে এনেছে, খালি পায়ে শুধু মাথায়; আবার নিজেরা রেঁধে খাওয়াচ্ছে। আবার কলেরা রোগীর সেবা করে এরা নিজেদের মান-অভিমান ভয় সব ত্যাগ করে। এদিকে লেখাপড়ায় সকলেরই মনোযোগ। এসব দেখে আমার আনন্দ ধরে না! এই দেখতেই ছুটে ছুটে আসি, নাম কিনতে নয়। আমি কি করছি? তিনিই ও সব করে রেখেছেন আমি আসবার আগে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে তাঁর পূজা হবে, প্রত্যেকে তাঁর ভাব নেবে। তোরা বেরিয়ে পড়, সর্বত্র তাঁর নাম প্রচার কর।' সেই মহাপুরুষের আদেশে চার দিকে ছুটে বেড়াই। তা নইলে আমি মূর্খ, কি প্রচার করবো? এ সব দেখে মনে হয়, দেহটা ত যাবেই। ঘরে বসে থেকে সময়মত চারটে খেয়ে, শরীরটা সুস্থ রাখলে আর কি লাভ হবে? একটু কষ্ট করে এলে যদি আমায় দেখে ওদের উৎসাহ ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তাহলে আমার না হয় একটু কষ্ট হলই। তা নইলে এতটুকু পালকিতে চড়ে আসা, বেলা তিনটায় খাওয়া, রাত্রে অনিদ্রা, এতে যে কি সুখ তাত দেখছ। কিন্তু তা হলেও ঠাকুর স্বামীজী পূর্বে যা বলে গেছেন এসব জায়গায় তা প্রত্যক্ষ দেখছি; আর ধন্য হয়ে যাচ্ছি। তোদের আর বেশি কিছু করতে হবে না। এসব তলিয়ে দেখ, তাহলেই তাঁর ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা আপনা আপনি আসবে। সর্বদা বসে ধ্যান করা কি সোজা কথা? অসম্ভব! মঠের কয়েক জনের pox (বসন্ত) হওয়ায় গঙ্গার ধারে একটি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে তাদের রেখে ভাত পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেরে গেলে তাদের ওখানেই ধ্যান-ধারণা করতে বলা হল। কিন্তু কিছু দিন বাদে তারা বলে পাঠাল, প্রথমে ভেবেছিলুম নির্জনে খুব ধ্যান করব। কিন্তু এখন এমন হয়েছে যে, আর কিছু দিন এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। তাই যতটুকু সম্ভব ধ্যান-ধারণা করে অবশিষ্ট সময় নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে হয়। তাহলে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে মন আপনি তাতে লিপ্ত হয়ে যায়।"

সময়ান্তরে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার বাল্যজীবন ও গর্ভধারিণী সম্বন্ধে রাড়ীখালে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

"মা মাঝে মাঝে কপাট বন্ধ করে সমস্ত দিন ধ্যান করতেন। সে সময় ছেলেরা কলকাতা থেকে এলে অন্য এক বাড়ীতে থাকত, পরদিন মার সঙ্গে দেখা হত। তাঁর খুব কঠোর শাসন ছিল। মিথ্যা বললেই মার দিতেন। পাড়াগাঁয়ে পড়াশুনা হবে না বলে আমাদের কলকাতায় পাঠাতেন। ওদিকে বধূঠাকুরাণীদিগকে ও ঝিদের কখনো কড়া কথা বলতেন না। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'বিদ্যাশক্তি'। একদিনের প্লেগে তিনি মারা গেলেন। ভাইদের নানা রূপ ঘরে বিয়ে হয়েছিল। তাদের জন্য মাকে মাঝে মাঝে কথা শুনতে হত। তাই আমাকে বলেছিলেন, 'তোর জন্যে তো আমায় কিছু শুনতে হয় না।' আমি ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলুম। দেখ, আমার মাথায় এখনও কেমন দাগ রয়েছে। স্বামীজী বলতেন, যার মাথায় গায় দাগ নেই সে আবার ছেলে!"

"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্"

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

রুদ্র তোমার প্রলয়-অগ্নি
দুঃসহ তেজে জ্বলে,
যাহা কিছু মোর করিছ দগ্ধ
আসিয়া মর্মতলে।
আমার নিখিলে তোমার বিরহ,
পুঞ্জিত হ'য়ে জাগে অহরহ,
মর্মন্তুদ দুঃখ-জ্বালায়
দহি আমি পলে পলে।

জীবনের মাঝে জাগিল যে রূপ
শত কামনায় ভ'রে,
তোমার প্রেমের পরম প্রকাশ
রাখিল রুদ্ধ ক'রে।
কারাকক্ষের গভীর আঁধারে,
কাঁদালো এ হিয়া কত হাহাকারে,
তুমি যে দেখেছ বন্দী আমারে,
বাঁধা শৃঙ্খল-ডোরে

তাই নির্মম নির্দয় হ'য়ে
দুর্দম তুমি এলে,
তোমার রোষের বজ্র-অগ্নি
দীপ্ত-শিখায় জেলে
তব দুন্দুভি ভেদি অম্বর,
তুলে উদাত্ত গম্ভীর স্বর,
নেত্র তোমার জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্
তীব্র রশ্মি মেলে।

দুঃসহ তুমি এসেছ আজিকে
আমার জীবন মাঝে,
জাগ্রত ক'রি দিতে চাও মোরে
তোমার আপন কাজে।
প্রেম এল তব ছিঁড়িয়া বাঁধন,
ঘুচায়ে ব্যথার সকল কাঁদন,
আমি চেয়ে আছি তব পানে শুধু
বিস্ময়ে ভয়ে লাজে

রুদ্র-ভয়াল রূপের মাঝারে
আছ তুমি শিবতম,
শিশু-চন্দ্রমা-উজ্জ্বল-ভাল
প্রসন্ন-মনোরম।
জাগো নির্মল, জাগো সুন্দর,
জাগো সুশান্ত শিব শঙ্কর,
ফিরাও তোমার দক্ষিণ মুখ
হে স্বয়ম্ভূ নমঃ নমঃ!

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় পূর্ণজীবনের আরাধনা

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

যৌবন-পূজা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। হিন্দুধর্ম্ম চিরকাল পরিপূর্ণ যৌবনকেই মানবজীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি মানবজীবনের পূর্ণ আনন্দের উদাহরণ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' যৌবনকেই এই আনন্দের আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ঈশোপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন যে, এই জগতে কর্ম্ম করিতে করিতেই শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই যাহাতে একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহার জন্য ইচ্ছা করিবে, প্রযত্নশীল হইবে। ব্যাধি জরা মৃত্যু এই তিনটিই মানুষের অনীপ্সিত। ব্যাধি ও জরা জীবনের উপর মৃত্যুরই আক্রমণ, মৃত্যুরই জয়ঘোষণা। মৃত্যুর সাথে জীবনের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম। মৃত্যু যখন আপেক্ষিক জয়লাভ করে ও জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখনই ব্যাধি, তখনই জরা। সাধারণ ব্যাধিতে মৃত্যুর কাছে জীবনের আত্মসমর্পণ হয় না, মৃত্যুকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত জীবনের একটা বিধিবদ্ধ প্রচেষ্টা হয়। জরা ত বস্তুতঃ মৃত্যুর চরণে জীবনের নৈরাশ্যময় আত্মসমর্পণ। জরাগ্রস্ত মানুষ মৃত্যু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কবলিত হইবার জন্যই প্রতীক্ষা করিতে থাকে; যতদিন কবলিত না হয়, ততদিন যন্ত্রণাভোগ। জগতের কাছে তার বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক, তাই জগতে কেহ তাহাকে চায় না; মৃত্যুও তাহাকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করে না, জাগতিক লাঞ্ছনা হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেয় না। সেই হেতু জরা প্রায়শঃ ব্যাধি অপেক্ষাও পীড়াদায়ক। 'জরামরণ-মোক্ষার্থং' মানুষের সাধনা।

যে জীবনে মৃত্যুর কোন ছায়াপাত নাই, ব্যাধি ও জরার কোন চিহ্ন নাই, যে জীবনে দেহ বলিষ্ঠ, মন দ্রঢ়িষ্ঠ, হৃদয় আশায় ভরপুর, বুদ্ধি সত্যানুসন্ধিৎসু ও বিচারনিপুণ, যে জীবনে বিষাদ অবসাদ নৈরাশ্য ও ক্লীবতার কোন প্রশ্রয় নাই, যে জীবনের সকল অবয়ব আনন্দে দোলায়মান হইয়া প্রতিনিয়ত পূর্ণতর আনন্দসম্ভোগ ও রসাস্বাদনের পথে অগ্রসর, তাহারই নাম যৌবন। এই যৌবনই জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ। পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম যৌবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই মানবজীবনের আদর্শ। যে যৌবনে সমগ্র সত্তা ও চেতনা পরিপূর্ণ আনন্দে অভিষিক্ত, যে অবস্থায় সত্তার কোন অংশ ক্ষয়িত বা মৃত্যুগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা নাই, চেতনার কোন অংশ আবৃত বিমোহিত বা বিক্ষুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, জীবনের সেই নিত্য অব্যাহত নিখিলরসামৃতসিন্ধু অবস্থাই যৌবনের পরাকাষ্ঠা, তাহাই মানবজীবনের চরম আদর্শ, তাহার জন্যই মানুষের সাধনা। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা মানুষকে 'সর্ব্বভাবেন' সেই পরিপূর্ণ যৌবনলাভের পথই চিরকাল শিক্ষা দিতেছে; সব সাধনপদ্ধতি, সব উপাসনাপ্রণালী, সব ভাবানুশীলন, সব ব্রতনিয়ম, সব উৎসব, সব বিধিব্যবস্থা এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়াই প্রচলিত হইয়াছে।

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে অসংখ্য দেবদেবীর পরিকল্পনা হইয়াছে। অধ্যাত্মদৃষ্টি ও শিল্পনৈপুণ্য পরস্পরের নিবিড় সহযোগে এই সব দেবদেবীকে

বিচিত্র মূর্ত্তিতে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এই বেদমন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সাধকগণ এক অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বকে বিচিত্র নামে, বিচিত্র রূপে, বিচিত্র গুণশক্তিতে, বিচিত্র অলঙ্কারে, বিচিত্র অদ্ভুত পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়াছেন। সব দেবদেবীর প্রাণ সেই একই পরম তত্ত্ব—অবয়ব বিচিত্র; প্রকাশভঙ্গী বিচিত্র, জাগতিক লীলা বিচিত্র, উপাসকদের সহিত সম্বন্ধ বিচিত্র। অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের চমৎকার আস্বাদন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই সব দেবদেবী সকলেই চিরযৌবনালংকৃত। সকলেই পরিপূর্ণ জীবনের বিগ্রহ। জরামরণের ছায়াপাত কোন উপাস্য দেবদেবীর জীবনেই নাই। যৌবন লইয়াই তাঁহাদের আবির্ভাব, যৌবন লইয়াই তাঁহাদের লীলাবিলাস, যৌবন লইয়াই তাঁহাদের সকল বীর্য্য ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রকাশ, যৌবনেরই বিচিত্র খেলা তাঁহাদের সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রকটিত। এই সব দেবতাগণের মধ্যে পিতা পিতামহ, মাতা মাতামহী, পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী—সকলেই নিত্য পূর্ণযৌবনের বিগ্রহ।

সর্ব্বলোক-পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অনাদি অনন্তকাল সৃষ্টি করিয়াই চলিয়াছেন। কোটি কোটি বৎসরেও তাঁহার সৃষ্টিসামার্থ্যের কিংবা সৃষ্টির উৎসাহের বিন্দুমাত্রও লাঘব হয় নাই। এক হইতে বহুর উদ্ভব সাধন করা, এককে বহুরূপে প্রতীয়মান করা, এক সত্তার অন্তর্নিহিত অব্যক্ত ঐশ্বর্য্যকে দেশে কালে বিচিত্র আশায় পরিব্যক্ত করিয়া প্রদর্শন করা, সেই বহুর মধ্যে আবার প্রত্যেকের অন্তর্গূঢ় সম্ভাবনাকে নূতন নূতন বাস্তব আকার প্রদান করা—ইহারই নাম সৃষ্টি, এবং এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চিরকালই সবেগে সানন্দে চলিয়া আসিতেছে। অনাদি অতীত হইতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে এই সৃষ্টিধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার কোন ক্লান্তি নাই, কোন অবসাদ নাই, কোন নিরুৎসাহ নাই—তাঁহার ব্যাধি নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। তিনি চিরযুবা। বিশ্বের বৈচিত্র্য-সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার অফুরন্ত যৌবনের পরিচয়। সৃষ্টির এই চিরনবীনতায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া সাধক সেই চিরযুবা সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনায় আত্ম-নিয়োগ করেন, তাঁহার প্রাণের সঙ্গে আপনার প্রাণটিকে একই সুরে ঝংকৃত করিতে প্রয়াসী হন, নিজেও এই চিরনূতন জগতে আপনাকে চিরনবীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হন এবং নূতন নূতন সৃষ্টিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও যেমন কখনো বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হন না, সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেবও তেমনি কখনো বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হন না। তাঁহার সংহারকার্য্যেরও কোন বিরাম নাই। একত্বের ভিতর হইতে বহুত্বের প্রসার করা যেমন সৃষ্টিকার্য্য, বহুত্বকে একত্বে বিলীন করা তেমনি সংহারকার্য্য। এককে বহু করার কার্য্যও যেমন অনাদি অনন্ত কাল চলিতেছে, বহুর বিনাশসাধন করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কারণে বিলীন করার কার্য্যও তেমনি অনাদি অনন্ত কাল চলিতেছে। এই সংহারকার্য্যে সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেবেরও কোন ক্লান্তি, কোন অবসাদ, কোন নিরুৎসাহ পরি-লক্ষিত হয় না। আপাত পুরাতন সব পদার্থকে কারণের একত্বে বিলীন করিয়া তিনি নূতন সৃষ্টির পথ সুগম করিয়া দিতেছেন, বিশ্বজগতের চিরনবীনত্ব রক্ষা করিতেছেন। সব সৃষ্টি চলিয়াছে ধ্বংসের দিকে। সব ধ্বংস চলিয়াছে সৃষ্টির দিকে। এক হইতে বহু, বহু হইতে এক, —উভয় স্রোত জগতে সমানভাবে প্রবাহিত হইয়া জননী বসুন্ধরাকেও চিরযৌবনসম্পন্না

করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানস্বরূপিণী সরস্বতী দেবী ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্যে বিচিত্র কলাকৌশল যোগ করিতেছেন, সৌন্দর্য্যময়ী শক্তিস্বরূপিণী উমা দেবী চিরযুবা রুদ্রদেবের অঙ্কলীনা হইয়া সংহারকার্য্যকেও বৈচিত্র্যময় ও সুশোভন করিয়া তুলিতেছেন। বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার সবই যৌবনের খেলা।

সৃষ্টি ও সংহারের মাঝখানে পালন ও পোষণ কার্য্য। যাবতীয় চেতনাচেতন সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সৌসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য স্থাপন করিয়া, বহুত্বকে ঐক্যসূত্রে সংগ্রথিত করিয়া, অশেষ বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগতের একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাই স্থিতি বা পালন কার্য্য। পালন-কর্ত্তা বিষ্ণু অনাদি অনন্ত কাল এই কার্য্যের অধ্যক্ষরূপে ভারতীয় মনীষিগণ কর্ত্তৃক অভিধ্যাত। সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে এই পালনকার্য্যে—অশেষ বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার কার্য্যে—অনন্ত সংঘর্ষের মধ্যে সৌসামঞ্জস্য সংরক্ষণ পূর্ব্বক বিশ্বকে সুন্দর ও সুমহান্ করিয়া গড়িয়া তুলিবার কার্য্যে প্রতিনিয়ত কত সমস্যার উদ্ভব ও তাহাদের কিরূপ অদ্ভুত সমাধানের ব্যবস্থা হইতেছে, কত সংগ্রাম, কত ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া কিরূপ সুন্দর মিলন ও পরিপুষ্টির বিধান চলিতেছে, কত ক্লেশ, কত আর্ত্তনাদের ভিতর দিয়া কিরূপ নিত্য অভিনব আনন্দের বিকাশসাধন হইতেছে, কত বীভৎসতা, কত ভীষণতাকে কিরূপ নূতন নূতনতর মাধুর্য্যের উপকরণরূপে ব্যবহার হইতেছে! অদ্ভুত এই পালন ও পোষণ কার্য্য। বিশ্বের প্রত্যেক অঙ্গের প্রত্যেক সমস্যাই যেন বিশ্বকে মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও আনন্দের এক একটি উন্নততর স্তরে তুলিয়া দিবার জন্য সুষ্ঠু আয়োজন। এই দ্বন্দ্বময় জগতে দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও ব্যাপকতার ভিতর দিয়াই ক্রমোৎকর্ষ-সাধনের বিধান। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র অত্যাশ্চর্য্যভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র সকল স্তরে বিঘূর্ণিত হইতেছে। বৈষম্যসৃষ্টির যেমন বিরাম নাই, এক সত্যকে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী অসংখ্য ভাবরূপে অভিব্যক্ত করিবার সৃষ্টি-কার্য্য যেমন অব্যাহত গতিতে অনাদি অনন্ত কাল চলিতেছে, তেমনি এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বৈষম্য ও নৈষ্ঠুর্য্যের ভিতর দিয়াই সেই এক সত্যেরই স্বরূপভূত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যকে এই বিশ্বের মধ্যে নিত্য নূতন রূপ দান করিবার কার্য্যও অদ্ভুতভাবে অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। সৃষ্টি ও সংহারের মাঝখানে পালন ও পোষণ কর্ত্তা বিষ্ণু সদা জাগ্রত। তাঁহারও ক্লান্তি নাই, অনবধানতা নাই, অবসাদ নাই, অনুৎসাহ নাই। চিরযৌবনের পরিপূর্ণ পরাকাষ্ঠা তাঁহারও স্বরূপ-ভূত। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী-দেবী নিয়ত তাঁহার সেবারতা। প্রকৃতিরাজ্যের অধিনায়ক দেবতাবৃন্দের জীবনলীলায় জরা ব্যাধি মৃত্যুর কোন ছায়াপাত নাই। পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শস্বরূপ এই দেবগণই হিন্দুর উপাস্য, হিন্দুর জীবনাদর্শ।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি যত দেবতা পরিকল্পিত হইয়াছেন সকলেই চিরযুবা, চিরনবীন। ভারতীয় জীবনের আদর্শস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি অবতারগণ, নারদ শুক প্রভৃতি ঋষিগণ, ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ, দত্তাত্রেয় গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগিগণ—সকলেই চিরযুবা, চিরনবীন। মানুষ হিসাবে তাঁহাদের বয়োবৃদ্ধি ও দৈহিক বার্দ্ধক্য স্বাভাবিক নিয়মে হইলেও, হিন্দুজাতির স্মৃতিতে তাঁহাদের কারোই বৃদ্ধরূপ নাই, প্রত্যেকেই চিরকাল পূর্ণ যৌবনের বিগ্রহরূপে স্মরণীয় ও পূজনীয়। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ রূপযৌবনই ভারতীয় শাস্ত্রে উপাস্যরূপে পরিগৃহীত।

ভারতের এই যৌবন-পূজার একটি বিশেষ

অভিব্যক্তি বসন্তোৎসব। বসন্তোৎসব অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত। জনসাধারণের রুচি বুদ্ধি প্রকৃতি অনুসারে এই উৎসব বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন যুগে বিচিত্র আকারে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ভগবান্ গীতার বিভূতিযোগে বলিয়াছেন—"ঋতুনাং কুসুমাকরঃ"—সব ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি এই ঋতুতে বিচিত্র রূপে রসে বর্ণে গন্ধে -শোভায় সম্পদে আত্মপ্রকাশ ও আত্মসম্ভোগ করে। শীতের জড়তার অবসানে প্রকৃতিদেবীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বন্ধনমুক্ত প্রাণের খেলায় উল্লসিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। ভবিষ্যতে তাহার কোন অঙ্গ যে তাপদগ্ধ হইতে পারে, সে কল্পনাই তাহার অন্তরে স্থান পায় না। নাতিশীতোষ্ণ মলয়ানিলকে সাথী করিয়া সে তাহার পূর্ণজীবন ও পূর্ণযৌবনের আস্বাদনে ভরপুর। বাসন্তী প্রকৃতির এই জীবন-ভরা যৌবন-ভরা প্রাণের সহিত আপনাদের দেহমন প্রাণ মিলাইয়া ভারতের নরনারী রঙ্গের খেলায় আপনাদের জীবন-যৌবনের রসাস্বাদনে উন্মাদিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতির 'বিজর বিমৃত্যু বিশোক' অমৃতময় প্রেমময় আনন্দময় সমষ্টি-প্রাণের সহিত আপনাদের ব্যষ্টিপ্রাণসমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া, একসুরে ঝঙ্কৃত করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল হিন্দুসন্তান জীবনের পূর্ণ আদর্শকে আস্বাদন করিতে প্রযত্নশীল হয়। বসন্তের প্রথম শুক্লা পঞ্চমীতে সর্ব্বকলাবিদ্যা-ধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীদেবীর আবাহনে এই বসন্তোৎ-সবের প্রারম্ভ, বসন্তের শেষ শুক্লা নবমীতে পশুরাজবাহিনী অসুররাজমর্দ্দিনী বীর্য্যৈশ্বর্য্যবিদ্যা-সিদ্ধিপ্রসবিনী নিত্যশিবসুন্দরসঙ্গিনী মহাশক্তিময়ী পরাপ্রকৃতির আরাধনে এই বসন্তোৎসবের পরি-সমাপ্তি। সমষ্টিপ্রাণের বিজয়ঘোষণার ভিতর দিয়া আপন প্রাণের পরিপূর্ণ স্বরূপটি সাধক মানুষ সানন্দে অনুসন্ধান করেন, অভিনয়ের ভিতর দিয়া তাহা আস্বাদন করেন।

বাংলা দেশের দোলযাত্রায় এই বসন্তোৎসবের একটি অসাধারণ মহিমমণ্ডিত বিকাশ। ত্রিতল বেদীর উপরে দোলের ঠাকুর পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ শক্তি, পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ কল্যাণ ও পরিপূর্ণ প্রেমের নিবিড় আস্বাদনময় পরমানন্দে নিত্য দোলায়মান। সেখানে তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তিনিচয়কে নিয়া তাঁহার নিত্য বিহার। তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন সত্তা, বীর্য্য ও জ্ঞান পরম কল্যাণে সুশোভিত, পরম প্রেমে, সুমধুর পরম আনন্দে উল্লসিত। তাঁহার সন্ধিনী ও সম্বিৎশক্তি হ্লাদিনী শক্তির অঙ্কলীনা। জীবন ও যৌবনের সেখানে পরম পরাকাষ্ঠা, গভীরতম আস্বাদন। এই অপ্রাকৃত অবিকার দেশকালাতীত পরমানন্দময় ধামই জীবনযৌবনের নিত্যধাম, 'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে'। এখানে জরাব্যাধিমৃত্যুর উঁকি মারাও নিষিদ্ধ। সাধক মানুষ সর্ব্ববন্ধনবিবর্জ্জিত হইয়া সম্যক্ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থায় আনন্দসমাধিতে বিশ্বের প্রাণপুরুষের এই নিত্যধামে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, আপনার জীবনযৌবনের পরিপূর্ণ স্বরূপটি আস্বাদন করেন।

এই আস্বাদন অবতরণ করে ত্রিতল বেদীর দ্বিতীয় সোপানে—অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য বিলাস-ধাম হইতে তটস্থা শক্তির বৈচিত্র্যময় আস্বাদন-ক্ষেত্রে—তত্ত্বের রাজ্য হইতে জীবের ভাবের রাজ্যে। তত্ত্বের রাজ্যে যিনি আপনাতে আপনি প্রেমঘনানন্দে নিত্যদোলায়মান, সেই ঠাকুরটিই আপনার জীবভূতা তটস্থা শক্তির ভাবের রাজ্যে অবতীর্ণ হইয়া আপনার নিত্যপরিপূর্ণ জীবন-যৌবন কত বৈচিত্র্যময় ভাববিলাসের আকারে আস্বাদন করেন। এই ভাবের রাজ্যে অদ্ভুত যুগলরূপের বিকাশ ও সম্ভোগ। এখানে মিলনের সহিত বিরহের যুগল ভাব, হাসির সহিত

কান্নার যুগল ভাব, হর্ষের সহিত বিষাদের যুগল ভাব, দৈন্যের সহিত অভিমানের যুগল ভাব, আরো কত কি! কত কাব্য, কত নাটক, কত শিল্পকলা, কত উৎসব, কত পূজার্চ্চনা, কত সাধন-ভজনের মধ্যে আনন্দময় রসরাজের আত্মানন্দসম্ভোগ বিচিত্র রসসমন্বিত রূপ অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া পরিগ্রহ করিতেছে। তত্ত্বের রাজ্যে বিশুদ্ধ আলোর খেলা, ভাবের রাজ্যে আলোছায়ার বিচিত্র খেলা। সব আলো-ছায়ার আলিঙ্গন ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এক ভাবাতীত আনন্দই বিচিত্র ভাবে দোলায়িত। এই ভাবের রাজ্য তত্ত্ব ও বাহ্যপ্রকৃতির মাঝখানে অবস্থিত। তত্ত্বের আলো ও বহিঃপ্রকৃতির ছায়া—অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ ও বহিরঙ্গা শক্তির আবরণ—দুই-এরই প্রভাব তটস্থা শক্তির ভাবের রাজ্যে। প্রকাশ ও আবরণ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভাবের রাজ্যের শোভাসম্পদ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যকে বিচিত্র আকার প্রদান করিয়াছে। 'কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে' রূপাতীতের আত্মাস্বাদন ভাবরাজ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভাবসাধকগণ ভাবের রাজ্যে ভাবাতীতের অবতরণ উপলব্ধি করিয়া, পূর্ণ জীবন-যৌবনের অশেষ বৈচিত্র্যময় লীলা আস্বাদন করিয়া, পরমানন্দে ভাবসাগরে সন্তরণ করিতে থাকেন, ভাবের বিচিত্র তরঙ্গহিল্লোলে আপনার জীবন-যৌবনের বিচিত্র রসাস্বাদন করিতে থাকেন।

ভাবাতীত নিত্যধামের হ্লাদিনীশক্তিবিলাসী সচ্চিদানন্দঘন পরম পুরুষ ভাবরাজ্যের বিচিত্র-রসাস্বাদনের দোলায় চড়িয়া অবতরণ করেন ত্রিতলবেদীর নিম্নতম সোপানে, বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির দেশকালবিস্তৃত পার্থিব জগতে। অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যের রসবৈচিত্র্য স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে পার্থিব রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের অফুরন্ত সত্তাবৈচিত্র্যে। এ জগতে কত বিচিত্র আকারের কত বিচিত্র রূপ রস গন্ধ স্পর্শের ওষধি বনস্পতি লতা পাতা ফুল ফল, নদনদীর কত বিচিত্র প্রবাহ, পর্ব্বতমালার কত বিচিত্র গাম্ভীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের কত বিচিত্র আকৃতি প্রকৃতি, কত বিচিত্র জীবনযাপন ও সুখ-সম্ভোগের প্রণালী, মানুষের কত বিচিত্র শক্তিসামর্থ্য, কত বিচিত্র হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি, কত উদ্ভাবনী শক্তি, সংগঠনী শক্তি, সংহারিণী শক্তি, কত বিচিত্র সত্যানুসন্ধিৎসা, রসপিপাসা, ভাববিলাস, ভোগলিপ্সা! একই আনন্দঘন পরমপুরুষ আপনার অসীম আনন্দ-সত্তাকে অনন্তরূপে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত কত অনন্ত প্রকার আবরণ সৃষ্টি করিয়াছেন, কত অনন্তপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের আয়োজন করিয়াছেন, কত অদ্ভুত কলাকৌশলে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিয়া সম্ভোগলিপ্সু অন্ধের মত আপনাকে আপনি খুঁজিতেছেন, খুঁজিয়া না পাইয়া কাঁদিতেছেন, খুঁজিয়া নূতন ভাবে আবিষ্কার করিয়া উল্লসিত হইতেছেন। বিশ্বজগতের সকল বিভাগে এই আনন্দের খেলা, যৌবনের খেলা, বসন্তের খেলা চিরকাল চলিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতি নিত্যনূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া, নিত্যনূতন বেশভূষায় অলংকৃত হইয়া, পুরাতন জীর্ণমলিন নিষ্প্রভ সব কিছু আপনার মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়া, চিরযৌবনের বিচিত্র ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছেন। মায়িক জগতের সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসের তরঙ্গায়িত প্রবাহের মধ্যে ভাগবতী হ্লাদিনী-শক্তিই আপনাকে বিচিত্র আকারপ্রকারে অভিব্যক্ত করিতেছেন এবং ভগবানের আত্মানন্দ-সম্ভোগের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন। বাসন্তী পূর্ণিমার দোলের উৎসব এই অধ্যাত্ম-দৃষ্টিকেই জীবন্ত ভাবে আস্বাদনের প্রচেষ্টা।

রসিক ভাবুক প্রেমিক ভক্ত এই দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের যাবতীয় ব্যাপারপরম্পরা সন্দর্শন

করিয়া সর্ব্বত্রই অনন্তরস-বিলাসী চিরতরুণ শ্রীভগবানের লীলারস আস্বাদন করেন এবং আপনার জীবনকে সেই পরিপূর্ণ জীবন যৌবনের নিত্য আদর্শের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে যোগযুক্ত করিতে প্রয়াসী হন। দেহের সব পরিণামকে, জগতের সব ঘটনাকে তিনি সমানভাবে 'রম্যতরৈব' সম্ভোগ করেন। জীবন তাঁহার কাছে কখনো পুরাণো বা বিরস হয় না, জরার অনুভূতি তাঁহাকে স্পর্শ করে না, মৃত্যু তাঁহাকে বিভীষিকা দেখায় না, দৈত্যদানবের তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সন্ত্রস্ত সংকুচিত বা অবসাদ-গ্রস্ত হয় না। সমস্ত জগতে তিনি আনন্দময়ের আনন্দের খেলা দেখিয়া পূর্ণ জীবন যৌবন লইয়া সব রঙ্গের খেলায় সপ্রেমে যোগদান করেন। বসন্তের উৎসবে মাতিয়া বিশ্বের সকল মানুষকে সকল জীবকে আহ্বান করিয়া, তিনি প্রাণের আলিঙ্গন দানে রঙ্গিন করেন এবং সকলের মধ্যে এক নিত্য সত্য রসময় নির্ব্বিকার পরিপূর্ণ জীবনের বিচিত্র প্রকাশ দর্শন করেন।

পার্থিব জীবনের সকল অপূর্ণতা, সকল অভাব-অভিযোগ, সকল দ্বন্দ্ব-কলহ, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা, সকল দুর্ব্বলতা মলিনতা কদর্য্যতার মধ্যে এক পরিপূর্ণ সচ্চিৎপ্রেমানন্দঘন পরমপুরুষের প্রেম কল্যাণ ও আনন্দের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অনুসন্ধান করিয়া, জীবনের সকল বিভাগে পূর্ণতার আস্বাদন করিবার অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার ভারতীয় অধ্যাত্মসংস্কৃতির একটি চমৎকার অভিব্যক্তি।

তৃষা

শ্রীরবি গুপ্ত

আশিস্ তোমার প্রদীপসম জ্বলে সকল তিমির-তলে,
বিচ্ছুরিয়া দেয় সে তব দীপন-বাণী প্রতিপলে।
নাশে চির আঁধার-কালো
ফোটায় প্রিয়-উষা-আলো,
ছায় সুরভি আরক্ত রাগ-রঞ্জিত মোর গহন-দলে,
আশিস্ তোমার প্রদীপসম জ্বলে সকল তিমির-তলে।

মাগো, তোমার পরশ-সুধায় চিনেছি মোর প্রাণের তৃষা,
তাই জেনেছি তিমির রাতে কোথায় চির দিনের দিশা।
বাঁধনহারা স্রোতের টানে
উধাও জীবন অসীম পানে,
প্রমুক্ত মোর জীবন-ধারা তোমার জ্যোতির ধারায় চলে,
আশিস্ তোমার প্রদীপসম জ্বলে সকল তিমির-তলে।

মণ্ডন মিশ্র বনাম শংকর-সুরেশ্বর

স্বামী বাসুদেবানন্দ

(১) মাহীষ্মতীনিবাসী মণ্ডন তাঁর 'স্ফোট-সিদ্ধি'তে স্ফোটবাদ এবং শব্দাদ্বৈতবাদ স্বীকার করেছেন। আচার্য্যপাদ তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (১৩।২৮-৩০সূ) ভর্তৃহরির মত খণ্ডন কালেই ঐ মত খণ্ডন করেন। বিশ্বরূপ-সুরেশ্বর এ সম্বন্ধে স্বীয় আচার্য্যের অনুকূল। মণ্ডন উপনিষদের ওঁকারকেই (তৈঃ উঃ ১।৮।১, ছাঃ উঃ ২।২৩।৩, প্রশ্ন ৫.২) তাঁর প্রতিপাদ্য শব্দ-ব্রহ্মের স্বরূপ বলেছেন, পরন্তু শংকর ও সুরেশ্বর প্রণবকে প্রবর্ত্তক অদ্বৈত-সাধকদের অনুকূল ব্রহ্মপ্রতীক-রূপে গ্রহণ করেছেন।

(২) মণ্ডনের ভ্রমের ব্যাখ্যা কুমারিলের বিপরীত-খ্যাতিরই অনুকূল, যা নৈয়ায়িকদের অন্যথাখ্যাতিরই নামান্তর। বাচস্পতি 'ব্রহ্মসিদ্ধি'র যে 'তত্ত্বসমীক্ষা' নামক টীকা লেখেন, তাতে এই অন্যথা-খ্যাতির ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেন, পরন্তু শংকর ও সুরেশ্বরের ব্যাখ্যা অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিরূপেই পণ্ডিতসমাজে বিদিত। কিন্তু অমলানন্দ স্বামী ব্রহ্মসূত্রের 'কল্পতরু' টীকায় বাচস্পতি সম্বন্ধে অনির্বচনীয়া খ্যাতিই পোষণ করেন—"স্বরূপেণ মরীচ্যম্ভো মৃষা বাচস্পতের্মতম্। অন্যথাখ্যাতিরিষ্টাস্যেত্যন্যথা জগৃহুর্জনাঃ॥"

(৩) 'ব্রহ্মসিদ্ধি'তে মণ্ডন দুরুক্রমা অবিদ্যার (nescience) দ্বিধা বিভাগ করেছেন—অগ্রহণ (non-apprehension) এবং অন্যথাগ্রহণ (mis-apprehension)। কিন্তু শ্রীশংকর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্যে (১৩।২) অবিদ্যাকার্য্য ত্রিধা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—বিপরীত-গ্রাহক, সংশয়-উপস্থাপক এবং অগ্রহণাত্মক। মণ্ডন-মতে বেদাধ্যয়নের দ্বারা উক্ত অন্যথা-গ্রহণরূপ ভ্রমটি যেতে পারে, কিন্তু যথার্থ তত্ত্বগ্রহণ নিরন্তর ব্রহ্মভাবনারূপ নিদিধ্যাসন উপাসনা-কর্ম্ম ছাড়া হতে পারে না। বেদার্থজ্ঞানের দ্বারা একটা পরোক্ষ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু ধ্যানধারণার দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। 'ব্রহ্মসূত্র'-ব্যাখ্যা-কালে বাচস্পতি মিশ্রেরও এইরূপ অভিমত অভিব্যক্ত হয়ে পড়ে। এইজন্য মণ্ডন-মতে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যসম্পাদন হয় বটে, কিন্তু তা হলেও শাস্ত্রার্থজ্ঞান হলো পরোক্ষ। এই শাস্ত্রার্থজ্ঞান যদি ধ্যানাদি উপাসনা-পূত হয়, তা হলেই তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি হয়। এই জ্ঞানকেই তিনি প্রসংখ্যান বলেন। (প্রসংখ্যান কথাটি নব্য সাংখ্যাদিতেও পাওয়া যায়)। 'কল্পতরু'-কার অমলানন্দের মতে এ বাচস্পতিসম্মতও বটে (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪, ভামতী)। "অপি সংবাধনে সূত্রাচ্ছাস্ত্রার্থধ্যানজা প্রমা। শাস্ত্রদৃষ্টির্মতা তাং তু বেত্তি বাচস্পতিঃ পরম্॥"—(ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪ কল্পতরু)। [এইরূপ মতবাদ সম্বন্ধে সুরেশ্বর তাঁর 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি'তে (১।৬৭) ব্রহ্মদণ্ড নামক পূর্ব্বমীমাংসকের উল্লেখ করেছেন। সুরেশ্বর 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি'র ৩।৬৪-৭১, ১২৩।২৬ কারিকায় এবং বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক ১।২০৬-২১৬, ৮।৮-৪৯; ৩।৭১৬-৯৬১ শ্লোকে মণ্ডনের মত খণ্ডন করেছেন।]

শ্রীশংকর-সুরেশ্বর মতে বেদার্থজ্ঞানই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ; যম, নিয়ম, ধ্যান, ধারণাদি তত্ত্বজ্ঞানের সহকারী মাত্র। [এ সম্বন্ধে "তং

স্তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ উঃ ৩৷৯৷২৬), বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" (মুণ্ডক উঃ ৩৷২৷৬) "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" (বৃঃ উঃ ৪৷৪৷২১), "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সুঃ ২৷১৷১১), "আবৃত্তি-রসকৃদুপদেশাৎ" (ব্রঃ সুঃ ৪৷১৷১), "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সুঃ ১৷১৷৩), শাং ভাষ্য দ্রষ্টব্য ।] মণ্ডন ধ্যানাদি উপাসনাকর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের করণ করাতে, জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়ও সমর্থিত হয়েছে। পরন্তু কেহ কেহ বলেন, ভগবান শংকর গীতাভাষ্যে (২৷২১) এই সমুচ্চয় মতই পোষণ করেন। কারণ গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ শ্লোক ব্যাখ্যা কালে প্রশ্ন হয়েছে—"ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, কারণ করণের অগোচর।" তাতে তিনি উত্তর দিচ্ছেন—"ন, 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্ বৃঃ উঃ ৪৷৯৷২১) ইতি শ্রুতেঃ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-শমাদিসংস্কৃতমন আত্মদর্শনে করণম্।"—অর্থাৎ সংস্কৃত মনই নিদিধ্যাসনাদি কর্ম্মবৃত্তির দ্বারা আত্মদর্শনের করণ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ মনঃ-সংস্কারের সহকারী মাত্র।

কিন্তু আনন্দগিরি করণপক্ষে ধ্যানাদি-সংস্কৃত মন পদটিকে গৌণরূপে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মননিদিধ্যাসন-মনোব্যাপারবিশিষ্ট তত্ত্বমস্যাদি শব্দজন্যই তত্ত্বজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। কেন না আচার্য্য এর পূর্ব্বে ভাষ্যেই বলেছেন—"যথা চ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাদ্ ধর্ম্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্ত্তুঃ চ দেহান্তরসম্বন্ধি জ্ঞানং চ উৎপদ্যতে, তথা শাস্ত্রাৎ তস্য এব আত্মনঃ অবিক্রিয়ত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বাদি-বিজ্ঞানং কস্মাৎ ন উৎপদ্যতে ইতি প্রষ্টব্যাঃ তে।" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মাস্তিত্ববিজ্ঞান ও দেহান্তর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যখন শাস্ত্রোপদেশ-সামর্থ্যেই হয়ে থাকে, তখন আত্মবিজ্ঞানও কেন শাস্ত্রোপদেশতঃ হবে না? আবার পরবর্ত্তী ভাষ্যেই বলছেন—"তথা চ তদধিগমায় অনুমানে আগমে চ সতি জ্ঞানং ন উপপদ্যতে ইতি সাহসম্ এতৎ।" —অনুমানাদি সহকারে আগম প্রমাণ থাকতে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এ কথা সাহসমাত্র। অতএব বলতে হয় শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ শ্রবণ যেমন মনঃশুদ্ধিকারক সেইরূপ উহা ঐ সংস্কৃত মনে অবিদ্যাবরণ-নাশের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানেরও কারণ। তা ছাড়া ব্রহ্মসূত্রের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১৷১৷৩) সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শব্দপ্রমাণ ভিন্ন অন্য গৌণ প্রমাণ হতে শিষ্যদের স্পষ্টতঃ সাবধান করে দিচ্ছেন—"তত্র পূর্ব্বসূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্য অনুপাদানাজ্জন্মাদি কেবলমনুমানম্ উপন্যস্তমিত্যা-শংকতে, তামাশংকাং নিবর্ত্তয়িতুমিদং সূত্রং প্রবর্ত্ততে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" আর তা ছাড়া 'আত্মানাত্মবিবেকঃ' গ্রন্থে আচার্য্যপাদ অশেষ-বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ষড়বিধ লিঙ্গের 'অপূর্ব্বতা' সম্বন্ধে বলছেন—"অপূর্ব্বতা তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য অদ্বিতীয়বস্তুনঃ প্রমাণান্তর-বিষয়ীকরণম্।" এই অপূর্ব্বতা-লিঙ্গের সমর্থক "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ উঃ ৩৷৯৷২৬) এবং "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" (মুণ্ডক উঃ ৩৷২৷৬), "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" (বৃঃ উঃ ৪৷৪৷২১) প্রভৃতি উপনিষদ্‌ভাষ্যগুলি স্পষ্টার্থক।

সাধক কি ধ্যান করবে, কি মনন করবে, যদি না অপ্রমেয় ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে পূর্ব্বশ্রুত না হয়? কাজে কাজেই মনন ও নিদিধ্যাসন যথার্থ বেদবাক্যার্থজ্ঞানের সহায়ক-মাত্র। নচেৎ ধ্যানাদি উপাসনা-কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মবিজ্ঞানের সমুচ্চয় হয়ে পড়ে। এই জন্য সুরেশ্বর ও মধুসূদন সমুচ্চয়বাদীদের একটু বিদ্রূপচ্ছলেই বলছেন, এইরূপ ব্রহ্মোপাসকেরা তার্কিকগণ হতে ব্রহ্মবিচারে ভীত হয়ে পড়েন—"কেচিৎ তার্কিকেভ্যো বিভ্যতঃ।"— (মধুসূদন-কৃত 'বেদান্তকল্পলতিকা')।

(৪) মণ্ডন বলেন, অবিদ্যার আশ্রয় (locus) হচ্ছে জীব। এই অবিদ্যাই জীবের জ্ঞান আবরণ করায়, অজ্ঞানী জীবের নিকট ব্রহ্ম

বিষয়াকারিত (জ্ঞেয়:—প্রমেয় অর্থাৎ objecti-fied) হয়ে পড়েন। পরন্তু সুরেশ্বর জীবাশ্রিত চৈতন্য ও বিষয়াপন্ন চৈতন্যের ঐক্যসাধন করায় আচার্য্যপাদ শংকরকে আশ্রয় করে দুটি প্রস্থান উঠলো—বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী-প্রস্থান (মণ্ডনের অনুকূলে) এবং প্রকাশাত্ম-যতির বিবরণ-প্রস্থান (যিনি সুরেশ্বর-পদ্মপাদাদির অনুসরণ করেছেন)। বাচস্পতি মিশ্র এই দুটি মায়ার (প্রমাতা মায়া—জীবাশ্রিত এবং প্রমেয় মায়া—বিষয়াশ্রিত) দ্বিবিধ নামকরণ করেছেন—জীবাশ্রিত খণ্ড মায়া 'তুলা' এবং বিষয়াশ্রিত সমষ্টি মায়া 'মূলা'।

(৫) মণ্ডন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী বলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হতে গৃহাস্থাশ্রম অবশ্যাবলম্বনীয় বলেন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হতে একেবারে সন্ন্যাসাশ্রম তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অগ্নি-হোত্রাদি শুভকর্ম্মার্জ্জিত গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থের মধ্য দিয়ে চিত্তশুদ্ধি-পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনে স্খলনের ভয় থাকে না এবং তাঁরা অতিশীঘ্র উন্নত হন, পরন্তু প্রথমাশ্রম হতে একেবারে চতুর্থাশ্রমীরা অতি স্খলনশীল এবং উন্নতিমার্গে তাঁদের গতি অতি মন্থর।

পরন্তু শংকর-সুরেশ্বর কর্ম্মকে একেবারে জ্ঞানের পরিপন্থী বলেছেন। অবশ্য যারা দুর্ব্বল, তাদের জন্য তিনি গৃহস্থাশ্রমে থেকে নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের ব্যবস্থা করেছেন। গার্হস্থ্য-কর্ম্মযোগ মানে ঈশ্বরে ফল ত্যাগ পূর্ব্বক সেবাবুদ্ধিতে সাংসারিক কর্ম্ম করা। কিন্তু যখন যথার্থ বৈরাগ্য আসবে, তখন কর্ম্ম যতই উচ্চ স্তরের হোক না কেন তার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব বুদ্ধি কর্ম্মাসক্তি এবং ফল শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের প্রতি বিক্ষেপই সৃষ্টি করে। আর তা ছাড়া গৃহস্থদের পক্ষে সাংসারিক সংস্কারগুলি অতিক্রম করা সন্ন্যাস-জীবনে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এসম্বন্ধে সুরেশ্বর বলছেন—"শুদ্ধমানস্ত তচ্চিত্তমীশ্বরার্পিত-কর্ম্মভিঃ। বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ ব্যনক্ত্যর্থং সুনির্ম্মলম্॥"—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ১।৪৭। "কর্ম্মজ্ঞান-সমুত্থত্বান্ন্যাসাৎ মোহাপনুত্তয়ে। সম্যগ্জ্ঞানং বিরোধস্য তামিস্রস্যাংশুমানিব॥"—(ঐ ১।৩৫)।

(৬) মণ্ডন ঈশোপনিষদের (৯ মন্ত্র) 'অবিদ্যা' শব্দের অর্থ করেছেন 'কর্ম্ম' এবং এই কর্ম্ম যদি নিষ্কাম ভাবে করা যায়, তা হলে কর্ম্মবীজ নষ্ট হয় (যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা")। তখন ব্রহ্মবিদ্যা নিরংকুশ হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের হেতু হয়। তিনি ঈশোপনিষদের "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া-মৃতমশ্নুতে" (১১) মন্ত্রের অর্থ করেছেন, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অনিত্য কর্ম্মফলরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করে ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা অমৃতরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু শংকর ও সুরেশ্বর 'অবিদ্যা' মানে মন্ত্রার্থ এবং কোটি-জ্ঞান-রহিত-কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মবিজ্ঞানহীন (without knowing the philosophy of karma), 'বিদ্যা' মানে দৈবত-বিজ্ঞান অর্থাৎ অহংগ্রহাদি উপাসনা এবং 'অমৃত' মানে আপেক্ষিক মোক্ষ ব্রহ্মলোকাদি করেছেন। যজ্ঞকর্ম্ম এবং উপাসনাকর্ম্ম—এই উভয়বিধ কর্ম্মেই কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলবুদ্ধির প্রয়োজন। কাজে কাজেই উক্ত উভয় কর্ম্মের সমুচ্চয়শ্রুতি স্বীকার করেছেন—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" পরন্তু 'নাহং'-মূলক ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বদাই কর্ম্মবিরোধী, তা যতই মহান্ বা সুন্দর ফলপ্রসূ হোক।

(৭) মণ্ডনের মতে জীবন্মুক্ত এবং আধি-কারিক পুরুষ এক নয়, তাঁরা বিভিন্ন স্তরের। জীবন্মুক্ত কারা? যাঁরা ব্রহ্ম স্পর্শ করেছেন, তাঁদের দেহপাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, আর তাঁদের নব কলেবর ধারণ করে প্রারব্ধ ক্ষয় করতে হবে না, এমন কি ব্রহ্ম স্পর্শের পরও

যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ বুঝতে হবে তাঁদের চিত্তে অবিদ্যা লেশ বা গন্ধ মাত্র আছে। কিন্তু যথার্থ পূর্ণত্ব লাভ করলে দেহধারণ বা প্রারব্ধ-ক্ষয় হেতু পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব। (শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "শুকনো পাতার মত চব্বিশ দিনের মধ্যে দেহ ঝরে পড়ে")। মণ্ডন বলেন গীতোক্ত 'স্থিতপ্রজ্ঞ' (২।৫৫-৫৮) বা আধিকারিক পুরুষ, (শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের সিদ্ধের সিদ্ধ বলতেন) সেরূপ সিদ্ধ নয়; তবে তাঁরা খুব উচ্চস্তরের লোক, লেশমাত্র অবিদ্যাকে আশ্রয় করে সম্পূর্ণতা লাভ করবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের প্রারব্ধ ক্ষয় জন্য লোককল্যাণ এবং পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধ হয়—সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়েঽপি ভুজ্যমানবিপাক-সংস্কারানুবৃত্তিনিবন্ধনা শরীরস্থিতিঃ কুলাল-ব্যাপারবিগম ইব চক্রভ্রান্তিঃ।" "স্থিতপ্রজ্ঞস্ত্বান্ন বিগলিতনিখিলাবিদ্যঃ সিদ্ধঃ কিন্তু সাধক এব অবস্থাবিশেষং প্রাপ্তঃ।"—'ব্রহ্মসিদ্ধি'।*

কিন্তু আচার্য্যপাদ শংকরের মতে জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ এবং আধিকারিক পুরুষ একই। ব্রহ্মস্পর্শের পরও তাঁদের প্রারব্ধশক্তি-বলে জন্মান্তর সম্ভব; ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (৪।১।১৫,১৯) তিনি স্বীকার করেছেন—"অপ্রবৃত্তফলে এব পূর্ব্বে জন্মান্তরসঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃতদুস্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়তে ন তু আরব্ধকার্য্যে সামিভুক্তফলে। ইতরে তু আরব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে"—(ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৫)। গীতোক্ত "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" (৪।৩৮) ভাষ্যে বলছেন—"যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে। অতো যানি অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্ম-কৃতানি তানি সর্বাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।" জীবন্মুক্ত-দের আধিকারিক নামের হেতু, ব্রহ্মানুভূতির পরও "গুরু-ঈশ্বরাদেশতঃ" তাঁরা জীব-কল্যাণের জন্য শরীরধারণের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু এটি কোন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বোধ হয় না। কিন্তু তথাপি আচার্য্যপাদ ব্রহ্মসূত্রের উক্ত ভাষ্যসকলের এক জায়গায় বলছেন যে তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁরা জানেন এরূপ হতে পারে। আমরা আচার্য্যপাদের উপদেশই শিরোধার্য্য মনে করি। পরন্তু আচার্য্যের "অপরোক্ষানুভূতি" গ্রন্থে মণ্ডন-সিদ্ধান্তেরই গোপনাভিব্যক্তি যেন নজরে পড়ে যায়। তা ছাড়া এ থেকে আমরা আর একটা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বহিরঙ্গ-নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করলে তাঁরা "সিদ্ধ" এবং "যততামপি সিদ্ধানাং" (গীতা ৭।৩) অর্থাৎ যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যেও যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরাই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণোক্ত "সিদ্ধের সিদ্ধ"। বাচস্পতি ও ইষ্টসিদ্ধির রচয়িতা বিমুক্তমান আচার্য্যপাদেরই অনুসরণ করেছেন; পরন্তু সুরেশ্বরের মণ্ডনের দিকেই ঝোঁক বেশী বটে, কিন্তু তথাপি তিনি শংকরের জীবন্মুক্তি ভাব স্বীকার করেছেন।

(৮) যদিও মণ্ডনমিশ্র স্বীয় দর্শন সম্বন্ধে উত্তর-শাংকর দার্শনিকদের 'ভাবাদ্বৈত' (ens-monism) শব্দটি ব্যবহার করেন নি, তথাপি ব্রহ্মসিদ্ধির ব্রহ্মকাণ্ড এবং সিদ্ধিকাণ্ড হতে এই ভাবাদ্বৈত বা সদাদ্বৈত মতটি পাওয়া যায়। সেখানে তিনি দ্বৈতবাদীদের 'অভাবাদ্বৈত' (ens-dualism) সম্পূর্ণরূপে সমালোচনা করেছেন এবং তার বিপরীত প্রপঞ্চাভাব প্রমাণ করেছেন—

* মণ্ডন "স্থিতপ্রজ্ঞা"দি গীতোক্ত বিষয় আলোচনা করায় এবং গৌড়পাদাচার্য্যের 'মাণ্ডূক্যকারিকা'য় গীতোক্ত শ্লোকের স্পর্শ পাওয়ায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা যে ভগবান শ্রীশংকরাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

"দ্বিবিধা ধর্ম্মা ভাবরূপা অভাবরূপাশ্চেতি ; তত্রাভাবরূপা নাদ্বৈতং বিঘ্নন্তি"—(ব্রঃ সিঃ)। মধুসূদন 'অদ্বৈতসিদ্ধি'তে মণ্ডনোক্ত মত স্বীকার করলেও সেটাকে যথার্থ অদ্বৈতবাদ বলে স্বীকার করেন নি। ঐ স্থলের টীকায় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মণ্ডনের মত আরও বিস্তার করে বলেছেন যে মিশ্রমতে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, প্রপঞ্চাভাব এবং অবিদ্যাপ্রধ্বংসাভাব—এই দুটি অভাবধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানে স্বীকার করা চলে, কারণ তারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বিরোধী নয়। কিন্তু সুরেশ্বর 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি' এবং 'বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক' গ্রন্থে তাতেও আপত্তি করেছেন যে যথার্থ অদ্বৈতে কোন বিশেষণ থাকা উচিত নয়। কারণ 'প্রপঞ্চাভাববৎ', 'অবিদ্যাপ্রধ্বংসাভাববৎ' বিশেষণযুক্ত যে অদ্বৈত তাতে দ্বৈতস্বীকৃতির ছায়া বর্ত্তমান থাকে।

(১) মণ্ডন ব্রহ্মসূত্রের "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্রটির ব্যাখ্যাকালে গৌড়পাদের 'মাণ্ডুক্যকারিকা' ও ভর্ত্তৃহরিকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ঐ সূত্রের শংকরের "সর্ব্বশ্রুতির মধ্যে এক অদ্বৈততত্ত্বে সমন্বয় আছে"—এরূপ অর্থ গ্রহণ না করে "তু" শব্দের দ্বারা "ধর্ম্ম" ও "ব্রহ্ম" উভয়ের গ্রহণ করে "সমন্বয়" শব্দের দ্বারা উভয়ের সমুচ্চয়-সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন, অতএব তিনি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী ইহাই স্থির হয়।

মুণ্ডকোপনিষদের "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" (৩।২।৬) মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শংকর ভগবান বলছেন, "বেদান্তজনিতবিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তস্যার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ সোঽর্থঃ সুনিশ্চিতো যেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। তে চ সন্ন্যাসযোগাৎ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠাস্বরূপাদ্ যোগাদ্ যতয়ো যতনশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং সন্ন্যাসযোগাত্তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ।" আর "ব্রহ্মলোকেষু" পদের ব্যাখ্যায় বলছেন—"ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক একোঽপি অনেকবদ্ দৃশ্যতে প্রাপ্যতে বা ; অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেষ্বিতি ব্রহ্মণীত্যর্থঃ—পরামৃতাঃ পরমমৃতমমরণধর্মকং ব্রহ্মাত্মভূতং যেষাং তে পরামৃতা জীবন্ত এব ব্রহ্মভূতাঃ পরামৃতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তাৎ প্রদীপনির্ব্বাণবদ্ (ঘটভগ্নে) ঘটাকাশবচ্চ নিবৃত্তিমুপযান্তি। পরিমুচ্যন্তি পরি সমন্তান্ মুচ্যন্তে সর্ব্বে ন দেশান্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে।"—অর্থাৎ বহু সাধকের ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণাহেতু শব্দটি বহুবচনে রয়েছে, কিন্তু যথার্থতঃ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মলোক এক, সাধারণ কথায় তাকে প্রাপ্তি বলে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি মানে, ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান, এতে কোন দেশান্তরপ্রাপ্তি নেই। সুরেশ্বরও এটি গুরুর অনুসরণ করেই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মণ্ডন বলেন, "বেদান্ত-বিজ্ঞানের দ্বারা যে সুনিশ্চিতার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তা মাত্র পরোক্ষ জ্ঞান, নিরন্তর ধ্যানোপাসনা-কর্ম্মের দ্বারা যে অপরোক্ষ সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এ তা নয়।" মণ্ডন "সন্ন্যাসসংযোগাৎ" পদের অর্থ "কর্ম্মসন্ন্যাস" করেন নি, পরন্তু "ঈশ্বরপদে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ" এবং "অন্যচিন্তাত্যাগ-পূর্ব্বক নিত্য ব্রহ্ম-ধ্যানোপাসনা" করেছেন। কাজে কাজেই মণ্ডনমতে শংকরের বহিরঙ্গ গার্হস্থ্য এবং অন্তরঙ্গ ধ্যানপর উভয় কর্ম্মযোগই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাক্-কালত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে, পরন্তু "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" অর্থটি গৌণ পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র। মণ্ডন "ব্রহ্মলোকেষু" শব্দের অর্থ করেছেন—"ব্রহ্মলোকের বিভিন্ন স্তর"। মিশ্র ব্রহ্মসূত্রের (১।১।১) প্রথম সূত্রের "অথ" শব্দের ব্যাখ্যায় বলছেন, জৈমিনীয় কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান ও প্রয়োগাদির দ্বারা অবগত হয়ে ব্রহ্মমীমাংসার প্রয়োজন ; শংকরের ব্রহ্মমীমাংসার প্রাক্‌কালীন সাধনচতুষ্টয়কে অপরিত্যাজ্য সাধনরূপে গ্রহণ না করে, তিনি ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম এবং ব্রহ্মোপাসনাকেই গ্রহণ করেছেন।

আমি চাই

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

আমি চাই
বিলাইতে আপনারে
শতদল সম।
দুখের কণ্টকাঘাতে
হলেও জরজর
দশ দিশি দিব আমি
সৌরভে ভরিয়া।
কাপট্য, নীচতা, দ্বেষ
ক্ষমিব হাসিয়া।
ভুলিব অতীত দুখে,
লইব মস্তকে
দুখের দান নিরমম।

নশ্বর-সুখ-আশে
কলুষিত নাহি হবে
অন্তর আমার।
আমি চাই—
হব আমি দৃঢ় বজ্রসম,
হব অপ্রতিহত গতি
যথা প্রভঞ্জন।
নাহি ভালবাসি তায়
অধরে হাসির ফুলে
লুকিয়ে রাখে যে
কাপট্যের কাল ভুজঙ্গিনী।

হৃদয়-দুয়ার খুলি
কব কথা হৃদয়ের সাথে,
কাপট্য, নিঠুরতা
কিংবা অন্ধ সংস্কার
পাষাণ বাঁধন
কভু দাঁড়াবে না সেথা।

আমাকে করিবে আপন
সমগ্র ভুবন,
বাসিব সবারে ভাল
এই আমি চাই।
যত কিছু ভাল,
যত কিছু পূত জগতের
করিবে পবিত্র মোর
তপত হৃদয়।

অনন্তের পূত হাস্য
প্রতি ফুলে, ফলে
অধরে অধরে
হেরিয়া হইব ধন্য,
তাঁহারই মধুর গীতি
শুনিব পুলকে
মর্ত্তে, মহাব্যোমে।

স্নেহের, মমতার
স্মৃতি পরিপূর্ণ করি'
ভাসাইব মহানন্দে
জীবনের তরী,
সংসারের মহাপারাবারে
এই আমি চাই।

স্বাধীন ভারতে নারীর স্থান

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

বহু পুণ্যফলেই আমরা এই যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছি—যে যুগে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে যুগে তাঁরই প্রদর্শিত ও পরিচালিত সত্য ও অহিংসার সেই অপূর্ব নিরস্ত্র, নীরক্ত, নিষ্কলুষ সংগ্রামে প্রবলতম বিদেশী রাজশক্তিকেও পরাভূত হয়ে বিদায়গ্রহণে বাধ্য হ'তে হয়েছিল, যে যুগে শতবর্ষব্যাপী পরাধীনতার ঘোর তমিস্রা ভেদ করে স্বাধীনতা-সূর্যের প্রথম কনকায়মান কিরণমালা পূর্বদিগন্তে স্বপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সেই মহিমমণ্ডিত, মহাযুগেরই নারী আমরা, এ কি অল্প সৌভাগ্যের কথা ? পরাধীন ভারতের ততোধিকা পরাধীনা নারীরূপে অবশ্য আমরা বহু ক্লেশলাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু বন্ধন থেকে মুক্তিতে, নৈরাশ্য থেকে আশাতে, অন্ধকার থেকে আলোতে উপনীত হ'বারও যে অপূর্ব আনন্দ ও উন্মাদনা, তার থেকেও ত হ'বেন বঞ্চিতা আমাদের পরবর্তী যুগের অন্য দিক থেকে অধিক সৌভাগ্যশালিনী ভগিনীরা।

কিন্তু এক দিক থেকে আমরা যেমন বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী, অপর দিক থেকে তেমনি আমাদের দায়িত্বও অতি গুরুতর। স্বাধীনতা-লাভ ও স্বাধীনতা-রক্ষণের মধ্যে প্রভেদ অনেক। কোনো কাম্যবস্তু যেমন লাভ করতে হয় বহু প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই, তা' রক্ষাও করতে হয় তেমনি সমান অনলস উত্তম ও উৎসাহের সাহায্যে। আমরা ভারতীয়েরা কর্ম-বাদে বিশ্বাসী—আমরা স্থির জানি যে ন্যায়ের অমোঘ বিধানেই ফললাভ করা যায় কেবল উপযুক্ত কর্মের দ্বারাই। যদি আমরা অনবধানতা অথবা অহঙ্কারবশতঃ এরূপ কর্মে অবহেলা করি, তা হ'লে ন্যায়ের অলঙ্ঘ্য নীতি অনুসারেই হ'ব আমরা ফল থেকে বঞ্চিত—সে ক্ষেত্রে আমাদের অনুযোগ, অভিযোগের কিছুই থাকতে পারে না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য আমরা সহাস্যমুখে সুকঠোর ব্রতে ব্রতী হয়েছিলাম, নিঃস্বার্থ নিরলস ভাবে কর্মসাধনায় জীবন পণ করেছিলাম, তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আজ আমরা হয়েছি এই অমূল্য স্বাধীনতা-ধন লাভে অধিকারী। কিন্তু সেই ধনরক্ষণের জন্যও যে নূতন কর্ম, যে নব প্রচেষ্টা ও উত্যম, যে নিরলসতা ও নিঃস্বার্থপরতা অত্যাবশ্যক, তাতে যদি আমরা পরাঙ্‌মুখ হই, তাহ'লে এই কষ্টলব্ধ সম্পদ স্বভাবতঃই আমাদের হস্তচ্যুত হ'বে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় নারীর দান কেবল ভারতের ইতিহাসেই নয়, জগতের ইতিহাসেও এক বিস্ময়জনক বস্তু। শিক্ষা-দীক্ষা-স্বাস্থ্য-স্বাধীনতাহীনা ভারতের নারী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে, অন্তঃপুরের স্নেহশীতল নিভৃত আশ্রয় ত্যাগ করে যে নির্দয় সংসারের উন্মুক্ত মরুপ্রাঙ্গণে পুরুষের সঙ্গিনী, সহকর্মিণী, সহযোদ্ধ্রী-রূপে নির্ভয়ে এসে দাঁড়াতে পারবেন, তা' পূর্বে আশার অতীত ছিল। একই ভাবে, এই নবরাষ্ট্রের সংগঠন, সংরক্ষণ ও সমুন্নতির কার্যেও নারীদেরই গ্রহণ করতে হ'বে অন্যতম প্রধান অংশ ও গুরুভার।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নামমাত্রে পর্যবসিত হয় যদি

না সে সঙ্গে আসে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মুক্তি। সুতরাং এই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাই আজ আমাদের লক্ষ্যস্থল। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার আগমন হয় জ্ঞানারুণের হেমপ্রভ পূর্বদিগন্ত পথেই কেবল। আমাদের পুণ্যশ্লোক আর্য-ঋষিরা বলেছেন যে, অজ্ঞানের নিকট, অবিদ্যার নিকট, অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কারের নিকট পরাজয়স্বীকার করাই মানবের তীব্রতম, শোচনীয়তম পরাজয়—এরূপ অধীনতার ন্যায় দুরপনেয় ও ক্ষতিকর অন্য কিছুই হ'তে পারে না। সেজন্য জ্ঞানের সাধনাই আমাদের দেশে চিরকাল শ্রেষ্ঠ সাধনারূপে পরিগণিত হয়েছে। মহাভারতে আছে—

"নাস্তি সত্যসমো ধর্মো ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিৎ অনৃতাদ্ ইহ বিদ্যতে ॥"

(আদি পর্ব, ৭৪।১০৪)।

অর্থাৎ সত্যের সমান ধর্ম নেই, সত্যের চেয়ে শ্রেয়ান্ অন্য কিছু নেই, মিথ্যার চেয়েও তীব্রতর জগতে কিছুই নেই।

আজ স্বাধীন ভারতে আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য এই অজ্ঞতার নাগপাশ ছিন্ন করে জ্ঞানের মুক্ত বায়ু সেবনে সচেষ্ট হওয়া। জাতীয় সরকার এই সুমহৎ অথচ সুকঠিন কার্যে ব্রতী হবেন নিশ্চয়ই, কারণ একটি মহাদেশ-তুল্য এই ভারতে শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ফলে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধতমিস্রা আজও দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত, পরিম্লান করে রেখেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নারীদেরও অগ্রসর হ'তে হ'বে বিশেষ করে। তা'র কারণ দু'টি। প্রথমতঃ, ভারতে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যাই যথেষ্ট অল্প—এরূপ অত্যধিক অল্প যে পৃথিবীর যে কোনো সভ্য জাতির শিক্ষিতের সংখ্যার সঙ্গে তার উল্লেখমাত্র আমাদের লজ্জার বিষয়। ভারতীয় পুরুষের তুলনায় শিক্ষিতা নারীর অনুপাত অতি সামান্য। সেজন্য আজ শিক্ষায় সমস্যা সমগ্র জাতির প্রধানতম সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেও নারী-শিক্ষার সমস্যা তদপেক্ষাও গুরুতর। সেজন্য আজ নবীন ভারতের নারীদের জীবন পণ করে অগ্রণী হ'তে হ'বে বিশেষ করে নারীসমাজে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য। যে মুষ্টিমেয় নারী জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন, তাঁদেরই গ্রহণ করতে হ'বে এই পুণ্য জ্ঞানযজ্ঞের পৌরোহিত্য—পুরোধারূপে পুরোভাগে দণ্ডায়মানা হয়ে তাঁরাই করবেন এই শুভানুষ্ঠানের পরিকল্পনা, পরিচালনা, পূর্ণতা ও সার্থকতা বিধান। দ্বিতীয়তঃ, কেবল নারীদের শিক্ষার জন্য নয়, সাধারণভাবে শিক্ষকতা-কার্যের জন্যও নারীদেরই বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে হ'বে। জগতের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, শিক্ষকতারূপ সুপবিত্র ব্রতপালনে নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত। মাতৃস্বরূপিণী মঙ্গলময়ী নারীকে স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই এই কার্যের বিশেষ উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। শিশুর প্রথম শিক্ষা মাতারই নিকট, এবং বহুদিন পর্যন্ত মাতার প্রভাব ও উদাহরণই হয় তার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রবল, নিগূঢ়, কার্যকর ও ফলপ্রসূ। তদ্ব্যতীত, শিক্ষকতা-কার্যে যে স্নেহ, সহানুভূতি, ঔদার্য ও ধৈর্যের প্রয়োজন, তা' বিশেষভাবে নারীরই চরিত্রগত, পুরুষের নয়। সেজন্য সর্বত্রই শিশুশিক্ষার ভার ন্যস্ত হয় নারীরই উপর। জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় যাঁর কাছ থেকে এবং প্রকৃষ্ট ফলপ্রদ ও সুন্দর হয়ে উঠে যাঁর সস্নেহ আত্মত্যাগে, সেই নারীকেই হ'তে হ'বে স্বয়ং সকল অজ্ঞতা-কুসংস্কার-নীচতা-মুক্তা, জ্ঞানারুণালোক-দীপ্তা, মহীয়সী, তপস্বিনী। মানবসভ্যতার প্রথম অরুণোদয়-মুহূর্ত থেকে ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া নারী ঋষিগণ জ্ঞানের তপস্যায় অমৃতের অনুসন্ধানে আত্মোৎসর্গ

করেছেন। উপনিষদের যুগে এই ভারতীয় নারীর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল সেই মহাপ্রশ্ন: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ২।৪।৩)—"যা নিয়ে আমি অমৃতত্বলাভে অধিকারিণী হ'ব না, তা নিয়ে আমি কি করব?" ঘোষা গোধা প্রমুখ সাতাশ জন বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্ট্রী, সত্যোপলব্ধী নারী ঋষি থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগের অসংখ্য নারী দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, বৈয়াকরণ, স্মৃতিকার, তান্ত্রিক, আলঙ্কারিক প্রভৃতি ভারতীয় নারীদের অপূর্ব জ্ঞানস্পৃহা, সর্বতোমুখী প্রতিভা, অতন্দ্র অধ্যয়ন-তপস্যা ও অতুলনীয় সৃজনী শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁদেরই বংশধর আমরা যে এতদিন এমন ভাবেই অন্তঃপুরের অন্ধকারে নিষ্ফল, নির্জীব জীবন যাপন করব, তা' সত্যই জাতির ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। আজ সেই হৃতগৌরব-উদ্ধারে সচেষ্ট হওয়া আমাদের ভারতীয় নারীদের প্রধান কর্তব্য। পরম আশার কথা যে, আমাদের জাতীয় সরকার জাতির মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন উপনিষদের সেই পূত বাণী "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৬)—"একমাত্র সত্যই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যা নয়।" এই সত্য, জ্ঞান, অমৃতের পন্থাই ভারতের শাশ্বত পন্থা। সেই পন্থাই আজ আমাদের অনুসরণ করতে হ'বে স্থির দৃঢ় পদবিক্ষেপে; এবং এই পন্থাই আনবে সেই প্রকৃত স্বাধীনতা যা' শাশ্বত ও অবিনশ্বর, যা' বিদেশীর অস্ত্রাঘাত চূর্ণ করতে পারে না, যা' সমাজের অবিচার লুপ্ত করতে পারে না—যা' মনের প্রসার, হৃদয়ের স্ফূর্তি, আত্মার বিকাশেরই নামান্তর-মাত্র।

এরূপে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আসবে সামাজিক স্বাধীনতা। সমাজের অর্থ-হীন, অযৌক্তিক, নির্দয় বিধিবিধান দেশের বায়ু বিষাক্ত করে তোলে, জাতির প্রাণশক্তি নিষ্পেষিত করে ফেলে তখনই, যখন অজ্ঞ, ভীত, পীড়িত জনগণ এই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন ক'রে দণ্ডায়মান হ'তে পারে না, পারে না সেই মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোলুপ, স্বার্থান্বেষী ও ক্রূরবুদ্ধি সমাজশাসকগণের লৌহশৃঙ্খল চূর্ণ বিচূর্ণ করতে। সেজন্য জন-শিক্ষার অগ্রগতিই সামাজিক অধোগতির অমোঘ প্রতিষেধক। আমরা ত চক্ষের সম্মুখেই দেখ্‌ছি যে কিরূপে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, দেবদাসীপ্রথা, ছুঁৎমার্গ প্রমুখ বহুবিধ সামাজিক কুপ্রথার ক্রমশঃ বিলোপ সংঘটিত হচ্ছে, আইনের সাহায্য ব্যতীতই। সুস্থ, সবল, সুখী জাতি গড়ে উঠবে সেদিনই, যে দিন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই পাবে সমান অধিকার—রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক সমান অধিকার, যে দিন সাম্য ও মৈত্রীই হ'বে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। নবপ্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতে এই দুটিকেই অবশ্য সাদরে সগৌরবে গ্রহণ করা হয়েছে শাসনতন্ত্রের মূলভিত্তিরূপে। কিন্তু সত্যই তাকে কার্যে পরিণত করা, সফল করে তোলা আমাদের, দেশবাসি-গণেরই কর্তব্য। রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকি রাবণের মুখেই বলেছেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। অর্থাৎ, যে দুরাত্মা পরস্ত্রী-হরণকারী অত্যাচারী, তার নিকটেও জননী ও জন্মভূমির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই প্রাণ-প্রতিম জন্মভূমির সেবায় আজ আমাদের জীবনোৎসর্গ করতে হ'বে। পুণ্যশ্লোক আর্য ঋষিগণের মহিমময়ী বাণী স্মরণ করি—

> "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"
>
> (কঠোপনিষৎ ৩।১৪)

"উঠ! জাগো! শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করে উদ্বুদ্ধ হও! তত্ত্বদর্শিগণ বলেছেন, শাণিত ক্ষুরের ধারার ন্যায়ই দুর্গম সেই পথ, যে পথে এই সম্পদ লাভ হয়।" এরূপে শাণিত ক্ষুরের মত দুর্লঙ্ঘ্য এই সত্যের, জ্ঞানের, ন্যায়ের, নীতির ও সেবার পথেই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা, শাশ্বত মুক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ *

'বনফুল'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন-কাহিনী পৃথিবীর সুধীসমাজে সুবিদিত। তাঁহার জীবনের তথ্যমূলক ঘটনাবলী সকলেই জানেন। কিন্তু একথাটা হয়তো অনেকে জানেন না ঐতিহাসিক তথ্যই জীবনের তত্ত্ব নয়, সেগুলি সংবাদমাত্র। সংবাদের নেপথ্যে যে সংঘাত-প্রতিসংঘাত থাকে, যে আবেগ, যে প্রতিভা, যে প্রেরণা থাকে তাহার রহস্যই জীবন-রহস্য। সামান্য মানুষের জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনও সহজ নহে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো বিরাট জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা আরও দুরূহ। তাঁহাকে অনেকটা চিনিয়া ছিলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। পরমহংসদেবের পূর্ণ রূপ সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন তাহা আমার নাই। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে যতটুকু যে ভাবে বুঝিয়াছি তাহাই কেবল আপনাদের নিকট আজ নিবেদন করিব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একদল অন্ধ একবার একটি হাতী দেখিতে গিয়াছিল। হাতীটিকে ঘিরিয়া হাত দিয়া দিয়া তাহারা হাতীর স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহারা হাতীর পা-টাই স্পর্শ করিল তাহারা বলিল হাতী থামের মতন, যাহারা কানটা স্পর্শ করিল তাহারা বলিল হাতী কুলার মতন, যাহারা শুঁড়টা স্পর্শ করিল তাহাদের ধারণা হইল হাতী সাপের মতন। আমাদের মতো অল্পবুদ্ধি লোকেরা যখন মহাপুরুষ-জীবন আলোচনা করিতে যায় তখন এইরূপ হাস্যকর ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তবু যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিব, নিজের স্বার্থের জন্যই বলিব, কারণ মহাপুরুষের নামকীর্ত্তনই হয়তো আমার অন্ধত্বমোচন করিয়া দিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি তাঁহার জীবনে, আচরণে ও উপদেশে বিধৃত হইয়া আছে বলিয়াই আমরা তাঁহাকে অবতার বলি।

মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? প্রাণি-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষও একপ্রকার পশু। পশু হইলেও তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কি সে বৈশিষ্ট্য? কেহ বলেন মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব, কেহ বলেন সে বিবেকী, কাহারও মতে মানুষ সামাজিক। Burke বলিয়াছেন—"Man is an animal that cooks his victuals." Adam Smith মানুষের আরও বৈষয়িক সংজ্ঞা দিয়াছেন —"Man is an animal that makes bargains." কবি বায়রণের ভাষায়—"Man is half dust, half deity, alike unfit to sink or soar, a pendulum betwixt a smile and a tear"; শেক্‌স্‌পীয়রের ভাষায়—"What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculties." কিন্তু গীতায় বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়ে মনুষ্যরূপী শ্রীভগবান এবং দেবীসূক্তে অম্ভৃণ-মহর্ষির কন্যা বাক্ মানুষের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষ স্রষ্টা। অন্যান্য প্রাণীরাও সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু তাহাদের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য নাই। উই পোকা উই ঢিপি ছাড়া আর

* কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গত জন্মোৎসব-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না যুগযুগান্ত ধরিয়া সে উহাই করিতেছে। এক জাতীয় পাখী এক জাতীয় নীড় নির্মাণ করিতেই দক্ষ। অতি স্থূল আধিভৌতিক দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে মানুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। মানবসভ্যতা স্রষ্টা মানবের কীর্ত্তি, নব নব সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। সৃষ্টিই মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, নিত্য নূতন দৃষ্টিতে সে নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে, তাহাতেই তাহার আনন্দ, পুরাতনের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। তাহার মনীষা নিত্য নূতন লোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উন্মুখ, এজন্য যুগে যুগে বহু বিপদকে সে বরণ করিয়াছে। সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াছে, ব্যাধজীবনের অবসান করিয়া কৃষি-সভ্যতার পত্তন করিয়াছে, অরণ্য কাটিয়া পল্লী বসাইয়াছে, পল্লীকে নগরে রূপান্তরিত করিয়াছে। সৃষ্টি করিয়াছে, নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংসও করিয়াছে নবতর সৃষ্টির প্রেরণায়। বিশ্বপ্রকৃতির মতো তাহার প্রকৃতিও যেন সতত সংগ্রামশীল। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন—

"তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি-
মুহূর্ত্তের সংগ্রাম
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণ-রঙ্গ-ভূমি
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের
বিজয়বার্ত্তা"

তাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীব মানুষের সম্বন্ধেও সমান সত্য।

মানব পশু বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহী পশু। প্রকৃতির প্রতিভাবান দুরন্ত অশান্ত সন্তান সে। প্রকৃতির কোনও শাসনকেই সে মানিয়া লয় নাই। সে রাত্রের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়াছে, দিবসের প্রখর আলোকে রুদ্ধঘরে বসিয়া কৃত্রিম অন্ধকার উপভোগ করিয়াছে। আহারে নিদ্রায় প্রজননে প্রকৃতির কোনও বিধান, কোন সীমা, কোন গণ্ডীকে সে মানে নাই। ইহার জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছে তবু মানে নাই। নানাবিধ আবিষ্কারের সাহায্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে দূর করার প্রচেষ্টাই যেন তাহার সভ্যতার পরিচয়। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, বেতার, বিমান-পোত, টেলিভিশন, পুস্তক, মুদ্রাযন্ত্র, বিজ্ঞানের নিত্য নব আবিষ্কারে তাহাকে নিত্য নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে। নব নব সৃষ্টিতে সে নিজেকেই যেন অতিক্রম করিতে চাহিতেছে। পথ দুর্গম, কিন্তু তবু সে আনন্দিত। এই আনন্দের প্রেরণাই তাহার পাথেয়। নিত্য নব আনন্দের সন্ধানে বস্তুজগতে নিত্যনব আবিষ্কার করিতে করিতে মানুষ অবশেষে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করিল যাহা তাহার সমস্ত পূর্ব্ব-আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিল, যাহার নিকট সমস্ত বস্তু-মহিমা তুচ্ছ হইয়া গেল। এতকাল যে পশু-মানব আহার-নিদ্রাদির বৈচিত্র্যসাধনে তৎপর ছিল সহসা সে আত্ম-আবিষ্কার করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-আলেয়াকে অনু-সরণ করিতে করিতে মানবের সৃষ্টিপ্রতিভা যখন তমসাচ্ছন্ন লোকে বিভ্রান্ত তখন সহসা ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ", ধ্বনিত হইল যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্—তাহা, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, তাহা অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। সুখের সন্ধানেই তাহার যাত্রা সুরু হইয়াছিল, সহসা সে আবিষ্কার করিল —ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। এই আত্ম-আবিষ্কার এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানব-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। অধ্যাত্মজগতের নূতন আলোকে তাহার আধিভৌতিক জগৎস্বপ্নের মতো অলীক

হইয়া গেল। তাহার মনে নূতন চিন্তা জাগিল কি শ্রেয় এবং কি প্রেয় এবং এই চিন্তাধারা তাহার প্রগতির রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।"

শ্রেয় এবং প্রেয়—ধর্ম্মবুদ্ধি এবং বিষয়বুদ্ধি—সম্মিলিত ভাবে প্রত্যেক মানুষকেই আশ্রয় করে। বুদ্ধিমান লোক শ্রেয়কে এবং অল্পবুদ্ধি লোক প্রেয়কে বরণ করিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য অল্পবুদ্ধি লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে চিরকাল বেশী। বস্তুজগতে প্রাধান্য-লাভ করিবার জন্য অধিকাংশ মানুষ তখনও যুদ্ধ করিত, এখনও করিতেছে। বন্যমানবের নখদন্ত সভ্য মানবের নানা অস্ত্রশস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। পৌরাণিক যুগের অসি, গদা, মুষল, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, তোমর অঙ্কুশ, ক্ষুরপ্র, নারাচ, পরশু, পট্টিশ, ভল্ল, চক্র, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, চর্ম্ম প্রভৃতি বর্ত্তমানে গুলি গোলা বন্দুক কামান শ্র্যাপ্‌নেল, আণবিক বোমা, উদ্‌বোমায় পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ মানুষই জীবনটাকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারবিন জীবনযাত্রার নামকরণই করিয়াছেন Struggle for existence. আমাদের পুরাণের গল্পের অধিকাংশ গল্পও যুদ্ধের গল্প। দেব-অসুর, রাম-রাবণ, কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের চণ্ডী রণরঙ্গিণী, আমাদের দেবতারা কেহ ত্রিপুরারি, কেহ কংসারি, বৃত্রনিসূদন। শুধু আমাদের পুরাণেই নয় মিশরীয় পুরাণের 'রা' এবং আই-সিসের গল্প, ব্যাবিলনের ইয়া এবং তিয়াম্মতের কাহিনী প্রাগৈতিহাসিক আমেরিকার ওবেলিথের গল্প সবই দ্বেষ এবং দ্বন্দ্বের ইতিহাস। অল্পবুদ্ধি প্রেয়কামী মানব-মানসের প্রতিচ্ছবি। আমাদের আধুনিক ইতিহাসও তাই। ব্যক্তির বা জাতির অতি স্থূল বৈষয়িক জয়-পরাজয়ই তাহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রেয়কামীর সংখ্যা এখনও অল্প। অধিকাংশ মানবই প্রেয়কামী একথা সত্য, কিন্তু একথাও সত্য সমস্ত মানবজাতি ওই মুষ্টিমেয় শ্রেয়কামী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষদের দিকেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে—যাঁহারা জীবনকে 'যুদ্ধ' না বলিয়া 'লীলা' বলিয়াছেন। মাঝে মাঝে ইঁহাদের পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা যে করা হয় নাই তাহা নয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মানবসমাজের অন্তরোৎসারিত শ্রদ্ধা ইঁহাদেরই চরণে সমর্পিত হইয়াছে। ঘৃণ্যতম ভোগীও অবশেষে ত্যাগীর চরণেই শির অবনত করিয়াছে।

অধিকাংশ মানুষই লুণ্ঠনকারী দস্যু, কিন্তু মনে হয়, সেজন্য তাহারা যেন মনে মনে লজ্জিত, তাই লুণ্ঠন করিবার সময় তাহারা ধর্ম্মের মুখোশ পরিয়া লুণ্ঠন করে। এই ভণ্ডামি দেখিয়া আমরা অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই বটে, কিন্তু ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই, ওটা সুলক্ষণ, ওই মুখোশের দ্বারাই তাহারা বাঁকা পথে সত্য শিব সুন্দরকে অভিনন্দন করিতেছে।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই মহাবাণীর নিগূঢ় সত্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে।

ইহারা সংখ্যায় বেশী বলিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ধূলিকণা অসংখ্য, কিন্তু সূর্য্য এক। সেই একটি সূর্য্যের ভাস্বরতায়

অসংখ্য ধূলিকণা তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। বস্তুজগতে বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার যেমন পূর্ব্বতন আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিয়াছে—বিমান-পোতের নিকট গরুর গাড়ি আজ যেমন অকিঞ্চিৎকর, হাইড্রোজেন বোমার কাছে বন্দুক যেমন হাস্যকর—মানবজাতির অগ্রগতিতে অধ্যাত্ম-জগতের আবিষ্কারের কাছে আধিভৌতিক জগতের ঐশ্বর্য্য আজ তেমনি হীনপ্রভ। শ্রেষ্ঠ মানবমনীষা আর অনিত্য বস্তুতে নিবদ্ধ নাই, নিত্যবস্তুর সন্ধানে সে উৎসুক। তাহাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে নয়, আসক্তি-বন্ধনের বিরুদ্ধে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গুণাতীত হইতে চান—

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

যাহার কাছে সুখ-দুঃখ সমান, যিনি আত্মস্থ, যাঁহার কাছে মাটি, পাথর, সোনা তুল্যমূল্য, প্রিয়-অপ্রিয়, মান-অপমান, শত্রুমিত্র, স্তুতিনিন্দা যাঁহার দৃষ্টিতে সমান, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষী নন—তিনিই গুণাতীত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতেই সমুৎসুক। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তথাপি তাঁহাদেরই সাধনা সংখ্যাগরিষ্ঠ পশুর দলকে ধীরে ধীরে পশুত্বের স্তর হইতে মুক্ত করিতেছে। অধ্যাত্মজগতে সংখ্যা-গরিষ্ঠরাই জয়ী নয়।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয় যে পশুমানবের মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হইল কি প্রকারে? তাহার উত্তর মৃত্যু এবং মানব-মনের অন্তহীন কৌতূহল। সে চিরকালই প্রকৃতিকে জানিতে চাহিয়াছে, বুঝিতে চাহিয়াছে, তাহার অমোঘ বিধানকে অতিক্রম করিবার সাধনা করিয়াছে। এজন্য তাহার কৌশল ও তপস্যার অন্ত নাই। এই পথেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে যে যাহা কিছু বস্তু-সংশ্লিষ্ট তাহাই ক্ষণভঙ্গুর। জীবন, যৌবন, পুত্র-কলত্র, ধন, মান, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার পরিণাম সমস্তই কালক্রমে বিনষ্ট হয়। এ সবই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যক্ষ মৃত্যুই মানবের প্রথম ধর্ম্মগুরু। তাই বোধ হয় কঠোপনিষদের ঋষি মানবসন্তান নচিকেতাকে যমের সম্মুখীন করিয়া যমের মুখ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মৃত্যুই—এই অনিত্য-বিধ্বংসী মহাকালই—শেষে তাহার নিকট দেবতা-রূপ ধারণ করিয়াছে। পুরুষরূপে যিনি মহাকাল, স্ত্রীরূপে তিনিই মহাকালী। নানারূপে নানা মূর্ত্তিতে নানা প্রতিমায় মহাকাল ও মহাকালীর পূজা মানবসমাজে প্রচলিত। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শুভঙ্কর রূপও তাহার নিকট ক্রমশঃ প্রতিভাত হইয়াছে। মৃত্যুই যে নবজীবনের সূচনা করে, ধ্বংসের মধ্যেই যে নবসৃষ্টির বীজ নিহিত আছে এ সত্য মানবকেই উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। ধ্বংসকর্ত্তা মহেশ্বরের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। মহাকালীর হস্তে কেবল খড়্গ এবং ছিন্নমুণ্ডই নাই, বরাভয়ও আছে।

এই পথেই—জীবনের সমস্ত কিছু নশ্বর এই উপলব্ধির ফলস্বরূপই—সে আর একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছে—ভালবাসা। যাহা থাকিবে না, একটু পরেই চলিয়া যাইবে তাহাকে ঘিরিয়া যে মোহ যে মায়া তাহাই ভাল-বাসার আদি রূপ, তাহাই পরিশুদ্ধ হইয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছে।

পরমহংসদেবের বিচিত্র অধ্যাত্মজীবনের দিগ্-দর্শনও এই দুইটি জিনিস—মহাকালী এবং প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মজগতের এক জন দিকপাল।

বস্তুজগতের দিকপালেরা যেমন বিশিষ্ট প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের কীর্তিকলাপ যেমন সৃষ্টিধর্ম্মী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তেমনি বিশেষ একটি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিক কীর্তিকলাপ তেমনি সৃষ্টি-ধর্ম্মী। প্রথম জীবনে তাঁহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাই তাহা কবি ও ভক্তের রূপ। তাঁহার কবিকল্পনা ও ভক্তি, তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যয় তাঁহাকে অনন্য করিয়াছে। তাঁহার যদি কেবল মাত্র কবি-কল্পনা থাকিত তাহা হইলে তিনি আর পাঁচ জন সাধারণ কবির মতো কবিতাই রচনা করিতেন, আমরা সাধক রাম-কৃষ্ণকে পাইতাম না। তিনি যদি কেবলমাত্র ভক্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা এক জন সাধক পাইতাম বটে কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র কবি রামকৃষ্ণকে পাইতাম না।

যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
　　ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা
　　বসন্তের এই সঙ্গীতে।"

সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই তিনি রোমাঞ্চিত হইয়া ভাবিয়াছেন—এই কি তিনি, এই কি তিনি! তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষও করিয়াছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের পল্লবগ্রাহীরা হয়তো ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। অনেকে তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাই তো প্রত্যাশিত। শফরীরা গণ্ডুষমাত্র জলেই তো ফরফর করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে কেবল বুদ্ধিপ্রভাবেই বুঝি বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়। এ যুগের এক জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dr. Alexis Carrel কিন্তু বলিতেছেন—"Intelligence alone is not capable of engendering science." তিনি আরও বলিতে-ছেন—"Certainty derived from science is very different from that derived from faith. The latter is more profound."

এই profound (গভীর) বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে profound দৃষ্টিভঙ্গীও প্রয়োজন। কেবল-মাত্র বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তরে কৃষ্ণমেঘের পটভূমিকায় শাদা বকের সারি যে বালককে অভিভূত করিয়াছিল, যাত্রার শিব সাজিয়া শৈশবেই যিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীপ্রতিমার স্পর্শমাত্র যাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল, ম্যাডোনার ছবি দেখিয়া যিনি যিশু খৃষ্ট-মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পাষাণ-প্রতিমাকে সজীব দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় যিনি আহার নিদ্রা বস্ত্র উপবীত সমস্ত ত্যাগ করিয়া মাতৃহারা শিশুর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে করিতে দিনের পর দিন কাটাইয়াছিলেন, অবশেষে যাঁহার অদর্শনে অধীর হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যিনি কালী দুর্গা শিব সীতা রাম হনুমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রেষ্ঠ ভক্তের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভক্ত কবি-মানসের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অবিশ্বাসীর নাই। যাহা অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় তাহা খালি চোখে দেখা যেমন সম্ভব নহে, বেরসিক ব্যক্তি যেমন কাব্যরস উপভোগ করিতে পারে না, অবিশ্বাসীর পক্ষেও তেমনি ভক্তের মর্ম্মোদ্ভেদ করা অসম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়-জনক ব্যাপার এই যে তাঁহার কবিমানসের কল্পনা ভক্তহৃদয়ের আকুলতায় বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ

করিয়াছিল। তিনি তাঁহার মানসদেবতাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। এই অসাধ্যসাধন করিবার জন্য তিনি কোথাও যান নাই, কোন শাস্ত্রচর্চ্চা করেন নাই, কাহারও নিকট উপদেশ-ভিক্ষা করেন নাই। তাঁহার কবিমানস অগাধ বিশ্বাস লইয়া যাহাই কল্পনা করিয়াছে তাহাই সফল হইয়াছে। Plato র Utopian স্বপ্ন সফল হয় নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুধু জড় প্রতিমাই সজীব হইয়া ওঠে নাই, তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে সাধনমার্গের সুকঠিন দুর্গম পথ অতি সহজে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সবিকল্প সমাধি-লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার গুরুরা স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ শিষ্যই গুরুর সন্ধান করে, কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতই ঘটিয়াছে—প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে তোতাপুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং নিজেদের তাগিদেই যেন তাঁহাকে সাধনমার্গে আগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভৈরবী আসিয়া তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি তোমাকেই খুঁজিতেছি। প্রত্যাদেশ পাইয়া আমি তোমারই কাছে আসিয়াছি।'

শুধু যে তাঁহার গুরুরা আসিয়াছিলেন তাহাই নয়, বাংলাদেশের তদানীন্তন মনীষিবৃন্দ—গৌরী পণ্ডিত, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ, শশধর তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাগ মহাশয়, তখনকার ইয়ং বেঙ্গলের দল, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ—দলে দলে সকলেই তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দও। তাঁহার অনাগত শিষ্যদের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কেবল ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন—ছাদের উপর উঠিয়া তাহাদের ডাক দিতেন—"ওরে কোথায় তোরা, আয়, আমি যে আর তোদের ছেড়ে থাকতে পাচ্ছি না।" তাঁহারা একে একে আসিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী দেশে দেশান্তরে ছড়াইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোথাও যান নাই। তাঁহার কল্পনা, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সাধনা লইয়া অটল হিমাদ্রির মতো একস্থানেই তিনি বসিয়াছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুগচেতনার মর্ম্মমূলে আজও বোধ হয় আছেন এবং ভবিষ্যতে নূতন যুগের নূতন আলোকে নূতন পৃথিবীতে যে নূতন ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইবে তাহার প্রাণকেন্দ্রেও তিনি তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিবেন।

এই ধর্মরাজ্য-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

অনেকেই বলেন—পাপে তো পৃথিবী ভরিয়া গেল, পাপীরাই তো বিজয়পতাকা উড়াইয়া সদম্ভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সাধুদের কষ্টের অবধি নাই, পরিত্রাতা ভগবান কবে, কি ভাবে, কোথায় আসিয়া ধর্ম্ম-স্থাপন করিবেন?

ভারতের ঋষি বলিয়াছেন—ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। ভগবান কখন কি ভাবে আসিয়া যে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার সে প্রয়াস চলিতেছে কি না, তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা সহজ নহে। সর্ব্বযুগেই যে তিনি শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণরূপেই জন্মগ্রহণ করিবেন এমন নাও হইতে পারে। তিনি যে নিশ্চিন্ত নাই তাহার কিছু আভাস আমাদের ইতিহাসেই আছে। ভারতে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কিংবা তাহার সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছে তখনই এক জন করিয়া মহাপুরুষ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যদিও শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের হুবহু নকল নন

কিন্তু উক্ত দুই অবতারের বাণী এবং আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক ধর্ম্মের অধঃপতনে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যখন কর্ম্মকাণ্ডের প্রাণহীন নিষ্ঠুরতায় কাতর, তখন প্রথমে মহাবীর, তাহার পর বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মও যখন কালক্রমে গ্লানিপূর্ণ হইয়া উঠিল তখন ধর্ম্মজগতে জন্মগ্রহণ করিলেন শঙ্করাচার্য্য এবং রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করিলেন মুসলমান। অধঃপতিত বৌদ্ধেরা অনেকেই মুসলমান হইতেছিল, সুলতান মাহমুদ যখন ভারত লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছেন তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রামানুজ। তাহার পর বাংলাদেশে পাঠানদের হিন্দুবিদ্বেষ যখন চরমে উঠিয়াছে তখন নিষ্ঠুর হিন্দুবিদ্বেষী সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বাংলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন চৈতন্য এবং পাঞ্জাবের মাটিতে নানক। তাহার পর প্রায় তিন শত বৎসর অন্ধকার। মোগলযুগই ভারতবর্ষের ধর্ম্মজগতে অন্ধকারময় যুগ। তবু এই অন্ধকারময় যুগের শেষভাগেও যখন ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম বিপন্ন, তখন যে বীরের কণ্ঠে ইহার প্রতিবাদ বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছিল তিনি রামভক্ত রামদাসের শিষ্য শিবাজী। তাহার পর আসিলেন ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যখন বাংলাদেশে শাসনের নামে যথেচ্ছাচারিতা করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের যে আত্মচেতনা ভবিষ্যতে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটাইবে সেই শক্তির প্রথম উদ্বোধক রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিলেন ১৭৭২ খৃঃঅব্দে। ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের যখন ফাঁসি হয়, তখন রামমোহন চারি বৎসরের শিশু। তাহার পর ইংরেজের হস্তে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে ভারতের শেষ হিন্দুশক্তি যখন বিধ্বস্ত হইতেছে—তখন ১৮১৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাংলাদেশে নব্য হিন্দুধর্ম্মের প্রথম উদ্গাতা, এবং তাহার কিছু দিন পরেই ১৮২৭ খৃঃ অব্দে দয়ানন্দ সরস্বতী, আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মোহ এবং নূতন ধরনের পাশ্চাত্য গোঁড়ামির বিষ আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া আমাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে সেই ইংরেজি ভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য হয় ১৮৩৫ খৃঃ। যাঁহার জীবন ভবিষ্যতে সকল প্রকার মোহ ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিবে সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিলেন ঠিক তাহার এক বৎসর পরে ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে। তাহার দুই বৎসর পরেই জন্মিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি। দশ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ—সেই মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা। ইহার কিছুকাল পরে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ—ইংরেজ ঐতিহাসিক যাহার নাম দিয়াছেন 'সিপাহী-বিদ্রোহ'। সে যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিতে পারি নাই, ভারতসন্তানের রক্তেই সেদিন ভারতভূমি সিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে রক্ত শুকাইতে না শুকাইতেই যে কয় জন ভারতসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন তাঁহাদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে বিবেকানন্দ, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী, ১৮৭০ খৃঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এই সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে একটা কথা স্বতঃই মনে হয় যে শ্রীভগবান নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই, তিনি সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু সমস্ত সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের দমন করিতে শ্রীরামচন্দ্রও পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণও পারেন নাই—দুই একটা রাবণ কংস জরাসন্ধ দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে মাত্র। এত বড় বিরাট

একটা কাজ—পাপের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং পুণ্যের সার্ব্বভৌম প্রবর্ত্তন—সহজে অল্প সময়ে হয় না। বহু কল্প প্রয়োজন। পৃথিবী এক কালে জলময় ছিল—বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে স্থলের উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মরাজ্যও এক দিন সংস্থাপিত হইবে, নিগূঢ় অন্তরালে তাহার আয়োজন চলিতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাবেই কি তাহার ইঙ্গিত নাই? যে মানব এক দিন বর্ব্বর বন্য পশু ছিল তাহাদেরই মধ্যে এমন লোক কেন জন্মিল যাঁহার চরিত্রে শঙ্করের প্রতিভা, বুদ্ধের অহিংসা, যিশু খৃষ্টের ক্ষমা, ইসলামের মহত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যের প্রেম একই সঙ্গে বিরাজমান, যিনি ভয়ঙ্করী কালীপ্রতিমার মধ্যে শুধু করুণাময়ী জননীকেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, 'শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' ব্রহ্মকে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কোনও ধর্ম্মের সহিত কোনও ধর্ম্মের বিরোধ নাই, যাঁহার দৃষ্টিতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একই তত্ত্বের বিভিন্ন স্তরমাত্র, যিনি জানিয়াছিলেন কিছুর সহিতই কোনও কিছুর মূলতঃ প্রভেদ নাই—কারণ সমস্ত কিছুই সেই বিরাট ঊর্দ্ধমূল নিম্নশাখ ক্ষণস্থায়ী অশ্বত্থবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা মাত্র—সমস্ত কিছুরই মূল ঊর্দ্ধে শাশ্বত ব্রহ্মে। এরূপ লোকের মানবসমাজে আবির্ভাবের কি কোনও অর্থ নাই?

অর্থ যে আছে তাহা আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বকে যে সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন সেই সমন্বয়ের সুর যেন আজ পৃথিবীর মানসক্ষেত্রে ধ্বনিত হইতে সুরু করিয়াছে। হয়তো ক্ষীণভাবে, কিন্তু সুরু যে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বস্তুজগতের বৈজ্ঞানিকদের যেন নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের চক্ষে জড় ও জীবের সীমারেখা আজ অস্পষ্ট। বিভিন্ন বস্তুর বৈষম্যের যে কারণ আজ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহাও সমন্বয়ধর্ম্মী, সমস্ত বস্তুরই বাহিরের স্থূলরূপ যে পরমাণু-নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তিকণার নানাবিধ সমাবেশ ও স্পন্দনের উপরই নির্ভরশীল একথা আজ তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইতেছে। স্বর্ণ ও লৌহের বৈষম্য, আপাত-বৈষম্য—আসলে তাহারা ইলেক্‌ট্রন প্রোটনের বিভিন্ন লীলামাত্র একথা আজ সর্ব্বস্বীকৃত সত্য।

রাজনৈতিক জগতেও আজ এই সমন্বয়দৃষ্টি দেখা দিয়াছে। সর্ব্বদেশের মনীষীরাই আজ সমন্বয়ের আলোকে রাজনীতির জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চাহিতেছেন। বস্তুতান্ত্রিক আমেরিকার Wendel Wilkie তৎপ্রণীত One World পুস্তকে বলিয়াছেন—পৃথিবীর মানসিক ভারকেন্দ্র ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। Aldous Huxley এবং Maugham-রা বেদান্ত-উপনিষদের বাণীতে মুগ্ধ হইয়াছেন, রম্যা রলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজীবনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন। হাওয়া বদলাইতেছে সন্দেহ নাই। League of Nations অথবা United Nations-এর ব্যর্থতায় হতাশ হইলে চলিবে না, হয়তো আরও দুই একটা মহাযুদ্ধ আমাদের বিভ্রান্ত করিবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মিলনের পথ মিলিবেই। মানুষকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ সেই পথ-প্রস্তুতির আয়োজন করিয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অন্যতম।

আজ আমরা নিকটে আছি বলিয়া তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু আমাদের পরবর্ত্তীরা সুদূর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিরাট হিমালয়ের অভ্রভেদী বিরাটরূপ দেখিতে পাইবে। সম্রাট অশোকের

সমসাময়িক ব্যক্তিরা অশোককে চিনিতে পারেন নাই, আজ আমরা অশোককে চিনিয়াছি।

আজ আমাদের ঘোর দুর্দ্দিন সন্দেহ নাই। দুঃখের কারণ শুধু বাহিরেই নাই, আমাদের ভিতরেও আছে। যে ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ-স্বরূপ আজ আমরা সেই ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছি। আমাদের মনের সমস্ত ঝোঁকটা গিয়া পড়িয়াছে রাজনীতির উপর—যে রাজনীতির মূল লক্ষ্য স্বার্থপরতা। আমরা সকলেই ক্রমশঃ স্বার্থপর পশু হইয়া পড়িতেছি। পাশব শক্তির আপাত-উন্নতি আমাদের সকলকেই পশুত্বের স্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ। আমরা বিপদে পড়িলে আজকাল ভগবানের কাছে আর প্রার্থনা করি না, সভায় বা সংবাদপত্রে আন্দোলন করি। দুর্দ্দিন পুরাকালেও বহুবার আসিয়াছিল। তখন আর্ত্ত মানব ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। কংসের অত্যাচারে যখন সকলে সন্ত্রস্ত তখন আর্ত্ত মানবমানবী যে প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা নিষ্ফল হয় নাই। আসুন আমাদের এই দুর্দ্দিনে পুরাণকারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি—

"হে দেবতা, জাগ্রত হও। বিভীষিকাময়ী রজনী সমুপস্থিত। অবিশ্রান্ত বারিপাতে কর্দ্দম-পিচ্ছিল পথ; মুহুর্মুহু বিদ্যুতে ও মেঘ-গর্জ্জনে আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মনে হইতেছে যেন প্রিয়-পরিজনের কাঁচা মাংস ও তপ্ত রক্তের উপর দিয়া চলিতেছি। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া আছে। সকলেরই নিজেকে বড় একা, বড় অসহায় মনে হইতেছে, যেন আর কেহ নাই। অন্ধকারে আমারই মতো আর যাহারা চলিতেছে তাহাদের সহিত মুখামুখি হইলেই হিংস্র পশুর মতো পরস্পর চাহিয়া দেখিতেছি, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার বাসনা, অথচ যেন পরস্পরকে হনন না করিয়া চলিবার উপায় নাই। রাক্ষস কংসের অনুচরেরা অন্ধকারে পাগলের মতো ঘুরিতেছে, তাহাদের চোখেও ঘুম নাই। আমরা তাহাদের বন্দী, আমাদের লাঞ্ছনার সীমা নাই। তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না। রুদ্ধনিশ্বাসে ভীত শঙ্কিত প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি—হে দেবতা, জাগ্রত হও। পাপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; জননীর বক্ষে স্তন্য নাই, ক্ষুধিত শিশুরা ধুলায় লুটিয়া কাঁদিতেছে। অসহায়া নারীদের আর্ত্তনাদে কর্ণ বধির হইয়া গেল। এত আঘাত সহ্য করিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি। তোমার প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে। শাসনে পীড়নে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে। হে অন্ধকারের দেবতা, হে কৃষ্ণ, তুমি জাগ্রত হও।"

তাঁহাদের প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই। আমরাও যদি তেমনি করিয়া প্রার্থনা করি ভগবান আবার আবির্ভূত হইবেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পুণ্য-জীবন আলোচনা করিয়া এই শিক্ষাই যেন আমরা লাভ করি।

প্রেমের সাগর

(Ocean of Love)

স্বামী পরমানন্দ

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দূরে ফেলো নীচ চিন্তা তব মন হ'তে
ডুব দাও ডুব দাও প্রেম-সাগরেতে।

ডুবে মর—তাহাতেও ক'রো নাক ভয়
প্রেমেতে যে সুখ তার নাহি নাহি ক্ষয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের সঙ্গে কয়েক দিন

শ্রী——

৮ই মার্চ ১৯৩৫, সারগাছি। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ট্রেণে একটি ভক্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হলে ঢুকিতেই বাবা জানাইলেন যে, তাহারই জন্য এতক্ষণ বাহিরের হলে চেয়ারে বসিয়া আছেন। সে প্রণাম করিয়া উঠিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জন্য কি কি এনেছ?" ভক্তটি ফল, মিষ্টি প্রভৃতি দিল। তিনি খুব খুসি হইয়া সেগুলি লইলেন। ভক্তটি চেয়ারের কাছে মাটিতে চাপিয়া বসিল।

বাবা বলিতে লাগিলেন, "মনে কোরো না লম্বা লম্বা উপদেশপূর্ণ চিঠি দেবো, বা অনেক কথা বলতে পারব। ও সব পারব না। দেখছ ত আমার কত কাজ, আবার এই বয়স। গুরুগিরি করা আমাদের কর্ম নয়। যারা সত্যি সত্যি তাঁকে ভালবাসে, তাঁকে চায়—তারা যখন আসে তখন আর পারি না, তাদের নিয়ে বলি, 'ঠাকুর, এই নাও তোমার ভক্তরা এসেছে, তুমি নাও'। সঁপে দিই তাঁর কাছে; তিনি যা করবার করবেন।

"তাঁকে ভালবাসতে শেখ, ব্যাকুল হয়ে ডাকো—তিনি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই—এইটি ভাবো। তিনিই একমাত্র আছেন, তিনিই সব হয়েছেন। তাঁর স্বরূপকে পেতে চাও বল, 'প্রভু দেখা দাও, তুমি ত বলেছ—যারা এখানে আসবে তাদের তুমি দেখা দেবেই, তুমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ'।

"সত্যি তিনি দেখা দেবেনই, শুধু একটি জিনিষের অপেক্ষা—ব্যাকুলতা, আগ্রহ। আর কোন কিছুর কথা তিনি বলেন নি। আর কিছু তিনি চান না, শুধু ঐটি। প্রার্থনা কর—'প্রভু, ব্যাকুলতা দাও।"

• • •

পরদিন সন্ধ্যাবেলা। আরতির পর হলে চেয়ারে বাবা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। এখনও কেহ প্রণাম করিতে আসে নাই। করজোড়ে গুরুগম্ভীর স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—

"ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।
তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।"

তার পর আপনিই বলিতেছেন—"ব্রহ্মনিরূপণ? দৈত্যের হাসি। না হাসলেও হাসছে। নিরূপণ না করলেও নিরূপিত হয়ে রয়েছে। তোমার নিরূপণের অপেক্ষা রাখে না—নিরপেক্ষ। সূর্যের মত জ্বল জ্বল করে প্রকাশ পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না? তোমার চোখ বাঁধা বলে, সামনে মায়ার মেঘ বলে। মনে ময়লা রয়েছে, ধুয়ে ফেলতে হবে। সেই হচ্ছে সাধন। যে রকম surroundingএ (পারিপার্শ্বিক অবস্থায়) থাকবে মনের ধারণা, বিশ্বাস সেই ভাবে গড়ে উঠবে। তাই ত সাধুসঙ্গ দরকার, যারা সব সময় অনুভব করছে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'।

"সাধু আর কি?—সতত যে তাঁর চিন্তা করছে, তাঁর ওপর সব নির্ভর, নিরভিমান, পবিত্র, স্বার্থশূন্য। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। আমরা কি কিছু করছি? আমরা কি কিছু করতে পারি? তিনি যে এইখানে (হৃদয় দেখাইয়া) আছেন;

তিনিই করাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছের সব হচ্ছে, সত্যি বলছি—এ অনুভব করেছি—জীবনের প্রতি পদে। তাঁর ইচ্ছে—তাঁর কৃপা নইলে কার সাধ্য কিছু করে। প্রভু, 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'। এগুলি ঠাকুরের উচ্চারিত বাক্য, মহাবাক্য, জপ করলে সিদ্ধি হয়।"

* * *

সকালবেলা বাবা ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। ভক্তটি কাছে বসিয়া আছে। দূরে আশ্রমের ছোট ছোট ছেলেরা পড়িতেছে। বাবা বলিলেন—

"দেখ, ত্যাগ করতেই হয়। কামকাঞ্চন-ত্যাগ। তার পর মনের সব সূক্ষ্ম বাসনাত্যাগ—নামযশের বাসনা, সব তারে বাড়া—আরো বাসনা আছে—সে সবও ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগের সীমা নেই, তাই আনন্দেরও সীমা নেই। ত্যাগ থেকেই আনন্দ। যত ত্যাগ তত আনন্দ। আদর্শ চাই, ত্যাগের আদর্শ। তাই তিনি দেখাতে আসেন, যখন যেখানে যেমনটি দরকার। ত্যাগই মনুষ্যত্ব—দেবত্বের চেয়েও বড়। দেবতারাও মানুষের ত্যাগের অপেক্ষায় চেয়ে বসে থাকেন—যথা দধীচির দেহত্যাগ। অবতার পরিপূর্ণ আদর্শ। যে যতটুকু নিতে পারে তার ততটুকু। অনন্ত অগাধ সমুদ্র, ছোট ঘটি—যে যতটুকু ভরতে পারে। ঘটি ডুবে যাক্—যাক্ না। ত্যাগ চাই। ভাল পেতে হলে মন্দত্যাগ—আবার মন্দ পেতে হলে ভালত্যাগ।

'সুখার্থী ন লভেদ্ বিদ্যাং বিদ্যার্থী ন লভেৎ সুখম্।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্ বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্॥'

সুখভোগের বাসনা থাকলে কিছুই হবে না। বিচার কর—সংসারে প্রকৃত সুখ নেই। সুখের পরই দুঃখ; জন্ম জন্ম ধরে এই চলেছে, আর না। এবার unalloyed (খাঁটি) সুখের সন্ধানে যেতে হবে—যে সুখে ভেজাল নেই। ভেজাল খেয়ে খেয়ে প্রকৃত জিনিষের আস্বাদই ভুলে গেছে—আর তা হজম করার শক্তিও সব হারিয়ে ফেলেছে। সস্তায় ভেজাল পেলে আজকাল আর খাঁটি কেউই চায় না।"

* * *

সময়—সন্ধ্যারতির পর। স্থান—বাহিরের হল্। ভক্ত দু-চার জন উপস্থিত। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর বাবা আপন মনে তাঁহার সহজ সুরে গান গাহিতেছেন—

"মা, তোর কোলে আমি লুকিয়ে থাকি।
থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে,
চেয়ে চেয়ে তোর মুখপানে
শুধু মা, মা, মা, মা বলে ডাকি।
ও মা তোর কোলে আমি লুকিয়ে থাকি॥

—এই যেন ছোটছেলে মার কোলে রয়েছে, মা'র দিকে তাকিয়ে—ভারি আনন্দ; ইচ্ছে করে মায়ের মাঝে মিলিয়ে যাই। কেউ দেখতে পাবে না, শুধু মা আর আমি—আর কিছু না। থেকে থেকে চেয়ে চেয়ে মাকে দেখতে দেখতে আনন্দে যখন আটখানা যখন আর চেপে রাখতে পারছে না—তখন 'মা, মা, মা, মা বলে ডাকি'। মায়ের কাছে, মায়ের-ই কোলে রয়েছে, ডাকবার কোন কারণ নেই; তবু অকারণ আনন্দে অকারণ ডাক। তারপর কি সব আছে—'যোগানন্দ-নিদ্রারসে'; আরও কত সব। ও সব কি? ছোটছেলে মার কোলে, তার মধ্যে ঢোকালে কিনা 'যোগানন্দ-নিদ্রারসে'! আমরা ওই দুলাইন গাইতুম—একঘণ্টা, দুঘণ্টা ধরে। সব আত্মহারা! আর তিনি * হাসতেন, কখন বা গানে যোগ দিতেন। খুব আনন্দ!

* শ্রীরামকৃষ্ণ

মা তোর কোলে আমি লুকিয়ে থাকি।
দেখে দেখে চেয়ে চেয়ে,
চেয়ে চেয়ে তোর মুখপানে
মা, মা, মা, মা বলে ডাকি।”

• • •

পরদিন সকালবেলা। একটি সাদা গরদের চাদর গায়ে জড়ানো। দুটি হাত জোড় করিয়া বাবা আপন মনে স্তোত্রপাঠ করিতেছেন—ভক্তেরা বাধা না দিয়া ঘরের বাহির হইতেই দেখিতে ও শুনিতে লাগিল ৺প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের ‘বিশুদ্ধবিজ্ঞানমগাধসৌখ্যং’ ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তব। প্রত্যেকটি শ্লোকের শেষে যখনি ‘ভুবি রামকৃষ্ণঃ’ বলিতেছেন, তখনি বাবা যুক্তকর মাথায় ঠেকাইতেছেন। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গদগদ স্বরে হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া বাবা নিবিষ্ট মনে স্তব করিতেছেন—

‘তমদ্ভুতং কঞ্চিদচিন্ত্যশক্তিং।
বন্দে প্রশান্তং পরিপূর্ণবোধং
জ্ঞানস্য ভক্তেশ্চ বিশুদ্ধমূর্তিং
দ্বিমূর্তিমেকং ভুবি রামকৃষ্ণঃ।
দ্বিমূর্তিমেকং ভুবি রামকৃষ্ণঃ।’

বলিয়া বারংবার মাথায় হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

সংশয়াতীত

শ্রীতারাকুমার ঘোষ

সমগ্র বিশ্বের মাঝে রাজে এক বাণী,
অণু পরমাণু হ’তে সত্যের সন্ধানী,—
তোমারেই বহুরূপে করিছে প্রকাশ;
বিশ্বমাঝে তুমি প্রভু আনন্দ-নির্যাস
বিতরণ করিয়াছো আপনার হাতে;
কিন্তু হায় ধ্বংসলীলা লয়ে আজ মাতে
বিজ্ঞানীর জ্ঞান, তার যতেক সাধনা,
শ্মশানের বিভীষিকা করেছে রচনা।
তাই মনে জাগিয়াছে অনন্ত সংশয়
কোথা তব শক্তি, দীপ্তি হে আলোকময়?
তব সৃষ্টি ধ্বংস করি আসুরিক বলে,
যাবে তারা নিজ পথে অনায়াসে চলে,
তুমি দূরে উদাসীন অচঞ্চল হ’য়ে
নিরখিবে—কোনরূপ কথা নাহি কয়ে?
হেন কালে একি লীলা, একি গো বিস্ময়!
জানাইলে, তুমি সত্য, অনন্ত অব্যয়।
তোমার মহিমা ম্লান করে কোন জন?
সত্য লভিয়াছে তার নিজ সিংহাসন।
সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব মন্দ তোমার বিহিত।
আপনি রয়েছো কিন্তু সবার অতীত।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি

মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্‌লাউড্

অনুবাদক—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

(৪)

নীল নদীর উৎসপথে কয়েক জন ইংরেজের সঙ্গে আমার দেখা হল। চমৎকার লোক তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে জাপানে যেতে তাঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন। সুতরাং ভারতবর্ষ হয়ে জাপানযাত্রার আমার সুযোগ হল। আবার স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বল্লেন, যদি তাঁর যাবার ব্যবস্থার জন্য আমি লিখি তা হলে তিনিও জাপানে যাবেন। জাপানে আমি ওকাকুরা কাকাজুর সঙ্গে পরিচিত হই। টোকিওতে ওকাকুরা বিজুিৎসুইন্ চিত্রবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাপানে স্বামীজীকে অতিথি হিসেবে পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী যেতে রাজী হন নি বলে মিঃ ওকাকুরা তাঁর পরিচয় লাভ করবার জন্য আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে এলেন। বেলুড়ে কয়েক দিন থাকার পর আমার জীবনে একটি অতি আনন্দময় মুহূর্ত এল যখন মিঃ ওকাকুরা অনেকটা উৎকট অহঙ্কারে আমাকে বল্লেন: "স্বামী বিবেকানন্দ ত আমাদেরই। তিনি একজন প্রাচ্যবাসী। তিনি আপনাদের নন।" তখন আমি বুঝতে পারলাম তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সত্যিকারের ভাবসাম্য হয়েছে। দু'একদিন পরে স্বামীজী আমাকে বল্লেন: "মনে হচ্ছে যেন বহুদিনের হারান একটি ভাই এসেছে।" তাঁর কথায় ধরা পড়ল তাঁদের দু'জনের যথার্থ মনের মিল। তারপর স্বামীজী যখন তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলেন: "আপনি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন?" মিঃ ওকাকুরা উত্তর দিলেন: "না, এই সংসারের সঙ্গে বোঝাপড়া এখনও আমার চুকে যায় নি।" তাঁর উত্তরটি অতি বিজ্ঞোচিত!

ঐ বছর গরমে আমেরিকার কন্‌সাল-জেনারেল জেনারেল প্যাটারসন ওঁদের কন্‌সুলেট্-এ (Consulate) আমাকে থাকতে দিলেন। সেখানে অতিথি ছিলেন মিঃ ওডা। টোকিওর আসাকুসা মন্দিরে আমি তাঁর অতিথি হয়েছিলাম।

সমস্ত বছর প্রায়ই আমি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতাম। একদিন এপ্রেল মাসে তিনি বল্লেন: "জগতে আমার কিছুই নেই। নিজের বল্‌তে আমার এক পেনিও নেই। আমাকে যখন যা কেউ দিয়েছে তার সবই আমি বিলিয়ে দিয়েছি।" আমি বল্লাম: "স্বামীজী, যত দিন আপনি বেঁচে থাকবেন তত দিন আমি আপনাকে প্রতিমাসে পঞ্চাশ ডলার দেব।" তিনি মিনিট-খানেক ভেবে বল্লেন: "তাতে কি আমি কুলিয়ে নিতে পারব?" "হাঁ, নিশ্চয়ই পারবেন। অবশ্য তাতে বোধ হয় আপনার ক্রীম্-এর ব্যবস্থা হবে না"—আমি উত্তর দিলাম। আমি তখনই তাঁকে দু'শ ডলার দিই, কিন্তু চারমাস যেতে না যেতেই তিনি ইহ সংসার থেকে চলেই গেলেন!

একদিন বেলুড় মঠে কোন ক্রীড়াপ্রতি-যোগিতায় ভগিনী নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করছিলেন; আমি স্বামীজীর শোবার ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম; সেই সময়

তিনি আমাকে বল্লেন: "আমি কখ্‌খনো চল্লিশে পৌছব না।" তাঁর বয়স ছিল উনচল্লিশ—তা আমি জানতাম। আমি বল্লাম: "কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধ চল্লিশ থেকে আশি বছরের আগে ত তাঁর জীবনের বড় কাজ করেন নি।" তিনি বল্লেন: "আমার যা বাণী তা আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমাকে যেতেই হবে।" আমি জিজ্ঞেস্ করলাম: "কেন যাবেন?" তিনি উত্তর দিলেন: "বড়গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বড় হতে দেবে না। ছোটদের জন্য স্থান করবার জন্য আমাকে যেতেই হবে।"

তারপর আমি আবার হিমালয় গেলাম। আমি স্বামীজীকে আর দেখতে পাইনি। রাজার জুবিলি উপলক্ষে আমি ইউরোপে ফিরে গেলাম। পূর্বেই বলেছি আমি কখনও তাঁর শিষ্যা ছিলাম না, ছিলাম শুধু বন্ধু। ১৯০২, এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার সময় তাঁর কাছে শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম: "সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আমি আপনার সঙ্গেই থাকব।" এই লেখার পর আমি তাঁকে আর দেখিনি। বিদায়কালীন পত্রে আমার পরিষ্কার মনে পড়ে আমি ঐ কথা লিখেছিলাম। কথাটি তিনবার পড়ে নিজেকে জিজ্ঞেস্ করলাম: 'আমি যা লিখেছি সত্যিই কি তা মনে করি?' হাঁ, সত্যিই তা আমার মনোগত ভাব। যাই হোক্, আমি ইউরোপ রওনা হলাম। চিঠিখানা তিনি পেয়েছিলেন, অবশ্য আমি কোন উত্তর পাইনি। তিনি ১৯০২, ৪ঠো জুলাই দেহত্যাগ করেন।

২রা জুলাই ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করেন। কোন একটি বিজ্ঞান তাঁর বিদ্যালয়ে পড়াবেন কিনা জানতে তিনি স্বামীজীর কাছে গিছ্লেন। স্বামীজী উত্তর দিলেন: "বোধ হয় এ বিষয়ে তুমিই ঠিক, আমার মন কিন্তু অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত। আমি পরপারের জন্য তৈরী হচ্ছি।" নিবেদিতা ভাবলেন স্বামীজী বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। স্বামীজী তাঁকে বল্লেন: তোমাকে ত খেয়ে যেতে হবে।" ভগিনী নিবেদিতা সব সময়ই হিন্দু ধরনে আঙুল দিয়ে খেতেন। তাঁর খাওয়া হয়ে গেলে স্বামীজী তাঁর হাতে জল ঢেলে দিলেন। সত্যিকার শিষ্যের মত নিবেদিতা বল্লেন: "আপনার এরূপ করা আমার ভাল লাগছে না।" তিনি উত্তর দিলেন: "যীশুখৃষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।" "তাঁদের শেষ সাক্ষাতের সময় ঐরূপ হয়েছিল"—ভগিনী নিবেদিতা কথাটি এক রকম বলতে যাচ্ছিলেন। ঐটিই ছিল তাঁর স্বামীজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার। সে দিন স্বামীজী তাঁর কাছে আমার কথা বলেছিলেন, অন্যান্য অনেকের কথা বলেছিলেন। আমার প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "সে পবিত্রতার মতই পবিত্র—যেন মূর্তিমতী পবিত্রতা। মূর্ত ভালবাসার মতই সে ভালবাসে।" সুতরাং ঐ কথাকেই আমার প্রতি স্বামীজীর শেষ বাণীরূপে আমি গ্রহণ করেছিলাম। দু দিনের মধ্যেই তিনি মহাপ্রস্থান করলেন। বলে গেলেন: "এই বেলুড়ে যে ঘনীভূত আধ্যাত্মিকতার চাপ এল, তা থাকবে পনর শ বছর। এ হবে এক সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। আমি কল্পনা করছি মনে কর না, আমি তা প্রত্যক্ষ দেখছি।"

৪ঠো জুলাই বেলুড় মঠ থেকে আমাকে ক্যাব্‌ল-এ খবর দেওয়া হল: "স্বামীজী নির্বাণ লাভ করেছেন।" কয়েক দিন আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ক্যাব্‌ল-এর আমি কোন উত্তর দিইনি। বিমর্ষের ঘনান্ধকারে আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠল; তাতে কয়েক বছর কাঁদলাম। ম্যাটারলিঙ্ক্ পড়বার পর আমি

আর চোখের জল ফেলিনি। ম্যাটারলিঙ্ক্ বলেছেন: "তুমি যদি কারো দ্বারা সত্যিই প্রভাবিত হয়ে থাক, তাহলে তোমার জীবনে তা প্রমাণ কর, চোখের জলে নয়।" আমি আমেরিকা ফিরে গিয়ে যে সব জায়গায় স্বামীজী ছিলেন তার অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি সহস্র দ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) গেলাম; সেখানে গৃহকর্ত্রী মিস্ ডাচারের অতিথি হলাম। স্বামীজী যে ঘর ব্যবহার করতেন সেই ঘরে তিনি আমাকে থাকতে দিলেন।

চৌদ্দ বছর কেটে যাবার পর আমি ভারতবর্ষে ফিরলাম; সেবার আমি প্রোফেসার গেড্‌স্ ও মিসেস্ গেড্‌স্-এর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তখন আমি দেখতে পেলাম ভারতবর্ষ ত নিরানন্দ নৈরাশ্যের দেশ নয়! সারা ভারতবর্ষ স্বামীজীর ভাবে উদ্দীপিত; ছ'সাতটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হাজার হাজার কেন্দ্র হয়েছে, শত শত সমিতি দেখা দিয়েছে! ঐ সময় থেকে আমি ঘনঘনই ভারতবর্ষে গিয়েছি। সন্ন্যাসীরা আমাকে বেলুড় মঠের অতিথিশালায় পেতে চান। আমি স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁদের সামনে প্রাণবন্ত করে ধরি কিনা! এই যুবকরা ত তাঁকে কখনও দেখেননি। আমিও ভারতবর্ষে থাকতে চাই। মনে পড়ে যখন স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞেস্ করেছিলাম: "স্বামীজী, আমি কি ভাবে আপনাকে সব চেয়ে বেশী সহায়তা করতে পারি?" তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "ভারতবর্ষকে ভালবাস।" সুতরাং ভারতবর্ষেই আমি থাকতে চাই! বেলুড় মঠের অতিথিশালার দোতলা আমারই! হয়ত প্রত্যেক বছর শীতকালে ওখানে যাব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত!

(সমাপ্ত)

শ্রীরমণ মহর্ষি

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

গত ১৪ই এপ্রিল (১৯৫০) শুক্রবার দক্ষিণ ভারতের সর্বজনমান্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীরমণ মহর্ষি সত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার আর্কট জেলাস্থিত অরুণাচল আশ্রমে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল এই মহর্ষি স্বীয় দিব্য জীবনের প্রভাবে অসংখ্য নরনারীর অশেষ কল্যাণ সাধন করেন।

১৮৭৯ খৃঃ দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই জেলার তিরুচুলি গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে বেঙ্কট-রমণ জন্মগ্রহণ করেন। অতিশয় বুদ্ধিমান ও স্বাধীনচেতা হইলেও বালক বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। বাল্যকালে তাহার কোন ধর্মানুরাগ বা ঈশ্বর-ভক্তির আতিশয্যও পরিলক্ষিত হয় নাই। পাঠ্যাবস্থায় ষোল বৎসর বয়সে বালকের জীবনে এমন একটি অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয় যাহার

ফলে তাহার জীবনগতি আমূল পরিবর্তিত হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ মৃত্যুভয় তাহাকে পাইয়া বসে। বালক অনুভব করিল—সে মরিতে চলিয়াছে। এই ভাবনা তাহাকে অনতিবিলম্বেই অন্তর্মুখী করিয়া তুলিল। তাহার ভিতরে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল—মৃত্যু কি এবং উহার পরিণামই বা কি? সে মৃত ব্যক্তির অভিনয় করিল—মৃতের ন্যায় ভূমিতে শায়িত হইয়া সর্বতোভাবে নিজকে মৃত বলিয়া অনুভব করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু বালক তখনও অন্তরে উপলব্ধি করিতে লাগিল—'সোঽহং' (আমি সেই)। চকিতে তাহার অনুভূতি হইল—মানুষ মরণশীল দেহমাত্র নয়, তাহার প্রকৃত স্বরূপ অজ অব্যয় শাশ্বত আত্মা। এইরূপে মুহূর্ত-মধ্যে তাহার হৃদয়ে বিবেক, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব উদ্দীপিত হইল। সংসারত্যাগ করিবার শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় বালক দিন কাটাইতে লাগিল। কয়েক মাস পরেই সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

পড়াশুনায় অমনোযোগী ও উদাসীন দেখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালককে সময়ে সময়ে তিরস্কার করিতেন। এই তিরস্কার তাহার নিকট পরম পুরস্কার বলিয়াই প্রতিভাত হইল। ভ্রাতার শাসনে বালকের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, সংসারে থাকিয়া সাধারণের ন্যায় বিষয়সম্ভোগে জীবন অতিবাহিত করা তাহার অভিপ্রেত নয়। একদিন ভ্রাতার উদ্দেশে নিম্নোক্ত মর্মে একখানা পত্র লিখিয়া মাত্র তিনটি টাকা সম্বল লইয়া বালক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান অরুণাচল (তিরুবন্নমলাই) অভিমুখে যাত্রা করিল—"দাদা, পরমপিতা পরমেশ্বরের আদেশে তাঁহার সন্ধানে গৃহ ছাড়িয়া চলিলাম; আমার কোন খোঁজ করিবেন না। আশীর্বাদ করিবেন যেন উদ্দেশ্য সফল হয়। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।"

অরুণাচল তীর্থে উপস্থিত হইয়া বেঙ্কটরমণ গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি কোন গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই এবং ধর্ম-শাস্ত্রেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল না। যে পরম-পিতার নির্দেশে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অরুণাচলে আসিয়াছিলেন সেই ভগবানের অদৃশ্য হস্তই তাঁহাকে এক্ষণে সাধনায় সিদ্ধিলাভে সহায়তা করিতেছিল। তিনি আত্মানুসন্ধানে এতদূর ডুবিয়া গেলেন যে গভীর তিতিক্ষা-সহায়ে অচিরকাল মধ্যেই আত্মজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইলেন। তদবধি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ মহর্ষি অরুণাচলে অবস্থান করিয়া তাঁহার উপলব্ধ জ্ঞান-বিতরণে ও মধুর কৃপাবর্ষণে অগণিত নরনারীর কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

অরুণাচলে মহর্ষির একটি আশ্রম আছে। তথায় তাঁহার কোন সন্ন্যাসী বা গৃহী শিষ্য-সম্প্রদায়ের মতো কিছু গড়িয়া উঠে নাই। তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন দীক্ষা দিতেন না, কাহাকেও শিষ্য করিতেন না এবং কোন সংঘও গঠন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি স্বয়ংই সকলের আলো ও আশ্রয় স্বরূপ ছিলেন। যাঁহারাই তাঁহার দিব্য সংস্পর্শে আসিত তাহারাই তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ ও অমৃতোপম উপদেশ পাইয়া ধন্য হইত, তাহাদের সকল সন্দেহের নিরসন হইত, তাহারা বিশ্বাস-ভক্তি-প্রেমে সমৃদ্ধ হইত এবং হৃদয়ে বিমল আনন্দ ও অপূর্ব শান্তির প্রেরণা লাভ করিত। এমনি ছিল তাঁহার দিব্য জীবনের অমোঘ প্রভাব। আজ তাঁহার দেহাবসানে তৎপ্রবর্তিত কোন সংঘ, সম্প্রদায় ও শিষ্যগোষ্ঠী দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তিনি অসংখ্য অনুরাগী ও ভক্তের হৃদয়ে তাঁহার দিব্য আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় মহর্ষি রমণ তাঁহার

নিজ অনুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিয়াছেন। তিনি দার্শনিকের ন্যায় কোন বিশেষ প্রণালীবদ্ধ মতবাদ প্রচার করেন নাই। তিনি ছিলেন একজন ঋষি, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। তৎপ্রণীত 'উপদেশসারম্' নামক কবিতায় তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই।

উপনিষদের শিক্ষার মতোই মহর্ষি রমণের শিক্ষা। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করাই তাঁহার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। তাঁহার উপদেশ-প্রদানপদ্ধতি ছিল একান্তই সরল ও মৌলিক—উহাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের চুলচেরা নীরস বিচার ও তর্কজাল-বিস্তারের কোন প্রচেষ্টা ছিল না, ছিল শুধু নিজের উপলব্ধ সহজ সরল কথার অপূর্ব ব্যাখ্যান। ফলে তাঁহার উপদিষ্ট 'আত্মবিচারের' সাধনা ধর্মার্থি-মাত্রেরই হৃদয় গভীর ভাবে স্পর্শ করিত। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য ও করুণা ছিল অপরিসীম। দর্শক ও উপদেশ-প্রার্থীরা তাঁহার দিব্য সান্নিধ্যে প্রেরণা এবং করুণাদৃষ্টিতে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিত। উচ্চ-নীচ, দীন-দরিদ্র, পুণ্যবান্ পাপী সকলকেই তিনি কৃপাবর্ষণে ধন্য করিতেন।

মহর্ষির শিক্ষার প্রধান কথা এই—আত্ম-বিচারই সর্বোচ্চ উপলব্ধির মুখ্য সাধন, কারণ ইহা দ্বারা কাঁচা 'আমি'-কে পাকা 'আমি'-তে শীঘ্র লীন করা যায়। এই আত্মবিচার মানসিক অনুসন্ধান নয়—ইহা মনকে বিষয় হইতে শুদ্ধ আত্মচৈতন্যে দৃঢ়নিবদ্ধকরণ। মন দৃশ্যবস্তু হইতে, বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে শুদ্ধ ও নিষ্কাম হয়, তখনই আত্মদর্শন হইয়া থাকে। আত্মা শুদ্ধ মনেরই গোচর। বাসনাযুক্ত মনের নাশ হইলে অখণ্ড পরিপূর্ণ সৎ থাকেন। এই পরিপূর্ণ সৎ-ই যথার্থ স্বরূপ—পাকা 'আমি', শাশ্বত আত্মা। এই অনুভূতি-লাভই পরম যোগ, পরম জ্ঞান এবং পরমা ভক্তি। ইহাই মহর্ষি-উপদিষ্ট সরল ও গভীর সাধন। ইহা সার্বভৌম ও সর্বজনের গ্রহণোপযোগী।

সমালোচনা

বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস—মণিলাল সেন-প্রণীত। পূর্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ। পৃষ্ঠা ১২৭ ; মূল্য দুই টাকা।

ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলার অবদান অবিস্মরণীয়। সঙ্গীতকলায়ও ইহার ব্যত্যয় হয় নাই। সঙ্গীত এবং উহার আনু-ষঙ্গিক নৃত্যবাদ্য প্রভৃতিতে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। আলোচ্যমান পুস্তকে গ্রন্থকার প্রাচীন বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত সঙ্গীত-চর্চায় বাঙ্গালী জাতি যে অতুলনীয় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে উহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকারের বিবৃতিগুলি কতিপয় বিশেষজ্ঞ সমালোচকের সুচিন্তিত ও গবেষণামূলক অভিমতের দ্বারা

সমর্থিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। তথ্যসংগ্রহ ও বিষয়বস্তু বিন্যাসে লেখকের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রশংসনীয়। পুস্তকের প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সুন্দর। পুস্তকখানি সঙ্গীতজ্ঞ এবং গীতবাদ্য-রসিকমাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতনা—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, এম-এ, কাব্যতীর্থ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা।

নানা সাময়িক পত্রে লেখক যে সকল সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে নয়টি এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম আটটি প্রবন্ধে যথাক্রমে রামমোহন, অক্ষয়কুমার ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, মীর মশাররফ হোসেন ও নবীনচন্দ্র এই আট জন সাহিত্য-সাধকের অন্তর্জীবন ও জীবন-দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী প্রতিভার যে বিস্ময়কর ও সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহার কয়েকটি চিত্র এই পুস্তকে সুচারুরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। কয়েক জন প্রতিভাবান্ বাঙ্গালীর জীবন ও রচনার মধ্যে সে যুগের ভাবধারা কতটা প্রতিফলিত হইয়াছিল পণ্ডিত লেখক তাহা বিভিন্ন মনীষীর বাক্যোদ্ধার-পূর্বক প্রবন্ধগুলিতে আলোচনা করিয়াছেন।

লেখকের মতে "রামমোহনের প্রতিভা মূলতঃ সাহিত্যিক প্রতিভা নয়, দার্শনিক প্রতিভা।.... রামমোহনের চিন্তাধারা দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমার ও উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।" ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' পুস্তক হইতে বাক্যোদ্ধার করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন, স্বামীজি নৈনিতালে নিজমুখে স্বশিষ্যা নিবেদিতার নিকট রাজা রামমোহনের ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বামীজি ছিলেন স্বাধীনচেতা যুগাচার্য। তাঁহার বাণীর যেমন ছিল বিশেষত্ব, তেমনি ছিল স্বাতন্ত্র্য। একই দেশের, একই শতাব্দীর মনীষিগণের মধ্যে ভাবসাদৃশ্য বা পারম্পর্য থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাহাকে 'ঋণ' বলা সমীচীন কি? লেখক মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তায় দ্বৈতধারাটি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি সাহিত্যিকের স্মরণীয় অবদান ও সুচিত্রিত হইয়াছে।

অন্তিম অধ্যায়টির নাম 'শতাব্দী-পরিক্রমা'। ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় ধর্মান্দোলন এবং সাহিত্য-সাধনার সামান্য পরিচয় প্রদত্ত। এই সম্পর্কে লেখক বলেন, "এযুগে স্বামী বিবেকানন্দই শিক্ষিত সমাজের উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।....তাঁহার বাণীর মধ্যে যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ আছে উহাই দেশের তরুণগণকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।" লেখক স্বামীজির পাঁচটি অবদান উল্লেখান্তে স্বামীজির বাংলা রচনার বিশেষত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, "স্বামীজির 'বর্তমান ভারত'-কে ইতিহাস-দর্শন বা Philosophy of History বলা চলে।"

এই তথ্যপূর্ণ ছোট বইখানি বাংলার তরুণ-তরুণীদের, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ করা উচিত। বিভক্ত বাংলার এই দুর্দিনে বাঙ্গালী যেন তাহার সাহিত্য-সম্পদকে বিস্মৃত না হয়। যে বঙ্গসাহিত্য ভারত-সাহিত্যে, এমনকি বিশ্ব-সাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল তাহার উজ্জ্বল অতীতের অবনতি অন্ধকার ভবিষ্যতেও আলোক-সম্পাত করিতে পারে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ছাত্রজীবনে শক্তিসঞ্চয়—অধ্যাপক সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা। ২৩ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থকার 'বেদশতক', 'বঙ্গগৌরব' প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতৃ-রূপে পরিচিত। ব্রহ্মচর্যের মহিমা কীর্তন এবং ছাত্রজীবনে উহার অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শন আলোচ্যমান পুস্তিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্রহ্মচর্য বা বীর্যধারণ মনুষ্য-জীবনের ভিত্তি। দৃঢ়ভিত্তিক সৌধ যেরূপ অটল ও স্থায়ী হয় বীর্যবান মানুষের জীবনও তদ্রূপ স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু হয়। দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশ বর্ষ পর্যন্ত মানবশরীরে বীর্যোৎ-পত্তির পরিমাণ সমধিক। উক্ত ধাতুর সংরক্ষণেই শক্তি সঞ্চিত হয়, উহার অপচয়ই মৃত্যুতুল্য। ছাত্রগণের পাঠ্যাবস্থাও এই কালের অন্তর্গত বলিয়া ছাত্রজীবনই বীর্যধারণের প্রকৃষ্ট সময়। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য শক্তি স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অক্ষয় আকর। অতএব কায়মনোবাক্যে বীর্য-ধারণ ও তৎসহিত নিয়মিত ভাবে আসনপ্রাণা-য়ামাদির অভ্যাস দ্বারা চরিত্রগঠন ছাত্রমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। এই পুস্তিকায় সরলভাষায় গল্পচ্ছলে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া উপরোক্ত সুমহান্ আদর্শ বর্ণিত। ছাত্রছাত্রী-সমাজে ইহা বহুল প্রচারের যোগ্য।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার

রাজা গণেশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। বিজয়া সাহিত্য মন্দির, কাশীধাম ও রাজসাহী হইতে শ্রীবিমলেন্দু কুমার মৈত্র কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩৯ ; মূল্য এক টাকা।

বঙ্গদেশের শৌর্য-বীর্যের গৌরবময় ঐতিহ্যস্রষ্টা-গণের মধ্যে রাজা গণেশের নাম অবিস্মরণীয়। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাঁহার জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া আলোচ্যমান নাটকখানি রচিত। রাজা গণেশ ছিলেন সপ্তদুর্গার ভূস্বামী, অমিত তেজ, সংগঠনী প্রতিভা ও অপূর্ব রণকৌশলে হইলেন বঙ্গের অধীশ্বর। তিনি পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, স্বধর্মনিষ্ঠা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতিস্থাপনেও ছিল তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ। লেখক ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা ; ইতিহাসের ঘটনা-পারম্পর্য তাঁহার মুখ্য উপাদান হইলেও রসস্রষ্টা হিসাবে, সংবেদনশীল নাট্যকার হিসাবে তিনি ঐতিহাসিক বাস্তবতার পশ্চাতে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। ইহাতেই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির পরিচয়। রাজা গণেশ ও নসেরিৎ সাহ-চরিত্রে যে উদার অসাম্প্রদায়িক মানবতা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। আসমান তারা-চরিত্রও নাটকখানিকে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। মোটের উপর ইহাতে একটি উদার ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ রূপায়িত। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতোষ লাভ করিলাম।

মহারাজ সীতারাম—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট, অরুণোদয় আর্ট প্রেস, কলিকাতা হইতে শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও রাজসাহী গোবিন্দধাম হইতে প্রকাশিত ; পৃষ্ঠা—১২৭ ; মূল্য অনুল্লিখিত।

ইহাও লেখকের আর একখানি ঐতিহাসিক নাটক। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'সীতারাম'অব-লম্বনে নাটকখানি লিখিত। বঙ্কিমের সীতারাম ও বর্তমান লেখক-বর্ণিত সীতারাম সম্পূর্ণ এক নন। এই নাটকের সীতারাম কঠোর কর্তব্য-পালনে সদা অপরাঙ্মুখ, তাঁহার জীবনের অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত শৌর্য ও দেশপ্রেমের সৌরভে আমোদিত। ইহাতেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ভাব লক্ষ্য করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্যানফ্রান্সিস্কো উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়া) বেদান্ত সোসাইটি—গত মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী নিম্নলিখিত বক্তৃতা দান করিয়াছেন:—(১) "আধ্যাত্মিক জীবনে স্বাধীন ইচ্ছা এবং ভগবৎ-কৃপা", (২) "স্যাল্‌ভাসন্‌ অথবা মোক্ষ?" (৩) "ভারতবর্ষের কতিপয় মহিলা সাধিকা", (৪) "একটি পূর্ণাবয়ব ধর্মদর্শন", (৫) "আমরা কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছি?" (৬) "জীবাত্মার কয়েকটি অন্ধকার রাত্রি", (৭) "নশ্বর ও অবিনশ্বর মানব"। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রতি শুক্রবার সোসাইটির সদস্য ও ছাত্রদিগকে ধ্যানশিক্ষা দিয়াছেন এবং বেদান্তদর্শনের তাত্ত্বিক ও কার্যকর দিকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সোসাইটির সহকারী অধ্যক্ষ স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী গত মার্চ মাসে "ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের উপায়" ও "নবযুগের নবধর্ম" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন।

রাজকোট (কাথিওয়ার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-জয়ন্তী মহোৎসব—গত ১৭ই চৈত্র হইতে ১৯শে চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে শ্রীশ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাজকোট ও সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর হইতে বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন।

গত ১৭ই চৈত্র মহিলা-সম্মেলনে স্থানীয় রিজন্যাল কমিশনারের পত্নী শ্রীমতী কমলাবেন রেগের সভানেত্রীত্বে প্রার্থনা, ভজন-সঙ্গীত ও গরবা নৃত্য প্রভৃতি স্থানীয় ভারতীয় সঙ্গীত নিকেতন ও বার্টন ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। বল্লভ কন্যা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত "শ্রদ্ধার দান" নামক একটি নাটিকা সুন্দররূপে অভিনয় করে। শ্রীমতী মুগ্ধাবেন শুক্ল শ্রীশ্রীমায়ের সরল, অনাড়ম্বর ও আদর্শ জীবন সম্বন্ধে মনোরম বক্তৃতা প্রদান করেন। উপসংহারে সভানেত্রী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেন।

গত ১৮ই চৈত্র স্বামী বিবেকানন্দ জয়ন্তী সভায় বহু বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। সৌরাষ্ট্র হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এইচ্‌ ভি দিবেটিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রমণলাল কে যাজ্ঞিক, অধ্যাপক শ্রীরবিশঙ্কর যোশী ও শ্রীবালকৃষ্ণ ডি শুক্ল, এম-এল্‌-এ এবং সভাপতি মহাশয়ের মনোজ্ঞ অভিভাষণের পর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়। ঐ দিন রাত্রে ভক্ত ইব্রাহিমের দুই ঘণ্টাব্যাপী ভজনসঙ্গীত সকলের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

উৎসবের শেষ দিনের সভায় সৌরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উচ্ছ্রঙ্গরায় এন্‌ ঢেবর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতীয় সঙ্গীত নিকেতন কর্তৃক গীত উদ্বোধন-সঙ্গীতের

পর আশ্রমের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অনন্ত প্রসাদ আর বক্সি, শ্রীহরকান্ত শুক্ল, শ্রীবালকৃষ্ণ শুক্ল ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের মনোরম অভিভাষণের পর আশ্রমের অধ্যক্ষ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য শেষ হয়। রাত্রিতে স্থানীয় সৌরাষ্ট্র জ্ঞানপ্রচার সঙ্ঘ কর্তৃক শিক্ষাবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনান্তে শ্রীজগজীবন জানি সদলে নানাবিধ হাস্যরস ও ভজনসঙ্গীত দ্বারা সমবেত জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করেন।

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১১শে চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৫ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। সদ্য আমেরিকা-প্রত্যাগত স্বামী যতীশ্বরানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে দেড় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। কুমারী ঊষা দত্ত কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইলে কুমারী ঝরণা ঘোষ স্বামীজীর রচনা হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। অতঃপর বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ আর্থার মুর, পণ্ডিত মৌলিচন্দ্র শর্মা, ডাঃ চম্পকলাল মেহতা এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি মহোদয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার জন্য পাশ্চাত্যবাসী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবীতে প্রকৃত স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠায় এই সব মহাপুরুষের জীবনী ও শিক্ষা বিশেষ সহায়তা করিবে। পরিশেষে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লোকশিক্ষা-প্রণালী বর্ণনা করিয়া ভারতের সনাতন আদর্শ ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। ডাঃ জে কে সেন কর্তৃক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনান্তে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

নিউ দিল্লী লোদী কলোনীতে বাঙ্গালী ক্লাবে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে আহূত এক সভায় বর্তমান সমস্যার সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা কি ভাবে সহায়ক হইতে পারে তৎসম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার অষ্টাবিংশ বার্ষিক মহোৎসব—গত ৭ই বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ-জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী পবিত্র জন্মভূমিতে এই প্রতিষ্ঠানের অষ্টাবিংশ বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পূজাদি, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে ঐ দিবস এখানে কয়েক সহস্র লোকসমাগম হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। বৈকালে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভায় শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবন-সম্বন্ধে স্বামী হংসানন্দজী ও স্বামী গদাধরানন্দজী

মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক, স্তোত্রপাঠ, ভজন ও কীর্তনের পর রাত্রিতে প্রসাদবিতরণ-অন্তে বিপুল আনন্দের মধ্যে এই দিবসের উৎসব সমাপ্ত হয়। পরবর্তী দুই দিবস রাত্রিতে যাত্রা অভিনয় দ্বারা উপস্থিত সকলের আনন্দবর্ধন করা হইয়াছে।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ১৫ই চৈত্র হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পঞ্চদশশততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ১০ই চৈত্র মিশন-পরিচালিত বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রী-দের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। স্বামী পূর্ণানন্দজী ছেলেমেয়েদিগকে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে বলেন। ১১ই চৈত্র উক্ত স্বামীজী বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন এবং জন-সভায় সভাপতিত্ব করেন। সম্পাদক স্বামী পরশিবানন্দজী আশ্রমের কার্যাবলী পাঠ করিলে মালদহ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী ও সভাপতি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ১২ই চৈত্র বিশেষ পূজাদি-অন্তে পূর্ববংগাগত বাস্তুত্যাগী নরনারায়ণগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। এই দিন স্বামী বগলানন্দজীর পরিচালনায় কালী-কীর্তন হয় এবং প্রায় ২৫০০ শত নরনারী পার-তোষপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন।

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—গত ২রা বৈশাখ হইতে দিবসত্রয় এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ঐ উৎসবে বহু নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক শ্রীযুক্ত হরিদাস কর মহাশয় তিন দিন কীর্তন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে কাটিহার আশ্রমের স্বামী পূর্ণানন্দজী আশ্রমে ও শহরের কয়েকটি স্থানে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোম্—১০ নং হরিনাথ দে রোডস্থ (কলি-কাতা-৯) এই প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট-সংখ্যক মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনাখরচে রাখিয়া কলেজে পড়ান হয়। পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ব্যয় বহন করিয়াও কয়েক জন ছাত্র এখানে থাকিতে পারে। এ বৎসর যে সকল ছাত্র কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে, শুধু তাহাদের আবেদনই বিবেচিত হইবে। যাহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে টেষ্ট পরীক্ষার নম্বর ও উত্তরপ্রাপ্তির জন্য পোষ্টেজ্ সহ শীঘ্র আবেদন করিতে অনুরোধ করি।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্ত-চিন্তামণি—গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি তাঁহার কলিকাতা জোড়াবাগানস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি একজন সুপরিচিত সাংবাদিক, লেখক ও বক্তা ছিলেন। 'বন্দে মাতরম্', 'ইংরেজী বসুমতী', 'এডভান্স' প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল। তিনি দৈনিক

পত্রিকাগুলিতে ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেন। প্রাচীন পুঁথি-পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের অনেকেরই দিব্যসংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। বহু-বৎসর পূর্বে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্র এবং উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে ছাপা হইত। এই জন্য উদ্বোধন-কার্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে তিনি সর্বদা যাতায়াত করিতেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন ও কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির জনহিতকর কার্যাদিতে তাঁহার শ্রদ্ধা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। ভারতীয় ধর্ম দর্শন সংগীত এবং বিশেষরূপে তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অনুরাগ ছিল। তিনি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার স্ত্রী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি এবং তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করিতেছি।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সমাবর্তন উৎসব—কিছু দিন হয় কলিকাতা রাজ্যপাল ভবনের মার্বেল হলে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের প্রথমবার্ষিক সমাবর্তন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু মহাশয় সভাপতি এবং শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পরিষদের সচিব ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী তাঁহার সংস্কৃত ভাষণে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সংস্কৃত শিক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা করিতেছেন সত্য, তথাপি কমিটির প্রধান সুপারিশ অর্থাৎ ৫ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে একটি রাজকীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এখনও গৃহীত হয় নাই। পরিষৎ বর্তমানে একটি পরীক্ষা গ্রহণ ও বৃত্তিবণ্টন সমিতিমাত্র, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাবিভাগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষণাবিভাগ এবং গ্রন্থপ্রকাশবিভাগ-সংবলিত একটি পূর্ণায়তন বিশ্ববিদ্যালয়ই পরিষদের মূল লক্ষ্য।

রাজ্যপাল ডক্টর কাটজু বলেন, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সংস্কৃতই ভারতের রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রভাষা ফরমায়েস দিয়া গড়া চলে না, আইনবলেও চালান চলে না। যে ভাষা আমাদের সাহিত্য দর্শন ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা, সেই ভাষাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত।

শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, স্বাধীন ভারতে সংস্কৃতের চর্চা জাতির উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুসারে গবেষণা-বিভাগাদি স্থাপনে সচেষ্ট আছেন। সভায় ছয় শতাধিক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর স্নেহময় দত্ত সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত বৈশাখ মাসে এই প্রতিষ্ঠানে বৈশাখী পূর্ণিমা-তিথিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত "ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার বাণী" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব "গীতা", পণ্ডিত পঞ্চানন শাস্ত্রী "তুলসী-দাসী রামায়ণ", শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (সাধকভাব)" ও

"শিবানন্দ-বাণী" এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে বৌদ্ধশাস্ত্র "ধম্মপদ" ধারাবাহিক রূপে ব্যাখ্যা করেন।

ছোটসরষা-পাইকাড়া (হুগলী) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ—গত ১২ই চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৫তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূজাদি, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা, নরনারায়ণ-সেবা এবং ভজন-কীর্তন হয়। অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী বেদানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি জনসভায় হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম বর্তমান সঙ্কটময় যুগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের মহতী শিক্ষা এবং কল্যাণকর আদর্শ গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী সংঘের ভাবধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শেষে সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বধর্মের ঐক্যসাধন এবং বর্তমানযুগে তাঁহার বাণী অনুধাবনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

আমেদাবাদ (বোম্বাই) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১৪ই চৈত্র শ্রীরামনবমী উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে সারাদিন-ব্যাপী কার্যক্রম অনুসরণ করা হইয়াছিল। প্রাতে ভজনাদি এবং মধ্যাহ্নে রামায়ণপাঠ হয়; ভোগরাগান্তে ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে জনসভায় 'আলোকস্তম্ভ শ্রীরামচন্দ্র' সম্বন্ধে প্রবচন ও কীর্তনীয়া শ্রীকালিদাস ভগতের কীর্তন হয়। এই উপলক্ষে পঞ্চায়তন শ্রীরামচন্দ্রের এক বড় সুন্দর প্রতিকৃতি সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং বহু নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

গোপীনাথপুর (পোঃ চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এবার গত ৫ই চৈত্র সারাদিন-ব্যাপী মহোৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষে আহূত সভায় ঝাঁকরা হাই স্কুলের বালক এবং আশ্রম-বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণ গীতা, দশাবতার-স্তোত্র ও স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাদি আবৃত্তি করিলে মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যভূষণ সেন, এম্‌-এ, বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, স্বামী সুশান্তানন্দজী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভান্তে বজবজ বিবেকানন্দ সংঘের শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ৬ই চৈত্র আশ্রম-প্রাংগণে স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী কর্তৃক চণ্ডী ব্যাখ্যাত এবং পরদিন ঝাঁকরা হাইস্কুলে একটি ধর্মসভায় তৎকর্তৃক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীগণের চেষ্টায় এই উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

জনাই (হুগলী), শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক-সম্মেলন—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১১শে চৈত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড় মঠের স্বামী বিমুক্তানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ও স্বামী বীতশোকানন্দজী ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। গ্রামের সকলেই এই উৎসবে যোগদান ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দলাভ করেন।

ভারতের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ—ভারতস্থিত বৃটিশ কাউন্সিল মহাবালেশ্বরের লাট ভবনে দুই সপ্তাহের জন্য ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে আলোচনা-বৈঠকের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা-সম্পর্কিত অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ পাইবেন। এই আলোচনা-বৈঠকে শিক্ষকগণ জাতীয় ভাষার অভ্যুদয়ের ফলে অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে সে সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবেন।

অধ্যাপক ই ডি গ্যাটেনবি, তুরস্কস্থিত বৃটিশ কাউন্সিলের উপদেষ্টা, আংকোরার টিচার্স, ট্রেনিং ইনষ্টিটুটের ইংরেজী ভাষার বিভাগীয় কর্তা—এই বৈঠকে বক্তৃতা করিবেন। অধ্যাপক গ্যাটেনবি ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি ৩০ বৎসর যাবৎ জাপান তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশে বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা দান সম্পর্কে কাজ করিতেছেন।

পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন পশ্চিম-বঙ্গ, ত্রিপুরারাজ্য ও আসামের বিভিন্ন স্থানে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন। বনগাঁ রেলষ্টেশনের নিকটবর্তী জয়ন্তীপুর (২৪ পরগনা), সিঙ্গাবাদ রেল ষ্টেশন (মালদহ), গীতালদহ রেলষ্টেশন (কুচবিহার), ডাউকি (জৈন্তিয়া পাহাড়), লামডিং রেলষ্টেশন (নওগাঁ), শিলচর ও করিমগঞ্জ (কাছাড়) এবং ত্রিপুরারাজ্যের আগরতলায় মিশনের সেবাকার্য পরিচালিত হইতেছে।

গত ১৬ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত জয়ন্তীপুর কেন্দ্রে ৫৯৪০টি শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তির মধ্যে ১৯৮ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ এবং ২৩,৬৭২ জন ব্যক্তির মধ্যে ৪৯ মণ ১২ সের চিঁড়া ও ১৩ মণ ৩৮ সের গুড় বিতরিত হইয়াছে। রেড ক্রশ সোসাইটির সহযোগিতায় মিশন মালদহ জেলার সিঙ্গাবাদ রেলষ্টেশনে একটি আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালন করিতেছেন। তাহাতে ২০,০০০ শরণার্থীর বাসাহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শরণার্থীদের অধিকাংশই সাঁওতাল ও কৃষক। গীতালদহ রেলষ্টেশনে আমরা দৈনিক ৫০০ শরণার্থীর আহার এবং শিশু ও রোগীদের মধ্যে দুগ্ধ-বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছি। এখানে ৬৬৬০ জন শরণার্থীকে আহার দান করা হইতেছে।

বর্তমানে আমাদের লামডিং-স্থিত আশ্রয়কেন্দ্রে দৈনিক ১৫০০ হইতে ২৫০০ জন শরণার্থীকে আহার প্রদান করা হয়। ১১ই মার্চ হইতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত এই কেন্দ্র ৩০,০০০ শরণার্থীর আহারের ব্যবস্থা করিয়াছে। নবাগত শরণার্থিগণকে টিকাদান, তাঁহাদের নাম রেজিষ্ট্রীকরণ, পাকিস্তান নোটের ভারতীয় নোটে পরিবর্তন-সাধন এবং রুগ্ন শরণার্থীদিগকে হাসপাতালে ভর্তি করা—এই সকল কাজে মিশন সাহায্য

করিতেছেন। শ্রীহট্ট ও শিলং-এর মধ্যবর্তী ডাউকিতে মিশন একটি সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। ইহাতে প্রায় এক হাজার শরণার্থীকে মুড়ি দুধ বার্লি এবং ঔষধ দান করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সর্দি জ্বর এবং কঠিন আমাশয় রোগে ভুগিতেছেন। এই শরণার্থীদের মধ্যে ১৯৬ খানা কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে।

মিশনের শিলচর কেন্দ্রে দৈনিক দুই বার ১০৪৫ জন শরণার্থীকে আহার এবং গড়ে ৪৩টি শিশু এবং ৪০ জন রোগীকে পথ্যদান করা হইতেছে। ১১ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত এই কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত ১৯০০ জন শরণার্থীর মধ্যে ৭৭২ জন বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

করিমগঞ্জ কেন্দ্রের তিনটি আশ্রয়-শিবিরে ৮ই মার্চ হইতে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১১,৭৯৮ জন শরণার্থী সেবাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে দৈনিক দুই বেলা ৩,১২৫ জন শরণার্থীকে আহার দেওয়া হইতেছে, ১৩৯৩ জনকে বসন্তের টিকা এবং ২৯৬৩ জনকে কলেরার ইন্-অকুলেশন দেওয়া হয়। শরণার্থী-দের পুনর্বাসনের জন্য ঐ স্থানে কর্মী প্রেরণ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত সকল কেন্দ্রেই রোগী ও শিশুদিগকে পথ্য ও দুধ দান এবং গর্ভিণী ও রুগ্ন প্রসূতিগণের পরিচর্যা করা হইতেছে।

আগরতলা কেন্দ্রে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত এক সপ্তাহ ১৫৮৭ জন রোগীকে ঔষধদান করা হইয়াছে। এই রোগি-সেবাকেন্দ্র তিনজন সুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মিশন ১০০টি পরিবারের জন্য একটি উপনিবেশও স্থাপন করিতেছেন। ইতোমধ্যেই ইহাদের মধ্যে ৬০টি পরিবারের বসতির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট পরিবারগুলিরও ব্যবস্থা হইতেছে। এই পরিবারগুলিকে যথেষ্ট কৃষির জমি দেওয়া হইয়াছে। আরও ২০০টি পরিবারের পুনর্বাসনের চেষ্টা চলিতেছে।

প্রাদেশিক শান্তি কমি সহযোগিতায় মিশন নারায়ণগঞ্জ ষ্টিমার ঘাটের নিকটে তিনটি শিবিরে ১০,০০০ শরণার্থীকে আশ্রয়দান করিতে-ছেন। এই শরণার্থিগণকে বিনামূল্যে খাদ্যদান এবং তাঁহাদিগের ভারতবর্ষে আসিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৩০০ জন শরণার্থী ছিলেন। বর্তমানে ১৬০ জনকে দৈনিক আহার দেওয়া হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে ৩২৫ খানা নূতন কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে।

এই সেবা ও পুনর্বাসন কার্যে মিশন সরকার এবং অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন।

বর্তমানে শরণার্থীদের সেবার জন্য বস্ত্র, ঔষধ এবং প্রতিষেধক ইন্-অকুলেশনের বিশেষ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য শরণার্থিগণকে রোগ ও মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদের দ্রুত পুনর্বাসনার্থ সক্রিয় প্রচেষ্টা আবশ্যক। দুঃস্থ নরনারীদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। সেবা এবং পুনর্বাসন-কার্যও নিতান্ত সাধারণ ও সহজসাধ্য নহে। এই অসহায় নরনারীর আর্তিমোচনার্থ যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিবার জন্য আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি। এতদুদ্দেশ্যে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় কৃতজ্ঞতা-সহকারে সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে:

(স্বাঃ) স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদক

ইংরেজ রাজত্বের শেষ ভাগে ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলন যতই শক্তিশালী হইতে থাকে, রাজশক্তির সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সমর্থনে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধও ততই প্রবল আকার ধারণ করে। এই বিরোধের চরম পরিণতি-রূপে স্বাধীনতা-অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক নীতিমূলে দ্বিধা—প্রকৃত-পক্ষে ত্রিধা বিভক্ত হয়। ইংরেজরাজের মধ্যস্থতায় অবস্থাধীনে নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইতে চিরতরে মুক্ত রাখিবার উপায়রূপে এই বিভাগ মানিয়া নেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, পাকিস্তানের সীমানা ঘোষিত হওয়া মাত্র পশ্চিম-পাকিস্তান এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বহ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রায় সকল হিন্দু ও শিখ এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের প্রায় সকল মুসলমান নিতান্ত নির্মম ভাবে বিতাড়িত হইয়া সর্বহারা অবস্থায় যথাক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও পশ্চিম-পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই সর্ববিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক বিরোধে উভয় পক্ষের কত লক্ষ নরনারী যে হতাহত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিরূপিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন এই কালে পূর্ব-পাকিস্তান হইতেও প্রায় বিশ লক্ষ আতংকিত হিন্দু নিরাপত্তার আশায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েক মাস হয় পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-বঙ্গের স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের আগুন পুনরায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান হতাহত হইয়াছে এবং পূর্বপাকিস্তান হইতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ হিন্দু-নরনারী সর্বস্বান্ত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং পশ্চিম-বঙ্গ ও আসাম হইতে প্রায় ছয় লক্ষ মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। এই হৃতসর্বস্ব সর্বহারা বাস্তুত্যাগীদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনাতীত; ইহাদের জন্য আবাসগৃহ ও কর্মসংস্থান করা নব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে একটি গুরুতর সমস্যা। এই কল্পনাতীত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দ্বারা সন্তোষ-জনকভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, ভারত-বিভাগের ফলে হিন্দুমুসলমান-সমস্যার তো সমাধান হয়ই নাই, অধিকন্তু বর্তমানে ইহা অত্যন্ত বৈপ্লবিক ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে এবং এজন্য পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের

সংখ্যালঘু সকল হিন্দু-মুসলমানই অপার দুঃখের সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ও ঐহিক বলিয়া ঘোষিত ভারত-রাষ্ট্র এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইসলামিক বলিয়া ঘোষিত পাকিস্তান-রাষ্ট্র কর্তৃক স্ব স্ব সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের সর্ববিধ ন্যায্য অধিকার রক্ষার পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতিদানেও কোন ফল হইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া প্রয়োজনের তাড়নায় সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং তাহাদের নিরাপত্তা-বিধানের জন্য উভয় রাষ্ট্র সম্প্রতি মিলিত হইয়া কতকগুলি সর্তে আবদ্ধ হইয়াছে। এইগুলি প্রতিপালিত এবং ইহার সুফল-স্বরূপে উভয় রাজ্যের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান হ'ক, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভারত ও পাকিস্তানের বর্তমান হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ একেবারেই ধর্মঘটিত নহে, ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই ; ইহা সম্পূর্ণ রাজনীতিক। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রতি যে আপস হইয়াছে, উহার সর্তগুলিই এ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বর্তমান হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ নিছক রাজনীতিক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস যে, দেশী ও বিদেশী শক্তিমান জাতিসমূহ যতদিন এই বিরোধকে সঞ্জীবিত রাখা তাঁহাদের রাজনীতিক স্বার্থসাধনের উপায় বলিয়া মনে করিবেন, ততদিন তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া ইহাতে ইন্ধন দিতে থাকিবেনই এবং এজন্য ইহার অবসানও হইবে না। পক্ষান্তরে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশের মনে সাম্প্রদায়িকতা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, অথবা ধর্মের নামে সৃষ্টি করা সম্ভব বলিয়াই রাজনীতিক ধুরন্ধরগণের পক্ষেও উহার সাহায্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সংঘটন করা সময়ে সময়ে সম্ভব হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় বুঝাইয়া যদি অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া সমন্বয়ভাবাপন্ন অর্থাৎ পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করা যায়, তাহা হইলে এই মহা-অনর্থকর সাম্প্রদায়িক বিরোধের নিশ্চয়ই অবসান হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ দুইটি মহান্ মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ একমাত্র আশা। আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।"

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমতের সমন্বয় বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় এই দুইটি মতের সামঞ্জস্যবিধান বা মিলন-সাধন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের মূর্ত-বিগ্রহ ছিলেন। এই দুইটি ধর্ম আপন আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া তাঁহার সাধন-জীবনে একাধারে সম্মিলিত হইয়াছিল। তাঁহার সমন্বয়সাধন কেবল শাস্ত্র যুক্তি বা বিচারপ্রসূত নয়, পরন্তু উহা প্রত্যক্ষ বস্তুতান্ত্রিক ও বাস্তব। এই মহাপুরুষের আচরিত ও প্রচারিত হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয়—উভয় ধর্মের সারাংশ সংগৃহীত সমীকরণ, বা উভয় ধর্মকে একজাতীয়করণ, অথবা একীকরণ নয় ; ইহা পরধর্ম-নিরপেক্ষতার মনোরম আবরণে আবৃত নিষ্ক্রিয় পরধর্মসহিষ্ণুতা মাত্রও নহে। তাঁহার অনুষ্ঠিত সমন্বয়ের অর্থ—উভয় ধর্মই সত্য এবং একই ভগবান লাভের

দুইটি পৃথক পথমাত্র। পক্ষান্তরে তিনি কেবল হিন্দু-মুসলমান-ধর্মেরই সমন্বয় করেন নাই, অধিকন্তু পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ধর্মেরই সমন্বয়-সাধন ও প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সাধনালোকে সর্বধর্ম-সমন্বয়—'যত মত তত পথের' সত্যতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন শাস্ত্রে এই সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মাহাত্ম্য কীর্তিত থাকিলেও এবং কোন কোন ধর্মাচার্য কর্তৃক ইহা উপদিষ্ট হইলেও পৃথিবীর ধর্মাচার্যগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবই ইহার সত্যতা নিজ জীবনে কার্যতঃ অনুষ্ঠান করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই মহামানবের অনুষ্ঠিত সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের অত্যুদার আদর্শে অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত করাই যে স্থায়ী ভাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ এবং এই মহান্ আদর্শের আশ্রয়-গ্রহণই যে পৃথিবী হইতে সর্ববিধ ধর্মবিরোধ দুর করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বি-গণের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়, ইহা স্বামী বিবেকানন্দ বহু স্থানে বহু ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পূর্বোদ্ধৃত "হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ দুইটি মহান্ মতের সমন্বয়" কথাটির ব্যাখ্যা ঐরূপ সমন্বয় অর্থে সাধারণ ভাবে না করিয়া তিনি উহার মানে করিয়াছেন—"বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ"। ইহা যথার্থই বিশেষ অর্থপূর্ণ।

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ দুর করিয়া উভয় ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অনুষ্ঠিত ও উপদিষ্ট সর্বধর্মসমন্বয়ের মাহাত্ম্য প্রচারই যথেষ্ট নহে, পরন্তু এজন্য হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ"-নীতির অনুবর্তন করা অপরিহার্য। এই নীতি হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায় কার্যতঃ অনুসরণ করে নাই বলিয়াই যে বিবিধ উপায়ে চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ এখনও দুর হয় নাই, ইহা উক্ত নীতির নিম্ন-লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অনেকটা পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করি।

'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক' কথার অর্থ—যাঁহার মস্তিষ্ক বেদান্তের চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রী ও সমত্ব আদর্শে ভরপুর। বেদান্ত বলেন, এক নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ আত্মা সকল মানুষে সমভাবে বিদ্যমান। আত্মার দিক দিয়া মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই; সকলেই একই আত্মার বহুরূপ এবং সকল জ্ঞান শক্তি মহত্ত্ব পবিত্রতা ও পূর্ণত্বের আধার। নরমাত্রই নারায়ণ—জীবমাত্রই শিব। মানুষে মানুষে—জীবে জীবে যে নানা বিষয়ে ভেদ-বৈষম্য দেখা যায়, উহা জীবাত্মার ব্রহ্মশক্তি-বিকাশের তারতম্য-জনিত। যে কোন মানুষ তাহার জ্ঞান ও শক্তির উদ্বোধন করিয়া সকল বিষয়ে জ্ঞানবান ও শক্তিমান হইতে—এমন কি জীবত্ব নাশ করিয়া শিবত্ব লাভও করিতে পারে। যাঁহার মস্তিষ্ক বা হৃদয় এই বেদান্ত-ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহার দৃষ্টিতে এক মানুষ কেবল অপর মানুষের ভাই নয়, পরন্তু সকল মানুষ আত্মার দিক দিয়া এক ও অভেদ। এই ভাবে যিনি ভাবিত, তিনি পৃথিবীর কোন মানুষকে হিংসা বা উপেক্ষা করিতে পারেন না। কারণ, তাহার পক্ষে অপরকে হিংসা বা উপেক্ষা করা, আর আপনি আপনাকে হিংসা বা উপেক্ষা করা একই। বৈদান্তিক বা অদ্বৈতবাদীর পক্ষে এই অভেদ বা সমভাব অবলম্বন অপরিহার্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া-ছেন, "উহাকে আমরা বেদান্তই বলি, আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্মের ও চিন্তার সব শেষের কথা, এবং কেবল এই

অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানব-সাধারণের ধর্ম।" অদ্বৈত-ভূমিতে উপনীত হইয়া অন্তরে বাহিরে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা আত্মদর্শন, অথবা সমদর্শন সকল ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ। বেদান্তে এই আদর্শ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত। ইহাতে যে সাম্য মৈত্রী ও গণতন্ত্র প্রকটিত, উহা অপেক্ষা উন্নততর সাম্য মৈত্রী ও গণতন্ত্র মানবকল্পনা ধারণা করিতে অসমর্থ। এই জন্য কেবল বেদান্তভাবে ভাবিত—অদ্বৈত-ভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিই প্রকৃত সমন্বয়বাদী হইতে পারেন এবং সকল ধর্ম ও সকল নরনারীকে যথার্থ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন। এই সকল কারণে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের নির্দেশে ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি—এমন কি মানুষমাত্রেরই দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন পর্যন্ত পরিচালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ কার্যে পরিণত করা কেবল হিন্দু মুসলমানে নয়, পরন্তু বিশ্ব-মানবের মধ্যে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও শান্তি-প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায়। অবশ্য বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বটে, কিন্তু বেদান্তবেদ্য সমন্বয় সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মনীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া তন্মতে জীবন-পরিচালনের চেষ্টা করা সকল ধর্মাবলম্বিগণের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এইগুলিই সকল ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ নীতি। তবে বেদান্তে এই সকল যেরূপ পরিস্ফুট, অন্য কোন মতে তদ্রূপ নহে। এই জন্য এই নীতি-সমূহকে স্বামীজী বৈদান্তিক নীতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করে। এই জন্য হিন্দুধর্ম বেদান্ত এবং হিন্দু-মাত্রই বৈদান্তিক নামে অভিহিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, হিন্দুগণ উচ্চকণ্ঠে বেদান্তের কল্পনাতীত সাম্য মৈত্রী অদ্বৈত ও অভেদতত্ত্বের গুণগান করিয়াও ব্যক্তিগত ভাবে না হইলেও জাতিগত ভাবে ঐগুলিকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে—বিশেষ করিয়া সমাজ-জীবনে একেবারেই কাজে লাগাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বেদান্ত-সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াও তাহাদের ধর্ম-জীবনে না হইলেও সমাজ-জীবনে তথা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে ইহাকে অতি বিস্ময়কর ভাবে কাজে লাগাইয়াছে। মুসলমান-সমাজের সাম্য মৈত্রী ও সংহতি-শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "যদি কোন যুগে কোন ধর্মাবলম্বি-গণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্য রূপে এই (বৈদান্তিক) সাম্যের সমীপবর্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে, এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইসলাম-পন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না, এইমাত্র প্রভেদ। এই হেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম-পরিণত ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।" বেদান্তের সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনকে কেবল মস্তিষ্ক বা হৃদয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগানেই উহার সার্থকতা নিহিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বৈদান্তিক নামে অভিহিত হইয়াও হিন্দুগণ জাতি হিসাবে বেদান্তকে

কাজে লাগাইতে পারে নাই। এই জন্য তাহাদের ধর্ম ও সমাজ-জীবনে এখনও অসাম্য অনৈক্য ভেদ ও বিরোধ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। ইহাই যে হিন্দুজাতির রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক দুর্গতি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ দুর্দশার মূল কারণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বেদান্তের সাম্য-মৈত্রীর নির্দেশে হিন্দুজাতির ধর্ম ও সমাজজীবন পরিচালন করাই হিন্দুতে হিন্দুতে এবং হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূর করিবার উপায়।

পূর্বোদ্ধৃত "ইসলামীয় দেহ" কথার অর্থ—ইসলামীয় সমাজ-দেহ বা সমাজ-শরীর। স্বামী বিবেকানন্দ মুসলমান সমাজের সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃভাব ও ভোগাধিকার-বৈষম্যহীনতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "মহম্মদ দেখাইয়া গিয়াছেন—মুসলমানদের মধ্যে কোন ভেদ না রাখিয়া ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় সংঘবদ্ধতা। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে ক্রয় করিলেন, কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর যোগ্যতা, গুণ ও সামর্থ্য থাকিলে সে সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে, আর আমরা হিন্দুরা?" হিন্দুরা পৃথিবীর কোন অহিন্দুকে দূরের কথা বহু হিন্দুকেও আপনাদের সমাজে সম্মানিত স্থান দিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে হাজার হাজার মুসলমান কোন স্থানে সমবেত হইলে তাহাদের মধ্যে আহার ও বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধস্থাপনে কোন বাধা নাই। তাহারা সকল জাতির সকল নরনারীকে তাহাদের ধর্মে ও সমাজে সম্মানিত স্থান দিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতে পারে। এই জন্য তাহারা অত্যন্ত সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী এবং তাহাদের সংখ্যা ও প্রভাব দিন দিন বাড়িতেছে। পক্ষান্তরে, ভারতের দশটি প্রদেশ হইতে দশজন হিন্দু কোন স্থানে সমবেত হইলে তাহাদের মধ্যে আহার ও বিবাহাদি কোন প্রকার সামাজিক সম্প্রীতিস্থাপন একেবারেই সম্ভব হয় না। হিন্দু-সমাজে শত ভেদ, সহস্র বৈষম্যের জন্য হিন্দুজাতি অত্যন্ত সংহতিশক্তিহীন ও দুর্বল এবং তাহাদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। হিন্দুকে জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে এবং হিন্দুতে হিন্দুতে ও হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিহার করিয়া সম্প্রীতি স্থাপন করিতে হইলে 'ইসলামীয় দেহ' নীতির অনুবর্তন অর্থাৎ ইসলাম-সমাজের সাম্য-মৈত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ মুসলমানদের সামাজিক সাম্য ও সংহতি-শক্তির যেরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, অধিকাংশ মুসলমানের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার তেমন তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র হইতেছে—ঈশ্বর এক এবং একমাত্র মহম্মদই তাঁহার দূত, এইজন্য বাহিরের যাহা কিছু তাহা যে কেবল মন্দ তাহা নহে, উহাকে ধ্বংস করা চাই-ই তৎক্ষণাৎ। * * অবশ্য ইহা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে সময়ে সময়ে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ।" উল্লেখ বাহুল্য যে, অধিকাংশ মুসলমানের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা কোরান এবং হজরত মহম্মদের উপদেশ-বিরোধী। ইহা ইসলাম-ধর্ম-বিশেষজ্ঞগণ সমস্বরে প্রচারও করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মুসলমানকে কার্যতঃ ইহা মান্য করিতে দেখা যায় না।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, উদারহৃদয় বহু

মুসলমান ব্যক্তিগত ভাবে ও কয়েকটি মুসলমান-সম্প্রদায় সম্প্রদায়গত ভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি অত্যন্ত ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার করিলেও এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতা দেখাইলেও জাতিগত ভাবে মুসলমানগণ অতীতে ঐরূপ করিতে পারে নাই এবং বর্তমানেও পারে না। পক্ষান্তরে ইহাও সমভাবে সত্য যে, উদারহৃদয় বহু হিন্দু ব্যক্তিগত ভাবে ও কয়েকটি হিন্দুসম্প্রদায় সম্প্রদায়গত ভাবে মুসলমান ধর্ম ও সমাজের প্রতি এবং অধিকাংশ হিন্দু মুসলমান-ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখাইলেও তাহারা মুসলমান-সমাজের প্রতি অতীতে একেবারেই সদ্ভাব পোষণ করে নাই এবং বর্তমানেও করে না। মূল কথা—হিন্দুগণ জাতি হিসাবে মুসলমান-ধর্মের প্রতি যথার্থই আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত, কিন্তু মুসলমান-সমাজকে আদৌ ভাল দৃষ্টিতে দেখে না। অপর দিকে মুসলমানগণ জাতি হিসাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজ উভয়ের প্রতিই ভাল ভাব পোষণ করে না। এই অপ্রিয় সত্যই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সমস্যার মূলে বিদ্যমান। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নরনারীর ধর্ম এবং সামাজিক ভাব সাম্য মৈত্রী ও সমন্বয়-মূলক হওয়া আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দের "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ"-নীতির আশ্রয় গ্রহণই ইহা কার্যে পরিণত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই মহাপুরুষ মুসলমানগণকে তাহাদের স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া বৈদান্তিক ধর্ম এবং হিন্দুগণকে তাহাদের সমাজ ত্যাগ করিয়া ইসলামীয় সমাজ অবলম্বন করিতে বলেন নাই। মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মকে বেদান্তের ন্যায় এবং হিন্দুগণ তাহাদের সমাজকে ইসলামের ন্যায় কার্যতঃ যথার্থ সমন্বয় সাম্য ও মৈত্রীমূলক করুক, ইহাই তৎপ্রচারিত "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্লামীয় দেহ"-নীতির প্রকৃত অর্থ এবং এই নীতি অবলম্বনই হিন্দু-মুসলমানে যথার্থ সম্প্রীতি-প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ঐহিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য-স্থাপনের জন্য পরোক্ষভাবে কার্যতঃ এই পথই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র কখনও জনসাধারণের মনের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না; হিন্দু মুসলমানের মনের পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে তাহাদের পক্ষে স্ব স্ব ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ এবং ধর্মকে কর্ম-জীবনে পরিণত করিবার উপায়রূপে 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্লামীয় দেহ'-নীতি অবলম্বন অপরিহার্য।

"একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে একথাও (ঠাকুরের জীবন দেখিলে) হৃদয়ঙ্গম হয়। * * হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত ব্যবধান রহিয়াছে। ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্ম-সাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ

শাস্ত্রবিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়, ন্যায়তর্কতীর্থ

অনাদিকাল হইতে ভারতের আর্যশাস্ত্রসমূহ জগতের কল্যাণসাধনপূর্বক শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার করিয়া আসিতেছে। আমাদের সুখ দুঃখ স্বাস্থ্য সম্পদ—সবই নির্ভর করে এই শাস্ত্রের উপর এবং শাস্ত্রার্থে ঐকান্তিক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার উপর। ভারতের এই অবিনশ্বর সম্পদই ভারতের বৈশিষ্ট্য। প্রবাদ আছে "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে"। কিন্তু কালপ্রভাবে এবং প্রতীচ্য-ভাবধারার আপাতরম্য আলোক-সম্পাতে বিমুগ্ধ হইয়া প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের প্রকৃত পরিচয় না জানিয়া আর্যশাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয়গণ। এই শ্রদ্ধাহীনতাই হইল আমাদের অবনতির কারণ। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥"

(১৬।২৩-২৪)

মনুষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য-নিরূপণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রীয় বিধান সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া কার্য করা উচিত। অতএব সম্প্রতি সেই শাস্ত্রগুলির স্থূল পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করা যাক—

"প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে॥"

(শ্লোকবার্তিক)

আচার্য শঙ্করের মতে "শাস্ত্রং শব্দবিজ্ঞানাদ-সন্নিকৃষ্টেঽর্থে বিজ্ঞানম্" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য)। ভামতী বলিয়াছেন—"শিষ্যাণাং শাসনাৎ শাস্ত্রম্"; যথা ঋগ্বেদাদি। দেখা যাইতেছে যাহা মনুষ্যসমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে রক্ষা করে, নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেয় তাহাই শাস্ত্র।

আর্যদের শাসনকালে ধর্মশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দায়ভাগ মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হওয়ায় তাহাও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিতে হইবে। বর্তমানে রাজশক্তি-প্রবর্তিত শাসনগ্রন্থগুলি ধর্মশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রচিত নয় বলিয়া তাদৃশ ফলপ্রসূ হইতেছে না এবং তাহাদের দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজনও অপরিহার্য; তজ্জন্য এগুলিকে আর্যদের দৃষ্টিতে ধর্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাকালে রাজ্যশাসনের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ ঋষিগণ-কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল তাহা শাসনপদ্ধতি-সম্বলিত পুস্তক হইলেও আর্যগণ সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। যাহাই হউক, যে শাস্ত্রের সহিত পরিচিত না হইয়া আমরা শাশ্বত সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি, প্রতি মুহূর্তেই আমাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিতেছি এবং যথার্থতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি—সেই শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, শাস্ত্র সাক্ষাৎভাবেই হ'ক বা পরোক্ষভাবেই হ'ক আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়প্রতি-পাদনে প্রবৃত্ত।

ঋষিগণ আর্যশাস্ত্রকে অষ্টাদশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ॥
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এই চারিখানি বেদ। শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ এই ছয়খানি বেদাঙ্গ। পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্মশাস্ত্র, এই চারিখানি উপাঙ্গ। এই চতুর্দশ বিদ্যা অলৌকিক ধর্মের প্রতিপাদক। উপপুরাণগুলি পুরাণের, বৈশেষিক ন্যায়তন্ত্রের, বেদান্ত মীমাংসাতন্ত্রের এবং রামায়ণ মহাভারত সাংখ্য পাতঞ্জল ও বৈষ্ণব-তন্ত্রগুলি ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। যাজ্ঞবল্ক্যও এই চতুর্দশ বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন—

"পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ॥"

(মধুসূদন সরস্বতীকৃত প্রস্থানভেদধৃত)

আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারিখানি উপবেদ। ইহারা দৃষ্টার্থের প্রতিপাদক, স্থলবিশেষে আবার এই চতুর্বিধ শাস্ত্র ধর্মবিষয়েও প্রমাণরূপে গৃহীত হওয়ায় অদৃষ্টার্থেরও প্রতিপাদক হইয়া থাকে। "চতুর্দশবিদ্যা ধর্মপ্রমিতিপ্রধানানি, চতস্রঃ পুনর্দৃষ্টপ্রধানাঃ। ক্বচিদ্ অলৌকিকমর্থং প্রমাণয়ন্ত্যো ধর্মেঽপি প্রমাণম্।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে রঘুনন্দন)

আস্তিক-সম্প্রদায় এই অষ্টাদশ শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং মাধ্যমিক যোগাচার সৌত্রান্তিক বৈভাষিক চার্বাক ও দিগম্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রন্থের বেদার্থপ্রতিপাদকতা না থাকায় এই গ্রন্থগুলিকে ঋষিগণ অষ্টাদশবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এবং এইগুলি নাস্তিক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত হয়। উপরি-কথিত অষ্টাদশ শাস্ত্রকে বিদ্যা বলে।

আমাদের অনেকের ধারণা আছে যিনি মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনিই আস্তিক এবং যিনি তাহা স্বীকার করেন না, তিনি নাস্তিক। প্রত্যুত তাহা নহে। "অস্তি বেদে মতির্যস্য স আস্তিক উদাহৃতঃ।" "নাস্তি যজ্ঞফলং নাস্তি পরলোক ইত্যাদিকং কায়তি ইতি নাস্তিকঃ, নাস্তি সুকৃতং নাস্তি পরলোক ইতি বুদ্ধির্নাস্তিকতা ইতি ভরতঃ।" অতএব দেখা যাইতেছে মীমাংসা ও সাংখ্যশাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে নীরব থাকিলেও বেদের প্রামাণ্য-স্বীকার করায় আস্তিক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং বেদবিরোধী দিগম্বর প্রভৃতি সম্প্রদায় তথাকথিত ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও নাস্তিক-পর্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। এই যে সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্যপ্রতিপাদকগ্রন্থ বেদ, তাহা কি? মীমাংসক বলেন, "ধর্মব্রহ্ম-প্রতিপাদকোঽপৌরুষেয়ো বেদঃ।" তাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষবিশেষ কর্তৃকও রচিত নহে এইরূপ বলিয়া থাকেন। "ন কশ্চিৎ বেদকর্তাস্তি বেদস্মর্তা পিতামহঃ।" যদি বেদ কোন পুরুষবিশেষ-কর্তৃক রচিত হইত, তাহা হইলে বেদব্যাসাদি-প্রণীত মহাভারতাদি গ্রন্থের অবসানে যেরূপ কর্তার নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বেদেও তাহা পরিদৃষ্ট হইত। মাধবাচার্যও বলিয়াছেন—"কালিদাসাদি-গ্রন্থেষু তত্তৎসর্গাবসানে কর্তার উপলভ্যন্তে, তথা বেদস্য পৌরুষেয়ত্বে তত্তৎকর্তোপলভ্যেত। ন চোপলভ্যতে। ....তস্মাদপৌরুষেয়ো বেদঃ, তথা সতি পুরুষবুদ্ধিদোষকৃতস্যাপ্রামাণ্যস্যা-নাশঙ্কনীয়ত্বাদ্বিধিবাক্যস্য ধর্মে প্রামাণ্যং সুস্থিতম্।" (জৈমিনীয় ন্যায়মালা ১-১)

সুতরাং তিনি স্বয়ম্ভূ ও স্বতঃপ্রমাণ—

"স্বয়ম্ভূরেষ ভগবান্ বেদো গীতস্ত্বয়া পুরা।
শিবাদ্যা ঋষিপর্যন্তাঃ স্মর্তারোঽস্য ন কারকাঃ।"

(তত্ত্বচিন্তামণি, তাৎপর্যগ্রন্থধৃত মহাভাগবতপুরাণ)

নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় বলেন, ক্ষণস্থায়ী বর্ণ কখনও নিত্য হইতে পারে না। বর্ণের নিত্যতা স্বীকার করিলেও অক্ষরগুলির বিশেষ সন্নিবেশরূপ আনুপূর্বিকতা-যুক্ত বেদ নিত্য হইতেই পারে না। তাহা ভ্রমপ্রমাদশূন্য পরমেশ্বর-কর্তৃক প্রণীত। "তস্মাৎ তপস্তপনাৎ চত্বারো বেদা অজায়ন্ত।" "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।"

(শুক্লযজুর্বেদ)

এতদ্ব্যতীত স্মার্তপ্রমাণও দেখা যায়—

"অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।
প্রতি মন্বন্তরঞ্চৈষা শ্রুতিরন্যা বিধীয়তে॥"

(উদয়নকৃত-কুসুমাঞ্জলি)

সুতরাং তত্ত্বচিন্তামণিধৃত মহাভাগবতপুরাণের "স্বয়ম্ভূরেষ" ইত্যাদি প্রমাণ অর্থবাদমূলক। "ইতি বেদস্য স্তুতিমাত্রম্।" (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী) শ্রুতি আবার এই বেদকে পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ" ইতি।

(গীতাব্যাখ্যা, শ্রীধরস্বামি-ধৃত)

অতএব দেখা যাইতেছে সর্বজ্ঞাননিদান পরমার্থ সত্য পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিতরূপ এই বেদরাশি তাঁহারই প্রজ্ঞাস্বরূপ। পরমেশ্বর বেদ অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন; কারণ, যিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহার প্রজ্ঞা তদপেক্ষা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। যাহাই হউক, নাস্তিকশিরোমণি চার্বাক "ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ" ইত্যাদি বলিলেও বেদের প্রামাণ্যবিষয়ে আস্তিক-সম্প্রদায়ের কোন সন্দেহ বা মতভেদ নাই। বেদ আবার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভেদে দ্বিবিধ। কর্মের অনুষ্ঠানকালে যাহা দেবতা প্রভৃতির স্মৃতি জন্মাইয়া দেয় তাহাকে মন্ত্র বলে। মন্ত্র ঋক্ সাম ও যজুঃ ভেদে তিন প্রকার। ছন্দোবদ্ধ পাদবিশিষ্ট যে মন্ত্র তাহাকে ঋক্‌মন্ত্র বলে। সেই ঋক্ যখন স্বরসংযোগে গীত হয় তখন তাহার নাম সাম। আবার যখন এই উভয় হইতে ভিন্ন অবস্থায় গদ্যের আকারে থাকে তখন তাহাকে যজুঃ বলে। সম্বোধনমন্ত্র প্রভৃতি যজুর অন্তর্গত। ব্রাহ্মণও বিধি, অর্থবাদ ও বেদান্ত-ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। কর্তব্যবুদ্ধিতে যাহা মানুষকে কর্মে প্রবর্তিত করে ও অকর্তব্য বিষয় হইতে যাহা নিবর্তিত করে তাহাকে সাধারণতঃ বিধি বলে। সংক্ষেপে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। অর্থবাদ বিধেয় কর্মের প্রশস্তি ও নিন্দা দ্বারা মানুষের প্রশস্ত কর্মে প্রবৃত্তি ও নিন্দিত কর্ম হইতে নিবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ দ্বিজাতিগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি অবশ্যকর্তব্য-কর্মের প্রশস্তির উপন্যাস করা যাইতে পারে। নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানে কোন ফল নাই, পক্ষান্তরে তাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। অথবা 'ন কুর্যাদ্ নিষ্ফলং কর্ম' এই নিষেধ-বাক্য থাকায় ফলবিহীন নিত্যকর্মে প্রথম অধিকারীর প্রবৃত্তি উৎপাদন অসম্ভব। তাই শাস্ত্রকার বলেন—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে গোস্বামিকৃত টীকাধৃত)

মা যেমন ছেলেকে বলেন 'এই তিক্ত ঔষধ সেবন কর, তোমাকে মিষ্টি খাইতে দিব'—সেই প্রকার প্ররোচনা বাক্যদ্বারা প্রথমে কষ্টসাধ্য অথচ পরিণামে হিতকর কার্যে মানুষের প্রবৃত্তি জন্মাইতে হয়। ইহাই অর্থবাদ। বেদান্তবাক্য বিধিও নহে, অর্থবাদও নহে, ইহা তৃতীয় ব্রাহ্মণ। ইহাতেই জগতের সার ও সত্য ব্রহ্মতত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে। বিধি ও অর্থবাদ—

কর্মকাণ্ডের ও বেদান্তবাক্য জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এই ভাবে বেদকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

এখন দেখা যাইতেছে এই কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড-বিশিষ্ট বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রনিচয় বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল প্রদানে সমর্থ।

প্রয়োজন-ভেদে বেদ ত্রিধাবিভক্ত হইলেও অধ্যেতৃভেদে তাহা অনন্ত-শাখায় বিভক্ত। সম্প্রতি মানুষের আয়ুহ্রাস ও বুদ্ধিমান্দ্যের জন্য সমগ্র বেদ কাহারও পক্ষে অধ্যয়ন করা সম্ভব হইতেছে না। কেহ কেহ হয়ত শাখাবিশেষ অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন। তাই আচার্য উদয়ন আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন—

"জন্মসংস্কারবিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায়কর্মণোঃ।
হ্রাসদর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাম্॥
পূর্বং সহস্রশাখো বেদোঽধ্যগায়ি, ততো ব্যস্তঃ, ততঃ ষড়ঙ্গ একঃ, ইদানীন্তু ক্বচিদেকা শাখেতি।" (কুসুমাঞ্জলি)।

বর্ধমানোপাধ্যায়-প্রমুখ পরবর্তী ব্যাখ্যাতৃগণ বৈদিক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত উচ্ছেদেরও অনুমান করিয়াছেন—এক্ষণে সেই কাল উপস্থিত। মন্ত্রার্থজ্ঞানের সহিত বৈদিক যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে, অথচ বেদের সমালোচনায় আমরা পঞ্চমুখ। যে বেদ যথারীতি গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া শ্রুতি নামে অভিহিত, যাহা জগতের অনন্তকল্যাণ-সাধনপূর্বক শাশ্বত শান্তির পথে মানবসমাজকে পরিচালিত করে, কালপ্রভাবে আজ সেই বেদ মহাজনপ্রদর্শিতপথ-ভ্রষ্ট ও দুর্ব্যাখ্যাবিষ-মূর্চ্ছিত হইয়া কার্যকরী শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই চূড়ান্ত দুর্দিনে উপনিষদের ভাষায় ভারতীয় সমাজকে বলি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

পরম নির্ভর

শ্রীতারাকুমার ঘোষ, এম্‌-এ

কিশলয়ে প্রভাতের আলোক-কম্পন,
আনে প্রাণে আনন্দের মধুর স্পন্দন,
অনন্ত পরশ—মিশি অসীমের সাথে
প্রস্ফুট কমল যথা সৌরভেতে মাতে
সমগ্র বিশ্বের মাঝে—দেখি বাণী লিখা
'ওঠ' 'জাগো'—জলে প্রাণে এক বহ্নিশিখা—
তুমি নিত্য, তুমি সত্য, তুমিই আপন
তোমার স্বরূপে নিত্য দিবস-যাপন।

তুমি স্থির, তুমি গতি, তুমিই অবধি,
তুমি কেন্দ্র, তুমি ব্যাস, তুমিই পরিধি।
জেগে উঠি সেই সত্যে—এ মহা জীবন
এরই তরে মহাবাণী করেছো রচন—
'উত্তিষ্ঠত' 'জাগ্রত' লভিতে সে 'বর'
বুঝিয়াছি তুমিই মোর পরম নির্ভর।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদপ্রসঙ্গ

সংগ্রাহক—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ বার্ধক্যেও শিবরাত্রির উপবাস করিতেন। তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি বৃদ্ধ বয়সেও উপবাস করেন কেন? উত্তর—কিছু পাই। প্রশ্ন—কি পান? উত্তর—দর্শনাদি। প্রশ্ন—কার, শিবের না ঠাকুরের? উত্তর—ঠাকুরের দর্শন পাই। প্রশ্ন—শুধু দর্শন, না কথাবার্তাও হয়? উত্তর—সেইটিই জীবনের শেষ আশা। এই সকল কথা বলিবার সময় গিরিশ বাবুর চোখ মুখ ভাবাতিশয্যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল।[১]

* * *

১৯১৯ খ্রীঃ বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন নিশীথে উঠিয়া সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কটা বেজেছে? সেবক—একটা কুড়ি মিনিট। তখন মহারাজ বলিলেন, অনেক দিন মায়ের খবর পাই নি। একটা দুঃস্বপ্ন দেখলুম। মনটা খুব খারাপ হয়েছে। এক ছিলিম তামাক সাজ। তিনি দুঃস্বপ্নের কথা আর কিছু বলিলেন না। পরদিন প্রাতে বেলুড় মঠ হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল, শ্রীশ্রীমা পূর্বরাত্রে সেই সময়েই মহাসমাধিস্থা হইয়াছেন। তাই মহারাজ উক্ত সময়েই মার মহাসমাধির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের পর তাঁহার শরীর বেলুড় মঠে ভস্মীভূত করা হয়। ভক্ত পঞ্চানন বাবু তখন মায়ের একটু অস্থি লইয়া স্বগৃহে রাখেন এবং কিরূপে উহার পূজাদি করিবেন সেই সম্বন্ধে রাজা মহারাজকে পত্র দেন। মহারাজ তখন বাঙ্গালোরেই ছিলেন। তিনি পঞ্চানন বাবুর পত্র পাঠান্তে উত্তর দিলেন, আপনি অবিলম্বে মায়ের অস্থি বেলুড় মঠে ফেরৎ দিয়ে আসুন। সাধুব্রহ্মচারী দ্বারা উহার পূজা করাইতে না পারিলে অকল্যাণ হইবে। অন্য কেহ পূজা করিলে সর্বনাশ হইতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যগণ শ্রীশ্রীমাকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা এই ঘটনা হইতে সহজেই অনুমেয়।

* * *

স্বামীজীর জীবৎকালে বাবুরাম মহারাজ মঠে ঠাকুরপূজা করিতেন। তখন পুরাতন ঠাকুরঘরেই পূজা হইত। বাবুরাম মহারাজ পুষ্পপাত্র ও কোশাকুশি প্রভৃতি সাজাইয়া ঠাকুরঘরে পূজার আসনে বসিয়াছেন। তখন বেলা আন্দাজ নয়টা হইবে। স্বামীজী ঠাকুরঘরে ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসিয়া বাবুরাম মহারাজকে পূজার আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, বাবুরাম দা, যাও ত পাড়ার গরীবদুঃখীদের সেবা কর। ফুল-চন্দন দিয়ে ত এতদিন পূজো করলে; এখন সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণের সেবা কর। এই বলিয়া স্বশিষ্য ব্রহ্মচারী নন্দলালকে ঠাকুরপূজা করিবার আদেশ দিলেন। বাবুরাম মহারাজ দল-পতির নির্দেশ অমান্য করিতে না পারিয়া বেলুড় গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া গরীবদুঃখীদের সন্ধান করিলেন। কোন পর্ণকুটিরে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা বিধবাকে দেখিয়া তাঁহার সুখদুঃখের কথা শুনিলেন

১ স্বামী শঙ্করানন্দজী-কথিত।

এবং তাঁহাকে অসুখ হইলে মঠের চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ লইতে বলিলেন। বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, গতর থাকতে তোমাদের খয়রাত কেন নেবো গো? বাবুরাম মহারাজ অন্য পাড়ায় যাইয়া কয়েকটি গরীব ছেলেমেয়ে ধরিয়া মঠে আনিলেন এবং তাহাদের মলিন দেহ সাবান দ্বারা ধোয়াইয়া, তেল মাখাইয়া স্নানান্তে নূতন কাপড় পরাইয়া তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইলেন। স্বামীজী দ্বিতল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুরাম দা, কেমন লাগছে? বাবুরাম মহারাজ প্রসন্ন বদনে বলিলেন, যখন এদের সেবা কচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ ঠাকুরের, জীবন্ত নারায়ণের সেবা কচ্ছি।[২]

বাগবাজার বসুপাড়া গলিতে স্বামী সদানন্দ যখন অন্তিম শয়নে শায়িত, তখন মা তাঁহাকে একবার দেখিতে আসেন। মা গুপ্ত মহারাজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। তখন গুপ্ত মহারাজ করজোড়ে কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, মা, বাইশ বৎসর পূর্বে যখন জয়রামবাটীতে গিয়েছিলাম তখন আপনি আমার মাথায় পা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাতেই বাইশ বছর গুজরান হল। আর একটি বার আমার মাথায় পা দিয়ে আশীর্বাদ করুন, মা, যাতে হাসতে হাসতে ভবসাগর-পারে চলে যেতে পারি। মুমূর্ষু সন্তানের করুণ প্রার্থনায় মাতৃহৃদয় দ্রবীভূত হইল। বহুমূত্র রোগে দীর্ঘকাল আক্রান্ত হওয়ায় গুপ্ত মহারাজের ঘাড় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি ঘাড় নোয়াইয়া মাতৃচরণে প্রণত হইতে পারিলেন না। তখন মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সন্তানের মস্তকে স্বীয় পদ-স্থাপন করিয়া ভাবস্থ হইলেন। এই ঘটনার দুই এক মাস পরেই গুপ্ত মহারাজ দেহরক্ষা করেন।

আমেরিকার ভক্তগণ বলিয়াছিলেন, Swamiji was like the dazzling sun, but Sarat Maharaj was like the soothing moon. (স্বামীজী ছিলেন অত্যুজ্জ্বল সূর্য, যার আলোকে চোখ ঝলসে যায়; আর শরৎ মহারাজ ছিলেন স্নিগ্ধ কিরণশালী চন্দ্র)।[৩]

বিজ্ঞান মহারাজ যখন কলেজে পড়িতেন তখন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে একবার গিয়েছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাদুর পাতিয়া মেজেতে বসিতে বলিলেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে? তখন গুরুকৃপায় শিষ্য দেখিলেন, তাঁহার হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ময় রামকৃষ্ণ মূর্তি। পরে ঠাকুর বলিলেন, তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও। তখন বিজ্ঞান মহারাজ দেখিলেন, সম্মুখে ঠাকুর নাই, কেবল মাত্র ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়ের জ্যোতির্ময় আকার। আর অন্তরে দর্শন করিলেন অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্র, কোন রূপ নাই। বিজ্ঞান মহারাজ বলিতেন, ঠাকুরের বাক্য দ্বারাই অনেকের অনুভূতি লাভ হইত।

ভুবনেশ্বর মঠে রাজা মহারাজ একদিন সুরেন বাবুকে (নির্বেদ মহারাজকে) বলিয়াছিলেন, এইখানে একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) করুন না। মহারাজ অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক যে স্থলে বিশ্ববিদ্যালয় করিবার জন্য সুরেন বাবুকে বলিয়াছিলেন সে স্থলেই উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় হইবার কথা হইতেছে। সিদ্ধ মহাপুরুষের মনে ভবিষ্যতের চিত্র ভাসিয়া উঠে।

১৯১১ খ্রীঃ শ্রীশ্রীমা কাশীধামে কিরণচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ স্থানীয় অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন।

২ স্বামী হরিহরানন্দজী-কথিত।

৩ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী-কথিত।

তাঁহারা একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আহার করিতে যান। নীচের হলঘরে তাঁহারা খাইতে বসিয়াছেন। মধ্যস্থলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং তাঁহার বাম ও ডান পার্শ্বে যথাক্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ উপবিষ্ট। বাঁকুড়ার কোন ভক্ত তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীর সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভক্তপত্নী প্রণাম করিতে আসিলে ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ভক্তপত্নী লজ্জাবশতঃ উত্তর দিতে দ্বিধা করিতেছেন দেখিয়া রাজা মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, লজ্জা কি মা? আমি তোমার পিতা। পিতার কাছে কথা বলতে লজ্জা কি? আমি তোমার বাপ, ইনি (শিবানন্দজী) তোমার জ্যাঠা, আর ইনি (তুরীয়ানন্দজী) তোমার কাকা। হরি মহারাজ ও মহাপুরুষের দিকে পর পর মুখ ফিরাইয়া তিনি ভক্তপত্নীকে আবার বলিলেন, দেখছ না ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসে আছেন। তখন ভক্তপত্নী নিজের নামটি বলিতে সাহস পাইলেন।

* * *

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে এক বৎসর বিজয়া দশমীর দিন মঠের দুর্গাপ্রতিমা-পূজার তন্ত্রধারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, মায়ের বিসর্জন কোথায় হবে? তন্ত্রধারক—কেন? গঙ্গায়, যেমন বৎসর বৎসর হয়। বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন—না না, হৃদয়ে মাকে বিসর্জন দিতে হয়। হৃদয়ে মায়ের নিত্যাধিষ্ঠান। হৃদয়-দেবতাকে প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত করে পূজা হয়েছিল। পূজান্তে তাঁকে হৃদয়ে রাখতে হবে।

* * *

১৯১৭ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন পুরীধামে ছিলেন তখন রাজা মহারাজও তথায় ছিলেন। একদিন রাজা মহারাজ আহারান্তে তাড়াতাড়ি উঠিয়া খালি পায়ে মুখ ধুইতে গেলেন নব-রোপিত একটি চারা গাছের গোড়ায়। তখন খুব রৌদ্র ছিল। খালি পায়ে চলিলে বা রৌদ্র লাগিলে তাঁহার কষ্ট হইবে ভাবিয়া হরি মহারাজ তৎক্ষণাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া গুরু-ভ্রাতার জুতা ও ছাতা হাতে লইয়া যাইয়া রাজা মহারাজের মাথায় ছাতা ধরিয়া জুতা জোড়াটি পায়ে দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা মহারাজ বলিলেন, হরি ভাই, করেন কি? হরি মহারাজ তখন শ্রদ্ধাপ্রীতি-পূর্ণ বাক্যে জানাইলেন, খালি পায়ে ও খালি মাথায় আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে যে! এমনি গভীর ছিল ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের গুরুভ্রাতৃ-ভক্তি!

সুরেন বাবু (স্বামী নির্বেদানন্দজী) বেলুড় মঠে যোগদানের সংকল্প করেন। কিন্তু অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহার যে ঋণ হইয়াছিল তাহা শোধ করিবার জন্য তাঁহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। এদিকে মহাপুরুষজী নির্বেদ মহারাজকে বৈদিক ঋষি-কুলের আদর্শে ছাত্রাবাস স্থাপনের আদেশ দিয়া বলেন, স্বামীজীর এই কাজটি তুমি আরম্ভ কর। নির্বেদ মহারাজ অনতিবিলম্বে মহাপুরুষজীর আদেশ পালন করেন। বাবুরাম মহারাজ পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণান্তে ফিরিয়া স্বামী নির্বেদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, ঋণশোধ হয়েছে? কবে মঠে যোগ দেবে? নির্বেদ মহারাজ বলিলেন, হাঁ মহারাজ, ঋণশোধ হয়েছে। মহা-পুরুষজীর আদেশে কলকাতায় ছাত্রাবাস স্থাপন করেছি। ইহা শুনিয়া প্রেমানন্দজী সানন্দে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, তা বেশ, মহাপুরুষজীর কথা দৈববাণী জানবে।*

* * *

* স্বামী নির্বেদানন্দজী-কথিত।

বাবুরাম মহারাজ একদিন কোন এক গরীব লোককে মঠের বাগানে উৎপন্ন কিছু শাকসব্জি ও একটি লাউ দান করেন। রাজা মহারাজ তাহা দেখিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন, মঠের জিনিষ ঠাকুরের ভোগে লাগবে, ওকে দিলে কেন? ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রেমানন্দজী মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বুজান পুকুরের ধার দিয়া পুরাণ ফটক পর্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া তাঁহার গলায় গামছা দিয়া বলিলেন, যাবে কোথায় যাচ্ছ? বাবুরাম মহারাজ আর যাইতে পারিলেন না। তিনি মঠে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মানন্দজীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ এইরূপে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন পাইতেন।

* * *

১৯২৭ খ্রীঃ স্বামী শিবানন্দ শেষবার কাশীতে ছিলেন। তিনি প্রথমে সেবাশ্রমে উঠেন, কিন্তু পরে অদ্বৈতাশ্রমে আসেন। তাঁহার শুভ জন্মদিনে অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্রবাবা তাঁহাকে রেশমী কাপড় ও চাদর উপহার দেন এবং ভাল গড়ে মালা আনান তাঁহাকে পরাইবার জন্য। অদ্বৈতাশ্রমে দোতলার বারাণ্ডায় ঐ কাপড় পরিয়া আসিয়া মহাপুরুষজী দাঁড়াইলেন এবং নিম্নে দুর্গামণ্ডপে অবস্থিত চন্দ্রবাবাকে দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, জয় চন্দ্রবাবার জয়! জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়! এমন সময় বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদী গড়ে মালা আনিয়া তাঁহাকে পরান হইল। তিনি ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। কাশীতে পৌষের শীতেও তাঁহার দেহ ভাবাবেগে ঘর্মাক্ত হইল। ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি পার্শ্বস্থ সন্ন্যাসী সেবকগণকে বার-বার বলিতে লাগিলেন, তোরা মুক্ত হয়ে যা। তোরা মুক্ত হয়ে যা। সেইবার কাশীতে অবস্থান-কালে চন্দ্রগ্রহণের পরদিন প্রাতে সেবাশ্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গা-স্নানান্তে প্রত্যাগত সাধুগণকে দেখিয়া মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন, গঙ্গাস্নানে তোদের সব পাপ ধুয়ে গেল, তোরা পাপমুক্ত হয়ে গেলি। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের একমাত্র কর্ম থাকে অন্যের কল্যাণ-কামনা। গীতার মতে তাঁরা সর্বভূতহিতে রত থাকেন।*

* * *

১৯০৮ খ্রীঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাঙ্গালোরে যান শশী মহারাজের সহিত। তাঁহার সেবক স্বামী উমানন্দ তথায় দৈবাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল চিকিৎসার্থ। শশী মহারাজ রোজ হাসপাতালে যাইয়া রোগীকে দেখিয়া আসিতেন। উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা-সত্ত্বেও রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তারেরা আরোগ্যের আশা ছাড়িয়া দিলেন। রোগীও তাহা বুঝিতে পারিয়া একদিন শশী মহারাজকে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, আমি ত আর বাঁচবো না। একটি বার মহারাজকে শেষ দেখা দেখতে চাই। তাঁকে হাসপাতালে আসতে দেব না। তিনি রাস্তার গাড়ীতে বসে থাকবেন। আমি জানালার মধ্য দিয়ে তাঁকে দর্শন করে প্রাণ জুড়াব। শশী মহারাজ মুমূর্ষু রোগীর কাতর প্রার্থনা ব্রহ্মানন্দজীকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দজী বলিলেন, আমার শরীর ভাল নয়। আমি রোগীকে দেখতে গিয়া সংক্রামক রোগে পড়ব নাকি? তিনি রোগীকে দেখিতে গেলেন না। শশী মহারাজ রোগীকে সান্ত্বনা দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইল। ইহাতে শশী মহারাজ মর্মাহত হইলেন।

* স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দজী-কথিত।

তিনি গম্ভীর বদনে আসিয়া ব্রহ্মানন্দজীকে উমানন্দের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দুই একদিন পরে তিনি মর্মবেদনা চাপিতে না পারিয়া ব্রহ্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সেবকের প্রতি এত নিষ্ঠুর হলেন কেন মহারাজ? তখন ব্রহ্মানন্দজী বলিলেন, শশী, তুমি কি মনে কর চোখের দেখাই একমাত্র দেখা? তার জন্য আমার প্রাণ কেমন করেছিল তা কি তুমি জান? আর সে যে আমার দেখা পায় নি তাও বা তুমি কি করে জানলে? শশী মহারাজ বুঝিলেন, ঈশ্বরকোটি গুরু শিষ্যকে শেষ সময়ে সূক্ষ্ম দেহে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।*

*　　*　　*

স্বামীজী যখন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত তখন গুপ্ত মহারাজ কিছুদিন তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। গুরুসেবার জন্য শিষ্য সেবককে সারারাত্রি জাগিতে হইত। একদিন রাত্রে স্বামীজী ঘুমের ঘোরে প্রস্রাবের বেগ-বশতঃ হু হু হু শব্দ করিতে-ছিলেন। সেবক তৎক্ষণাৎ মূত্রপাত্র লইয়া গুরুকে দিলেন। গুরু এইরূপে রাত্রিতে বহুবার মূত্রত্যাগ করিতেন। শিষ্যের প্রতি গুরুরও ছিল অসীম স্নেহ। গুরুসেবার জন্য রাত্রিজাগরণ হেতু শিষ্য পরদিন প্রাতে বারাণ্ডায় ঘুমাইয়া পড়েন। ইতোমধ্যে রৌদ্র আসিয়া শিষ্যের মাথায় পড়িল। গুরু তাহা দেখিয়া নিজের ছাতাটি খুলিয়া শিষ্যের মাথায় ধরিলেন, পাছে শিষ্যের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

গুপ্ত মহারাজের সেবাপরায়ণতা ছিল অসাধারণ। কলিকাতায় যে বৎসর প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়, সেই বৎসর স্বামীজীর নির্দেশে তাঁহার শিষ্যগণ সেবাকার্যে ব্রতী হন। যে পল্লীতে গুপ্ত মহারাজ সেবা করিতেন, তথায় একটি প্লেগ রোগী জ্বরের অত্যধিক উত্তাপে ছটফট করিতেছিল। রোগীটিকে বুকে করিয়া সন্ন্যাসী সেবক রাত্রি কাটাইলেন। রোগীর মুখের লালা সেবকের বুকে গড়াইয়া পড়িল, কিন্তু রোগ সংক্রমিত হইল না। ইহা শুনিয়া গিরিশ বাবু গুপ্ত মহারাজকে বলিয়াছিলেন, তোর দেহ ঠাকুরের।

*　　*　　*

হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর গ্রামে ঠাকুরের পরম ভক্ত নবগোপাল ঘোষ বাস করিতেন। স্বামীজী তাঁহাদের পূজাঘরে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই শুভমুহূর্তে তৎকর্তৃক রামকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্র রচিত হয়। নবগোপাল বাবুর সহধর্মিণী পরম ভক্তিমতী ও গুণশালিনী ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি পরিণীতা হন। পরিণয়ের অল্পকাল পরে তিনি তাঁহার পতির সহিত দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। একবার তিনি ঠাকুরের কাছে যান; তখন ঠাকুরের খাটের নীচে একটি বিড়াল কয়েকটি সদ্যপ্রসূত ছানা লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, ওরা এলে এখুনি বেড়ালের বাচ্চাগুলোকে মেরে তাড়াবে। কিন্তু আশ্রিতকে কি করে রক্ষা করা যায়? তখন স্ত্রীভক্তটি বলিলেন, আমি এগুলি নিয়ে যেতে পারি। উক্ত প্রস্তাবে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, তুমি আমাকে একটি দায়িত্ব থেকে বাঁচালে। মায়ের কৃপায় তোমার মঙ্গল হোক, ইষ্টদর্শন হোক। ঠাকুর বলিতেন, এই স্ত্রীভক্ত উচ্চাধিকারিণী। ওর ছিন্নমস্তার অংশে জন্ম। ছিন্নমস্তা-দর্শনের পর তিনি প্রায় ছয় মাস উক্ত ভাবে অভিভূতা ছিলেন। সেই সময় ভাবে তাঁহার মুখচোখ লাল হইয়া থাকিত এবং তাঁহার গৌরী মূর্তিটিকে ছিন্নমস্তার মত দেখাইত। বেলুড় মঠের সাধুব্রহ্মচারিগণ যাইয়া তখন তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন রাম। তিনি

৬ স্বামী শিবেশানন্দজী-কথিত।

ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন। যেই তিনি আবির্ভূত ইষ্টদেবতাকে প্রণামপূর্বক পায়ের ধূলা লইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, ইষ্টমূর্তির পরিবর্তে গুরুমূর্তি রামকৃষ্ণ। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, কি, এখন বিশ্বাস হ'ল, আমি কে? ৭

৭ স্বামী বাসুদেবানন্দজী-কথিত।

ভারতের বাণী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

ভারতেরে কেহ পাবে না খুঁজিয়া সময়ের বালু-তীরে,
পাবে নাক কভু বিস্মৃতিময় অতীতের দিনে ফিরে!
সে নাই জাগিয়া শিলালিপি মাঝে, ভগ্ন মাটির স্তূপে,
সে নাই নিঝুম গহনারণ্যে নিভৃতে চুপে চুপে!
সমাজ, জাতি ও দেশকালগত বিরোধে বদ্ধ নহে,
আত্মা তাহার সকল কালের অন্তরে জাগি রহে!
মহামানবের অভয় কণ্ঠে অভয় মন্ত্র দানি,
যুগে যুগে যুগ-সন্ধির ক্ষণে জাগে ভারতের বাণী!

* * *

ভোক্তা রূপে, স্রষ্টারূপে যেবা আছে বিশ্ব-চরাচরে,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি জীবের জীবন যেবা ধরে,
কর্ণে যে শোনে বাক্য, জেনে রেখ সেই শুধু আমি,
আমি ত সকলি করি অন্তরেতে রহি অন্তর্যামী!
আমারে জানে না যারা, হীন সম রহে এ সংসারে,
জন্ম-মৃত্যু-ঘূর্ণাবর্তে ভুঞ্জে দুঃখ হেথা বারে বারে!

* * *

তমসার উর্ধ্ব-দেশে যে জ্যোতি রয়েছে জাগি,
সে যে মোর অন্তরের দ্যুতি!
জ্যোতির্ময় সূর্য-রূপে লভিয়াছি তাহা আমি,
লভিয়াছি জ্যোতি-অনুভূতি!

* * *

আত্মার ত আদি নাই, তাই তাঁর জন্ম নাহি হয়,
জন্মশূন্য বলি তাঁর কখন ত নাহি ক্ষতি ক্ষয়!
নিজ সত্তা বিনা তাঁর অন্য কিছু নাহিক সম্ভবে,
বাসনা-বিহীন তিনি, অচঞ্চল হন এই ভবে!

দিক্‌ বা কালের দ্বারা তিনি নন কাহারো জানিত,
তাই তিনি নন বদ্ধ—বন্ধন ও মুক্তির অতীত
সকল জীবের মাঝে আত্মার ত একই স্বভাব,
মূঢ় জন করে শোক—একমাত্র জ্ঞানের অভাব!

* * *

ভূলোকে দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত পুণ্য-ধ্বনি!
পুণ্যকর্ম্মা জগতে ভূষিত-কীর্ত্তি-মণি!
পুরুষ-খ্যাতিতে লভে পৌরুষ, শ্রেষ্ঠ হয়,
সত্যে ধর্ম্মে দয়ায় করে সে বিশ্বজয়!

* * *

সুখ খোঁজ? শান্তি খোঁজ?
কোথা তুমি পাবে ধরণীতে?
শোন ঐ সুগম্ভীর
রণবাদ্য বাজে চারিভিতে!
একদিকে কাঁদে আর্ত,
ফেলে শুধু নয়নের জল,
অন্যদিকে কাম ক্রোধ
হিংসা নিয়ে যাহারা প্রবল,
বিরোধ-বিচ্ছেদ মাঝে
তুলিতেছে কোলাহল-রব!
হৃদয়ে কোথায় শান্তি?
এ জীবনে কোথায় গৌরব?
সময়-সমুদ্র যেন
ভ'রে গেছে শোণিত-ধারায়,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ তা'র
কলঙ্কিত সলিলে মিলায়!

* * *

কর নির্ভর আপন শক্তি 'পরে,
ত্যজ তব আশ অন্য ভরসা তরে।
নিজ অঙ্গনে বহে উচ্ছলা নদী,
পিপাসায় তবু কেন কাঁদো নিরবধি?

* * *

যারা মনে করে এই পৃথিবীতে অপর ধর্ম শাসি',
আপন ধর্ম রাখিবে জীবিত—অক্ষয় অবিনাশী,
জেন জেন তাহা ভুল!
যেথায় বিরোধ সেথা মহাকাল করে সব নির্মূল!
শোন আমি কহি—"রহিবে লিখিত ধর্ম-পতাকা 'পর,
কর সহায়তা, ভুলিয়া দ্বন্দ্ব-বিরোধ পরস্পর!
মিলনের গান গাও—
অন্তর-ভাব দাও আর নাও, মৈত্রী-শান্তি চাও!"

পল্লব ও পাল-শিল্প

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে পল্লবরাজগণের প্রাধান্য ছিল। প্রথমতঃ পল্লবেরা বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম দক্ষিণ ভারতে হীনপ্রভ হইলে পল্লবগণ শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাজদের সংগে পল্লব-রাজগণের বিরোধ লাগিয়াই থাকিত। কাঞ্চিপুরম্ (আধুনিক কাঞ্জিভরম্) তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

প্রথম রাজা মহেন্দ্রবর্ম্মন্ (৬০০-৬২৫ খৃঃ) দ্রাবিড় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত। তাঁহাকে তামিল-সংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক বলা হয়।

প্রথম নরসিংহের রাজত্বকালে (৬২৫-৬৪৫ খৃঃ) হুয়েন্ শাঙ্ কাঞ্চিতে আসিয়া অনেক মহাযান-মন্দির দেখিয়াছিলেন। প্রথম নরসিংহ মা-মল্ল বা মহামল্ল নামে পরিচিত।

মহেন্দ্রবর্ম্মন্ ও তৎপুত্র নরসিংহবর্ম্মন্ কর্ত্তৃক মহাবলিপুরম্-এর মনোলিথিক মন্দির ও মূর্ত্তি-সমূহ ক্ষোদিত হইয়াছিল। নরসিংহবর্ম্মণের নাম অনুসারে ইহার নাম মামল্লপুরম্ বা মহাবলিপুরম্ হয়। নরসিংহবর্ম্মন্ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে হত্যা করেন। সিংহল পর্য্যন্ত তিনি আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

নরসিংহের পৌত্র রাজসিংহ মহাবলিপুরম্-এর "শোর টেম্পল্" বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী মন্দির (৭০০-৭২০ খৃঃ) এবং কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এগুলি নির্ম্মিত (structural) মন্দির।

কৈলাসনাথ মন্দিরের শিখর পিরামিডাকৃতি। ইহাতে সমতল ছাদ ও স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ এবং মণ্ডপ ঘিরিয়া রথাকার ক্ষুদ্র কুঠরি (peristyle) আছে। উপবিষ্ট সিংহের মাথায় স্তম্ভ রহিয়াছে। পল্লব-স্থাপত্যের পূর্ণবিকাশ এই স্থাপত্যে দেখা যায়।

মহাবলিপুরম্-এর গাত্রে ক্ষোদিত বিরাট রিলিফের কাজ চিত্তাকর্ষক বস্তু। ৯৬ ফুট দীর্ঘ ও ৪৩ ফুট প্রস্থ। বিরাট panorama শিল্পীর বিরাট কল্পনা; দেবদেবী মানুষ দেবযোনি নাগনাগিনী পশু প্রভৃতি উপস্থিত। গঙ্গাবতরণের দৃশ্য চমৎকার। পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল আছে, তাহার দুই দিকে সব মূর্ত্তি ক্ষোদিত। সকলে এই ফাটলের দিকে তাকাইয়া হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছে। চতুর্ভুজ শিব দাঁড়াইয়া আছেন। ফাটলের মধ্যে নাগ-নাগিনী মূর্ত্তি; ইহারা জলের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। ফাটল সম্ভবতঃ জলের ধারা সূচনা করিতেছে। ইহার পার্শ্বে একটি মন্দির এবং তৎপার্শ্বে জনৈক যোগীর শীর্ণমূর্ত্তি। উপরেও এক পায়ে দণ্ডায়মান এবং ঊর্দ্ধবাহু এক তপস্বীর মূর্ত্তি। ইহা অর্জ্জুনের তপস্যা নামে পরিচিত। নীচে হস্তিমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে; হাতীর অঙ্গভঙ্গি খুবই স্বাভাবিক। তপস্যারত ঊর্দ্ধবাহু এক বিড়ালের মূর্ত্তিও ক্ষোদিত আছে; উহার পায়ের কাছে একটি ইঁদুর খেলা করিতেছে।

পঞ্চপাণ্ডবের নামানুসারে পাঁচটি মন্দির পাহাড় খোদিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই মন্দিরগুলি রথ নামে পরিচিত। ইহারা পল্লব বা দ্রাবিড়-স্থাপত্যের নিদর্শন। দ্রৌপদীরথ বাংলার চৌচালা ঘরের মত। গণেশরথের ছাদ বৌদ্ধচৈত্যের ন্যায়। মহাবলিপুরম্-এ দেখা যায়, উপবিষ্ট সিংহের মস্তকে স্তম্ভ। ইহাই পরবর্ত্তী যুগে গজসিংহ-যুক্ত স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে। এই স্তম্ভ "যলি" নামে পরিচিত।

এখানকার বরাহগুহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তি আছে—বরাহ অবতার, বামন অবতার, সূর্য্য, দুর্গা এবং দুই রাণীর সহিত মহেন্দ্রবর্ম্মণের মূর্ত্তি। সিংহবাহিনী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করিতে যাইতেছেন, মূর্ত্তিটিতে তেজস্বিতা প্রকট। এখানকার কয়েকটি বানর-মূর্ত্তিও উল্লেখযোগ্য, মূর্ত্তিগুলি খুব স্বাভাবিক। পশুমূর্ত্তির মধ্যে বিশেষ করিয়া হস্তিমূর্ত্তি অতুলনীয়। এরূপ হস্তিমূর্ত্তি ভারতে আর কোথাও দেখা যায় না। সিংহলের অনুরাধাপুরে ইসুরুমুনি বিহারে পাহাড়ের গায়ে এই জাতীয় হস্তিমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে।

মধ্যযুগ

৮০০ হইতে ১৭০০ খৃঃ পর্য্যন্ত পাল চালুক্য চোল রাজপুত প্রভৃতি রাজত্ব করে। এই সময়ের ইতিহাস জটিল ; ভারত তখন শতধা বিচ্ছিন্ন। প্রাচীন যাযাবর জাতির বংশধরগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজপুত নামে উত্তর ভারতের বিভিন্নস্থানে রাজ্যস্থাপন করেন। ঐ সময় গুর্জ্জর প্রতীহার বংশ কনৌজে প্রবল। পরমার-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় ভোজ (১০১৮-১০৬০ খৃঃ) সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; তিনি নিজেও কাব্য দর্শন জ্যোতিষ ও স্থাপত্যবিদ্যায় অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভোজ একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শকারি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তিনিও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতির চূড়ান্ত উন্নতি সাধিত হয়। মহোবা বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশের রাজধানী ছিল। এই বংশীয় রাজগণ ১০০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। চন্দেল্ল-বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ধঙ্গ ৯৫৪ খৃঃ হইতে ১০০২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১১৯৭ খৃঃ অবধি ইঁহাদের শাসনকাল ছিল। পালরাজগণ গৌড়ে ও বিহারে বৌদ্ধ ও হিন্দু-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেনরাজগণ পাল-দিগকে পরাজিত করিয়া ১০৭০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে সেনরাজত্ব স্থাপন করেন। খৃঃ দ্বাদশ শতকের শেষে সেন ও পালরাজগণ মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত হন। প্রাচ্যগঙ্গবংশীয় রাজগণ তখন উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। কলিঙ্গের গঙ্গবংশের এক শাখা মহীশূরে রাজত্ব করেন, তাঁহারা পাশ্চাত্যগঙ্গ নামে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িলে কল্যাণের (নিজামরাজ্যে অবস্থিত) চালুক্যরাজগণ প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহারা বাতাপিনগরের পুরাতন চালুক্যদের বংশধর। ইঁহাদের রাজত্বকাল ১১৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত। হোয়সল বংশ মহীশূরে রাজত্ব করেন একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত। দক্ষিণে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাঞ্চির পল্লবগণের পর চোলরাজগণ প্রবল হইয়া উঠেন। রাজরাজদেব (৯৮৫-১০১৮ খৃঃ) এই বংশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সমুদ্রপথে বিশাল নৌবাহিনীর সাহায্যে সিংহল এবং ভারত-মহাসাগরের বহু দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। রাজরাজদেব গোঁড়া শৈব হইলেও নাগপটমে সুমাত্রার বৌদ্ধদের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১০১৫ খৃঃ তিনি চীনে দূত

প্রেরণ করেন। রাজরাজদেব বহুমন্দির-নির্ম্মাতা; তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগ জয় করিয়া "গঙ্গইকোণ্ড" অর্থাৎ গঙ্গাবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন। ত্রিচিনোপল্লীতে গঙ্গইকোণ্ড চোল-পুরম্ নামে একটি নূতন রাজধানী তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাদুরার পাণ্ড্যরাজগণ কিছু কালের জন্য প্রবল হইয়া উঠেন। মার্কো-পোলোর বিবরণ হইতে জানা যায় পাণ্ড্যরাজ্যের প্রধান বন্দর কায়লনগরী সমৃদ্ধিশালী ছিল। আরবদেশ এবং চীন হইতে বহু বাণিজ্যপোত কায়লবন্দরে আসিত।

১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে মুসলমানগণ মালাবার ব্যতীত দক্ষিণের সকল রাজ্য অধিকার করে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি বিজয়নগরের রাজগণ প্রবল হইয়া দক্ষিণ-ভারতের মুসলমানদের প্রভাব হ্রাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদেবরায় ১৫০৯ হইতে ১৫২৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দক্ষিণ-ভারতে যে সকল নৃপতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদেবরায় অন্যতম। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের পতন হয়। বিজয়নগরের পরে দক্ষিণে মাদুরায় নায়করাজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে তিরুমলনায়ক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিরুমলের শাসনকাল ১৬২৩ খৃঃ হইতে ১৬৫৯ খৃঃ পর্য্যন্ত।

পাল-শিল্প (৮ম-১২শতাব্দী)

গুপ্তদের তিরোধানের পর পূর্ব্ব ভারতে সংস্কৃতি ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ভার গ্রহণ করেন পালরাজগণ। তাঁহাদের আমলেই বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পদ বৌদ্ধ মহাযান-মতের সঙ্গে নেপাল তিব্বত যবদ্বীপ সুমাত্রা প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যদেশে এবং সিংহলে ছড়াইয়া পড়ে। পালগণ বৌদ্ধ ছিলেন; তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন।

প্রথম রাজা গোপাল উদ্দণ্ডপুর বিহার (পাটনা জেলায় অবস্থিত) স্থাপন করেন। ধর্ম্মপাল (আনুমানিক ৭৬৯-৮১৫ খৃঃ) পাটলীপুত্র-নগরে রাজধানী-স্থাপন এবং বিক্রম-শীলা বিহার (কাহারও কাহারও মতে ভাগলপুর জেলার পাথরঘাট নামক স্থানে) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পালদের সময় বঙ্গদেশের সুমাত্রার সহিত যোগাযোগ ছিল। দেবপালের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৮১৫-৮৫৪ খৃঃ) সুমাত্রার বৌদ্ধ রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৯২-১০৪০ খৃঃ) পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; তিনি চোলবংশীয় প্রথম রাজেন্দ্রের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার রাজত্বকালে ও ধর্ম্মপালের আমলে আরো কয়েক জন বৌদ্ধাচার্য্য তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারার্থ গমন করেন। প্রথম মহীপালের সময়ে (আনুমানিক ১০৪০-১০৫৫ খৃঃ) অতীশ দীপঙ্কর বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে যান।

ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময় ধীমান এবং তৎপুত্র বিতপাল ভাস্কর্য্য ও চিত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর (১৬০৮ খৃঃ) তিব্বতীয় লামা তারানাথ পালশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহা Eastern School বা পূর্ব্বশৈলী বলিয়া আখ্যাত।

সমগ্র এশিয়ার মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় মহাযান বৌদ্ধমতের কেন্দ্র ছিল। এখানে নেপাল তিব্বত যবদ্বীপ এবং সুদূর প্রাচ্য হইতে শিক্ষার্থী আসিত। তাহাদের মাধ্যমে নালন্দার মহাযান-শিল্প সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মহাযান-মত তন্ত্রের সঙ্গে মিলিত; শৈব এবং বৈষ্ণব-

প্রভাবও মহাযান-শিল্পের উপর বর্ত্তিয়াছে। হিন্দু দেবদেবীর ন্যায় অসংখ্য দেবদেবী মহাযান-ধর্ম্মে স্থান পাইয়াছেন। নালন্দায় কৃষ্ণপ্রস্তর এবং ব্রোঞ্জে এই সকল দেবদেবী অঙ্কিত। এই ভাস্কর্য্যে প্রথম দেখা যায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি; তান্ত্রিক দেবদেবী পরবর্ত্তী কালের। নালন্দায় আগত বিদেশী শিক্ষার্থী ও পরিব্রাজকগণ এই সকল মূর্ত্তি নিজেদের দেশে লইয়া গিয়াছেন। এই উপায়ে সর্ব্বত্র মহাযান-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সে সকল দেশের শিল্পীরা পালশিল্পের আদর্শে মূর্ত্তি গড়িয়াছে। অন্যত্র পাল শিল্পীরা মূর্ত্তির উপর এবং শিল্পাদর্শের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

শুধু নালন্দায় নয়, খিচিং-এ (উড়িষ্যা), কর্‌কিহারে এবং বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই পালযুগের মূর্ত্তি দেখা যায়। শুধু বৌদ্ধ নয়, হিন্দু-দেবদেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। পুষ্করিণী-খননকালে এ সকল মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। শুধু নালন্দাতেই নয়, সারা বাংলাদেশেও মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ হইয়াছে। কুম্ভকারের ন্যায় ভাস্করও সর্ব্বত্র ছিল। এখনও বর্দ্ধমানের দাইহাটা গ্রামে পুরাতন ভাস্কর-বংশ বিদ্যমান। তাহাদের উপাধি ভাস্কর। তাহারা এখনও পাথরের মূর্ত্তি খোদাই করে, যদিও প্রাচীন নৈপুণ্য ইহাদের আর নাই।

পালদের ন্যায় সেনরাজাদের আমলেও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সেনযুগের মূর্ত্তিগুলি পালযুগের মূর্ত্তির ন্যায়ই।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র পালযুগের মূর্ত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে—লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রাজসাহী ও ঢাকা যাদুঘরে ইহাদের নিদর্শন আছে। বাহিরে লণ্ডন প্যারিস বার্লিন বোষ্টন ও নিউইয়র্কে পালমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এক সময় নিশ্চয়ই অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পালশিল্পের বৈশিষ্ট্য হইল শিল্পীর নানা শাস্ত্রীয় নিয়মে আবদ্ধ থাকিয়া শিল্পসৃষ্টি। পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তশিল্পের যুগে পৌরাণিক মূর্ত্তি নির্ম্মাণে শিল্পীদের যে স্বাধীনতা ছিল তাহা তাহাদের ছিল না। যে সকল শিল্পী ক্ষমতাবান, তাহারা বাধা-নিষেধ মানিয়াও শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। ক্ষমতাবিহীন শিল্পীরা শুধু পুনরাবৃত্তি করিয়াছে, সেজন্য ইহাকে Decadent Gupta Art বলা যায়। পাল-শিল্পীদের technique বা শিল্পপদ্ধতির উপর দখল ছিল। তাহারা পাথরের মূর্ত্তিকে এমন মসৃণ করিয়াছে যে, তাহাকে ধাতুমূর্ত্তির কাছাকাছি আনিয়াছে। মূর্ত্তির বহিঃরেখা সুস্পষ্ট।

বৌদ্ধমূর্ত্তির বিষয় হইল বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বজ্রপাণি তারা মঞ্জুশ্রী মরীচি ইত্যাদি। বিষ্ণু, বরাহ অবতার, মৎস্য অবতার, শিব, দুর্গা, উমা, মহেশ্বর, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু মূর্ত্তি। ব্রোঞ্জ, পিতল, অষ্ট ধাতু, রৌপ্য প্রভৃতি নির্ম্মিত ধাতুমূর্ত্তিও দেখা যায়। মূর্ত্তির পিছনে চালি ও প্রস্তরফলক আছে; অধিকাংশ মূর্ত্তিই high relief; সম্পূর্ণ ক্ষোদিত মূর্ত্তি অল্প। পিছনে প্রস্তরফলকযুক্ত এইরূপ মূর্ত্তিকে ইংরেজীতে ষ্টেলে বলে। চালি সমতল অথবা কারুকার্য্যে পূর্ণ। প্রথম দিকের মূর্ত্তিতে কারুকর্ম্ম কম, শেষের দিকে বাড়িয়াছে। অধিকাংশ মূর্ত্তিই স্থিতিশীল; সোজা দাঁড়াইয়া আছে, যেমন বিষ্ণু ও সূর্য্যমূর্ত্তি। বাংলার শিল্প পৌরুষ-ব্যঞ্জক নহে, ইহা কমনীয় ও লাবণ্যযুক্ত। এলিফেণ্টা-এলোরার দেবতার মত বাংলার দেবতাগণ স্বর্গের অধিবাসী নহেন,

তাঁহারা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের দ্বারে উপস্থিত। বাংলার ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা এই মূর্ত্তিগুলিতে দেখা যায়।

ভারতের অন্যত্র পাহাড় থাকায় বিরাটাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বাংলার শিল্পীদিগকে অন্যস্থান হইতে পাথর বহন করিয়া আনিতে হইয়াছে, সেজন্য এখানে বৃহদাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্ভব হয় নাই। অধিকাংশ মূর্ত্তিই ছোট। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নালন্দা ও সারনাথের বিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বাংলা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মেরও অবসান হয়। বাংলার ভাস্কর্য্যেরও সেই সঙ্গে অবসান ঘটে।

এপার ও ওপার

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু দে হাজরা

এপারে শুধু আশা শুধু ভাষা
শুধু যে মায়া,
ওপারে আশা নাই ভাষা নাই
নাই যে ছায়া।

এপারে মুখর প্রাণ,
ওপারে নীরব গান,

এপারে মহাসাগরে
তরণী বাওয়া,
ওপারে চির বসন্ত
মলয় হাওয়া।

এপারে যাহা চাই
তাহা যে নাহি পাই,
চাওয়া ও পাওয়া হায়
ওপারে কিছু নাই।

এপারে হারাই যারে
ওপারে আসে ফিরে,

এপারে মিলন শেষে
বিরহে গান গাই,
ওপারে সবই পাই
কিছু না হারাই।

এপারে প্রভাত হলে
সন্ধ্যা ঘনায় কূলে
ওপারে প্রেমের জ্যোতি
সদা সদা যে জ্বলে।

এপারে কাঁদাহাসা,
ওপারে ভালবাসা,

এপারে শেষ আছে
দিবসে পলে পলে
ওপারে শেষ নাই।
সব চাওয়া মেলে।

এপারে সব কিছু
ধ্বংসের মুখে
ওপারে সব কিছু
শাশ্বত সুখে।

এপারে সীমার বাঁধন,
ওপারে অসীম গগন,

সীমা ও অসীমের
দুইটি দ্বারে,
জনম মরণ দোঁহে
খেলে বারে বারে।

বিশ্বরচনা

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্‌-এস্‌সি

সৃষ্টির এক আদিকালে কোন্ এক অজ্ঞাত পুরুষ এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন! তাঁহার রচনার নিয়ম-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা সর্বত্র প্রকৃতির পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। জ্ঞানী ব্যক্তি উহার গোপন লিপি কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার নমুনা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। যে পুরাতন পরমপুরুষ এ বিশ্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহার হাতে বিরানব্বই প্রকার অগণিত ইষ্টকখণ্ডের পুঁজি ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর ইষ্টক বিভিন্ন ও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। ১নং ইষ্টকগুলির আকার, ওজন ও অন্যান্য গুণে নিজেদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ২নং ইষ্টকগুলিও তদ্রূপ। কিন্তু ১নং-এর সঙ্গে তাহাদের কোন সামঞ্জস্য নাই। এই ভাবে বিরানব্বই প্রকার ইঁট শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্ব স্ব পার্থক্য রক্ষা করিয়া আপনাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উহারাই স্থাবর জঙ্গম প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ প্রত্যেকটি অবয়বের মূলীভূত কারণ। এইজন্য উহাদিগকে পণ্ডিতগণ "মৌলিক পরমাণু" আখ্যা দিয়াছেন। মানুষের সাধ্য নাই এমন কোন শরীর আবিষ্কার করে যাহার মধ্যে উহাদের কোন না কোন একটি বর্ত্তমান নাই।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এ বিশ্বরচনায় যে সকল ইষ্টকের প্রয়োজন তাহামাত্র বিরানব্বই প্রকার। উহাদিগকে নানা ভাবে ও ভঙ্গিতে গাঁথিয়া সেই পুরাতন পুরুষ তাঁহার রচনাকার্য্য সমাপন করিয়াছেন। যেমন বিভিন্ন ইমারত-প্রস্তুতিতে ইষ্টক-সমাবেশের মধ্যে নানা ভাব ও ভঙ্গি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তিনিও তাঁহার সৃষ্ট বস্তু নির্মাণে বৈচিত্র্যময় ইষ্টকসমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিরানব্বইটি মৌলিকের মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র লৌহ দস্তা বঙ্গ পারদ গন্ধক ফস্‌ফরাস্ অঙ্গার ইত্যাদির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এইগুলি ছাড়া বর্ত্তমানে হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্ নাইট্রোজেন্ সিলিকন্ ক্লোরিন্ ব্রোমিন্ আইডিন্ পটাসিয়াম্ সডিয়াম্ ক্যালসিয়াম্ ম্যাগনেসিয়াম্ এলুমিনিয়াম্ ক্রোমিয়াম্ নিকেল্ প্লাটিনাম্ আরসেনিক্ এন্‌টিমনি ইত্যাদিও আধুনিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। সেই পুরাতন পুরুষ তাঁহার সৃষ্ট সাম্রাজ্যের যে আকার দিয়াছেন তাহার গঠনভঙ্গির বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করিলে আমরা মৌলিকগুলির কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি তাহার সবিশেষ পরিচয় পাই। কোন কোন মৌলিক বেশ একা থাকিতে পারে। পৃথিবীতে আমরা তাহাদের অহরহ দেখিতে পাই, যেমন স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ পারদ গন্ধক অঙ্গার এলুমিনিয়াম্ নিকেল্ ক্রোমিয়াম্ ইত্যাদি। যাহাদের আমরা মুক্ত অবস্থায় দেখি না তাহাদের সঙ্গে পরিচয়ের কি সম্ভাবনা আছে তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। তাহাদের আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না কেন? ক্লোরিন্ একটি মৌলিক, সডিয়াম্‌ও তাহাই। কিন্তু বিশেষ রক্ষণব্যবস্থা ব্যতীত তাহাদের দেখা সম্ভব নহে। ইহার কারণ কি? পণ্ডিতগণ বলেন যাহারা মুক্ত নহে তাহারাই রাসায়নিক

প্রেরণায় বেশী উদ্বুদ্ধ, কাজেই বিশ্বরচনায় তাহারা অকর্মণ্য থাকিতে পারে না। পৃথিবীর বেশীর ভাগই যুক্ত বা যৌগিক পদার্থ। মৌলিকগুলি একে অন্যের সঙ্গে কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া যুক্ত হইয়াছে এবং উহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ নিয়মগুলি সবই সেই অজ্ঞাত পুরুষের রচিত। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, রাসায়নিক সংযোগ-বিধির ঐ নিয়ম মানিয়াই হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ জলাকারে পরিণত হইয়াছে। জলের গঠন সুনির্দিষ্ট। একটি অক্সিজেন্ ইঁট ও দুইটি হাইড্রোজেন্ ইঁটের সমাবেশে একটি জল অণু সৃষ্ট হয়। লবণপ্রস্তুতিতে সেই পুরাতন কারিগর একটি ক্লোরিন্ ইঁট ও একটি সডিয়াম্ ইঁট লইয়াছেন। দুইটির যোগফল একটি লবণ অণু, অর্থাৎ লবণের ক্ষুদ্রতম অংশ। চিনি-প্রস্তুতিতে তাঁহার দরকার হইয়াছিল ১২টি অঙ্গার, ২২টি হাইড্রোজেন্ ও ১১টি অক্সিজেন ইঁট্-এর। চকের জন্য তিনি পছন্দ করিয়াছিলেন একটি ক্যাল-সিয়াম্, একটি অঙ্গার ও তিনটি অক্সিজেন্ ইঁট। বায়ু কিন্তু তিনি যৌগিক-রূপে প্রস্তুত করেন নাই। সেখানে অক্সিজেন্ ও নাইট্রো-জেন্ মুক্ত। রাসয়ানিক বন্ধন সৃষ্টি করা এক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহার অভিসন্ধির কথা কে বুঝিবে? অদ্ভুত তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য! তিনি চুন তৈরী করিলেন একটি ক্যালসিয়াম্ ও একটি অক্সিজেন্ দ্বারা, কিন্তু বালুতে সন্নিবেশ করিলেন একটি সিলিকন্ ও দুইটি অক্সিজেন্!

তাঁহার কতকগুলি রচনা যেমন সুন্দর ও সহজ, কতকগুলি তেমনি সুন্দর অথচ জটিল জৈব শরীর অর্থাৎ গাছপালা ও জীবশরীর প্রধানতঃ অত্যন্ত জটিল। সেখানে ইঁটের সংখ্যা এরূপ বেশী ও গাথনির নমুনা এত বিভিন্ন যে বুদ্ধিমান লোক আজও তাহার সম্যক কূল-কিনারা করিতে পারে নাই। মনুষ্য-শরীর প্রায় একুশ প্রকার ইঁটের দ্বারা প্রস্তুত। অঙ্গার হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্ ক্যালসিয়াম্ ফসফরাস্ গন্ধক ক্লোরিন্ সডিয়াম্, পটাসিয়াম্ তন্মধ্যে প্রধান। নানাভাবে ও যথানিয়মে তাহাদের সেখানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গাছপালায় প্রধানতঃ অঙ্গার হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্ আছে। ক্যালসিয়াম ফসফরাস্ পটাসিয়াম্ নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি আরও অনেক মৌলিককে প্রয়োজন মত উপস্থাপিত করা হয়। সকলেই রাসায়নিক বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নানাবিধ রূপের কারণ হইয়াছে।

মানুষ যখন রাসায়নিক বন্ধনসূত্র আবিষ্কার করিয়াছে তখন যৌগিকদের বিভক্ত করা তাহাদের পক্ষে এমন কঠিন নয়। তাহারা দেখিয়াছে কেরোসিন তেলে আছে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন, নীলবর্ণে আছে অঙ্গার হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্, ক্লোরোফর্মে আছে অঙ্গার হাইড্রোজেন্ ও ক্লোরিন্, পেট্রোলে আছে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্, গ্লিসারিনে আছে অঙ্গার হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন, সুরাতে আছে অঙ্গার হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্।

পৃথিবীর বক্ষে প্রায় সব মৌলিকই আছে। এ জন্য মানুষ ধরাবক্ষ হইতেই উহাদের উদ্ধার করে। কিন্তু কোন কোন মৌলিক যে অন্ত-রীক্ষে নাই তাহা নহে। হিলিয়াম্ আরগন্ নিয়ন্ ক্রিপটন্ জেনন্ ও র‍্যাডন গ্যাসরূপে বায়ুতে অবস্থান করে। পৃথিবীর বক্ষে সিলিকন্ সর্ব্বা-পেক্ষা বেশী। তৎপর অক্সিজেন্ এলুমিনিয়াম্ ইত্যাদি পর পর আসিয়া দাঁড়ায়। উহারা কিন্তু প্রায়শঃ যৌগিক রূপেই বিরাজ করে। এজন্য মৌলিকদের উদ্ধারের জন্য বৈজ্ঞানিককে নানা-বিধ প্রচেষ্টা ও আয়োজনের আশ্রয় নিতে হয় যেমন, লৌহ-উদ্ধারের জন্য আমাদের দেশে টাটা

কোম্পানী বা ষ্টিল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল প্রভৃতি কারখানা বিরাট যান্ত্রিক যন্ত্র চালু রয়িয়াছে। ঐ রূপ রাসায়নিক আয়োজন দ্বারা তাম্র এলুমিনিয়াম্ সীসক বঙ্গ ফসফরাস্ প্রভৃতি মৌলিক মুক্ত করার ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত মৌলিক পৃথিবীতে একক বর্ত্তমান থাকিতে পারে তাহাদেরও সম্যক বিশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কারণ, ধূলাবালি পাথর মাটি উহাদের সঙ্গে মিশ্রিত থাকার কথা। ঐগুলিকে মুক্ত করার জন্য বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্য লইতে হয়। গন্ধক স্বর্ণ প্লাটিনাম্ প্রভৃতি এ জাতীয় মৌলিক। হাইড্রোজেন্ ক্লোরিন্ ব্রোমিন্ আইওডিন্ প্রভৃতি মৌলিক যুক্তাবস্থায় থাকার দরুন ইহাদের উদ্ধারপদ্ধতি বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক সংকেত ও কর্ম্মধারায় পরিপূর্ণ।

বিস্ময়

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

এ ভাঙ্গা দেহের মাঝারে
আছো তুমি চির নব,
চির পুরাতন,
সাক্ষী হ'য়ে।
বিস্ময়ে
ভরে যায় মন।

দ্রষ্টা যে জন
এই ভাঙ্গা দেহ ও মন নিয়ে
হেরিয়াছে স্বরূপ তোমার।
কিন্তু, কহিবার
শকতি তাঁহার
নিয়েছো কাড়িয়া।

এই ভাঙ্গা দেহের মাঝারে
আছো তুমি একভাবে মেতে।
এ বিশ্বের বিরাট সত্তা
ঘনীভূত হ'য়ে
মিশে আছে তোমা সনে।
অবোধ শিশুর মত
ভাবি বসে—
"কেমনে এ জীর্ণ দেহ
করিয়া আশ্রয়
রয়েছো শাশ্বত নব জরাহীন হ'য়ে ?"

ভক্ত অধর সেন

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

(৩)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধরকে কিরূপ অন্তরঙ্গ মনে করিতেন তাহা 'শ্রীম'র নিকট তাঁহার শ্রীমুখের কথা-প্রসঙ্গে বোঝা যায়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন তিনি শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথকে (মাষ্টার মহাশয়) বলিয়াছিলেন, "ভাবে দেখলাম—অধরের বাড়ী—বলরামের বাড়ী—সুরেন্দ্রের বাড়ী—এসব আমার আড্ডা। ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই।"

একবার দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলার নিকট রেলিংএর তারের বেড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায় পড়িয়া যান; তখন তাঁহার নিকট কেহ ছিল না। ইহাতে তাঁহার খুব আঘাত লাগে, এমন কি বাম হাতের হাড় সরিয়া যায়। ডাক্তার দেখিয়া উক্ত হাতে বাড় বাঁধিয়া দেন। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পর অধর আসিয়া ঠাকুর কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর স্নেহকোমল স্বরে "এই ত্যাখো" বলিয়া বাম হাতখানি দেখাইলেন। সহাস্যবদনে ঠাকুর বলিলেন, "হাত লেগে কি হয়েছে। আছি আর কেমন!"

ভক্তসঙ্গে অধর ঘরের মেঝেতে বসিলে ঠাকুর ডাকিয়া কাছে বসাইলেন এবং তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বলিলেন। ঠাকুরের বসিবার ছোট খাটটির একপ্রান্তে বসিয়া অধর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে অহেতুকী ভক্তির কথা বলিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "অহেতুকী ভক্তি যদি সাধতে পার—তাহলে ভাল হয়।" অধর এই অহেতুকী ভক্তির সাধক ছিলেন। ঠাকুরের নিকট তিনি কিছু চাহিতেন না—তাঁহাকে দর্শন করিয়াই অধরের কত আনন্দ! এমন কি উপদেশ শুনিবার তাঁহার বিশেষ সুযোগ হইত না। তিনি কাছারি হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া সামান্য জলপান করিতেন এবং তাহার পর প্রতিদিন একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে সোজা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীভবতারিণীর আরতির প্রাক্কালে গিয়া তিনি উপস্থিত হইতেন। গাড়ী হইতে নামিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন এবং শ্রীশ্রীভবতারিণীর আরতিদর্শন করিতে যাইতেন। আরতির পর তিনি ঠাকুরকে পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিতেন বা ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহার পাদপদ্মের সেবা করিতেন। সমস্ত দিন কাজ-কর্ম করিয়া অধরের দেহ শ্রমক্লান্ত হইত। ঠাকুর অধরকে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখিয়া প্রায়ই বিশ্রাম করিতে বলিতেন। ঘরে মাদুর পাতা থাকিত, অধর তাহার উপর প্রায়ই শুইয়া পড়িতেন এবং ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া অল্পক্ষণেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। রাত্রি নয়টা দশটার পর তাঁহাকে উঠাইয়া দিলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পাদবন্দনা করিয়া গৃহাভিমুখে উক্ত গাড়ীতে রওনা হইতেন। প্রায় প্রতিদিন ইহাই ছিল অধরের নিত্য কর্তব্য। ইহার জন্য তিনি কোন কষ্টকেই

কষ্ট অনুভব করিতেন না এবং অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেন না। অাপিস বা কাজকর্ম হইতে ছুটি পাইয়া মানুষ স্বভাবতঃ ক্লান্তদেহে বিশ্রাম সুখলাভ করিতে লালায়িত হয়, কিন্তু অধর কাছারি হইতে বাড়ীতে ফিরিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। শোভা-বাজার বেনেটোলা হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিত এবং মধ্যরাত্রে আসিয়া অধর রাত্রিকালের আহারাদি সম্পন্ন করিতেন। প্রবল অনুরাগ না থাকিলে মানুষ সহজে অধরের ন্যায় প্রতিদিন দক্ষিণেশ্বর ছুটিয়া যাইতে পারে না। যদি কাজকর্মের ব্যস্ততায় কোন দিন অধরের দক্ষিণেশ্বরে না যাওয়া হইত, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনে একান্তে নির্জনে তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতেন। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে কোন সপ্তাহে না যাইতেন অধরের মনে হইত ঘরে দুর্গন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই প্রায় প্রতি সপ্তাহে ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আনিয়া আনন্দোৎসব করিতেন। যদি কখনও দুই এক সপ্তাহ বাদ পড়িত, তবে অধর ঠাকুরকে অতি বিনীতভাবে বলিতেন, "আপনি অনেক দিন যান নি—ঘরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে।" ইহা গভীর অনুরাগের উক্তি। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' আছে—

"মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার॥
সেই বপু লৌহ সম জানি॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে অধরের মন প্রেমের সৌরভে সুরভিত হইত। তাঁহার পদরজে ও অঙ্গগন্ধে তাঁহার গৃহ তীর্থরূপে পরিণত হয় অধর ইহাই মনে স্থির বিশ্বাস করিতেন। অধর গম্ভীরাত্মা ছিলেন; কথাবার্তা বা আবেগ-উচ্ছ্বাস বাহ্যিক ভাবে বড় প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে তিনি কোন কোন দিন সরলভাবে বলিয়া ফেলিতেন, "আপনি অনেক দিন এ বাড়ীতে আসেন নি। ঘর মলিন হয়েছিল—যেন কি এক রকম গন্ধ হয়েছিল! আজ দেখুন ঘরের কেমন শোভা হয়েছে, আর কেমন একটি সুগন্ধ বেরুচ্চে। আজ আমি ঈশ্বরকে খুব ডেকেছিলাম, এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।" অধরের মুখে এই গভীর অনুরাগের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ভক্তদিগের দিকে তাকাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "বলে কিগো!" পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অধরের বাড়ীতে ঠাকুরদালানে শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রতিমা গড়াইয়া দুর্গোৎসব হইত এবং পূজার তিন দিনই অধর ঠাকুরকে ভক্তসহ নিমন্ত্রণ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দুই এক জন ভক্তসঙ্গে অধরের বাড়ীতে দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন এবং ঠাকুরদালানে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদিগের দিকে চাহিয়া বলিতেন, "এমন হাস্যময়ী প্রতিমা আর দেখা যায় না।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে সমস্ত বাড়ীটি যেন আনন্দ-কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিত। আনন্দময় দিব্যপুরুষের আনন্দোজ্জ্বল ভাবদ্যুতিতে এবং আনন্দপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় সকলের হৃদয়ে এক অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রবাহ খেলিয়া যাইত। ঠাকুর চলিয়া গেলে অধরের মনে হইত তাঁহার গৃহ-দ্বার সব যেন অকস্মাৎ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বাড়ীতে দুর্গোৎসব—ঠাকুরদালানে পূজা হইতেছে, নর-নারী সকলে দুর্গোৎসবের আনন্দে মাতিয়া

রহিয়াছে ; কিন্তু ঠাকুর চলিয়া গেলে অধরের মনে কিন্তু এই সব কলোচ্ছ্বাস প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইত। বাগভাণ্ড, পূজার্চনা, হাস্যকৌতুক, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমাগম সেই অপূর্ব আনন্দের এক কণাও অধরের প্রাণে সঞ্চার করিতে পারিত না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে ও তাঁহার দর্শনে অধরের শরীর মন ইন্দ্রিয়াদি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিত এবং এক বিচিত্র আনন্দরসে তাঁহার প্রাণ কানায় কানায় পূর্ণ হইত। আবার ঠাকুরের চলিয়া যাইবার পর তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি অবসন্ন হইয়া পড়িত এবং ক্লান্তদেহে বিমর্ষবদনে খিন্নচিত্তে অধর বসিয়া রহিতেন। ঠাকুরের আদেশ তাঁহার শিরোধার্য ; প্রাণপণে তিনি তাহা পালনের চেষ্টা করিতেন। ঠাকুরের আদেশে তিনি বাড়ীতে সুবিখ্যাত রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান দিয়াছিলেন। যদি সেই গানের সময় ঠাকুর তাঁহার ভক্তমণ্ডলী লইয়া উপস্থিত না থাকেন তবে চণ্ডীর গানের রসাস্বাদন হইবে কিরূপে? অধর ঠাকুরকে ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেন। বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ প্রভৃতি ত্যাগী অন্তরঙ্গ এবং মহেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্র কেদারনাথ এবং বিজয়কৃষ্ণও এই সব উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত থাকিতেন। ঠাকুর ভাবে তন্ময় হইয়া গান শুনিতে শুনিতে কখনও কখনও সমাধিস্থ হইতেন, আবার কখনও দিব্যভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি তাঁহার গন্ধর্ব-নিন্দিত দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে শ্রীশ্রীজগন্মাতার গুণ-গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে দিব্যানন্দে মাতাইয়া তুলিতেন। অধর তখন মাতৃভাবে মাতোয়ারা। মহাত্মা রামচন্দ্র তৎপ্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"কলিকাতার ভূতপূর্ব ডেপুটী কলেক্টর অধরলাল সেন, ইনি শাক্ত ছিলেন।" অধরলাল প্রতিদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে যাইতেন বলিয়াই কি তাঁহাকে শাক্ত বলিয়া রামবাবু মনে করিতেন? 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' এমন কোন আলাপ-আলোচনা বা ঘটনার উল্লেখ নাই যাহাতে অধরলালকে শাক্ত বলিয়া মনে হয়। এমন কি কথামৃতকার অধরের ঠাকুরদালান ও ঘরটিকে শ্রীবাসের আঙিনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যতদূর বিচার করিয়া বুঝিতে পারা যায়—অধরের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ছিল, তিনি ছিলেন যুক্তি-বাদী। কবিতায় যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রতীয়মান হয় তিনি প্রেমিক ও অদ্বৈত-বাদী। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'কুসুমকাননের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে 'মহাবীর' নামক কবিতায় অধরলাল বলিতেছেন—"আমি অজেয়, অভেদ্য ; বিশালভুবন আমারই অধিকার-ভুক্ত, আমার রাজত্ব ; আমিই পরমজ্যোতি, অপ্রতিহত গতি ; আমিই জ্ঞানালোক, আমিই করুণা, আমিই কাম, সুন্দর কল্পনা, স্বপ্ন, তুষ্টি ও সন্তোষ—'মহাবীর আমি, মনে জানিল এখন'।" সুতরাং তাঁহার কবিতাবলীতে কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের ছায়া পড়ে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ অধরকে যে ভাবধারায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডী থাকিবার কথা নয়। ঠাকুরের আদেশে রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান যখন অধরের বাড়ীতে হইতেছিল তখন মহাত্মা রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে তাঁহার ভুল হইয়াছিল ; তাহাতে রামচন্দ্রের অভিমান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অধরকে সে কথা বলেন। অধর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়া উক্ত ত্রুটির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ঠাকুর রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধর

বলছিল তুমি নাকি তার খুব খাতির করেছ।" রামবাবু বলিলেন, "সে অধরের দোষ নয়। আমি জানতে পেরেছি—সে রাখালের দোষ। রাখালের উপর ভার ছিল।" রামচন্দ্রের কথা সমাপ্ত না হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "রাখালের দোষ ধরতে নেই—গলা টিপলে দুধ বেরোয়!" রাখালের উপর রামবাবুর পাছে অভিমান আসিয়া পড়ে তাই তিনি রামবাবুকে বলিতেছেন রাখালের দোষ ধরতে নেই। এইবার ক্ষুব্ধ অভিমানী রামচন্দ্র উত্তরে বলিলেন, "বলেন কি, চণ্ডীর গান হল!" ঠাকুর তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "অধর তা জানত না। এই দেখ না সেদিন অধর আমার সঙ্গে যদু মল্লিকের বাড়ীতে গিয়েছিল। সেখান থেকে চলে আসবার সময় অধরকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি সিংহবাহিনী বিগ্রহ দর্শন করলে—সেখানে কোন প্রণামী দিলে না?' তখন সে বল্লে—'মশায়, আমি জানতাম না যে প্রণামী দিতে হয়।' তা যদি না বলেই থাকে, হরিনামে দোষ কি? যেখানে হরিনাম সেখানে না বল্লেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণের দরকার হয় না।" ঠাকুরের এই কথায় রামচন্দ্রের হৃদয় হইতে সব অভিমান মুছিয়া গেল। তিনি ঠাকুরের নিকট শিখিলেন যেখানে ভগবানের নামকীর্তন বা তাঁহার উদ্দেশে ভজন কিংবা উৎসব হয়, সেখানে সামাজিক প্রথানুযায়ী নিমন্ত্রণের আবশ্যক হয় না। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সামাজিক বিধি-নিষেধ অচল। যেখানে ভগবানের নামসংকীর্তন ও ভজনাদি হয়, যেখানে তাঁহার প্রসঙ্গ বা গুণানুশীলন হয় সেখানে সামাজিক আদব-কায়দার দিকে দৃষ্টি করিতে নাই। ভক্তসঙ্গ, ভক্তসমাগমে আনন্দোৎসব এবং নামসংকীর্তন ভক্তিসাধনের উপায়। "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা"—ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের স্মরণ করাইয়া দিতেন।

ঠাকুরের আদেশে অধর কিছুদিন সন্ধ্যাকালে বৈষ্ণবচরণের পদাবলীকীর্তন শুনিতেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে তথায় আসিয়া বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতে আসিতেন। তখন কীর্তনের আসর জমিয়া উঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনেই অধরের বাড়ীতে উৎসব পড়িয়া যাইত। সকল ভক্তই তথায় মিলিত হইতেন। কোন কোন দিন ঠাকুরের আদেশে স্বামীজীও তথায় ভজন গাহিতেন। অধরের বাড়ীতে ঠাকুর এই ভাবে ভক্তের মজলিস বসাইতেন। বিজয়কৃষ্ণ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গগণ, মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র-প্রমুখ ভক্ত সমবেত ভাবে সংকীর্তনে, নৃত্যগীতে যোগদান-পূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ ও তাঁহার ভাবোন্মত্ত উদ্দাম নৃত্য ও মুহুর্মুহু সমাধি দর্শন করিয়া অতীন্দ্রিয় আনন্দের আস্বাদন করিতেন। এই অপূর্ব চিত্র দেখিতে রাস্তায় পর্যন্ত লোকের ভিড় হইত।

যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণ সহ অধরের বাড়ীতে যাইতেন তখন অধরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও ভগবানের পরিচর্যা। কীর্তনান্তে অধর পরম সমাদরে ঠাকুর ও ভক্তগণকে আহার করাইতেন।

ঠাকুর অধরের বাড়ীতে আহার করিতেন, কিন্তু অধর জাতিতে সুবর্ণবণিক বলিয়া ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন, আবার কেহ বা আহারের আয়োজন হইতেছে জানিয়া পূর্বেই চলিয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে উল্লেখ আছে—প্রিয়নাথ ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভ্রাতৃদ্বয়কে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি গো, তোমরা খেতে যাবে না?" তাঁহারা বিনীতভাবে জানাইলেন, "আজ্ঞে, আমাদের থাক্।" ঠাকুর সহাস্যে ভক্তদিগের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এঁরা

সবই কচ্চেন, শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ।" ভক্ত কেদার চট্টোপাধ্যায় একদিন অধরের বাড়ীতে কীর্তনান্তে বাড়ী যাইবার অভিপ্রায়ে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আসি।" ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অধরকে না বলে যাবে? অভদ্রতা হয় না?" কেদার উত্তর করিলেন, "আপনি যে কালে রইলেন তখন সকলের থাকাই হলো—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। আর সমাজে বিয়ে-থাওয়া তো আছে—গোল একবার তো হয়েছে।" বিজয় অমনি বলিয়া উঠিলেন, "একে রেখে যাওয়া"—ঠিক এমন সময় অধর ঠাকুরকে লইয়া যাইতে আসিলেন। বিনীতভাবে তিনি ঠাকুরকে জানাইলেন যে ভিতরে পাতা হইয়াছে। ঠাকুর উঠিয়া বিজয় ও কেদারকে তাঁহার সঙ্গে ডাকিয়া লইলেন। প্রসাদগ্রহণ করিবার পর কেদার কৃতাঞ্জলি হইয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাহিতেছেন, কারণ যেখানে ঠাকুর স্বয়ং আহার করেন সেখানে তাঁহার আপত্তি বা ইতস্ততঃ করা অনুচিত। কথাপ্রসঙ্গে কেদারকে ঠাকুর বলিলেন, "ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্নও খাওয়া যায়।" এখানে পরমভক্ত অধরের কথা কি! অবশ্য ঠাকুর একমাত্র বলরামের গৃহেই অন্নগ্রহণ করিতেন; কেন না 'বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন'—তাঁর শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা আছে।

কোন কোন সময় অধর নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইবার পর, অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। দিন দিন নানা কাজকর্মে অধর জড়িত হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে সাবধান করিয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, "মিটিং ইস্কুল আপিস এই সব নিয়ে থাকলে কি হবে? এসব অনিত্য। জানবে ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু, আর সব অবস্তু। এক মনে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়—মন প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হয়।" অধর নিবিষ্ট মনে নিরুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত ফেলো হিসাবে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাকে চিন্তা ও অধ্যয়ন করিতে হইত। অনারেবল এইচ্ জে রেনেল্ডস্ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার। আপিসের কাজকর্ম শেষ করিয়া অধরকে সেনেটের অধিবেশনে যোগদান করিতে হইত, সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও এই সব দিনে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারিতেন না। অধর প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে যাইতেন, কিন্তু ইস্কুল কমিটির বা সেনেটের অধিবেশন থাকিলে অধরের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "এসব অনিত্য। শরীর এই আছে এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।" ঠাকুর দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন যে অধর আর বেশীদিন ইহজগতে নাই—তাই একান্ত মনে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে বলিতেছেন। অধর শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যবাণী উৎকর্ণ হইয়া একাগ্র মনে শুনিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—'সংসারী জীব আমরা, কেমন করিয়া সব মন দিয়া ঈশ্বরকে ডাকিব?' অন্তর্যামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরের কথা বুঝিয়া অধরকে বলিলেন, "তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নেই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে। সব মনটা তার ডিম যেখানে সেইখানে পড়ে থাকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমৃতময় উপদেশ ও আদেশ অধর হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণা করিলেন।

পরে তিনি অতি বিনীতভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার অন্তরতম গূঢ় মর্মকথা ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন, "আমাদের বাড়ীতে আপনার অনেক-দিন যাওয়া হয় নাই। বৈঠকখানা ঘরে গন্ধ হয়েছে—আর যেন সব অন্ধকার।" স্বল্প কথায় ভক্ত অধর তাঁহার সরল প্রাণের আবেগ জানাইলেন। কথামৃতকার লিখিতেছেন, "ভক্তের এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের স্নেহ-সাগর যেন উথলিয়া উঠিল! তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবে অধর ও মাষ্টারের মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আর সস্নেহে বলিতেছেন, 'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি! তোমরাই আমার আপনার লোক।'

প্রথম হইতেই ঠাকুরের প্রতি অধরের গভীর অনুরাগ দেখিয়া মাষ্টার-মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে সংস্কারবশতঃ অধর তাঁহাকে অত ভক্তি করেন। কিন্তু সংস্কারের কথা মুখে বলিলেও তৎসম্বন্ধে মাষ্টার-মহাশয়ের স্পষ্ট ধারণা বা বিশ্বাস ছিল না। তাই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই মাষ্টার-মহাশয় সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই এই কথা ঠাকুরকে জানাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করিবার জন্য চারটি ফজলি আম হাতে লইয়া যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরের প্রবেশদ্বারে ফটকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ী করিয়া কলিকাতা রওনা হইতেছেন। ঠাকুর ফটক পার হইবার সময় মাষ্টার-মহাশয়কে দেখিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন। সহাস্যবদনে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমিও এস না, আমরা অধরের বাড়ী যাচ্ছি।" ঠাকুরের আদেশ পাইয়া মাষ্টার-মহাশয় উক্ত গাড়ীতে উঠিলেন। পথিমধ্যে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা অধরকে তোমার কিরূপ মনে হয়?" মাষ্টার-মহাশয় অমনি উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, তাঁর খুব অনুরাগ।" প্রসন্ন বদনে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি করে।"

একদিন অধর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখেন ঠাকুর ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া তন্ময়চিত্তে কীর্তন শুনিতেছেন। ঠাকুরের ঘরের বারাণ্ডায় কীর্তন হইতেছিল। অধর তথায় ভূমিষ্ঠ ভাবে প্রণত হইয়া উক্ত আসরের একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অধরের উপর যখন শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি পতিত হইল তখন তিনি শশব্যস্তে অধরকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া তাহার নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অধরকে দেখিলেই অহেতুককৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহসাগর যেন উথলিয়া উঠিত। ঠাকুরকে দর্শন করিলে অধরের হৃদয়ও প্রেম ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইত।

"মুক্তপুরুষ সংসারে কিরূপ অবস্থায় থাকে জান? যেমন ঝড়ের এঁটো পাতা। নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না। বাতাসে তাকে উড়িয়ে যে দিকে নিয়ে যায়, সেই দিকে যায়। কখনও বা আঁস্তাকুড়ে, কখনও বা ভাল যায়গায়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার-কার্যে স্বামী বিবেকানন্দ *

অনুবাদক—শ্রীনীরদকুমার রায়

ওয়াশিংটন শহরে আমাদের মহাসভার পুস্তকাগার-মধ্যবর্তী গুম্বজটিতে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে: "একটি প্রদীপ যেমন আর একটি প্রদীপকে জ্বেলে দেয়, অথচ তার আলো কমে যায় না, মহত্ত্বও তেমনি মহত্ত্বকে প্রজ্জ্বলিত করে।" সকল আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মধ্যে এই সত্যই নিহিত রয়েছে যে, কোথাও থেকে একটা আলোকের ঝলক বা একটু উত্তাপ কিংবা পবিত্র সবল সাধুতার একটা প্রাণপ্রদ দীপ্তি এসে আত্মাকে আলোকিত করে দেয়, এবং দেশ ও কালের অনন্ত ধারার মধ্য দিয়ে কত উৎসুক হৃদয়, কত ব্যাকুল চিত্ত সেই আলোকছটার স্পর্শ পেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে।

বেদান্তপ্রচার-কার্যের নেতা স্বামীজী সম্বন্ধে আমাদের আলোচনায় ভুললে চলবে না শ্রীরামকৃষ্ণকে—স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর শিষ্য ছিলেন এবং যাঁর কাছ থেকেই উদার আলোকের দীপ্তি তিনি নিজের মধ্যে ধরে নিয়েছিলেন; আর শ্রীরামকৃষ্ণের পশ্চাতে ছিল সেই মহান আলোক, সেই মূলসত্তা, সেই নিখিলের আত্মস্বরূপ।

পাশ্চাত্য দেশে আমরা সচরাচর সেই মূল সত্তাকে বলে থাকি "জগতের আলো" বা "তিমির-বিদারী আলোক"। আনন্দের ও বোধাতীত শান্তির উৎস সেই আলোকবার্তাই হচ্ছে সর্বত্র আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তি। ধর্ম ও জীবনদর্শনের এই মূল বার্তা যে সর্বত্র এক, বেদান্ত অধ্যয়ন করতে করতে সে জ্ঞান আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মায়। বেদান্তের মধ্যে যে চিন্তার স্পষ্টতা ও সূক্ষ্ম সঙ্গতি রয়েছে, তার যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা যায় না যে পর্যন্ত না অন্যান্য মতবাদও আলোচনা করা যায়। বেদান্ত কোনও কিছুকেই ছাড়েনি; যুক্তিসঙ্গত বা স্বতঃসিদ্ধ এমন কোন চিন্তাধারাই সে এড়িয়ে যায় নি যা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের উচ্চচিন্তার বিরোধী। মানুষের বাস্তব-সত্তাকে দেহ মন ও আত্মার একত্র সমাবেশে ঘটিত একটি যৌগিক পদার্থ বলে ধ'রে নিয়ে বেদান্ত দেখিয়ে দিয়েছে, কেমন ক'রে আমরা এই সমবায়ের প্রত্যেক অংশের উৎকর্ষ সাধন ক'রে উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের সত্তার প্রতি অংশ বিশ্বেরই প্রতি অংশের অংশস্বরূপ; বেদান্ত দেখিয়ে দিতে চেয়েছে কেমন করে আমরা প্রত্যেকে জানতে পারি, আমি সেই-ই —তৎ ত্বম্ অসি।

যাতে আমরা সেই বোধ লাভ করতে পারি, বেদান্ত তাই আমাদের কাছে এমন সব উপদেষ্টা পাঠাচ্ছেন যাঁরা সেই আলোকের সন্ধান পেয়েছেন, যে আলোক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সংঘকে অর্পণ করে গিয়েছেন। তিনি সর্বদাই আমার চিন্তায় 'সতেজ প্রাণবন্ত বিবেকানন্দ'-রূপে অঙ্কিত হয়ে আছেন। তার কারণ বোধ হয় এই তাঁর প্রোজ্জ্বল চোখ দুটিকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম।

যখন আমি ছোট বালিকা মাত্র তখন

* স্বামীজির ভক্ত হেনরিয়েটা হোমস্ ব্রাউন্ কর্তৃক ১৯৩৩, সেপ্টেম্বরের 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

আমি যে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন কর্ণেল ফ্রান্সেস্ পার্কার, যাঁর শিক্ষাকার্যের খ্যাতি ছিল দেশবিদেশ জুড়ে। প্রতিদিন সকাল বেলায় বিদ্যালয়ে সকলে সমবেত হতো প্রার্থনাগৃহে। সেখানে প্রায়ই কোন বিশিষ্ট আগন্তুক এসে স্বল্প কথায় আমাদের কিছু শোনাতেন। এমনি এক উপলক্ষে একদিন আমাদের দীর্ঘাকৃতি কর্ণেল পার্কারের সঙ্গে আর একটি মহিমান্বিত মূর্তিকে আসতে দেখে আমরা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাঁর পরিধানে ছিল লম্বা পোষাক এবং মাথায় ছিল পাগড়ী। আমরা একটি গান গাইলাম এবং কর্ণেল পার্কার একটি প্রার্থনা পাঠ করলেন। তার পর স্বামীজী আমাদের কিছু বললেন। আমি তখন নেহাত ছোট ছিলাম, তিনি কি বললেন কিছুই মনে নেই; কিন্তু মনে আছে, সেই প্রকাণ্ড ঘরখানি কী শান্তিপূর্ণ, কি প্রদীপ্ত তাঁর চোখ দুটি, আর কী স্নিগ্ধগম্ভীর তাঁর কণ্ঠধ্বনি! কথা শেষ করে তিনিও একটি প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করলেন; তার পরেই তিনি কর্ণেল পার্কারের সঙ্গে বেদী থেকে নেমে সেই সভাগৃহের মধ্য দিয়ে যেতে লাগলেন। একটি হিন্দু বালক, আমার শ্রেণীরই ছাত্র—এর বাপ-মা কর্ণেল পার্কারের শিক্ষাপ্রণালী আয়ত্ত করবার জন্য এখানে এসে তখন বাস করছিলেন—ধারের দিকে আমারই পাশে বসে ছিল। স্বামীজী যেমনি তার পাশ দিয়ে গেলেন, অমনি সে ঝুঁকে তাঁর আলখাল্লার প্রান্ত চুম্বন করলো। তাকে এরকম করতে দেখে আমার এমন বিস্ময় লাগ্‌লো যে আমি তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি অমন করলে কেন? উনি কে?" বালক উত্তর দিল, "উনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ; আমার দেশের এক জন খুব বড় মহাত্মা।" আমি বললাম, "মহাত্মা এখন কোথায় পাবে? এখন সে সব নেই।" সে বল্‌লো, "এখানে তোমাদের দেশে নেই, কিন্তু আমাদের ভারতে এখনও তার অভাব নেই।"

আমার পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়তে পড়তে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে স্বামীজী একদিকে পাশ্চাত্য চিন্তা ও আদর্শসকলের মর্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, অন্য দিকে প্রাচ্যের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। এই দুইয়ের সংযোগে তাঁর মধ্যে এসেছিল এমন একটা সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী যা সর্বত্র সকলকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতো। পাশ্চাত্যদেশে তিনি যে এক মহোদার ঐক্যের বাণী এনেছিলেন তাতে তিনি মানুষকে মুগ্ধ ও বশীভূত করে ফেলেছিলেন। আর তিনি যখন ভারতবর্ষে ফিরে গেলেন তখন তিনি তাকে দিলেন এমন এক সক্রিয় বেগবান শক্তির স্পন্দন যা ভারতের আজকার জাগরণের সূত্রপাত করে দিল। তিনি ছিলেন ভারতের মশালধারী, এবং সেই আলোকপিণ্ড হাতে নিয়ে তিনি ভারতকে ডেকে বলেছিলেন, "ওঠো! জাগো! এগিয়ে চল!" তাঁর সেই আহ্বান-মন্ত্রের সুরই আজ পাশ্চাত্যদেশে আমাদের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে তাঁরই সংঘের যাঁরা এখানে আসছেন তাঁদের কণ্ঠ দিয়ে। তাঁরা এখানে কোন দুর্বোধ্য গুপ্তরহস্যের ব্যবসা ফাঁদতে বা অলৌকিক কিছু দেখাতে আসেন না। তাঁরা আসেন সবল উদার তপস্যাপূত মন নিয়ে, তাঁদের উত্তরাধিকারলব্ধ প্রাচীন সংস্কৃতির গভীর জ্ঞান নিয়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিয়ে। জীবন তাঁদের উচ্চ আদর্শে গঠিত, আচার তাঁদের প্রীতিপ্রদ, মার্জিত তাঁদের রুচি; তাই তাঁরা মানুষকে কখনো অলীক সুলভ পথ দেখিয়ে প্রতারিত করতে চান না বা নিজেদের অদ্ভুত কোন ক্ষমতার

ঢাক বাজান না। বেদান্ত আমাদের কাছে এমন সব ব্যক্তিকে পাঠান যাঁরা জ্ঞানগর্বী ন'ন, যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা বা কৃতিত্বের গুরুত্বে স্ফীত হন না। এমন লোকই আসেন যাঁরা সকল দেশ-কালের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছেন, যাঁরা নম্রহৃদয় ও সরল প্রীতি নিয়ে সেবা করতে আসেন। আমাদের কোন মত বা ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ বা পরিবর্তন করতে তাঁরা বলেন না ; যে সব সত্য আমাদের কাছে অতি অস্পষ্ট ছিল, তাঁদের প্রখর সন্ধানী আলোক ফেলে তাঁরা সেই সকল সত্যকে আমাদের সামনে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেন। বহু বৎসর ধরে দর্শন ও মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার পর আমি দেখলাম, বেদান্তের মত এমন সরল, স্পষ্ট ও সাধনোপযোগী উপদেশ আর কোথাও পাওয়া যায় না। আর, যতই দিন যাচ্ছে ততই এই কথাটা আমার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে, জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, পাশ্চাত্য চিন্তানেতাদের মন কিছু না কিছু বেদান্তের শিক্ষার স্পর্শ পেয়েছে। তা ছাড়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এই যে একটা চিন্তার ঐক্য দেখতে পাচ্ছি, এই থেকেই আমি বুঝতে পারছি যে এমন একদিন আসবে যে দিন এই মূল ঐক্যটুকুই হবে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে পরস্পরের সত্য পরিচয় ও যথার্থ ভ্রাতৃত্বস্থাপনের ভিত্তিস্বরূপ।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে আমাদের স্বাধীনতা-বোধের যে অপূর্ব্ব প্রকাশ, তারই মূর্ত্ত ছবি প্রতিফলিত হয়েছে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর বিশেষ সমাদর-প্রদর্শনে।

১৯৪৭ সালে বঙ্গীয় সংস্কৃত-সমিতির সমাবর্ত্তন-অভিভাষণে আমি বলেছিলাম—"আমাদের মূল লক্ষ্য বঙ্গীয় সংস্কৃত-সমিতি ও সংস্কৃত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। বর্ত্তমানে এই পরিষৎ পরীক্ষাগ্রহণসমিতি-মাত্র। কিন্তু আমরা চাই সংস্কৃত সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাবিভাগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুযায়ী এবং তুলনামূলক প্রাচ্য গবেষণাদির সর্ব্ব সুযোগ-সম্বলিত গবেষণাবিভাগ, গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ প্রভৃতি সম্বলিত একটি পূর্ণায়তন বিশ্ববিদ্যালয়।"

সুখের বিষয় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে মাননীয় বিচারপতি ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সুধীবৃন্দ যে সংস্কৃত বিদ্যোন্নয়ন সমিতি গঠিত করেন, সে সমিতিও পাঁচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনই মৌলিক লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন।

এই সমিতির সদস্যবৃন্দের সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে

গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ১৯৪৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গীয় সরকার বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতিকে "বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষৎ" এই নূতন নামে অভিহিত করে বহুল সংস্কৃতোন্নয়ন কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ব্রতী হন। বঙ্গদেশের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী ও সংস্কৃতানুরাগি-বৃন্দের লক্ষ্যীভূত এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের দিক্ থেকে এটি যে অবশ্য শুভ সূচনা তদ্‌বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিগত কয়েক মাসের মধ্যে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে কয়েক জন নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত এবং নবদ্বীপে একটি নূতন সংস্কৃত টোল সংস্থাপিত হয়েছে। দশটি বড় টোলে মাসিক ৭৫৲ টাকা এবং নব্বইটি অন্যান্য টোলে মাসিক ৫০৲ টাকা হারে বৃত্তিপ্রদান করা হয়েছে। এতদ্‌ভিন্ন বাৎসরিক দশ হাজার টাকা যা' পূর্ব্বে Imperial grant নামে চল্‌তো—তাও এবার বৃত্তি হিসাবে ১২৫ জন পণ্ডিতকে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব্বে পণ্ডিতমণ্ডলীকে যে মাগ্‌গি ভাতা দেওয়া হতো, তা থেকে অনেক অধিকসংখ্যক পণ্ডিতকে মাগ্‌গি ভাতা দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, কর্পোরেশন এবং ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডসমূহও উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক পণ্ডিতকে সাহায্য প্রদান করবেন। সরকারের পরিকল্পনানুসারে কণ্টাইতে সরকারী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলে এবং অনলস সংস্কৃতসেবী পণ্ডিত-ধুরন্ধরদের নিমিত্ত আজীবন বৃত্তি গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হলে পণ্ডিতমণ্ডলীর ক্লেশের আরো লাঘব হবে, সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের আরো অভিমত এই যে, যদি অর্থের সংকুলান হয়, তাহলে প্রতিবৎসর আরো দশটি অধিকসংখ্যক ছোট টোল এবং দুইটি অধিকসংখ্যক বড় টোলে মাসিক যথাক্রমে ৫০৲ টাকা ও ৭৫৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করবেন। যাতে সর্ব্বসমেত ১৪০টি ছোট এবং ৩০টি বড় টোল বৃত্তি পেতে পারে, ভগবান্ এই পরিকল্পনা সার্থক করে তুলুন।

আমাদের আদ্য পরীক্ষায় ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক এই বিষয়ত্রয়কে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজ আর এ বিষয়ে কারো মতদ্বৈধ নেই যে, পাঠ্যতালিকায় এই বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্তি পণ্ডিতসমাজের পক্ষে প্রভূতকল্যাণ-প্রসূ হবে। এই সমস্ত বিষয়-ব্যপদেশে সংস্কৃতের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক সুসংস্থাপিত হবে এবং উত্তরজীবনে আমাদের ছাত্রসমাজ এতে বিশেষ উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

বর্ত্তমানে আমাদের আবশ্যক:

(১) একটি স্থায়ী নিজস্ব বাসভবন।

(২) একটি গবেষণা-বিভাগ।

(৩) একটি গ্রন্থাগার। পূর্ব্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু পণ্ডিতমণ্ডলী যে সমস্ত অমূল্য পুঁথি ও গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন, সেই সমুদয়ের সংরক্ষণও অত্যাবশ্যক।

বিশেষতঃ সরকারী বৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক যে ২২৫টি টোল পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড প্রভৃতি যে সকল টোলের অর্থসাহায্য-বিধানপূর্ব্বক পরিচালনায় সহায়তা করছেন, পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারও মাগ্‌গি-ভাতা প্রদানপূর্ব্বক যে পাঁচ শতাধিক টোলের সংরক্ষণে তৎপর হয়েছেন, এই সমস্ত টোলের দরিদ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সর্ব্ববিধপঠন-পাঠনের সুযোগ-সুবিধাদানের নিমিত্ত সমিতির একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থালয় স্থাপন আচিরে প্রয়োজন। পণ্ডিতমণ্ডলী অশেষ দুঃখ-দারিদ্র্য সত্ত্বেও যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তৎসমূহের সংরক্ষণও এ গ্রন্থালয়ের অবশ্য লক্ষ্যীভূত হবে। এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, সরকারের বিশেষতঃ সংস্কৃতানুরাগী দেশবাসীর সহায়তা ও সৌজন্যে এ গ্রন্থাগার অচিরেই প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা-গ্রন্থাগার রূপে পরিগণিত হবে।

(৪) গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ স্থাপন। ১৯৪৮ সালে উদ্বাস্তু পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। তদ্ভিন্ন আমাদের পরিষদের পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তকাবলীর অধিকাংশই ছাপা নেই। এইজন্য গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ স্থাপন অবিলম্বে অত্যাবশ্যক। বলা বাহুল্য, এতে যে কেবল ছাত্র ও সংস্কৃতানুরাগি-বৃন্দের উপকার সাধিত হবে তা নয়, পরন্তু পরিষদের ভবিষ্যৎ আয়েরও একটি প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বিত হবে নিঃসন্দেহ।

(৫) পরিষদের মুখপত্র-রূপে সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজী রচনা সংবলিত একটি গবেষণা-পত্রিকা পরিচালনা। এই পত্রিকাই ভারতের সর্ব্বত্র যত চতুষ্পাঠী ও কেন্দ্র আছে, সেই সব কেন্দ্রের ছাত্র, অধ্যাপক ও হিতৈষি-বৃন্দের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সংযোগসূত্র সংস্থাপনের অন্যতম উপায়। তদ্ব্যতীত, সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতজ্ঞান-সম্প্রসারণের নিমিত্ত এ পত্রিকা পরিচালনা অত্যাবশ্যক।

(৬) বৃদ্ধ, অসমর্থ, অতি দুঃস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিমিত্ত একটি স্থায়ী সাহায্যভাণ্ডার-সংস্থাপন। বিশেষতঃ যাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যানু-শীলনের নিমিত্ত প্রথিতযশাঃ, অথচ বর্ত্তমানে জীবিকার্জ্জনের উপায়বিহীন, তাঁরা যাতে পর-মুখাপেক্ষী না হয়ে সসম্মানে বাকী জীবন অতি-বাহিত করতে পারেন, তজ্জন্য তাঁদের নিয়মিত মাসিক বৃত্তি প্রদান অত্যাবশ্যক।

(৭) বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে সরকারী টোল স্থাপন। কাঁথিতে অচিরে সরকার-পরিচালিত টোল-স্থাপন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(৮) আয়ুর্ব্বেদ, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষাপ্রচলন-ব্যবস্থা এবং সংস্কৃত, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক ও সংস্কৃত সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস-বিরচনের ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবসম্পদ সংস্কৃত। এই সংস্কৃতই ভারতবর্ষীয় সমস্ত ভাষার জীবন-রূপে সর্ব্বজনবন্দ্য। এই সংস্কৃতেই ভারত-জননীর পূর্ণরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতানু-শীলনে তাই যাঁরা দত্তপ্রাণ, তাঁদের আমি স্তুতি-নিবেদন করি। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষই দেখাবে মুক্তির পথ। ভারতবর্ষের শাশ্বত শান্তি, প্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর অমৃতময়ী বাণী সমগ্র বিশ্বে আজ প্রচারিত হোক এবং তারই ধারক ও বাহক গীর্ব্বাণবাণীর অশেষ মহিমা দিগ্‌দিগন্তে উদ্ভাসিত হোক্। আজ এই পরম হর্ষদিবসে ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করি—

> "গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
> ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
> স্বর্গাপবর্গসম্পদ্মার্গভূতে
> ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।"
>
> —বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।২২।২৪

অর্থাৎ অন্য সব দেশ ভোগভূমি, ভারতবর্ষ কর্মভূমি; তাই দেবতাদের মধ্যেও ভারতবর্ষের এই পৌরগীতি প্রচলিত আছে যে, ভারতভূমি হচ্ছে স্বর্গ ও ধর্ম্মাদি অপবর্গ-লাভের মার্গস্বরূপ। সেই ভারতভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা দেবতার চেয়ে ধন্য।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মাতৃভাব

স্বামী শ্যামলানন্দ

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শেষ জীবনে যে কেহ তাঁহার দিব্য সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার কৃপা ও আশীর্বাণী-প্রভাবে সংসারের শোক-তাপ ভুলিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। মহাপুরুষজী আজীবন কঠোর তপস্বী ছিলেন এবং লোকালয়, লোক-সংসর্গ ও কর্ম-কোলাহল হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। শেষজীবনে এক বিরাট সংঘের অধিনায়ক-পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার নায়কত্বাভিমান ও ক্ষমতা-প্রিয়তার লেশমাত্র ছিল না—তাহার স্থলে ছিল তাঁহার মায়ের মত সকলের প্রতি ভালবাসা। সে প্রেম অনন্ত, অফুরন্ত। পতিহীনা স্ত্রী, পুত্রহীনা মাতা, বিষয়সম্পত্তি-হারা ভাগ্যহীন ব্যক্তি—সকলেই তাঁহার কাছে আসিয়া শোক-তাপ ভুলিয়া সান্ত্বনা পাইত; তাহাদের দৈনন্দিন জীবন শোকতাপের মধ্যেও পুনঃ আনন্দময় হইয়া উঠিত। যে কেহ জীবনে অন্যায় করিয়াছে, পাপ করিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য তাহার হৃদয়ে অনুশোচনা আসিয়াছে—সে-ই তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছে এবং প্রাণে শান্তি পাইয়াছে। তাঁহার নিকট ঘৃণা বলিয়া কিছু ছিল না। পাপি-তাপীকে কোল দিবার জন্যই যেন তাঁহার জীবনধারণ।

এই মাতৃভাব-প্রসূত ভালবাসা বা বাৎসল্য কোথা হইতে আসিল? এই পুরুষ-প্রবরে কিরূপে মাতৃভাব জাগিল—এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয়। ইহার উত্তরে আমরা তিনটি বস্তু দেখিতে পাই। প্রথম তাঁহার জননীর শিক্ষা, দ্বিতীয় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মাতৃভাবের সম্পর্ক, তৃতীয় তাঁহার অদ্বৈতানুভূতি।

মহাপুরুষ মহারাজের বাল্যকালেই মাতৃ-বিয়োগ হয়। তিনি বেশী দিন মাতৃস্নেহ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে অল্পকাল তিনি মাতৃসংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার মাতা অত্যন্ত দয়াবতী ও স্নেহপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে ২৪।২৫ জন ছাত্র বাস করিত। তাঁহার মাতা এই ছাত্রদিগকে ও তাঁহাকে সমভাবে স্নেহ করিতেন। মহাপুরুষ মহারাজ একমাত্র পুত্র-সন্তান হইলেও মাতা তাঁহাকে পৃথকভাবে যত্ন বা আদর করিতেন না। তাঁহার মাতৃদেবী নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। ছাত্রদের যত্নের ত্রুটি হইবে ভাবিয়া তিনি বাড়ীতে পাচক-নিয়োগ করিতে চাহিতেন না। সারাদিন রন্ধন-কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া পুত্রের প্রতি মনোযোগ দিবার তাঁহার অবসর থাকিত না। পুত্র অনাদৃত হইতেছে দেখিয়া প্রতিবেশীরা তাঁহার নিকট অনুযোগ করিত। তদুত্তরে তিনি বলিতেন—সকল ছাত্রই তাঁহার সন্তান, কাহাকেও তিনি পৃথকভাবে আদর-যত্ন করিতে পারেন না। মহাপুরুষ মহারাজ তখন অল্পবয়স্ক হইলেও স্নেহময়ী মায়ের এই ঔদার্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। উহাই তাঁহার চরিত্রে প্রতিফলিত মাতৃভাবের অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

তিনি বাল্যে মাতৃহীন হন। এই জন্য হয়ত তাঁহার অন্তরে মাতৃস্নেহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল। অন্তর্যামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাতৃস্নেহ

দিয়া আকর্ষণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ছিল মাতাপুত্র-সম্পর্ক। বাহিরে ইহার বিশেষ প্রকাশ না থাকিলেও মহাপুরুষ মহারাজের কথার মধ্যে ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনেই ইহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রাণের আবেগে শ্রীরামকৃষ্ণের কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরপুর হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ পুরুষ কি স্ত্রী—তাঁহার কিছুই মনে আসিল না। তিনি তিনি শুধু দেখিলেন—সাক্ষাৎ স্নেহময়ী মা, কত আপনার জন; তাঁহার চাহনিতে কত করুণা, কত স্নেহ!

মহাপুরুষ মহারাজ নিজেও বলিয়াছেন "ঠাকুর আমাকে ছেলের মত দেখতেন। পরে যখন তাঁকে দর্শন করতে যেতাম, তখন সাধারণের মত দূর থেকে প্রণাম না করে তাঁর কোলে মাথা রেখে প্রণাম করতাম। তাঁর হৃদয়ও বাৎসল্যে ভরে উঠত। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কত আদর করতেন, ঠিক যেমন মা তাঁর সন্তানদের আদর করেন। সে কি দিব্য অনুগ্রহ! একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমাকে তোর কেমন মনে হয়?' আমি বললাম—'কেন, আপনি যে আমার চিন্ময়ী মা।' তখন স্বর্গীয় হাসিতে তাঁর মুখ-মণ্ডল ভরে উঠল।" কোনও ভক্তের নিকট তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই পর্যন্ত জানিয়া রাখ যে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) আমাকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন—আর বেশী জানিবার দরকার নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে মাতৃস্নেহ লাভ করিয়াই তাঁহার জীবন পরিসমাপ্ত হয় নাই। উত্তরকালে তিনি নিজেও মা-ময় হইয়া গিয়াছিলেন। মা বই তিনি আর কিছু জানিতেন না। সমগ্র জগতের মধ্যেও মাতৃরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমি ঠাকুরকে মা-ই বলতাম। এখনও তাই। তবে এখন সেই মা অনেক বড়—বিরাট হয়ে গেছেন। এ সবই তিনি। এখন—'ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী'—সবই তাঁর উদরের ভেতর।" ইহাই তাঁহার অদ্বৈতানুভূতি।

উত্তরকালে তিনি সব সময়ই মাতৃভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মাতৃভাবে বিভোর ছিলেন, কথাবার্তায় যেমন মায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, মহাপুরুষজীও তাই। তিনিও 'মা' 'মা'-ই করিতেন, মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। মঠে মার (কালী, দুর্গা ইত্যাদি) পূজা বা মাতৃভাবো-দ্দীপক সঙ্গীতাদি হইলে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন। একদিন তাঁহার সম্মুখে মায়ের গান হইতেছিল, তিনি নিজকে সামলাইতে না পারিয়া গায়ককে বলিলেন—"যা, যা—পালা, পালা! হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলি! এ যেন শুক্‌নো দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলতেন 'একটুকুতেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠে—তাই হয়েছে।" মঠের পূজাদিতে মায়ের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া তিনি বলিতেন, "দেখলাম সবই মা—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'।"

শেষ বয়সে তাঁহার শরীরের অবস্থা প্রায়ই খুব খারাপ থাকিত। তাঁহাকে হাঁপানিতে অত্যন্ত ভুগিতে হইত, রাত্রে নিদ্রা ছিল না। দিনেও ব্যাধির প্রকোপ কম হইত না। কিন্তু তিনি সদা আনন্দময় ছিলেন—কাহাকেও ব্যাধির কথা বলিতেন না। শারীরিক অবস্থার

কথা জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতেন—"শরীরের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ? ও ভাল নয়; আমি ভাল আছি। I am ever ready to jump into Mother's lap—মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য সর্বক্ষণ তৈরি হয়ে আছি।"

তাঁহার এই মাতৃভাবের বিরাম ছিল না। উহা উচ্চ-নীচ, সাধু-অসাধু, ভদ্র-অভদ্র, আত্মীয়-অনাত্মীয়, সকলের উপর সমভাবে বিস্তৃত ছিল। তিনি বৃদ্ধ অক্ষম চলচ্ছক্তিবিহীন, কিন্তু এই অবস্থায়ও মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের, অতিথি-অভ্যাগতদের, চাকর-বাকরদের, প্রতিবেশী বাগদী হাড়ী সাঁওতালদের খোঁজখবর লইতেন; দুঃখীদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন; মঠের গরু কুকুর পাখী প্রভৃতি জীব-জন্তুদের খবর লইতেন, খাবার দিতেন। তিনি যেন চতুর্দিকে প্রেমের সংসার বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন! মা যেমন শুভ-কামনা ও শুভকর্মই করেন—অশুভ কামনা বা অশুভ কর্ম করিতে পারেন না, তিনিও সেইরূপ। কেহ কেহ অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াও তাঁহার নিকট ক্ষমা ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে। ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ সত্ত্বেও তিনি অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে প্রেম ছিল, হিংসাদ্বেষ ছিল না। সকলকে ভালবাসিয়া, উপকার করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট। প্রত্যুপকারের কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। কত লোক তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মঠের সাধুদের অসুখ হইলে তাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইত, তিনি কাতর কণ্ঠে বলিতেন, "মা, এরা বালক—এদের উপর ঝড়-ঝাপটা দিও না, এরা কি সইতে পারবে? আমি বরং সইতে পারি—এরা তো বালকমাত্র।" তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী-লেখক বলিতেছেন "'বাবার' কাছে সকলেরই সমান অধিকার। কেহ শূন্যহাতে ফিরিতেছে না। হয় নগদ টাকা, নয় বস্ত্র, আর তাহা না হইলে ফলমিষ্টি প্রত্যেককেই দেওয়া চাই। 'মহারাজ, অমুক যায়গায় অমুক মেয়েটির বড় অসুখ—কিছু দিতে হবে।' 'কত?' 'দশটাকা'। 'আচ্ছা নে যাও'। 'মহারাজ, চাকরী নেই—বড় কষ্ট।' 'আচ্ছা, ভয় নেই—চাকরী হবে। আপাততঃ পঁচিশ টাকা নিয়ে যাও।' এরূপ যাচ্ঞা এবং সহাস্যমুখে তাহার পূরণ নিত্যকার ঘটনা ছিল।"

তাঁহার সম্বন্ধে জনৈক আমেরিকাবাসী ভক্ত লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষজীর প্রেমের ধারণাই ছিল অত্যদ্ভুত। উহা সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হইত, সকলকে সমান করে দিত। উহা ক্ষুদ্রতমকে মহান্, মহান্‌কে মহত্তম ও পবিত্রতম করতো। তাঁর জার্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকান, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও জরথুষ্ট্রীয় ভক্ত শিষ্যগোষ্ঠী হতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও কৃষ্টির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীরেখা-বিবর্জিত হয়েছিলেন। একমাত্র মানব-দেহে ভগবানই এরূপ অতীব বিস্ময়কর কার্য সম্পন্ন করতে পারেন।"

"গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি—গাঁট। বিবেক-বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা, অহংকারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র।"—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী আত্মানন্দ

স্বামী বোধানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে স্বামী আত্মানন্দ একজন প্রধান। ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্যে তিনি সর্ব্বোচ্চ ছিলেন বলিলে অযথা হইবে না। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। খুব কঠোরী হইলেও সুরসিক ছিলেন। আমাদের সঙ্গে চলিত কথায় কতই না ব্যঙ্গ করিতেন! তিনি বেশ তবলা ও পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। অনেক বার স্বামী বিবেকানন্দের গানের সঙ্গে তিনি সঙ্গত করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খ্রীঃ স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে যখন কাশীতে দেখা হয় তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর তোমার দ্বারা বক্তৃতা করাইয়া লইতেছেন।' তিনি শেষ কয়েক বৎসর উদরাময় রোগে ভুগিয়াছিলেন এবং উহাতেই তাঁহার শরীরত্যাগ হয়। তিনি ভারতের সমস্ত প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আজন্ম নিরামিষাশী থাকা সত্ত্বেও এবং ধূমপানাসক্ত না হইলেও আবশ্যক হইলে অপরের জন্য মৎস্যাদি পাক করিতে ও তামাক সাজিতে বিমুখ ছিলেন না।

তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল গোবিন্দচন্দ্র শুকুল। মধ্যভারতে তাঁহার পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল। তাঁহার পিতামহ বা পিতা কার্য-উপলক্ষে মালদহে বাস করেন। স্বামী আত্মানন্দের জন্ম ঐ স্থানেই হয়। তিনি বেশ হিন্দি ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন। তাঁহার বাংলাতেও একটু হিন্দীর যোগ ছিল। মালদহ হইতে ১৮৯০ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় রিপন কলেজে পাঠ আরম্ভ করেন। সেই সময় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বেশ মেধাবী ও মনস্বী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফল ভালই হইত।

ঐ বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যদের সঙ্গে মিলিবার আমার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে। স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও আরও ৫।৭ জন মিলিয়া আমরা কাঁকুড়গাছির সমাধি-মন্দিরে, বরাহনগর মঠে ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দর্শনার্থ যাইতাম। সেখানে রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তের ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ স্বামীদের সঙ্গলাভ হয়। ঐ সময় কিন্তু স্বামী আত্মানন্দ আমাদের ঐ কার্যে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইতেন না। পরে আমাদের সঙ্গে ঐ সকল স্থানে যাতায়াত এবং উক্ত ভক্তদের ও স্বামীদের সঙ্গলাভে তাঁহার মন পরিবর্তিত হয় এবং আমাদের সঙ্গে তিনি আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে সংবদ্ধ হন।

১৮৯৩-৯৪ খ্রীঃ বি-এ পড়িবার সময় তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তখন তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া ধ্যান-ধারণাদি লইয়াই থাকিতেন। ঐ সময় তিনি আমার পূর্বাশ্রমের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বাস করিতেন। সেই বাড়ীর কয়েকটি ছেলে স্কুলে পড়িত। তিনি বিনা বেতনে তাহাদের পড়াশুনায় সাহায্য করিতেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতের আদেশ মত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর-

বাড়ীতে থাকিয়া তিনি সাধন-ভজন করিতেন। তখন স্বামীরা আলমবাজারের মঠে থাকিতেন। স্বামী আত্মানন্দ দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রায়ই মঠে আসিতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আলমবাজার মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি স্বামী আত্মানন্দকে বেশ্ পছন্দ করিতেন। তাঁহার আদেশে স্বামী আত্মানন্দ মঠেই থাকিয়া গেলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি বাংলায় আসিবার পর আলমবাজার মঠেই অধিকাংশ সময় থাকিতেন এবং নিয়মাদি করিয়া রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে ঐ সময় হইতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ উক্ত সংঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠান পরে রামকৃষ্ণ মিশন নামে প্রসিদ্ধ হয়। স্বামী আত্মানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য ভাব ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন। ঐ বৎসর মে বা জুন মাসের প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যান।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময় হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত আমরা অনেক সময় একত্রে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিতে লীন হন। তারপর স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্বামী আত্মানন্দ প্রায় দুই বৎসর বেলুড় মঠে ঠাকুর-ঘরের পূজাকার্য অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সহিত সমাধা করিয়াছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহকারী হইয়া তিনি 'উদ্বোধনে'র কার্যও কয়েক মাস করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে আমি যখন মান্দ্রাজ যাই তখন স্বামী আত্মানন্দ বাঙ্গালোরে ছিলেন। মান্দ্রাজে ২।১ সপ্তাহ থাকিবার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাকেও বাঙ্গালোরে পাঠান। সেখানে তখন আমরা তিন জন ছিলাম। স্বামী বিমলানন্দ স্বামী আত্মানন্দের প্রধান সহকারী; আমিও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতাম। সেখানে তিন জন স্বামীর থাকা আবশ্যক ছিল না। সেইজন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী আত্মানন্দকে মান্দ্রাজে লইয়া যান।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমেরিকা যাইবার জন্য আমাকে চিঠি দ্বারা সংবাদ পাঠান। তাঁহার আদেশ মত মার্চ মাসে আমি কলিকাতা যাত্রা করি। যাইবার পথে প্রায় এক সপ্তাহকাল মান্দ্রাজ মঠে ছিলাম। সেই সময় স্বামী আত্মানন্দের সঙ্গে খুব আনন্দে থাকিতাম। তখন জানিতাম না যে, এই শরীরে তাঁহার সঙ্গে আমার আর দেখা হইবে না। কিন্তু তাঁহার সেই দিব্যমূর্তি আমার মনের সম্মুখে এখনও বিরাজ করিতেছে। আমি করজোড়ে তাঁহাকে নমস্কার করি। তাঁহার পুণ্যজীবন আমাদের এক জলন্ত আদর্শ। উহা ধর্মমার্গের পথিকদের ধ্রুবতারা-সদৃশ। স্বামী আত্মানন্দের জীবনচরিত পড়িয়া পাঠক ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। তাঁহার চরণে আবার নমস্কার করি। অলমিতি বিস্তরেণ। ওঁ তৎ সৎ।

বেদান্ত সোসাইটি
৩৪ ওয়েষ্ট ৭১ ষ্ট্রীট
নিউইয়র্ক

বোধানন্দ
১৪ই এপ্রিল, ১৯৫০

রবীন্দ্র-কাব্যে নদীর রূপ

শ্রীশঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অনেকখানি সময় নদীর বুকে কাটিয়েছিলেন। পদ্মার বুকে তিনি যতদিন ছিলেন ও যাওয়া-আসা ক'রতেন, তা' সত্যিই কবিজনোচিত মাধুর্যে ভরা। নদীর প্রতি একটা গভীর ভালবাসা, নদী সম্বন্ধে একটা সু-স্পষ্ট অনুভূতি তাঁর অনেক কবিতাতেই রূপ পেয়েছে। অনেক জায়গায় নদীকে ঘিরে তার আশ-পাশের গ্রামের ছবি মূর্ত হ'য়ে উঠেছে কবির কবিতাতে। নদীর এই রূপ যে কোন সাহিত্যেই বিরল। তার ভয়ংকর শান্তিময় নানা রূপই চিত্রিত ক'রেছেন কবি; এই ছবিগুলো স্বতই পাঠককে টেনে নিয়ে যায় একটা আনন্দময় এবং বিস্ময়কর পরিবেশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ ছবি দেখতেন, প্রকৃতিকে উপভোগ ক'রতেন, তা' শুধু দেখা বা উপভোগ করার খাতিরেই নয়। তিনি প্রকৃতির সাথে নিজের একটা অবিচ্ছিন্ন একাত্মতা অনুভব ক'রতেন। তাঁর জীবন-দর্শনের মূল কথাই হোলো—জগৎকে, জগতের আলো-হাওয়া আর মানুষকে ভালবাসা। এই ভালবাসা জগতের সাথে একাত্ম না হ'লে জন্মায় না। তাঁর কথায়—"...এই জীবন-যাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি, তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি: তখন মাটিকে মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দ-গানে বহিয়া গেছে।" (আত্মপরিচয়)

আমরা অতি সুন্দর ছবি পাচ্ছি এখানে:

"আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।

সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে
পুলকে উছলি, ঢেউ ছলছলে
লক্ষ মানিক ঝলকি' আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলী।

মৃণাল ভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।"

(সামান্য ক্ষতি)

নদীর দুটো রূপ দেখতে পাই আমরা—একটা দৃশ্যময়, অপরটা বাঙ্ময়। এই দুটো ছবিই কবি নিপুণ হাতে এঁকেছেন ওপরের ঐ কবিতাংশটিতে। নদীর এই চঞ্চল, যৌবনাকুল ছবিটি পাঠকের মনে এক বিরাট বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অতি সুন্দর, উচ্ছ্বসিত, ভীতিপূর্ণ ছবি পাওয়া যায় 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটিতে।

"........জল শুধু জল

....

মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা, তুলি' লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।"

আবার—

"....চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। দিগন্তরে যায় দেখা
অতি দূর তটপ্রান্তে নীল বনরেখা ;—
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে।"

'নিষ্ফল উপহার' এও তাই—

"নিম্নে আবর্ত্তিয়া ছুটে যমুনার জল
দুই তীরে গিরিতট, উচ্চ শিলাতল।
সঙ্কীর্ণ গুহার পথে মূর্চ্ছি' জলধার
উন্মত্ত প্রলাপে গর্জ্জি উঠে অনিবার।

'নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী'র সাথে নদীর সম্বন্ধ নিবিড়, প্রাচীন, তাই কবি অনেক স্থানে নদীতীরের প্রাণবন্ত, সজীব পৃথিবীকে এঁকেছেন।

"নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল ;"
('ঘণ্টা বাজে দূরে')

"দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে
দুধারে ঘন-বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।"
('বধূ', 'মানসী')

'দিঘি'র অন্য অর্থ ক'রলেও আমরা সৌন্দর্য হিসেবে নিতে পারি :

"কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়।"

কি চমৎকার উপমা!

নদীর শান্ত রূপ যেটা বাঙলা দেশেও দেখা যায়, তা কবি আঁকছেন 'পুনশ্চ'র 'ছেলেটা' কবিতায়—

"মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,
....
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগ্‌লি তোলে।
....
লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে,—
তলায় পাতা ছাড়িয়ে শ্যাওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে।
....
ওই সবুজ জল,
সাপের চিকণ দেহের মতো।"

আবার—

"নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো ;" (পরিশেষ')

বা 'শেষশিক্ষা'তে—

"........নদী হাঁটুজল
ফটিকের মত স্বচ্ছ—চলে একধারে
গেরুয়া বালির কিনারায়।"

'বলাকা'তে গতিবাদ। 'চঞ্চলা' কবিতাটিতে আমরা নদীর চঞ্চলা রূপ ধ'রে নিতে পারি :

"হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।"

আবার—

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও ;
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে
ফেলে যাও ।"

'ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা' এই রূপটিও কবি অনবদ্য ভাষায়, সুন্দর ছন্দে, ভাবের গভীরতা দিয়ে এঁকেছেন।

ঝিলমের বুকে সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কবি-হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে যে বাণী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে একটি নব-সৃষ্টি ক'রল, সেই অপূর্ব মুহূর্তের ছবি আঁকছেন কবি :

"সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে আসা নিয়ে কালো জলে ;"
(বলাকা)

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' রবীন্দ্র-জীবনের একটা কথা বলা হ'লেও আমরা রূপ-বর্ণনা হিসেবে নিতে পারি—

"কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি ।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব
তালি ।"

'কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে' কবি-মন ঘুরে বেড়িয়েছে, সচল অনুভূতি দিয়ে সব কিছু বোঝবার চেষ্টা ক'রেছেন কবি।

'ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর স্থির স্রোতোহীন' এই অবস্থা দেখে কবির হয়ত বা দুঃখও হ'য়েছিল।

'মানসসুন্দরী'তে পদ্মার কথা ব'লছেন—

"হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে।"

'চিত্রা'র 'সুখ' কবিতায় মাতৃ-রূপ বর্ণনা ক'রছেন :

"........উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে ; ধৈর্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন ।
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুইপার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্রবর্ণের রেখা।"

'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র এই অংশটি আমরা নদীর রূপ-বর্ণনা হিসেবে নিচ্ছি :

"হুহু করে বায়ু ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর ;
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি প'রে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,........"

বর্ষার জলভরা পরিবেশ আর মেঘমন্দ্রিত সময়ের রূপ আঁকছেন কবি :

"তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর
কাছেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের
মতো নাচেরে,
হৃদয় নাচে রে।"
(নববর্ষা', 'ক্ষণিকা')

বর্ষায় ভরা নদীর খরস্রোত সত্যিই বুঝি গাঁয়ের কূলে কূলে সুর নিয়ে এল। আনন্দগানে, যৌবনের জয়গানে, তার গম্ভীর মন্দ্রে চারিদিক মুখর ক'রে নদী ছুটে চলেছে। জীবনের শীর্ণতা, খর্বতা দূর হ'য়ে গিয়ে এসেছে প্রাণের জোয়ার!

বাঙলার গাঁয়ের সাথে নদীর সম্পর্ক নিবিড়, অচ্ছেদ্য; রবীন্দ্র-কাব্য সেই সম্বন্ধ আরও গভীর ক'রে তুলেছে তার সৌন্দর্য-সুষমা দিয়ে।

জীবন-দেবতা

শ্রীমতী বিভা সরকার

মানস মর্ম্ম মুকুল তুলে
গাঁথাও তোমার মালা,
আমার সকল আমি নিয়ে
সাজাও তোমার ডালা।
কি পেলি তুই শুধাই যবে
বোবা বেদন জাগে,
সকল পাওয়া পূর্ণ কর
তোমার অনুরাগে।

কুসুমকোমল কঠোর তুমি
নিঠুর দরদী,
ভ্রান্ত মনে তোমার আশিস্
না মানি আমি যদি—
আঘাত হানি পন্থ আমার
আপনি সহজ কর
আমায় তোমার বিশ্ব-কাজে
নিত্য সাথী কর।

তোমার পূজা সহজ অতি
সে যে পরম দান,
আমায় তোমার যোগ্য করি
ঘোচাও অভিমান।
মিথ্যা অহং দ্বন্দ্ব নিঠুর
চিত্ত দোদুল দোলে,
হিংসা-মুখর দুঃখী ধরা
তোমার অভয় ভোলে।

দাও জেলে দাও ক্ষমার আগুন
সকল কলুষনাশা,
জীবন-মরণ দু-কূল ভোলায়
তোমার ভালবাসা।
আমি ত নাথ দাঁড়িয়ে আছি
তোমার চলার পথে,
আর কিছু নেই দ্বিধা প্রভু
তোমার সেবার ব্রতে।

সমালোচনা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থাবলী—এই অমূল্য গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক খানি প্রতিবিষয়ে খ্যাতনামা এক এক জন বাঙালী বিশেষজ্ঞ মনীষি-কর্তৃক অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। বিশ্ববিদ্যার সহিত বাংলার শিক্ষিত মনের যোগসাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীপুলিন বিহারী সেন কর্তৃক এই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীগণ তাঁহাদের সীমাবদ্ধ শিক্ষার বহির্ভূত বহু বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহারা যাহাতে অনায়াসে বিশ্ববিদ্যার সকল বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের বিদ্যোৎসাহী পরিচালক-গণের অক্লান্ত চেষ্টায় সর্ববিষয়ক গ্রন্থ ক্ষুদ্রাকারে ও অত্যন্ত অল্প মূল্যে প্রকাশনের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং এই জনহিতকর মহৎ কার্যের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই মহতী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইলে এক দিকে যেমন বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিবে, অপর দিকে তেমন বাংলার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক-পাঠিকাগণ স্বগৃহে থাকিয়া অতি অল্পায়াসে বিশ্ববিদ্যার মহাসমুদ্র-দর্শনের সুযোগ পাইবেন। আমরা আশা করি, বাংলার বিদ্যাবান সুধীগণ তাঁহাদের জাতীয় জীবনের এই ভীষণ দুর্দিনেও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থাবলীর যথাযোগ্য সমাদর করিতে ভুলিবেন না।

উদ্বোধন-পত্রের এই সংখ্যায় এই গ্রন্থাবলীর মাত্র কয়েকখানির সমালোচনা প্রকাশিত হইল। ইহার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে ক্রমে সকল পুস্তকেরই সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ও কাগজ উত্তম।

উপনিষদ্—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৫৩। মূল্য আট আনা।

আলোচ্যমান বইখানি পাঠ করিলে সমগ্র উপনিষদের মহান্ তত্ত্বগুলি-সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা হইবে। চারিটি অধ্যায়ে প্রস্তাবনা, আত্মবিচার, ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মসাধনা যেরূপ নূতন ধরনে আলোচিত হইয়াছে, তাহা পাঠককে নানা আখ্যায়িকা-সহযোগে জিজ্ঞাসা হইতে সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দিবে, সাধনার ইঙ্গিতও দিবে। এই পুস্তকখানিতে কৃতী লেখক বিরাট উপনিষৎসাহিত্যের সৌন্দর্য যে ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সুনাম রক্ষিত হইয়াছে। আশা করি, জ্ঞানানুরাগী বাঙালী পাঠকসমাজ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন।

মায়াবাদ—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ৫৮ পৃষ্ঠা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থকারের প্রদত্ত বক্তৃতার পুনর্মুদ্রণ। মূল্য আট আনা।

প্রথম প্রবন্ধে ন্যায় ও বৈশেষিকের আরম্ভ-বাদ, দ্বিতীয় প্রবন্ধে সাংখ্য ও পাতঞ্জল অনুমোদিত পরিণামবাদ আলোচনা করিয়া তিনি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত-সহায়ে বেদান্তের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ সহজ ও সরলভাবে বুঝাইয়াছেন।

পুস্তকখানি পড়িলে মায়াবাদ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া একটা স্পষ্ট ধারণা হইবে যে মায়া বা মিথ্যা মানে অসত্য বা অলীক কল্পনা নয়, মায়া মানে বিবর্ত্ত, ইন্দ্রজাল বা অনির্বচনীয় অর্থাৎ যা আছে কি নাই—ঠিক বলা যায় না, ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে আছে অথচ বিচারদৃষ্টিতে নাই, যাহার ব্যবহারিক সত্তা আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই তাহাই মায়া। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল এবং ব্যাখ্যানকৌশল উত্তম।

বাংলার সাধনা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। ১০৩ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে দর্শনের সভাপতিরূপে খ্যাতনামা গ্রন্থকার বাংলার ধর্ম ও সাধনার বৈশিষ্ট্যের যে আলোচনা করেন বর্তমান পুস্তকে তাহাই এক সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উপনিষদ্, বৈষ্ণব-পদাবলী, মালসী ও বাউলসঙ্গীতের যথাযোগ্য উদ্ধৃতির জন্য সমগ্র পুস্তকখানি ছন্দোমুখরিত ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার মূলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা লেখক উপক্রমণিকায় স্বীকার করিয়াছেন।

উপনিষদ্-যুগ হইতে বৌদ্ধ জৈন বৈষ্ণব-যুগের ভিতর দিয়া আজ পর্যন্ত বাংলার একটা নিজস্ব সাধনার ধারা অব্যাহত আছে। লেখকের মতে বাংলার কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি বেদান্তী, কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকল সাধকের ভিতর বাংলার পলিমাটির গোটা মানুষ একটি বাউল লুকাইয়া আছে, যে জাত মানে না, পাত মানে না, শাস্ত্র মানে না, আচার মানে না, বিধি-নিষেধ মানে না। মানে সে একটি জিনিষ, সে জিনিষটি মানুষ! এই মানবধর্মী বাংলার কবি তাই বাংলার মর্মবাণী গাহিয়া গিয়াছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই।' আলোচ্যমান পুস্তকে এই ভাবটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারতীয় সাধনায় ঐক্য—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। ৬৩ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকখানিতে কৃতী লেখক ভারতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সাধনার ধারা ঐক্যসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উপনিষদ্, গীতা, বৌদ্ধ-চর্যা, বৈষ্ণব-কবিতা, গোরক্ষ-সাহিত্য, সহজিয়া ও বাউল সঙ্গীত প্রভৃতি আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, সকল সাধনার মূলে একটি সাধনা আছে তাহা হইতেছে উল্টা সাধন, অর্থাৎ সাধারণ স্বাভাবিক মনোবৃত্তি যে দিকে যায়, বা মন যা চায়, তাহা হইতে তাহাকে বিপরীত মুখে লইয়া গেলে ঊর্ধ্বমূল সৃষ্টির স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাঁহার মতে সকল সাধনার ভাষাই রহস্যময়, কোথাও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই, বিপরীত ভাবসমন্বয়েই সত্যের প্রকাশ বিপরীত মুখে যাইতে বলিয়া সাধনার ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, আলোচ্যমান পুস্তকে গ্রন্থকার ভারতীয় সাধনার সকল ধারার আলোচনা না করিয়া কয়েকটি ধারার উপর একটু বেশি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহাতে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সাধনার ধারার তেমন উল্লেখ নাই। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইহা সংশোধিত হইবে। গ্রন্থের ভাষা ভাব ও প্রকাশভঙ্গী উত্তম।

স্বামী নিরাময়ানন্দ

ভারতদর্শনসার—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত ও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কর্তৃক জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০১ মূল্য তিন টাকা চারি আনা।

অবসরভোগী অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সুপণ্ডিত ও সুলেখক এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। চিন্তা বা ভাষার অস্পষ্টতা তাঁহার কোনও পুস্তক বা প্রবন্ধে নাই। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালায় তাঁহার প্রণীত "দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও ভাষার সাবলীলতার নিদর্শন ইতঃপূর্বেই যথেষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত "বেদান্তস্যমন্তক" ও তাঁহার প্রণীত "চার শ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক। বহু বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সহিত একত্র কর্ম করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল—তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসাধারণ বাগ্মিতা ও গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুবিধা আমি পাইয়াছিলাম।

আলোচ্যমান গ্রন্থে তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টি ও রচনার বৈশারদ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অত্যন্ত সুখবোধ্য ভাষায় তিনি ভারতীয় দর্শনের স্থূল তত্ত্বগুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উপর তাঁহার স্বাধীন মতামত অভিব্যক্ত করিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই বলিয়া তাহাদের মূল্য নির্ণয় করা পাঠকের পক্ষে সহজ হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি নাস্তিক ও আস্তিক উভয় দর্শনের কাহাকেও নিষ্কৃতি দেন নাই। পুস্তকখানিতে পাঁচটি অংশ আছে। উপসংহার বাদ দিলে অন্য চারটি অংশ—আলোচনার পটভূমি, নাস্তিক (চার্বাক-জৈন-বৌদ্ধ) দর্শন, সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা-বেদান্ত—পুস্তকটিকে সমচতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছে। সুতরাং পদ্ধতির দিক দিয়াও পুস্তকটি সুলিখিত। যাঁহারা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে অবতারিত তত্ত্বের উল্লেখ হইতে সহজেই গ্রন্থকারের বিস্তৃত জ্ঞানের উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যতটুকু ঐতিহাসিকতার সন্ধান দিলে ভাবধারার অর্থবোধ সুগম হয় তিনি সেই সীমা অতিক্রম করেন নাই। দীর্ঘ পুস্তকতালিকা দিয়া তিনি গ্রন্থের পৃষ্ঠাকে অযথা ভারাক্রান্ত করেন নাই। অবশ্য জিজ্ঞাসুর কৌতূহল মিটাইতে পরিশিষ্ট হিসাবে দার্শনিকদিগের নাম, সন ও গ্রন্থের তালিকা একত্র সন্নিবেশিত হইলে মন্দ হইত না।

পুস্তকে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি যে নাই তাহা নয়। গ্রন্থকার সংস্কার বা স্মৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করায় তাহাতেও ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে—দৃষ্টান্ত হিসাবে সূচনার প্রথম পৃষ্ঠার ও পুস্তকের ১৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকার শ্লোক দেখান যাইতে পারে। অন্য ক্ষুদ্র বিচ্যুতির মধ্যে ৪১ পৃঃ (হরিদ্বারে গঙ্গার ত্রিধারা), ১২২ পৃঃ (আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের নাম) ও ১৬৩ পৃঃ (নাসিকার দুই দিকে ইড়া ও পিঙ্গলা ও মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী)-র উল্লেখ করা যাইতে পারে। তদপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি ১১০ পৃঃ তে বর্ণিত ধর্ম ও অধর্মের অর্থ। ইহা মোটেই "স্পষ্ট" নয়, কারণ জৈন দর্শনে তাহাদের একটু বিশেষ অর্থ আছে যাহা অন্য দর্শনে ব্যবহৃত হয় না। ১২৪ পৃঃ হীনযান ও মহাযানের সংস্থিতির বর্ণনায় ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে—ইহার সংশোধন আবশ্যক। ঐ পৃষ্ঠাতেই মহাযানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের স্থান প্রত্যেকবুদ্ধও দেবদেবীর স্থান কতকটা পূরণ করে এই মতটি ঠিক বলিয়া মনে হয় না, যদিও জনসাধারণ তাঁহাদিগকেও অর্হৎ বলিয়া মান্য করিত।

কিন্তু এ সমস্ত ক্ষুদ্র ত্রুটিতে এই সুলিখিত পুস্তকটির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তক নাই বলিলেও

অত্যুক্তি হইবে না। গ্রন্থকারের তন্ত্রের প্রতি কটাক্ষের তীব্রতা আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইবে, কেননা দেহকে ঐশী দৃষ্টিতে দেখা তন্ত্রের ন্যায় অন্য শাস্ত্র করে নাই। কাশ্মীর শৈবদর্শনের একটু বিশদ বিবরণ থাকিলে মন্দ হইত না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি গ্রন্থকার শীঘ্র নিরাময় হইয়া নবীন শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন।

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, এম্‌-এ, বি-এল্, পি-আর্-এস্, দর্শনসাগর

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

আমেরিকায় স্বামী বোধানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ—গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩-১৫ মিনিটের সময় স্বামী বোধানন্দজী মহারাজ ৭৯ বৎসর বয়সে নিউইয়র্ক শহরে রুজভেল্ট হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি 'প্রষ্ট্রেট্ গ্ল্যাণ্ড' রোগে ভুগিতেছিলেন। ইহার চিকিৎসার জন্য তিনি গত ৩১শে বৈশাখ ঐ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং অস্ত্রোপচারের সময় দেহত্যাগ করেন।

স্বামী বোধানন্দজী মহারাজ ১৮৯৭ সনে আলমবাজার মঠে যোগদান করেন এবং ঐ সনেই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ক্রমবর্ধমান প্রচারকার্যে সাহায্য করিবার জন্য ১৯০৬ সনের এপ্রিল মাসে তিনি নিউইয়র্কে প্রেরিত হন। পর বৎসরে তিনি পিটস্‌বার্গের বেদান্তপ্রচার-কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। ১৯১২ সনে স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের স্থলে তিনি নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় তথাকার বেদান্ত সোসাইটির বর্তমান বাড়ীটি ক্রীত হয়। তিনি ১৯২৩ সনে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

স্বামী বোধানন্দজী মহারাজ অত্যন্ত কঠোর-ব্রতী ও নিয়মানুবর্তী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। তিনি সুদীর্ঘকাল আমেরিকায় কৃতিত্ব-সহকারে বেদান্তপ্রচার-কার্য পরিচালন করিয়াছেন। স্বামী বোধানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ-সংঘ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জনৈক সুযোগ্য শিষ্য হইতে বঞ্চিত হইল। তাঁহার আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্যানফ্রান্সিস্কো (উত্তর-ক্যালিফোর্নিয়া) বেদান্ত সোসাইটি—গত এপ্রিল মাসে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন:—(১) "চিন্তার প্রভাব", (২) "পুনরুজ্জীবনের উদ্ভব ও

উপায়", (৩) "কি হেতু একটি ধর্ম প্রভাবশালী হয়?" (৪) "ঈশ্বর এবং তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর", (৫) "কুণ্ডলিনী এবং উচ্চানুভূতির কেন্দ্রসমূহ", (৬) "জীবাত্মার কয়েকটি অন্ধকার রাত্রি", (৭) প্রেম ও অনাসক্তির অভ্যাস"। স্বামী অশোকানন্দজীর সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী "ঈশ্বর, জীব ও জগৎ" এবং "ভারতবর্ষের সাধকবৃন্দ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন স্বামী অশোকানন্দজী নিয়মিত ভাবে প্রতি শুক্রবার সোসাইটির সভ্য ও ছাত্রদিগকে ধ্যানাদি শিক্ষা দিয়াছেন এবং বেদান্তদর্শনের দার্শনিক ও কার্যকর দিকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত বৈশাখ মাসে ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীবুদ্ধদেবের জন্মতিথি উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় দিবসই বেলুড় মঠের স্বামী ওঁকারানন্দজী সমবেত ভক্ত নরনারীর সমক্ষে মহাপুরুষদ্বয়ের অপূর্ব জীবন-কথা ও তৎপ্রদর্শিত পথ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

গত [illegible]শে বৈশাখ আশ্রম-প্রাঙ্গণে পাটনা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ঝা মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চদশাধিক শততম জন্মতিথি উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়। শহরের গণ্যমান্য বহু নর-নারী ইহাতে যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভে আশ্রমস্থ সন্ন্যাসিবৃন্দ বৈদিক শান্তিপাঠ ও স্থানীয় বেতার-সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হয়। আশ্রম-সম্পাদক স্বামী তেজসানন্দজী আশ্রমের ১৯৪৯ সনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানান্তর্গত চিকিৎসা-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, প্রচার-বিভাগ ও অন্যান্য জনহিতকর কার্যের উন্নতি ও প্রসার সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করেন। তিনি সর্বসমক্ষে ইহাও জ্ঞাপন করেন যে সম্প্রতি বিহারস্থ বিহিটা নামক স্থানে স্থানীয় আশ্রমের পক্ষ হইতে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত দুঃস্থ শরণার্থিগণের জন্য একটি সাহায্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তৎপর পাটনা বি এন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও পাটনা হাইকোর্টের বর্তমান এডভোকেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিশ্র, এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় সুললিত হিন্দীভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বি এন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গাঙ্গুলী, এম্-এ তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা, ভারতের তথা ভারতেতর দেশের সমাজক্ষেত্রে তাঁহার অলৌকিক প্রভাব ও অত্যুচ্চ সেবাদর্শের প্রকৃত সার্থকতা সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাবে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা দেন। অতঃপর বেলুড় মঠের স্বামী ওঁকারানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক অনুভূতিনিচয় ও প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকবৃন্দের আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের মূল্যনির্ধারণ-প্রসঙ্গে এক অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা বাংলা ভাষায় প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয় ও ধর্মের সার্বজনীন আদর্শ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সনাতন হিন্দুধর্মের উদার আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং যুগে যুগে পুণ্যতীর্থ এই ভারতভূমিতে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া কি ভাবে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও বুঝাইয়া দেন। এই জড় সভ্যতার যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক অবদান ও তাঁহার সুদীর্ঘ কঠোর সাধনার প্রতি সভাপতি মহোদয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন

যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যেক ধর্মই যে সেই পরমতত্ত্বে পৌছিবার এক একটি সোপান তাহা বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণের উদার শিক্ষাই যে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের পক্ষে কল্যাণকর তাহা সভাপতি মহোদয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন। অতঃপর আশ্রমের সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয়, বক্তাগণ ও অন্যান্য সকলকে আশ্রমের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীমতী বন্দনা দেবী, সুধা দেবী ও বাণী দেবী কর্তৃক সমাপ্তি-সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—গত ২৩শে ও ২৪শে বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন ও ধর্মালোচনা উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে দুই দিন স্থানীয় গ্রান্ট হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনার জন্য দুইটি সভা আহূত হয়। প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায় এবং দ্বিতীয় দিনের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়। বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজে উহার কার্যকারিতা এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৪৯ সনের কার্য-বিবরণী—পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্যমান বর্ষেও এই প্রতিষ্ঠানে পূজা এবং ধর্মালোচনা যথারীতি সম্পন্ন এবং আশ্রমের কর্মী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ১৫২টি সভায় অধিবেশনে ধর্মপুস্তকাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে। শ্যামাপূজা, সরস্বতীপূজা, বাসন্তীপূজা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের জন্মতিথিপূজাও প্রতিবৎসর যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসিগণ এই মঠে আগমন করিয়া ১৫টি আলোচনা-সভায় ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা দ্বারা জনগণমধ্যে ধর্মভাব-উদ্দীপনের সহায়তা করিয়াছেন।

আশ্রমের পরিচালনাধীনে রামহরিপুর শাখাকেন্দ্রে একটি ঠাকুরঘর নির্মিত এবং জন্মাষ্টমী তিথিতে সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমের পুস্তকাগারে মোট ১৬৭৭ খানি পুস্তক আছে। পাঠকগণ আলোচ্যমান বর্ষে ২০৭৫ খানি পুস্তক পাঠের জন্য নিয়াছেন। ২০ খানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র এবং তিন খানা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠাগারে নিয়মিতভাবে রক্ষিত হয়।

আলোচ্যমান বর্ষে তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়। এই তিনটিতে ৯৩৬৪৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নূতন রোগী ২৮৯৩২ জন, পুরাতন রোগী ৬৪৭১৬ জন ও অস্ত্রোপচার-রোগী ৯২ জন। এতদ্ভিন্ন দাতব্যচিকিৎসালয়-সংলগ্ন রোগিগণের জন্য নির্দিষ্ট অস্থায়ী কুটিরগুলিতে ১২১৫ জন রোগী চিকিৎসার্থ অবস্থান করিয়াছিলেন। আলোচ্যমান বর্ষে ১০৮৯ জন রুগ্ন ব্যক্তিকে ৪ পাঃ ২ আঃ ৩ ড্রাঃ ৫৬ গ্রেঃ কুইনাইন ও ২৩ জনকে ২৩টি কুইনাইন ইনজেকশন্, ২৮৮ জনকে ৬৩৪ মেপাক্রিন্ বটিকা এবং ১০৫৩ জনকে ৩৮০৮টি পেলুড্রিন বটিকা দেওয়া হইয়াছে। বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে ১৯৪৯ সনে

মোট ৮ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে একজন সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৭ জন ছাত্র মঠের তত্ত্বাবধানে মঠেই বাস করিয়াছে। সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ১৪ জন ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে তিন জন গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উপযুক্ত দরিদ্র ছাত্রকে সাময়িক সাহায্য দান করা হয়। দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যের উদ্দেশ্যে এই মিশনে একটি পশম-কার্যের কুটিরশিল্প-বিভাগ পরিচালিত হইতেছে। এবার রামহরিপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে মোট ১১৭ জন শিক্ষার্থী ছিল, তন্মধ্যে ৫ জন বালিকা।

বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বদিন শোভাযাত্রা সহকারে কীর্তনদল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। উৎসব-দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগ ও ভজনাদি হইলে প্রায় ছয় শত ভক্ত প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। অপরাহ্নে আশ্রমের সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বার-য়্যাট্-ল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এই প্রতিষ্ঠানের উনচল্লিশ বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে সেবাশ্রমের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন অধিকারী মঠ ও মিশনের গত বৎসরের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় আশ্রম-পরিচালিত অবৈতনিক সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিভাষণের পর সমাপ্তি-সংগীত গীত হইলে সভার কার্য এবং উৎসব শেষ হয়।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

Kali The Mother—Sister Nivedita. Published by Swami Yogeshwarananda, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora. To be had of Advaita Ashrama, 4, Wellington Lane, Calcutta—13. Pages 111. Price: Paper Re. 1-4.

The book is a collection of excellent essays on the Divine Mother of the Universe.

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস—ঢাকা মালাকারটোলা-নিবাসী বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস গত ৯ই বৈশাখ ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের দিব্যসংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে ঢাকা নগরীতে বিপুল সম্বর্ধনাজ্ঞাপনের জন্য যে আয়োজন

হইয়াছিল যতীন্দ্র বাবুই উহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের আজীবন সভ্য ছিলেন এবং উহার বিভিন্নমুখী জনহিতকর কার্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। চিত্রবিদ্যা, দেবদেবীর প্রতিকৃতি-রূপায়ণ ও সাজসজ্জায় তাঁহার গভীর নৈপুণ্য ও অনুরাগ ছিল। তিনি প্রতি বৎসর ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে উৎসবাদি পর্ব উপলক্ষে চিত্র ও সাজসজ্জার ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তদীয় পার্ষদগণের এবং অন্যান্য ধর্মাচার্যের শিক্ষাপ্রচারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতেন। বিগত শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় সর্বধর্মসমন্বয়জ্ঞাপক যে বিরাট শোভাযাত্রা ও প্রদর্শনী হইয়াছিল উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যতীন্দ্র বাবুর উদ্যম অপরিসীম ছিল।

যতীন্দ্র বাবু সদালাপী, মিষ্টভাষী ও উদার-ভাবাপন্ন এবং রামকৃষ্ণ-সংঘের সাধু-সন্ন্যাসিগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উহার সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের নির্দেশে তিনি ঢাকায় উহার বহুল প্রচারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়—গত ২৫শে বৈশাখ বরিশালের সুপরিচিত ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় আমাশয়রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বর্ধমানস্থিত বাসভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের ও রামকৃষ্ণ-সংঘের সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার মিষ্টালাপ ও বিনম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা এবং শোকার্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মাইতি—গত ২১শে বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মাইতি ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ বাবু মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত কানুনগোচক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবাকার্যাদিতে তাঁহার অপরিসীম উদ্যম ও আগ্রহ দেখা যাইত। চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সরলতা ও ধর্মানুসন্ধিৎসা সকলকে মুগ্ধ করিত। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চির-শান্তি লাভ করুক।

স্বামী শুদ্ধানন্দজী ও স্বামী প্রকাশানন্দ-জীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি-অর্পণ—গত ৩১শে বৈশাখ কলিকাতা মহেন্দ্র সরকার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্বামী বিবেকানন্দের দুই সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজী এবং স্বামী প্রকাশানন্দজীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। বেলুড় মঠের সহকারী সম্পাদক স্বামী পবিত্রানন্দ-জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উক্ত স্বামীজিদ্বয়ের স্মৃতিরক্ষাস্বরূপ রামকৃষ্ণ

সমিতির তত্ত্বাবধানে উক্ত সমিতি-ভবনে একটি উপযুক্ত হলঘর নির্মাণের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার জন্মস্থান সার্পেন্টাইন লেনের নাম বদলাইয়া স্বামী শুদ্ধানন্দ ষ্ট্রীট রাখার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানান হয়।

স্বামী সুন্দরানন্দজী, স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, অধ্যাপক ডি এন বসু রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন এবং শ্রীযুক্ত অশোককুমার দাস স্বামীজিদ্বয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা স্বামীজিদ্বয়ের কর্মময় জীবনের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি-অর্পণ প্রসঙ্গে বলেন যে, জাতীয়তা গঠনের জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন জাতীয় সাহিত্যের। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দজী বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন। বাঙ্গলার যুব-সম্প্রদায় তাঁহার অনূদিত গ্রন্থপাঠে অশেষ উপকৃত হইয়াছে। জাতীয়সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর দান অপরিসীম। তাঁহারা বলেন যে, স্বামীজিদ্বয় তাঁহাদের নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবায় দেহমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দজী আমেরিকায় ভারত এবং বেদান্তের শাশ্বত বাণী প্রচার করিয়া সনাতন ভারতের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সভাপতি তাঁহার ভাষণে স্বামীজিদ্বয়ের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দজী আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। ৫০ বৎসরকাল তিনি মঠের সেবা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান অপরিসীম। স্বামী শুদ্ধানন্দজী এবং স্বামী প্রকাশানন্দজী সম্পর্কে সহোদর ছিলেন। এই দুই জনের মধ্যে চরিত্রের একটা সামঞ্জস্য ছিল: তাঁহারা উভয়েই নিরভিমান এবং বিনয়ী ছিলেন। তাঁহারা বাস্তবিকই ছিলেন আনন্দময় পুরুষ।

ঐদিন সভাশেষে উক্ত সন্ন্যাসিদ্বয়ের সার্পেন্টাইন লেনের পৈত্রিক বাসভবনে একটি স্মৃতিফলকের উন্মোচন হয়।

কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি—এই প্রতিষ্ঠানে চারিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ২২শে বৈশাখ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগাদি হয়। আউটসাহি, বরলিয়া, শীপুর, রাউৎভোগ, ধোপরাপাশা, মূলচর, পাচগাঁ, বানারি, দিঘলি, কনকসার, চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করেন। অপরাহ্নে আহূত এক জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আলোচিত হয়। অন্যান্য তিন দিন বিভিন্ন ধর্মাচার্যের শিক্ষা আলোচিত হয়।

চারিগ্রাম রঘুনাথপুর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাতে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ-কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন ও ভজন, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ, সিঁথির মিলনপরিষদ-কর্তৃক কালী-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুক্ত অজয়কুমার দত্ত প্রধান অতিথিরূপে সম্মানিত হন। আশ্রমের সহকারী সম্পাদক-কর্তৃক বার্ষিক কার্যবিবরণী

পঠিত হইলে স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অজয়কুমার দত্ত ও সভাপতি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় বেলেঘাটা পল্লীর বালিকাগণ-কর্তৃক শিশুনাটিকা "বাণী" অভিনীত হয়। রাত্রে প্রফেসার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকার মহাশয়ের হাস্য-কৌতুকাভিনয় হয়। উৎসবে সহস্রাধিক ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

নূতনপুকুর (২৪পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-ভবন—কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্নে ধর্মসভায় স্বামী নির্বাণানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। উৎসবে প্রায় আটশত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

মগরায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী—স্থানীয় প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের উদ্যোগে গত ২৪শে বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও প্রসাদবিতরণ এবং সন্ধ্যায় বারোয়ারী তলায় ধর্মসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী পৌরোহিত্য করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী এবং সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর, ১৯৪৯ সনের কার্য-বিবরণী—এই আশ্রমটি ১৯৪৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাসাধ্য নরনারায়ণ-সেবাকার্য করিয়া আসিতেছে। আলোচ্যমান বর্ষে আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ২৬০০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছেন। আশ্রমের পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা মোট ১৩৩২ খানি ছিল, তন্মধ্যে ৫৭ খানি পুস্তক এই বৎসরে ক্রীত ও সংগৃহীত হয়। দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৭ খানি। মোট ৪৩২৫ খানি পুস্তক পঠিত হইয়াছিল। আলোচ্যমান বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব, শ্রীরামনবমী, শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী, শ্রীসারদা-দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও যীশুখ্রীষ্টের জন্মতিথি প্রতিপালিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব উপলক্ষে আশ্রমের নিজস্ব ভূমিতে আশ্রম-গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। গৃহনির্মাণ বাবত ১২০৪৲ টাকা সমেত এই বৎসরের মোট আয় ৪২০৭৩০ এবং মোট ব্যয় ৩৩৩১৲ টাকা।

ভাবী মহাযুদ্ধের বিষময় ফল সম্বন্ধে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্—ভারতীয় প্রতিনিধি ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণন্ জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন,"মানুষ যদি তাহাদের মধ্যে সন্দেহ ও ঘৃণার যে অশুভ ব্যবধান দেখা দিয়াছে, তাহা দূর না করে তাহা হইলে পৃথিবীতে এক অন্ধকার যুগ নামিয়া আসিবে। যখন কোটি কোটি লোক ক্ষুধার্ত ও গৃহহীন রহিয়াছে, কোন আশার আলোর সন্ধান পাইতেছে না তখন আমাদের সরকারগুলি যুদ্ধের পদ্ধতি-অবলম্বনে ব্যাপৃত।

"যে সময় এসিয়া ও আফ্রিকায় পৃথিবীর অর্ধেক অধিবাসী বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রারও নিম্নস্তরে রহিয়াছে, তখন অপর

সকলে তাহাদের সমর সম্পদ ও উত্তম সৈন্য, নৌ ও বিমানবাহিনী-গঠনে নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে কোনই ফল হইবে না, কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। অপর একটি যুদ্ধের সামরিক ফল যাহাই হউক না কেন, উহার রাজনৈতিক ফল সুস্পষ্ট, অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের সমাধি।

"ইহার দ্বারা কেহই লাভবান হইবে না। বিজেতা যে জাতিই হউক না কেন, গণতন্ত্র অথবা কম্যুনিজম্ উহাদের আজিকার রূপ লইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। ঘৃণা, ব্যাধি ও অনাহারের মারাত্মক ফল ফলিবে।

"রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাবলীর তীব্র নিন্দা করিয়া তিনি বলেন যে, উহার ফলে মানুষকে অমানুষ করা হইতেছে। মানুষের মর্যাদার জন্য তাহার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি চাই। সে যেন অজানা ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া না যায়। সকল ক্ষেত্রেই আমরা মানুষের অবলুপ্তি ও সমরসজ্জার সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি দেখিতে পাই। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, অথচ আমরা ভুল পথে নিক্ষিপ্ত হইতেছি।"

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত জয়ন্তী উৎসব—গত ৩রা জ্যেষ্ঠ হইতে ৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিবস চালতা বাগান ১৩ বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনস্থ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মিলনমন্দিরে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাগ্রন্থের একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় সভার উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষাকে যাঁহারা মনোজ্ঞ রূপ দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামী অন্যতম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ভারতের বিশিষ্ট সম্পদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রের শুদ্ধসার সংগ্রহ পূর্বক চরিতামৃত রচনা করিয়া বাঙ্গালীর নিকট সেই সম্পদের পরিচয় দিয়াছেন। অতঃপর শ্রীশ্রী-চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন সংস্করণের প্রাচীন চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। সভাপতি মহাশয় বলেন যে কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য ও দর্শনের সমন্বয়। তিনি যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন সমগ্র জগতে তাহা প্রচার করিয়া বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। দ্বিতীয় দিবস চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত জয়ন্তীর দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ভ্রম-সংশোধন—উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত "বাড়ীখালে (ঢাকা) স্বামী প্রেমানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের মাতৃদেবী সম্বন্ধে "তিনি একদিনের প্লেগে মারা গেলেন" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। তথ্যসংগ্রাহকের দিনলিপি-পাঠে মনে হয় স্বামী প্রেমানন্দজী ১৯১৫ সনের মে মাসে ঐ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার মাতৃদেবী ১৯১৭ সনে (১৩২৪ বাংলা, ৩রা কার্তিক) দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ১৯১৫ সনে স্বামী প্রেমানন্দজীর ঐ কথা বলা সম্ভব ছিল না। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ প্লেগে মারা যান।
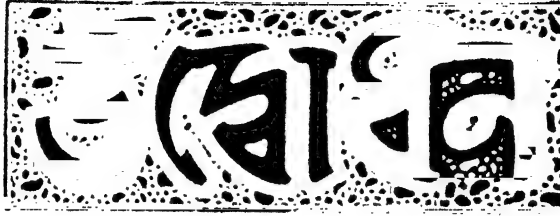
স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-সংবাদ

সম্পাদক

(১)

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন বয়সে বেলুড় মঠে মহাসমাধি লাভ করেন। এই সম্বন্ধে বাংলা দেশের তৎকালীন বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌' 'ইংলিশ্‌ম্যান্‌' 'ইণ্ডিয়ান্‌ মিরর্‌' ও 'বেঙ্গলী' সংবাদ-পত্রে যাহা বাহির হইয়াছিল উহার বঙ্গানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। কোন কোন সংবাদের স্থানে স্থানে ভুল আছে, কয়েকটি ভুলের প্রতিবাদও করা হইয়াছে। ভুলগুলি সংশোধন না করিয়া সংবাদ কয়টি যথাযথ প্রকাশ করা হইল। এমন কি, থিয়োসফিক্যাল্‌ সোসাইটির মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' স্বামীজীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াও স্থানে স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে অতি সুকৌশলে যে অশোভন মন্তব্য করিয়াছেন, উহাও কিছুমাত্র বাদ দেওয়া হইল না। ইহাতে সেকালে বাংলা দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত শ্রেণীর মনোরাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, উহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে।

ষ্টেটস্‌ম্যান্‌, ৬ই জুলাই, ১৯০২ সন —পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকায় যোগদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি গত শুক্রবার রাত্রে হাওড়া বেলুড় মঠে (মন্দিরে) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার যুবোচিত আকৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি দেশের চারিদিক ঘুরিয়া তাঁহার পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন-কালে তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন ইউরোপীয় শিষ্য এবং তাঁহাদের মধ্যে জনৈক ভদ্রমহিলা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুকাল পরই চলিয়া যান। বহু স্বদেশবাসী কর্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত স্বামীর অন্তর্ধান আকস্মিক বলিয়াই অনুমিত হয়। অল্পক্ষণ ভ্রমণের পর মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং তাঁহার খাটিয়ায় শুইয়া পড়েন; কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। [১]

[১] *The Statesman, July 6, 1902,—The Late Swami Vivekananda.*—Swami Vivekananda, who, a few years ago, made a great stir in America by his lectures on the Yoga Philosophy,

ষ্টেটস্‌ম্যান্‌, ৭ই জুলাই, ১৯০২ সন—পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ আমাদের রবিবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন তাঁহারা বলেন যে, তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন—তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৩৯ বৎসর। তিনি বর্তমানে বিলুপ্ত মেসার্স টেম্পল্‌ এণ্ড ফ্রেণ্ড নামক সর্বজন-পরিচিত য়্যাটর্নী ফার্মের কার্যনির্বাহক কর্মচারী বাবু বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র ছিলেন। পরলোকগত স্বামীর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কলিকাতার দেশীয় বিদ্যালয়গুলির একটিতে শিক্ষা-প্রাপ্ত হন, কিন্তু অধ্যয়নে প্রবেশিকা পরীক্ষার অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। স্কুল ত্যাগ করিবার অল্পদিন পরেই প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বহু ব্যক্তির ন্যায় তিনি দেবী কালীর পরমভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক জনৈক পুরোহিতের ধর্মোপদেশ দ্বারা আকৃষ্ট হন। ইনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরের নিকট দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে থাকিয়া ধর্মশিক্ষা দিতেন। ধর্মভাব ও কৃচ্ছ্র-সাধনের জন্য রামকৃষ্ণ হিন্দু-সম্প্রদায়ে সুপরিচিত ছিলেন। যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার অন্যতম শিষ্য হন। স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় যে, এদেশে অবস্থানকালে ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া তিনি বেদান্তদর্শনের রহস্য আয়ত্ত করেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তিনি এরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন যে, সমাধিতে বা ভাবাবেশে অভ্যস্ত রামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার শিষ্যের ভাবী মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পরে মাদ্রাজে যাইয়া কয়েক বৎসর অবস্থান করেন এবং রামনাদের রাজার মাদুরার বিখ্যাত মন্দির-সমূহের একটিতে অধ্যয়নে রত হন। এখানেও তিনি বেদান্তদর্শনে পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। রামনাদের রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করিতে থাকেন। অতঃপর যখন ঘোষিত হইল যে, শিকাগো প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় ধর্মসমূহের একটি সম্মেলন হইবে, তখন রামনাদের রাজা এবং মাদ্রাজের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় হিন্দুগণ নরেন্দ্রনাথ দত্তকে সেখানে প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন।

নরেন্দ্রনাথ তখন স্বামীতে পরিণত এবং পৈতৃক নাম পরিত্যাগ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন। ধর্মসম্মেলনে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণ সকলের প্রভূত মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্বামী প্রকৃত পক্ষে বাগ্মী ছিলেন না, কিন্তু অসাধারণ রূপে অনর্গল এবং বাহ্যতঃ সংশয়নিরসক বক্তৃতাদান-পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শনে গভীর পারদর্শিতা থাকায় প্রকৃত পক্ষে তিনিই শিকাগোতে উহার একমাত্র ব্যাখ্যাতা ছিলেন। নিশ্চিতই তিনি আগ্রহশীল ছিলেন এবং তাঁহার আগ্রহশীলতা বক্তব্য বিষয়ে পূর্ণ অধিকারের সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জগতের ধর্মাচার্যদের এই মহতী সভায় তাঁহার বক্তৃতা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা মতপ্রকাশ

died at the Belur Math (temple) Howrah, on Friday night. He was a robust, youngish looking man of striking appearance and after his tour in Europe and the United States he travelled round the country lecturing on his experience in the Western hemisphere. When returning to India, he was accompanied by a few of his European converts, a lady being one of the number, but they left the country shortly afterwards. The Swami, who was highly esteemed by a number of his own countrymen, seems to have died rather suddenly. It appears that on returning to the math after a short walk he felt unwell and lay down on his charpoy, where he expired within a few minutes.

করিয়াছিলেন। তিনি যে দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন উহা তাঁহার অধিকাংশ শ্রোতার নিকট সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। অতঃপর প্রাচ্য হইতে আগত আধ্যাত্মিক-জ্ঞানসম্পন্ন এই ব্যক্তির যে কেবল অনুসন্ধানই করা হইত তাহা নহে, পরন্তু তিনি আপনাকে বহু শিষ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিতেন। এই শিষ্যগণের মধ্যে কয়েক জন কয়েক বৎসর পরে তাঁহার অনুগামী হইয়া এই দেশে আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া সর্বত্রই পরম উল্লাসের সহিত সম্বর্ধিত হন। মাদ্রাজ বোম্বাই ও কলিকাতায় সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রাজপথ-সমূহে বহু বিজয়-তোরণ নির্মিত ও ঐকতান বাদিত হইয়াছিল এবং উত্তেজিত জনতা অশ্ব সরাইয়া তাঁহার গাড়ী আপনারাই টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার আনন্দোচ্ছ্বাস কয়েক দিন স্থায়ী হইয়াছিল। প্রত্যেকেই স্বামীকে অতিথিরূপে পাইতে এবং তাঁহার করমর্দন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহ কয়েক দিন যাবৎ তাঁহার প্রশংসায় এবং আমেরিকায় তিনি যে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন উহার বর্ণনায় ভরপুর ছিল। অতঃপর অকস্মাৎ কিছুকাল নীরবতা চলিল, পরে লোক কানাঘুষা করিতে লাগিল যে, স্বামী পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ দেখিতে বলিষ্ঠ হইলেও যথার্থতঃ তদ্রূপ ছিলেন না। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রকাশ্য ভাবে মাংসাহার সমর্থন করিয়া তাঁহার গোঁড়া ভ্রাতৃগণের মনে তিনি নিদারুণ বেদনা দিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ইহা (মাংসাহার) হিন্দুধর্ম-নিষিদ্ধ নহে, নিশ্চিতই ইহা হিন্দুধর্মের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে: ফলে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহার অনেক অনুগামী সরিয়া পড়েন। তাঁহার পূর্বতন উপদেশকের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বেশির ভাগ চাঁদা ইংলণ্ড হইতে তুলিয়া তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। কলিকাতায় প্লেগ আরম্ভ হইলে এই প্রতিষ্ঠান প্রভূত সৎকার্য করিয়াছিল। হাওড়া জেলায় বেলুড়ে হুগলী নদীর তীরে মঠ বা মন্দির ক্রীত এবং কয়েকটি অনাথালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগিনী নিবেদিতা পরলোকগত স্বামীর অন্যতমা প্রধানা শিষ্যা। তিনি এখন আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছেন।[২]

ষ্টেটস্‌ম্যান্‌, ৯ই জুলাই, ১৯০২ সন—

নব হিন্দু আন্দোলনের অন্যতম খ্যাতনামা

[২] *The Statesman, July 7, 1902—The Late Swami Vivekananda*—Swami Vivekananda, whose somewhat sudden death was announced in our issue of Sunday, was a comparatively youngman, being it is said by those who knew him intimately, only thirty-nine years of age. He was the son of Babu Bissonath Dutta, managing clerk of Messrs. Temple and Friend, a well-known firm of attorneys, which has ceased to exist. Norendra Nath Dutta —for such was the late Swami's proper name —received his education in one of the many native schools of Calcutta, but did not pursue his studies further than the Entrance Examination. Shortly after leaving school he was attracted, as, indeed were many others besides himself, by the teachings of a priest named Ramkrishna Paramhangsa, a warm devotee of the goddess Kali, who taught in a temple at Dhakhineswar near Barnagore in the suburbs of Calcutta. Ramkrishna was a man noted among the Hindu community for his piety and austerities, and young Norendra Nath Dutta became one of his disciples. While here, it is said, he mastered, evidently from the English translations the mysteries of the Vedanta Philosophy. He became so proficient in the sacred knowledge that Ramkrishna—himself, it was believed, a practitioner of the samadhi, or trance-process—predicted great things of his pupil. Norendra Nath then went to Madras, where he stayed several years, studying in one of the famous temples of Madura, belonging to the Raja

ব্যক্তি যে শুক্রবার রাত্রে পরলোকগমন করিয়াছেন, সে সংবাদ এই পত্রিকার স্তম্ভে পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ধরনে একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎসম্বন্ধীয় বিবরণী প্রমাণ দেয় যে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। বাংলায় ও মাদ্রাজে তাঁহার বহু অনুরাগী ছিল। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার সম্বর্ধনা উপলক্ষে যে বিপুল ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা কলিকাতার অনেকেই স্মরণ করিবেন। প্রধানতঃ তাঁহার উপদেশ ও কর্ম চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক রীতিসঙ্গত ছিল না বলিয়া গোঁড়া হিন্দুগণ তাঁহাকে কম সন্দেহ করিতেন না। কোন ব্যক্তির বিদ্যা ও ধর্মপরায়ণতা যাহাই থাক না কেন তিনি যদি প্রকাশ্য ভাবে শিক্ষা দেন যে, কেবল মাংসাহার করিলে হিন্দু জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে নিজেদের মুক্তির পথ করিয়া লইতে পারিবে, তাহা হইলে তাঁহার স্বধর্মাবলম্বী জনসাধারণ কর্তৃক উহা সমর্থিত হইবে বলিয়া কদাচও আশা করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর অপর প্রান্তে বিজয়ী হইয়াছিলেন। শিকাগোর বিখ্যাত ধর্মসম্মেলনীতে তাঁহার অতুলনীয় চেহারা এবং বক্তৃতার মোহিনী শক্তি বিরাট জনসংঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। অদ্ভুত সম্প্রদায় এবং অসম্ভব

of Ramnad. Here, too, he, acquired fame for his learning in Vedanta Philosophy, and among others who took a deep interest in him was the Raja of Ramnad. When, therefore, it was announced that in connection of the Chicago Exhibition there would be a Parliament of Religions, the Raja of Ramnad and other leading Hindu gentlemen of Madras decided to send Norendra Nath Dutta to it. Norendra Nath had by that time blossomed into a Swami, and having dropped his parental name was henceforward known as Swami Vivekananda. His address at the Parliament of Religions attracted immense attention. The Swami was not exactly an orator, but he was gifted with a singularly fluent and apparently convincing method of speech. He had drunk deep of the Vedanta philosophy of which he was, as it happened, the only exponent at Chicago. He certainly was earnest and it was his earnestness, combined with a complete mastery of his subject, which impressed his hearers, who it is said, voted his speech the best of those delivered before that august and learned assemblage of the world religious teachers. The philosophy he was expounding was, to most of his listeners, perfectly new and ever after the Wise Man from the East was not only much sought after, but found himself surrounded by many converts, some of whom, a few years later, followed him out to this country. Swami Vivekananda, on his return to India, was, everywhere received with the great rejoicings. Thousands of people, in Madras, in Bombay and in Calcutta went out to receive him. Triumphal arches were erected in the public thoroughfares, bands played, and the excited crowds even unyoked his carriage and pulled it along themselves. The rejoicings in Calcutta lasted several days. Everybody wished to have the Swami as a guest and to grasp him by the hand. For days together the native papers were full of his praises and the wonders he had achieved in the New World. Then suddenly followed a period of silence and it was whispered that the Swami had retrograded. The fact is that Swami Vivekananda although robust in appearance was not so in reality. * On his return to this country he gave mortal offence to many of his orthodox brethren by publicly advocating meat eating. He maintained that this was not forbidden by Hinduism, certainly that it was not essential to it, and the result was a breach, and many of his followers fell off. With the help of subscriptions, most of them received from England, he started in memory of his former instructor, the Ramkrishna Mission, which did much good work when plague first broke out in Calcutta. The Math or temple on the banks of the Hooghly at Belur in Howrah was purchased, and several orphanages established. Sister Nivedita who is now at Almora, is one of the principal disciples of the late Swami.

বিশ্বাসের জন্মভূমি যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচ্যের গেরুয়া-পরিহিত সন্ন্যাসী পরিগৃহীত হইয়াছিলেন; এবং মিঃ কিপলিং-এর অননুকরণীয় লামার (তিব্বতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) ন্যায় তিনি অভিযোগ করিতে পারিতেন যে, "যাহারা ঐ পন্থা অনুসরণ করে, তাহারা নির্বোধ রমণীগণ দ্বারা বিতাড়িত হয়।" ইংলণ্ডেও তিনি এক শ্রেণীর কমবেশী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন। ইঁহারা নানা কারণে ইঁহাদের পৈতৃক ধর্মে সন্তুষ্ট নহেন। ছয়সাত বৎসর পূর্বে লণ্ডনে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ নিভৃতপথের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণ স্বামীর নির্দেশিত শান্ত ও নিবৃত্তিমূলক পথ সময়ে সময়ে অতিক্রম করিতেন। ধনবতী ভদ্রমহিলাগণ তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। তাঁহার গেরুয়া পরিচ্ছদ, চমৎকার উষ্ণীষ, পরিপূর্ণ প্রশান্ত মুখমণ্ডল, তুল্য মর্যাদাবিশিষ্ট মধুবর্ষিণী বাণী সহায়ে তিনি তাঁহাদের বৈঠকখানায় সর্বাতিক্রান্ত দর্শনীয় অলংকাররূপে শোভা পাইতেন। ক্ষীণালোকোজ্জ্বল বেলগ্রেভিয়ান কক্ষগুলিতে গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় প্রধানতঃ এক একটি ক্ষুদ্র ভক্তমহিলাগোষ্ঠীর নিকট তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে দেখা যাইত। তাঁহাদের দৃষ্টিতে স্মরণাতীত কালের প্রাচ্যদেশাগত এই ঋষি ঐশ্বরিক আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদান্ত-দর্শন রূপ কূপ হইতে তিনি যে তৃষ্ণানিবারক বারি উত্তোলন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইত, ঐ বারি তাঁহারা পান করিতেন। তিনি অনর্গল ভাবে চিত্তাকর্ষক ভাষায় ও নিরন্তর গাম্ভীর্যের সহিত এই বাণী প্রচার করিয়াছেন: ভারতের সকল ধর্মের লক্ষ্য এক, পূর্ণতা সহায়ে আত্মার মুক্তি; প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ ঈশ্বর। বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রকৃতি বশীভূত করিয়া অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ করা ও মুক্ত হওয়াই মানবের আদর্শ। জ্ঞান বা কর্ম বা উপাসনা বা মনঃসংযম, ইহাদের মধ্যে এক বা একাধিক বা সকলগুলি দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে হইবে; ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। যাঁহাদের মন খৃষ্টশাস্ত্রসম্মত প্রটেষ্টান্ট মতের নশ্বর স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা সন্দেহ ও ভ্রমের গোলক-ধাঁধাঁয় ভ্রমণ করিয়া মানুষের অদৃষ্টের প্রধান গ্রন্থি যে কোন উপায়ে মোচন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে সুদূর প্রাচ্য এবং দূরতম অতীত হইতে আনীত স্বামীর বাণী অন্ততঃ কিছুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিবার উপযোগী বলিয়া খেই ধরাইয়া দেয়। স্বামীর বিশ্বহিতপরিকল্পনায় তাঁহার অনেক ইংরেজ ও মার্কিন শিষ্যের অবদান রহিয়াছে। কয়েক জন তাঁহাকে অনেক অর্থ দিয়াছেন। যাহা হক, তৎপ্রবর্তিত পদ্ধতি স্থায়ী হয় নাই এবং তিনি হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক নিয়ম লঙ্ঘন করায় তাঁহার প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে কোন্ প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না যে, বর্তমানে ভারতের প্রাচীন চিন্তা ও মতবাদের প্রতি পাশ্চাত্য জীবনের যে বর্ধমান অনুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছে ইহা বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব; কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার নিজের ব্যাখ্যান-প্রণালী প্রাচীন-ভারতের ঋষিগণের নিকট যেরূপ ঋণী, ইউরোপের আধুনিক চিন্তানায়কগণের নিকটও অন্ততঃ সেইরূপ ঋণী। [৩]

[৩] *The Statesman, July 9, 1902.*—There passed away at Belur on Friday evening, as already announced in these columns, one of the notable figures of the neo-Hindu movement. The Swami Vivekananda was, in his way, a remarkable man, and, as his history shows, a personality of considerable attraction. The most prominent disciple of Ramkrishna Paramhansa, he had a large following in Bengal and Madras, and many people in

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ পত্রিকার ১৯০২ সনের ৯ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল :

পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদক ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌,

মহাশয়,—স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে আপনার বিবরণীতে কয়েকটি ভুল আছে। আপনি বলিয়াছেন স্বামীর গুরু রামকৃষ্ণ কোন মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, তিনি মাত্র ছয় মাস (প্রায় ১৮৫৬ সনে) দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুরোহিত ছিলেন, সেখানে তিনি সাধকের ন্যায় প্রায় চল্লিশ বৎসর বাস করেন। স্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন, এবং আপনি যে বলিয়াছিলেন—তিনি মাত্র এণ্ট্রেন্স পর্যন্ত পড়িয়াছেন, ইহা সত্য নহে। তাঁহার বেদান্ত জ্ঞান আদৌ আপনাদের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া হয় নাই, পরন্তু সংস্কৃতে তাঁহার

Calcutta will remember the fervour of the reception accorded to him on his return from the West. Among the orthodox Hindus he was regarded with no little suspicions, chiefly because his teaching and practice were out of accord with the ceremonial usages of the traditional faith. A man who, whatever his learning and piety, should openly teach that only by taking to animal food can the Hindu people work out their salvation among the nations of the world, could scarcely expect to be approved by the mass of his co-religionists. It was on the other side of the world that the Swami Vivekananda achieved his triumphs. At the memorable Parliament of Religions in Chicago, his superb appearance and the fascination of his speech swept the great assembly off its feet. In the United States—that home of quaint communities and impossible beliefs—the orange monk of the East became the vogue; and, like Mr. Kipling's inimitable lama, he might have complained that they "who follow the Way are turned aside by foolish women." In England, also, he was admired by numbers of more or less thoughtful people who, for all kinds of reasons, had ceased to find satisfaction in the religion of their fathers. The explorer of the byways of heterodoxy in London some six or seven years ago might occasionally have found himself crossing the quiet and withdrawn paths of the Swami. Wealthy ladies took him up. He made a surpassingly effective ornament to their drawing-rooms, with his saffron robe, his splendid turban, his full impassive face, and level mellifluous speech. In dim Belgravian rooms, on cool summer evenings, he was to be heard addressing a little company of devotees, mostly women, in whose eyes this Seer from the immemorial East was clothed in light. They drank of the waters of healing that he seemed to draw from the wells of the Vedanta philosophy. Fluently, impressively, with unvarying solemnity, he delivered his message: that the goal of all the Indian religions is one, each soul is potentially divine; that the aim of the soul is to be free, and to manifest the divinity within, by controlling nature, external and internal; that this is to be done by work, or worship, or psychic control, or philosophy—by one, or more, or all of these; and that herein is the whole of religion. To minds that had lost anchorage in evangelical Protestantism and were wondering in mazes of doubt and disillusion, seeking by any means that offered to untie the master knot of human fate, the Swami's message from the remote East and the remoter past seemed to furnish a clue at least worth following for a little way. Many of his English and American followers contribute to his philanthropic schemes; a few entrusted him with very considerable sums of money. His vogue, however, was not sustained, and in India his departure from the ceremonial law of Hinduism detracted very greatly from his influence. There can be no question that the increased interest in the ancient thought and creeds of India, which is so noticeable a feature of Western life to-day, is largely due to the influence of the Swami Vivekananda; but it may be remarked that his own methods of exposition owed at least as much to the thinkers of modern Europe as to the sages of ancient India.

গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কাশী মাদ্রাজ এবং অন্যান্য সংস্কৃত কেন্দ্রের পণ্ডিতগণের সহিত অনর্গল সংস্কৃতে আলাপ করিতেন এবং যথার্থ উৎস হইতেই তিনি তাঁহার জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটাইতে অধিকতর অভিলাষী ছিলেন।

কলিকাতা, জুলাই ৮। [৪]

[৪] *The Late Swami Vivekananda.*

To the Editor of the "Statesman,"

Sir,—Several inaccuracies have crept into your account of Swami Vivekananda. You say the Swami's Master, Ramkrishna was a priest in a certain temple. The fact is he had been a priest only for six months (about the year 1856) in the temple of Dakhineswar, where he lived as a saint for about forty years. The Swami was a graduate of the Calcutta University and it is not the fact that he read, as you say, only up to the standard of the Entrance Examination. He did not owe his knowledge of the Vedanta to your English translations at all, but he was a sound Sanskrit scholar, talking fluently in Sanskrit with the Pundits of Benares, Madras and other centres of Sanskrit learning, and preferring to quench his thirst for knowledge at the very fountain head.

Calcutta, July, 8. M.

সংসারের প্রতি

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

সংসার,
মোহন মূরতি তব
ভুলিয়েছিল মোরে
যবে ছিল মুগ্ধ আঁখি
কল্পনার রঙিন স্ফটিকে।
কিন্তু
চূর্ণ বিচূর্ণ যেন
আজ সেই স্ফটিক রঞ্জিত!
তব স্বরূপ এবে
নহে পূর্ণ অজ্ঞাত
আমার সমীপে—
আজি বুঝিয়াছি আমি
নহ তুমি শান্তির আগার।

ত্যাগ-ক্ষমা-ধৈরয
স্নেহ-মমতার-রজ্জু
পরাইয়া নির্ধনের গলে
কর তা'র জীবনের ক্ষয়।
এসব গুণরাজি—
ভূষণ সুন্দর যেন
কাপট্য কাল ভুজঙ্গিনীর!
জানি,
ক্রূর আবর্ত্তে ফেলি'
মানবগণে তুমি
কর সর্ব্বহারা,
অকালে কর পক্ব
কৃষ্ণ কেশদাম,

সুন্দর শরীরে কর
জীবন্ত কঙ্কাল !
নাশ শান্তি,
নাশ সুখ
যতনে সাজানো গেহ
কর ছারখার,
বুকের শিশুকে নাও
সবলে কাড়িয়া,
কৃতঘ্নতা মহাপাপে
মহত্বের কর অপমান।
অদৃশ্য, প্রকাশে অক্ষম
বেদনার তুষানলে
দহ চিত্ত মানবের
অনন্ত প্রকারে !

জানি সব-ই
মরমে মরমে।
তবু
তুমি কী করিতে পার
করি যদি অনুভব
অন্তরে অন্তরে—
এ নহে স্থান কভু
সুখ লভিবার,
দুখ-শোক মোদের নিত্যসহচর,
সুখ আকস্মিক সঙ্গী

জীবন-পথের—
খর রবিকর তপ্ত
অজানা পথেতে যথা
অপ্রত্যাশিত কোন
সুশীতল অশ্বত্থ মহান্।
জানি যদি
নির্ম্মম কণ্টক
পথের চিরপরিচিত,
ভূষণ পথের সে যে,
তা'র-ই তরে পথের গৌরব।
জানি যদি এই সত্য
সমগ্র অন্তরে,
কণ্টক বিষম হবে
মুকুট-ভূষণ।

ভগবৎ-প্রেমরজ্জু-বলে
মন্থন করিব ধীরে
বিষের সাগর—
অমৃত করিবে মোরে
অমর অব্যয়,
আর যত তীব্র হলাহল
মহাস্থির সদাতুষ্ট
নীলকণ্ঠ সম
ধরিব এ কণ্ঠ-মাঝে
পরম হরষে।

'বাংলা চরিত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য'*

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পিএইচ্-ডি

বাংলা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানি অনেক নূতন আলোকপাত করিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ যাঁহারা বৈজ্ঞানিক রীতিতে আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থের মতামত উল্লেখ ও আলোচনা করা অপরিহার্য্য হইবে। লেখকের সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে না নিশ্চিত, কিন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া ইতিহাস রচনা করা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হইবে। লেখক প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যুক্তি-তর্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ বাণ অক্লান্তভাবে বর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সন্ধান অব্যর্থ—অন্তরের মর্ম্মস্থলে যাইয়া সেই বাণগুলি প্রবিষ্ট হয়। যাঁহারা চিরাচরিত মত ও পথকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন, তাঁহাদের হৃদয় এই শরজাল-নিক্ষেপের ফলে রক্তরঞ্জিত হইবে, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানকেই যাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের সহিত সর্ব্বত্র একমত না হইলেও তাঁহাকে সুহৃদ্ ও সহায়ক বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন।

গ্রন্থখানি আলোচনা করিতে যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি পড়ে লেখকের ভাষার উপর। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পড়িয়া, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্য্য করিয়া এবং কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া যৌবনে লেখক যে ফেনিল উচ্ছ্বাসময় ও গম্ভীর-নির্ঘোষ-পূর্ণ ভাষায় "স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী" ও "বাংলার রূপ" লিখিয়াছিলেন, আজ তাঁহার পরিণত বয়সের রচনায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এ ভাষা কোথাও অশনি-গর্ভ মেঘের কথা, আবার কোথাও ফল-ভারে অবনত রসাল বৃক্ষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজা রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা বলা হয়; কিন্তু গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে তাঁহার রচনাশৈলী কেহ সজ্ঞানে অনুসরণ করেন নাই। গিরিজাশঙ্কর বাবুর ভাষা যেন রামমোহন রায়ের তর্ক-বিচারের ভাষার আধুনিক সংস্করণ।

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতকথা সর্ব্বজন-বিদিত; সুতরাং একটি ঘটনার পর আরেকটি ঘটনা কিরূপে ঘটিল তাহা জানিবার জন্য আকুল আগ্রহ হইবার কথা নহে। কিন্তু গিরিজা বাবুর গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কোন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেছি অথবা কোন অজ্ঞাত মহাদেশের আবিষ্কারের কাহিনী পড়িতেছি। লেখক অপূর্ব্ব কৌশলক্রমে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কালানুসারে এক একটি ছোট ঘটনা বাছিয়া লইয়াছেন; ব্যবহারজীবীর সুনিপুণ বিশ্লেষণী প্রতিভার দ্বারা উহার অন্তর্নি-

* বাংলা চরিত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রয়াল আট পেজী, ৩৪৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৲ টাকা।

হিত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং মনোবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে একই সূত্রে মণিগণকে গাঁথিবার ভঙ্গীতে বিভিন্ন ঘটনাকে এক সুসম্পূর্ণ সমগ্রতার কেন্দ্রে আবর্ত্তিত করাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাস হইতে রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহের সমালোচনা যেমন শিল্পকলা হিসাবে নূতন নহে, তেমনি আকর চরিতগ্রন্থগুলি অপেক্ষা এই পর্য্যালোচনামূলক গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য কম হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

জয়ানন্দ-বর্ণিত সিরল্যা গ্রামের মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার-কাহিনীর বিশ্লেষণ দিয়া গ্রন্থের আরম্ভ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "যবনরাজভীতি দূরীকরণ এই যুগধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত" (পৃঃ ২২) ; "পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ আর যবনরাজভীতি দূরীকরণ" এই দুই সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে গয়া হইতে ফিরিয়া নিমাই অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়া বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন" (পৃঃ ৯৫)। বৃন্দাবনদাস বলেন যে পাষণ্ডেরা নিরবধি বৈষ্ণবের নিন্দা করে শুনিয়া নিমাইয়ের

"চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম প্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন আগে আসি গিয়া গয়া হইতে॥"

"আগে আসি গিয়া গয়া হইতে" কথাটি হইতে গিরিজাশঙ্কর বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"গয়া যাইবার পূর্ব্বেই, গয়া হইতে ফিরিয়া তিনি যাহা করিবেন তাহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়াই তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রষ্টা এবং সেই জন্যই তিনি নবদ্বীপে কৃষ্ণের অবতার" (পৃঃ ৯৭-৯৮)। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েক মাস পরে বিশ্বম্ভর মিশ্রকে নবদ্বীপে সমাগত বৈষ্ণববৃন্দ অভিষেক করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে পূজা করেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে লেখক বলেন—"বৈষ্ণবসমাজের সম্মুখে বিপদ দুইটি। প্রথম—পাষণ্ডী, দ্বিতীয়—যবনরাজভীতি। এই সঙ্কটসমস্যা পূরণের ভার যে বীর যুবক গ্রহণ করিলেন তিনি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণব শ্রীবাসের বাড়ীতে অভিষেক করিয়া তাঁহাকে অবিসংবাদিরূপে বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিলেন" (পৃঃ ১০৬-১০৭)।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন তখন মল্লগণ তাঁহাকে অশনিরূপে, পিতামাতা সুকুমার শিশুরূপে, পুরনারীরা সাক্ষাৎ মদনরূপে ও কংস তাঁহাকে প্রত্যক্ষ যমরূপে দেখিয়াছিলেন। বিভিন্ন লোকের মনের ভাব অনুযায়ী একই ব্যক্তি বা একই ঘটনা বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। মুসলমানরাজ-ভীতির আশঙ্কায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত গ্রন্থকার—যিনি অত্যন্ত নিকটে থাকিয়া মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু দাশের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব দেখিয়াছিলেন—তিনি শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তবে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি যে বাংলার গণেশ বা দনুজমর্দ্দনদেব, রাজপুতনার রাণা প্রতাপ অথবা মহারাষ্ট্রের শিবজী মুসলমানরাজ-ভীতি দূর করিবার জন্য বিশ্বম্ভর মিশ্র অপেক্ষা অনেক বেশী উদ্যম করিয়াছিলেন ও অনেক বেশী কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা গোব্রাহ্মণ-প্রতিপালক ছিলেন ; তথাপি কেহ তাঁহাদিগকে স্বয়ং ভগবান, অংশ অবতার এমন কি আবেশ অবতার বলিয়াও অভিষেক করে নাই, পূজা করে নাই। আমাদের সহিত মতে না মিলিলেও এক্ষেত্রে লেখকের যুগোপযোগী এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অনাদর করিতে সাহসী হই না।

কিন্তু লেখকের অপর দুইটি অনুমান ও ইঙ্গিতকে কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিতেছি না। একটি হইতেছে নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কারণ। লেখক বলেন "লক্ষ্মীর মৃত্যুতে 'সংসার অনিত্য, কেহ কার নহে' এই তত্ত্বজ্ঞানে'র উদয়ে ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসের বীজ উপ্ত হয়। ইহা অনুমান নয়, ইহা প্রত্যক্ষ" (পৃঃ ৯১)। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নিমাইয়ের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকে লেখক বলেন—"প্রাকৃতে ইহা লক্ষ্মীর জন্য বিরহ অনুমান অসঙ্গত হইবে না" (পৃঃ ১০০)। এখানে গিরিজা বাবু তাঁহার বন্ধু ডক্টর সুশীল কুমার দে'র একটা অনুমানকে জোর দিয়া সিদ্ধান্ত-রূপে দাঁড় করাইয়াছেন। ডক্টর দে লিখিয়াছেন যে "It is possible, however, that the first wife held a unique place in his affection, and the shock of her death had something to do with his samnyasa, which occurred not many years later" (Vaisnava Faith and Movement, P. 56). একটি ষোল বছরের ছেলে যদি ভালবাসিয়া একটি মেয়েকে বিবাহ করে এবং দুই তিন বৎসর পরে সেই মেয়েটির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই শোকের আঘাতে সন্ন্যাসী হইতে হইলে সে মৃত্যুর পরই সন্ন্যাসী হইবে; আবার বিবাহ করিয়া তিন চার বৎসর সংসার করিয়া তারপর সন্ন্যাসী হয় না—মনোবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য না থাকিলেও আমরা তো সাধারণবুদ্ধিতে ইহাই বুঝি। একটা নূতন কথা বলিবার লোভে সাধারণ জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দেওয়া কি খুব সঙ্গত?

গিরিজাশঙ্কর বাবুর দ্বিতীয় কথা—যাহার সহিত আমি একমত হইতে পারি না—তাহা হইতেছে বৃন্দাবনদাসের জন্ম লইয়া। তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসসময়ে জয়ানন্দ-উল্লিখিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপরিচয় এক নারায়ণীর (যিনি ধাত্রীমাতা নারায়ণী হইতে ভিন্ন এবং যাঁহার সঙ্গে উল্লিখিত শর্ব্বাণী, সুভদ্রা চন্দ্রকলা সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে কিছুই পাওয়া যায় না) নাম দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৃন্দাবনদাস নিজে বলিলেও তাঁহার মায়ের বয়স তখন চারিবৎসর মাত্র ছিল না (পৃঃ ১৫৬) এবং কোন রূপ কারণ না দেখাইয়া স্থির করিয়াছেন যে তখন "নারায়ণীর বয়স বিষ্ণুপ্রিয়া হইতে কিছু বেশীই হইবে" (পৃঃ ২০৩-২০৪)। এই প্রসঙ্গে ১৪৫ পৃষ্ঠায় নিত্যানন্দের শ্রীবাসের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা ও ১৫৬ পৃষ্ঠায় নারায়ণা কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন সম্বন্ধে যে উৎকট ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিয়া লেখকের অশিষ্ট ইঙ্গিতকে কোনরূপ গুরুত্ব দিতে আমি রাজী নহি।

বাংলাভাষায় লিখিত চরিতগ্রন্থগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিতে যাইয়া গিরিজাশঙ্কর বাবু একটি মূল্যবান্ আবিষ্কার করিয়াছেন—লোচনের চৈতন্যমঙ্গল যে আকারে এখন ছাপা হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—"এতটা আক্ষরিক মিল প্রক্ষিপ্ত ব্যতিরেকে হইতে পারে না" (পৃঃ ১৪৫); "লোচনে এইরূপ বহু প্রক্ষিপ্ত আছে" (পৃঃ ২৫০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগের কর্ত্তব্য লোচনের চৈতন্যমঙ্গল ও অন্যান্য প্রাচীন চরিত-গ্রন্থগুলির পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পাঠ মিলাইয়া কবির নিজের লেখাকে উদ্ধার করা। যতদিন পর্য্যন্ত এ কার্য্য সম্পন্ন না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত অনুমানের আশ্রয় লইয়া কাজ চালাইতে হইবে।

গোবিন্দদাসের কড়চার অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে লওয়া ইহা গিরিজাবাবুর দ্বিতীয় আবিষ্কার। ইহা সত্ত্বেও তিনি কড়চাকে সম্পূর্ণ জাল বলেন না (পৃঃ ২৬৪)। আমিও বার বৎসর পূর্ব্বে আমার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" গ্রন্থে লিখিয়াছিলাম—"কড়চার আগাগোড়া সমস্তটাই যে জয়গোপাল গোস্বামীর কল্পনাপ্রসূত, তাহার কোন প্রকার প্রাচীন ভিত্তি নাই, একথা বলাও সঙ্গত মনে হয় না। কোন প্রকার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাইলেও আমার বিশ্বাস যে গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীটদষ্ট প্রাচীন পুথিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

লেখক বহু যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপলীলায় ও নীলাচললীলায় অপূর্ব্ব সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন—"He never had, in his emotional absorption, either the time or the willingness to found a sect or a system." শ্রীচৈতন্যদেবের সময় ও ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। নবদ্বীপে কাজীদলন ব্যাপারে অথবা অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও দশনামী সম্প্রদায়-ভুক্ত বহু বিভিন্নপন্থী ব্যক্তিকে এবং রূপ সনাতন ও রায় রামানন্দ প্রভৃতি প্রভাবশালী রাজপুরুষকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করায় তাঁহার সংগঠনশক্তি অবশ্যই প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে যে এজন্য রাজনৈতিক নেতাদের মতন বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণই নাই। নেতৃত্বলাভের জন্য শ্রীচৈতন্য সক্রিয় বা সচেতন ভাবে কোন চেষ্টা করেন নাই। প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবসমাজও একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা করিয়া বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থিত করিয়াছিলেন বলিলে নবদ্বীপলীলা একটি ষড়যন্ত্রের আকার ধারণ করে।

গ্রন্থকার ইতিহাসের ছাত্র নহেন। তাই তিনি বাংলার সুলতানদের কালনির্ণয়ে এখন পর্য্যন্ত ষ্টুয়ার্ট ও ভিন্সেণ্ট স্মিথের দেওয়া তারিখকে মানিয়া লইয়াছেন। এসব বিষয়ে টমাস ও ভট্টশালী অনেক অধিক নির্ভরযোগ্য। কোথাও কোথাও তিনি প্রমাণাদি অনুসন্ধান না করিয়া সংস্কার বা ধারণাবশে কিছু বলিয়া ফেলিয়াছেন। একটি মাত্র উদাহরণ দিব। তিনি বলেন—"ভাগবতের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য দেহরক্ষা করিয়াছেন।" একথা সত্য হইলে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচীন পুরাণগুলির নাম ও সংক্ষিপ্তসার দিতে যাইয়া অল্ বেরুণী ভাগবত পুরাণের বিবরণ দিতেন না।

এইরূপ সামান্য দুই চারিটি অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত কথা থাকিলেও গ্রন্থখানি একটি "work of art" হইয়াছে। ইহা কেবলমাত্র ইতিহাস বা সমাজতত্ত্বের নীরস আলোচনা নহে। সুপণ্ডিত ও অনুভবী গ্রন্থকার নিজের স্বাধীন চিন্তা ও সাধনার দ্বারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনধারাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ও সেই চেষ্টায় অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত হইতে—"বৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বহু গ্রন্থ লিখিয়া মাধুকরী মাগিয়া খাইয়া এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি শয়ন করিয়া যেরূপ কঠোরতার সঙ্গে জীবনধারণ করিতেছিলেন, তাহার সহিত গৌড়দেশে নিত্যানন্দ-

প্রভুর প্রচারপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ এই দুই প্রকারের প্রচারপদ্ধতি মহাপ্রভু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গণসংযোগ এবং শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর রসশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি প্রণয়ন—মহাপ্রভু-প্রবর্তিত একই বৈষ্ণবধর্মের দুইটি অঙ্গবিশেষ। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর জীবিতকালেই নিত্যানন্দ প্রভু প্রবর্তিত ধারা গৌড়ে ও রাঢ়ে প্রবাহিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রসতত্ত্বের ধারা আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর প্রবর্তিত ধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভু প্রচার করিয়াছেন, ভাগবতে যাহাকে বলে অকিঞ্চন সমরস; আর শ্রীরূপ-সনাতন প্রচার করিয়াছেন যুগল-রস। দুইটি ভিন্ন ধারায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর পর ইহা বাংলাদেশে মহাপ্রভুর নামাঙ্কিত বৈষ্ণবধর্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই ধারাই মহাপ্রভুর জীবিতকালে মহাপ্রভুর জীবন হইতে উদ্ভব হইয়াছে" (পৃঃ ৩০৮)।

লেখক শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে ক্রমবিকাশ দেখাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"নীতিবাদ ক্রম-বিকাশের পথে নবদ্বীপ হইতে পুরীতে পরিবর্তিত হইয়াছে, যেমন অবতারবাদ নবদ্বীপ হইতে পুরীতে কৃষ্ণ হইতে রাধায় রূপান্তরিত হইয়াছে" (পৃঃ ৩৪০)। আমরা লেখকের বিশ্লেষণ-ধারাতেও একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি। প্রথম দিকে তিনি প্রত্যেক ব্যাপার তটস্থ হইয়া, এমন কি কোথাও কোথাও বিদ্রূপের ভাব লইয়া বিচার করিতেছেন—কোন কিছুই তিনি যেন বিশ্বাস করিতে, মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। শেষের দিকে, শ্রীচৈতন্যচরিত আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, কাঠিন্য দূরীভূত হইয়াছে, তিনি ঐতিহাসিকের ভূমি হইতে সাধকের স্তরে উন্নীত হইয়াছেন। তাই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিয়াছেন —"কলির জীবকে নিজের স্কন্ধে তুলিয়া জগন্নাথ দেখাইবার ভার প্রভু নবদ্বীপলীলায় শ্রীবাসের বাড়ীতে আচার্য্য অদ্বৈতের সম্মুখে অঙ্গীকার করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরীলীলায় দিব্যোন্মাদের ভিত্তিভূমির স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইয়া তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই" (পৃঃ ৩৩০)।

শ্রাবণ-সাঁঝে

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী

নিবিড় মেঘে হৃদয়-আকাশ
আঁধার আজি ঘোর,
চপল হাসি অঝোর ধারায়
ব্যাকুল পরাণ মোর।

কংস-কারায় কঠিন বাঁধন
খুল্‌তে হৃদয় মাঝে,
লুকিয়ে এস নীরদ-বরণ
আজ্‌কে শ্রাবণ-সাঁঝে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাব

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল্

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর নিখিল ধর্ম্ম-মহাসভার অধিবেশনের সময় হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তাঁহার মহাসমাধির মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-বাণী প্রচার করিয়া সমগ্র সভ্য জগতের ভাব, চিন্তা এবং অন্তর্জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর আনয়ন করেন। এইরূপ জগদ্ব্যাপী ধর্ম্মাভিযান ও অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক বিজয়ের কথা অপর কোন ধর্ম্মবীর সম্বন্ধে ইতিহাসে কীর্ত্তিত দেখা যায় না।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শুভসংযোগ হইতে যে সুমহান্ যুগের উদ্ভব হইয়াছে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে তাহার অবসান হইবে, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ও চেতনা তাঁহারা সমগ্র মানবসমাজে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কত অচিন্ত্য ও বিচিত্র ভাবে কত কত শতাব্দী জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে,তাহা কল্পনা করাও সাধ্যাতীত। তবে আমাদের স্থূলবুদ্ধির সহায়তায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব বাহ্যতঃ যেরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারিতেছি এক্ষণে মোটামুটি তাহারই উল্লেখ করিব।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও ভক্তসম্প্রদায় এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রতিষ্ঠান-সমূহ

"যাহা শিব, মঙ্গলকর তাহা অব্যর্থ—তাহা নানারূপে আত্মবিস্তার করিতে থাকে, আপনার স্থান আপনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আপনার অনুকূল সহযোগী মিত্রগণকে বাছিয়া নেয়। * * নদীস্রোতের ন্যায় সৎ-চিন্তা, মহদ্ভাব ও আপনার অগ্রগতির পথ আপনিই খুঁজিয়া নেয়, প্রতিদিন বর্দ্ধিত ও সমাজকর্ত্তৃক আদৃত হইয়া তাহার আত্ম-প্রকাশের উপযোগী প্রতিষ্ঠানসকল সৃষ্টি করে—অন্যায় ও পাপকে জয় করিবার জন্য যন্ত্র প্রস্তুত করে—তাহার অন্তঃস্থিত অর্থ, তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা ও ব্যক্ত করিবার জন্য অনুরক্ত শিষ্যসম্প্রদায় গড়িয়া তোলে।"[১] মনীষী এমার্সনের এই সার-গর্ভ উক্তি কত সত্য তাহা স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মপ্রচার সম্পর্কে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

স্বামীজির সুকণ্ঠ-নিঃসৃত বেদান্তের অমৃত বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছে তাঁহাদের ত কথাই নাই, যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাও বেদান্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষে, আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে এবং ইংলণ্ডে সহস্র সহস্র নরনারী পাওয়া যাইবে যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দকে স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুরূপে বরণ করিয়াছেন। স্বামীজি কখনও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করেন নাই, অথচ পরে আমরা দেখিব উক্ত মহাদেশের ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং চিলিপ্রদেশে স্বামীজির গ্রন্থাবলী এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" পর্ত্তুগীজ

১ Representative Men গ্রন্থের 'Uses of Great Men' শীর্ষক প্রবন্ধ।

এবং স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং বেদান্তসমিতি ও বেদান্ত-বিষয়ক পত্রিকা-সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে বহু শিক্ষিত দক্ষিণ-আমেরিকাবাসীর জীবন বেদান্তের আদর্শে গঠিত হইতেছে। তাই স্বামীজির শিষ্য এবং ভক্ত-মণ্ডলীর সম্পূর্ণ তালিকা ও বিবরণ প্রস্তুত করা অসম্ভব। আমরা শুধু তাঁহার জীবিতকালের প্রধান প্রধান শিষ্য, ভক্ত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব :

মাদাম্ ম্যারি লুই নাম্নী মহিলা সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকায় স্বামীজি হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তৎপর স্বামীজি তাঁহাকে 'স্বামী অভয়ানন্দ' নাম প্রদান করেন। এই মহিলা ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক নগরের স্থায়ী অধি-বাসিনী হন। স্বামী অভয়ানন্দ পাশ্চাত্যদর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে প্রায় দুই বৎসর আমেরিকার নগরে নগরে বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে চিকাগো নগরে আসিবার পর উক্ত মহানগরের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অনুরোধে সেখানে 'Advaita Society' স্থাপন করেন। যাঁহারা স্বামী অভয়ানন্দের নিকট বেদান্তশিক্ষা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সকল শিষ্যের মধ্যে হিন্দু-শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী অনুষ্ঠানাদির পর কেহ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী অভয়ানন্দের ভারতবর্ষে অবস্থান-কালে ঐ সকল শিষ্যই অদ্বৈত সোসাইটির কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি প্রায় চারি বৎসর আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার করিয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বোম্বে মান্দ্রাজ কলিকাতা বরিশাল ঢাকা ও ময়মনসিংহে জ্ঞানগর্ভ উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে বিস্ময়াভিভূত করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়গুলি ছিল :—(1) The Vedanta and its Prospect in the West, (2) Material and Spiritual Evolution, (3) Law of Karma, (4) Salvation Versus Liberation, (5) Religion, (6) Love of God, (7) Advaita-vada. ঢাকা Northbrook Hallএ এক অভিনন্দনপত্র দ্বারা ঢাকাবাসিগণ তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

অভয়ানন্দের পরই Leon Landsberg স্বামীজিদ্বারা সন্ন্যাসে দীক্ষিত হইয়া স্বামী কৃপানন্দ নাম গ্রহণ করেন। কৃপানন্দ ইহুদীবংশে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আমেরিকায় আসিয়া নিউ ইয়র্কে এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের লেখকের কাজ করিতেছিলেন। বেদান্তপ্রচার-কার্য্যে তিনি স্বামীজিকে নানারূপে সহায়তা করেন। স্বামীজির অনুপস্থিতি-কালে মিস্ ওয়াল্ডো (Miss S. E. Waldo), স্বামী অভয়ানন্দ এবং স্বামী কৃপানন্দ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার করিতেন।

স্বামীজির আমেরিকান শিষ্য-শিষ্যাগণের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মিস্ ওয়াল্ডোর নাম উল্লেখযোগ্য। দীক্ষার পর স্বামীজি তাঁহাকে 'হরিদাসী' নাম প্রদান করেন। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক কবি Ralf Waldo Emerson এর সঙ্গে Miss Waldo-র আত্মীয়তা ছিল। তিনি দীর্ঘকাল দর্শন এবং তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় দীক্ষা দিবার সময় স্বামীজি মিস্ ওয়াল্ডোকে কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ

করিয়া তাহা হইতে একটি বাছিয়া লইতে বলিলে মিস্ ওয়াল্‌ডো শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রটি বাছিয়া নিলেন। স্বামীজিকৃত 'রাজযোগ' গ্রন্থ মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রগুলি সহ স্বামীজির স্বকৃত ব্যাখ্যা। স্বামীজি মুখে মুখে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন, আর মিস্ ওয়াল্‌ডো (হরিদাসী) তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কাজ চলিত। হরিদাসীর রাজযোগ-বিষয়ে এত অভিনিবেশ দেখিয়া স্বামীজি তাঁহাকে 'যতিমাতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে রাজযোগ শিক্ষা দিবার জন্য স্বামীজি একমাত্র যতিমাতা হরিদাসীকেই নিয়োগ করিতেন। স্বামীজির ইংরেজ শিষ্য মিঃ গুড্‌উইন J. J. Goodwin) আমেরিকায় আসিবার পূর্ব্বে হরিদাসীই স্বামীজির বক্তৃতার নোট লিখিয়া ঐগুলিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সহস্রদ্বীপো-দ্যানে (Thousand Island Park) স্বামীজি তাঁহার শিষ্যা ও অন্যান্য ধর্মপিপাসু মহিলাদিগকে যে সকল অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করেন মিস্ ওয়াল্‌ডো তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তাহাই "The Inspired Talks" নামক গ্রন্থাকারে পরে প্রকাশিত হয়। মিস্ ওয়াল্‌ডো লিখিত উক্ত উপদেশাবলী শুনিয়া স্বামীজি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন তিনি যেন নিজের ভাব ও চিন্তা নিজের ভাষায়ই শুনিলেন। স্বামীজির এই বিদুষী পাশ্চাত্যদেশীয়া শিষ্যা আবশ্যকমত তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিতেন, এমন কি খাবার বাসনপত্র পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

সিষ্টার ক্রিশ্চিন্ (Sister Christine) স্বামীজির প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিষ্যগণের অন্যতম। তিনি ডিট্রয়েট্ নগরের শিক্ষা-বিভাগে এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন ; কিন্তু স্বামীজির নিকট সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিতা হইয়া উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে একযোগে ভারতে নারী-শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'Memoirs of Sister Christine" শীর্ষক তাঁহার লিখিত যে প্রবন্ধাবলী Prabuddha Bharata পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সিষ্টার ক্রিশ্চিনের সাহিত্যিক প্রতিভা এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজির আমেরিকান শিষ্যা দেবমাতা ভারতবর্ষে কিছুকাল বাস করেন। তিনিও একজন শক্তিশালিনী লেখিকা ছিলেন। তাঁহার রচিত (1) Sri Ramakrishna and His Disciples", (2) "Days in an Indian Monastery", (3) "The Habit of Happiness", (4) "The open Portal" —এই চারিখানা গ্রন্থ দেবমাতার দেবস্বভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বীয় গুরুদেবের প্রতি অবিচলা ভক্তি, স্বামীজির গুরু-ভ্রাতাগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভারত-প্রেমের অকাট্য প্রমাণস্বরূপ। স্বামীজির আমেরিকান শিষ্যগণের মধ্যে Dr. M. H. Logan, Mr. C. F. Patterson, Mr. A. S. Wollberg, Miss Spencer, Professor Wyman, Prof. Wright এবং Dr. Street-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রীতির শৃঙ্খলে সম্বদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে Miss Josephine MacLeod এর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথমদর্শন হইতে তিনি স্বামীজিকে "পরমাত্মার প্রেরিত দূত", "নররূপী যীশুখৃষ্ট" ('A Messenger of the Spirit, a Christ-soul') বলিয়া স্বীকার করেন। তাই তিনি স্বামীজির প্রচারকার্য্যে সমস্ত হৃদয়-মন প্রয়োগ করিয়া সহায়তা করিতেন।

তিনি পূর্ব্বেই ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া গীতার আদর্শ অনুসারে নিজ জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। স্বামীজিকে তিনি একাধারে গুরুদেব ও পরমবন্ধু মনে করিতেন। তিনি স্বামী সারদানন্দ, Mrs. Ole Bull এবং অপর কয়েক জনের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়া স্বামীজির সৎসঙ্গ লাভ করেন।

স্বামীজি আমেরিকায় প্রচার আরম্ভ করিবার সময় হইতেই তাঁহার সঙ্গে মিসেস্ ওলি বুল্ (Mrs. Ole Bull) পরিচিতা হন। মিসেস্ বুল বদান্যতা, পরহিতচিকীর্ষা, বিদ্যাবত্তা এবং নৈতিক উৎকর্ষবশতঃ সমগ্র আমেরিকার শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার গৃহে স্বামীজি অনেকবার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি নানা ভাবে স্বামীজির প্রচারকার্য্যে সহায়তা করেন এবং বেলুড় মঠ নির্ম্মাণের জন্য অর্থদান করেন। কলিকাতার নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি স্বামীজি ও অন্য বন্ধুগণ সহ আলমোড়া এবং কাশ্মীর ভ্রমণ করেন।

মিঃ ও মিসেস্ লেগেটের সঙ্গেও স্বামীজির গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। ডিড্রয়েট নগরের মিসেস্ ফ্রাঙ্ক এবং চিকাগো নগরের হেইল-দম্পতী (Mr. & Mrs. Hale) এবং তাঁহাদের কন্যাগণের সঙ্গেও স্বামীজী প্রগাঢ়প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

দীন তীর্থযাত্রী

(The Poor Pilgrim)

স্বামী পরমানন্দ

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিজন জীবনপথে একাকী ভ্রমিয়া
কত না কাতর কত বিব্রত হইয়া,
একান্ত সহায়শূন্য কপর্দ্দকহীন
পথের সন্ধানে বৃথা কেটে যায় দিন।

শুধু যবে দেখা যায় জ্যোতিটুকু তব
বিচ্ছুরিত হইতেছে অতি অভিনব,
তোমার ভুষণ হতে পথের মাঝারে
তখনি গো পারি আমি পথ চিনিবারে।
শুধু সেই কালে করে তবানুসরণ
ক্ষীণ মম এই দুটি স্খলিত চরণ।

কৃপা কি করিবে নাথ ক্ষণেকের তরে,
দাঁড়াইবে কিছুকাল পথেরি এ ধারে?
দয়া ক'রে দাও মোরে চরণ পূজিতে,
বাহির হয়েছি, দীন, তোমারে খুঁজিতে।

বিজ্ঞানের পরিণতি

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম্-এ

পৃথিবীর যে সব দেশে একতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান সে সব রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক-দের পক্ষে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এমন কি বৈজ্ঞানিকদের তথ্য-প্রকাশেরও স্বাধীনতা থাকে না। এতদিন পর্য্যন্ত রুশ পররাষ্ট্রদপ্তর থেকে প্রচার করা হয়েছে, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে রাশিয়া বিজ্ঞানের অবদানকে স্বীকার করে নিয়েছে। অর্থাৎ রাশিয়ার প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিককে স্বাধীন ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক 'লাইসেম্‌কো ঘটনা'টির ভিতর দিয়ে রুশনীতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, রাশিয়া এমন কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে বিবেচনা করতে পর্য্যন্ত রাজী নয় যার সাথে রাশিয়া-কর্ত্তৃক গৃহীত চিন্তাধারার সংঘর্ষ বাধতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক যে, কোন নূতন চিন্তাধারাকে গ্রহণ করবার আগে সে চিন্তাধারাকে সব দিক থেকে বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু রাশিয়া নিজের গৃহীত চিন্তাধারার বাইরে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে আমল দিতে চাচ্ছে না। রাশিয়া বলে, জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে মাইকুরিন্ যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেবলমাত্র সে সব অভিমতই সত্য; অর্থাৎ মাইকুরিনের জীব-তত্ত্বসম্বন্ধীয় অভিমত ছাড়া অন্য কোন চিন্তা-ধারাকে গ্রহণ করা হবে না।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আজ যে পথ দিয়ে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে তা'তে মানুষ বিজ্ঞানের কল্যাণময় রূপটি দেখতে পাচ্ছে না; বিজ্ঞান দিনের পর দিন মানুষের নিরাপত্তার সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে মানুষ যা'তে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে না পড়ে সে জন্য প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে চেষ্টা করতে হবে। ডক্টর জুলিয়ান্ হাক্সলি বলেন: "It is clear that science is often in conflict with society or with powerful groups or vested interests in society. Sometimes science seems to threaten social stability, at others to run counter to the dominant aims of society. The problem is how to reconcile the autonomy of science with the needs of society as a whole. It is not always easy; but must be done if we are to enjoy the benefits which science alone can bring to society." অর্থাৎ 'এটা সুস্পষ্ট যে সমাজ, সমাজের শক্তিশালী দল বা কায়েমী স্বার্থের সাথে বিজ্ঞানের প্রায়ই সংঘর্ষ বাধে। কোন কোন সময়ে মনে হয়, বিজ্ঞান সামাজিক সংহতি নষ্ট করে ফেলছে এবং প্রধান সামাজিক উদ্দেশ্যগুলোর বিরোধী হয়ে উঠছে। সমস্যা হচ্ছে, কি করে সমাজের প্রয়োজনের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর

হতে পারে। সব সময়ে সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ নয়। কিন্তু একমাত্র বিজ্ঞানই সমাজের যে সব উপকার সাধন করতে সমর্থ, সে সব উপকার যদি আমরা পেতে চাই, তাহলে সামঞ্জস্য বিধান করতেই হবে।' আজ বিজ্ঞান এবং সমাজের সম্বন্ধ ক্রমশঃ যে অবনতির দিকে চলেছে সে অবনতির পেছনে দুটো প্রধান কারণ রয়েছে: প্রথম কারণ হল শিল্পের প্রসার। দ্বিতীয় কারণ হল, বিজ্ঞানের সাধারণ নীতিগুলো মানুষ গ্রহণ করতে পাচ্ছে না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ যান্ত্রিক সভ্যতার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সে যৌক্তিক ধর্ম্ম হারিয়ে ফেলছে এবং জীবনদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছে না। মানুষ ভুলে যায়, জীবন-দর্শন ছাড়া তার জীবন শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে সে কল্যাণ লাভ করবার জন্য মানুষ লালায়িত। কিন্তু যখন সে হতোদ্যম হয়ে পড়ে তখন সে যান্ত্রিক জীবনের মর্ম্মবেদনা তীব্রভাবে অনুভব করে। আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি সে কথাটি হল, মানুষ যখন বিজ্ঞান এবং নিজের জীবন-দর্শনের সাথে সমন্বয়সাধন করতে পারে না তখন তার নৈতিক অবনতি ঘটে এবং বিজ্ঞান মনুষ্যসমাজের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। সেটি হচ্ছে, আজ বিজ্ঞান এবং সমাজের সম্বন্ধ যে অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে, সে অবনতির জন্য কেবলমাত্র সাধারণ মানুষই দায়ী নয়। এই অবনতির জন্য বৈজ্ঞানিকদেরও দায়িত্ব আছে, তাঁদের সৃষ্টির ফলে সমাজ আজ যে সব ক্ষতিকর সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়েছে সে সব সম্ভাবনা দূরীভূত করতে তাঁরা অসমর্থ হয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টি কেবলমাত্র শিল্পের প্রসারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। তাঁরা মানুষের মনে সত্যি-কারের বৈজ্ঞানিক মনোভাব জাগাতে পারেন নি। তাই মানুষ আজ বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না, বিজ্ঞানকে তার কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা সম্ভবপর। ফলে বিজ্ঞান এবং মানুষের জীবনের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে।

সমাজ এবং বিজ্ঞানের সম্বন্ধের শোচনীয় পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা আমাদের বর্তমান ব্যর্থতার কারণ নির্দ্ধারণ করবার জন্য চেষ্টা করি তাহলে দেখব, আজ সমস্ত মানব-জাতি একটা বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। এই সঙ্কটের পেছনে রয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মনুষ্যত্ব-বিরোধী নীতি। জীবনের প্রত্যেক স্তরের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে বিশেষজ্ঞগণ আধুনিক বিজ্ঞানকে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবহার কচ্ছেন। তাই দেখতে পাচ্ছি, মানুষের জীবনের দার্শনিক ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়েছে। আলডুস্ হাক্সলি বলেছেন: "In practice great masses of human beings have again and again been sacrificed to applied science." অর্থাৎ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জন্য মানুষকে বার বার বলি দেওয়া হয়েছে। এস্থলে প্রশ্ন উঠে—বিজ্ঞান মানুষের জন্য না মানুষ বিজ্ঞানের জন্য? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জগতের প্রত্যেক চিন্তাশীল মনীষী জোর দিয়ে বলবেন, কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেখানে এর ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে সেখানেই হয়েছে অবনতি। আলডুস্ হাক্সলি সত্যই বলেছেন: "The finding of science—especially of science as applied for the bene-

fit of the holders of centralised economic and political power—are frequently in conflict with humanity's pragmatic values, and this conflict has been and still is the source of much unhappiness, frustration and bitterness."

শিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে শিল্পপতিদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা এসে পড়েছে। প্রকৃত পক্ষে এঁরা সমাজের বিরাট অংশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কচ্ছেন। সম্প্রতি বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্রে শিল্পগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার জন্য আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে। আমাদের মনে হয়, কেবলমাত্র শিল্পগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই মানুষ বিপদ থেকে মুক্তি পাবে না, মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক মনোভাব জাগিয়ে তোলা দরকার। কেবলমাত্র শিল্পের প্রসারের ভেতর দিয়ে মানুষের কল্যাণ আসবে না। আলডুস্ হাক্সলি বলেন, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোতে "Man as a moral, social and political being is sacrificed to homo faber or man the smith, the inventor and forger of new gadgets."

সুতরাং আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি, শিল্পের প্রসারের ফলে বিজ্ঞান মানুষের সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। অথচ এর মঙ্গলময় বৈশিষ্ট্য এখনও পর্য্যন্ত ততটা ফুটে উঠেনি।

জ্ঞানোদয়

(শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ অবলম্বনে)

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

গৃহস্থের পুকুরেতে রাতে যায় চুরি,
নিতি নেয় চোর এসে মাছ ভুরি ভুরি।
বাগানের চারিদিকে একদিন শেষে
ঘিরিল পাড়ার লোক রাতিকালে এসে।
ঘেরা পড়ি' ধূর্ত্ত চোর ভাবে সেইক্ষণ,
"পালাবার পথ নাই, কি করি এখন?"
বুদ্ধি এক সেইখনে মনে এল তা'র,
ছাই মেখে বসে গেল সাধু নির্ব্বিকার।
চারিদিকে খুঁজি সবে নাহি পায় চোর,
দেখে শেষে বৃক্ষমূলে বসিয়া বিভোর—
ধ্যান-মগ্ন যোগী এক মুদিয়া নয়ন
দেখি সবে ভক্তিভরে বন্দিল চরণ।
তখন সে চোর ভাবে এত মন্দ নয়,
"সাধু হ'লে ভগবানে পাইব নিশ্চয়।"

মিশ্র মণ্ডন :: বিশ্বরূপ মণ্ডন :: উম্বেক মণ্ডন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'বেদান্ত-দর্শন—অদ্বৈতবাদ' গ্রন্থে বিদ্যারণ্য (অনন্তানন্দ ?)-কৃত 'শংকর-দিগ্‌বিজয়', চিদ্‌বিলাস-রচিত 'শংকরবিজয়-বিলাস', কর্ণাল জ্যাকবি এবং প্রবাদাবলম্বনে মণ্ডন মিশ্র ও বিশ্বরূপ সুরেশ্বরাচার্য এক ব্যক্তি নির্ণয় করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক হিরণ্য 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির' উপক্রমণিকায় এবং মহা-মহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী 'ব্রহ্মসিদ্ধি'র উপক্রমণিকায় বলেন, মণ্ডনমিশ্র নিজে সন্ন্যাস নেন নি, যদিও তিনি অদ্বৈতবেদান্তীদের এক-দণ্ড সন্ন্যাস সম্বন্ধে মত দেন। পরন্তু দ্বৈতবাদীরা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। একদণ্ড মানে একমাত্র উপনিষদ্‌ই দণ্ড (শাসন) যার, আর ত্রিদণ্ড মানে—যজ্ঞ, উপাসনা ও উপনিষৎ দণ্ড (শাসন) যার। পরবর্তী কালে ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের খুব সমর্থক ছিলেন। ত্রিদণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায়—

"বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥"

অনন্তানন্দ গিরি তাঁর 'শংকর-দিগ্বিজয়' নামক গ্রন্থে মণ্ডন ও সুরেশ্বরকে এক ব্যক্তি বলেছেন। কিন্তু আনন্দানুভব তাঁর 'ন্যায়রত্নদীপাবলী'তে পাঁচজন বড় বড় দার্শনিকের উল্লেখ করেছেন—"কিঞ্চ প্রসিদ্ধপ্রভাবৈর্বিশ্বরূপ-প্রভাকর-মণ্ডন-বাচস্পতি-সুচরিত-মিশ্রৈঃ শিষ্টাগ্রণীভিঃ পরিগৃহীতস্য কথং দ্বেষমোহাভ্যাং বিনাপ্যপলাপসংভবঃ"—বিশ্বরূপ, প্রভাকর, মণ্ডনমিশ্র, বাচস্পতি এবং সুচরিত মিশ্র ইত্যাদি। সেইজন্য কুপ্পুস্বামীর মতে সুরেশ্বরাচার্য মণ্ডন উপাধিধারী বিশ্বরূপভট্ট। সেই জন্য সুরেশ্বর সন্ন্যাসের পরও বিশ্বরূপাচার্য নামে খ্যাত। প্রভাকরও একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরন্তু, মণ্ডনমিশ্র শংকর কর্তৃক পরাজিত হয়েও গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। চিৎসুখী তাঁর 'তত্ত্বপ্রদীপিকা' ও বিদ্যারণ্য তাঁর 'বিবরণ-প্রমেয়'তেও এইরূপ মতপ্রকাশ করেন।

আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে মণ্ডন-মিশ্র ও উম্বেক এক ব্যক্তি। কারণ বিদ্যারণ্য-কৃত 'সংক্ষিপ্ত-শঙ্করদিগ্‌বিজয়' গ্রন্থে ঐ রূপই পাওয়া যায়। কিন্তু স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দের (পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বেদান্তভূষণ) মতে উম্বেক হলেন ভবভূতি ('অদ্বৈতসিদ্ধি' ভূমিকা দ্রঃ)। এ মঃ মঃ কুপ্পুস্বামীরও মত। কারণ চিৎসুখের 'তত্ত্বপ্রদীপিকা'র উপর প্রত্যক্স্বরূপ ভগবানের যে 'মানস-নয়ন-প্রসাদিনী' টীকা পাওয়া যায়, তাতে তিনি শিবাদিত্য উদয়ন বাচস্পতি ভব-নাথ বল্লভ ভাসর্বজ্ঞ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি দার্শনিকের সহিত উম্বেক বা ভবভূতির নাম করেছেন।

মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণদেশীয় মঠাধীশ শ্রীমৎ নরসিংহ ভারতীর যে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে বোধ হয় 'মণ্ডন' তাৎকালিক পণ্ডিতদের একটি উপাধি। তখন দুজন মণ্ডন ছিলেন—একজন বিশ্বরূপভট্ট মণ্ডন ও মণ্ডনমিশ্র। আমার বোধ হয় ভবভূতি বা উম্বেকও মণ্ডন উপাধি-ভূষিত ছিলেন। গোবিন্দনাথের 'শংকরাচার্য-চরিতে' দেখা যায়,

কুমারিল্লের পরামর্শে শংকরের সহিত বিশ্বরূপের সাক্ষাৎ ঘটে, কিন্তু উহাতে শংকরের মণ্ডনমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকারের উল্লেখ নেই। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহাশয় আর একটি ব্যাপার উল্লেখ করেছেন—তৎপূর্ববর্তী ব্যাসাচল তাঁর 'শংকরবিজয়' নামক গ্রন্থে কুমারিল্লের পরামর্শে বিশ্বরূপের নিকট যাবার পথে 'আজীবন গৃহস্থ' মণ্ডনমিশ্রের সহিত শংকরের সাক্ষাৎ হয়। অতএব আমরা বলতে পারি বিশ্বরূপও মণ্ডনমিশ্রের ন্যায়ই জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়বাদী পরন্তু মাত্র পূর্বমীমাংসক ছিলেন, শ্রীশংকর-কর্তৃক পরাজিত হয়ে সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে সুরেশ্বর বা বিশ্বরূপাচার্য বলে পরিচিত হন এবং 'নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি', 'বৃহদারণ্যক-বার্তিক' আদি গ্রন্থে শংকর-মতকেই সবিশেষ পরিস্ফুট করেন। এ সম্বন্ধে আনন্দানুভব একদণ্ড সন্ন্যাস-পক্ষপাতী বিশ্বরূপের একখানি স্মৃতিগ্রন্থ উপলক্ষ করে আরও পরিষ্কার করে বলছেন—"গৃহস্থাবস্থায়াং বিরচিতে চ বিশ্বরূপগ্রন্থে দর্শিতবাক্যপরিগ্রহো দৃশ্যতে। ন চাসৌ গ্রন্থঃ সন্ন্যাসিনা বিরচিতঃ। তথা হি পরিব্রাজকাচার্য-সুরেশ্বর-বিরচিতেতি গ্রন্থে নাম লিখেৎ; লিখিতং তু ভট্টবিশ্বরূপবিরচিতেতি।"

এখন যদি আমরা মিশ্রমণ্ডনের 'ব্রহ্মসিদ্ধি' গ্রন্থ * এবং সুরেশ্বরাচার্যের (বিশ্বরূপভট্ট মণ্ডনের) 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' গ্রন্থ তুলনা করি তা হলে আমরা নিম্নলিখিত মতভেদ গুলি পাই :—

(১) মণ্ডনের স্ফোটবাদ ও শব্দব্রহ্মবাদ বা শব্দাদ্বৈতবাদ—সুরেশ্বরের শংকরানুযায়ী স্ফোটবাদখণ্ডন, বর্ণের আপেক্ষিক নিত্যতা স্বীকার ও ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ-প্রতিষ্ঠা।

(২) মণ্ডনমতে ভাবাদ্বৈত অর্থাৎ ভাবপদার্থ এক শব্দব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় নাস্তি; এই শব্দাদ্বৈতজ্ঞানেও প্রপঞ্চাভাব এবং অবিদ্যাপ্রধ্বংসাভাব রূপ দুই অভাব বর্তমানেও শব্দাদ্বৈতজ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় না—সুরেশ্বরমতে অবিদ্যার আত্যন্তিক নিবৃত্তিই ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাব পদার্থ নেই। ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বৈত পদার্থ। ব্রহ্মভিন্ন কোন অভাব-পদার্থ নেই।

(৩) মণ্ডনমতে অবিদ্যার আশ্রয় জীব ও বিষয় ব্রহ্ম। বাচস্পতিও 'ভামতী'তে এই মত পোষণ করেন—সুরেশ্বরমতে অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় এক অদ্বৈত ব্রহ্মপদার্থই। শংকর-শিষ্য পদ্মপাদাচার্য ও 'বিবরণ'কার প্রকাশাত্মযতিরও এই মত।

(৪) মণ্ডনমতে অবিদ্যা দু' প্রকার—(ক) অগ্রহণ (non-apprehension—আবরণ) ও (খ) অন্যথা-গ্রহণ (misapprehension—বিক্ষেপ)। 'ভামতী'কার বাচস্পতি জীবাশ্রিত অবিদ্যাকে তুলারূপা (individual) এবং ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যাকে মূলারূপা (total) স্বীকার করেন। তার মধ্যে তুলাতে বিক্ষেপ এবং মূলাতে আবরণ সাধিত হয়—সুরেশ্বরমতে অবিদ্যা এক, বিক্ষেপ ও আবরণ তার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি।

(৫) মণ্ডনমতে বেদান্তশ্রবণে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, পরে মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা

* বিশ্বরূপভট্ট মণ্ডনের গুরু কুমারিল্লের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখন প্রসিদ্ধ—(১) 'শ্লোকবার্তিক', (২) —'তন্ত্রবার্তিক' এবং (৩) টুপ্‌টীকা'; এবং মণ্ডনমিশ্রের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—(১) 'মীমাংসানুক্রমিকা,' (২) 'ভাবনা-বিবেক,' (৩) 'বিধি-বিবেক,' (পূর্বমীমাংসা সম্বন্ধে) (৪) স্ফোটসিদ্ধি বা শব্দবিজ্ঞান (Philosophy of word) (৫) 'বিভ্রমবিবেক' (প্রমাণসম্বন্ধে—Epistemology) এবং (৬) 'ব্রহ্মসিদ্ধি' বা 'শব্দাদ্বৈতবাদ'। কুমারিল্ল পূর্বমীমাংসা ও বর্ণনিত্যবাদী, পরন্তু মণ্ডন মিশ্র উত্তরমীমাংসক ও স্ফোটবাদী। অতএব বিশ্বরূপভট্ট মণ্ডনই কুমারিল্ল-শিষ্য ছিলেন, মণ্ডন মিশ্র নয়।

অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়—সুরেশ্বর স্বীয় গুরুর "ঔপনিষদং পুরুষম্" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬) বাক্যের "য ঔপনিষদঃ পুরুষোঽশনায়াদিবর্জ্জিতঃ উপনিষৎস্বেব বিজ্ঞেয়ো নান্যপ্রমাণগম্যঃ"—ব্যাখ্যার অনুযায়ী বলেন, তত্ত্বমস্যাদিশব্দজন্য অপরোক্ষ জ্ঞানে কোন বাধা নেই।

(৬) মণ্ডন কুমারিল্লের বিপরীতখ্যাতিই (ন্যায়মতে অন্যথাখ্যাতি) বিবর্ত বা ভ্রমস্বরূপে গ্রহণ করেছেন—সুরেশ্বর শংকরের অনির্বচনীয়া খ্যাতিই বিবর্ত বা ভ্রমস্বরূপ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

(৭) মণ্ডন ঈশ্বর, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেছেন। (পদ্মপাদ, 'সংক্ষিপ্তশারীরক'-কার সর্ব্বজ্ঞানমুনি এবং তদনুসারী প্রকাশাত্মযতি, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য প্রভৃতি শাংকর দার্শনিকেরাও এই মত পরবর্তী কালে স্বীকার করেছেন। 'বিবরণ'-কার এবং 'সংক্ষিপ্তশারীরক'-কারের মত এই প্রতিবিম্ববাদ আবার দ্বিবিধ)। সুরেশ্বর আভাসবাদী, বাচস্পতি অবচ্ছেদবাদী এবং অপ্পয়-দীক্ষিত একজীব-দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী। ভগবান ভাষ্যকারে কিন্তু ঈশ্বর, জীব ও ব্রহ্মসম্বন্ধ-নির্ণায়ক উক্ত সর্ববিধ মতবাদীর দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। একজীববাদ আবার দ্বিবিধ। 'অদ্বৈতবেদান্ত-ধারা' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচনার ইচ্ছা রইল।

(৮) মণ্ডন দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী অর্থাৎ তাঁর মতে জীববুদ্ধিতেই জগদ্‌ভ্রান্তি রয়েছে। প্রতিজীবত্বের বিলয়ে তদনুগত জগৎও বিলীন হয়, জীব ব্যতীত দ্বিতীয় জগদ্‌দ্রষ্টা নেই। প্রতি জীবের নিকট জগৎ ভিন্ন প্রতীয়মান হয়। 'বেদান্ত-সিদ্ধান্তাবলী'র লেখক প্রকাশানন্দ, 'কল্পতরু'কার অমলানন্দ এবং আংশিক ভাবে বাচস্পতিও এ মত স্বীকার করেন, পরন্তু সুরেশ্বর শংকরসম্মত সৃষ্টিদৃষ্টিবাদই স্বীকার করেন। জীবত্বের নাশ হলেও ব্যবহারিক সত্তায় অপর জীবের নিকট জগৎ থাকে। এক সমষ্টি মায়োপহিত ঈশ্বর-চৈতন্যে সমষ্টি বিশ্ব আছে, কাজে কাজেই ব্যষ্টি মায়োপহিত প্রাজ্ঞ বা ব্যক্তিচৈতন্যে ব্যক্তিত্বের নাশের দ্বারা ব্যক্তিগত জগৎনাশ হলেও সমষ্টিজগৎ নাশ হয় না। চিৎসুখাদিও এই মতাবলম্বী। পরন্তু মণ্ডনের দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অপ্পয়দীক্ষিতের একজীব-দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ হতে ভিন্ন। মণ্ডনমতে ব্যক্তিজীবের বিলয়ে তদনুগত জগতের বিলয় হয়, পরন্তু অপ্পয়মতে সমষ্টি-জীবত্বের বিলয় ভিন্ন মুক্তি সিদ্ধ হয় না।

(৯) মণ্ডন জীবন্মুক্তি মানেন না—সুরেশ্বর এ বিষয়ে শংকরানুগ, জীবন্মুক্তাবস্থা স্বীকার করেন।

সাধারণতঃ আমরা প্রস্থানত্রয় বলতে শ্রুতি-প্রস্থান (উপনিষৎ), ন্যায়প্রস্থান (ব্রহ্মসূত্র) এবং স্মৃতিপ্রস্থান (গীতাদি) এবং উহাদের উপর যে শাংকরভাষ্য ও টীকাদি বুঝি। কিন্তু প্রস্থানত্রয়ের আর একরূপ বিভাগ আছে যা শাংকরভাষ্যকে স্থাপিত মান বলিয়া (standard) মনে করে, মণ্ডনমিশ্র প্রকাশাত্মযতি এবং বাচস্পতি-মিশ্রের অদ্বৈতমতবাদ—মণ্ডনপ্রস্থান, বিবরণ-প্রস্থান এবং ভামতীপ্রস্থান বলে খ্যাত।

(১) মণ্ডনপ্রস্থানে স্ফোটবাদ ও শব্দ-ব্রহ্মবাদ স্বীকৃত—বাচস্পতির ভামতীপ্রস্থানে (ব্রহ্মসূত্র, ১।২।২৮) উহা খণ্ডিত হয় এবং বর্ণের আপেক্ষিক নিত্যত্ব স্বীকৃত হয়। পদ্মপাদের 'পঞ্চপাদিকা'র ওপর পরবর্তী কালের প্রকাশাত্মযতির বিবরণপ্রস্থানেও স্ফোটবাদ খণ্ডিত হয়েছে এবং বর্ণের ব্যবহারিক নিত্যত্বও স্বীকৃত হয়েছে। 'সংক্ষিপ্তশারীরক'-কার সর্বজ্ঞান এবং পরবর্তী কালের বিবরণসংগ্রহ ও পঞ্চদশীকার ভারতীশ্বর এবং বিদ্যারণ্যও এই মতাবলম্বী।

(২) মণ্ডনপ্রস্থানে ভাবাদ্বৈতে অর্থাৎ শব্দাদ্বৈতজ্ঞানে প্রপঞ্চাভাব ঘটে, কিন্তু অবিদ্যা ও অবিদ্যাপ্রধ্বংসাভাব জ্ঞানদ্বয় থাকতে পারে। তা ছাড়া কেবল অবিদ্যা-নিবৃত্তিই ব্রহ্মস্বরূপ নয়, অবিদ্যানিবৃত্তির পর ব্রহ্মস্বরূপ উপাসনালভ্য—ভামতীপ্রস্থানে অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও ব্রহ্মস্বরূপ এক, ভাবাদ্বৈত অস্বীকৃত এবং ব্রহ্মাদ্বৈতই প্রতিষ্ঠিত। বিবরণপ্রস্থান এ বিষয়ে ভামতীপ্রস্থানের অনুরূপই।

(৩) মণ্ডনপ্রস্থানে অবিদ্যার আশ্রয় জীব এবং বিষয় ব্রহ্ম—এ সম্বন্ধে ভামতীপ্রস্থান এক মত। বিবরণপ্রস্থান এ সম্বন্ধে সুরেশ্বরমতাবলম্বনে অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় উভয়কেই ব্রহ্ম বলেন। পঞ্চদশীকার বলেন, শুদ্ধসত্ত্ব মায়া ঈশ্বরাশ্রিত, পরন্তু অবিদ্যা জীবাশ্রিত। ভামতীপ্রস্থানে জীবাশ্রিত মায়া তুলা এবং ঈশ্বরাশ্রিত মায়া মূলা।

(৪) মণ্ডনপ্রস্থানে অবিদ্যা দ্বিপ্রকার—অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণ—ভামতীপ্রস্থানে অবিদ্যা তুলা ও মূলা। বিবরণপ্রস্থানে সুরেশ্বরের মতাবলম্বনে অবিদ্যাকে একই বলা হয়েছে, যার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি আবরণ ও বিক্ষেপ অথবা ত্রিগুণাত্মক। গীতাভাষ্যে (১৩।২) আচার্যপাদ এক অবিদ্যার ত্রিবিধ অভিব্যক্তি বলছেন—বিপরীতগ্রাহক, সংশয়োপস্থাপক এবং অগ্রহণাত্মক।

(৫) মণ্ডনপ্রস্থানে 'ভ্রম' ভট্টসম্মত বিপরীতখ্যাতি, ন্যায়মতে উহাই অন্যথাখ্যাতি—ভামতীপ্রস্থানে ব্রহ্মসূত্রের উপোদ্‌ঘাত-ভাষ্যের টীকায় অনির্বচনীয়-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মণ্ডনকৃত 'বিধিবিবেকে'র 'কণিকা' টীকায় বাচস্পতি অন্যথাখ্যাতি সমর্থন করেছেন; কিন্তু বিবরণবিদ্যালয় অনির্বচনীয়-খ্যাতিবাদই স্বীকার করেন।

(৬) মণ্ডনপ্রস্থানে—'তত্ত্বমস্যা'দি বেদশব্দজন্য জ্ঞান পরোক্ষ—ভামতীপ্রস্থানেও (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪) এই মতই সূত্রকার ব্যাসসিদ্ধান্ত বলা হয়েছে। পরন্তু বিবরণপ্রস্থানে ঔপনিষদ বাক্যজন্য জ্ঞান অপরোক্ষ হতে পারে, যেমন 'দশমস্ত্বমসি' (বেদান্তপরিভাষা) ন্যায়ের দ্বারা সুরেশ্বরকেই অনুসরণ করা হয়েছে। সুরেশ্বর 'নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি'তে বলছেন যে শব্দ পরোক্ষ-জ্ঞানোৎপাদক বটে, কিন্তু যদি শব্দজ্ঞানের বিষয় যেখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তা হলে সেই শব্দজ্ঞান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণ-করণ জন্যই হোক বা শব্দাদি পরোক্ষপ্রমাণ-করণ জন্যই হোক বিষয়টির সাক্ষাৎকার হলেই তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যেতে পারে। যেমন 'দশমস্ত্বমসি' বাক্যের দ্বারা মূর্খের নিজের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হলো। এখানে শব্দই প্রত্যক্ষের প্রতি করণ। তাই প্রকাশাত্মযতিও 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণে' বলেছেন, 'জ্ঞেয় বিষয় যখন অব্যবধানে (immediate, direct) জ্ঞাতার অনুভূতির বিষয় হয়, তখনই তাকে আমরা প্রত্যক্ষ বলি। এখন উহার করণরূপ প্রমাণটি প্রত্যক্ষপ্রমাণও হতে পারে, আবার পরোক্ষ প্রমাণও হতে পারে, তাতে প্রত্যক্ষপ্রমার কোন বাধ হয় না। কাজে কাজেই পরোক্ষ শব্দাদি জন্য করণ দ্বারাও যদি অব্যবধানে অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে-জ্ঞান জন্মায়, তখন ঐ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষই বলব। যেমন ব্যাধপালিত রাজপুত্র তার স্বরূপ-শ্রবণমাত্রই নিজেকে রাজপুত্র বলেই প্রত্যক্ষ করে। কাজে কাজেই প্রকাশাত্মযতি 'প্রত্যক্ষ-করণজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ'—প্রত্যক্ষের এরূপ সংজ্ঞা স্বীকার করেন না। পরন্তু তাঁর মতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করণজন্য যে জ্ঞেয় বিষয়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতার অনুভূতির বিষয় হয়, তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

(৭) মণ্ডনপ্রস্থান দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট জীবের দৃষ্টিতে এই সৃষ্টি রয়েছে, যেমন এক বিশিষ্ট জীবের স্বপ্নেতে যাবতীয় স্বাপ্ন বৈচিত্র্য বর্তমান থাকে, সেইরূপ স্বপ্নদর্শীর স্বাপ্নবিলাস হতে আর কোন পৃথক সত্তা নেই এবং থাকতেও পারে না। সেইরূপ আমার দৃষ্টিবিলাসেই এই বিচিত্র জগৎ রয়েছে, আমার কল্পনাবিক্ষেপের অতিরিক্ত আর কোন জাগতিক সত্তা নেই বা আমার কল্পনালায়ের অবসানে আর কোন জগৎ থাকবে না, জগদ্দৃশ্যের বিক্ষেপকেন্দ্র একমাত্র আমিই, এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন দ্রষ্টা ছিল না, নাই বা থাকবে না—ভামতীপ্রস্থান দৃষ্টিসৃষ্টি ও সৃষ্টিদৃষ্টিবাদের এক সামঞ্জস্য-বিধান। প্রতি জীবের বিচিত্র অজ্ঞানই বিশ্বসৃষ্টির বীজ। প্রতি জীবের অবিদ্যাবিলাসই এই ঈশ্বরাশ্রিত মূলা মায়াকৃত—ব্যবহারিক সত্তার এত বৈচিত্র্য অনুভব প্রতিজীবে দেখা যায়। ব্যক্তিজীবের অবিজ্ঞাত অবস্থায় বা মুক্তিতেও ব্যবহারিক জগৎ থাকে, তবে তা প্রতি জীবের বিচিত্র অবিদ্যাবিলাস ভিন্ন আর কিছু নয়। এই বিভিন্ন জীবাশ্রিত তুলা মায়ার স্বীকার হেতু ভামতীপ্রস্থান ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীবসম্বন্ধনির্ণয়ে অবচ্ছেদবাদ বলে খ্যাত, কিন্তু বিবরণপ্রস্থানের মতে এই ব্যবহারিক সত্তা বা বিক্ষেপাবরণাত্মিকা সমষ্টিমায়া জীবের আ-নির্বাণ স্থায়ী এবং এই ব্যবহারিক সত্তার আশ্রয় ব্রহ্ম স্বয়ং। এই ব্যবহারিক সত্তোপহিত নিত্যবিম্বচৈতন্যই ঈশ্বর। তাঁর ঈক্ষণে এই জগৎ রয়েছে বলে ব্যষ্টি-প্রতিবিম্ব জীবসকল এই ব্যবহারিক সত্তাকে মূলতঃ একরূপেই দেখে, তবে জীবপ্রতিবিম্বের সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যে তাদের নিকট এই সাধারণ জগতের ব্যবহার ও প্রয়োজন বিভিন্ন ভাবদ্যোতক অনুভূতির তারতম্যে ঘটে। তথা ব্যষ্টিজীবের নির্বাণেও এই ঈশ্বরদৃষ্ট সাধারণ জগৎকেই অপর জীব দর্শন করে।

(৮) মণ্ডনপ্রস্থানে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রতিবিম্ববাদের দ্বারাই হয়ে থাকে। অবিদ্যার প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই এক জীব এবং এক জীবই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। নির্গুণ বিম্বচৈতন্যই অক্ষর বা শব্দব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জীবের মাঝামাঝি ঈশ্বর বলে আর কিছু নেই। এই প্রস্থানের ব্রহ্ম শব্দাদ্বৈত। প্রতিবিম্ব স্বরূপতঃ বিম্বই, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই। অতএব প্রতিবিম্বের উচ্ছেদ হয় না, প্রতিবিম্ব ও বিম্বের ভেদের উচ্ছেদই মুক্তি। ভামতীপ্রস্থান মূলতঃ অবচ্ছেদবাদী, তবে তার কোথাও কোথাও প্রতিবিম্ববাদ দেখা যায়। বিবরণপ্রস্থানও প্রতিবিম্ববাদ। কিন্তু সুরেশ্বর আভাসবাদী। তিনি বলেন, প্রতিবিম্ব বিম্ব হতে ভিন্ন, অর্থাৎ ছায়া বা আভাসমাত্র, যেমন দেহ ও দেহের ছায়া, চন্দ্র ও চক্ষুদোষ হেতু দ্বিতীয় চন্দ্র এক নয়। সমষ্টি মায়াভাসচৈতন্য ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি জীবচৈতন্য। জীবোপাধিবাধে মুক্তি।

"যতদিন না ভারতে আবার বুদ্ধের হৃদয়বত্তা আসিতেছে, যতদিন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী কর্ম্মজীবনে পরিণত করা হইতেছে, ততদিন আমাদের আশা নাই। …………চাই চরিত্র—চাই এইরূপ দৃঢ়তা ও চরিত্রবল, যাহাতে মানুষ একটা জিনিষকে মরণকামড়ে ধরিয়া থাকিতে পারে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলার প্রবাদ-বাক্য

শ্রীবেলা দে

সমাজ ও জীবন এই দুটি বস্তু পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এবং অংগাংগী ভাবে জড়িত। অসংখ্য মানুষের জীবন নিয়ে সমাজের সংগঠন, আর সেই সমাজের মধ্যেই মানবের ব্যক্তিসত্তাটি বিকাশ লাভ করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলার সমাজ-জীবনে বাংলা দেশে প্রচলিত প্রবাদবাক্যগুলি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

বাঙ্গালীর কর্মজীবনের সমস্যা, সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, ধর্মজীবনের আদর্শ, বিবাদ-বিসংবাদ, আচার-ব্যবহার, হাসি-তামাশা, সমস্তই তার প্রবাদগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রবাদগুলি বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হতে জন্ম লাভ করেছে। পৃথিবীর সকল উন্নত ভাষাতেই প্রবাদবাক্যের প্রচলন দেখা যায়। প্রবাদগুলির বিচার দ্বারা সাধারণ মানুষের চিন্তা কোন্ দিকে কতদূর বিস্তারলাভ করেছিল তা যেমন অনুমান করা যায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক অবস্থার একটা পরিচয়ও পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা ভাষার প্রবাদ-গুলি থেকেও বাংলার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত অধ্যায় জানা যায়। প্রবাদের মধ্যে সাধারণতঃ একটা উপমা থাকে, এগুলি সংগ্রহ করা হয় জীবনের পরিচিত বিষয়বস্তু থেকে। যেমন—'মোগল পাঠান হদ্দ হলো, ফারসী পড়েন তাঁতি।' তাঁতির ফারসী পড়ার অর্থ—অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যে কাজ করতে পারেন না, শক্তিহীন ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা সে কাজ করবার চেষ্টা ক'রে বৃথা দম্ভ প্রকাশ করে। এত জাতি থাকতে তাঁতিকে কেন এ প্রবচনে উল্লেখ করা হলো সে সম্বন্ধে খোঁজ করলে জানা যায় যে, যখন দেশে মোগল-পাঠানরা ফারসী পড়া প্রচলন করলেন, তখন সমাজের অনেকেই ঐ ভাষা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তন্তুবায়-শ্রেণীর লোকরা ঐ ভাষা মোটেই চর্চা করতেন না, সেই জন্য এই প্রবাদটিতে বিশেষ ক'রে তাঁদেরই উল্লেখ দেখা যায়। 'রথ দেখা কলা বেচা' এই প্রবাদ-বাক্যটি একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক কাজ করে ফেলা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। রথ দেখতে যেয়ে কেউ কেউ কলাও বিক্রী করে। নিজের দোষত্রুটির দিকে লক্ষ্য না করে অন্যের দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করার যে বদ অভ্যাস আমাদের আছে সেইটিকে লক্ষ্য করে বলা হয়—'আপন চরকায় তেল দাও'। এই প্রবাদটি থেকে একটি কথা জানা যায় যে বাংলা দেশে এক সময় চরকার বেশ প্রচলন ছিল।

কতকগুলি প্রবাদের মধ্যে আবার ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে: যেমন—'ভজন সাধন যেমন তেমন করতে জানলেই হয়', 'ভক্তিতে ভগবান তুষ্ট', 'ভক্তের ভগবান', —ভগবানকে পাবার প্রশস্ততম পথ এই প্রবাদ-গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। আবার কতকগুলিতে অদৃষ্টনির্ভরের পরিচয় পাই: যেমন—'কপালে নেই ঘি, ঠক ঠকালে হবে কি', 'আমি যাব বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে'। মানুষের জীবন যে

নশ্বর এ কথাটিও প্রকাশ পেয়েছে প্রবাদগুলি থেকে : যেমন—'পদ্ম পত্রে জল, জীবের আয়ু বল', 'বল বুদ্ধি ভরসা ডাক পড়লেই ফরসা'। নীতি-সম্বন্ধেও অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে —'ধর্মের ঘরে পাপ সয় না', 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে', 'সত্যকথার ডালপালা নেই'। কয়েকটি প্রবাদে মানুষের কোন কোন স্বভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে : যেমন—'যেতে ছাগল আসতে পাগল,' 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'। আবার 'তেল দাও সিঁদুর দাও ভবী ভোলবার নয়', 'চোরের মন ভাঙ্গা বেড়ায়,' 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়'। এই সব প্রবাদ মনুষ্য-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির সাক্ষ্য দেয়। গৃহাদিনির্মাণ বিষয়ে প্রবচন আছে—'দক্ষিণ দ্বারী ঘরের রাজা পূর্বদ্বারী তার প্রজা, পশ্চিম দ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই'। খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও একটি সুন্দর প্রবাদ আছে—'কচি পাঁঠা বুড়ো মেষ দধির অগ্র ঘোলের শেষ'. 'মাছের মা শাকের ছা', 'উচ্ছের কচি পটোলের বীচি'।

রামায়ণ-মহাভারত দ্বারা প্রভাবান্বিত অনেক প্রবাদ আছে—যেমন 'রাম রাবণের যুদ্ধ' 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রা', 'এক রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর' ইত্যাদি। বাঙ্গালী যে চিরদিন হাস্যরসিক তা তার বহু প্রবচন থেকে বুঝতে পারা যায় : যেমন—'আমে ধান তেঁতুলে বান', 'নাপিতের অসি, ধোপার বাঁশী' ইত্যাদি। শিক্ষার আদর্শের প্রতি একটা উচ্চ ধারণা অনেকগুলি প্রবাদ থেকে জানা যায় : যেমন—'মূর্খ পুত্র যম সম', 'মূর্খের দোষ পদে পদে' ইত্যাদি। বাঙ্গালীর কামারশালা, কুমারের কারখানা, তাঁতির তাঁত, কলুর ঘানি, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় থেকেই প্রবাদ রচনা করা হয়েছে। সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী করে বলার ও বোঝাবার ক্ষমতা, অল্পকথায় সুললিত ছন্দে প্রবচন-রচনার চাতুর্য বাংলাদেশে লোক-শিক্ষার প্রচলন অনেক সহজ করে দিয়েছে। যদিও এই সমস্ত প্রবচনগুলি অধিকাংশই মধ্যযুগীয়, তথাপি মনে হয় এসব কোন বিশেষ শতাব্দীর রচনা নয়। কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতা, কত শতাব্দীর সঞ্চয়, কত সুখদুঃখ, কত হাসিকান্না এই প্রবচনগুলির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে! এগুলির সম্পূর্ণ উদ্ধার আজও হয় নি—যেদিন হবে সেদিন জাতীয় জীবনের অনেক অন্ধকার দিক্ নতুন আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং সমগ্রজাতি উপকৃত হবে।

অরূপ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

সরিৎ, সাগর, মরু, পর্ব্বত-কন্দর,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-তারা কানন-প্রান্তর,
পুষ্পবীথি পরিপূর্ণ বন-উপবন
শোভাময় প্রকৃতির রম্য নিকেতন,
অরূপের রূপ যাহে সদা প্রকাশিত
আকৃষ্ট সতত তা'হে মানবের চিত।

চিত্রকর আঁকে তায় চিত্র-তুলিকায়,
কবি তা'র রূপ দেয় কাব্য-প্রতিভায়।
অসীমে বাঁধিতে চাহে সীমার বাঁধনে,
ভাবুক হাসিয়া খুন আপনার মনে।
অরূপের রূপ যেবা হেরে-একবার,
প্রকাশের ভাষা কভু থাকে না তাহার

ভক্ত অধর সেন

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে' উল্লেখ আছে যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শনিবার অধরের বাড়ীতেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। অধরের অনুরোধে বা নিমন্ত্রণের খাতিরে বঙ্কিম অধরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন কিংবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসেই তথায় উপস্থিত হন তৎসম্বন্ধে সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অধরের কথায় বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরকে দর্শন করিতেই অধরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। অধর যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বঙ্কিমকে প্রথম সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় করাইয়া দেন, তখন তিনি বঙ্কিমকে দেখাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন। এঁর নাম বঙ্কিম বাবু।" বয়স হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপেক্ষা বঙ্কিম প্রায় দেড় বৎসরের মাত্র কনিষ্ঠ। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠাল-পাড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রামে। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়া বসবাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল দক্ষ। দক্ষই এই চট্টোপাধ্যায় বংশের আদি পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রপিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহ রঘুদেব ঘোষালের বিষয়-সম্পত্তি পাইয়া কাঁঠাল-পাড়ায় আসিয়া বাস করেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণপরিবারে বৈষ্ণব-পরিবেশেই বঙ্কিম বাল্যকালে মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ। স্বর্গীয় মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে। খুব জাঁকালো নিত্য ভোগ হয়। রোজ দশ সের চাউল রাঁধা হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজারখরচ বন্দোবস্ত আছে।" সেখানে অনেক দুঃখি-দরিদ্র ও সাধু-বৈষ্ণব প্রসাদ পাইত। হুগলী চুঁচুড়া-নিবাসী সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয় চন্দ্র সরকার এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "আমাদের ওপারে রায় বাহাদুরের * বাড়ী ছিল যাত্রাগান ও মহোৎসবের মিলনমন্দির—এতদঞ্চলের টাউন হল। পালপার্বণ তো ফাঁক যাইতই না—অন্য সময়েও উৎসব আছে। দুর্গোৎসবে কৃষ্ণনগর ঘুর্ণির উৎকৃষ্ট শশী পাল ঠাকুর গড়িবে। উৎকৃষ্ট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর চিত্র করিবে। প্রতিমা সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। জগমোহন স্বর্ণকারের চণ্ডীর গানে উচ্চকণ্ঠে "মা" "মা" রবের মোহিনী শক্তি অথবা প্রসিদ্ধ নীলকমলের রামায়ণগান। যাত্রার সঙ্গে মদন অধিকারীর তুক্কো বা গোবিন্দ অধিকারীর কালীয়দমন গান, দাশরথি রায়ের কথার ছটাঘটা, সঙ্গে সঙ্গে তিন কড়ির সুরে তালে মাখামাখি গান। ফরাসডাঙ্গার জগৎমোহিনীর ঢপ;

* বঙ্কিমের পিতার নাম ছিল রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বর্ধমানের সহচরী ও যাদুমণির কীর্তন, মধুকানের গান—এইরূপে ছোট মাঝারি কত গানই হইত। এক ধরণীর কথকতাই ক্রমাগত তিন মাস চলিয়াছে—এ সকলের কত পরিচয় দিব। আর তাঁহার ভবনে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ জীউ ও তাঁহার নিত্য সেবার কথা কত বলিব? বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের ও অতিথিসেবার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এখনও অনেকটা আছে। সেই সুন্দর বিগ্রহ ও তাঁহার ঐকান্তিক সন্দর্শনে অভ্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র বয়সকালে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন।" এই সব পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াই বঙ্কিম পরিণত বয়সে ধর্মের অনুশীলন করেন। প্রতিভাশালী তেজস্বী পুরুষ বঙ্কিম কলিকাতায় আসিয়া ছাত্রজীবনে পাশ্চাত্য প্রভাবে কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। একদিকে ডার্‌উইন, মিল, হার্বার্ট স্পেন্সর, হাক্সলী, কোঁতে-দর্শন—অপর দিকে সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা, বেদ-বেদান্ত—হিন্দুর ব্রহ্মবিদ্যা। এক দিকে হিন্দু দেবদেবীর পূজাপার্বণ, কীর্তন-ভজন, অপরদিকে খৃষ্টান ও ব্রাহ্মধর্মের হিন্দু দেবদেবীর বিরুদ্ধে প্রচার—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই ভাবসংঘর্ষে বঙ্কিম স্বাধীন যুক্তিবাদের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী থাকায় এই দুইটি ভাবের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী তারিখে হাইকোর্টের জজ জাষ্টিস্ ফিয়ারের (Phear) সভাপতিত্বে বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েসনে 'On the Origin of Hindu Festivals' সম্বন্ধে বঙ্কিম একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধপাঠের পর রেভারেণ্ড লং সাহেব, মিঃ উড্রো এবং বেভার্লি সাহেব বঙ্কিমের সঙ্গে তুমুল আলোচনা করেন। সভাপতি জাষ্টিস্ ফিয়ার প্রবন্ধপাঠের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বঙ্কিমকে উক্ত বিষয়ে আরও অনুশীলন ও তথ্যানুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। বঙ্কিম বলেন, এই যে দেবদেবী লইয়া হিন্দু নানা পালপার্বণ উৎসবাদি করিতেছে, ইহার মূলে ছিল কোন ঋতু অথবা পরিদৃশ্যমান স্থূল জাগতিক দৃশ্য বা ঘটনা। ধর্মের সঙ্গে প্রথমে এই সব পালপার্বণের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন—

"It is certain that many festivals which have now assumed the shape and adopted the symbols of the worship of particular gods, were in their origin nothing more than the celebration of the advent of particular seasons of the year or of other physical phenomena, and had no religious element at the beginning."

এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন—দোলযাত্রা মদনোৎসবের রূপান্তর, বসন্তোৎসবের অধোগামী পরিণতিই মদনোৎসব। পরে ইহা কৃষ্ণলীলার অঙ্গরূপে রূপায়িত হয়—মদনের স্থান পূর্ণ করিলেন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও তাঁহার অলৌকিক কীর্তি-কাহিনী ভারতের নরনারীর হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বলিয়াই—এই উৎসব তাঁহার পূজার অঙ্গ বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই ভাবে তিনি দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, রথ প্রভৃতি সব উৎসবেরই মূল উৎস নির্ণয় করিয়াছিলেন—ঋতু বা চন্দ্রসূর্যের গতি। শেষে পৌরাণিক উপাখ্যানে আকারিত হয়। ইহার পর তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে "বৌদ্ধধর্ম ও সাংখ্যদর্শন" সম্বন্ধে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ 'কলিকাতা রিভিউ'তে প্রকাশ করেন এবং বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে বাংলা ভাষায় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে মুখার্জি ম্যাগাজিনের সুযোগ্য সম্পাদক শম্ভুচন্দ্রকে

লিখিয়াছিলেন : "The Sankhya is the only system of which I have made anything like a study."

জাতিকে গঠন করিবার জন্য তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তাঁহার চেষ্টা ছিল বর্তমান যুগের সহিত অতীত সংস্কৃতির যোগাযোগ রক্ষা করা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-যজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেই দিন হইতে বঙ্গ-সাহিত্যে অমরতার আহ্বান হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে তাহার কারণ এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশঃই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড় তাহা নহে, তিনি বাংলা-সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলন-তত্ত্ব বাংলা-সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা সাহিত্যস্রষ্টা কিংবা শুধু একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যক্ষেত্রে কেবলমাত্র একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা নির্ভীক পুরুষ। ইংরেজ সরকারে চাকুরী গ্রহণ করিয়া তিনি প্রতিক্ষণে পরাধীনতার ক্লেশ অনুভব করিতেন। অধরের বাড়ীতে বঙ্কিমের পরিচয় পাইয়া ঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিম, তুমি কার ভাবে বাঁকা গো?" বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "আর মহাশয়, জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।" এইরূপ উত্তর বঙ্কিমের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিই দিতে পারেন। সুদীর্ঘকাল ডেপুটীগিরি করিয়া প্রায় অবসর-কালের প্রান্তে আসিয়া বঙ্কিমের এই বেদনাভরা উক্তি। রাজকার্য-ব্যপদেশে বাংলার নানাস্থানে ঘুরিয়া দেশের ও দশের অবস্থা দেখিয়া তিনি প্রাণে প্রাণে পরাধীনতার ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কল্পনানেত্রে ভাসিয়া উঠিল আনন্দমঠ—ত্যাগী ও দেশাত্মবোধে জাগ্রত প্রেমিক দেশসেবক সন্তানের দল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিঃসৃত হইল জাতীয় মন্ত্র "বন্দে মাতরম্"। এই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী নরনারী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, হাসিতে হাসিতে কারাবরণ ও ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়াছে—শুধু কি বাংলাদেশে। দেশমুক্তির মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত হইয়াছে, ইহা বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় ঐক্য আনিয়াছে—ভারতের গ্রামে অরণ্যে সমুদ্রতীরে গিরিশীর্ষে বঙ্কিমের এই মহামন্ত্র 'স্বাধীন ভারতের' স্বপ্ন জাগাইয়াছে। ভারতের অবসন্ন দেহে শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়াছে—স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে বীর ত্যাগী কর্মব্রতীর দল সৃষ্টি করিয়াছে। তাই রাষ্ট্রগুরু বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় যজ্ঞের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি জাতিকে স্বাধীন ও উন্নত পথে পরিচালনার জন্য ধর্ম ইতিহাস অর্থনীতি সমাজনীতি ও নানা-বিষয়িণী বিদ্যার অনুশীলনে বাঙ্গালীকে আহ্বান করিয়াছেন। বঙ্কিম প্রচার করিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের পারদর্শী হইতে হইবে। নৈতিক গুণ অর্জন না করিলে বড় হওয়া যায় না। যে বঙ্কিম ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে

হেষ্টির সঙ্গে হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজার পক্ষে তর্কযুদ্ধে বলিয়াছিলেন—"Images of gods have in themselves have no sanctity. They are daily sold in the bazars as toys. The very images are worshipped as made by impure workmen, sold in the bazar and are treated on exactly the same footing as other shopkeeper's wares. They do not acquire any sanctity till *the pranapratistha i. e.* till I consent to worship it." ইহার পরে তিনি বলিতেছেন—"Our idols are hideous they say. True, we wait for sculptors. It is a question of art only. The Hindu pantheon has never been adequately represented in stone or clay, because India has produced no sculptors. The few good images we had have been mutilated or destroyed by the hand of Mussalman vandals. The images we worship in Bengal are, as works of art, a disgrace to the nation. Wealthy Hindus should get their Krishna and Radha made in Europe." ইহার উত্তরে হেষ্টি ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"And hence it would really be of no avail to get a brand new set of fine-looking gods manufactured in Birmingham, even if it should be arranged that these godships should pass like piece goods through the Custom House and that no protective tariff should limit educated Hindus in their more aesthetic worship of the sordid productions of European skill." যাহা হউক "আনন্দমঠ" ও "কমলাকান্তের দপ্তরে" বঙ্কিম প্রতিমায় দেশমাতৃকার ভাব কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী", "কমলা কমলদলবিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী" দেশমাতৃকার রূপ আঁকিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন "তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। বঙ্কিম কমলাকান্তের মুখে বলাইয়াছেন "আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথায় মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি? এই ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দপবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ—এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিক—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন—কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী—বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। আমি সেই কালস্রোতো-মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা। দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—অনন্ত কালসমুদ্রে প্রতিমা ডুবিল! ....এস ভাই সকল আমরা এই অন্ধকারে কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা

তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।” পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকে উদ্দেশ করিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন।” আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কৈ?....

“চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশানভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহার পা ধোয়াইতে সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাহার জন্য সিংহল বালী আরব সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে সে অনন্ত সৌন্দর্যশালিনী কোথায়? তুমি যাহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ-ঐশ্বর্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল-কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতলগর্ভমধ্যে যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে সেইদিন কল্পনা করিয়া কাঁদি।”

বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ অতি তীব্র ছিল—তাই কমলাকান্তের তরফে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন “আমার এক দুঃখ এক সন্তাপ এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে গণি। যেদিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল—সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব? দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া সাত বার গণি—কৈ অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কৈ? যাহা চাই তাহা মিলাইল কৈ? মনুষ্যত্ব মিলিল কৈ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কৈ? ঐক্য কৈ? বিদ্যা কৈ? গৌরব কৈ?....আর কি মিলিবে না?”

এই তীব্র ব্যথা ছিল বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বঙ্কিম হাস্যমুখে বলিলেন, “আর মশায়, জুতোর চোটে! সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।” ইহা বঙ্কিমের সরল উক্তি! স্থির ধীর গম্ভীর বঙ্কিম ঠাকুরের নিকট হাস্যমুখে ইহা বলিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার এই দেশাত্মবোধ বা মর্মবেদনা বুঝিতে পারেন নাই তাঁহারা হাসিয়াছিলেন।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণব-পরিবেশে পালিত হইয়াছেন—তাই জন্ম হইতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি আদর্শ পুরুষরূপে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিকে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিই রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ইংরেজী প্রবন্ধে লেখেন—“Krishna is soul, Radha is Nature. The Sankhya philosophy—the school to which the great conception Nature and Soul originally belongs but which inspite of its wealth of thought, is a gloomy pessimism—had laid down that supreme human bliss consisted in the dissolution of soul from nature. It had pronounced its connection illegitimate; and the legend of Radha and Krishna retain the illegi.

timate connection. Nevertheless the Hindu worships this illicit union. He worships it because, with a truer insight than is given to the morose philosopher, he has perceived that in this union of the Soul with Nature lies the source of all beauty, all truth and all love. And this magnificent legend, the basis of the Hindu religion of *love for all that exists* is treated by its European critics as the grossest and most revolting story of crime ever invented by the brain of man." হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের প্রায় শেষ ভাগে বাদে প্রবৃত্ত বঙ্কিম ইহা লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমকে দেখিয়া ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন—তিনি কৃষ্ণভক্ত। বঙ্কিমের উত্তর শুনিয়া বলিলেন—"না গো, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। প্রেমে বেঁকে গিয়েছিলেন।" আশ্চর্য! ঠাকুর পুরুষপ্রকৃতির অভেদতত্ত্বরূপে রাধাকৃষ্ণরূপের কথা প্রথমে উত্থাপন করিলেন। তিনি বঙ্কিমকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আদ্যাশক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগলমূর্ত্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। তাঁদের ভেদ নেই। পুরুষ প্রকৃতি না হলে থাকতে পারেন না। একটি বললেই আর একটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না। আর অগ্নিকে দাহিকা শক্তি ছাড়া ভাবা যায় না।" আবার যুগলমূর্ত্তির রূপ-ব্যাখ্যায় ঠাকুর বলিলেন "যুগলমূর্তিতে কৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে ও শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌরবর্ণ, বিদ্যুতের মত। তাই কৃষ্ণ পীতাম্বর পরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বরণ নীল মেঘের, তাই শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর, তাই শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরেছেন অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরে বাহিরে মিল।" এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া বঙ্কিম তাঁহার বন্ধুদের সহিত ইংরেজীতে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর অধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইংরেজীতে কি কথাবার্তা হইতেছে, তদুত্তরে অধর নিবেদন করিলেন "আজ্ঞে, এই বিষয় একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা।" বুঝিতে পারা যায় যে বঙ্কিম এই ব্যাখ্যা শুনিয়া নূতন আলোক পাইলেন এবং অত্যন্ত চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াই ঠাকুরকে বলিলেন "মশায়, আপনি প্রচার করেন না কেন?" ঠাকুর বঙ্কিমকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন "ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়ে যদি আদেশ দেন, তবেই প্রচার হয়, লোকশিক্ষা হয়; তা না হলে কে তোমার কথা শুনবে?" বঙ্কিম গম্ভীর ভাবে স্থির হইয়া ইহা শুনিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিতদের কাছে ইহা সম্পূর্ণ নূতন কথা। ঠাকুর বঙ্কিমকে বলিলেন—"শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে, যদি ঈশ্বর-চিন্তা না থাকে, যদি বিবেকবৈরাগ্য না থাকে?" শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমের আর একটি ভ্রান্তি দূর করিলেন। বঙ্কিমকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?" বঙ্কিম উত্তরে বলিলেন "হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয় জগতের বিষয়ে। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানবো কেমন করে? আগে পড়া শুনা করে জানতে হয়।" ঠাকুর নানা উপদেশ দিয়া পরে বুঝাইলেন "তোমার দরকার ঈশ্বর-লাভ করা। তুমি অতো জগৎ সৃষ্টি সায়েন্স ফায়েন্স এসব করছো কেন? তোমার আম খাবার দরকার। তোমার বাগানে কত শ আম গাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ-কোটি পাতা, এসব খবরে তোমার কাজ কি? তুই আম খেতে

এসেছিস, আম খেয়েই যা।" বঙ্কিম বলিলেন—"আম পাই কই ?" ঠাকুর বলিলেন "তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।···· কেউ হয়তো বলে দেয়, এমনি এমনি করো, তা হলে ঈশ্বরকে পাবে।" বঙ্কিম অমনি বলিয়া উঠিলেন "কে ? গুরু ? তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম দেন।" ঠাকুর বুঝাইলেন "গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু। তাঁর কথা বিশ্বাস করলে, বালকের মত বিশ্বাস করলে ঈশ্বরলাভ হয়। চাই ব্যাকুলতা।"

এইরূপ প্রসঙ্গের পর কীর্তন আরম্ভ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন শুনিতে শুনিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া একেবারে সমাধিস্থ হইলেন; ভাবাবেশে কোন বাহ্য সংজ্ঞা নাই—একেবারে অন্তর্মুখ। চারিদিকে ভক্তেরা এবং উপস্থিত দর্শকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ত্রস্তভাবে ভিড় ঠেলিয়া বঙ্কিম ঠাকুরকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি ইতঃপূর্বে সমাধি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই, পুস্তকে পড়িয়াছেন মাত্র। অর্ধবাহ্যাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত নৃত্য! বঙ্কিম অবাক হইয়া দেখিতেছেন। কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইলেন। "ভাগবত ভক্ত ভগবান" এই কথার সঙ্গে বলিলেন "জ্ঞানী যোগী ভক্ত সকলের চরণে প্রণাম।"

এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া বঙ্কিমের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি বিনীতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভক্তি কেমন করে হয় ?" ঠাকুর বলিলেন "ঐ যা বলেছি ব্যাকুলতা। কি রকম ব্যাকুলতা চাই তাহা বঙ্কিমকে নানা উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। শেষে তিনি বঙ্কিমকে বলিলেন "তাই বলছি, ডুব দাও। কিছু ভয় নেই, ডুবলে অমর হয়।" বিদায়গ্রহণ-কালে প্রণাম করিয়া বঙ্কিম বিনীতভাবে বলিলেন "একটি প্রার্থনা আছে—অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধুলা।" ঠাকুর বলিলেন "বেশ তো ঈশ্বরের ইচ্ছা।" বঙ্কিম বলিলেন "সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে।" ঠাকুর রহস্য করিয়া বলিলেন "কি রকম সব ভক্ত সেখানে, যারা গোপাল গোপাল কেশব কেশব বলেছিল—তাদের মতন কি ?" কোন ভক্তের অনুরোধে ঠাকুর গল্পটি বলিলেন। আন্তরিক ঈশ্বরভক্ত অতি বিরল। নানা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেকে কপট ভক্তি দেখাইয়া থাকে। বঙ্কিম শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্বভাব ও বাণী শুনিয়া একাগ্রমনে বঙ্কিম চিন্তামগ্ন; এমন কি যাইবার সময় গায়ের চাদর পড়িয়া গিয়াছে—তাহাতে খেয়াল নাই! এক জন চাদরখানি কুড়াইয়া তাঁহার হস্তে দিল। বঙ্কিম গভীর চিন্তামগ্ন—এই ছবি কথামৃতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্যটি আমরা অধরের বাড়ীতে দেখিতে পাই। বঙ্কিমের প্রতি ঠাকুরের একটি বিশেষ কৃপা জানিতে পারা যায়। তিনি 'শ্রীম'কে ইহার কিছু দিন পরে ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বইখানি কি এনেছ ?" শ্রীম বলিলেন "আজ্ঞে হাঁ।" বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে অনেক ভক্ত সেদিন উপস্থিত ছিলেন—তাঁহারা আগ্রহান্বিত হইয়া দেখিলেন বইখানি বঙ্কিম বাবুর রচিত "দেবী চৌধুরাণী"। ঠাকুর মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন "পড়ে আমায় একটু একটু শোনাও দেখি।" মাষ্টার মশায় আগাগোড়া কতক গল্পচ্ছলে আবার কতক পুস্তকের নানা স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন। মাষ্টার মহাশয় ও গিরিশবাবুর নিকট শুনিয়াছি যে ঠাকুর তাঁহাদিগকে বঙ্কিমের বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর সহিত বঙ্কিম বাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; তিনি নানা প্রসঙ্গের পর বলিলেন যে

"পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি যে দক্ষিণেশ্বরে যাবেন বলেছিলেন—কবে যাবেন?" বঙ্কিম ঠাকুরের প্রসঙ্গে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিলেন "নানা ঝঞ্ঝাটে বড় ব্যস্ত আছি, একটু অবসর পেলেই যাব।" তাঁহার আর ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন হয় নাই।

পাশ্চাত্যভাবের স্পর্শে কোন কোন দোষগুণ তাঁহার চরিত্রেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন "আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি আশ্চর্য রকমে ফিরিয়া গেল। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে।" শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার উপদেশের প্রভাব বঙ্কিমের পরবর্তী জীবনে দেখা যায়। "অনুশীলন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "খৃষ্ট ধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম সবই বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি।" অধরের যত্নেই এই মিলন ঘটিয়াছিল অধরের গৃহে। তাই এই মিলনপ্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে বর্ণিত হইল।

ইহার কিছু দিন পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সরকারী কার্যোপলক্ষে অধরলাল মাণিকতলা ডিষ্টিলারি পরিদর্শনে অশ্বারোহণে গিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময়ে শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান। ইহাতে তাঁহার বাম হাতের কব্জি ভাঙ্গিয়া যায়। এই দুর্ঘটনা শুনিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ অধরলালকে দেখিতে যান—অধর তখন শয্যাশায়ী ধনুষ্টঙ্কারে বাক্‌শক্তিহীন। ম্লানমুখে ও সাশ্রুনয়নে ঠাকুর তাঁহার গায়ে মাথায় শ্রীহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অধরের দুই নয়ন দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয় বাণী শুনাইলেন। অধরের মুখমণ্ডল এক অপূর্ব দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী বাংলা ১২৯১ সালের ২রা মাঘ বুধবার প্রত্যুষে বেলা ৬টার সময় অধরলাল মহাপ্রয়াণ করিলেন। 'শ্রীম' বলেন "অধর বাবুর যখন শরীর যায় তখন ঠাকুর জগদম্বার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, মা, তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই ত এই অবস্থা!" ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের জন্য রোদন করেন—ইহাই প্রেমময়ের অপূর্ব লীলা!

অধরলালের অকাল মৃত্যুতে বোর্ড অব রেভেনিউ শোক প্রকাশ করেন। অধরলালের জন্য একটি সাধারণ শোকসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল; তাহাতে কটন সাহেব সভাপতি ছিলেন। তিনি অধরলালের নানা গুণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "How bright a promise has been blighted by his premature death!" ত্রিশ বৎসর পূর্ণ না হইতে যুবক অধর ইহলীলা সাঙ্গ করিলেন!

ভক্ত অধর সেন শুদ্ধ প্রেমভক্তির বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের এক জন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখেরই বাণী "অধর সেনের বাড়ী, বলরামের বাড়ী আমার আড্ডা—তারা না এলেও আমার ইষ্টাপত্তি নেই।"

ধন্য অধরলাল! আন্তরিক সরল ভক্তি ও প্রেমের বলেই তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়াছিলে! শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার লীলাকাহিনীতে তুমি অমরত্ব লাভ করিয়াছ!

স্বামী নিত্যানন্দের পত্র*

শ্রীশ্রীদুর্গা

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

বেলুড় মঠ

সন ১৩০৯, ২৭শে আষাঢ়

স্নেহের শ্রীমান্ যতীন,

বাবাজী, বহু দিবস হইল তোমাদের পত্রাদি না পাইয়া চিন্তিত আছি এবং আমিও নানা কারণে পত্র লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি বড়ই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ভগবান রামকৃষ্ণের পুত্র ভুবনবিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ গত ২০শে আষাঢ়, শুক্রবার (১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই) রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় আমাদিগকে ছাড়িয়া রামকৃষ্ণচরণে লীন হইয়াছেন।

ইদানীং তাঁহার শরীরে কোন ব্যাধি ছিল না। গত মাঘ মাসে গয়া কাশী যান। তথা হইতে আসিয়া অসুস্থ হন। তৎপর কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করায় শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল, কোন অসুখই ছিল না। ২০শে শুক্রবার প্রাতে চা, কাফি, ফল ও দুগ্ধ যেরূপ খাইয়া থাকেন সেইরূপই খাইয়াছিলেন। তৎপর ৭টার পর স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে দরজা বন্ধ করিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টা ধ্যান, জপাদি করেন। শেষে ইলিশ মৎস্যাদি দ্বারা ঠাকুরের ভোগ হইলে প্রসাদ খাইয়া ১৫।২০ মিনিট ঘুমাইলেন। শেষে প্রায় ২½ আড়াই ঘণ্টা পর্য্যন্ত সকলকে পাণিনির ব্যাকরণ পড়াইয়া বাবুরাম মহারাজের সহিত প্রায় দুই মাইল রাস্তা বেড়াইয়া আসিলেন। তৎপর শশী মহারাজের পিতার সহিত পরদিন কালীপূজা করিবেন বলিয়া অনেক গল্প ও তদ্‌বিষয়ক আলোচনা করিলেন। শেষে তামাক খাইতে খাইতে পায়খানা হইতে আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে বলিলেন, "আমার শরীর আজ খুব ভাল আছে।" এই বলিয়া উক্ত শ্রীমান্‌কে তাঁহার মালা আনিতে বলিলেন। শেষে ব্রজেন্দ্রকে অন্য ঘরে যাইতে বলিয়া নিজে ধ্যান ও জপ করিতে বসিলেন। প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে ব্রজেন্দ্রকে ডাকিলেন এবং নিজে শুইয়া পড়িলেন। শেষে ব্রজেন্দ্রকে হাওয়া করিতে বলিলেন। খানিক পরে পা টিপিতে বলিলেন। শেষে তাঁহার নিদ্রা হইল। রাত্রি ৯ টার পর তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল এবং তৎপর একটু বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। এরূপ তাঁহার নিদ্রাবস্থায় মাঝে মাঝে হইত বলিয়াই ব্রজেন্দ্র কিছু মনে করে নাই। শেষে দুই মিনিট অন্তর দুটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ব্রজেন্দ্র তাঁহার সমাধি হইয়াছে মনে করিয়া গোপাল মহারাজকে ডাকিল; তিনি যাইয়া দেখেন স্বামিজী শিবনেত্রে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি করিয়া কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার শরীর উজ্জ্বল, মুখশ্রী গম্ভীর ও হাস্যপূর্ণ। তিনি প্রথমতঃ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বাবুরাম মহারাজকে ডাকিলেন। বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর সমাধি হইয়াছে দেখিয়া রামকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এরূপ ২।৩ ঘণ্টা চলিতে লাগিল, কিন্তু দেহে আত্মা ফিরিল না। তিনি ঐ দিবস প্রাতে সুষুম্না নাড়ীতে মন উঠাইয়া

* ঢাকা-নিবাসী স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন দাস মহাশয়কে লিখিত।

দেওয়া যায় এবং ঐ মন আর ফিরিয়া আসে না এরূপ বলিয়াছিলেন এবং বেদান্ত হইতে উক্ত সুষুম্নার মন্ত্রটি ২।৩ বার পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মর্ম্ম তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই। তিনিও সুষুম্নাতে মন উঠাইয়া দিয়াছিলেন। যোগীদেরই এরূপ হইয়া থাকে, অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনি বিহনে মঠ অন্ধকার। তৎপর শনিবার দিবস ১২টার সময় তাঁহার দেহ পুষ্প-শয্যায় শয়ন করাইয়া মঠের দক্ষিণ দিকে বেল-তলার নিকট গঙ্গাতীরে দাহ করা হইয়াছে। আমরা সকলেই একেবারে অধীর হইয়াছি। এই সংবাদ তোমার বাবাকে, হরপ্রসন্ন বাবুকে ও যোগেশকে জানাইবে। আমার আশীর্ব্বাদ তোমার বাবা ও মাকে জানাইবে। তুমিও জানিবে। পত্রের উত্তর শীঘ্র লিখিবে।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীনিত্যানন্দ স্বামী

মোহভঙ্গ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, বি-এল্

পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরেতে এক দিন
শ্রীগুরুর পদাম্বুজে বসি, পদ্মলীন
ভৃঙ্গসম কহিলেন ঠাকুরে মথুর,
"সংশয়দোলায় দোলে মন ; কর দুর
সে সন্দেহ, তুমি প্রভু করুণা-নিলয় !
ইচ্ছায় যাঁহার হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
যাঁহার ইঙ্গিতে কোটি গ্রহ-সূর্য্য-তারা
ভ্রমিছে অনন্ত শূন্যে, তবু পথহারা
নাহি হয়, নাহি কভু হানে পরস্পরে ;
ফুটিছে কুসুমকুল, সমীর সঞ্চরে,
নিত্য সুধা ঢালে নদী, পাখী গায় গান,
খাদ্য দেয় বসুন্ধরা সর্ব্বজীব-প্রাণ
রক্ষা হয় যাতে ; সর্ব্ব বিশ্ব চরাচর
হয় নিত্য নিয়ন্ত্রিত নিয়মে তাঁহার।
তবু মনে হয় সেই সর্ব্বেশ্বর প্রভু
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্ব শক্তিমান বিভু
নিজ নিয়মের পাশে বাঁধা সর্বকাল
সুদৃঢ় বন্ধনে, সেই স্বরচিত জাল
নাহিক শকতি তাঁর করিতে ছেদন
অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাঁর কঠিন এমন।
ঐ রক্তজবা-বৃক্ষে নাহি সাধ্য তাঁর
ফুটাইতে শ্বেত পুষ্প যদিও তাঁহার
শক্তিতে নিয়মে রক্ত কুসুমনিচয়,
বিকাশি অতুল শোভা প্রস্ফুটিত হয়।"
বরষিয়া করুণার সুধা হাসিরাশি,
কহিলেন নরদেব নবতীর্থ-ঋষি
"ভ্রান্ত তুমি ; জান নাকি তিনি ইচ্ছাময়
স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কভু নাহি পরাজয়
তাঁহার ইচ্ছার। বিধি রচেছেন যিনি
লঙ্ঘিবারে তাহা পুনঃ শক্তিমান তিনি।"
মথুর চলিলা গৃহে, সংশয়ে আকুল
বুঝায় মনেরে বৃথা ভাঙ্গিবারে ভুল।
অন্যদিন রজনীর তমোরাশি নাশি
বিচ্ছুরিয়া দশদিকে আরক্তিম হাসি
উঠিলেন দিবাকর। পুষ্পিত উদ্যানে
একই রক্ত জবাবৃক্ষে বর্দ্ধিত যতনে
মায়ের পূজার লাগি, তারি এক শাখে
দুইজবা, শুভ্র এক অন্য রক্ত রাগে
রাঙ্গা, ফুটি দুলিতেছে প্রভাতসমীরে,
দেখিয়া ঠাকুর তাহা বলিলা মথুরে।
আনন্দ-আপ্লুত কণ্ঠে কহিলা মথুর,
"আজি হ'তে দ্বিধা শেষ, তর্ক হোল দূর।"

বিশ্ববাসীর পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মই কি একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম্ম ? *

কৃষ্ণদাস বুদ্ধপ্রিয়

অনুবাদক—স্বামী শ্যামলানন্দ

অনেকের বিশ্বাস যে বৌদ্ধধর্ম্ম নীতিমূলক, নীতিই বৌদ্ধধর্ম্মের লক্ষ্য। কিন্তু শ্রীবুদ্ধই বলিয়াছেন—নির্ব্বাণই জীবন, নির্ব্বাণই লক্ষ্য, নির্ব্বাণই পরিণতি। উপনিষদের সুরে তিনিও গাহিয়াছেন, সদসৎ দুইই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে নীতিই একমাত্র লক্ষ্য নহে, উহা উপায়মাত্র। বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং হিন্দুর ঈশ্বর একই কথা। অন্যান্য ধর্ম্ম যেরূপ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্মও তদ্রূপ।

পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতারূপ শ্রেষ্ঠনীতি একমাত্র হিন্দুধর্ম্মেই রহিয়াছে। 'প্রতিবেশীকে নিজের ন্যায় ভালবাসিবে' এই নীতিবাক্যের দার্শনিক ভিত্তি হিন্দুধর্ম্মেই বর্ত্তমান। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র অদ্বৈত বেদান্ত বলেন—একই বস্তু বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে উহা জড়, বুদ্ধির দৃষ্টিতে প্রাণ, আত্মার দৃষ্টিতে উহাই ঈশ্বর। এখানেই কেবল সমস্ত নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিদ্যমান। শ্রীবুদ্ধ বলেন—পরিবর্ত্তনই একমাত্র সত্তা। কিন্তু পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইলে একটি অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু থাকা প্রয়োজন। সেই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুই ব্রহ্ম অথবা নির্ব্বাণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করিতে পারিলেই স্বার্থপূর্ণ জগৎ হইতে হিংসা-বিদ্বেষ অপসৃত হইতে পারে ; তখনই যথার্থ নীতিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ধর্ম্মভাবাপন্ন হিন্দুকে নীতিবাদী হইতেই হইবে—অনীতিজ্ঞ হিন্দু কখনই ধর্ম্মভাবাপন্ন হইতে পারে না।

অনেকের ধারণা বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানমাত্রেই পর্য্যবসিত। উহাতে নীতির কোন স্থান নাই ; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। আমরা দেখিতে পাই যে প্রাচীনতম শাস্ত্রেও নীতির নির্দ্দেশ রহিয়াছে ; ধর্ম্মশব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। ইহা সত্য যে বুদ্ধ উহার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ঋত ও সত্য শব্দের প্রয়োগ হইতে বুঝিতে পারা যায় প্রাথমিক বৈদিক যুগেও নীতিসম্বন্ধে লোকের একটা ধারণা ছিল। বেদে ধর্ম্ম ও যজ্ঞ সমানার্থবাচক। দেব ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ভূত-ঋণ প্রভৃতি মোচনের জন্য পঞ্চ-মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের নীতিবাদ ঘোষিত হইয়াছে। নীতিধর্ম্মের সারকথা—আত্মসংযম ত্যাগ ইন্দ্রিয়দমন। হিন্দুধর্ম্ম ব্রত-উপবাসাদির ভিতর দিয়া ইহাই ঘোষণা করিতেছে। যখন বুদ্ধ বলিয়াছেন তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত পথের দর্শন পাইয়াছেন, তখন তিনি যে নীতিধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য ইহা বলা ঠিক নয়।

নিষ্কামকর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশেষ নীতি। রবীন্দ্রনাথের মতে গীতাকার নিষ্কামকর্ম্ম প্রচার করিয়া কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন

* 'মহাবোধি' পত্রিকার গত বৈশাখ-সংখ্যায় ডক্টর বি আর্ আম্বেদকার, এম-এ, পিএইচ্-ডি, ডি-এস্‌সি, বার্-য্যাট্-ল লিখিত "Buddha and the Future of His Religion" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার প্রতিবাদরূপে গত জুন-সংখ্যার 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকায় কৃষ্ণদাস বুদ্ধপ্রিয় "Is Buddhism the Only ***Religion the World Can Have ?"*** শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ উহার মর্ম্মানুবাদ।—উঃ সঃ

গীতার নিষ্কামকর্ম্মের অর্থ—ব্রাহ্মণোচিত নিত্যকর্ম্ম নহে। আসক্তি, অহঙ্কার ও ফলাভিলাষ-বর্জ্জিত কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত তাহাই নিষ্কামকর্ম্ম। ইহা কি শ্রেষ্ঠ নীতিধর্ম্মের নিদর্শন নহে? কৃষ্ণ নীতিবাদী না হইলে দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ-যোগ এত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতে যাইতেন না।

হিন্দুসমাজে বৈষম্যসূচক জাতিভেদ নামক যে প্রথা দেখা যায় তাহা একটি আকস্মিক ঘটনামাত্র। ইহা যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এত কঠোর ছিল না। সমাজের সকলের জন্য ক্ষমতানুযায়ী এক একটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্যই ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। যানবাহন ও শিল্পোন্নতির দরুন ইহা অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। লোকের মানসিক প্রবৃত্তি, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এক একটি বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করা হয়। মহাভারত ও শুক্রনীতি এইরূপ ভাবেই ইহা সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরেই-ঋষি জন্মিয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশে উচ্চাধিকারী অব্রাহ্মণ আলোয়ারদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অন্যান্য স্থানেও তদ্রূপ আচরণ প্রচলিত আছে। মালাবারের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীনারায়ণ গুরু অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, কবি, দার্শনিক ও সমাজ-সংস্কারক। তাঁহার প্রভাবে সেখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান প্রভৃতিতে উন্নত সম্প্রদায়ের তুল্য। ইহা তিনি কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা সাধন করেন নাই; হিন্দুধর্ম্মের যে সমদর্শন ও একত্বের বাণী—তাহা দ্বারাই সাধন করিয়াছেন। সমদর্শন ও সর্ব্বভূতে আত্মভাবই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মবাণী। ইহাই আজ জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু একদল দুর্ব্বল স্বার্থপর লোক জাতিভেদের ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্ম্মকে হীন করিবার অপচেষ্টা করিতেছে। জাতিভেদ সকল যুগে, সকল জাতিতে এক এক ভাবে বিদ্যমান। আদিযুগে জাতিভেদ অলঙ্ঘনীয় বা বংশগত ছিল না। অধিকার-ভেদে ইহার প্রয়োগ পরিবর্ত্তনশীল ছিল। মহাভারতে শূদ্র পৈষবন কয়েকটি যোগ প্রদর্শন করিতেছেন—এইরূপ উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ও দেবাপি পৌরোহিত্য করিতেছেন। শূদ্র ঐতরেয় ও বৈশ্য কবষ ঋষিজনোচিত সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। শূদ্র বিদুরের শবদেহ দাহ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে। বেদের ব্রহ্ম-বাদিনীর কথা ছাড়িয়া দিলেও পুরাণে সুলভা প্রভৃতি সন্ন্যাসিনীর কথা রহিয়াছে। আমাদের মহান্ পূর্ব্বপুরুষেরা মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ইহা অনেক উপকারও করিয়াছে। তবে কালে উহা অধঃপতিত হইয়া সমাজের উন্নতির ও একত্বের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আমরা বৌদ্ধদের কথা বিচার করিয়া দেখিব: চীন তিব্বত ব্রহ্ম শ্যাম সিংহল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা কি অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর নীতিসম্পন্ন। এই সমস্ত দেশের পাপাচরণের সংখ্যা কি অন্যান্য দেশের তুলনায় কম? বুদ্ধ চাতুর্ব্বর্ণ্যের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছেন ইহাও ঠিক নয়। তিনি শুধু বলিয়াছেন—সন্ন্যাসিসঙ্ঘে উহার কোন স্থান নাই। স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং-হাজবেণ্ড শ্রীবুদ্ধকে 'হিন্দু-সংস্কারক' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মহাকাশ্যপ, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, কাত্যায়ন-প্রমুখ বুদ্ধের প্রধান শিষ্যগণ সকলেই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধিমান ন্যায়পরায়ণ লোকেরা মহদ্ধর্ম্মের অধিকারী হউক ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সৎপথ সদ্ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেহ বিপথে গমন করে ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না।

শ্রীবুদ্ধ তথাকথিত স্ত্রীপুরুষ-সাম্যবাদের প্রবর্ত্তক নন। তিনি স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসের একান্ত বিরোধী ছিলেন। মাতা মহাপ্রজাপতি ও প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধেই তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সন্ন্যাসাধিকার প্রদান করেন এবং সখেদে বলেন—স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ হেতু এই সদ্ধর্ম্ম মাত্র ৫০০ বৎসর সুদৃঢ় থাকিবে। বুদ্ধের দেহত্যাগের পর আনন্দ সঙ্ঘের অধঃপতনের হেতু বলিয়া সঙ্ঘ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। শ্রীবুদ্ধ শুধু আধ্যাত্মিকতাশূন্য বংশগত আধিপত্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ক্ষীয়মাণ চাতুর্ব্বর্ণ্যবাদকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই গীতা লিখিত—ইহা ঠিক নয়। গীতার ৭০০ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ৬।৭ টিতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ আছে। গীতার প্রতি অধ্যায়-শেষে ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র-বর্ণনাই গীতার লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গীতার চাতুর্ব্বর্ণ্য অধিকারবৈষম্যগত নয়, গুণগত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রমূলক চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ গীতা ভিন্ন মহাভারত, ঋগ্বেদাদিতেও রহিয়াছে। প্রথম তিন বর্ণের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাহ, আহারাদির উল্লেখ আছে। সূত্রযুগে শূদ্রকৃত অন্নগ্রহণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বাধা ছিল না। উপনিষদ্যুগে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। বিশ্বামিত্র গৃৎসমদ এবং অন্যান্য ঋষিগণ শূদ্র কববকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"নমস্তেঽস্তু ত্বং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি।" ঋগ্বেদে একই পরিবারে নানাবর্ণীয় লোকের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে চাতুর্ব্বর্ণ্য বৃত্তিমূলক বলিয়া বর্ণিত আছে। আধ্যাত্মিকতানুযায়ী ব্রাহ্মণ, অন্যান্য বৃত্তি-অনুযায়ী অন্যান্য জাতি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও মহাভারতের মতে আদিতে ব্রাহ্মণ বর্ণই ছিল। এই সমস্ত শাস্ত্র-আলোচনাক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ধর্ম্ম ও সদাচার-সম্পন্ন হওয়াই সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিভেদ-প্রথা তুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল অথবা অন্যান্য জাতীয় লোক অপেক্ষা বৌদ্ধদিগকে অধিকতর নীতিসম্পন্ন করিয়াছিল—তাহা নয়। অহিংসাবাদ বুদ্ধের নিজস্ব নয়। ঋগ্বেদে উহার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুরা হিংসা ত্যাগ করে নাই। আবার বুদ্ধের পূর্ব্বেও অনেকে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আজও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মাংসাহারী। চীন জাপান ব্রহ্ম সিংহল প্রভৃতি দেশের অনেক বৌদ্ধ স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমান অথবা খৃষ্টান হইয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্ম বেদের অভ্রান্তত্ব বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছিল—ইহা ঠিক নয়। যদিও কয়েকটি গোঁড়া সম্প্রদায় ইহাকে 'আপ্তবাক্য'-রূপ মর্য্যাদা দিয়া থাকে। শ্রীবুদ্ধের পরে আবির্ভূত আস্তিক্যবাদী কর্ত্তৃক ইহার মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন ইহা অতিরঞ্জিত কথা। হিন্দুরা শ্রীবুদ্ধদেবকে আপনাদের অন্যতম অবতার বলিয়া তাঁহার পূজানুষ্ঠান করেন এবং বৌদ্ধ শিল্প ভাস্কর্য্য প্রতিমাদিও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানুষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং মানুষের বর্ণ ও বৃত্তি পরিবর্ত্তনশীল। মানুষ চিরকাল একই আচার অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না। আবার যদি মানুষ বর্ণবিভাগানুযায়ী চিরকাল থাকে তবে হিট্লার, মুসোলিনী প্রভৃতি নীচজাতীয় লোক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইলেন কিরূপে? ইহার উত্তর এইরূপ:

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণ (ভগবানই) চাতুর্ব্বর্ণ্যানুযায়ী লোকসৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর অপর নাম যে জগৎ, ইহা হইতেই বুঝিতে

পারা যায়—হিন্দুরা পৃথিবীকে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া জানিতেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা লোককে গুণ ও ক্ষমতানুযায়ী একটি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিতেন। এরূপ না হইলে মানুষ এ জগতে দাঁড়াইতে পারে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় মানব-সমাজ গুণ-কর্ম্মানুযায়ী বিভক্ত।

মানুষের জন্মগত গুণের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। শিক্ষা, অভ্যাস প্রভৃতি দ্বারা ইহার সংস্কার সাধন করা যায়। মানুষের উন্নতির পক্ষে কর্ম্ম প্রধান সহায়। কর্ম্মই মানুষের জন্মগত গুণের উন্নতি সাধন করে।

রাজনৈতিক দলবিভাগ জাতিভেদ হইতেও জগতের অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। যে কোন সাইনবোর্ডশিল্পী বা রাজমিস্ত্রী এক দিনে হিটলার বা মুসোলিনী হয় না! একমাত্র যে ব্যক্তি ঐরূপ গুণসম্পন্ন সেই ঐরূপ হইতে পারে। কৃষ্ণ দেখিয়াছেন—দাসীপুত্র বিদুর সাধুশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, গোপিনীরা ব্রাহ্মণ মুনি ঋষি ও সন্ন্যাসী হইতে অধিকতর ঈশ্বর-তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও পারিষদ-বেষ্টিত বিলাসী রাজা অধঃপতিত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না যে, বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি সমস্ত পারিপার্শ্বিক অন্তরায় দূরে ঠেলিয়া দাঁড়াইতে পারে।

চাতুর্ব্বর্ণ্য অর্থ বর্ণবিভাগ, স্তরবিন্যাস নয়। সুতরাং জাতিবিভাগ ইহার বিকৃতিমাত্র। জগতে জাতিভেদ না থাকিতে পারে কিন্তু বর্ণভেদ চিরকাল থাকিবে। যতদিন সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-গুণসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন আছে, ততদিন বর্ণভেদ থাকিবেই।

রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের চাপে সামাজিক পদোন্নতি লাভের জন্য কোন কোন বংশ স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আভীর ব্রাহ্মণগণ গো-পালক ও কৃষক ছিলেন ; যখন শকগণ ভারতে বসতি আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন এবং পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ হইয়া পড়িলেন। বংশগত বৃত্তি অনুসরণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, সেই বৃত্তির রহস্য বংশের মধ্যে গোপন রাখা এবং বংশানুক্রমে তাহার উন্নতি সাধন করা —এই সমস্ত ভাব শুধু ভারতবর্ষেই নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ করার অনিচ্ছা বৌদ্ধদের মধ্যেও দেখা যায়। যখন সমাজের জন্য বিশেষ প্রকার রক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল তখন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণ দৃষ্টি সৃষ্ট হইয়াছিল। এখন সেই প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

হিন্দুধর্ম্মে তফসিলী অথবা অনুন্নত সম্প্রদায় বলিয়া কিছু নাই। হিন্দুধর্ম্ম মানুষকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উপনীত করিতে পারে। সেই অবস্থায় উপনীত হইলে মানুষ এই বিশ্বকে অনন্ত সদ্বস্তুর প্রতিবিম্ব এবং প্রত্যেকের মধ্যে সেই একই সদ্বস্তুকে দেখিয়া থাকে। কোন ধর্ম্মই ঐরূপ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে পারে না—তুমি কাহারও দাস নহ। সমস্ত শক্তি ও স্বাধীনতা তোমাতেই বিদ্যমান। তুমি উচ্চতম হইতেও উচ্চতর, কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানই তোমার মধ্যে রহিয়াছেন। মোহাচ্ছন্নভাব দূরে নিক্ষেপ কর, তোমার অন্তর্নিহিত শক্তি ও মর্য্যাদার বিকাশ সাধন কর। তোমার দুঃখ ও বন্ধন অন্তর্হিত হইবে। তুমি যে সামর্থ্য ও আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা কর তাহা তোমাতেই রহিয়াছে। সুতরাং এস, তোমার ভবিষ্যৎ নিজেই গঠন কর।

হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মই আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদার কথা এত উচ্চরবে

ঘোষণা করে না। একমাত্র উপনিষদ্‌ই মানুষকে মানসিক ও নৈতিক সাহস প্রদান করিতে সমর্থ। নিজকে অসহায় বোধ করিয়া চীৎকার অথবা অন্য ধর্ম্মগ্রহণের ভয়প্রদর্শন করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। আমরাই আমাদের অদৃষ্টগঠনে সমর্থ—আসুন, এই বিশ্বাসে আমরা কার্য্য আরম্ভ করি।

রাজনৈতিক অধিকারলাভ করিলেই দুর্ব্বলতা দূর অথবা উন্নতি হইবে না তজ্জন্য চাই—অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দ্বারা নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নতি-সাধন। অনুন্নত জাতিরা বাহির হইতে বৌদ্ধ-যাজক আনিয়া অথবা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে না। বৌদ্ধরা ভারতে ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে আসিতে বিশেষ উৎসাহী নন। উন্নতসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুও দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাবশতঃ ধর্মপ্রচারে উৎসাহহীন। বর্ত্তমান অবস্থায় অনুন্নত জনগণের উচিত—কালক্ষেপ না করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অবাধ শিক্ষাগ্রহণের সুযোগে ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের অনুসন্ধান ও তাহার স্বায়ত্তীকরণ।

উন্নততম হইতে অবনততম সকলেই হিন্দু-সংস্কৃতির অধিকারী। প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি অনুন্নত জাতির পূর্ব্বপুরুষদের পরিশ্রমেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। উচ্চবর্ণেরা যে শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকারী হইয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা তথাকথিত এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিকট ঋণী। ইঁহারাই তাঁহাদের জীবনরক্ষা ও ভরণপোষণ করিয়াছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতিতে ইঁহাদের ঈশ্বরদত্ত জন্মগত অধিকার। সুতরাং অনুন্নত হিন্দুদের হিন্দুধর্ম্মকে নিজের বলিয়া গ্রহণ ও তাহা হইতেই শান্তিলাভের চেষ্টা করা উচিত। উন্নত-সম্প্রদায়-ভুক্ত হিন্দুরাও তাঁহাদের যাহা আছে তাহা ভাগ করিয়া লইতে প্রস্তুত। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আঘাত করা ও অন্তর্দ্রোহ সঞ্জীবিত রাখা আত্মঘাতী ও মারাত্মক।

অনেকের ধারণা হিন্দুসন্ন্যাসীরা সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুরা এরূপ নন—তাঁহারা সংসারের কাজও করিয়া থাকেন। হিন্দু-সন্ন্যাসীরা সংসারের নিকট মৃতবৎ হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় তদ্গত থাকেন। যখন মানুষ ক্ষুদ্র আমিত্ব ও ক্ষুদ্রাধিকার বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরভাবে অনুপ্রাণিত হয় তখনই সে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সংসার-ভোগান্তে যাঁহার বৈরাগ্য আসিয়াছে অথবা যিনি সংসারের কোন প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করেন না, তিনিই বৈরাগ্যের অধিকারী। সুতরাং সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে পুনরায় সংসারে আসা স্বধর্ম্মত্যাগ অথবা স্বদল ত্যাগের তুল্য! কাজেই হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে ইহা অতি নিন্দনীয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে এরূপ বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই। বৌদ্ধেরা একবার গৃহস্থ হইয়া ভিক্ষু হইতে পারেন এবং পুনরায় গৃহস্থ হইতে পারেন। হিন্দুধর্ম্মে ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধভিক্ষুতে কোনও প্রভেদ নাই। কারণ উভয়কেই বাসনাত্যাগ, ইন্দ্রিয়দমন, ধ্যানাভ্যাস, জ্ঞানার্জ্জন, ধর্ম্মপ্রচার ইত্যাদি কাজ সমভাবেই করিতে হয়!

“সকল ধর্ম্মমতই সত্য—ইহা একটি মিথ্যা ভাষণ মাত্র”—ইহার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, “আজ যদি মানবজাতি মানিয়া নেয়—এক ধর্ম, এক সার্ব্বজনীন উপাসনা, এক নীতিই সত্য; তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত বুঝিতে হইবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ইহা মৃত্যুতুল্য। মহৎ অথবা মন্দ পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক মানবজাতিকে আমাদের কল্পিত তথাকথিত সত্যাদর্শ গ্রহণ করানরূপ মারাত্মক পথে পরি-চালনা না করিয়া আমাদের উচিত—যে সকল

বিঘ্ন শ্রেষ্ঠ-সত্য-লাভে বাধা দিতেছে তাহা দূর করা এবং একটি মাত্র ধর্ম্মস্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ করা।"

জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম আজও বাঁচিয়া আছে এবং জগদ্বাসীকে শান্তি আনন্দ দিতেছে—ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়—সমস্ত ধর্ম্মমতই সত্য। যদি কোন ব্যক্তির ছয়টি আঙ্গুল থাকে এবং সে যদি বলে ইহাই প্রকৃতির ইচ্ছা, ইহা যেমন সত্য; কোন ব্যক্তি যদি বলে একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মই সত্য তাহাও তদ্রূপই হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন সকল ধর্ম্মের মর্ম্মকথা এক। ধর্ম্মসকল একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সততা, পবিত্রতা, দান প্রভৃতি কোন এক ধর্ম্মের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। সকল ধর্ম্মই মহান্ চরিত্রসম্পন্ন স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপ দেখিয়াও যে ব্যক্তি একটি ধর্ম্মকে একমাত্র সত্যধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে সে করুণার পাত্র। আজ আমাদের একমাত্র উচিত—সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসবান্ হওয়া।

একধর্ম্ম-বাদের দিন চলিয়া গিয়াছে। যতদিন মানুষের রুচি ও প্রকৃতি বিভিন্ন থাকিবে ততদিন বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মেরও প্রয়োজনীয়তা থাকিবে। ধর্ম্মের সংখ্যা যত বাড়িবে—মানুষের ধার্ম্মিক হওয়ার পথও তত সুগম হইবে। যে হোটেলে সর্ব্বপ্রকার খাদ্যের সংস্থান থাকে সেখানেই সকল প্রকার লোকের ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। যেহেতু আমাদের প্রকৃতি বিভিন্ন, আমাদের ধর্ম্মও বিভিন্ন হইবে। ভাবপ্রবণ লোকের এক ধর্ম্ম, জ্ঞানবান লোকের অন্য ধর্ম্ম, কর্ম্মপরায়ণ লোকের আর এক ধর্ম্ম হইবে। সুতরাং আমাদের উচিত সমস্ত ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করা এবং সর্ব্বধর্ম্মের সারবস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম গ্রহণ করা।

জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম সহস্র বৎসর যাবৎ বাঁচিয়া আছে এবং আজও সমভাবে মানবকে শান্তি ও আনন্দ দিতেছে। সুতরাং ইহার বিনাশ হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মই বাঁচিয়া থাকিবে এবং জগতের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে, ইহা বাতুলতা মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মে এমন কিছু নাই যাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই। হিন্দুরা শ্রীবুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার যে অদ্ভুত মানব-প্রেম হিন্দু তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। ইহার অর্থ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হওয়া নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার মহদ্ভাব প্রভৃতি সত্ত্বেও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করায় ও অন্যান্য বহুকারণে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইল—রাখিয়া গেল বিরাট ধ্বংসস্তূপ।

তারপর শঙ্করের আবির্ভাব। তিনি দেখাইলেন বুদ্ধের সারতত্ত্ব ও বেদান্তের মধ্যে বিভিন্নতা অতি অল্পই। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের ফলে দেশ যে পাপপঙ্কে ডুবিয়াছিল তাহা হইতে শঙ্করই তাহাকে উদ্ধার করেন। পতিত বৌদ্ধধর্ম্মসঞ্জাত বামাচার নামক কুপ্রথা আজও বিদ্যমান। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদানপূর্ব্বক একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের পক্ষেই সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব, নির্ব্বাণমাত্রসম্বল বুদ্ধের পক্ষে নহে। হিন্দুধর্ম্ম সুরসমষ্টি—বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার একটি সুর। বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি অতি ক্ষীণ। হিন্দুরা বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের বুদ্ধি একত্র সংযুক্ত করিয়াই লাভবান হইবে—হিন্দুধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া নহে, অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ভূত তথাকথিত চমকপ্রদ আধুনিক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও নহে।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের উপদেশ

জনৈক সন্ন্যাসী

২১শে অক্টোবর, ১৯২৭, সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে মহারাজের কাছে বসে দীক্ষার কথা ভাবছি। একটু পরে তিনি বললেন—"তোর ত হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, তোকে যে উপদেশ দিয়েছি—তা তোর মনে আছে? সাড়ে চারটার সময় উঠিস্ ত? ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবি—'ঠাকুর, আমায় প্রেম দাও, শুদ্ধা ভক্তি দাও, দেখা দাও। তুমি কত জ্ঞান প্রেম দিচ্ছ, কত লোককে তরাচ্ছ, আমি তোমার আশ্রয়ে আছি—আমাকে দেখা দাও।' ঠাকুর আমাদের এই রকম উপদেশ দিতেন; বলতেন—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকবি। সকালে উঠে নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের ধ্যান করবি, যেন মাথার উপর সহস্রদল পদ্মে সহাস্য ও জ্যোতির্ময় রূপে শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন। এই রকম ধ্যান করবি।"

আর এক দিন বলেছিলেন, "পারব না—এ কথা আমার কাছে বোলো না। পারব না—এ কথা যেন তোমার মুখে না শুনি। যখনই মনে বিকার উপস্থিত হবে, তখনই ঠাকুরঘরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবে—ঠাকুর, আমায় উদ্ধার করো, কত পাপি-তাপীকে তুমি উদ্ধার করছ, আমাকেও উদ্ধার কর।"

২১শে নভেম্বর, ১৯২৮, ধ্যানের সম্বন্ধে বললেন, "যখন মন স্থির না হয় তখন অনেক রকম ফুল ও নৈবেদ্য সাজায়ে ইষ্টদেবতাকে মনে মনে নিবেদন করবে। মনটা সম্পূর্ণরূপে তাঁতে লাগিয়ে রাখবে; মানস পূজা করবে। তা হলেই মন আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। আসনের বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নেই। যে আসনে বসলে কোন কষ্ট হয় না এবং অনেক ক্ষণ একাসনে থাকতে পারা যায় এইরূপ আসনই শ্রেয়।

"ধ্যান করতে করতে মন যদি ইষ্টদেবতার প্রতি একাগ্র না হতে চায়, ত মন করবে—রাশি রাশি ফুল দিয়ে তাঁকে পূজা করছ, মালা পরিয়ে দিচ্ছ, থালা থালা বিল্বপত্র, পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য সব দিচ্ছ। এই রকম ভাবতে ভাবতে ধ্যান আপনি জমে যাবে।"

২৩শে মে, ১৯২৯, বুদ্ধ পূর্ণিমা দিন মহারাজ বললেন, "বুদ্ধদেব ত্যাগের আদর্শ, মহাতপস্যার ফলে আত্মজ্ঞান লাভ করেন।" পরে ত্রিশরণমন্ত্র উচ্চারণ করলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি।"

কথা-প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "যে যে সংস্কার নিয়ে জন্মায়, তার সেই সেই সংস্কার সহজে যায় না। এমন কি মহাপুরুষদের কাছে থাকলেও নয়। এই দেখ না—শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পর্শে কত লোকের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে উদ্ধার পেয়ে গেছে, কেউ তাঁর কথা শুনে উদ্ধার পেয়ে গেছে, আবার কেউ তাঁর দীর্ঘদিন সেবা করেও সাধারণ লোকের মত রয়ে গেল।"

২৪শে মে, ১৯২৯, আমাকে বললেন, "নিজের দিকে যত তুমি মন দেবে, তত তুমি ছোট হয়ে যাবে; আর পরকে যত তুমি আত্মবৎ

মনে করবে তত তুমি বড় হবে। স্বামীজী বলতেন—নিজেকে ভাবলে যা আনন্দ হয়, নিজের সুখদুঃখে সুখী দুঃখী আর একজনকে ভাবলে তার চেয়ে দ্বিগুণ আনন্দ। এই রকম যত করবে তত তোমার 'আমি'টা জগতে ছড়িয়ে পড়বে। তবে ত আত্মজ্ঞান লাভ হবে। পরকে নিজের মত যত দেখতে শিখবে, তত তোমার হৃদয় উদার এবং আত্মজ্ঞান লাভ হবে।"

একজন কুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বললেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর—ঠাকুর, আমায় প্রেম দাও, শ্রদ্ধা দাও, ভক্তি দাও। তোমারই এক জন ছেলের কাছে আছি। নাথ, একবার কৃপা কর, একবার দেখা দাও। এই রকম কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেই তোমার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা হবে। তোমার কুণ্ডলিনী নিশ্চয় জেগেছেন, না জাগলে তুমি ঠাকুরকে ডাকতে পারতে না, ঠাকুরের কথা আলোচনা করতে তোমার এত ইচ্ছা হ'ত না। যাদের কুণ্ডলিনী জাগেনি তাদের ভগবানের নাম ভাল লাগে না, তারা সংসারে জড়িয়ে পড়ে; যেখানে ভগবানের নাম হয় সেখান থেকে উঠে যায়। ঠাকুরের কাছে কুণ্ডলিনী জাগার প্রার্থনা না করে তাঁকে কি করে পাওয়া যায় সেই প্রার্থনা করবে। প্রত্যহ নিয়মিত জপধ্যান করবে। আর আমাদের জীবন ষ্টাডি (অধ্যয়ন) করবে।

"দেখ না—আমি কেন এখানে এই ৩২ বছর পড়ে আছি। এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ বাকী আছে বলে রেখেছেন। নিজের আত্মা দশের মধ্যে ছড়িয়ে দিবি, আর দশের আত্মাটা নিজের ভেতর টেনে নিবি, দেখবি তাতে কত আনন্দ পাবি। আর যদি তুই নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত থাকিস্, তবে তুই নিজেকে আত্মঘাতী করবি, নিজের মধ্যে জড়িয়ে পড়বি, আর মরবি। নিজেকে যত লোকের মধ্যে বিলিয়ে দিবি ততই আনন্দলাভ করবি এবং তাতেই আত্মজ্ঞান হবে। আর নিজেকে যত জড়িয়ে ফেলবি ততই ছোট হয়ে যাবি।

"এই দেখ—দধীচি মুনির ত্যাগ। লোকের কল্যাণ হবে বলে নিজের অস্থি দান করলেন। এ কি কম কথা? দেবতারা এসে বললেন—হে মুনিবর, আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে প্রাণ বিসর্জন করতে হবে। তখন মুনি বললেন, এই শরীর রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরী, শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য, এই শরীর দিয়ে যদি পরের সেবা না হ'ল তবে এই শরীরধারণ বৃথা—

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥
এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥

'ইহ সংসারে যে ব্যক্তি অনিত্য শরীরের দ্বারা জীবের সেবা করে ধর্ম ও যশ লাভ না করল, সে স্থাবর অপেক্ষাও অধম। জীবের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হওয়াই মহাপুরুষদের ধর্ম। শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর দ্বারা, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও বিত্তদ্বারা যে মনুষ্য স্বার্থশূন্য ভাবে উপকার না করে তার ধন-জন-জীবনে ধিক্।' শেষে দধীচি বললেন—আমার এই শরীরের হাড় দিয়ে যদি বৃত্রাসুরের মত অত্যাচারীর প্রাণ-বধ হয় এবং তিনলোক শান্তিলাভ করে, তবে আমি পরম আনন্দের সহিত প্রাণত্যাগ করছি। এই বলে তিনি দেহত্যাগ করলেন এবং তাঁর অস্থি নিয়ে বজ্র তৈরী হল, তা দ্বারা বৃত্রাসুরবধ

হল। দেখ, কি ত্যাগ! এই রকম ত্যাগেই জ্ঞানলাভ হয়।

"নিজেকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিবি, তবেই এখানে থাকার ফল হবে। এখানে মানুষ হয়ে যদি হৃদয় না হ'ল ত কি হ'ল? নিজেকে পরের জন্য বিলিয়ে দে। যদি কোন অভুক্ত লোক আসে এবং অন্য আহার না থাকে ত নিজেরটা তাকে দিয়ে দিবি।

"সব সময় ধৈর্য-ক্ষমা চাই। রাগ ত্যাগ করবি। যদি খুব রাগের কিছু হয়, নির্বিকার থাকবি, কিছুতেই রাগবি না। রাগে শীঘ্র অধঃপতন হয়। ঠাকুর বলতেন, কামক্রোধাদি ছয় রিপুকে মোড় ফিরিয়ে দিবি। কাম কি না তাঁকে পাবার ইচ্ছা। এই রকম সব তাঁর দিকে মোড় ফিরিয়ে দিবি।

"আসল কথা নিজেকে বিলিয়ে দিবি। পরের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে কুণ্ঠিত হবি না। আর শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত কাজ করবি। শ্রদ্ধা না হলে কিছুই হবে না। শ্রদ্ধা মানুষকে অমর করে। শ্রদ্ধা থেকে প্রেম করুণা ভালবাসা দয়া—আত্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হয়, আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। শ্রদ্ধা না থাকলে কিছুই হয় না। ঠাকুরের উপর নির্ভর করে পড়ে থাক, সব হয়ে যাবে।"

মহাকবি

শ্রীতারাকুমার ঘোষ, এম-এ

বর্ষ বর্ষ অনুক্রমি আজও দিন রাত,
পাণ্ডিত্যের দ্বারে হানে প্রচণ্ড সংঘাত
তর্কের সংগ্রাম। কেহ করে বিশ্লেষণ,
কেহ কহে, এ বিশ্বের প্রকাশ-ভবন
অণু হ'তে প্রাদুর্ভূত—আণবিক তাই
আজি শক্তিমান শক্তি। চলিছে সদাই
তাহার-ই এষণা; অনন্ত আকাশ হ'তে
যে আলোক ঝরে পড়ে ভিন্নস্তরস্রোতে
তাহার পশ্চাতে করে প্রকৃতি নিয়ম
আপনার কাজ, বিবর্তন, অনুক্রম,
এই আছে—আর কিছু নাই; শূন্যলোক
নেতিবাদ নির্বাণের কহে জয় শ্লোক।

হেথা হ'তে বহুদূরে নির্জন নির্ঝরে
যেথায় একটি লতা পুষ্পের নিকরে;
আলোকের সৌন্দর্যের প্রপাতের ধারা
লয়ে স্বপ্নাতুর আঁখি জাগে চন্দ্রতারা,
তার পানে চেয়ে ভাবি ওগো মহাকবি
কাহার রচনা এই মহাবিশ্ব-ছবি?
একি শুধু প্রকৃতির লীলাভূমি পরে
অণুর প্রকাশ-দীপ্তি অনাদি অক্ষরে?
নহে তাহা জানিয়াছি সবার অতীতে
চেতনার দীপ্তি লয়ে মহান সঙ্গীতে,
আলোকের বার্তা লয়ে তুমি মহাকবি
অনন্তকাল আঁকিতেছ এ মহান ছবি।

সমালোচনা

পূজার অর্ঘ্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিজয়া সাহিত্য মন্দির, ভাগলপুর এবং ডি এম্ লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৬৭ ; মূল্য ১।০ আনা।

লেখক-প্রণীত 'রাজা গণেশ', 'মাতৃতীর্থ' এবং 'মহারাজা সীতারাম' ইতঃপূর্বে 'উদ্বোধন'-পত্রে প্রশংসিত হইয়াছে। আলোচ্যমান পুস্তকখানিও আমাদিগকে বিমল আনন্দ দান করিয়াছে। লেখক ভাবুক, সুসাহিত্যিক ; ইহা হইতেও গভীরতর পরিচয় তাঁহার স্বদেশপ্রাণতায়, সদ্ভাব ও সাধুভাবের পরিপোষকতায়। সাহিত্যের আদর্শ-সম্বন্ধে বিদগ্ধ সাহিত্যসমালোচকগণের অভিমত যাহাই হউক, আমরা বলিব সত্য-শিব-শ্রেয়ের তমোবিদারী 'দক্ষিণং মুখম্' যে রসরচনায় প্রতিফলিত, তাহাই আমাদের প্রাণের সাহিত্য। লেখকের রচনার মধ্যে রহিয়াছে শিবেতরের বিরুদ্ধে অভিযান, রহিয়াছে মঙ্গলের অর্ঘ্যোপচার।

আলোচ্যমান পুস্তকখানি ছয়টি গল্পের সমষ্টি। গল্পপাঠে পাঠকগোষ্ঠী তৃপ্তি পাইবেন সন্দেহ নাই। গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্যকে লেখক মোটেই উপেক্ষা করেন নাই, তবে চূড়ান্ত ত্যাগ ও নিষ্ঠার নিকষে পরীক্ষিত যে প্রেম তাহাকেই তিনি শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়াছেন। লেখকের অতন্দ্র সাহিত্য-সাধনাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

জয়যাত্রা—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—বিজয়া সাহিত্য মন্দির, ভাগলপুর। পৃষ্ঠা ১৩ ; মূল্য এক আনা।

ইহা লেখক-রচিত বিভিন্ন পুস্তকের পরিচিতি-পুস্তিকা। বঙ্গবাণার 'জয়যাত্রা'য় লেখক একজন নির্ভীক অনলস অপরাজেয় সৈনিক। তাঁহার সাহিত্যপ্রচেষ্টা সুধীসমাজে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

Hindusthani Teacher—By Surendra Mohan Dutta. To be had of Saraswati Book Depot, 81, Simla Street, Calcutta. Pages 132. Price Rs 1-4-0.

স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কে বিতর্কের অবসান ঘটিয়াছে। ভারতীয় গণপরিষদ হিন্দিকেই রাষ্টভাষা-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দিতে তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ; আবার হিন্দুস্থানীতে উর্দুশব্দ সমধিক ব্যবহৃত। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কে গণপরিষদের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন : যে ভাষা দীর্ঘ সংস্কৃত-শব্দভারাক্রান্ত নহে, অথচ অপেক্ষাকৃত অব্যবহৃত উর্দুশব্দেও জর্জ্জরিত নহে এমন হিন্দি বা হিন্দুস্থানী ভাষাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য গণপরিষদ্ হিন্দি নামই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সর্বজনবোধ্য এই ভাষার প্রচারকল্পে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। সুপণ্ডিত রাষ্ট্রভাষাবিদ্ বর্তমান লেখকের পুস্তকখানির পঞ্চম সংস্করণ চলিতেছে। ইহা হইতেই তাঁহার লেখার অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অনুমিত হয়। পুস্তকখানিতে হিন্দুস্থানী কথার ইংরেজী, বাংলা অসমীয়া উড়িয়া ও উর্দু রূপান্তর থাকায় অধি-

কাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে ইহার সাহায্যে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করা অত্যন্ত সহজ হইবে। লেখক হিন্দি বা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের খুটিনাটি সুনিপুণভাবে প্রথমশিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লেখক মনে করেন এই পুস্তকের সাহায্যে অবাঙ্গালী ভারতবাসিগণও সহজে বঙ্গভাষা শিখিতে পারিবেন। আমরা লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। বঙ্গবাণীর অতুলনীয় সম্পদের সহিত অন্যান্য প্রদেশবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিলে রাষ্ট্রভাষারও দীনতা ঘুচিবে। রাষ্ট্রভাষা শিখিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে পুস্তকখানি অপরিহার্য মনে করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (নবপর্যায়-১৯৪৯) —সম্পাদক ও প্রকাশক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময়-চৈতন্য, অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া। ৭১ পৃষ্ঠা।

এই বার্ষিক পত্রিকাখানি বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন বিদ্যামন্দিরের কতিপয় প্রাক্তন ও অধুনাতন অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীর লিখিত ধর্ম দর্শন সাহিত্য কাব্য শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্বন্ধীয় রচনা ও কবিতা-সম্ভারে সমৃদ্ধ। ইহাতে ২১টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও ১০টি কবিতা স্থান পাইয়াছে।

ভারতের প্রকৃতকল্যাণকামী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার সম্যক্ বিকাশসাধন। আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। এইরূপ অনাস্থামূলক 'নেতি'-ভাবোদ্দীপক শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। আমাদের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে, সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে এবং যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।" পরাধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত ভারতে স্বামীজীর এই শিক্ষাদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বিদ্যা এবং প্রতীচ্যের বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্বন্ধীয় শিক্ষা-বিস্তারের মধ্য দিয়া স্বামীজীর নির্দেশকে বাস্তব রূপদান করিবার জন্য বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যার্থিগণের পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব-গঠনে এবং তাহাদিগকে জীবনসংগ্রামে যথার্থরূপে সমর্থ করিবার মহৎকার্যে বিদ্যামন্দির আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এ কার্যে এই মহাবিদ্যালয় যে ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে সফলতার দিকে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতেছে উহার অন্যতম স্পষ্ট নিদর্শন আমরা পাইতেছি তৎপরিচালিত এই সুন্দর বার্ষিক পত্রিকা-প্রকাশনে। "বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের যে কয়টি বাহন আছে, আমাদের বিদ্যামন্দির পত্রিকা তাহার অন্যতম হইবে"—সম্পাদকের এই শুভ ইচ্ছা ফলবতী হউক এবং পত্রিকাটি দেশের ছাত্র-সমাজের মধ্যে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে এই মহান ভাব অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে স্বামীজীর বহু-আকাঙ্ক্ষিত 'ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজে' বলীয়ান করুক, ইহাই একান্ত কামনা।

পত্রিকাটির মুদ্রণ সুন্দর ও নির্ভুল হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দুই খানা এবং বিদ্যা-মন্দির কলেজ, ছাত্রাবাস ও ছাত্র-অধ্যাপকবৃন্দের তিন খানা মনোরম ছবি ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। পত্রিকাখানির যাত্রাপথ মঙ্গলময় ও জয়যুক্ত হউক।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌

বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থাবলী—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত। প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ও কাগজ উত্তম। মূল্য প্রতি গ্রন্থ আট আনা।

গ্রীক দর্শন—শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪৩। পাশ্চত্য জগতে দার্শনিক চিন্তার প্রথম বিকাশ গ্রীক দর্শন অতি সুন্দর ও সহজভাবে আলোচিত হয়েছে। লেখক ইহাকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন: প্রথম যুগে থালেস্ প্রভৃতি দার্শনিকের মূল উপাদান-সন্ধানপ্রচেষ্টায় ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুতের আবিষ্কার, পিথাগোরাসের সংখ্যাতত্ত্ব, পারমেনাইডিসের 'সত্তা'-তত্ত্ব, জেনোর স্থিতিশীল একত্ব এবং তদুত্তরে হেরাক্লিটাসের গতিশীল বহুত্ব গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন। অতঃপর এম্পিডক্লিসের দ্বন্দ্বশক্তিবাদ, ডিমক্রিটাসের পরমাণুবাদ ও আনেক্জাগোরাসের বহুবীজবাদের সঙ্গে মন বা চেতনার আভাস দিয়েই এ যুগ শেষ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় যুগের প্রশ্ন হল, মানুষের কথা—জগতের উপাদান নয়। মানুষের উপাদান কি? মানুষের মনটা কি? প্রোটাগোরাস-প্রমুখ সফিষ্ট দার্শনিক প্রচার করলেন ব্যক্তিই সব। তার উত্তর দিলেন দার্শনিক সক্রেটিস। তিনি মানুষের বিশ্বজনীন রূপটি ফুটিয়ে তুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকদর্শনের জ্ঞানগরিমায় চারদিক ভরে উঠল।

এরই পর দেখা দিল নূতন যুগের সমন্বয়-চেষ্টা। এর প্রধান পুরোহিত প্লেটো। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ছিল আকাশের দিকে, আরিষ্টটল তাকে নামিয়ে আনলেন পৃথিবীর দিকে। এইখানেই গ্রীক দর্শনের চরম পরিণতি। ধীরে ধীরে গ্রীক-দর্শনসূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়ল। ষ্টোয়িক এপিকিউরিয়ান ও স্কেপ্টিক মতবাদ মনে হয় যেন গোধূলি, অন্ধকারের পূর্বাভাস। পাঁচশ বছর পরে নিওপ্লেটনিজম্ দেখা দিল বহু দূরে—আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। এসব বিষয়ে লেখকের বর্ণনা চমৎকার পুস্তকের প্রথমেই একটি কালপঞ্জিকা পাঠকদের খুবই সাহায্য করবে।

আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭২। লেখক পটভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এযুগের দর্শনের নিছক বহিঃরেখার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করবেন। মধ্যযুগের দর্শন ধর্মপ্রাণ, বিশ্বাস-প্রবণ। য়ুরোপের শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চা দিল সেই স্থির জলকে ঘুলিয়ে। তাই দেখা যায় বিশ্লেষণমূলক দর্শনের ক্রমবিকাশ। ডেকার্ট, বেকন, বার্কলি, স্পিনোজা ও লাইবনিৎসের ভেতর সংগ্রাম চলেছিল বস্তুবাদ আর বিজ্ঞানবাদ নিয়ে। অবশেষে এলেন ক্যাণ্ট। তিনি বললেন—চরম জ্ঞান বা পরমসত্তা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। এই জাগরণ-যুগের দার্শনিক আন্দোলনের চরম বিকাশ হেগেলে। তিনি বললেন—তা কেন, পরমসত্তা প্রতি অণুপরমাণুতে; সীমার মাঝেই অসীমের অভিব্যক্তি। এই মতবাদ য়ুরোপকে মাতিয়ে তুলল।

আরো আধুনিক সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তা-ধারায় আমরা পাচ্ছি ব্র্যাডলির পরমবাদ। তারপর ক্রোচের হেগেল-ভক্তি অথচ হেগেল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা, যার ফলে তিনি "সত্য-শিব-সুন্দরের" ওপর জোর দিয়ে গেলেন। এর পর উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানবাদবিরোধী বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অগ্রদূত মুর। রাসেল ও আলেকজাণ্ডারের চিন্তার প্রেরণা এখান থেকেই। দুঃখের বিষয় সাণ্টায়ানার প্লেটোপ্রীতি মারফৎ বস্তুবাদ-বিচারের চক্রপথে ঘুরে ফিরে প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবাদেই পরিসমাপ্ত হয়েছে।

আমেরিকার জেমস্ অবাক্ হলেন হেগেলের পুনরুজ্জীবন দেখে। তাই তাঁর প্র্যাগ্‌ম্যাটিস্‌ম্ হেগেলদর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তিনি বুদ্ধিবাদকে অস্বীকার করে বাক্য-বুদ্‌বুদের পারে নিয়ে যেতে চাইলেন দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতিকে। এই মতে ব্যবহারিক জীবনে কতটা সুবিধা হবে—এই ছিল তাঁর দার্শনিক দৃষ্টির মাপকাঠি। ইন্দ্রিয়বাদের ভেতর দিয়ে মনস্তত্ত্বের ফাঁদে পড়ে জেমস্ শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানবাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন।

য়ুরোপকে বের্গসঁ শোনালেন নতুন কথা—বস্তু নয়, বুদ্ধি নয়, তত্ত্ব তারও পারে! বুদ্ধি ত আপেক্ষিক—সে কি করে পাবে নিরপেক্ষ সত্যকে? বুদ্ধি ত খণ্ড খণ্ড, সে কি করে জানবে অখণ্ড তত্ত্বকে? বুদ্ধিবৃত্তির উপরে প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা স্বজ্ঞা (intuition)। বের্গসঁর পরমসত্তা অখণ্ড জীবনপ্রবাহ এলা ভিতাল (Elan Vital)।

পুস্তকখানির শেষ অধ্যায় 'মার্কস্‌বাদ: আজ ও আগামী কাল'। দর্শনের লেখক হিসেবে নিরপেক্ষ বিচার করে গেলেই লেখক ভাল করতেন। এই অধ্যায়ে একটু যেন প্রচারের সুর এসে বইখানির রসভঙ্গ করেছে এবং সংখ্যাধিক্য দেখিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে একটা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের দিকে পাঠককে যেন ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দার্শনিক মনের পক্ষে এটা বোধ হয় ঠিক নয়। এই পুস্তকে লেখক হিন্দুধর্ম ও শংকর-সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন—তা এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন বলে মনে হয়। পুস্তকের প্রথমে পরিভাষা-পত্রটি পাঠকের পক্ষে খুবই সহায়ক।

দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি—শ্রীউমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৭৭। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে কোন মতবাদের উপর জোর না দিয়ে সাধারণভাবে দর্শনের মূল চিন্তাধারা আলোচিত হয়েছে। পুস্তকখানি পড়া শেষ হলে মনে হয় এ যেন এক বিরাট বিশ্বদর্শন-গ্রন্থের ভূমিকা অথবা প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শনের একটি অভিনব সমাবেশ।

অল্পপরিসর পুস্তকটির মধ্যে দর্শনসংক্রান্ত সব কিছু না হলেও অনেক কিছু আলোচিত হয়েছে। এর সাহায্যে পাঠক দর্শনের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করবেন এবং বুঝবেন যে, দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যস্থতা করছে, শিল্প ও কাব্যে নবীনতা দিচ্ছে, জীবনের সমস্যার সমাধান করছে, জ্ঞানের পিপাসা মেটাচ্ছে, কর্মে প্রেরণা, শোকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ছোট বড় অনুচ্ছেদে জীব জগৎ ঈশ্বর নিয়তি ক্রমোন্নতি কর্মবাদ আত্মবাদ জন্মান্তর মুক্তি সব কিছুই বিচারদৃষ্টিতে আলোচিত এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের মতামত তুলিত হয়েছে। শেষ সিদ্ধান্তে গ্রন্থকার প্রাচ্য দার্শনিকগণকেই সমর্থন করেছেন। এক অদ্বিতীয় অনাদি অনন্ত গরীয়ান্ সৎ নিজেকে নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন—দেহে মনে সমাজে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বৃক্ষে লতায় পুষ্পে সুন্দরে অসুন্দরে সতে এবং অসতে তিনি নিজকে প্রকাশ করছেন। পাশ্চাত্যেও এর প্রতিধ্বনি আমরা শুনছি। উপসংহারে জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও আপেক্ষিকত্ব আলোচনায় লেখক স্বীকার করেছেন—'সসীম মানুষকে অসীম জ্ঞান দর্শন দিতে পারে না, তবে যতটুকু জ্ঞান সে দেয় তা সুসমঞ্জস ও সুসংবদ্ধ।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের যুগবিভাগে গ্রন্থকার বলেছেন, "ভারতীয় দর্শনের চিন্তার অগ্রগতি ক্ষান্ত—আর য়ুরোপীয় দর্শন এখনো খরবেগে অগ্রসর হচ্ছে।" এ অভিমত মেনে

নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বর্তমানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে য়ুরোপীয় চিন্তা-ধারায় যে বিবর্তন সুরু হয়েছে, ভারত তা হতে মুক্ত নয়। ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে লেখকের ইঙ্গিত—'ধর্ম হয় ত আবার গৃহীত হইবে—হয় ত বা নূতন রূপে। দর্শনেরও আবার নূতন রূপ দেখা দিবে।' পুস্তকখানি আমরা সকলকে পড়তে অনুরোধ করি।

নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ—প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪৮। অতি আধুনিক একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রন্থকার সরল বাংলায় বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। বিষয়ের জটিলতাও পরিভাষার নূতনতায় জন্য বৈজ্ঞানিক দিকটা সাধারণ পাঠকের নিকট সহজবোধ্য না হলেও আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের চিন্তা-ধারার সহিত কতকটা পরিচয় করিয়ে দেবে।

কি ভাবে কার্য-কারণবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি ইলেক্‌ট্রনের অনিয়মিত গতিবেগে শিথিল হয়ে গিয়েছে, কি ভাবে প্ল্যাঙ্কের কণিকাবাদের সহিত আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব মিলিয়ে নিউটনের গতিবিজ্ঞানকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে, কি ভাবেই বা তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির বিকিরণে এক তথা-কথিত মৌলিক পদার্থ হতে অন্য মৌলিক পদার্থের আবির্ভাব হচ্ছে, কি ভাবে পরমাণুবাদের অট্টালিকা শক্তিতরঙ্গে বিলীন হচ্ছে সে সবই লেখক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

শেষে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ এসে বিজ্ঞানের পতনোন্মুখ সৌধকে কি উপায়ে রক্ষা করেছে তা গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন। নূতন বিজ্ঞানে ধারাবাহিক গতি নেই, আছে পদে পদে ঝট্‌কানো গতি—'যেন একটি গোলা লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি নামছে।' লাফের মাত্রা খুব কম হলে তাকেই অবিচ্ছিন্ন গতি বলে মনে হয়। লেখকের এ সব আলোচনা প্রশংসনীয়।

মানুষ এতদিন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে এসেছে—প্রকৃতির কাজের ধারা নিখুঁত ও নিয়মিত। হাইসেনবার্গ বলেছেন—এ বিষয়ে সম্ভাবনাই নির্দেশ করা চলে, নিশ্চয়ের কোন সন্ধান আমরা পেতে পারি না। কারণ, আমাদের অনুভূতি সীমাবদ্ধ। যেমন ত্রিমাত্রিক (three-dimension) পদার্থকে দ্বিমাত্রায় সমতলে বা ছবির কাগজে ঠিক ঠিক বোঝানো যায় না। তেমনি চতুর্মাত্রা বা বহুমাত্রার ঘটনাবলী দ্বিমাত্রায় বা ত্রিমাত্রায় বোঝানো সম্ভব নয়। "নিয়তিবাদে সংখ্যাতত্ত্বের ধারণা আমাদের বাস্তবের খুব কাছাকাছি নিয়ে চলেছে, এক অসম্ভব আদর্শের পরিবর্তে এক গ্রহণযোগ্য সত্যের সন্ধান দিয়েছে।" এই নূতন মতবাদ বিজ্ঞানের ও দর্শনের ক্ষেত্রে দুটি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে—প্রথম কার্যকারণ-সম্বন্ধ—পূর্বে যা মূলতথ্য ছিল, অন্যত্র চললেও পরমাণুজগতে তা চলে না। দ্বিতীয়তঃ—প্রকৃতির চরম সত্তা জানা মানুষের সাধ্যাতীত। বর্তমানই যার অনির্দিষ্ট, ভবিষ্যৎ তার অস্পষ্ট! এ এক অপূর্ব বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ! জগতের মূল প্রকৃতি জড় না মানস—না এ দুয়ের সমন্বয়? বস্তু ও মন—এর কোন্‌টি প্রধান? দর্শনের মুখ থেকে বিজ্ঞান আজ এই প্রশ্ন কেড়ে নিয়েছে। লেখকের এ আলোচনা চমৎকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কালিম্পং শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবং জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গত জুন মাসে দার্জিলিং জেলায় পাহাড়-ধ্বসের ফলে কালিম্পং আশ্রমে কিছু পাহাড়-ধ্বস ও ফাটল হইয়া আবাসগৃহ কয়টি আক্রান্ত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার সময়ে তিস্তা নদী প্লাবিত হওয়ায় জলপাইগুড়ি আশ্রমে ৭'৮ ফুট জল উঠিয়া ২৪ ঘণ্টা ছিল। ইহাতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

উত্তর-ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি রবিবার ও বুধবার নিয়মিত ভাবে বেদান্তের সাধারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী গত মে মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা-গুলি প্রদান করেন: (১) "প্রজ্ঞার চারি স্তম্ভ", "প্রাত্যহিক জীবনকে আধ্যাত্মিকতায় রূপায়ণ", (৩) "কেন, কোথা হইতে, কোথায়?" (৪) "সত্যানুশীলন", (৫) "নিগূঢ় অক্ষর ওঁ", (৬) "আমাদের ধ্যানাভ্যাস কর্তব্য কেন?" (৭) আদর্শানুসরণ ব্যতীত দর্শনশাস্ত্রের সার্থকতা নাই"। সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী "ঈশ্বরানুভূতির বিভিন্ন দিক" এবং "অনুসন্ধান করিও না, কিন্তু দর্শন কর"—এই দুইটি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সোসাইটি-ভবনে স্বামী অশোকানন্দজী সদস্য ও শিক্ষার্থি-গণের নিকট ধ্যানযোগ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাগণকে সার্বভৌম বেদান্তের সাধারণ জ্ঞান এবং সকল ধর্ম ও আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা শিক্ষা দেওয়া হয়।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—১৯৪৭-৪৯ সনের কার্যবিবরণী—১৯২১ সন হইতে এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় আর্ত-নারায়ণের সেবাদ্বারা ব্রহ্মদেশের সমাজ-জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৪১ সনে ইহার অন্তর্বিভাগে (In-patients' Department) ২৩০টি রোগিশয্যা ছিল। অস্ত্রোপচার, যক্ষ্মা, চক্ষুরোগ, যৌনব্যাধি, প্রসূতি-পরিচর্যা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই বিভাগ পরিচালন করিয়াছেন। ঐ সনে ইহার বহির্বিভাগে দৈনিক গড়ে ০০০ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। তখন এই প্রতিষ্ঠানটির স্থান রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের পরেই ছিল, কিন্তু ব্রহ্মদেশে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে এই সেবাশ্রমটি শত্রুর বিমানাক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ভারত-সরকার, ব্রহ্ম সরকার, রেঙ্গুন-করপোরেশন এবং সহৃদয় জনসাধারণের আনু-কূল্যে সেবাশ্রমটি তাহার গৌরবময় পূর্বাবস্থা-প্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ১৯৪৭ সনে কেবলমাত্র বহিরাগত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সেবাশ্রমে একটি ক্ষুদ্র ঔষধালয় স্থাপিত এবং সেই বৎসরের জুলাই মাসে বিভিন্ন-রোগাক্রান্ত ৫০ জন রোগীর চিকিৎসার জন্য একটি অন্তর্বিভাগ খোলা হয়। ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ অস্ত্রোপচার এবং আরও ৫০টি রোগিশয্যা-যুক্ত তিনটি ওয়ার্ডের

ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের পূর্বে সেবাশ্রম হাসপাতাল যত বড় ছিল, বর্তমানে ইহার অর্ধেক পুনর্নির্মিত হইয়াছে। জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে শত শত আর্ত নরনারী প্রতিদিন এই সেবাশ্রম দ্বারা উপকৃত হইতেছেন।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বহির্বিভাগ পরিচালন করিতেছেন। ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সনে এই বিভাগে যথাক্রমে ৭৬৯৬৫, ১৩২২৩২ এবং ১৫৮০৫৮ জন এবং অন্তর্বিভাগে ৪১৪ ২৪৫৮ এবং ৩০১৪৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। সেবাশ্রমের রোগপরীক্ষাগারের (Clinical Laboratory) কার্যকারিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ১৯৪৯ সনে এই প্রতিষ্ঠানে রঞ্জনরশ্মির (X-ray) ব্যবস্থা করা হয়। অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের রোগি-চিকিৎসায় ইহার উপযোগিতা বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছে। বৈদ্যুতিক এবং রেডিয়াম্ চিকিৎসাও সেবাশ্রমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্ম-সরকারের অনুমতি ক্রমে সেবাশ্রম ১৯৪৯ সনে ৬জন কম্পাউণ্ডারকে ঔষধপ্রস্তুতি শিক্ষাদান করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেবাশ্রমের বহুধাবিস্তৃত কার্যের সমর্থনে ভারত সরকার ও ব্রহ্ম-সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত-সরকার এককালীন ১০০০০০৲ টাকা এবং দুই বৎসরের জন্য বার্ষিক ২৫০০০৲ টাকা দিয়াছেন। ব্রহ্ম-সরকার তিনটি ১০০০০০৲ টাকা মূল্যের টিনের ঘর দান করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের অন্যান্য বদান্য ব্যক্তি সেবাশ্রমকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

হাসপাতালের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ ব্যতীতও সেবাশ্রমকে কয়েকটি বিস্তৃতি-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইবে : যথা—(১) ৩০টি রোগিশয্যাযুক্ত একটি নূতন ওয়ার্ড স্থাপন; ইহার জন্য ৩০০০০৲ টাকার প্রয়োজন। (২) আধুনিক উপকরণ-সমন্বিত একটি বহির্বিভাগ প্রতিষ্ঠা; এই কার্যে ৬০০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইবে। (৩) একটি প্রসূতিপরিচর্যা-বিভাগ স্থাপন : এই বাবত ৫০০০০৲ টাকা দরকার। (৪) অস্ত্রোপচার-ব্যবস্থা; এইজন্য ২৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। (৫) একটি অ্যাম্বুলেন্স্ মোটরগাড়ী; ইহার জন্য ১৭৫০০৲ টাকা দরকার। আমরা সহৃদয় জনসাধারণকে এই প্রতিষ্ঠানের জনহিতকর কার্যে সাহায্য করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সনে সেবাশ্রমের আয় যথাক্রমে ২০৩২৯২৷৶০, ২১৪২৪৯৸০ ও ১৮০৩১১১৬ পাই এবং ব্যয় ৯৪৭৬৭৷/০, ১৯২৭৩৫৷৶০ ও ১৯৫৯০৬/৬ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য ঔষধালয়, মায়লাপুর, মাদ্রাজ—১৯৪৯ সনের কার্য-বিবরণী—এই ঔষধালয় ১৯২৫ সনে স্থাপিত। ঐ বৎসরে মাত্র ৯৭০ জন রোগী চিকিৎসিত হন। আলোচ্যমান বর্ষে ইহার হোমিওপ্যাথিক বিভাগ ও অ্যালোপ্যাথিক বিভাগ হইতে যথাক্রমে ২৩,১৯০ ও ৬১,১৪১ জন—মোট ৮৪,৩৩১ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ৪৭৭ জন সার্জিক্যাল রোগী সহ নূতন রোগী ছিলেন ২৪৭৬২ জন। এই বৎসরে মোট আয় ১১,৩৪৬৶১১ পাই এবং মোট ব্যয় ৭৭৩১৸৶৬ পাই।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৪৭-৪৮ সনের কার্যবিবরণী—১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে এই জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানের ৪৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত ত্যাগ ও সেবার অনুপম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহা দীর্ঘকাল যাবৎ নরনারায়ণ-সেবায় নিয়োজিত। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য এবং যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাদের জীবনী ও শিক্ষা আলোচিত হইয়াছে। এই দুই বৎসর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আহূত জনসভায় জনসাধারণের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সভাদ্বয়ে যথাক্রমে পশ্চিম-বঙ্গের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাস নাথ কাটজু মহোদয় পৌরোহিত্য করেন। উভয় সভায়ই প্রখ্যাত বক্তাগণ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এতদ্ভিন্ন এই বর্ষদ্বয়ে সোসাইটি-ভবনে কালী ও সরস্বতী পূজা এবং ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট নবলব্ধ স্বাধীনতা-উৎসব সোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সনে সোসাইটি ধর্ম দর্শন এবং সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে ১১টি শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বেলুড় মঠের কতিপয় সাধু ও কলিকাতা নগরীর কয়েক জন বিশিষ্ট মনীষী এই সকল সভার বক্তৃতা দেন। সভাগুলিতে জিজ্ঞাসু শ্রোতৃবর্গ নিয়মিত ভাবে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে ব্রহ্মচারী তারক এবং শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র জানা কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে এবং সহরতলীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে সাতটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই দুই বৎসর সোসাইটি-ভবনে সপ্তাহে দুই দিন নিয়মিত ভাবে পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিদ্যার্ণব কর্তৃক 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', 'দেববাণী', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'শিবানন্দ-বাণী' পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে। সোসাইটি একটি লাইব্রেরী ও একটি পাঠাগার পরিচালন করিতেছেন। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ৩০২২ ও ১৪৯৫ খানা পুস্তক সোসাইটির সদস্যগণ কর্তৃক পঠিত হইয়াছে। লাইব্রেরী-সংলগ্ন পাঠাগারে অনেকগুলি ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্র ও একখানি বাংলা দৈনিকপত্র রক্ষিত হয়। এই দুই বৎসরে যথাক্রমে ৭ জন এবং ৮ জন দরিদ্র ছাত্রের সাহায্য বাবত ২৪৬৲ এবং ২৭১৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সোসাইটি একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ও পরিচালন করিতেছেন। এই বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ১৬৮৬ এবং ২২৯৪ জন রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হইয়াছে। ভারতীয় রেড্‌ ক্রশ্‌ সোসাইটির সাহায্যে ১৯৪৮ সনে সোসাইটি কর্তৃক একটি দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্র খোলা হয়। এই দুই বৎসর দুগ্ধপ্রাপ্ত দুঃস্থ ব্যক্তি ও শিশুদের দৈনিক গড়

ছিল ১৪০ জন। ১৯৪৮ সনের শেষে সোসাইটির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাড়ে চারিশতে উপনীত হইয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে সোসাইটির আয় ৫১৮৫৮/৩ পাই এবং ব্যয় ৪৮২৪/৬ পাই।

কলিকাতা নগরীতে বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির ও ভবন নির্মাণকল্পে সোসাইটির সভাপতি স্বামী আত্মবোধানন্দজী দুই লক্ষ টাকার অর্থসাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫১০২১৷/০ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা আশা করি, দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক এবং ভারতীয় জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সহৃদয় দেশবাসিগণ সোসাইটিকে অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থানুকূল্য করিবেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ-সোসাইটি—গত আষাঢ় মাসে এই প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ধর্মাধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে বৌদ্ধশাস্ত্র "ধম্মপদ", শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" ও "শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পত্রাবলী" এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব "গীতা" ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত সোসাইটির পরিচালনায় কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে কয়েক স্থানে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারিত হইয়াছে।

কোচবিহারে ধর্মপ্রচার—গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ হইতে চারি দিন অপরাহ্নে মাথাভাঙ্গা ৺মদনমোহন বিগ্রহের নাটমন্দিরে আহূত চারিটি জনসভায় স্বামী সুন্দরানন্দজী যথাক্রমে "শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়", "বর্তমান সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ", "হিন্দু মুসলমানে মিলনের উপায়" ও "নরনারায়ণ-সেবা" সম্বন্ধে চারিটি বক্তৃতা দেন এবং ঐ চারি দিন স্থানীয় ভক্তদের গৃহে গীতার কর্মযোগ, ভাগবতের ভক্তিযোগ ও পতঞ্জলির যোগসূত্র ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ঘোষ বি-এল্, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ বি-এল্, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চক্রবর্তী এম-এ এবং শ্রীযুক্ত মোহনলাল ভাদানী বি-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত স্বামীজী স্থানীয় সদ্যস্থাপিত "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির" ও শরণার্থি-কেন্দ্র কয়টি পরিদর্শন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি গত ৪ঠা আষাঢ় অপরাহ্নে কোচবিহার টাউন হলে কোচবিহারের শাসনকর্তা মিঃ কে কে হাজরার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় "জাতিগঠনে স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসমিতি, হাফলং, (আসাম)—কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠ, শিলং, শিলচর, করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বিশিষ্ট ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের পূর্বদিন স্বামী সৌম্যানন্দজীর পৌরোহিত্যে আহূত এক জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইলে স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ বসু এবং সভাপতি শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সমগ্র দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার্চনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-পাঠ, প্রসাদবিতরণাদি হয়। সন্ধ্যায় উক্ত স্বামীজীদ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাসম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, দেশবন্ধুনগর (২৪ পরগনা)—দেশবন্ধুনগর চিত্তরঞ্জন কলোনী-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না বসু তাঁহার বাসভবনে (১১ কাঠা জমি ও পাকা দালানাদি—মূল্য অনুমানিক ২০০০০ টাকা) শ্রীশ্রীমার নামে রেজিষ্টার্ড দলিল দ্বারা অর্পণ করিয়া গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের চিত্রপট যথাবিধি পূজার্চনা ও হোমাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কতিপয় ভক্ত-যুবক শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নামকীর্তন করিয়া করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। এই ভবনের নাম রাখা হইয়াছে "শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির"।

তুলসীঘাটা নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—২৪ পরগনার অন্তর্গত জয়নগরের নিকটবর্তী এই আশ্রমে কিছুদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্ম মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজাদি অন্তে প্রায় ছয় শত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় এক ধর্মসভায় বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। সভায় রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভক্তগণ কর্তৃক কালী কীর্তন হয়। রাত্রে কলিকাতা বিবেকানন্দ-সোসাইটির শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র জানা ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরদিন রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সভ্যগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় গায়কগণ 'মনসার ভাসান' গান করেন।

ভ্রম-সংশোধন—গত জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধনে "রাড়ীখালে (ঢাকা) স্বামী প্রেমানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ রাড়ীখালে ১৯১৫ সনের ২৯শে ও ৩০শে মে দিবসদ্বয় অবস্থান করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ঐ সনের এপ্রিল মাসের শেষ এবং মে মাসের প্রথম দিকে (বাং ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) ১০।১২ দিন রাড়ীখালে অবস্থান করিয়াছিলেন।

গত আষাঢ় মাসের উদ্বোধনে "শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদপ্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, ১৯১৯ সনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বাঙ্গালোরে অবস্থান-কালে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দেহত্যাগের কথা স্বপ্নে জানিতে পারেন। কিন্তু তিনি ঐ সনে বাঙ্গালোরে যান নাই। প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ১৯২০ সনের ২০শে জুলাই (বাং ১৩২৭ সনের ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার) কলিকাতা বাগবাজার মঠে দেহত্যাগ করেন। ঐ দিন রাত্রে শ্রীশ্রীমহারাজ ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অবস্থান-কালে ঐ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই ভ্রমের জন্য আমরা লজ্জিত ও দুঃখিত।
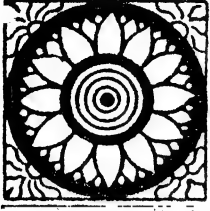
স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-সংবাদ

সম্পাদক

(২)

ইংলিশ্‌ম্যান্, ৬ই জুলাই, ১৯০২ সন—আমরা গভীর দুঃখের সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের অধিনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিতেছি। এই দুঃখজনক ব্যাপার গত শুক্রবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় বেলুড় মঠে সংঘটিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সে—কিঞ্চিদধিক ৩৯ বৎসরে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না এবং অধুনা তিনি নানা রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত-গগন হইতে একটি বিশাল নক্ষত্র অন্তর্হিত হইল। আমেরিকায় তাঁহার কার্য সে দেশ ও এ দেশের পক্ষে অমূল্য। প্রায় সাড়ে তিন বৎসর যাবৎ এই কার্য চলিয়াছিল। ১৮৯৩ সনের কোন সময়ে তিনি আমেরিকায় যান এবং ১৮৯৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রত্যাবর্তন করেন। এ দেশে প্রত্যাগমনের পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। সম্প্রতি আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের পরিধি এত অধিক বিস্তৃত হইয়াছে যে, স্বামী বিবেকানন্দের তথাকার সহকর্মিগণ স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রচারকার্যে সহায়তা করিবার জন্য আরও দশ জন হিন্দুপ্রচারক তথায় পাঠাইবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশন প্রধানতঃ মান্দ্রাজ, আলমোড়ার নিকট মায়াবতী, মুর্শিদাবাদ, রাজপুতনার কিষেণগড় এবং হরিদ্বারের নিকটবর্তী কনখলে নীরবে ও অনাড়ম্বর ভাবে জনহিতকর কার্য করিতেছেন। হাওড়ার নিকট বেলুড়ে ইহার প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠান কয়েকটি অনাথালয় স্থাপন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কার্য সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সংখ্যায় আমরা আরও সবিস্তার সংবাদ দিব।[১]

ইংলিশ্‌ম্যান্, ৭ই জুলাই, ১৯০২ সন—গত শুক্রবার সন্ধ্যাকালে হাওড়ায় বিশেষ খ্যাতনামা জনৈক ধর্মসংস্কারক পরলোক গমন

[১] ***The Englishman, July 6, 1902.***—We deeply regret to announce the death of Swami Vivekananda, the head of the Ramkrishna Mission. This melancholy event took place on Friday last at 10 p.m., at the Belur Math. He died at the rather early age of a little over 39 years. He had been suffering in health for a long time, and lately had a complication

করিয়াছেন। প্রায় পনর বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রচারক-রূপে সাধারণ্যে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উত্তর-ভারতের বড় বড় শহরে জনসভাসমূহে তাঁহার আশ্চর্য ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি ও বাগ্মিতা বিরাট জনসংঘকে আকর্ষণ করিত। এই দেশে সাধারণতঃ ধর্মপ্রচারককে প্রকাশ্য সভায় তাঁহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী জনসাধারণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের অভিযোগসমূহের উত্তর দিতে হয়। এই ভাবে কাশী ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে স্বামীকে সে কালের প্রধান প্রধান হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল। সতত বাদানুবাদে নিযুক্ত থাকার ফলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার নিজের ধারণাসমূহ বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে। এক দিন তিনি সহসা শিষ্যগণের নিকট ঘোষণা করেন যে, এই পুনর্জাগরণ-অভিযান হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন। অতঃপর ধ্যান-ধারণার জন্য তিনি এক বৎসর কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। নির্জন বাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এক অভিনব ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম একই প্রত্যাদিষ্ট সত্যের অভিব্যক্তি। আমরা যত দূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, তাঁহার এই মতের সমর্থনে ঐতিহাসিক বা তদ্রূপ অন্য প্রমাণমূলে তিনি কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ আট নয় বৎসর ঐ তিনটি দার্শনিক মতের মৌলিক ঐক্য প্রচারেই ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, জাতিভেদ এবং তৎসমর্থিত স্বার্থপরতা হিন্দুদের অধঃপতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। তিনি অদৃষ্ট-পূর্ব নৈতিক বলে সকল জাতিগত বৈষম্য এবং আনুষ্ঠানিক নিয়মপদ্ধতি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। এইগুলিকে এক সময়ে তিনি প্রকৃত ধর্মের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত দর্শন নানা দিক দিয়া এত চিত্তাকর্ষক ছিল যে, উহা দ্বারা তিনি কেবল তাঁহার দেশবাসি-গণকে নহে, পরন্তু ইউরোপীয়গণকেও দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী বিরাট সম্প্রদায়ের সর্বজন-মনোনীত প্রতিনিধিরূপে আমেরিকা পরিদর্শন করেন এবং বাগ্মিতার জন্যই যে সকলে আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিতেন তাহা নহে, অধিকন্তু কয়েক জন তাঁহার একনিষ্ঠ শিষ্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে তৎপ্রচারিত দার্শনিক মত বিলুপ্ত হইবে না, উহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তিনি নিন্দকগণের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিলেন না, কিন্তু অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও উচ্চচিন্তার এরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত তাঁহার ন্যায় আর কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই। তিনি দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিলেন; প্রাচ্য

of diseases. In him a star of great magnitude has disappeared from the Indian firmament. His work in America was of inestimable value both to that country and to this. It extended over a period of nearly three and a half years. He proceeded to America sometime in 1893, and returned to India in February, 1897. Ever since his arrival in his country, he had been far from well. Lately, the area of the Ramkrishna Mission work in America has widened so much that Swami Vivekananda was called upon by his colleagues in that country to send ten more Hindu preachers there to supplement the labours of Swami Abhedananda and Swami Turiyananda. The Ramkrishna Mission has been doing good work in India quietly and unostentatiously for some years, chiefly in Madras, Mayavati, near Almora, Murshidabad, Kishengarh in Rajputana, and Kankhal near Hardwar, its head quarters being at Belur near Howrah. It has established several orphanages. We reserve for a future issue a more detailed notice of the life and work of Swami Vivekananda.

দার্শনিক সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হইতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাঁহার চালচলন ও কার্যাবলী পুরোহিত অপেক্ষা যোদ্ধার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।[২]

[২] ***The Englishman, July 7, 1902.***—A very remarkable religious reformer passed away at Howrah on Friday evening. Swami Vivekananda first came into public prominence nearly fifteen years ago as the champion of orthodox Hinduism. His eloquence combined with a strange personal magnetism attracted enormous crowds to the public lectures he delivered in the large towns of Upper India. In this country it generally happens that a religious lecturer has to meet and answer in public the objections of people who think and believe other than he does, and it was thus that the Swami was brought into contact with the foremost living Hindu and Buddhist philosophers at places like Benares and Lahore. The result of the constant controversy in which he was engaged was to revolutionize his own ideas on the subject of Hinduism. One day he suddenly announced to his disciples that he was retiring from the revivalist campaign. Then he disappeared for a year from the active world in order to meditate. On emerging from his seclusion he began to preach a new gospel. He stated that Hinduism, Buddhism and Jainism were but manifestations of the one revelation. So far as we are aware he did not publish any book supporting this statement by historical or similar evidence, but the last eight or nine years of his life were spent in preaching the essential oneness of the three systems of philosophy. It was his belief that the caste system and the selfishness it encouraged was responsible for much of the degradation of the Hindus. With a rare moral courage he threw away all the caste restrictions and ceremonial formulae, which he at one time had declared were essential to true religion. The philosophy he preached was in many respects so attractive that he was able to make converts not only among his own people, but among Europeans. He visited America as the recognized representative of an enormous community of Hindu-Buddhists and his eloquence not only ensured him a hearing, but won him some very fervent disciples. There are indications that his system of religious philosophy will not disappear with his death. He was not without his calumniators, but no man ever set a better example in the way of plain living and high thinking. He was big and burly in appearance, very different from the ordinary conception of an Eastern philosopher, and his movements and actions recalled rather the warrior than the priest.

অনন্তের পথিক

শ্রীসুধীরকুমার রায় চৌধুরী

অনন্ত বিশ্বের বুকে জীবনের ক্ষণ-পান্থশালা
কালের করাল ডাকে বার বার হতেছে নিরালা।
জ্ঞানহীন চলিয়াছি আমি সদা বিমূঢ়ের মত
নবরূপে, নবনামে লক্ষ্যহীন পথে অবিরত।

কোথা হতে আসি আমি, কোথা চলি যুগ যুগ ধরি
কেনই বা আসি হেথা, তাই ভাবি দিবস-শর্ব্বরী।
কাল-সাগরের আমি যেন নিমেষের বুদ্‌বুদ,
অক্ষর হয়েও ক্ষর-রূপে ভাসি বড়ই অদ্ভুত!

সংসার-পথে পাথেয়শূন্য আমি চলিয়াছি একা,
নব নব সঙ্গী সাথে বার বার হয় মোর দেখা।
রত্ন বলি' হেথা অহরহ আমি কুড়াই কাঁকর
শত ফণা মেলি দংশে আমার অবিদ্যা-বিষধর।

ক্ষুধা পেলে খেতে হবে, চিত্তে মোর অনাদি সংস্কার
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মাতৃস্তন্যে প্রবৃত্তি আমার।
ছাড়ি অন্য পান্থশালা প্রথমে আসিয়া এ ধরায়
আলিঙ্গিনু দৃঢ়ভাবে মাতৃক্রোড় ভয়ে মৃতপ্রায়।

জনম জনম কাম-কাঞ্চনের বাসনা-নিচয়
কালের প্রয়াণপথে কোন দিন হয় নাই লয়।
কত সম্মোহন স্বপ্ন রচিতেছি কামনার বশে,
নব নব আশাবাণী দিবানিশি কর্ণে মোর পশে।

কি পেতে আসি এ ভবে, হেথা আমি কি কি বা হারাই ?
জ্ঞানহীন আমি সদা, বুঝিবার শক্তি মোর নাই।
যৌবনের বিজিগীষা শত শত আশা-মরীচিকা
আগামী স্বপ্নের রাজ্যে রচিতেছে মায়া-কুজ্ঝটিকা।

বার বার আসিতেছি দেখিবারে এ ভবের মেলা,
নেশায় ধরেছে মোরে, ছাড়িতে পারি না ধূলাখেলা।
আমার এ আনাগোনা ঢেউ যেন ঢেউ ছুঁয়ে চলে,
জানি না মিশিবে ঢেউ কবে অনন্ত সাগর-জলে।

সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে পৃথিবীর পুরাণ পথিক
ভবিষ্যের দ্বারপ্রান্তে চেয়ে আছি সদা নির্নিমিখ।
চিতার আগুনে যবে এই দেহ পাইবে বিলয়
নূতন সৃষ্টির মোহে কোথা পুনঃ মাগিব আশ্রয় ?

অন্ধ আবেগে ছুটিয়া সদা চলিয়াছি যাযাবর
অসার সংসার এই, যেন সীমাহীন বালুচর।
কত কালে চলা মোর হবে শেষ, বলা সুকঠিন,
ভবকারাগারে বন্দী, স্বেচ্ছায় হ'য়েছি পরাধীন।

বাসনা-কুসুম মোর সুরভি মদির-গন্ধময়
তাহাতে আকৃষ্ট হ'য়ে রচিতেছি সংসার-আলয়।
কত সৃষ্টি চলে গেল, কত ঝড় বহিল হিয়ায়
তবু না চৈতন্য হ'ল বার বার আসি এ ধরায়।

জানি না হবে কি কভু আদিম আত্মীয় সাথে দেখা
যাঁহার অন্তিম স্বপ্ন হৃৎ-চিত্রপটে আছে লেখা,
থেকে থেকে মনে হয় ছাড়ি এই অভিশপ্ত নীড়
যাব সেথা যেথা গেলে পূর্ণতায় হইব সুস্থির।

ওগো স্বরূপ আমার! কেন রয়েছ আপনা ভুলি ?
কি আনন্দ পাও তুমি, মাঝখানে এ প্রাচীর তুলি ?
নিঠুর আঘাতে ভাঙ্গ, ভাঙ্গ এবে প্রাচীরের দ্বার
চল চল পশি নিত্যানন্দে, ত্যজ আপন আগার।

ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

(১)

ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র আকর বেদ। এই জন্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-সমূহের আকরও বেদ। ভারতীয় দর্শনে মুখ্যতঃ অধ্যাত্মচিন্তাই বিবৃত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে বৌদ্ধজৈনাদি-দর্শনসমূহকে বেদবাহ্য বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহাদের মূল সিদ্ধান্ত বেদেই নিহিত রহিয়াছে। এই অভিমত কুমারিল ভট্ট তাঁহার তন্ত্রবার্ত্তিকে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"বিজ্ঞানমাত্রক্ষণ-ভঙ্গনৈরাত্ম্যাদিবাদানামপ্যুপনিষদর্থবাদপ্রভবত্বং বিষয়েষ্বাত্যন্তিকং রাগং নিবর্ত্তয়িতুমিত্যুপপন্নং সর্ব্বেষাং প্রামাণ্যম্।" বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানমাত্রা-স্তিত্ব ক্ষণভঙ্গনৈরাত্ম্যাদি সিদ্ধান্তও বেদের উপনিষদ্-ভাগ এবং অর্থবাদ-ভাগ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্থলে কুমারিল ভট্ট সাংখ্যাদি দর্শনও যে বেদপ্রসূত তাহাও বলিয়াছেন—"যাশ্চৈতাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরপরমাণুকারণাদি-প্রক্রিয়াঃ সৃষ্টিপ্রলয়াদিরূপেণ প্রতীতাস্তাঃ সর্ব্বা মন্ত্রার্থবাদজ্ঞানাদেব।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমস্ত দর্শনপ্রস্থানই বেদ হইতে প্রসৃত। ইহা কেবল আমাদের কথা নহে, ইহা সুপ্রাচীন কুমারিল ভট্টও বলিয়াছেন। বেদই সকল দর্শনপ্রস্থানের উৎপত্তিস্থান। একই উৎপত্তি-স্থান হইতে বিভিন্ন প্রবাহ নানা দিকে প্রবাহিত হইয়া একই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পর বিরোধ পরি-লক্ষিত হইলেও চরম সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই। ভারতীয় দার্শনিকগণের চরম সিদ্ধান্তের মহিমাই এইরূপ যে উহাতে উপনীত হইলে আর বিরোধগন্ধ থাকে না। যে স্থানে উপস্থিত হইলেও বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা ভারতীয় দার্শনিকগণের চরম সিদ্ধান্তই নহে। যাহা চরম সিদ্ধান্ত নহে তাহাতে বিরোধ আছে বলিয়া অনেকে ভ্রান্তি বশতঃ মনে করেন, দার্শনিকগণের চরম সিদ্ধান্তও পরস্পরবিরোধী।

ভারতে দর্শনপ্রস্থান বহুসংখ্যক। এইজন্য সমস্ত দর্শনপ্রস্থানের আলোচনা করা কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব। অতএব আমরা প্রসিদ্ধ দর্শনপ্রস্থানগুলির আলোচনা করিয়া দার্শনিকগণের চরম সিদ্ধান্তে অবিরোধ প্রদর্শন করিব। বেদের তিনটি কাণ্ড শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সমস্ত বেদভাগ এই কাণ্ডত্রয়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমগ্র বিদ্যাপ্রস্থানের কথা বেদে থাকিলেও সেই কথাগুলি প্রদর্শিত তিনটি কাণ্ডের কোন একটিতে বলা হইয়াছে। ভগবান্ জৈমিনি-প্রোক্ত দর্শন পূর্ব্বমীমাংসা নামে প্রসিদ্ধ। এই জৈমিনিসূত্রের বহু প্রাচীন ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে আমরা শাবর-ভাষ্যই দেখিতে পাই। এই শাবর-ভাষ্যের ব্যাখ্যাতৃগণের দুইটি সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ—একটিকে ভাট্টসম্প্রদায় ও অপরটিকে প্রাভাকর-সম্প্রদায় বলে। ভাট্টসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ভট্টপাদ কুমারিল এবং প্রাভাকর-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহামতি প্রভাকর

মিশ্র। শাবরভাষ্যের আশয় প্রদর্শন করিবার জন্য ইঁহারা দুই জনই বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইঁহারা দুইজনেই সপ্তম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। ভগবান্ বাদরায়ণ যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন তাহাতে উপাসনা-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই মীমাংসিত হইয়াছে। যদিও সঙ্কর্ষকাণ্ড বলিয়া আরও একটি বেদের মীমাংসা প্রস্থান দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রস্থানকে দেবতামীমাংসা-প্রস্থান বলা হয়, তথাপি এই সঙ্কর্ষকাণ্ডের সহিত বর্ত্তমান সময়ে কাহারও বিশেষ পরিচয় নাই। যদিও কাশী হইতে সঙ্কর্ষকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে এবং ভাস্কর রায় প্রণীত তাহার একটি বিবরণও উহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে, তথাপি এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ সঙ্কর্ষকাণ্ডের রচয়িতা কে, এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবদ্‌রামানুজাচার্য্য জৈমিনিকেই সঙ্কর্ষকাণ্ডের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রাচীন বৃত্তিকারেরও ইহাতে সম্মতি আছে দেখাইয়াছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়েরই 'তত্ত্বরত্নাকর'-গ্রন্থের রচয়িতা এই সঙ্কর্ষকাণ্ড কাশকৃৎস্ন-বিরচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সঙ্কর্ষসূত্র-সমূহে বেদের উপাসনা-কাণ্ড মীমাংসিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা পূজ্যপাদ ব্যাসতীর্থমুনি ব্রহ্মের নির্গুণত্বখণ্ডন-প্রকরণে একটি সঙ্কর্ষসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—'অচেতনাসত্যাযোগ্যান্যনুপাস্যান্যফলত্ববিপর্য্যয়াভ্যাম্'। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতীও 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ২য় পরিচ্ছেদে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব উপপত্তিপ্রকরণে এই সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রটি কাশীমুদ্রিত সঙ্কর্ষ-সূত্রে উল্লিখিত হয় নাই। কেবল যে উল্লিখিত হয় নাই তাহা নহে, বর্ত্তমান উপলব্ধ সঙ্কর্ষসূত্রে উপাসনা-সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। উপলব্ধ সঙ্কর্ষসূত্রে যাহা আছে তাহা জৈমিনি-প্রণীত মীমাংসাসূত্রের পরিশিষ্ট-স্বরূপ।

যাহা হউক, বেদের কাণ্ডত্রয় মীমাংসার জন্য পূর্ব্বোত্তর মীমাংসকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বেদের অর্থনিরূপণ করিবার জন্য মীমাংসাশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। 'প্রস্থানভেদ' নামক গ্রন্থেও মধুসূদন সরস্বতী এই কথাই বলিয়াছেন। ভট্ট প্রভাকর প্রভৃতি পূর্ব্বমীমাংসকগণ বেদার্থ-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া বেদার্থ-প্রদর্শনের অনুকূলে ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক-মতসিদ্ধ পদার্থই মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। আর এইজন্য পূর্ব্ব-মীমাংসকগণ ন্যায়দর্শনে ও বৈশেষিক দর্শনে প্রদর্শিত আরম্ভবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাবপদার্থ বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন—"দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।" এই বৈশেষিক-সম্মত পদার্থই ন্যূনাতিরেক-ভাবে গ্রহণ করিয়া ভাট্টপ্রস্থান ও প্রাভাকর-প্রস্থান রচিত হইয়াছে। "দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যানি চত্বারি এব পদার্থা ইতি তৌতাতিতাঃ, দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যসংখ্যাসমবায়সাদৃশ্যশক্তয়োঽষ্টৌ পদার্থা ইতি প্রাভাকরাঃ, দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য-সংখ্যাসমবায়সাদৃশ্যশক্তিক্রমোপকারসংস্কারা একাদশ পদার্থা ইতি প্রাভাকরৈকদেশিচন্দ্রঃ, চন্দ্রোক্তা একাদশ ঔপাধিকশ্চাপর ইতি দ্বাদশ পদার্থা ইতি মহার্ণবকারাঃ।" (প্রশস্তপাদভাষ্য) সেই টীকাতে ভট্টসম্মত ও প্রভাকরসম্মত যে পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা শঙ্করমিশ্র-প্রণীত 'বাদিবিনোদ' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চপাদিকা-বিবরণের পঞ্চম বর্ণকে পূজ্য-পাদ প্রকাশাত্মযতি বলিয়াছেন—"দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সামান্যাত্মকমিতি বার্ত্তিককারঃ। দ্রব্যগুণ-

কর্ম্মসামান্যবিশেষশক্তিপারতন্ত্রনিয়োগা ইত্যষ্টৌ প্রাভাকরাঃ।" এই সকল উক্তির প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, বৈশেষিকসম্মত পদার্থগুলি ন্যূনাতিরেক-ভাবে গ্রহণ করিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা-প্রদর্শনে পূর্ব্বমীমাংসকগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পূর্ব্ব-মীমাংসকগণ ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকগণের মতই অসৎকার্য্যবাদী। বৈশেষিক-সম্মত এই অসৎ-কার্য্যবাদই আরম্ভবাদ নামে প্রসিদ্ধ। আরম্ভ-বাদ অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বমীমাংসকগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম প্রভৃতির নিরূপণ জৈমিনি করেন নাই। দ্রব্যগুণাদির লক্ষণও তিনি প্রদর্শন করেন নাই। কাণাদতন্ত্রেই ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত ও নিরূপিত হইয়াছে। এই কণাদ-শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দ্রব্যগুণাদি পদার্থ অবলম্বন করিয়াই জৈমিনি তাঁহার সূত্ররচনা করিয়াছেন। যেমন 'দ্রব্যগুণ-সংস্কারেষু বাদরিঃ', 'কর্ম্মণ্যপি জৈমিনিঃ' ইত্যাদি। জৈমিনি স্বীয় সূত্রে দ্রব্যগুণাদির ব্যবহার করিলেও তিনি নিজে ইহাদের নিরূপণ করেন নাই, কিন্তু কণাদশাস্ত্র-নিরূপিত পদার্থ লইয়াই স্বীয় সূত্রসমূহ রচনা করিয়াছেন। আর এইজন্যই ভট্ট প্রভাকর প্রমুখ মীমাংসকগণ বৈশেষিকমত-সিদ্ধ পদার্থই ন্যূনাতিরেক-ভাবে গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

যাঁহারা মনে করেন—কাণাদতন্ত্র অবৈদিক, তাহা বেদানুকূল নহে, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে কণাদ-প্রদর্শিত দ্রব্যগুণাদি পদার্থ এবং অসৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি যদি অবৈদিক হইত তবে পূর্ব্বমীমাংসকগণ বেদার্থ-প্রদর্শনের জন্য এই কাণাদসম্মত পদার্থ গ্রহণ করিতে গেলেন কেন? সাংখ্যাদিপ্রসিদ্ধ পদার্থ লইয়াও তো বেদার্থ প্রদর্শন করিতে পারিতেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যাতে তাহা অনুকূল নহে বলিয়াই পূর্ব্বমীমাংসার সূত্রকার ভাষ্যকার বার্ত্তিককার প্রভৃতি তাহা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদের কর্ম্মকাণ্ড আরম্ভবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বেদের কর্ম্ম-ভাগকে বিবৃত করিবার জন্য কণাদ প্রমুখ মহর্ষি আরম্ভবাদের ব্যুৎপাদন করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক দার্শনিকগণ বেদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বেদব্যাখ্যার অনুকূলে নানা প্রকার প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন। আমরা ভারতীয় বৈদিক দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাই যে কোন দর্শনপ্রস্থানে আরম্ভবাদ, আবার কোনটিতে পরিণামবাদ, অন্য কোন প্রস্থানে বিবর্ত্তবাদ—এই তিনটি বাদের যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া বৈদিক দার্শনিকগণ স্ব স্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ-প্রদর্শিত বাদ এই তিনটি বাদ হইতে পৃথক্। সংঘাতবাদ অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধদার্শনিকগণ স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আর এই কথা 'সংক্ষেপ-শারীরকে'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫৭ কারিকাতে বলা হইয়াছে—

"আরম্ভসংহতিবিকারবিবর্ত্তবাদানাশ্রিত্য
বাদিজনতা খলু বাবদীতি ॥"

প্রদর্শিত এই চারিটি প্রকার ভিন্ন অন্য কোন পঞ্চম প্রকার কল্পনার বিষয়ই হইতে পারে না। যে সমস্ত দার্শনিকগণ অন্য প্রকার প্রদর্শনে উৎসাহী হইয়াছেন তাঁহারাও এই প্রদর্শিত চারিটি বাদের পরস্পর সংমিশ্রণদ্বারা প্রকারান্তর দেখাইয়াছেন মাত্র, বস্তুতঃ তাহা প্রকারান্তরই নহে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড আরম্ভবাদে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে। বেদের উপাসনাকাণ্ড পরিণাম-বাদে প্রতিষ্ঠিত বুঝিতে হইবে। ভগবান্ ভাষ্য-কার শঙ্করাচার্য্য 'আরম্ভণ'-সূত্রের শেষভাগে বলিয়াছেন যে—"অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্যপ্রপঞ্চং

পরিণামপ্রক্রিয়াং চাশ্রয়তি—সগুণেষূপাসনেষূপযোক্ষ্যত ইতি।" ইহার অর্থ ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ ২।১।১৩ সূত্রে পরিণামপ্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। ১৪ সূত্রে বিবর্ত্তবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মকারণতাবাদে দোষ-পরিহারের জন্য সূত্রকার ব্রহ্মপরিণামবাদ কেন স্বীকার করিয়াছেন, তাহারই অভিপ্রায় ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন। উপাসনা-কাণ্ডে পরিণামবাদের আবশ্যকতা আছে। সগুণব্রহ্মের উপাসনাতে পরিণামবাদই স্বীকৃত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বিবর্ত্তবাদী হইলেও উপাসনাকাণ্ড-বিবরণপ্রসঙ্গে পরিণামবাদই বলিয়াছেন। বেদের উপাসনাকাণ্ড বিবর্ত্তবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। এইজন্য ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য 'প্রপঞ্চসার' প্রভৃতি আগমগ্রন্থে পরিণামবাদই প্রদর্শন করিয়াছেন। আগমশাস্ত্র উপাসনাশাস্ত্র, উপনিষদ্‌সমূহেও সগুণব্রহ্মের উপাসনার কথা বহু বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। সগুণব্রহ্মের উপাসনার মীমাংসা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রকারও পরিণাম-প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে কর্ম্ম-কাণ্ড বিচারিত হয় নাই। উপাসনা ও জ্ঞানই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। এইজন্য ব্রহ্মসূত্রকার উপাসনা প্রতিপাদনের জন্য পরিণামবাদ ও জ্ঞানস্বরূপ প্রতিপাদনের জন্য বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিয়াছেন। আর এই কথাই 'সংক্ষেপশারীরকে' বলা হইয়াছে যে—"যাবত্র সংগ্রহপদং নয়তে মুনীন্দ্রঃ" (সংক্ষেপশারীরক—২।৫৭)। পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ এই দুইটিই সূত্রকার গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন উপাসনাতে বিশুদ্ধবুদ্ধি না হইলে কাহারও জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার জন্মিতে পারে না সেইরূপ পরিণামবাদে নিষ্ণাত না হইলে বিবর্ত্তবাদ-বোধের যোগ্যতা জন্মে না। এই হেতু যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চান, তাঁহাদেরও পরিণামবাদের রহস্য সর্ব্বাগ্রে জানা উচিত। 'সংক্ষেপশারীরক'-কার বলিয়াছেন—"ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ।" (২।১।৬১) এই গ্রন্থে আবার বলা হইয়াছে—

"বিবর্ত্তবাদস্য স হি পূর্ব্বভূমিঃ বেদান্তবাদে হি
পরিণামবাদঃ।
"উপায়মাতিষ্ঠতি পূর্ব্বমুচ্চৈরুপেয়মাপ্তুং
জনতা যথৈব
শ্রুতির্মুনীন্দ্রশ্চ বিবর্ত্তসিদ্ধ্যৈ বিকারবাদং
বদতস্তথৈব॥"
(২।১।৬২)

পরিণামবাদের স্বরূপ কি তাহা আমরা এখানে আলোচনা করিব না, কিন্তু ইহা সত্য যে পরিণামবাদ বুঝিতে না পারিলে বিবর্ত্তবাদ বুঝিতে পারা যায় না। পরিণামবাদে শাস্ত্রের অবান্তর তাৎপর্য্য ও বিবর্ত্তবাদে শাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য। উপাসনাকাণ্ডে পরিণামবাদ ও জ্ঞানকাণ্ডে বিবর্ত্তবাদ ব্যবস্থিত রহিয়াছে। উপাসনার ফল তারতম্য-ভাবে অবস্থিত ব্রহ্ম-লোকাদি এবং জ্ঞানের ফল তারতম্যবিবর্জ্জিত মোক্ষ। এই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উপাসনায় শাস্ত্রের অবান্তর তাৎপর্য্য এবং জ্ঞানে শাস্ত্রের চরম তাৎপর্য্য কেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এবং তাহাতে পরিণামবাদের ও বিবর্ত্ত-বাদের তাৎপর্য্য ও বুঝা যাইবে। এইজন্য ভগবদ্‌ভাস্কর প্রমুখ ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে কোন বিরোধ করেন নাই, প্রত্যুত অদ্বৈতবাদের সমর্থনই করিয়াছেন। ব্রহ্মপরিণতিবোধ ব্যতীত ব্রহ্মবিবর্ত্তবোধ হইতেই পারে না। অনেকে মনে করেন যে, ভাস্করাদি-প্রদর্শিত ব্রহ্মপরিণাম যদি ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদের অনুকূলই হইত তবে ভাস্কর প্রভৃতি আচার্য্য ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদের খণ্ডন করিলেন কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মন্দাধিকারি-রক্ষণের জন্যই

পরিণামবাদ রচিত হইয়াছে। যিনি যাহাতে অধিকারী তাঁহার তাহাতেই শ্রদ্ধাতিশয় উৎপাদনের জন্য অন্যপক্ষের নিন্দাচ্ছলে স্বসিদ্ধান্তের উপাদেয়তা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে, যেমন আমরা বেদে দেখিতে পাই কোন স্থলে কর্ম্মের প্রশংসার জন্য জ্ঞানের নিন্দা করা হইয়াছে। আবার কোন স্থলে জ্ঞানের প্রশংসার জন্য কর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অধিকারি-বৈলক্ষণ্য হেতুই করা হইয়াছে। কোন প্রকৃত বৈলক্ষণ্য নাই। 'সংক্ষেপশারীরক'-কার বলিয়াছেন—

"কৃপণধীঃ পরিণামুদীক্ষতে
ক্ষপিতকল্মষধীস্তু বিবর্ত্ততাম্।
স্থিরমতিঃ পুরুষঃ পুনরীক্ষতে
ব্যপগতদ্বিতয়ং পরমং পদম্ ॥"

ইহার অর্থ এই যে অনাত্মপ্রপঞ্চে যাঁহারা অবিরক্তবুদ্ধি তাঁহারা সমস্ত প্রপঞ্চকেই পরমার্থ-সত্য বলিয়া মনে করেন। এতাদৃশ অধিকারী নিজেকে কর্ত্তা, ভোক্তা মনে করেন ও যে ব্রহ্মের পরিণাম এই পরমার্থসত্য প্রপঞ্চ তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করিয়া তাহারই প্রসাদে শ্রেয় লাভ হইবে এরূপ মনে করেন। আর যাঁহারা ক্ষপিতকল্মষবুদ্ধি, নিষ্কামবুদ্ধি, তাঁহারা পরিদৃশ্যমান সংসারে বিরক্তবুদ্ধি হওয়ায় সংসারকে ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিয়া দেখেন। আর যাঁহারা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা পরিপক্ব, নিশ্চলবুদ্ধি তাঁহারা ব্রহ্মপরিণামও দর্শন করেন না, ব্রহ্মবিবর্ত্তও দর্শন করেন না, কিন্তু শুদ্ধ পরমপদ ব্রহ্মমাত্র দর্শন করেন। সুতরাং ব্রহ্মপরিণামবাদ ব্রহ্মবিবর্ত্ত-বাদের বিরোধী নহে। প্রত্যুত অধিকারি-বিশেষের অনুগ্রহের জন্য ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"যোনিশ্চ হি গীয়তে"—(১।৪।২৭) ব্রহ্ম-সূত্রের 'ভামতী' ও 'কল্পতরু' গ্রন্থে ভগবদ্‌ভাস্করীয় পরিণামবাদ প্রদর্শন করিয়া তাহার নিরাকরণ করা হইয়াছে। 'আত্মকৃতে পরিণামাৎ'—(১।৪।২৬) এই সূত্রে সূত্রকার স্পষ্টভাবেই ব্রহ্মপরিণামের কথা বলিয়াছেন। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, ব্রহ্মই জগতের যোনি ইত্যাদি সূত্র-নির্দ্দেশানুসারে ব্রহ্মপরিণামবাদই সূত্রকারসম্মত এই কথা ভাস্কর বলিয়াছেন। ভাস্কর আরও বলিয়াছেন যে ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যকার ব্রহ্মনন্দী ব্রহ্মের পরিণামই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মনন্দী শঙ্করাচার্য্য হইতেও প্রাচীন। সুতরাং ব্রহ্মপরিণামবাদ প্রাচীন আচার্য্যসম্মত বুঝিতে পারা যায়। ভাস্করের এই উক্তির উত্তর এই সূত্রের 'ভামতী'-গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মনন্দী যে ব্রহ্মের পরিণামের কথা বলিয়াছেন তাহাও আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মনন্দীও ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদের কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মনন্দী বলিয়াছেন, ব্রহ্মসৃষ্ট এই প্রপঞ্চ অসৎ হইতে পারে না, কারণ অসৎ শশবিষাণাদি নিষ্পাদ্য অর্থাৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং প্রপঞ্চ অসৎ নহে। এইরূপ প্রপঞ্চ সৎও নহে। যদি প্রপঞ্চ সৎই হইত তাহার জন্য ব্রহ্মের প্রবৃত্তির কোন অপেক্ষাই হইত না। সিদ্ধবস্তুকেই সদ্‌বস্তু বলে। প্রপঞ্চ যদি সদ্‌বস্তুই হইত তবে তাহার জন্য ব্রহ্মের প্রবৃত্তির অপেক্ষা কি ছিল? এইজন্য প্রপঞ্চ অসৎ নহে, সৎও নহে। তবে প্রপঞ্চের স্বরূপ কি হইবে? এই শঙ্কার উত্তরে ব্রহ্মনন্দী বলিয়াছেন—প্রপঞ্চ 'সৎ'-ব্যবহারমাত্র অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় সদসদ্‌বিলক্ষণ। এস্থলে বিবেচনার বিষয় এই যে ভগবদ্‌ভাস্কর ব্রহ্মনন্দীর উক্তির একাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—'পরিণামস্তু স্যাৎ'। কিন্তু ইহার পরেই ব্রহ্মনন্দী প্রপঞ্চকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাস্কর যে ইহা দেখেন নাই তাহা নহে, তথাপি তিনি

ঐ অংশের উদ্ধরণ করেন নাই। ইহার উদ্দেশ্য মন্দাধিকারীর প্রতি অনুগ্রহ।

অধিকারি-জনের অধিকারানুসারেই তাহাকে ব্যুৎপাদিত করা উচিত। কিন্তু অধিকারি-জনের চিত্তবিভ্রম উৎপাদন করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্'। ভগবান কপিল সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির পরিণামই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এই কথা বলিয়াছেন। জড়বস্তু পরিণামশীল ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। জড়বস্তুর পরিণাম অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণের মতে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া জড়বস্তু। বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহারই পরিণাম। মায়াকে অপেক্ষা করিয়া যে বিশ্ব পরিণামরূপ, মায়াধিষ্ঠান ব্রহ্মকে অপেক্ষা করিয়া সেই বিশ্বই বিবর্ত্তরূপ। দৃশ্যমান প্রপঞ্চকে যে বিবর্ত্ত বলা হইয়াছে তাহা ব্রহ্মকে অপেক্ষা করিয়াই বলা হইয়াছে। বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়ার বিবর্ত্ত নহে। যাহা হউক আমরা আরম্ভবাদ, পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদের সংক্ষেপে স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। এই বাদত্রয়ে কোন স্থলে কাহার অবস্থান তাহাই মাত্র দেখাইলাম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমস্ত দার্শনিকই বৈদিক সিদ্ধান্তের বিবরণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইজন্য আপাতদৃষ্টিতে দার্শনিকগণের মতবিরোধ লক্ষিত হইলেও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিলে ইহাদের মতের যে কোন বিরোধ নাই তাহা বুঝা যাইবে।

লীলা

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য

তুমি ব্রহ্ম নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত মহান্
আনন্দসমুদ্র মাঝে সদা অধিষ্ঠান।
তবে কেন লীলা তব ওগো লীলাময়,
ভাবিতে হৃদয়ে জাগে রোমাঞ্চ বিস্ময় ?
নানারূপে নানাভাবে হইয়া প্রকাশ
কে তুমি, তাহারি বুঝি দিতেছ আভাস।
আনন্দের সুমধুর রস বিতরণে
অমৃতের অধিকারী করো জনে জনে।

যে অমৃতপানে তুমি চিদানন্দময়
পূর্ণানন্দে উচ্ছ্বসিত তোমার হৃদয়,
সে রস-বৈভব তুমি বিলাইয়া দিয়া
সৃষ্টিরে টানিয়া লও আপন করিয়া।
বিন্দুর যে সার্থকতা সিন্ধুর সঙ্গমে,
সিন্ধুও বিন্দু চায় কায়-মন-প্রাণে।

আমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান *

স্বামী বোধানন্দ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রিপণ কলেজে পড়িবার সময় খগেন সুধীর কালীকৃষ্ণ সুশীল বিজয় ফণী শশী কুঞ্জ খেলাত উপেন শরৎ দেবেন প্রিয়নাথ প্রভৃতি ১৪।১৫ জন মিলিয়া আমরা একটি ছোট খাট দল বাঁধিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় রত হই। খগেন ও কালীকৃষ্ণদের বাড়ীতেই আমাদের বেশী বৈঠক হইত। ঐ সময় আমরা প্রায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, বার ও তিথিবিশেষে উপবাস, নিরামিষ ভক্ষণ ইত্যাদি আচার নিয়মিতভাবে রক্ষা করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া গীতা ভাগবত উপনিষদাদি গ্রন্থপাঠ, সুবিধামত সাধুদর্শন, সঙ্কীর্ত্তনাদিতে যোগদানও আমাদের ধর্ম্মচর্চ্চার অঙ্গ ছিল। একদিন সকলের সখ হইল—ভিক্ষাদ্বারা চাউলাদি সংগ্রহ করিয়া উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে সাধুভোজন করান হইবে। পরদিন বৈকালে সকলেই ভিক্ষায় বাহির হইলাম। সর্ব্বসমেত ১০।১২ সের চাউল, সামান্য আলু ও ফল পাওয়া গিয়াছিল। কালীকৃষ্ণদের কোচম্যানের নিকট চাউল বিক্রয় করা হয়। উহাতে আন্দাজ এক টাকা হইয়াছিল। উহার দুই তিন দিন পরে আমরা তিন চারিজন মিলিয়া ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুড় বাগানের বাড়ীতে তাঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিতে যাই। তখন বেলা আন্দাজ ৩টা হইবে। তিনি দোতলার লাইব্রেরীতে ছিলেন। আমরা সেখানে যাইয়া যথাযোগ্য প্রণামান্তে মেঝের উপর বসিলাম। তিনি দেখা করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমাদের এক জন বলিল, "সাধুভোজন করাইবার ইচ্ছায় কিছু অর্থভিক্ষার জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি।" ঐকথা শুনিয়া তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "যখন অর্থ-উপার্জ্জনক্ষম হইবে তখন স্বোপার্জ্জিত অর্থে সাধুভোজন করাইও। আমি উহার জন্য এক পয়সাও দিব না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন আমরা ধর্ম্মের ধুয়ায় পড়াশুনা অবহেলা করিতেছি। তাঁহার কথায় কিন্তু আমাদের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এক দিন ছোট গোলদীঘির (পার্ক) ধারে বেড়াইবার সময় এক ব্যক্তি কাঁকুড়গাছিতে ৺রামচন্দ্র দত্তের বাগানে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব-উৎসবের একখানি ছাপা

* এই প্রবন্ধটি আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য বেলুড় মঠের খ্যাতনামা সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী বোধানন্দ মহারাজের আত্মজীবনী। তিনি ১৮৯৭ সনে আলমবাজার মঠে যোগদান করেন এবং ১৯০৬ সনে বেদান্ত-প্রচারের জন্য আমেরিকায় প্রেরিত হন। ১৯১২ সনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের স্থলে স্বামী বোধানন্দ মহারাজ নিউইয়র্ক বেদান্তপ্রচার-কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করিয়া কৃতিত্বসহকারে আজীবন উহার কার্য পরিচালন করেন। ১৯২৩ সনে তিনি একবার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ৭১ বৎসর বয়সে নিউইয়র্ক-স্থিত রুজভেল্ট হাসপাতালে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। —উঃ সঃ

বিজ্ঞাপন হাতে দিয়া গেল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীররক্ষার পর কাঁকুড়গাছির ৺রামচন্দ্র দত্তের বাগানে তাঁহার পূত অস্থির সমাধি হয়। তাহার উপর মার্ব্বল প্রস্তরের একটি বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত বেদির উপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সমাধিস্থ পট রক্ষিত হইত। ঐ বেদির বা সমাধিভূমির উপর একটি সংকীর্ণ চতুষ্কোণ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐটি ঠাকুরঘর নামে অভিহিত হইত। অস্থিসমাধির দিন হইতে প্রত্যহ ঐ বেদি ও তদুপরিস্থ পটখানির নিয়মিত পূজাদি হইতেছে। ঐ ঠাকুরঘরটিই সাধারণ্যে কাঁকুড়গাছির সমাধিমন্দির বলিয়া পরিচিত। প্রতি বৎসর মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন কাঁকুড়-গাছিতে তিরোভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞাপনখানি পড়িয়া কাঁকুড়গাছি যাইবার খুব ইচ্ছা হইল। বোধ হয় সেই দিনই বা তার পর দিন কাহাকেও না বলিয়া একা কাঁকুড়গাছি গেলাম। রংপুর তাজহাটের রাজা ৺গোবিন্দলাল রায়ের কাঁকুড়গাছির বাগানে উহার পূর্ব্বে অনেক বার গিয়াছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া বাগানের সরকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ৺রামচন্দ্র দত্তের বাগানে যাইবার পথটি দেখাইয়া দিলেন। ৮।১০ মিনিটের মধ্যে তথায় পৌঁছিলাম। বাগানের ফটকটি খোলা ছিল। প্রবেশ করিয়াই একটি ছোট পুষ্করিণী দেখিলাম। উহার পূর্ব্বভাগে একটি বৃহৎ হোগ্‌লা বা তালপাতার চালা ও তাহার নীচে সেই পরি-মাণের একটি পাকা চাতাল দেখিয়া সেই দিকেই গেলাম। দূর হইতে দেখিলাম চার পাঁচ জন ভদ্রলোক উহার নিকটস্থ ঠাকুরঘরের সম্মুখের রোয়াকে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে-ছেন। ঠাকুরঘরে প্রণামান্তে উঁহাদের কাছে যাওয়া মাত্র উঁহারা সকলেই খুব সৌজন্যের সহিত আমাকে বসিতে বলিলেন। তখন আগষ্টমাস। সম্ভবতঃ সেদিন রবিবার ছিল। বেলা ৫টা বা ৫½টা হইবে। যাঁহাদিগকে দেখিলাম তাঁহাদের তিন জনের কথা বেশ মনে আছে—রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র ও তারানাথ দত্ত। রাম বাবুই আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। কোথায় থাকি, কি করি, কি করিয়া ওখানে আসিলাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসান্তে উত্তর পাইবার পর আমাকে আবার প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে আপনার কি মনে হয়?" রাম বাবু আমাকে আপনি বলিয়া সম্ভাষণ করায় আমি একটু জড়সড় হইলাম এবং আমাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন না করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "পরমহংসদেব একজন সিদ্ধ পুরুষ।" রাম বাবু ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তিনি শুধু সিদ্ধপুরুষ নহেন, তিনি অবতার।" পরমহংসদেবের অবতারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার নিজের জীবনের দুই একটি ঘটনার কথা বলিলেন। পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্ব্বে যখন রাম বাবু ধর্ম্মপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া নানা স্থানে যাইতেছিলেন, সেই সময় এক দিন নিভৃতে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় এক ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া তাহাকে "ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সয়ে থাক"—এই রূপ বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার পর তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে মহাপুরুষ ঐ বাণীতে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া-ছিলেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেব। পরমহংসদেব তাঁহাকে স্বপ্নে মন্ত্র দিয়াছিলেন এবং ঐ মন্ত্র এক দিন ভাবাবেশে ফিরাইয়া লইয়া তাঁহাকেই "বকলমা" দিতে বলেন। তদবধি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবই * রাম বাবুর "দেবদেব" হইয়াছিলেন।

তাঁহার দর্শন, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার পূজা, তাঁহার নামকীর্ত্তন, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদিতেই রাম বাবুর জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

রাম বাবু আরও বলিলেন—সিদ্ধ পুরুষ একটি মাত্র সাধনমার্গ অনুসরণ করিয়া সেইটিতেই সমগ্রজীবন অতিবাহিত করেন এবং শেষদশায় সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু পরমহংসদেব জগতের প্রধানধর্ম্মগুলির সাধনপদ্ধতি—বিশেষতঃ হিন্দু-ধর্ম্মের বিভিন্ন মতানুযায়ী সমস্ত সাধন—নিয়মিত দীক্ষার সহিত অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং সকলের ভিতর একই সত্য উপলব্ধি করেন। তিনি বলিতেন "মত পথ"। অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মমতই এক সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও এক সত্যই উহাদের লক্ষ্য। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এযুগে ধর্ম্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ গুরু তিনিই। সুতরাং তিনিই যুগাবতার।

সেদিন মাত্র একঘণ্টা কাল রাম বাবুর সঙ্গে কথা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্ব প্রমাণের উপসংহারে রাম বাবু বিশেষ জোর দিয়া বলিলেন, সিদ্ধ পুরুষ কখন "বকল্‌মা" লইতে পারেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতার না হইলে উহা করিতেন না। তিনি সত্যস্বরূপ ছিলেন। অন্যায় বা অসত্য তাঁহাতে সম্ভব হইত না। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরও দুই একটি অলৌকিক ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে পাঠক নিশ্চয় উহা পড়িয়াছেন বলিয়া উহার পুনরাবৃত্তি এখানে করিলাম না। ঐ সময় রাম বাবু নিজেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে উহার কয়েকখানি আমাদিগকে উপহারস্বরূপ দিয়াছিলেন। আমরা উহা মহা আগ্রহে পড়িয়াছিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আরাত্রিকাদির পর রাম বাবু কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল ১০ নং মধু রায়ের লেন, সিমুলিয়ায়। আমাকে তাঁহার গাড়ীতে আসিতে বলিলেন। ঠনঠনিয়াতে আমি নামিয়া গেলাম। ইহার ৫।৬ দিন পরেই তিরোভাব-উৎসব। উহার পূর্ব্ব সপ্তাহে প্রত্যহ বিশেষ পূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা হইত। রাম বাবু আমাকে উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমার বন্ধুদিগকেও উক্ত উৎসবে আনিতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি যারপরনাই আন্তরিকতার সহিত সকলকে আনিতে বলিলেন। আমি রাম বাবুর সৌজন্য ও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াই বন্ধুগণকে ঐ বিষয় জানাইলাম।

কাঁকুড়গাছি যাইবার মতলবের কথা পূর্ব্বে তাহাদিগকে বলি নাই। তাহারা খগেনদের বাড়ীতে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এবং সুখবরটি কথায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই যেন তাহারা অনুভব করিয়াছিল। পৌঁছিয়াই কাঁকুড়গাছির ঠাকুরবাড়ী দর্শন ও রাম বাবু প্রভৃতির সহিত আলাপনের কথা তাহাদিগকে বলিলাম। উহা শুনিয়া সকলেই এত আনন্দিত হইল যে, সারারাত্রি ঐ কথাতেই কাটিয়া গেল। মাঝে মাঝে রাস্তায় বাহির হইয়া বেড়ানোও হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বদা ঐ কথারই প্রসঙ্গ চলিয়াছিল।

তার পর দিন চাঁদা তুলিয়া কিছু অর্থ পাওয়া গেল। উহাতে ও চাউল-বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রায় ৮।১০ টাকা হইয়াছিল। উহাদ্বারা কয়েকটি ভাল আম ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া সকলে মিলিয়া সন্ধ্যার সময় কাঁকুড়গাছির বাগানে গেলাম। এবার রাম বাবু প্রভৃতি ৮।১০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও পূর্ব্ববৎ

পরমহংসদেবের কথাই কহিতে লাগিলেন। আরতির পর সংকীর্ত্তন হইল। বলরাম সিংহ নামক জনৈক ভক্তের ভাবাবেশ হইয়াছিল; উহাই আমাদের প্রথম ভাবাবেশ-দর্শন।

অনেক কথাবার্ত্তার পর প্রসাদাদি পাইয়া আমরা রাম বাবু প্রভৃতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিলাম। রাম বাবু উৎসবের দিন আসিবার জন্য আবার আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিলেন। উৎসবের ৩।৪ চার দিন পূর্ব্বে রাম বাবুর হাঁপানি অসুখটির অনুবৃত্তি হওয়ায় কয়েক দিন তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে হয়। সুতরাং তিনি উৎসবের দিন নগরকীর্ত্তনে যোগদান করিতে পারেন নাই। উক্ত সংকীর্ত্তনে তিনিই প্রধান নেতা হইতেন। উৎসবের প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে প্রত্যহ ঐ সংকীর্ত্তনের আখ্ড়াই হইত। তখনকার প্রসিদ্ধ খুলি গোষ্ঠ বাবাজী খোল বাজাইতেন। আমাদের ভিতর কেহই ভাল গান গাহিতে পারিত না। যাহারা একটু আধটু পারিত তাহারা একদিনও আখ্ড়াইয়ে যোগ দিয়া গাহিতে অভ্যাস করে না। উক্ত নগরকীর্ত্তন রাম বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কলেজ ষ্ট্রীট্, সার্কুলার রোড্, মানিকতলা রোড প্রভৃতি হইয়া কাঁকুড়গাছির বাগানে যাইত। সর্ব্বসমেত প্রায় ৪।৫ মাইল পথ হইবে এবং নগরসংকীর্ত্তনটিতে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগিত। আমরা সংকীর্ত্তনে অনভ্যস্ত হইলেও সকলের দেখাদেখি উহাতে যোগদান করিয়া 'বেতালা, বেসুরো' গাহিয়া সংকীর্ত্তনটি একরূপ মাটি করিয়া দিয়াছিলাম। তজ্জন্য ভাল গায়কেরা আমাদিগকে ভর্ৎসনাও করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বাগানে পৌছিবার পর বহু লোকের সমাগম হইল। ঠাকুরঘরের সম্মুখে চাতালের উপর কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। ঐ সময় পূর্ব্ববঙ্গের নবরসিক সম্প্রদায়ের ভক্ত নৃত্যগোপালের ভাবাশ্রিত নৃত্য দেখা গেল। উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চাতালের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত পদবিক্ষেপে নাচিতে লাগিলেন, অনেককে আলিঙ্গনও করিলেন। আমাদের মধ্যেও দুই তিন জন তাঁহার আলিঙ্গন লাভ করিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে লীলাকালে দেখিয়াছিলেন।

সংকীর্ত্তনে আরও অনেকের ভাবাবেশ হইয়া-ছিল। উহা শেষ হইবার পর ভোগ ও আরতি হইল। সমবেত প্রায় সহস্রাধিক লোক প্রসাদ পাইলেন। ভুনি খিচুড়ি, আলুর দম, বেগুন ও পাপর ভাজা, মালপো, দই, জিলিপি ইত্যাদি প্রসাদ পাওয়া গেল। জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের আসনে উপবিষ্ট সমাধিস্থ লিথোগ্রাফ্ ছবি বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়া-ছিলেন। আমরা উহার এক এক খানি পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। ঐ দিনের মত আনন্দ জীবনে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই। ঐ আনন্দ-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দল বাঁধিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিলাম।

"অনুভূতিই ধর্ম্মের প্রাণ। ব্যাকুলতাই ঈশ্বর লাভের উপায়। আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই ধর্ম্মপ্রাণতা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীকৃষ্ণ

স্বামী পবিত্রানন্দ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনী, শিক্ষা ও উপদেশের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিলে চারি পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকখানি বাদ পড়িয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহাকে উপাসনা করিয়া, কত শত সাধক সিদ্ধ হইয়াছেন, কত শত মানব মহামানব হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দক্ষিণদেশে রামানুজাচার্য, ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে মধ্বাচার্য, ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন ও তাঁহার নাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে স্তব রচনা করিয়া গিয়াছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

—শ্রীকৃষ্ণের দর্শনহারা হইলে এক মুহূর্ত্তও এক যুগ বলিয়া মনে হয়, চক্ষুর জল বর্ষার বারিধারার মতন বর্ষিত হয়, সমস্ত জগৎ শূন্যময় মনে হয়। ইহা শুধু কবিত্ব হিসাবেই তিনি লিখিয়া যান নাই, তাঁহার নিজের জীবনে প্রতিক্ষণে ইহা দৃষ্ট হইত। জীবনের সর্বক্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। নীলাকাশ দর্শন করিয়া তিনি শ্যামের চিন্তায় বিহ্বল হইতেন, নীলসমুদ্রের সম্মুখে গেলে শ্যামরূপ মনে করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিতে যাইতেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মীরাবাই কাতরকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন—

দর্শন দে দর্শন দে, হৌ তৌ
তেরী মুকতি ন মাঁগোঁ,
সিধি ন মাঁগোঁ, রিধি ন মাঁগো,
তুম্‌হহীঁ মাঁগোঁ গোবিন্দা;
ঘর নহিঁ মাঁগোঁ, বন নহি মাঁগোঁ
তুম্‌হহীঁ মাঁগোঁ দেব্‌জী॥

—হে প্রভো, আমাকে দর্শন দাও, আমাকে দর্শন দাও। আমি স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করি না, আমি পরমার্থ যাচ্ঞা করি না, আমি একমাত্র গোবিন্দের দর্শন কামনা করি। আমি ঘরেও বাস করিতে চাই না, আমি বনেও যাইতে চাই না। হে দেব, একমাত্র তোমাকে দর্শনের অভিলাষ করি।

সাধন-অবস্থায় মীরা করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেন—

মেরে জনম মরণকে সাথী।
তুহুঁ নহিঁ বিসরু দিন রাতী॥
তুম্ দেখ বিনু কল ন পরত হায়,
জানত মেরী ছাতি,
উচী চড় চড় পন্থ নিহারু,
রোয় রোয় আখিয়া রাতী॥

—হে প্রভো, তুমি আমার জনমমরণের সাথী, তোমাকে দিবারাত্র কোন সময়েই

বিস্মৃত হইতে পারি না। তোমার দর্শন না পাওয়ায় আমার সময় আর কাটে না। আমার যে কি অবস্থা, তাহা একমাত্র আমার প্রাণই জানে। উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া তোমার জন্য পথ চাহিয়া থাকি, তোমার বিরহে রোদন করিতে করিতে আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষে কত উপাসক-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, কত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জন্মাষ্টমীর সময় হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ভক্ত ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান-ধারণা, স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।

—সমস্ত জগৎ আমাতে সূত্রে মালার মতন গ্রথিত আছে। ইহার সত্যতা একমাত্র উচ্চ সাধকই উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব যে বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তাহা যে কোন লোকের প্রত্যক্ষ করিতে অসুবিধা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকে আমরা অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকি। হিন্দুধর্মে অনেক অবতারের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু ভাগবতকার বলেন, অন্যান্য অবতার অংশমাত্র, কলামাত্র, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—

এতে চাংশঃ কলা পুংসঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

মানবের দুঃখে বিচলিত হইয়া পরম করুণাময় ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন ও মানবের ত্রিতাপজ্বালা মোচন করেন, ইহা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক অবতার এক একটি মাত্র উচ্চভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বহুবিধ ভাবের সমষ্টি। তিনি একাধারে ছিলেন বৃন্দাবনলীলার প্রেমময় পুরুষ, দুষ্ট কংসের বিনাশকারী, দ্বারকার অধীশ্বর, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের সারথি এবং গীতার অমৃতবাণীর ঘোষণকর্ত্তা—যে গীতা এখনও শত সহস্র সাধক ও ভক্তের হৃদয়ে নিশিদিন প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।

ভক্তের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার-পুরুষ, কিন্তু যুক্তিবাদীর নিকট তিনি এক বিষম প্রহেলিকা; আবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঐতিহাসিকের নিকট তিনি কতকগুলি কিংবদন্তী-মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। অনেক পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-বিবরণী পাওয়া যায়, কিন্তু সেই বিবরণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই, ঘটনার মিল নাই। তাহাতে অনেকের মনে সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব উত্থিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আদৌ কেহ ছিলেন কি না। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নিকট স্বামী বিবেকানন্দ—তখন নরেন্দ্র-নাথ—এই প্রশ্ন উল্লেখ করিলে তিনি জবাব দিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহ না থাকিলেও যিনি শ্রীকৃষ্ণজীবনীর কল্পনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কবিকল্পনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের স্থান অধিকার করিবার যোগ্যপাত্র। কারণ শ্রীকৃষ্ণের মতন অতিমানব না হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের কল্পনাই করিতে পারগ হইতেন না।"

শ্রীকৃষ্ণকে শত সহস্র ভক্ত অবতারজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনাও হইয়াছে যথেষ্ট। তবে সেই সমালোচনা অনেক সময়েই হইয়াছে বিদ্বেষ অথবা অজ্ঞান হইতে। ভিন্নধর্মাবলম্বী অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ছোট প্রতিপাদন করিয়া হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য। হিন্দু-

ধর্মকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করিবার জন্য যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা এত উৎকট হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্র-সম্বন্ধে স্থিরচিত্তে চিন্তা করিবারও তাঁহাদের অবসর হয় নাই। যে সমস্ত ভারত-বাসী শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ঔদাসীন্য ও অবহেলার ভাব প্রকাশ করেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কীয় অধিকাংশ সমালোচনাই হইয়াছে তাঁহার বৃন্দাবন-লীলা লইয়া—গোপীপ্রেম-বিষয়ে। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার অল্পবয়সে বৃন্দাবনলীলার কোন কোন দিক সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতেন। কিন্তু পরে তিনি বলিতেন, বৃন্দাবনলীলাতে ভক্তিমার্গের চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে —অহেতুকী ভক্তির কি উচ্চতম অবস্থা হইতে পারে, বৃন্দাবনলীলায় তাহা পরিদৃষ্ট হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, "যিনি সম্পূর্ণ শুদ্ধ পবিত্র হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই বৃন্দাবনলীলা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, অন্যের পক্ষে তাহা করা সম্ভবপর নয়। নিজেরা তত উন্নত নয় বলিয়াই অর্বাচীন লোকগণ বৃন্দাবনলীলার মধ্যে দোষ আবিষ্কার করিয়া থাকে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে স্বয়ং শুকদেব—যিনি জন্ম হইতেই ব্রহ্মজ্ঞ, শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, তিনি—ভাগবত-গ্রন্থে এই সব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা বৃন্দাবনলীলাভিরামে পূতিগন্ধ আবিষ্কার করে, তাহারা প্রথমে ঐ সব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করুক, পরে সমালোচনা করিতে অগ্রসর হউক।"

তবে এই কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, অনধিকারীর হস্তে অযোগ্য ব্যক্তির স্বীয় দোষ ও দুর্বলতার জন্য বৃন্দাবনলীলার বিবরণ ও ব্যাখ্যা অনেকস্থলে বিকৃত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থও রচিত হইয়াছে যাহা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর নয়। যাহারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী নয়, তাহারা ইহার চর্চা না করিলেই সকল দিক দিয়া মঙ্গল। শুধু গোপীপ্রেম নয়, নিম্নাধিকারী লোক উচ্চাঙ্গ ভক্তিমার্গের অনুশীলন করিতে গিয়া অতিশয় ভাবপ্রবণ হইয়াছে, অতিমাত্রায় কোমলতার প্রশ্রয় দিয়াছে—যাহার ফল সব সময়ে শুভ হয় নাই। ভক্তকে, সাধককে কুসুমের মত কোমল হইতে হইবে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে বজ্রের মত কঠোরও হইতে হইবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার, অবিচারের প্রতিবাদ করিবার শক্তি তাহার থাকা চাই। নতুবা জীবনসংগ্রামে কেহই টিকিয়া থাকিতে পারে না। ভক্তির নামে যেখানে দৃষ্ট হয় কেবল ভাবপ্রবণতা, বাষ্পনিভ কোমলতা, সেখানে জাতীয় জীবনে বা সামাজিক জীবনে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ভক্তিভাব খারাপ নয়—নিম্নাধিকারীদিগের পক্ষে উচ্চতম, গভীরতম ভক্তিভাবের ভান করাটা খারাপ।

বৃন্দাবনলীলা বুঝিবার যাহাদের যোগ্যতা বা ক্ষমতা নাই, তাহারা ঐ সবের চেষ্টা বা অনুশীলন হইতে বিরত হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আরও অনেক দিক আছে, যাহার জন্য তাঁহার নিকট সকলকে মস্তক অবনত করিতে হইবে, নত-জানু হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণজীবনের সেই দিকটা হইয়াছে—কুরুক্ষেত্রে গীতার বাণীপ্রচারকারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সব দিক সকলের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু গীতার অমোঘ বাণী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহা সকল সময়ে সকলের নিকট প্রযোজ্য। শুষ্কহৃদয় যুক্তিবাদী,

ধর্মে আস্থাহীন নাস্তিক, ভাবপ্রবল ভক্ত, বৈরাগ্যবান সাধকশ্রেষ্ঠ—সকলেই গীতার বাণী হইতে জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করিতে পারিবে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখি আশ্চর্য বক্তা—শিষ্য, সখা অর্জুনকে দেখি কুশলোঽস্য লব্ধা। গীতাতে দুর্লভ শিষ্যকে ততোধিক দুর্লভ গুরু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার জন্যই গীতার এত মাহাত্ম্য, গীতার উপদেশ এত মূল্যবান।

গীতার সূত্রপাত তখনই হয়, যখন অর্জুন যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া কাপুরুষের মত ভীরুতা প্রদর্শন করিতে থাকেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল সেনাবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন বলিতে থাকেন, বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে —আমার শরীর কম্পমান হইতেছে, আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে, আমার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভবপর হইবে না। অর্জুনের এই অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা মৃদুহাস্য করিতে পারি, কিন্তু আমরাও কি কর্তব্যের আহ্বান আসিলে অনেক সময় এরূপ ভাবে কম্পিতদেহ, রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া মুখে বড় বড় বুলি আওড়াইয়া থাকি না? এইরূপ দৃশ্য ত অনবরতই জগতে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সকল লোকের পক্ষেই প্রযোজ্য। অর্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ
নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বাল্যং
ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

—হে অর্জুন, এই কাপুরুষতা পরিত্যাগ কর, ইহা তোমার পক্ষে অশোভনীয়, এই লজ্জাকর দুর্বলতা পরিত্যাগ পূর্বক দণ্ডায়মান হও।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, পূর্বোক্ত এই শ্লোকটিতেই গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ নিহিত—"কাপুরুষত্ব পরিত্যাগ কর, হাস্যাস্পদ দুর্ব্বলতা বিসর্জ্জন দাও—জীবনে কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইতে ভীত হইও না।"

শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়
যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

—কর্তব্যসাধনে যদি তোমার মৃত্যুও হয়, তবে তুমি হইবে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী, আর কর্তব্যকর্মে যদি সফলতা লাভ কর, তবে পাইবে বিমল আনন্দ। সুতরাং কর্তব্য পালন করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া দণ্ডায়মান হও।

গীতাতে এইরূপ আরও অনেক উপদেশ আছে, যাহা হইতে সাধারণ লোক কর্তব্যকর্ম করিবার জন্য অশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিবে। আর এক স্থলে গীতা বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং
নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু-
রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

—নিজকে নিজে উদ্ধার কর, নিজকে কখনও অবসাদগ্রস্ত হইতে দিও না। তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—আবার তুমিই তোমার সাংঘাতিক শত্রু।

এইরূপে ভর্ৎসনার কশাঘাত দ্বারা, উৎসাহ ও সহানুভূতির বাণী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্তব্য-কর্মে নিয়োজিত করেন।

বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় রহস্যময় প্রহেলিকার জাল বিস্তার করিয়া তিনি লুকোচুরি খেলিয়াছেন; কিন্তু সহস্র সূর্য উত্থিত হইলে ধরিত্রী যেরূপ আলোকিত হয়, কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সেইরূপ আলোকের সম্মুখে নিঃসন্দেহ ভাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন যুগে যুগে পরম ভগবান আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি।" কিন্তু—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

—মূঢ়ব্যক্তি আমাকে বুঝিতে না পারিয়া, দেহরূপী নারায়ণ আমাকে না জানিয়া, অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের সত্যিকার রূপ প্রথম জানিতে পারেন নাই। প্রিয় ভক্ত অর্জুনের প্রতি অশেষ কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন, তখন অর্জুন কাতর স্বরে বলিতে থাকেন, "হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে সখা মনে করিয়া, বন্ধু ভাবনা করিয়া, খাইতে শুইতে বসিতে তোমার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি, তোমাকে যে অবহেলা করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্তং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

—তোমাকে পুরোভাগে প্রণাম করি, তোমাকে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে প্রণাম জানাইতেছি, তোমার অসীম শক্তি, তুমি অনন্তবীর্য, তুমি সর্বব্যাপী, সুতরাং তুমিই সমস্ত যাহা কিছু।

নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী অথবা মনের গঠন অনুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে গীতার উপদেশের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে গীতার প্রধান বাণী—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

—যাহা হইতে সমস্ত ভূতের উদ্ভব হইয়াছে, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, নিজ নিজ কর্ম দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করিয়া মানুষ সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

যাহার যাহা কর্তব্য তাহাকে তাহা করিতেই হইবে—পরধর্মের অনুসরণ ভয়াবহ—নিজের ধর্ম অনুশীলন করিলেই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করা যায়। কর্তব্য কর্ম করিবার এই যে উপদেশ, বর্তমান যুগে ইহাই গীতার প্রকৃষ্ট ও প্রধান বাণী।

বর্তমান সময়ে আমরা ইহা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আসিয়াছে ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ফলতা, জাতীয় জীবনে অবসাদ এবং চারি দিকে আমরা দেখিতে পাই বিষাদের ছায়া। তাই স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এখন কিছু দিন মোহনমুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা বন্ধ থাকুক, এখন পার্থসারথির পূজা কর—যিনি পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, অর্জুনকে জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হইতে অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন, যিনি গীতার বাণী বজ্রকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

(১)

১৮৯৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরে আহূত বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের গৌরবময় আসন-প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব সাফল্যের সংবাদ ভারতে পৌঁছিলে সর্বত্র বিপুল উল্লাসের সাড়া পড়িয়া গেল। স্বামীজির গুরুভ্রাতৃগণের এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে যে কি অপরিসীম গর্ব ও আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল উহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতাবাসিগণ আনন্দ-প্রকাশের জন্য ১৮৯৪ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া আমেরিকায় স্বামীজির নিকট তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞ অভিনন্দন ও ধন্যবাদ প্রেরণ করেন। পাশ্চাত্যবিজয়ের পর স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিংহল ও দক্ষিণ-ভারতের কয়েক স্থানে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন ও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে স্বামীজি তাঁহার প্রিয় জন্মস্থান কলিকাতায় উপনীত হন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৮৯৭ খৃঃ) শোভাবাজার রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কলিকাতাবাসিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অপূর্ব বাগ্মিতা, হিন্দুধর্মের রহস্যোদ্ঘাটনে ও ব্যাখ্যানে অনুপম নৈপুণ্য, গভীর পাণ্ডিত্য এবং ত্যাগোজ্জ্বল আধ্যাত্মিক জীবনের পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার অধিবাসিগণও তাঁহাকে তথায় তাঁহাদিগের মধ্যে পাইবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিলেন। নানাস্থানে ধর্মপ্রচারাদি কার্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় এবং শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন স্বামীজি ১৯০১ খৃঃ মার্চের পূর্বে ঢাকা-বাসিগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। ইতোমধ্যে তিনি ঢাকার ভক্তগণের আকুল আগ্রহ দেখিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা-প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন সময়ে তাঁহার কয়েক জন শিষ্য এবং অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দকে তথায় প্রেরণ করেন।

বাংলা ১৩০৫ সনে স্বামীজির শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ বেলুড় মঠ হইতে ঢাকা গমন করেন এবং ফরাসগঞ্জ অঞ্চলের জমিদার ৺মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করেন। পূর্ব হইতেই ঢাকার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ মোহিনী বাবুর বাড়ীতে সমবেত হইয়া সাপ্তাহিক অধিবেশনে ধর্মপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করিতেন। এই ভাবে তথায় একটি ক্ষুদ্র ভক্ত-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বামিদ্বয়ের শুভাগমনে ভক্তগণের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা ও স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শ প্রচার করিয়া বহু লোকের মন আকর্ষণ করেন এবং মোহিনী বাবুর বাড়ীতেই ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর প্রথম সূত্রপাত করেন।

১৮৯৯ সনের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন শিষ্যা স্বামী অভয়ানন্দ ঢাকা গমন করেন এবং মোহিনী বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। ৬ই এপ্রিল ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে নর্থব্রুক হলে তাঁহাকে এক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তদুত্তরে তিনি এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ১৪ই এপ্রিল স্থানীয় জগন্নাথ কলেজে 'অদ্বৈতবাদ' (Advaitism) সম্বন্ধে একটি এবং পর দিবস মোহিনী বাবুর বাড়ীতে মিশনের সাপ্তাহিক ধর্মসভার অধিবেশনে 'পাশ্চাত্যে বেদান্ত' (Vedanta in the West) সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮৯৯ সনের ডিসেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ঢাকা গমন করেন। তিনি ফরাশগঞ্জস্থিত মোহিনী বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী (১৯০০) পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে তিনি স্থানীয় জগন্নাথ কলেজে 'হিন্দুধর্মের সার্বভৌমত্ব' (Catholicity of Hinduism), জীবন বাবুর বাড়ীর নাটমন্দিরে 'জগতে কি আমাদের কোন মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবার আছে?' (Have We any Mission for the World?), 'প্রেমধর্ম' (Religion of Love) ও 'পারিবারিক জীবনে কি ধর্ম সম্ভব?' (Is Religion Possible in the Familiy-life?) সম্বন্ধে মোট চারিটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার অপরাহ্নে মোহিনী বাবুর বাড়ীতে ধারাবাহিকরূপে 'ভগবদ্‌গীতা' এবং অন্যান্য বিবিধ ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। স্বামীজির অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী অদ্বৈতানন্দও ঢাকা গমন করিয়া কিছু দিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করেন।

ঢাকার বিশিষ্ট ভক্ত যতীন্দ্রমোহন দাস পূর্ব হইতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ স্বামিগণের নিকট স্বামী বিবেকানন্দকে ঢাকায় সম্বর্ধিত করিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কয়েকখানি অনুরোধ-লিপি লিখিয়াছিলেন। যতীন্দ্র বাবু ১৮৯৮ সনের ২৮শে অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ঢাকাবাসিগণের পক্ষ হইতে ইংরেজীতে এই মর্মে একখানা পত্র * লিখিয়াছিলেন—

মালাকারটোলা,
ঢাকা
২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৮

পূজ্যপাদ স্বামীজি,

আপনার ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মা অজ্ঞানাচ্ছন্ন ঢাকাবাসিগণের নিবেদন সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন—এই আশায় আপনার মূল্যবান সময়ের উপর কথঞ্চিৎ অনধিকার হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেছি।

Malakartola, Dacca,
The 28th October, 1898.

* HOLY FATHER,

I venture to intrude a little on your valuable time in the hope that the appeal of the benighted people of Dacca will meet with a sympathetic response from your noble and world-loving heart.

Students of this city, impelled by some invisible power as it were, had the courage to invite your holiness and you were pleased to concede to their request and accordingly sent a telegram in reply. The matter was made public. It was announced in the 'Indian Mirror' and in all the local papers. The arrangements as lie in their humble power were accordingly made to bid you a hearty welcome. Unfortunately on a sudden a news came asto your illness. A blow fell upon the followers and admirers who took the lead. They were disappointed. Their long-looked-for day was not to dawn. The talk asto your holiness's arrival is still prevalent and is held with enthusiasm. Under the circumstances will you not grant our prayer and favour us

এই নগরীর ছাত্রগণ কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই যেন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইতে সাহসী হইয়াছিল এবং আপনি কৃপাপূর্বক তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে একখানা তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি সাধারণ্যে এবং 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' ও অন্যান্য স্থানীয় সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে। তদনুসারে আপনাকে সাদর সম্বর্ধনাজ্ঞাপনের জন্য যথাশক্তি আয়োজন করা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ আপনার অসুস্থতার সংবাদ আসিল। আপনার অনুরাগী ও অনুগামীদের মধ্যে যাহারা সম্বর্ধনাকার্যে অগ্রণী হইয়াছিল তাহাদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে: তাহাদের দীর্ঘ-আকাঙ্ক্ষিত শুভদিনের আবির্ভাব হইল না। আপনার শুভাগমনের কথা এখনও সকলে উৎসাহের সহিত বলিতেছে। এতদবস্থায় আপনি কি কৃপাপূর্বক আমাদের প্রার্থনা পূরণার্থ এই অঞ্চলে একবার শুভপদার্পণ করিবেন না? আপনি সুদূর আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে গমন করিয়া তদ্দেশবাসিগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন; আর আপনি যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং লালিত-পালিত হইয়াছেন তৎস্থানের অনতিদূরে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা আপনার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলাম! আমাদের সকলের উপর একটা অবসাদ আসিয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্বক এখানে আগমন করিয়া পতিত ও নিষ্পেষিত জনগণকে জাগ্রত ও উন্নীত করুন। ভবাদৃশ বিরাট পুরুষই একার্য সাধন করিতে পারেন। সূর্য ভিন্ন আর কিছুই জগতের অন্ধকার দূর করিতে পারে না।

একান্ত বিনীত
শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাস

with your holy visit? Distant America and England were favoured with your benign visit and we born not far off from the place where you have been born and bred up are deprived of your favour. A stupor has spread over us all. Please come and "raise and awake" the fallen and down-trodden humanity. It requires the hand of a giant. Nothing but the sun can dispel the darkness of the world.

I have the honour to be,
Sir,
Yours most humbly
JATINDRA MOHAN DAS

তৎপর ১৩০৫ সনের ১৩ই ফাল্গুন ঢাকার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীগগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের নিকট বেলুড় মঠে ইংরেজীতে এই মর্মে একখানা নিবেদন-পত্র * প্রেরণ করিয়াছিলেন—

১৩ই ফাল্গুন, ১৩০৫
(১৮৯৯)

প্রিয় মহোদয়,

এতদঞ্চলের জনগণের পক্ষ হইতে আমরা আপনাকে পূর্ববঙ্গের এই রাজধানীতে শুভাগমন করিতে পুনঃ সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সমধর্মাবলম্বী আমাদের সকলেরই ইহা পরম উল্লাসের হেতু যে, আপনি এযুগে আশ্চর্য সাফল্যের সহিত প্রাচ্য হইতে

The 13th Falgoon, 1305

* DEAR SIR,

We venture to approach you once again on behalf of ourselves and our people in these parts humbly asking you to honour this capital of East Bengal with your presence. It is a source of infinite satisfaction to us and co-religionists throughout this vast Empire that you should have carried the sacred torch of religion from the East to the West in your turn with such wonderful success. So many millions of your countrymen shall gratefully recollect the proud place that you so deservedly secured for India in the Congress of Religion and that but for you her very name

পাশ্চাত্যে ধর্মের পবিত্র পতাকা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ধর্মমহাসম্মেলনে ভারতের জন্য আপনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত গৌরবময় স্থান অর্জন করিয়াছেন এবং আপনি উপস্থিত না থাকিলে সেই বিরাট ধর্মসভায় ভারতের নাম পর্যন্ত কেহ লইত না—এই সকল কথা আপনার কোটি কোটি স্বদেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

আশা করি, আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত জীবন্ত বাণী শ্রবণে আলোকপ্রাপ্ত হইবার আমাদের দাবী গতবারের মতো এবার প্রত্যাখ্যাত হইবে না। এতদঞ্চলবাসিগণ আশা করিতেছে যে, তাহাদের সনির্বন্ধ ও সশ্রদ্ধ অনুরোধ আপনি অবিলম্বে রক্ষা করিবেন। আপনার সম্মতিসূচক সদয় উত্তর পাইলে এখানে আপনার অবস্থান যথাসম্ভব সুখপ্রদ করিবার জন্য সামান্য আর্থসঙ্গতির মধ্যেও যথাশক্তি চেষ্টা করিব।

বশংবদ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ
শ্রীগগনচন্দ্র ঘোষ
উকিল, জজকোর্ট, ঢাকা

এই সকল অনুরোধ ও নিবেদনের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের নিকট ইংরেজীতে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার মর্ম এই—

বেলুড় মঠ
জিঃ হাওড়া
৬ই মার্চ, ১৮৯৯

প্রিয় মহাশয়,

আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ-পূর্ণ আমন্ত্রণের জন্য বহু ধন্যবাদ। আপনার পত্রের উত্তর দিতে এত অধিক দিন বিলম্ব হওয়ায় বিশেষ দুঃখিত।

আমি সেই সময় খুব অসুস্থ ছিলাম এবং যে ভদ্রলোকের উপর পত্রোত্তর দিবার ভার ছিল তিনি উহা দেন নি বলে বোধ হয়। আমি এই মাত্র ইহা জানতে পেরেছি।

আপনাদের সানুগ্রহ আহ্বানের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য আমি এখনও সম্পূর্ণ নিরাময় হই নি। এই শীতকালেই আপনাদের ঐ অঞ্চল দর্শন করবার স্থির সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু আমার কর্মের গতি অন্যরূপ। প্রাচীন বাংলার সভ্যতার কেন্দ্রভূমি দেখবার আনন্দ-উপভোগের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

আপনাদের সহৃদয়তার জন্য পুনঃ ধন্যবাদ।

শুভার্থী
বিবেকানন্দ *

might have been missed in that august assembly.

We hope our claims to be enlightened by the living words from your lips will not be denied on this occasion as on the last. The people here expect to find a ready compliance with their earnest and respectful request. If it should please you to vouchsafe to us a favourable reply we should do our best to make your stay here as comfortable as it lies within our humble means.

Yours faithfully,
ISHWAR CHANDRA GHOSH
GAGAN CHANDRA GHOSH
Pleaders, Judge's Court, Dacca.

Math, Belur
Howrah Dist.
6th March, 99

* MY DEAR SIR,

Many thanks for your very kind invitation. I am so sorry that so many days' delay should occur in reply to your note.

I was very ill at the time and the gentleman on whom the duty fell of replying could not do it, it seems. I got notice of it just now.

I am not yet sufficiently recovered to take advantage of your kindness. This winter I had made it a point of visiting your part of the country. But my Karma will have otherwise. I will have to wait to give me the pleasure of visiting the seat of civilisation of ancient Bengal.

With my thanks again for all your kindness
I remain,
Yours in the Lord
Vivekananda

ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরবাদ

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য

ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় ঈশ্বরতত্ত্ব একটি প্রধান বিষয়। আস্তিক অথবা নাস্তিক-দর্শন প্রত্যেকটিই ঈশ্বরানুমানকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি? তাঁর স্বরূপ কি? বিশ্বপ্রপঞ্চ ও মানবের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি—এই সব প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে জিজ্ঞাসু মনের সামগ্রী পরিবেশন করেছিল। ভারতীয় ন্যায়-দর্শনের ক্রমবিবর্তনের ধারা এই আদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ন্যায়দর্শন প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরবাদ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল—ইহাই আধুনিক পণ্ডিতগণের সুচিন্তিত অভিমত। ফ্যাডেগন, গার্বে, রাধাকৃষ্ণন্ এই মতই সমর্থন করেছেন। গোতমের ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরবাদের সমর্থনস্বরূপ কোনও সূত্রের নির্দেশ পাওয়া যায় না। চতুর্থ অধ্যায়ে 'ঈশ্বর-কারণম্' (৪।১।১৯) ভাষ্যকারের মতে পূর্বপক্ষ-সূত্র। কিন্তু বাৎস্যায়ন 'তৎকারিত্বাদহেতুঃ' সূত্রের ব্যাখ্যায় তদ্‌শব্দের অর্থে ঈশ্বর গ্রহণ করে জীবের কর্ম্ম ও ঈশ্বর উভয়ই জগৎসৃষ্টির কারণ—ইহাই বলেছেন। যদিও গোতম তাঁর প্রমেয় ষোড়শ-পদার্থ-সংকলনের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু তাঁর উল্লিখিত আত্মার মধ্যেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্নিবেশ প্রতিভাত হয়। সেইস্থানে ভাষ্যকার বলেছেন, 'গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ'। এই ভাষ্যকারের সময় থেকে ন্যায়দর্শনের ইতিহাসে ঈশ্বরবাদের প্রথম সূত্রপাত হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে বোঝা যায় যে আস্তিক অথবা নাস্তিক—প্রতিটি শাখাই প্রকারান্তরে এক অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। অতিবাস্তববাদী সুশিক্ষিত চার্বাকসম্প্রদায়ও রাজাকেই সেই অলৌকিক শক্তির আধারস্বরূপ স্বীকার করে নিয়েছে—লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ। বৌদ্ধধর্মমতে বুদ্ধই সর্বজ্ঞ ও নৈতিক ধারার একমাত্র প্রবর্তক। জৈনগণও জিনকেই সর্বব্যাপী ঈশ্বররূপে জ্ঞান করেন। মীমাংসক-সম্প্রদায়ের মতে বেদ অলৌকিক জ্ঞানের আধার ও বেদজ্ঞই সর্বেশ্বর। সাংখ্যমতে কপিলই আদিবিদ্বান। বেদান্তে সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাই ঈশ্বরস্বরূপ। অতিজাগতিক সত্তার এই অস্ফুট রূপটিই যুগ যুগ ধরে রূপায়িত হয়ে ঈশ্বরবাদের আকার ধারণ করেছে।

ন্যায়বৈশেষিকদর্শনের ইতিহাসে খৃষ্টীয় অষ্টম-শতাব্দীর বাচস্পতিমিশ্র ও খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর প্রশস্তপাদাচার্যই প্রথম জগৎসৃষ্টির কারণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রহণ করেন। বাচস্পতিমিশ্রের এই অবদান সার্থক হয়ে উঠ্‌ল উদয়নাচার্যের নিবন্ধের মাঝে। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যই (১০ম শতাব্দী) তাঁহার 'কুসুমাঞ্জলি'-গ্রন্থে ঈশ্বর-তত্ত্বের একটি সুসমঞ্জস রূপদান করে সেশ্বরবাদের অধিকর্তারূপে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করলেন। 'কুসুমাঞ্জলি' ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে যুগ যুগ ধরে খ্যাতি লাভ করছে। তাই তাঁর গ্রন্থকে বলা হয়েছে—'a classic in Indian Theism'. তিনি 'নিরুক্তে'র একটি বাক্য উদ্ধৃত

করে বললেন, 'অন্ধব্যক্তি বৃক্ষের কাণ্ড দেখতে পায় না—ইহা কি বৃক্ষের অপরাধ?' অর্থাৎ সাধকপুরুষ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন—যারা অজ্ঞানান্ধ তারা ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে পারে না তাদেরই সাধনার অভাবে, ঈশ্বর সেজন্য দায়ী নন। 'কুসুমাঞ্জলি'র প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন, 'আসংসারং সুপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি ভবে কৃত এব সন্দেহঃ'—ঈশ্বর সর্বত্রই স্বীকৃত, তাঁর সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। পাঁচটি স্তবকে তিনি অকাট্য সূক্ষ্ম যুক্তিজালে নিরীশ্বরবাদিগণের মতবাদসমূহ নিরাস করে ন্যায়শাস্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদন করেছেন। ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত নানাবিধ অসহ্য জ্বালাময় সংসার থেকে মুক্তি পাবার উপায় নেই—আচার্যের এই বিশ্বাস গ্রন্থমধ্যে সুপরিস্ফুট।

ঈশ্বরানুমানের যুক্তিস্বরূপ শ্রীমদুদয়নাচার্য বলেছেন, জীবের শুভাশুভকর্মজন্য ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এই অদৃষ্ট অচেতন, সুতরাং কোনও চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনপদার্থ জগৎসৃষ্টির কারণ হ'তে পারে না। অসর্বজ্ঞ জীবও তার অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরই অনাদি চেতন পদার্থরূপে সর্বকর্মের ফলদাতা। একটি নৈতিক শৃঙ্খলা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত, সেই শৃঙ্খলার নির্দেশক একমাত্র ঈশ্বর। নব্যন্যায়ে এই আদর্শটি অনুরূপ গ্রহণ করল। ব্যক্তিজীবনের চরমলক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি, ঈশ্বরানুসন্ধানেই ব্যক্তিত্বের চরমবিকাশ—এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল। নিঃশ্রেয়সলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা তাঁরই দর্শনলাভ। নব্য-নৈয়ায়িক গদাধর তাঁর 'মুক্তিবাদ'-গ্রন্থে এই মতবাদ পোষণ করলেন।

কুমারিল ভট্ট অদৃষ্টবাদে ঈশ্বরানুমানের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেন যে ধর্মাধর্মের কৃতকৃত্যতা পুণ্যাদি কর্মের কর্তার উপরই আরোপ করা যেতে পারে। 'ন্যায়কন্দলী'-কার (নবমশতাব্দী) ও উদয়নাচার্যই ধর্ম ও অধর্মকে অচেতনরূপে গ্রহণ করে এ মত খণ্ডন করলেন। বৌদ্ধদার্শনিক শান্তরক্ষিত-কৃত 'তত্ত্বসংগ্রহ'-গ্রন্থে ঐ যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে—"যদ্যপি ধর্মাদি কারণং তথাপি তদচেতনত্বাদধিষ্ঠাপকমন্তরেণ ন স্বয়ং স্বকার্যমারভতে।"

দ্বিতীয়তঃ নৈয়ায়িকগণের মতে ঈশ্বরের অভাববোধক (negative) বিচারই তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন। প্রতিটি পরিমাপক (Degree) বস্তুরই অত্যুৎকর্ষ ও অতি-অপকর্ষ—এই দুটো দিক আছে। সুতরাং জ্ঞানেরও চরমাবস্থা নিশ্চয়ই স্বীকৃত। এই সর্বজ্ঞই ঈশ্বর। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) বলেছেন যে ঈশ্বরসাধকানুমানের প্রচেষ্টা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। আনসেল ও ডেকার্ট বলেন যে ঈশ্বরের কল্পনাই তাঁর অস্তিত্বের সাধক। স্পিনোজার মতে "The very idea of God is the source and sum of all perfection." কাণ্ট ঐ মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সেইরূপ ভারতেও নৈয়ায়িকগণের উক্ত মতবাদ বৌদ্ধ জৈন ও কুমারিল-সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ-কর্তৃক খণ্ডিত হয়েছে। নব্যন্যায়ের রূপায়ক রঘুনাথশিরোমণি যুক্তিবাদের উপর ভিত্তি করে নিরীশ্বরবাদিগণের উক্ত মতবাদ খণ্ডন করলেন।

নৈয়ায়িকগণের অন্য যুক্তি কার্যকারণবাদের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কার্যকারণবাদের দুইটি দিক আছে, দ্বিতীয় কার্য-কারণবাদের নৈরন্তর্য স্বীকার করতে হবে, অন্যথা কারণ-পরম্পরার মাধ্যমে প্রথম কারণরূপে কোনও উপাদান গ্রহণ করতে হবে। প্রথম যুক্তি অনবস্থাদোষদুষ্ট (regressus ad infinitum), সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চের গতিপ্রবাহের উৎসরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। পাশ্চাত্ত্যদর্শনে য়্যারিষ্টটলের মতবাদ উক্ত মতের

প্রতিফলনরূপেই অনুমিত হয়। তাঁর মতে ঈশ্বর জগতের প্রথম চালক (first mover)। প্লেটো, অগাষ্টাইন ঐ কথাই বলেছেন, 'Contingency involves the necessity of God.' এই স্থলে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের সহিত নৈয়ায়িকের প্রভেদ এই যে নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ-রূপে গ্রহণ করেছেন।

ন্যায়দর্শনের ঘোর প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ ও চার্বাক-সম্প্রদায় এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। চার্বাকগণ অতিজাগতিক পরিবেশের মধ্যে স্থিত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধগণের মতে জগৎ ক্ষণিক (universal flux), সুতরাং বিশ্বের কর্তাও ক্ষণিক, সুতরাং ন্যায়মতে স্থিতিশীল ঈশ্বর প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি ঈশ্বর স্বীকার করতেই হয়, তবে একেশ্বরবাদ কখনই সমর্থন করা যেতে পারে না। শান্তরক্ষিতের এই আক্রমণ প্রধানতঃ প্রশস্তপাদাচার্য ও উদয়নের বিরুদ্ধেই ঘোষিত হয়েছে। তৃতীয়তঃ নৈয়ায়িকগণের মতে ঈশ্বর ব্যক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত—এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিতান্তই তামসভাবাপন্ন। বৌদ্ধগণের প্রথম আক্রমণ গঙ্গেশ ও জগদীশের মতে ন্যায়োক্ত প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা নিরোধ করা যেতে পারে। উদ্দ্যোতকর ও শ্রীধর তাঁদের গ্রন্থে ঈশ্বরের একত্ব সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে বলেছেন যে ঈশ্বরের বহুত্ব তাঁর সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বব্যাপকত্বের বাধকই হ'বে, তৃতীয় সমালোচনার সমাধানে বলা যেতে পারে যে নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকে অনন্ত ইচ্ছাশক্তির আধাররূপে কল্পনা করেছেন। সুতরাং তাহা দুষ্ট যুক্তি হ'তে পারে না।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ একটি সুসমঞ্জস সন্নিবেশের আধার (সন্নিবেশ-বিশিষ্টতা), সুতরাং এই সন্নিবেশ-নিচয়ের প্রযোজকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। সেই ঈশ্বর সৃষ্টির উপাদান অচেতন পরমাণুর সংযোজক, সুতরাং তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অধিকর্তা। 'তাৎপর্যটীকা'-কার ও শ্রীধর এই মতের পোষক। নিরীশ্বরবাদিগণের আপত্তি এই যে ঘটপটাদির সমস্ত সৃষ্টিতেই নির্মাতার শরীর থাকা প্রয়োজন—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। ঈশ্বর যদি জগৎস্রষ্টা হন তবে নিশ্চয়ই তিনি শরীরী হবেন। বাচস্পতিমিশ্র, উদয়ন প্রমুখ আচার্যগণ এই মত বিশেষভাবে খণ্ডন করেছেন। তাঁদের মতে শরীরবত্তা ও কর্তৃত্বের মধ্যে এরূপ কোনও ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নেই। ঈশ্বরের শরীর না থাকলেও তাঁর প্রযত্ন থাকতে পারে।

নৈয়ায়িকগণ বেদের কর্তারূপেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাধকানুযায়ী প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। মহর্ষি গোতম বেদপ্রামাণ্য-স্থাপনে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি। বাৎস্যায়ন ও উদ্দ্যোতকর বেদকর্তারূপে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেন নি। বাচস্পতিমিশ্রই প্রথমে বেদকে ঈশ্বরের রচিত বলে স্থির করেছেন। উদয়নাচার্য, জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীও বাচস্পতিমিশ্রের অনুসরণ করেছেন। বৈশেষিকদর্শনে "তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (১।১।৩)—এই সূত্রের ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য তদ্‌শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণের যুক্তি এই যে আদিম মানবের হৃদয় কে সর্বপ্রথম জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিল? সুতরাং এই জ্ঞানের প্রসারকরূপে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা অবশ্যই বিধেয়।

কণাদ ও গোতমের মতে এই ঈশ্বর নিত্য, সর্বজ্ঞ, সগুণ, সর্বদা সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষরূপ নিত্যজ্ঞানের আশ্রয়—কিন্তু আনন্দস্বরূপ নহেন। ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে হরিভদ্র-সূরি বলেছেন, অক্ষপাদ-

মতে "দেবঃ সৃষ্টিসংহারকৃচ্ছিবঃ, বিভুর্নিত্যৈক-সর্বজ্ঞো নিত্যবুদ্ধিসমাশ্রয়ঃ।" কিন্তু নৈয়ায়িক-প্রবর উদয়নাচার্য 'কুসুমাঞ্জলি'র শেষে পরমেশ্বরকে আনন্দনিধি বলেছিল। 'ন্যায়মঞ্জরী'-কার জয়ন্ত ভট্টের মতেও পরমেশ্বর নিত্যসুখবিশিষ্ট। পরবর্তী যুগে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি 'দীধিতি'র মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বলেছেন "অখণ্ডা-নন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে।" উদয়নাচার্যের পূর্ববর্তী বাচস্পতিমিশ্র 'ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্যটীকায়' পরমেশ্বরকে নিত্যচৈতন্যশক্তি-বিশিষ্ট বলেছেন। তিনি মিথ্যাজ্ঞানের বহির্ভূত—সুখদুঃখাদির পারে অবস্থিত, অণিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির আধার।

ন্যায়মতে এই ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। মানবজীবনের সুখ-দুঃখের তিনি পরিচালক। ত্রিবিধ দুঃখ ও জন্মপরম্পরা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় ঈশ্বরের নিকট প্রাণমন ঢেলে দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করা। ভাষ্যকার ইহা সুস্পষ্টরূপে বলেছেন। উদয়নাচার্যের মতে ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই সমস্ত দার্শনিক আলোচনা ঈশ্বর-আরাধনা-স্বরূপ। এইরূপ আরাধনার মাধ্যমে মানবজীবন ঈশ্বরকেন্দ্রিক হবে। গঙ্গেশ 'তত্ত্বচিন্তামণি'-গ্রন্থে এই মতবাদ সমর্থন করেছেন।

সুতরাং ন্যায়দর্শন-ভাষ্যের যুগ থেকেই ঈশ্বরবাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। ভক্তিমার্গের সহিত তার কোনও বিরোধ নেই, বরং ন্যায়দর্শন ভক্তিমার্গের অনুকূল। কুতার্কিকগণের অপ-প্রচারের ফলেই ন্যায়দর্শন নিরীশ্বরবাদী এইরূপ ধারণা প্রচলিত হয়েছে।

'আমি'র স্বরূপ

শ্রীনদীয়াবিহারী সাহা

'আমি' 'আমি' বলি বটে কিন্তু এর রূপ
জিজ্ঞাসিলে বিজ্ঞ জন বাক্‌হীন চুপ!
'আমি' যদি দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি নই,
তবে মোর দেহে 'আমি' কোন্ রূপে রই?
এই প্রশ্ন বহু দিন জাগিয়াছে মনে,
মিটে গেল এই সন্দ শাস্ত্র-কথা শুনে—
'আমি' যিনি আত্মা তিনি দেহ রথে রথী
জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন জীবনের সাথী,
সচ্চিৎ আনন্দ রূপে তাঁহার দর্শনে
মুক্তি লভে ছিন্ন করি সকল বন্ধনে।

জীবাণু-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ

ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্-বি

শরীর ধারণ করলেই ব্যাধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, আর তারই তাড়নায় পীড়িত মানবজাতির মঙ্গলের জন্য বিশ্বের জীবাণুবিদ্‌রা তাঁদের জীবন বিপন্ন করেও ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছেন রোগের কারণ-নির্ণয় ও তার প্রতিকারের জন্য। অনেক আগেকার কথা—তখন মানুষ ব্যাধিকে কোন এক শক্তিমান পুরুষের রোষের অভিব্যক্তি বলে মনে করতো। তাই কোন রোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির পূজা করতো। তার প্রভাব এখনও যায়নি, তাই এখনও কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ মহামারী রূপে দেখা দিলে বৈজ্ঞানিক সাধারণ নিয়মাবলীকে উপেক্ষা করেও দেব-দেবীর আরাধনার উদ্যোগ করা হয়। কিন্তু ক্রমশঃই এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ ধারণার বিরোধী হয়ে উঠলেন—তাঁদের কৌতূহলী মন সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত হলো। এদেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু জীবাণুর সঙ্গে যে রোগের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে সেটা মাত্র কিঞ্চিদধিক শতাব্দীকাল আগে স্বীকৃত হয়েছে। মধ্যযুগ হতে বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে লোকে ধারণা করতে আরম্ভ করে ঐ রোগগুলি একজন হ'তে আর একজনে সংক্রমিত হতে পারে। ১৫৪৬ খৃঃ ফ্রেকাষ্টার (Fracastor) প্রচার করলেন যে রোগের বিস্তারলাভ হয় এমন এক ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা যা সাধারণের চক্ষে দেখা যায় না। ১৬০১ খৃঃ ফিরচার নামক জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ করলেন যে, তিনি তাঁর অণুবীক্ষণ কাঁচ দিয়ে প্লেগরোগীর রক্তে একপ্রকার জীবাণু দেখেছেন এবং সেটাই প্লেগ-রোগের কারণ। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, তিনি রক্তে লোহিত কণিকাগুলি দেখেছিলেন—যা সকল সময় সকল মানুষেই পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে এক্ষেত্রে তাঁর ধারণা ভ্রান্ত হলেও, এটা যে অভ্রান্ত ছিলো তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই শতাব্দীতে লিউয়েন হোক্ নামে একজন ডাচ নানা রকমের অণুবীক্ষণ কাঁচ তৈরী করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। জগতে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তুকে চল্লিশ হইতে প্রায় তিনশ গুণ বড় দেখাতো। সুতরাং সাধারণের দৃষ্টিতে যে সব বস্তু ধরা দেয় না কুশলী বৈজ্ঞানিকের কাছে সেগুলি জাজ্বল্যমান হয়ে উঠলো। কিন্তু জীবাণুর সঙ্গে রোগের যে কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে সে ধারণাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি।

এ পর্য্যন্ত অনেকেরই ধারণা ছিল যে, জীবাণু আপনা আপনি জন্মায়। এই ধারণার সমর্থনে ১৭৫০ খৃঃ নিড্‌হাম একটি পরীক্ষা দেখান। তিনি একটি টেষ্টটিউবে খানিকটা মাংসের ক্বাথ (Meat-broth) রেখে প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ দিয়ে সব জীবাণু ধ্বংস করে ছিপি বন্ধ করে রাখলেন। কিছু দিন পর দেখা গেল সেখানে অসংখ্য জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে। অনতিকাল পরেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

পাস্তুর প্রমাণ করলেন যে, বাতাসে জীবাণু আছে এবং বাহিরের বাতাস থেকে সংস্রবহীন রাখতে পারলে নূতন করে জীবাণু সৃষ্ট হতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে তুলোর ছিপি বা সাধারণ শোলার ছিপি দ্বারা টেষ্টটিউবের পদার্থ বাইরের বাতাস থেকে সংস্রবহীন মনে হলেও বস্তুত তা নয়।

ক্রমেই উন্নততর ধরণের অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হতে লাগলো এবং জীবাণুগুলির বাহ্যিক আকৃতি অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হলো। কোনটা বিন্দুর মত, কোনটা ছোটো রেখার মত, কোনটা বা স্ক্রুর মত।

১৮০০ খৃঃ জেনার গো বসন্ত হইতে বসন্তের প্রতিষেধক আবিষ্কার করলেন, কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সন্ধান তখনও অজানা ছিল।

রোগীর শরীরে কোন প্রকার জীবাণু পেয়ে তাকেই রোগের কারণ বলে ধরে নেওয়ায় অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৪০ খৃঃ হেন্‌লি নামক একজন শরীরতত্ত্ববিদ্ বললেন যে, যদি কোন জীবাণুর সহিত কোন রোগের সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, তা হলে সেই রোগীর শরীরে ঐ জীবাণু পাওয়া চাই, আর সেই জীবাণু কোন সুস্থ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করালে তারও ঐ রোগ হবে।

১৮৪৯ খৃঃ পোলেণ্ডার এনথ্রাক্স (Anthrax) নামক একটি রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এ রোগটি জন্তুদের বিশেষতঃ গরু ও ভেড়ার মধ্যে বেশী দেখা যায়। এই রোগের জীবাণুই সব সংক্রামক রোগের জীবাণু থেকে আগে দেখা গেল।

পাস্তুর যখন প্রচার করলেন যে বাতাসে জীবাণু আছে, তখন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যচিকিৎসার অধ্যাপক লিষ্টার পাস্তুরের ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে প্রয়াসী হলেন। তখনকার দিনে অস্ত্রোপচারের পর অনেক রোগী ক্ষত-দূষিত হয়ে মারা যেত। ১৮৬৭ খৃঃ প্রভৃত বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল সমালোচনার মধ্যেও তিনি শল্য-চিকিৎসায় antiseptic এর ব্যবস্থা করলেন। তিনি অস্ত্রোপচারের সময় কারবলিক্ এসিড ব্যবহার করতেন ও পরে ক্ষতস্থান খুব ভালভাবে ঢাকা দিয়ে রাখতেন। এর ফল হল অতি আশ্চর্য্য-রকম। ক্ষত-দূষিত হওয়ার সংখ্যা খুব কমে গেল।

১৮৭৪ খৃঃ হেনসেন কুষ্ঠরোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে ঐ জীবাণুকে অনেকসময়ে 'হেনসেনের জীবাণু' বলা হয়। ১৮৭৯ খৃঃ নিসার (Neisser) গণোরিয়া রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৮০ খৃঃ এবার্থ টাইফয়েড রোগের জীবাণু ও ঠিক পরের বছর (১৮৮১ খৃঃ) পাস্তুর ও ষ্টার্ণবার্গ নিমোনিয়া রোগের জীবাণুর সন্ধান পেলেন।

এর আগেই বলা হয়েছে যে, বসন্তের প্রতিষেধক আবিষ্কারের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। ১৮০০ শতাব্দীর শেষদিকে পাস্তুর দেখলেন যে, যদি কোন প্রাণীর শরীরে কোন জীবাণুকে কমজোরী (attenuated) করে প্রবেশ করান যায় তা হলে পরবর্ত্তী কালে সেই জাতীয় প্রবল (virulent) জীবাণুও তার শরীরে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ১৮৮১ খৃঃ এই সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্য স্থানে একটি পরীক্ষা দেখান। একটি জন্তুর শরীরে এনথ্রাক্স জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেন এবং আর একটি জন্তুর শরীরেও অনুরূপভাবে দিলেন যেটিকে পূর্ব্বেই ঐ জীবাণু কমজোরী করে ঢোকান হয়েছিল। পরীক্ষায় দেখা গেল প্রথম জন্তুটি মরে গেছে কিন্তু দ্বিতীয়টি সুস্থ আছে। আজকাল কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতির প্রতিষেধক (Vaccine) যে আমরা লই সেগুলো ঐ একই উপায়ে কাজ করে।

ইতোমধ্যে বৈজ্ঞানিক কক্ (Koch) জীবাণু-তত্ত্বের অনেক নূতন পথ খুলে দিলেন। এ পর্য্যন্ত জীবাণুসমূহকে এমনি দেখা হতো। তিনিই সর্ব্বপ্রথম জীবাণুগুলিকে রঙ্গিয়ে দেখবার বন্দোবস্ত করলেন। এতে অনেক সুবিধা হলো। এ ছাড়া তিনি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের উন্নতি-সাধন ও কৃত্রিম উপায়ে জীবাণুর বৃদ্ধিসাধনের নূতন পন্থা আবিষ্কার করেন। তাঁর অতুলনীয় কাজ যক্ষ্মারোগের জীবাণু-আবিষ্কার (১৮৮২ খৃঃ); তাঁর নামানুসারে অনেক সময় আমরা যক্ষ্মা-রোগকে 'Koch's disease' বলে থাকি। এর দু বছর বাদে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তিনি কলেরারোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন।

১৮৮৩ খৃঃ ক্লেব (Kleb) ডিপথিরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৮৮ খৃঃ দু জন বৈজ্ঞানিক (Roux & Yersin) অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ঐ রোগের যে সব উপসর্গ দেখা যায় সেগুলো ঐ জীবাণু-নিঃসৃত এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্যের (toxin) জন্য। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখালেন যে যদি কৃত্রিম উপায়ে ডিপথিরিয়ার জীবাণু ব্রথে (broth) জন্মান যায় ও পরে ঐটি বিশেষ কোন প্রকার ছাঁকনী দ্বারা জীবাণুশূন্য করে কোন প্রাণীর দেহে ঢোকান যায়, তারও ডিপথিরিয়ার মত অনেক উপসর্গ দেখা দেবে। ১৮৯৪ খৃঃ রক্স ডিপথিরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেছিলেন যে যদি কোন প্রাণীর শরীরে কোন জীবাণুনিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ (toxin) খুব অল্প মাত্রায় বা কমজোরী করে ঢোকান যায়, সেই প্রাণীর রক্তে সেই জীবাণুরই প্রতিষেধক সৃষ্টি হয়। এখনও আমরা ডিপথিরিয়ার চিকিৎসা হিসাবে যে ঔষধ ব্যবহার করি সেটা ঘোড়ার রক্ত থেকে তৈরী—যে ঘোড়াতে আগে ডিপথিরিয়ার টক্সিন্ (toxin) ঢোকান হয়েছিল। এইরূপ উপায়েই ধনুষ্টঙ্কার (tetanus), গ্যাস গ্যাংগ্রীন প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক তৈরী হয়। ১৮৯৪ খৃঃ কিটাসাটো প্লেগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৯০৫ খৃঃ Schaudinn উপদংশরোগের জীবাণু নির্ণয় করেন।

সম্প্রতি যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক হিসাবে বি সি জি (B. C. G) ভ্যাকসিন্ বেরিয়েছে। এটার নাম হয়েছে আবিষ্কারকদের নামানুসারে। কেলমেট (Calmett) ও গুয়েরিণ, (Guerin) : বি অর্থে জীবাণু (bacillus)—এটা এক প্রকার জীবন্ত গো-যক্ষ্মার জীবাণু যাকে কৃত্রিম উপায়ে দুর্ব্বল করা হয়েছে; তাই এটা শরীরে গেলে যক্ষ্মারোগ তো হবে না-ই উপরন্তু ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হতে আমাদের রক্ষা করবে।

ক্রমাগত চেষ্টার পর অনেক রোগের জীবাণু দেখা গেলেও অনেক রোগের কারণ তখনও নির্ণীত হয় নি। পরে এটা বোঝা গেল যে রোগ অনেক সময় এমন ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা হয় যেটা সাধারণ অণুবীক্ষণ-যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। এগুলোকে 'ভাইরাস' (virus) নাম দেওয়া হয়েছে। আমরা সাধারণতঃ যাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা বলি সেটার জীবাণু এই ধরণের। তা ছাড়া হাম, বসন্ত তো আছেই। দীর্ঘ দিনের সাধনার পর আজকাল এক প্রকার বিশেষ ধরনের অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের (Electron-microscope) সাহায্যে এদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানা যাচ্ছে।

আজকাল গন্ধকজাতীয় অনেক কিছুই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক রোগে এগুলো অব্যর্থ। বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন যে, এইসব গন্ধকজাতীয় ঔষধ জীবাণুগুলির স্বাভাবিক জীবনধারণে বাধা দিয়ে তাদের বৃদ্ধি দমন করে, তাই এখন জীবাণুদের জীবনধারণের প্রণালীর ওপর সবিশেষ নজর পড়েছে। ঘটনাচক্রে

দেখা গেল যে, এক প্রকার জীবাণু আর এক প্রকার জীবাণুর বৃদ্ধি দমন বা ধ্বংস করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সাটিলিস, (Subtlis), পাইওসাইনাস (Pyocyaneus) প্রভৃতি জীবাণুর নাম বলা যায়। এরা সাধারণ অবস্থায় মানুষের কোন ক্ষতি করে না উপরন্তু অন্যান্য জীবাণুদের শত্রু। ক্রমে কোন কোন উদ্ভিদজাতীয় দ্রব্যেরও এই সব গুণ আছে বলে প্রমাণিত হল।

১৮২৯ খৃঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং দেখলেন যে, কৃত্রিম উপায়ে জাত ষ্টেফাইলোকক্কাস নামক এক প্রকার জীবাণু একপ্রকার উদ্ভিদজাতীয় দ্রব্যের আকস্মিক আবির্ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরে এটা পেনিসিলিয়াম নোটেটাম (Penicillium Notatum) নামক একপ্রকার উদ্ভিদ-জাতীয় দ্রব্য বলে স্বীকৃত হল। এ থেকে পেনিসিলিন তৈরী হয়। ১৯৪৪ খৃঃ ওয়াকস্ম্যান (Walksman) মৃত্তিকাস্থিত একপ্রকার জীবাণু থেকে ষ্ট্রেপটোমাইসিন্ আবিষ্কার করলেন। এ পর্য্যন্ত যক্ষ্মারোগের এর চেয়ে ফলপ্রদ ঔষধ বেরোয় নি।

কিছুকাল আগে ভেনজুয়েলা নামক এক স্থানের মৃত্তিকাস্থিত জীবাণু থেকে ক্লোরোমাই-সিটিন তৈরী করা হয়েছে। টাইফয়েড রোগে এটা একপ্রকার অব্যর্থ। এছাড়া আরও অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও যে হবে সেটা নিশ্চিত।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্চে যে, এক শ্রেণীর জীবাণু যেমন মানুষের ক্ষতিসাধন করতে তৎপর, ঠিক অনুরূপ ভাবেই আর এক শ্রেণীর জীবাণু ও উদ্ভিদ মানবদেহের অশেষ কল্যাণসাধন করছে।

প্রার্থনা

মৃত্যুঞ্জিত

আমারে তোমার যোগ্য করিয়া লও,
থাকি যেন আমি চির আলোকের পথে।
আমার জীবনে তুমি মোর সব হও,
তব প্রেমে মোর জীবন স্বর্ণ-রথে
ছুটিয়া চলুক চির সার্থক পানে।
আমি যেন হই জাগ্রত নির্ভয়,
ওগো সুন্দর, তোমার প্রেমের তানে
জীবন আমার পূর্ণ যেন গো রয়।

সকল কামনা সকল বাসনা মোর
হয় যেন দূর তোমার প্রেমের দানে।
তুমি আছ মোর সব চেয়ে সুন্দর
আমি কেন ছুটি অসুন্দরের টানে!
চোখে মোর তুমি এঁকে দাও অঞ্জন,
পরশে তোমার হোক মোহ-ভঞ্জন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাব

শ্রীউপেন্দ্রকুমার কর, বি-এল্

(২)

স্বামীজির অন্য এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মিসেস্ আনি স্মিথ্ (Mrs. Annie Smith)। স্বামীজি তাঁহাকে মাতা স্মিথ্ (Mother Smith) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মিসেস্ স্মিথ্ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে আমেরিকায় প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া খ্যাতি লাভ করেন। স্বামীজির মহাসমাধির পর তিনি লিখিয়া-ছিলেন: "I found the spiritual seed of the Swami's planting springing up all over the Pacific coast ; for, he vitalised American religions and sects as well as Hinduism."—"আমি দেখিতে পাইলাম, স্বামী বিবেকানন্দ যে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন তাহা এখন প্রশান্ত মহাসাগরের সমগ্র তীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, তিনি আমেরিকার সমুদয় ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়সমূহকে, তথা হিন্দুধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন।"

মিসেস্ স্মিথের উপরি-উক্ত অভিমত কত সত্য তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিসেস্ এলা হুইলার উইল্‌কক্স নাম্নী (Mrs Ella Wheeler Wilcox) আমেরিকান মহিলা এবং তাঁহার পতির উপর স্বামীজির বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতার প্রভাব। মিসেস্ উইল্‌কক্স আমেরিকার এক জন শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক এবং পৃথিবীর নারী-সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি এবং মিঃ উইল্‌কক্স ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা নবজীবন ও পরমা শান্তি লাভ করেন। Mrs Wilcox ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মে New York American পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। ঐ প্রবন্ধ হইতে যে কয়টি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ধর্ম্মপিপাসু শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজের উপর বিবেকানন্দ-প্রচারিত বেদান্তের বাণী কি রূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মিসেস্ উইল্‌কক্স লিখিয়াছেন:

"* * * We went out of curiosity (the Man whose name I bear and I) and before we had been ten minutes in the audience we felt ourselves lifted up into an atmosphere so rarefied, so vital, so wonderful that we sat spell-bound and almost breathless to the end of the lecture.

"When it was over we went out with new courage, new hope, new strength, new faith to meet life's daily vicissitudes. 'This is the philosophy, this is the idea of God, the religion which I have been seeking', said the Man. And for months afterwards he went with me to hear Swami Vivekananda explain the old religion and to gather from his wonderful mind jewels of truth and thoughts of helpfulness and strength. * * When any philosophy, any religion can do this for human beings in this age of stress and strain, and when, added to that, it intensifies their faith

in God and increases their sympathies for their kind and gives them a confident joy in thought of other lives to come, it is a good and great religion."

"আমার স্বামী ও আমি কৌতূহল-বশতঃ বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু দশ মিনিট বক্তৃতা শুনিবার পূর্ব্বেই অনুভব করিতে লাগিলাম আমরা এক অপূর্ব্ব জীবনসঞ্চারী ঊর্দ্ধলোকে উন্নীত হইলাম। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমরা প্রায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। নব সাহস, নব আশা, নূতন বল, নূতন বিশ্বাস লইয়া আমরা সুখ-দুঃখময় দৈনন্দিন জীবনে ফিরিয়া আসিলাম। আমার স্বামী বলিলেন—'এই ধর্ম্মের, এই দর্শনের, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণারই অনুসন্ধান এত কাল করিতেছিলাম।'—ইহার পর কয়েক মাস স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত প্রাচীন বেদান্তধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য—তাঁহার অনন্যসাধারণ মানস-নিঃসৃত বলপ্রদ মঙ্গলাকর চিন্তা এবং সত্যের রত্নরাজি সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা উভয়ে গিয়াছিলাম। * * যে দর্শন, যে ধর্ম্ম বর্ত্তমান সঙ্কটময় কালেও মানুষের এত উপকার করিতে পারে, যে ধর্ম্ম মানুষের আস্তিক্য-বুদ্ধি, ভগবানে বিশ্বাস অচল-অটল করে এবং মানুষের প্রতি মানুষের সম-বেদনার পরিধি বিস্তৃত করে, যে ধর্ম্ম পার-লৌকিক জীবনবিষয়ক চিন্তায় মানুষের মনে (ভয় বা দুঃখের পরিবর্ত্তে) আস্থা এবং আনন্দের উদ্রেক করে তাহাই মহান্ ধর্ম্ম, তাহাই পরম ধর্ম্ম।"

Sarah Bernhardt এক জন বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী ছিলেন। তিনি আমেরিকায় স্বামীজির দর্শনবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফ্রান্সে স্বামীজির সঙ্গে তাঁহার আবার দেখা হয়। তিনি ভারতবর্ষীয় সভ্যতার অত্যন্ত অনুরাগিণী ছিলেন এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে একখানা নাটক অভিনয় করেন। তিনি স্বামীজিকে বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ দর্শন করা তাঁহার একটি জীবনের স্বপ্ন। ম্যাডাম্ ক্যাল্ভে (Madame Calve) ফ্রান্সের সুবিখ্যাত গায়িকা ছিলেন এবং তাঁহারও স্বামীজির সঙ্গে আমেরিকায় দেখা হয় এবং পরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে আবার দেখা হয়। তাঁহার আতিথ্যে স্বামীজি য়ুরোপ এবং মিশর ভ্রমণ করেন। তিনি স্বামীজিকে সর্ব্বদা Mon Pere (My Father) অর্থাৎ 'আমার পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টানগণ তাঁহাদের ধর্ম্মযাজকদিগকে Mon Pere বলিয়া সম্বোধন করেন।

এখন আমরা স্বামীজির কয়েক জন বিশিষ্ট ইংরেজ শিষ্য ও শিষ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য Mr G. J. Goodwin (গুডউইন্)। তিনি Stenography শিক্ষা করিয়া স্বামীজির প্রথম বার আমেরিকায় প্রচারের সময় ২৩ বৎসর বয়সে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উক্ত দেশে গিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে মিস্ ওয়াল্‌ডোর সঙ্গে দৈবাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীজির সঙ্গে কয়েক দিবস বাস করিবার পরই তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তিনি লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেন নাই, কিন্তু স্বামীজি অল্প সময়ের মধ্যেই গুডউইনের হৃদয়-মনে বেদান্তের ভাব ও আদর্শ সঞ্চারিত করিয়া সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া গুড্‌উইন্ স্বামীজির সুদীর্ঘ বক্তৃতাসমূহ অতি সহজে প্রথমে Shorthand-এ এবং পরে

Type-writer দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদ-পত্রের আপিসসমূহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। তাঁহাকে সমস্ত দিন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই রূপ পরিশ্রম করিতে হইত। বস্তুতঃ গুড্-উইনের সহায়তা না পাইলে স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য বক্তৃতাবলী বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত। বলা বাহুল্য, তুই সপ্তাহের পর গুড্উইন্ কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই; পক্ষান্তরে, সাধারণ ভৃত্যের মত গুরুদেবের সকল প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া দিতেন। এরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগী জগতে বিরল। স্বামীজি বলিতেন—"আমার কার্য্যের জন্যই ভগবান গুড্উইন্‌কে মনোনীত করিয়াছেন। যদি আমার কোন Mission থাকে তবে গুড্উইন্ তাহার অংশস্বরূপ।" স্বামীজির সঙ্গে গুড্উইন্ প্রথমে ইংলণ্ডে এবং পরে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বিষম জ্বরে (Enteric fever) আক্রান্ত হইয়া তিনি ২৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। স্বামীজি এই শোকসংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হন এবং "Requiescat in pace" ("সে শান্তিতে থাকুক") শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ গুড্-উইনের শোকসন্তপ্তা জননীর নিকট প্রেরণ করেন।

Miss Margaret E. Noble (মিস্ মার-গারেট্ ই নোবল্) লণ্ডন-নগরে স্বামীজির বক্তৃতা এবং বেদান্ত-ক্লাশে উপদেশ শুনিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তখন স্বামিজী মিস্ নোবল্‌কে 'Sister Nivedita' (ভগিনী নিবেদিতা) নাম প্রদান করেন। নিবেদিতা সেই সময় হইতে ভগবচ্চরণে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া স্বামীজি দ্বারা সুশিক্ষিতা হইয়া নিজেকে ভারতসন্তান বলিয়া অনুভব করিতেন এবং ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া হিন্দু নারীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। স্বামীজির উপদেশানুসারে তিনি ভারতে জাতীয় ভাবে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং উত্তর কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সিষ্টার ক্রিশ্চিনের সহযোগে নবপ্রণালীতে মেয়েদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ভগিনী নিবেদিতা ১৫ বৎসর ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার, স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শ প্রচার এবং ভারতের কল্যাণবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ নিয়োগ করিয়া প্রাণাধিকপ্রিয় ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতেই দেহ-ত্যাগ করেন। নিবেদিতার অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ভারতবর্ষীয় সাধনা ও সভ্যতা বিষয়ে প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, গুরুভক্তি, ভারতপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে: "The Master as I saw Him", 'The web of Indian Life'', "Footfalls of Indian History", "Cradle Tales of Hindusthan", "Kali The Mother", "Siva and Buddha", "Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda", "The Civic and National Ideals", "Hints on Education"; "Aggressive Hinduism", "An Indian Study of Love and Death." অক্সফোর্ড (Oxford) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক T. K. Cheyne লিখিয়াছেন, নিবেদিতার "The Master as I saw Him" গ্রন্থখানা নানা ধর্ম্মশাস্ত্রের পরই যত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ আছে তাহাদের ন্যায় অমূল্য, এই গ্রন্থ The Confessions of St. Augustine এবং সেবেটিয়ার প্রণীত Life of St. Francis নামক গ্রন্থদ্বয়ের পার্শ্বে রক্ষিত হইবার যোগ্য।

Mr. E. T. Sturdy (মিঃ ই টি ষ্টার্ডি) স্বামীজির ঘনিষ্ঠ ইংরেজ বন্ধুগণের অন্যতম। তিনি এবং মিস্ মূলার স্বামীজির সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাপ্রণালী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আলমোড়ার নিকট এক পাহাড়ে ধ্যানধারণা করেন। তাঁহার আন্তরিক অনুরোধেই স্বামীজি লণ্ডনে প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। মিঃ ষ্টার্ডি স্বামীজির ইংলণ্ডে প্রচারকার্য্যে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা বিশেষরূপে করিয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে স্বামীজি দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে প্রচারকালে ব্যাখ্যা সহ "নারদীয় ভক্তিসূত্রের" ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। স্বামীজির লণ্ডনে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগ বিষয়ক বক্তৃতাবলী মিঃ ষ্টার্ডিই পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

Miss Henrietta Muller স্বামীজির সঙ্গে পরিচিত হন স্বামীজির প্রথম বার আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রচারকালে। পরে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া স্বামীজির সৎসঙ্গ লাভ করেন। বেলুড় মঠের জন্য ভূমির মূল্য বাবত অনেক টাকা মিস্ মূলার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন বটে, কিন্তু ত্যাগ-বৈরাগ্য, দান এবং পরমেশ্বরের প্রতিই তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। একবার তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু স্বামীজি তাঁহাকে নিষেধ করেন এবং অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকিয়া সমাজের হিতসাধন করিবার জন্য সম্মত করান। স্বামীজির কার্য্যে মিস্ মূলার নানা প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন।

শরৎ

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী

নব নীলবাস পরি
উদার আকাশ
শরৎ-শিশির শুভ্র
রূপে পরকাশ।

বনভূমি পাতি দিল
শ্যাম আস্তরণ,
মধুপ কমলদলে
করে গুঞ্জরণ।

কুল্ কুল্ নদীধারা
অসীমে মিশায়,
দিগ্‌বধূগণ ঘোষে
বরষা বিদায়।

হরিৎ শস্যের ক্ষেত্রে
বোধনের বাণী,
শেফালী শোভায় শোভে
শরতের রাণী

ঐতিহাসিক মহামানব শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীসাহাজী

ভারতযুদ্ধ তিনবার হয়, কৃষ্ণও তিন জন; তন্মধ্যে, প্রথম কৃষ্ণ সহস্রজিতের, দ্বিতীয় জন ক্রোষ্টুর এবং তৃতীয় মাধবের বংশধর। সহস্রজিৎ এবং ক্রোষ্টু উভয়েই যযাতির পৌত্র। যযাতি চন্দ্রবংশীয়; সুতরাং প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় কৃষ্ণই চন্দ্রবংশীয়। কিন্তু মাধব হর্যশ্বের পৌত্র। হর্যশ্ব সূর্যবংশীয়: সুতরাং তৃতীয় কৃষ্ণ সূর্যবংশীয়। এ কথা অবশ্য সত্য যে, তাঁহাদের তিন জনেরই জন্ম যদুর বংশে। কেন না, সহস্রজিৎ এবং ক্রোষ্টু যেমন যযাতিনন্দন, মাধব আবার তেমনি হর্যশ্বনন্দন যদুর পুত্র। (৬-১৫।৪ বিষ্ণু, ১০-৩৯ হরি, ৩৭-৩৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)।

তিন কৃষ্ণেরই পিতার নাম বসুদেব, তবে প্রথম দুই জনের পিতামহের নাম শূর হইলেও তৃতীয় জনেরই পিতামহ ছিলেন বসু। (৩৪ হরি, ৩৮ বিষ্ণু, হরিবংশ; ১৪।৪ বিষ্ণু)। মাতার নামও তিন জনেরই দেবকী; তন্মধ্যে, প্রথম কংসের পিতৃস্বসা। (৪, ২২, ২৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংসের ভগিনী। (১৪।৪ বিষ্ণু, ১ বিষ্ণু, হরিবংশ)।

কৃষ্ণ যেমন তিন জন, কংসও তেমনি তিন জন, আবার জরাসন্ধও তেমনি তিন জন। প্রথম কৃষ্ণ প্রথম কংসের পিতৃস্বস্রেয়। (২২, ২৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় কৃষ্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংসের ভাগিনেয়। (১৪।৪ বিষ্ণু, ১ বিষ্ণু, হরিবংশ)। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংস আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় জরাসন্ধের জামাতা; তন্মধ্যে দ্বিতীয় কংসের মহিষীদের নাম সহদেবা ও অনুজা। (১৪ সভা, মহাভারত)। তৃতীয় কংসের মহিষীদের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। (৩৪ বিষ্ণু, হরিবংশ; ৫০।১০ ভাগবত, ২৩।৫ বিষ্ণু)। কিন্তু প্রথম কংস প্রথম জরাসন্ধের জামাতা কি না জানা যায় না। জামাতা বা হইলেও তিনি যে তাঁহার একান্ত অনুগত, সে কথা আশা করি না বলিলেও চলে। ভীষ্মক, আহ্বৃতি এবং জরাসন্ধের প্রশ্রয় পাইয়াই যে ঐ কংস তাঁহার পিতাকে বন্দী করিয়া নিজেই রাজা হইয়া বসেন। হরিবংশে (১০১) এবং বিষ্ণু-পুরাণে সেকথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম কৃষ্ণ যেমন বৃহদ্বনের, প্রথম কংস তেমনি শূরসেনের: দ্বিতীয় কৃষ্ণ যেমন কুশস্থলীর, দ্বিতীয় কংস তেমনি ভোজরাজের। পক্ষান্তরে, তৃতীয় কৃষ্ণ যেমন দ্বারবতীর, তৃতীয় কংস আবার তেমনি মথুরার অধিপতি। (৩৫, ৫৪, ৫৫ হরি; ১, ৩৪ বিষ্ণু, হরিবংশ: ১৪১ সভা, মহাভারত; ১, ৮৩।১০, ১২।১২ ভাগবত; ১,২৩।৫ বিষ্ণু)। ইহাদের মধ্যে বৃন্দাবন বৃহদ্বনের, পুরী কুশস্থলীর এবং দ্বারকা দ্বারবতীর বর্তমান নাম।

শূরসেন এবং মথুরা পাশাপাশি রাজ্য। বৃহদ্বন খুব সম্ভব পূর্বে শূরসেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে উহা মথুরার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং খুব সম্ভব তখনই উহা বৃন্দাবন-খ্যাতি লাভ করে। সুতরাং প্রথম

কৃষ্ণের আমলে শূরসেনের যে স্থান তৃতীয় কৃষ্ণের আমলে মথুরারও ঠিক সেই স্থান। জরাসন্ধ-ভয়ে দ্বারকায় গিয়া বাস করেন তৃতীয় কৃষ্ণ : কিন্তু প্রথম কৃষ্ণ 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য কচিন্নৈব স গচ্ছতি' —কাজেই কৃষ্ণ জরাসন্ধ-ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারবতীতে গিয়া বাস করেন, এই যে উক্তি ইহা তৃতীয় কৃষ্ণ-সম্পর্কীয়। প্রথম কৃষ্ণের আমলে মথুরা লবণদৈত্যের অধীন, উহার নাম তখন মধুবন, পরে উত্তররাম এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণের আমলে উহা মানবজাতির অধিকার-ভুক্ত হইয়া মথুরা-খ্যাতি লাভ করে। (৫৪ ৫৫ হরি : ৩৭-৩৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)। মথুরা পরিত্যাগ-পূর্বক দ্বারবতীতে গিয়া বাস করার কথা প্রথম কৃষ্ণের সম্পর্কে সেইজন্যই খাটে না।

নৃপতিসূর্য জরাসন্ধ আর্যাবর্তের একচ্ছত্র সম্রাট ; ক্রথ ও কৈশিক দেশ জয়ী ভীষ্মক সমগ্র পৃথিবীর (উত্তরভারত) একচতুর্থাংশের অধিপতি ; তাঁহার ভ্রাতা আহ্বৃতি পরশুরামতুল্য তেজস্বী। (১৪ সভা মহাভারত)। কংস তাঁহাদের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ। সহায়সম্পদহীন শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র আত্মশক্তি-প্রভাবে উঁহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া বৈদিক সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের উন্নতির উহাই সূত্রপাত। সুতরাং ইহা তাঁহার সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়।

অল্পবীর্য ইন্দ্রাদি দেবগণকে পর্যুদস্ত করা খুব সম্ভব হয় এবং তৃতীয় কংসের কীর্তি (৪।৫ বিষ্ণু) চক্রমুসলযুদ্ধে দেবাসুরগণ যে দ্বিতীয় কৃষ্ণের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হন, তাহা সেই জন্যই অন্যায় নয়। (৩৯-৪৩ বিষ্ণু, হরিবংশ)। স্বর্গ-বিজয় এই হেতু অনুমিত হয় প্রথম কংসের কীর্তি নয়। কেন না পরস্পর আত্মকলহে দুর্বল হইয়া পড়িলে দেবতারা তখন মানবজাতির কুক্ষিমধ্যে গ্রহণ করেন; ইহা পৌরাণিক সত্য। তন্মধ্যে আশ্রয় দেবতারা মানব-সভ্যতার পক্ষপাতীদের, পক্ষান্তরে অসুরেরা ঐ সভ্যতার বিরোধীদের দলপুষ্টি করেন। সুতরাং আদৌ দেবতা এবং অসুরগণ যে মানবজাতির প্রধান অংগ ছিলেন সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, মানব দেবাসুরের মিলনভূমি এই উক্তি সেইজন্যই মিথ্যা বলা যায় না। বলা বহুল্য, দেব (সুর) এবং অসুর একই জাতির দুইটি সম্প্রদায় (৩১ বায়ু) প্রথম কংস এবং প্রথম কৃষ্ণ উভয়েই কলিযুগের গোড়ার লোক ; কিন্তু ২য় ও ৩য় কংস এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কৃষ্ণ পূর্ণ কলিযুগের লোক। কলিযুগে দেবতারা অন্তর্ধান করেন, ইহা সর্বজনবিদিত সত্য। পরবর্তী যুগের পতনোন্মুখ দেবতাদিগকে পর্যুদস্ত করা এবং তাঁহাদের নিকট হইতে আশাতীত সাহায্য লাভ করা পরবর্তী কংস এবং পরবর্তী কৃষ্ণের পক্ষে সেইজন্যই অসম্ভব নয়। কৃষ্ণের বিরাট অভ্যুদয়ের পথে সহায়তা করা দেবগণের পক্ষে সে সময়ে খুবই স্বাভাবিক। কেন না যে অখণ্ড মানবজাতির প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণ প্রাণপণ করেন, তাহা যেমন বেদমূলক, দেবতাদের যে সমাজ তাহাও তেমনি বেদমূলক। বৈদিক সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠাই করেন দেবপিতা ব্রহ্মা। মানবী সভ্যতা দৈবী সভ্যতারই দুহিতা। দেবপিতা ব্রহ্মার অন্য নাম তাই লোকপিতামহ। এরূপ অবস্থায় সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া কৃষ্ণের সহিত সহিত তাঁহাদের যতই বিবাদ হউক, মোটামুটি কৃষ্ণের যে তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন সে কথা মিথ্যা নয়। উষার দূতী চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে বাণরাজ্যে হরণপূর্বক লইয়া গেলে সেনাপতি অনাবৃষ্টি যখন ঐ কার্য দেবতাদের বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, লোকচরিত্রজ্ঞ কৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "তাত, এরূপ বাক্য মুখেও আনিবেন না। নীচ কার্য করা দেবতা-দের স্বভাব নয়। তাঁহারা মহাত্মা সত্যশীল

এবং ভক্তের নিত্য ইষ্টসাধক। আমার মনপ্রাণ তাঁহাদিগের মধ্যেই পড়িয়া আছে। কথা জানিয়াও তাঁহারা কি কারণে আমার অনিষ্ট করিবেন?" (১২০, বিষ্ণু, হরিবংশ)। উভয় পক্ষের মধ্যে কী যেন বাধ্যবাধকতা ছিল, ইহা হইতেই সে কথার প্রতিপন্ন হয়। দেবতারা পরম বিচক্ষণ ছিলেন; তাঁহারা বুঝিতেন, উত্থানপতন জগতের নিয়ম; কাজেই তাঁহাদের পতন হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের কৃষ্টির যেন পতন না হয়। মানবগণের সহিত তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিবাদ বিসংবাদ যতই হউক, তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের কৃষ্টি-রক্ষার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে সেইজন্যই তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই এবং অধিক কী, পরিশেষে তাঁহারা মানবজাতিরই কক্ষিমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মর্ত্যের অমরাবতী কুশস্থলী (পুরী) এবং দ্বারবতী (দ্বারকা) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কৃষ্ণের রাজধানী। (৩৫, হরিবংশ; ১৪, সভা মহাভারত; ৮৩।১০, ১২।১২ ভাগবত; ২৩।৫ বিষ্ণু)। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্মা ঐ দুইটি পুরী নির্মাণ করিয়া দেন। (৫৮,৯৮, বিষ্ণু, হরিবংশ)। সর্বজাতির উপযোগী করিয়া মানবী সভ্যতার যে পরিকল্পনা (উহারই নাম বেদ) ব্রহ্মা করিয়াছিলেন, যাহার বাস্তব রূপ দিতে গিয়া স্বয়ং বিষ্ণু এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ পর্যন্ত হিমসিম খাইয়া গিয়াছিলেন, মর্ত-মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার সেই স্বপ্ন তিনি মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন. তাঁহারই রাজ-ধানী বিশ্বকর্মা যে দ্বিতীয় অমরাবতীতুল্য করিয়া গড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় নয়। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার—

আসিলাম দ্রুতগতি ইন্দ্রের আদেশে,
ধৃতব্রত বিষ্ণু তুমি, আমি তব দাস,
কী আদেশ মম প্রতি কহ শ্রীনিবাস।
মান্য মোর ইন্দ্র আর শংকর যেমতি,
হে কেশব। মান্য মোর তুমিও তেমন,
জানি আমি অভেদ তোমরা তিনজন।
শ্রীমুখের বাণী তব ওগো মহাভুজ!
ত্রৈলোক্যেরে পারে আজ্ঞা করিতে প্রদান,
আজ্ঞা কর, কর, কার্য তব করিব বিধান।
(৫৮, বিষ্ণু, হরিবংশ)

ইত্যাদি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কর্ণকৃত ঘটোৎকচনিধনের পর অর্জুনকে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তির দ্বারা ঘটোৎকচকে সংহার না করিতেন, তাহা হইলে আমাকেই উহার বধোপায় করিতে হইত। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক এবং পাপাত্মা, সুতরাং অবশ্য বধ্য। আমি ধর্মসংস্থাপনের জন্য এরূপ দৃঢ়তর পণ করিয়াছি যে, যাহারা ধর্মনাশক, তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। (১৮২ দ্রোণ, মহাভারত)। সুতরাং এহেন মহাপুরুষকে—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

বলিয়া আভূমিনত হইয়া প্রণাম করিলে সেই জন্যই তাহা অন্যায় হয় না।

কংশবধের পর সমগ্র রাজ্য তাঁহার করতল গত হয়; কিন্তু তথাপি উহা তিনি নিজে গ্রহণ না করিয়া নিহত কংসের পিতা উগ্রসেনকেই প্রদান করেন এবং স্বয়ং তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিয়া রাজ্যের সর্ববিধ উন্নতিসাধনে মনোযোগী হন। সুতরাং বলা যাইতে পারে, তিনি রাজা হন নাই বটে, কিন্তু কার্যতঃ রাজারও রাজা হইয়াছিলেন: অথচ দেখা যায়, কোন দেশের রাজা নন বলিয়া রুক্মিণীস্বয়ংবরে রাজন্যসমাজে তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয় না। ইহাতে তিনি অতিমাত্র অপমানিত হন। ফলে স্বর্গ হইতে সমাগত দেবদূত তখন সমবেত

রাজন্যগণের সমক্ষে তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রেরিত সিংহ-চিহ্নিত আসনে সর্বভারতের রাজচক্রবর্তিপদে অভিষিক্ত করেন। (৫০ বিষ্ণু, হরিবংশ)। পরবর্তী যুগে রাজারা যে সিংহচিহ্নিত আসনে বসা গৌরবের বিষয় বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করেন, মনে হয় উহা হইতেই তাহার সূত্রপাত।

অলকাপুরী হইতে নির্বাসিত, বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষজাতির মধ্যে আত্মগোপনকারী কুবেরপুত্রদ্বয়কে (নলকূবর ও মণিগ্রীব-যমলার্জুন) যিনি নিজপ্রভাবে তাঁহাদের স্বপুরীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (৯-১০।১০ ভাগবত, ১৪ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত ৭ ; বিষ্ণু, হরিবংশ)। তাঁহারই প্রজাদের অভাবমোচনের জন্য নিধিপতি শংখ যে কুবেরের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা খুব বেশী কথা নয়। (৫৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)। কিন্তু দেবরাজ বায়ু যে তাঁহার নির্দেশে ইন্দ্রের সমগ্র সুধর্মা সভাই তাঁহার পুরীতে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই সমধিক আশ্চর্যের কথা। (৫৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)। বলা বাহুল্য ঐ সভা ব্যবহারজ্ঞ দেব, শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি এবং সংগীতজ্ঞ গন্ধর্ব প্রভৃতি কর্মী জ্ঞানী এবং গুণীদের একত্র সমাবেশ। (৭ সভা, মহাভারত)। পুরাণে (৩৬, ব্রহ্মাণ্ড) দেখা যায়, ঐ সভায় ব্রহ্মা রুদ্র মরুৎ বসু আদিত্য পক্ষীন্দ্র গন্ধর্ব অপ্সরা নাগ সাধ্য ঋষি ও পিতৃগণ অবস্থান করিতেন এবং পারিজাতেরা মণ্ডলাকারে বেষ্টন পূর্বক উহার দ্বার রক্ষা করিতেন। কৃষ্ণ যে কীরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তৎকর্তৃক আনীত এই সুধর্মা সভাই তাহার প্রমাণ। কৃতিত্বসম্পন্ন শুধু ঐ সকল মহাত্মাই নন, এমন কী, স্বর্গের অপ্সরারাও তাঁহার বীরত্ব এবং ঔদার্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতী পরিত্যাগ পূর্বক পরিশেষে তাঁহারই নিরাপদ আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। (৮৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)। দেবতারা কখন এবং কেমন করিয়া সহিত মিশিয়া অভেদ হইয়া গিয়াছিলেন সে কথা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

দেবতাদের নয়টি সম্প্রদায় :— দেব দৈত্য নাগ পক্ষী যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব পিশাচ ও পিতৃগণ। (৩১ বায়ু, ৩২ ব্রহ্মাণ্ড)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দৈবী সভ্যতার পতন হইলে ইঁহাদের অধিকাংশ সম্প্রদায়ই তখন মানবী সভ্যতার উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া মানবজাতির কুক্ষিমধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু নাগেরা ঐ প্রকার সমন্বয়ের বিরোধী হইয়া দাঁড়ান। খাণ্ডবদাহনে কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক এবং নাগযজ্ঞে কৌরব জনমেজয় কর্তৃক তাঁহাদের উৎসাদন তাহারই ফল। (৪১-৫৮ আদি, মহাভারত)। উৎপীড়িত নাগদের মধ্যে যাঁহারা গভীর অরণ্যে পলাইয়া যান বর্তমান নাগগণ তাঁহাদেরই বংশধর। মহাভারতের সর্পরাজ নহুষও অনুমিত হয় তাহাদেরই একজন। বনবাসকালে জলান্বেষণে পাণ্ডবেরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহারা যে তখন তাঁহারই রাজ্যমধ্যে গিয়া উপস্থিত হন, তাহা স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায়, খাণ্ডব-দাহনের নায়কদিগকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া সর্পরাজের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তখন যে তাঁহাদিগকে তিনি বন্দী করিয়া রাখেন, তাহা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাব-দর্শনে অতঃপর তিনি এতই মুগ্ধ হন যে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে সসম্মানে মুক্ত করিয়া দেন। (১৭৬-১৮১ বন, মহাভারত)। তাঁহার কৃত এই উপকারের কথা মহানুভব যুধিষ্ঠির ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই এবং কীরূপে তাঁহাকে মানব-সমাজে পাঙ্‌ক্তেয় করিয়া লওয়া যায় তাহারই উপায় খুঁজিতে থাকেন। (১০০ অনু, মহাভারত)। তিনি বুঝিতে পারেন, দেবগণের সম্মতি ভিন্ন

ঐরূপ হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু দেবগণকে একত্র সমবেত করা সহজ কথা নয়; তবে, তাঁহারা যেরূপ সহৃদয় তাহাতে নরমেধযজ্ঞের আয়োজন করিলে ঐ বধ্য নরের জীবনরক্ষার্থ ঐ যজ্ঞসভায় আগমন করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। উহাই তাঁহাদিগকে একত্রিত করিবার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়। নহুষের পুত্র সর্পরাজ যযাতি কর্তৃক নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন তাহারই ফল। ঐ উপায়েই সহৃদয় দেবগণকে একত্র সমবেত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সর্পরাজ নহুষের শুদ্ধিকার্য সর্ববাদিসম্মত করাইয়া লওয়া হয়। দেখা যায়, কৃকলাস-জাতীয় নৃপকেও কৃষ্ণ ঐ ভাবেই মানবসমাজে পাঙক্তেয় করিয়া নেন। (৬৭।১০ ভাগবত; ৭০ অঃ, মহাভারত)। যাহা হৌক, পৌরাণিক ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া মহামানব শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়া চাতুর্বর্ণ্য-সমন্বিত এক অখণ্ড মানবজাতির সৃষ্টি করেন, সর্পরাজ নহুষের কাহিনী হইতেই আমরা তাহার আভাস পাই। এক অখণ্ড মহাভারত প্রতিষ্ঠার এই অপূর্ব কৃতিত্ব তাঁহারই। তাঁহার গীতোক্ত 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' বাক্যটি সেইজন্যই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পৌরাণিক ভারতের পরস্পর বিবদমান দেব-দৈত্য, নাগপক্ষী, যক্ষ-রক্ষ, সিংহ-মহিষ, ব্যাঘ্র-হরিণ, নর-বানর, জম্বুক-ভল্লুক, শ্যেন-কপোত, অভিবক, অহি-নকুল, গজ-কচ্ছপ, মৎস্য-কূর্ম, মীন-মকর এবং কৃকলাস ভ্রমর প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া চতুর্বর্ণ-সমন্বিত এক অখণ্ড মানবজাতির সৃষ্টি করা অল্প কৃতিত্বের কথা নয়।

কথিত আছে শাম্বের কুষ্ঠব্যাধি হইলে দৈবী চিকিৎসায় তাহা নিরাময় হইতে পারে বুঝিয়াই কৃষ্ণ সূর্যদেবকে সসম্মানে নিজরাজ্যে লইয়া আসেন। (১০১ প্র, প্রভাস স্কন্দ)। কোনারকের সূর্যমন্দির ঐ ঘটনার নিদর্শন-স্বরূপ আজিও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজধানী কুশস্থলী বা পুরীর যে উহা অদূরবর্তী সে কথা আশা করি বলাই বাহুল্য। দেবতারা কখন এবং কেমন করিয়া মানবজাতির সহিত মিশিয়া যান, ইহা হইতেই সে কথা প্রতিপন্ন হয়।

শুধু ঐ পর্যন্তই নয়, যে ছালিক্যসংগীত গন্ধর্ব এবং মহর্ষি ভিন্ন অন্যের আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য ছিল, যাদবেরা তাঁহারই চেষ্টায় সেই দুরূহ সংগীত আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রতুল্য রাম কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন শাম্ব এবং অনিরুদ্ধ এই পঞ্চ জন ছালিক্য-সংগীত আরম্ভ করিলে তাহা সকল সময়েই মনুষ্যের মনোহরণ করিত। অনেক সময়ে স্বর্গের অপ্সরাগণও নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার রাজসভায় আসিয়া নৃত্যগীতাভিনয়ে সকলকে আনন্দিত করিয়া যাইতেন। (৮৮-৮৯ বিষ্ণু, হরিবংশ)। কোনও সময়ে দেবর্ষি নারদকে পর্যন্ত উচ্চসংগীত শিক্ষার জন্য তাঁহার মহিষী সত্যভামার সাকরেদি করিতে হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ যে শুধু অদ্বিতীয় বীর ছিলেন তাহা নয়, নৃত্য গীত এবং শিল্পকলাতেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজধানী দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এরূপ সুকৌশলে নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, উহাতে থাকিয়া বৃষ্ণিবীরগণের ত কথাই নাই, এমন কী বৃষ্ণিস্ত্রীগণও শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিতেন। স্বর্গ মর্ত্য এবং পাতালে (সমুদ্ররাজ্য) সে সময়ে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যাইত, তৎসমুদয় আহরণ করিয়া ঐ পুরীকে তিনি নিজের প্রমদার ন্যায় অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনীতি-জ্ঞান

যেমন গভীর, রাজ্যশাসনের ব্যবস্থাও তেমনি সুন্দর ছিল। রাজ্যশাসনের জন্য তিনি মর্যাদাবিভাগ, প্রকৃতিবিভাগ, সৈন্যাধ্যক্ষবিভাগ, কর্মচারিবিভাগ এবং প্রজানায়কবিভাগ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি উগ্রসেনকে রাজা, সান্দীপনিকে পুরোহিত, অনাধৃষ্টিকে সেনাপতি, বিকদ্রুকে মন্ত্রী, দারুককে সারথি, সাত্যকিকে নেতা এবং দশ জন যদুবৃদ্ধকে সর্বকার্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ দশজনের নাম, যথা: উদ্ধব, বাসুদেব (কৃষ্ণ স্বয়ং), বলভদ্র, কংক, পৃথু, বিপৃথু, শ্বফল্ক, চিত্রক, গদ এবং সত্যক। (৫৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)। বলভদ্র, সাত্যকি, কৃতবর্মা, নিশঠ, বভ্রু, উৎকল, সারংগ, শারণ, বিপৃথু এবং উদ্ধব, এই দশজন মহাবীর তাঁহার পার্শ্বচর ছিলেন। (১৮৮ ভবিষ্য, হরিবংশ)। গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অগাবহ, অনিরুদ্ধ, চারুদেষ্ণ, শারণ, উল্মুক, নিশঠ, ঝিল্লীবভ্রু, পৃথু, বিপৃথু, শমীক এবং অরিমেজয়, ইঁহারা এরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন যে, ভারতযুদ্ধকালে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ইঁহাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়া বহু দিন যাবৎ রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। (১১ দ্রোণ ; ২২১ আদি, মহাভারত)।

তাঁহার শুধু যে চতুরংগ সৈন্যবল ছিল তাহা নয়, পঞ্চমবাহিনীরও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। দৈত্যরাজ বজ্রনাভের বজ্রপুর রাজ্য এরূপ দুর্ভেদ্য ছিল যে, স্বয়ং বায়ুরও উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু পঞ্চমবাহিনীর সাহায্যে যে ভাবে ঐ রাজ্যটি তিনি অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। (৯২-৯৭ বিষ্ণু, হরিবংশ)।

সে সময় পার্লিয়ামেণ্টারি প্রথারও প্রবর্তন হইয়াছিল এবং তখনও এখনকারই মতন রাত্রিতেই উহার অধিবেশন হইত। বসুদেব সন্তান-পরিবর্তন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া কংস অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হন এবং মধ্যরাত্রে সমস্ত মথুরাপুরী নিঃশব্দ হইলে (২২, বিষ্ণু হরিবংশ) যদুমুখ্যগণকে লইয়া মন্ত্রণাসভা করেন। ঐ সভায় উগ্রসেন, দেবতুল্য বসুদেব, সত্যক, কংক ও তাঁহার কনিষ্ঠ দারক, ভোজ বৈতরণ ভয়াসথ, বিকদ্রু, বিপৃথু, দানপতি বভ্রু (অক্রূর), কৃতবর্মা এবং ভূরিশ্রবা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। (২২ বিষ্ণু, হরিবংশ ; ১৪ সভা, মহাভারত)। আবার দেখা যায়, কৃতবর্মা, অনাধৃষ্টি শমীক, সমিতিঞ্জয়, কংক শংকু ও কুন্তি এই সাত জন মহারথ, অন্ধক ভোজের দুই পুত্র এবং রাজা এই দশজন মহাবীর বাহদ্রথ জরাসন্ধের ভয়ে একত্র মিলিত হন। কৃষ্ণের মহারথ যেমন সাত জন, রথীও তেমনি সাত জন। তাঁহারা চারুদেষ্ণ, চক্রদেব, সাত্যকি, বাসুদেব (কৃষ্ণ স্বয়ং), বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন এবং শাম্ব। কৃষ্ণের অতুলনীয় প্রভাব ইহা হইতেই অনুমান করা যায়।

উইলিয়ম বেনেট মুনরো তাঁহার "The Government of Europe গ্রন্থে লিখিয়াছেন: Civilised man has drawn his religious inspiration from the East, his alphabet from Egypt, his algebra from the Moors, his sculpture from Greece and laws from Rome But his political organisation he owes mostly to English conceptions. The British constitution is the mother of constitutions, the British Parliament is the mother of Parliaments." কিন্তু মুনরোর এই গর্বোক্তি যে কত অসার, কৃষ্ণের জীবনীপাঠে আমরা তাহা বুঝিতে পারি

প্রেমাশ্রু

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

ভক্ত-সাধক ভাবমুখে গাহিয়াছেন :

'তুমি যারে ভালবাস,
ভালবাস তাঁর আঁখিজল।
তাই তব পূজা তরে
করিয়াছি উহাই সম্বল।'

ইহার ভাবার্থ এই যে, কাহারও চোখে জল আসিলেই যে ভগবান তাহাকে ভালবাসেন তাহা নহে, তাঁহার কথা ভাবিয়া—তাঁহাকে চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগে যদি কোন ভাগ্যবান ভক্তের প্রেমাশ্রু বাহির হয়, তাহা হইলেই তিনি সেই ভক্তকে ভালবাসেন। ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণে প্রেমাশ্রু বাহির হইবার মত মানসিক অবস্থা না হইলে ভক্ত তাঁহার ভালবাসা পায় না অথবা অনুভব করিতে পারে না। এই জন্য ভক্ত বলিতেছে—হে ভগবান, তুমি যাহাকে ভালবাস, তোমার প্রতি তাহার ঐকান্তিক ভালবাসাজনিত প্রেমাশ্রুকেও তুমি ভালবাস। এই কারণে ভগবানের প্রতি ভক্তের ঐকান্তিক ভালবাসা-সঞ্জাত প্রেমাশ্রুই তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ।

সংসারে দুঃখের আঘাতে অনেক সময় চোখে জল আসে, লোকে ভগবানকে বিপদবারণ, অনাথশরণ, মধুসূদন প্রভৃতি বলিয়া ডাকে; কিন্তু দুঃখ কাটিয়া গেলে তাঁহাকে ভুলিয়া যায়। ইহাও দেখা যায় যে, অত্যন্ত অভাবে বা বিপদে পড়িলে কোন কোন ঈশ্বর-বিশ্বাসীর চোখে এই ভাবিয়া জল আসে যে, 'হে ভগবান, তোমাকে এত ডাকিলাম, তথাপি আমার এমন হইল কেন?' অথবা এরূপও দেখা যায় যে, কোন ঈশ্বর-বিশ্বাসী প্রাণে কোন আঘাত পাইল, তাহার চোখে জল আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে যে দুঃখ দূর হইতে পারে তাহাও মনে হইল। এই দুই প্রকার ভক্তিকেই আর্তভক্তি বলা যায়। এতদ্ভিন্ন ভগবানের প্রতি কতকটা আকর্ষণ জন্মিয়াছে, কিন্তু চোখে জল আসে এতটা আকর্ষণ তাঁহার প্রতি হয় নাই, অথচ নানা উপচার এবং মন্ত্রাদি সহায়ে ভক্ত নিয়মিত ভাবে ভগবানের পূজাদি করে, ইহাই বৈধী ভক্তি। ভক্তিশাস্ত্রমতে এই উভয়বিধ ভক্তি প্রকৃত ভক্তির সোপান মাত্র। কাজেই কেবল এইরূপ ভক্তিদ্বারা ভগবান লাভ হয় না।

যে ভক্ত ভগবান ভিন্ন জগতে আর কিছুই চায় না, একমাত্র তাঁহাকেই পরম প্রেমাস্পদ মনে করে, ভালবাসার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসে, প্রতিদানে তাঁহার নিকট কিছুই চায় না, তাঁহার কথা মনে হইলেই তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ-জনিত অনুরাগে যাহার প্রেমাশ্রু বহির্গত হয়, এইরূপ ভক্তের প্রেমাশ্রুই ভগবানের পূজার সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। ভক্তি-শাস্ত্রমতে ইহাই রাগানুগা ভক্তি। এই ভক্তির উদয়ে বৈধ পূজাদি বিলুপ্ত হয় এবং ইহাদ্বারা ভগবান লাভ হইয়া থাকে।

বাংলা সাধন-সঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌, বি-এস্‌সি

বাংলাদেশে কোন দিনই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের আদর হয় নাই, বাঙ্গালী শ্রোতা উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী গানের রসগ্রহণ করিতে পারেন না— এই প্রকার বিশ্বাস উত্তর ভারতের সঙ্গীত-গুণী বা ওস্তাদদের চির দিনই আছে। হিন্দুস্থানী গানের সুর অপেক্ষা তাহার ভাষার অবোধ্যতাই আমাদের রসগ্রহণের অন্তরায়।

যে গানের ধারার সহিত বঙ্গবাসী অতি-পরিচিত, তাহা কাব্যসঙ্গীত। এই গানে কাব্যকে, ভাবময় বাণীকেই রূপায়িত করিতেছে সুর। হিন্দী গানের ন্যায় কেবল সুরের প্রকাশই এইখানে লক্ষ্য নয়; ভাবগর্ভ কল্পনার, অনুভূতির প্রকাশই বাংলার কাব্যসঙ্গীতের উদ্দেশ্য। এই কাব্য-সঙ্গীতের একটি ধারা আমাদের ভগবদনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছে; তাহাকেই সাধন-সঙ্গীত বলা হইতেছে।

পশ্চিম-দেশের ভজনগানও সাধনসঙ্গীত। সুরদাস মীরাবাঈ কবীর নানক তুলসীদাস প্রভৃতির ভজনগানে যে বিশুদ্ধ সুররূপটি আছে, আমাদের সাধনসঙ্গীতে তাহা নাই। এই গানগুলির সুর সম্পূর্ণ স্বদেশীয়; বাংলার নিজস্ব বাউল কীর্ত্তন রামপ্রসাদী দেহতত্ত্ব প্রভৃতির সুরের সৃষ্টিও হইয়াছে কেবলমাত্র এই সাধন-সঙ্গীতের জন্যই।

গভীর আর্ত্তি, হৃদয়ানুভূতি, ভগবৎপ্রাপ্তির তৃষ্ণাপ্রকাশই এই শ্রেণীর গানের উদ্দেশ্য। সুরের কৌশল, তালের দায়িত্ব, রাগিণীর বৈচিত্র্য প্রদর্শন প্রভৃতি সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক রূপটি যত দূর সম্ভব এড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বাংলাদেশের চিরন্তন রূপটি বৈরাগীর। আমাদের দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক factor প্রায় সবই আমাদের করিয়া রাখিয়াছে অনাসক্ত; সাংসারিক বন্ধনের মধ্যেও আমাদের মুক্তির সাধনা। বাংলা দেশের কাব্যে এবং সঙ্গীতে সেই বৈরাগ্যেরই ছায়াপাত।

চর্য্যাপদের যুগ হইতে আধুনিক ব্রাহ্মযুগ পর্য্যন্ত বাংলার গান, তাহার ধর্ম্মজীবনেরই সাধনা। আমাদের এই সকল কবিই সাধক; কাব্য এবং সঙ্গীত তাঁহাদের সাধনারই অঙ্গ। কেবল কাব্যসঙ্গীতই নয়, বাংলার লোকসঙ্গীত, তাহার পল্লীর সাধারণ জীবনের গানও এই সাধনার বহির্ভূত নয়। বোধ হয় নাগরিক জীবনের সাহিত্য অপেক্ষা তাহাদেরই গানে এই সংসার-বৈরাগ্য, এই আসক্তিশূন্য মনো-ভাবের প্রকাশ আরও সুস্পষ্ট।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এমন অনেক বাউলের গান শুনেচি, ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায় সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেম্‌নি কাব্যরচনা, তেম্‌নি ভক্তির রস মিশেচে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্ব্বতা আর' কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করিনে।"

এই সকল গান তো কেবল সুরসাধনাই নয়, এইগুলি যে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাস। চর্য্যাপদ প্রাচীন বাঙ্গালী বৌদ্ধগণের ধর্ম্মসাধনার গান; চর্য্যাগানগুলিতে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন পূজন-আরাধনের গূঢ় তথ্যগুলি ঠারে ঠোরে বলা হইয়াছে—সাধারণ শ্রোতার নিকট

এইগুলি ইন্দ্রিয়সাধনার গান, কিন্তু ভক্তিসাধনার গান ভিক্ষুগণের নিকট। অবশ্য ক্রমেই সেই সময়ের বৌদ্ধসাধনা বিকৃত, রূপান্তরিত হইতেছিল।

বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গান কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনার গান নয়। বড়ু চণ্ডীদাস গ্রাম্য 'কৃষ্ণ-ধামালী' নামক এক প্রকার গ্রাম্য ঝুমুর গানের ধারায় তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" রচনা করিয়া-ছিলেন। বিদ্যাপতি এবং জয়দেব রাজমনো-রঞ্জনের জন্য তাঁহাদের গান গাহিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে আমাদের দেশের বৈষ্ণবগান সাধারণ প্রেমেরই গান—এইগুলির মধ্যে ধর্ম্মসাধনার কিছুই নাই; অবশ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আস্বাদ করিয়া এইগুলিকে আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' বলা হইয়াছে—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

সুতরাং এই চৈতন্যপূর্ব্ব যুগের গানগুলিও আমাদের ধর্ম্মসাধনার অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিতা মহাজন-পদাবলী। এই কবিরা কেবল সুরই সৃষ্টি করেন নাই, সুরের মধ্য দিয়া সাধনাও করিয়া-ছেন। তবে ক্রমশই শ্রীচৈতন্যদেবই তাঁহাদের উপাস্য হইয়া উঠিলেন। এই যুগের সৃষ্টি "গৌরপদাবলী"—গৌরগীতিকাই এই যুগের সাধন-সঙ্গীত। সাধক কবি লোচনদাসই এই গৌরপদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি। অনেক পদে রহস্যময়ী ভাষায় তিনি লোকোত্তর ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"আর এক নাগরী বলে এ দেশে না রবো।
রসের মালা গলায় দিয়ে দেশান্তরী হবো॥
এ দেশে ত কবাট দিলে সে দেশ ত পাই।
বাহির গায়ে কাজ নাই সই ভিতর গায়ে যাই॥
সাপের মণি বার করলে হারাই যদি মণি।
মণিহারা হলে তবে না বাঁচয়ে ফণী॥
যতন ক'রে রতন রাখা বাহির করা নয়।
প্রাণের ধনকে বার করিলে চৌকি দিতে হয়॥
লোচন বলে ভাবিস্ কেনে ঢোক আপনার ঘর।
হিয়ার মাঝে গোরাচাঁদে মন ভুলায়ে ধর॥"

রামপ্রসাদ তাঁহার গানের দ্বারা সাধন-সঙ্গীতের অপর একটি ধারার সূত্রপাত করিলেন। ভগবানকে তিনি মাতৃরূপে আরাধনা করিয়াছেন; বাৎসল্য এবং প্রতিবাৎসল্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে রামপ্রসাদী গানে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৃহস্থের দৈনান্দন সাধনায় শ্যামা মায়ের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। নানা তুচ্ছ বিষয়ের মধ্য দিয়া তিন গভীর ইঙ্গিত করিয়াছেন:

"শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি (ভবসংসার
বাজার মাঝে)
আশাবায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়াদড়ি॥
কাক গণ্ডি মণ্ডী গাথা পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা কর্কশা হ'য়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষের দুটা একটা কাটে, হেসে
দাও মা হাত চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড় যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়া তাড়াতাড়ি॥"
(একতালা)

রামপ্রসাদের পর কমলাকান্ত শ্যামাসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার। তিনি তাঁহার সাধন-সঙ্গীতে উচ্চাঙ্গ বৈঠকী সুর ব্যবহার করিয়া সঙ্গীতের মানোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ-প্রবর্ত্তিত বিচিত্র সুরেই অবশ্য শ্যামা-সঙ্গীতের প্রকাশ সাধারণতঃ। কমলাকান্তের নিম্নের গানটি সিন্ধু এবং খাম্বাজ রাগিণীর মিশ্রণে মাত্রার যৎ ছন্দে রচিত—

"মজলো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীল
কমলে।
(শ্যামাপদ নীলকমলে, কালীপদ নীল
কমলে)—আথর
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো, কামাদি কুসুম
সকলে॥
চরণ কাল ভ্রমর কাল কালয় কাল মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তেরি মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে
(তায়) সুখ দুখ সমান হ'ল আনন্দ-সাগর
উথলে॥"

মুসলমান কবিরাও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিতেন।

শ্যামাসঙ্গীতের ন্যায় উমাসঙ্গীত—'আগমনী বিজয়ার গান'ও বাংলার সাধনসঙ্গীত। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি কমলাকান্ত, রাম বসু এবং দাশরথি রায়। সাধনসঙ্গীত এই ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর সাংসারিক জীবনকেই রূপায়িত করিয়াছে। "যে মেনকা-উমার সঙ্গীত বাঙ্গালী কবি গাহিয়াছেন—তাহার উদ্দীপনা পুরাণ হইতে আহৃত নয়—তাহা বাঙ্গালী আপন ঘরেই পাইয়াছে। তাই এই আগমনী-বিজয়ার গান পৌরাণিক সঙ্গীত নয়, ধর্মসঙ্গীত নয়। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত—তাহার গার্হস্থ্য-জীবনেরই সঙ্গীত। ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে ঢের বেশী হৃদয়ের ধন—ঢের বেশি অন্তরঙ্গ প্রাণের বস্তু। বাঙ্গালী কবিকে সাধনার দ্বারা এই রস আয়ত্ত করিতে হয় নাই, ইহা সে স্বভাবতই লাভ করিয়াছে।" (প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য, দ্বিতীয়াংশ, ৩৭৪ পৃঃ)।

ইহার পরের যুগের সাধনসঙ্গীত ব্রাহ্ম-সমাজের প্রার্থনাগান। কবির গান, পাঁচালী গান প্রভৃতি কিন্তু এই ধারার নয়—'কবির গান' সম্পূর্ণ লৌকিক প্রেমের গান রাধাকৃষ্ণের জবানিতে প্রকাশিত।

এই তো কাব্যসঙ্গীত। বাউল কীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে লৌকিক গ্রাম্য সাধনার ধারা বহিয়া আসিতেছে তাহারও উল্লেখ করিতে হয়। চর্য্যাগানে যে ঠারে ঠোরে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় সাধনার সূত্রপাত হইয়াছিল, বাউল-গানে তাহার পূর্ণাঙ্গতা-প্রাপ্তি হইয়াছে। বাউল প্রভৃতি সহজিয়া সাধকগণ সুরের স্পর্শে পরম পুরুষকে মনের মানুষে পরিণত করিয়াছিলেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—একমাত্র মানুষকেই আমরা ভালবাসিতে পারি, ভক্তি করিতে পারি। ব্রহ্ম অসীম, আবার তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমায় বদ্ধ; তিনি নিঃসীম শূন্যে, বিরাট বিশ্বে, সর্ব্বজীবে, সর্ব্বভূতে বিরাজমান; কিন্তু একমাত্র মানুষের মধ্যেই তাঁহার সজীব স্পর্শ পাই, মানুষের মধ্যেই তাঁহার সার্থক উপলব্ধি করি—বাংলাদেশের সাধনসঙ্গীতের মূল সুরটি তাহাই।

কবিগুরুর ভাষায়—"যাহাকে আমরা ভাল-বাসি, কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের (মানুষের) মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নামই ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব তত্ত্বটির মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে।"

বাংলাদেশের শেষ সাধনসঙ্গীতের কবি রজনীকান্ত সেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের ভাষায় বলিতে হয়—"বাংলা ভাষায় রজনী সেনের গান মরমীর গান। ভক্তিসংগীতে এমন আন্তরিকতা ও সরলতা বাংলা ভাষায় দুর্লভ বস্তু। আমি চিরকালই তাঁর গান গেয়ে থাকি, ভক্তের প্রাণের কথাটি তাঁহারই।"

রজনীকান্তের গান—

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির-আদরের বিনিময়ে সখা,
চির অবহেলা পেয়েছ,
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি',
ধ'রে টে'নে কোলে নিয়েছ।"
(মিশ্র কানাড়া, একতালা)

—গভীর আন্তরিকতার গান।

তাঁহার গানের বৈশিষ্ট্য সহজ কথায় প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ তাহাই আরো গভীর ভাবে গভীর সুরে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে হইয়াছে। তাঁহার সাধনসঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতের পর্য্যায় গানগুলিতে নয় ; ভানুসিংহ ঠাকুরের গানগুলিও তাঁহার বৈষ্ণব কবিতা নয়—এইগুলি বৈষ্ণব ভক্তিসাধনার অনুকরণ, তাঁহাদের ভাষা ও ছন্দে রচিত গীতিকবিতা মাত্র। তাঁহার ভাগবতী গীতির বিকাশ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের নানা mystic ভাবের কথা কবি তাঁহার এই গান-গুলিতে বলিয়াছেন—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরবদান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।"
(ইমনকল্যাণ, তেওড়া)

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীত-সুধারসে এসো।
কর্ম্ম যখন প্রবল আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার
হৃদয় প্রান্তে হে নীরব নাথ
শান্ত চরণে এসো।"
(জয়জয়বন্তী)

কবির এই সাধনা শান্তরসের সাধনা।

সংক্ষেপে বাংলার সাধনসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ এই। সুরের মাধ্যমে ধর্ম্মসাধনা ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। বৈদিক সামগীতি হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা সুরে আমাদের দেশের কবিরা এই সাধনা করিয়া আসিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশেও hymns প্রভৃতি গান, church service এর church music এর গম্ভীর উদাত্ত স্বর প্রভৃতি প্রার্থনাসঙ্গীতের সহযোগিতা করে।

ইসলাম সংস্কৃতিও আমাদের দেশের সুরযোগে প্রার্থনারীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিধানে সঙ্গীত নিষিদ্ধ ; কিন্তু ভারতবর্ষের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমৃদ্ধি হইয়াছে মুসলমান গুণি-গণেরই ঐকান্তিক সাধনায়। নাত, কাওয়ালি, মার্সিয়া প্রভৃতি গান হিন্দু সাধনসঙ্গীতের অনু-করণে তাঁহারাও সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাংলার এই সাধনসঙ্গীতের কোথাও সুরের খাতিরে ভাবকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। প্রধান বক্তব্যটি, প্রাণের গভীর আর্ত্তিটিকেই সর্ব্বত্র সযত্নে প্রকাশ করা হইয়াছে। ভক্তিসঙ্গীত কবির সাধনা ; এই যেন সে—

"মন দিয়ে যাঁর নাগাল নাহি পাই।
গান দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যাই॥"

সন্তোষ

শ্রীশান্তশীল দাশ, এম-এ

আলো ও আঁধার দুই-ই থাক্ পাশাপাশি ;
সুখে দুখে ঘেরা এ জীবনখানি
এরে আমি ভালবাসি।
যা পেয়েছি আমি সকলই আমার প্রিয় ;
হাসি-আনন্দ ব্যথা-বেদনায় এ ধরণী বরণীয়।
যে দিয়েছে এই আলোকের ধারা
ধরণীর বুকে ঢেলে,
তাঁরই দে'য়া দান তমসারে অবহেলে,
করিব না আমি তাহার অসম্মান ;
আমার জীবনে সত্য হউক আলো-আঁধারের
দান।

বন্ধন যদি তাঁরই দে'য়া হয়, নেব সেই বন্ধন,
মুক্তির লাগি করিব না ক্রন্দন :
ভাল-মন্দের বিচারের জালে জড়াবো না
আপনারে,
ধরা দেব নাকো দ্বন্দ্বের কারাগারে ;
সুখদুখের পূর্ণ পাত্রখানি
হাসিমুখে পান করে যাব আমি
দু'য়েরে সত্য মানি'।

সমালোচনা

জ্বলন্ত তলোয়ার—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১৮ পৃষ্ঠা ; মূল্য আড়াই টাকা।

স্বদেশ-প্রেমিকা দেশনেত্রী বিদুষী সরোজিনী নাইডু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা, অগ্নিময় স্বদেশ-প্রেম, দুর্জয় সাহস, বীর্যবত্তা ও সমরনৈপুণ্য এবং অনুপম আত্মবিসর্জনকে অভিনন্দিত করিতে গিয়া তাঁহাকে 'Flaming Sword' অর্থাৎ 'জ্বলন্ত তলোয়ার' নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। সুভাষ-চরিত্রের বিভিন্ন দিক অঙ্কিত করিতে গিয়া লেখক আলোচ্যমান পুস্তকখানির এই উপযোগী নামটিই রাখিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন সাতাশটি কবিতায় অনুপম ছন্দ ও ভাবাবেগে দেশবরেণ্য বীরযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। কবিতাগুলিতে কবি-চিত্তের বলিষ্ঠ প্রেম, সৌহার্দ্য, অভিন্নহৃদয়বত্তা ও আদর্শনিষ্ঠার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা মুদ্রিত আছে। সুভাষ-জীবনের অসমসাহসিকতা, ক্ষাত্রবীর্য, দেশ-প্রীতি, ক্ষমাসুন্দর উদার দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,

আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতি লেখককে মুগ্ধ করিয়াছিল—নেতাজীর এই গুণরাজি বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার পুস্তকের শেষভাগে কয়েকটি 'অবিস্মরণীয়' ঘটনা গল্পে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনাগুলি খুবই প্রাণস্পর্শী। সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে আধ্যাত্মিক গুরু বলিয়া মানিতেন; আত্মগোপনের কয়েক মাস পূর্বে তিনি স্বয়ং একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে (বর্তমান সমালোচককে) ঢাকায় বলিয়াছিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ আমার গুরু, আমার আরাধ্য দেবতা—তাঁকে আমি পূজা করি, তাঁর শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি ভক্তিবিনম্র প্রণতি।" আলোচ্যমান পুস্তকে গ্রন্থকার সুভাষচন্দ্র কর্তৃক মান্দালয় জেল হইতে জনৈক দেশকর্মীর নিকট লিখিত একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। পত্রে সুভাষচন্দ্র দেশকর্মিগণকে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে এই কয়েকখানা ধর্মগ্রন্থ নিয়মিত ভাবে পাঠ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন—(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (২) স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরৎ চক্রবর্তী, (৩) পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ। (৪) বক্তৃতাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ, (৫) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বামী বিবেকানন্দ, (৬) ভাববার কথা—স্বামী বিবেকানন্দ, (৭) চিকাগো বক্তৃতা—স্বামী বিবেকানন্দ, (৮) ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, (৯) ব্রহ্মচর্য—সুরেন্দ্র ভট্টচার্য; ঐ—ফকির চন্দ্র দে। ধর্মগ্রন্থগুলির নাম হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সুভাষচন্দ্রের হৃদয়দেবতা; স্বামীজির উচ্চ বীর্যপ্রদ আদর্শই তাঁহাকে কঠোর জীবনসংগ্রামে অপরিসীম শক্তি ও প্রেরণা জোগাইয়াছে, ক্ষত্রিয় বীরের মতো মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মবলিদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট মনোরম—উহাতে একখানি জলন্ত তলোয়ার সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়া পাঠক-মাত্রেরই হৃদয়ে ক্ষাত্রবীর্যের উদ্দীপনা জাগাইয়া দেয়। মুদ্রণ বেশ ভাল। পুস্তকখানি দেশবাসিমাত্রই পড়ুন এবং উহার বহুল প্রচার হউক—ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ-গ্রন্থাবলী—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত। প্রচ্ছদপদ, মুদ্রণ ও কাগজ উত্তম। মূল্য প্রতি গ্রন্থ আট আনা।

ন্যায়দর্শন—শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য। ৭২ পৃষ্ঠা। বিরাট ন্যায়দর্শনের একটি মোটামুটি পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হয়েছে। লেখক প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোলটি পদার্থ ছোট বড় অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। প্রমাণ-খণ্ডে প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দ উপমান পৃথক পৃথক আলোচিত হয়েছে। ষোড়শ পদার্থের পর নব্যন্যায় ও আরম্ভবাদ স্থান পেয়েছে। ঈশ্বরই এই পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ। ভাষার স্বচ্ছতা সত্ত্বেও বিষয়ের দুরূহতার জন্য বইখানি সাধারণের পক্ষে আশানুরূপ সহজ হয় নাই।

যোগপরিচয়—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। ৬৬ পৃষ্ঠা। পতঞ্জলির যোগদর্শনই এই পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়। এর উপক্রমণিকারূপে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, ভোগ-অপবর্গ, পরিণামবাদ ও দেশ-কাল আলোচিত হয়েছে। লেখক সংক্ষেপে যোগতত্ত্ব বুঝিয়ে অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনা কি তা বলেছেন। চিত্তের বিভিন্ন ভূমি ও সমাধির বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করে তিনি যোগীর আরোহক্রম সবিস্তারে আলোচনা করে সাধনার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বলেছেন, পতঞ্জলিতে বিশ্লেষণাত্মক সাংখ্য বা জ্ঞানমার্গের সঙ্গে

ঈশ্বরানুধ্যানরূপ ভক্তিমার্গও স্বীকৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন প্রকারের ধ্যান ও তার ফল শক্তির অভ্যুদয় বা বিভূতির আলোচনা করেছেন। পরিশেষে পুরুষকার ও অদৃষ্ট, জীবনকে কে কতটা নিয়ন্ত্রিত করছে এর আলোচনা করেছেন। উপসংহারে 'ভারতীয় দর্শন ও দুঃখবাদ' প্রসঙ্গ তুলে তিনি স্বীকার করেছেন—'শুধু যোগ ও সাংখ্য কেন, প্রায় দর্শনের উৎপত্তি দুঃখবাদে।' তিনি বলেছেন—'জীবনের মূলে সুখসন্ধান, কিন্তু সে সন্ধানের উৎপত্তি দুঃখে।' সাংখ্য ও যোগ দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস চায়, সাময়িক অবসান নয়। জীবনবাদ সত্য, কিন্তু পরিপূর্ণ সত্য নয়। জীবনবাদে আছে গতি ও পুলক, মুক্তিবাদে আছে স্থিতি ও শান্তি। পুস্তকখানির মাঝে মাঝে লেখকের দার্শনিক দৃষ্টি সাধক-পাঠককে আলো দেবে বলে আশা করি।

ভারতের অধ্যাত্মবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম। পৃষ্ঠা ৭১। অপেক্ষাকৃত সুদীর্ঘ অবতরণিকায় লেখক হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে দেখিয়েছেন এবং এর উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা যে ধীরে ধীরে এক মহাসমন্বয়রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুধর্ম কূপমণ্ডুকতা নয়, হিন্দুধর্ম অপর ধর্মের বিনাশ-কামনা করে না, পরন্তু সকল ধর্মকে যথাযথ অধিকারীর অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচার করে। বেদের যাগযজ্ঞ, ভাগবতের ভগবৎতত্ত্ব, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সবই রুচি-অনুসারে অধিকারিভেদে উপদিষ্ট। কর্ম ভক্তি জ্ঞান—এই তিনটিই প্রধান সাধনপদ্ধতি, কিন্তু এসবের লক্ষ্য সমন্বয়।

'কর্মযোগ'-অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, গীতার নিষ্কাম কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, রজস্তমঃ দ্বন্দ্বের পারে সত্ত্বের শান্ত স্থিতিই সংসারতরণের উপায়। তমঃ মোহ, রজঃ চঞ্চলতা, সত্ত্বই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা, সমত্বই চিত্তপ্রসাদ। কর্ম জ্ঞানযোগ্যতা এনে দেয়, এই তার সার্থকতা। তত্ত্বজ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক ভক্তিযোগ আলোচনা করেছেন। 'ঈশ্বরে পরানুরক্তি বা পরম তত্ত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণই ভক্তি'—এই ভাবে সুরু করে নারদভক্তিসূত্র, গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত উদ্ধৃত করে তিনি ভক্তিযোগের মহিমা কীর্তন করেছেন। অবশেষে দেখিয়েছেন উপনিষদ্‌বেদ্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞান শুষ্ক বা তিক্ত নয়, রসস্বরূপ। যিনি চিন্ময় তিনিই আনন্দময়।

উপসংহারে এই গ্রন্থে কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় বেশ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই সুলিখিত গ্রন্থে রাজযোগের সামান্য আলোচনা থাকলে ভাল হতো।

শ্রী—

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়-প্রণীত। ৭সি গোখেল রোড, ১৩নং ফ্ল্যাট্, কলিকাতা—২০, কলকাতা প্রকাশনার পক্ষ হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২১৫ ; মূল্য চার টাকা।

গিবন্‌-কৃত রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস সম্বন্ধে দার্শনিক এ এন্‌ হয়াইট্‌হেড্‌ বলিয়াছেন: "Throughout this history, it is Gibbon who speaks. He was the incarnation of the dominant spirit of his own time. In this way his volumes also tell another tale. They are a record of the mentality of the

eighteenth century. They are at once a detailed history of the Roman Empire, and a demonstration of the general ideas of the silver age of the modern European Renaissance." (Adventures of Ideas, pp 13-14) গিবন্ পর্যুদস্ত রোমের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে অলক্ষিতে প্রকাশ পাইয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীর সক্রিয় প্রভাব। আমার মনে হয় আলোচ্যমান চরিতালেখ্য সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করা যাইতে পারে। পুস্তকখানিতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য-জীবনের বিবৃতিতে কোথাও ঐতিহাসিক বস্তু-নিষ্ঠার অভাব নাই, অথচ সর্বত্রই পাইতেছি বিংশ শতাব্দীর ভাবভূয়িষ্ঠ লেখকের পরিচয়—এই পরিচয় তাঁহার পরিশীলিত শিল্পি-মনের, এই পরিচয় তাঁহার বঙ্কিম-রবীন্দ্রপ্রভাবিত সংবেদন-শীল সাহিত্যসৃষ্টির, এই পরিচয় তাঁহার স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত ভক্তি-জ্ঞান-কর্মসমন্বয়ের প্রোজ্জ্বল আদর্শপ্রীতিতে। চরিতশিল্পী লেখক সম্বন্ধে এইটুকু না বলিলে তাঁহার রচনার অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত থাকিয়া যাইত। পুস্তকের প্রতি পরিচ্ছেদ যেন এক একটি যুগাঙ্ক—এক একটি landmark. 'রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান', 'দিব্য উন্মাদনা', 'জীবন জুড়াল', 'নতুন বেশে মাটির দেশে ফিরে আসা', 'মনের মানুষের সন্ধানে', 'সিংহশিশুর জাগরণ', 'জাহ্নবীর বাজল ভেরী', 'অক্রূরানের জয়যাত্রা'—এইরূপ অনবদ্য অধ্যায়বিভাগে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা নাট্যের প্রতি যুগাঙ্কের কি চমৎকার ইঙ্গিত নিহিত! লেখকের রূপায়ণের আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি: "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনখানি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এনে দিয়েছে নতুন আশার আলো। নিত্যপরিচিত বস্তুর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন নতুন অর্থ। তাঁর কথা চিন্তা করলে আমাদের পুরাতন পৃথিবী ভরে উঠে নতুন সম্পদে, অবসন্ন হৃদয় জেগে ওঠে অভিনব প্রেরণায়, ঘুচে যায় চিরাচরিতের একঘেয়েমি জড়তা। পরম কারুণিক তিনি, সকল মানুষকেই ডাক দিয়েছেন অভয় মন্ত্রে। ছোট বড়, প্রতিভাবান্ ও সাধারণ, ত্যাগী ও ভোগী—যে যেমন আধার হোক না কেন—সকলের জন্য চলার পথ তৈরি করে দিয়ে গেছেন। তাঁকে স্মরণ করলে চারি দিকের অন্ধকার থেকে যেন নিয়ত শুনতে পাওয়া যায় ভোরের ভৈরবী ডাক:

> তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে,
> স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো,
> সব জড়তা হতে জাগো জাগোরে।"

অধিক কি বলিব, এই সুদৃশ্য সুলিখিত লোকপাবন 'লীলাকথা' প্রত্যেক শ্রেয়স্কাম সংস্কৃতিমান পাঠকের আদরের সামগ্রী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে—ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহ। কানন বাবুর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সমাধান (দ্বিতীয় খণ্ড)—স্বামী দুর্গা-চৈতন্য ভারতী প্রণীত। ক্যালকাটা ফটো হাউস, ১৩৪।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে স্বামী শান্তানন্দ ভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৮৯; মূল্য তিন টাকা মাত্র।

ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের পরিচিতিপ্রদান অনাবশ্যক। ইতঃপূর্বে তাঁহার একাধিক পুস্তক 'উদ্বোধন'-পত্রে সমালোচিত হইয়াছে। দার্শনিক বিচারে এমন প্রসন্নগম্ভীর অনাড়ষ্ট বাগ্‌ভঙ্গী বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ দেখা যায় না। আলোচ্যমান গ্রন্থে ধর্মের স্বরূপ, তত্ত্বানুভূতি, নিত্য ও লীলা, শ্রীদুর্গা-

পূজা, গীতোক্ত সন্ন্যাস, সন্ন্যাসে নারীর অধিকার, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয় লেখক বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন, সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। সনাতন ধর্মের স্বরূপ-বিশ্লেষণে লেখক কোথাও অনমনীয় রক্ষণশীলতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ চড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। ইহার ভৈষজ্যবিধানও স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে আমাদের অম্লানমহিম বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে। প্রয়োজন কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় আশয়ের সহজ সর্বজনবোধ্য প্রকটনের। এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হইয়াছেন বর্তমান গ্রন্থকার। এবম্বিধ তথ্যবহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সমুজ্জ্বল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া লেখক বাঙ্গালী সমাজের অভাবনীয় উপকার সাধন করিতেছেন। তাঁহার কোন কথাই স্বকপোল-কল্পিত নহে; তাঁহার প্রত্যেক সিদ্ধান্তই যুক্তি দ্বারা, যথেষ্ট উপপত্তি দ্বারা সমর্থিত। গ্রন্থকারের আলোচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম—বিরুদ্ধবাদীর মতখণ্ডনেও তিনি অত্যন্ত সংযত। লেখকের পুস্তকখানি পাঠে বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অবতারতত্ত্ব—শ্রীভুবনমোহন দাশ কবিশেখর প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীদেবীপ্রসাদ বসু, ওরিয়েণ্টাল পাবলিশিং কোং, ১১-ডি, আরপুলি লেন, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা ২৪৮; মূল্য তিন টাকা।

শ্রীভগবানের মৎস্যকূর্মাদি-রূপে 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্' অবতরণ অবিশ্বাসীর নিকট বালমনোরঞ্জন রূপকথা-মাত্র; পক্ষান্তরে অতিবিশ্বাসী ভক্ত পৌরাণিক আখ্যানের সবটুকুই আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করেন। ভক্তিমান্ অথচ যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্বাসী আবার বলিবেন: 'কেন? শ্রীভগবান্ ত সর্বানুস্যূত; মৎস্যকূর্মাদিরূপে তাঁহার আবির্ভাবই বা অসম্ভব হইবে কেন? যিনি ওষধিতে রহিয়াছেন, বনস্পতিতে যাঁহার অধিষ্ঠান, সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণু-ত্রসরেণুতে তাঁহার পূর্ণ অভিব্যক্তি। ইহা কল্পনাও নয়, রূপকথাও নয়—ইহা তথাকথিত সত্য হইতেও সত্যতর।' আলোচ্যমান গ্রন্থে অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যায় লেখক বিশ্বাস ও যুক্তি উভয়েরই পোষকতা করিয়াছেন। লেখকের মতে সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস রূপকাবরণে প্রচ্ছন্ন: এই আবরণের উন্মোচনে সুপণ্ডিত লেখক কেবলমাত্র স্বাধীন যুক্তির আশ্রয় নেন নাই, স্বসিদ্ধান্তকে যথাসম্ভব শাস্ত্রানুগ করিবারও প্রয়াস পাইয়াছেন। স্মরণাতীত প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর যাহারা ঐতিহাসিক সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা বলেন পৌরাণিক আখ্যানের (mythology) সঙ্গে বাস্তব ঘটনা (facts) অনেক ক্ষেত্রেই মিশ্রিত। তাহা হইতে তথ্যাবিষ্কার অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। লেখকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁহাদিগের নিকট স্থানে স্থানে কষ্টকল্পিত মনে হইতে পারে। পরমভাগবত প্রহ্লাদকে কদলীর রূপক বলিয়া উপস্থাপিত করিয়া তিনি যুক্তিবাদী ও বিশ্বাসী উভয়কেই মুশ্‌কিলে ফেলিয়াছেন। প্রহ্লাদের এত প্রজ্ঞা-সমুজ্জ্বল সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব রূপকথার কল্পলোকেও আপনার ভাবসমৃদ্ধ বৈশিষ্ট্য হারাইবে না।

লেখক অবতারতত্ত্ব-রূপ দুরূহ দার্শনিক আলোচনায় পদ্যের আশ্রয় নিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে পদ্যই ছিল সর্বপ্রকার ভাবাভিব্যক্তির বাহন। মানবের স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা কাব্যের নিগড়ে আপনিই ধরা দিত। লেখক হয়ত সেই ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি কামনা করেন। সৌন্দর্যসৃষ্টি লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও তাঁহার পদ্যচ্ছন্দে কাব্যের স্বাভাবিক আকর্ষণ যথেষ্টই আছে। এই সুচিন্তিত তত্ত্বকাব্য জিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের নিকট সমাদৃত হইবে মনে করি।

স্বপনী—শ্রীরবি গুপ্ত-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীহিমাংশুকুমার নিয়োগী, ২৪, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৭৬; মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্যমান পুস্তকখানি লেখকের কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। 'উদ্বোধনে'র পাঠক-পাঠিকার নিকট তিনি সুপরিচিত। তাঁহার একাধিক কবিতা 'উদ্বোধন'-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য-গ্রন্থের প্রথম কবিতার নামানুসারে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। 'স্বপনী'-কাব্যের সব কবিতাই স্বপ্নায়িত বলা যাইতে পারে। স্বপ্নের অস্পষ্টতাই তাহার প্রাণ; স্পষ্টতাকে মোহন ভঙ্গীতে আবরণ করাতেই স্বপ্নের সার্থকতা। ভাবের অন্তহীন গভীরতা বাক্যে সর্বদা স্ফূর্ত হইয়া উঠে না; যতটুকু বাক্যে বিধৃত হয় ততটুকুই তাহার অদ্ভুত স্বকীয়তায় ভাবুক-চিত্তকে আলোড়িত করে। কাব্যের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দের শৃঙ্খলে। সুকবি এই বন্ধনের মধ্যেও বাক্যকে মুক্তির আনন্দ দেন। লেখকের ছন্দের স্বাভাবিকতা তাই বড়ই উপভোগ্য। লেখকের কবিতাগুলি ভালই লাগিল। তাঁহার কাব্যসাধনাকে অভিনন্দিত করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী ভাস্করানন্দজীর দেহত্যাগ—গত ৭ই জুলাই প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় স্বামী ভাস্করানন্দজী কলিকাতা আর্ জি কর মেডিক্যাল্ হাসপাতালে পক্ষাঘাতরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্য ভূষিত করিয়া কাশীমিত্রের শ্মশানে দাহ করা হইয়াছে। দেহত্যাগ-কালে তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক ৬০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে থাকিয়া কিছু দিন যাবৎ বাত ও অন্যান্য রোগে ভুগিতেছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার পদদ্বয় পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসার জন্য গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁহাকে পূর্বোক্ত হাসপাতালে আনয়ন করা হয়। কিন্তু ঐ ব্যাধি ক্রমে তাঁহার দেহের উপরিভাগে প্রসারিত হওয়ায় তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্বামী ভাস্করানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে সাধন মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯১৬ সনে বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করিয়া ১৯২৪ সনে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সাধন মহারাজ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকিয়া দরিদ্র গ্রামবাসিগণের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে মাধুর্য ছিল; তিনি ভজনশীল ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি

গত জুনমাসে এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি রবিবার ও বুধবার ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ৮টি বক্তৃতা প্রদত্ত

হইয়াছে। অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী নিম্নলিখিত ৬টি বক্তৃতা দিয়াছেন : (১) 'অমরত্বের প্রমাণসমূহ', (২) 'ধ্যান, সমাধি ও অনুভূতি', (৩) 'অদৃশ্য জগৎ', (৪) 'ভগবান বুদ্ধ ও আধুনিক মানুষ', (৫) 'ভগবদ্দর্শনে কে আমাদের পথ-প্রদর্শক?' (৫) 'ধর্মের ভবিষ্যৎ—ভারতে ও প্রতীচ্যে'। সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী (১) 'মৌনব্রতের শক্তি' এবং (২) 'ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার সাধারণ ভিত্তিসমূহ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত স্বামী অশোকানন্দজী প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সোসাইটি-ভবনে সদস্য ও বিদ্যার্থি-গণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দিয়াছেন এবং বেদান্ত-দর্শনের তাত্ত্বিক ও কার্যকর দিকগুলি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ— আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৯ সনের কার্যবিবরণী পাইলাম। ইহা প্রাচীন প্রথার সামঞ্জস্যে আধুনিক ভাবে পরিচালিত হইতেছে। ইহার শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রণালী অভিনব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরণ করিয়াও শিক্ষাধারার মধ্যে নূতনত্ব আনা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১৯৪ জনের মধ্যে ১৭ জন ছাত্র বাড়ী হইতে দৈনিক যাওয়া আসা করে। ইহারা সকলেই পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগী। চতুর্থ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দী অবশ্যপাঠ্য বিষয়ে পরি-গণিত। এবারের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক। ২৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন প্রথম, ১০ জন দ্বিতীয় ও ৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাটনার কিশোরদল-পরি-চালিত আন্তঃপ্রাদেশিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতায় বিদ্যাপীঠের ছাত্র শ্রীমান বৈদ্যনাথ দে বাংলা বক্তৃতায় প্রথম, শ্রীমান সমর সরকার দ্বিতীয় এবং গল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম ও শ্রীমান গণেশশংকর প্রসাদ হিন্দী বক্তৃতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান বৈদ্যনাথ দে বক্তৃতামঞ্চে কয়েক মিনিট অপ্রস্তুত ভাবে বক্তৃতা দিয়া শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসাবে চ্যাম্পিয়নসিপ্ কাপ্ পাইয়াছে।

কলাবিদ্যায় কৃতী ছাত্রদ্বয় শ্রীমান অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান অরবিন্দ নাগ পাটনা ও দেওঘর চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিদ্যাপীঠের সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছে।

ছাত্রদের পরিচালিত সাহিত্যের বৈঠক ও তাহাদের সম্পাদিত 'দৈনিক বিবেক' ও 'কিশলয়' সাহিত্যপ্রীতির পরিচায়ক। সম্পূর্ণ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত 'প্রতিনিধি-সভা' ও 'সেবক-মণ্ডলী' ছাত্রদের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিয়া থাকে। বিদ্যাপীঠ-শ্রমিকদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ছাত্রদের নৈশবিদ্যা-লয়ে শিক্ষকতা এবং ফুলের বাগানে ফুল ও সবজি-বাগানে ফসল ফলাইবার আগ্রহ প্রশংসনীয়। ছাত্রদের সমবায়-ভাণ্ডারের লভ্যাংশ হইতে বিদ্যাপীঠের একটি যোগ্য প্রাক্তন ছাত্রকে আই-এ পড়িবার জন্য মাসিক ১০৲ টাকা এবং দরিদ্রবান্ধব সমিতি হইতে দেওঘরের একটি ও গ্রামের অপর একটি ছাত্রকে পড়ার জন্য সাহায্য করা হইয়াছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে বিদ্যাপীঠের চিকিৎসালয়ে ৮৭৮ জন দরিদ্র গ্রামবাসী চিকিৎসিত হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৩টি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে বিনাবেতনে ও অর্ধবেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ৫৭১৪ খানি গ্রন্থ, ২৫টি মাসিক, ৬টি সাপ্তাহিক, ৪টি দৈনিক পত্রিকা-সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার আছে। পাঠকের সংখ্যা নিয়মিত। এই প্রতিষ্ঠান হইতে আচার্য শংকরের 'বাক্যবৃত্তি', 'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প' এবং 'সংগীতসংগ্রহ' প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি কামনা করি।

বিবিধ সংবাদ

আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১৩ই শ্রাবণ প্রাতে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বিশেষ পূজাদি এবং বৈকালে "গুরুশিষ্যের শাস্ত্রীয় সম্বন্ধ" বিষয়ে হিন্দীতে আলোচনা হয়। পর দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের পূজাদি হইলে রাজকোটের শ্রীনুগরাম আত্মানন্দজী কীর্তন করেন। এই উপলক্ষে আহূত জনসভায় "পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক গুরুভাব" সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

ব্রুক বণ্ড্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের সুবর্ণ-জয়ন্তী—ভারতের প্রধান চা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম ব্রুক বণ্ড্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের সুবর্ণ-জয়ন্তী গত জুলাই মাসে সম্পন্ন হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা ম্যাঙ্গো লেনের একটি প্রকোষ্ঠে অতি সামান্য ভাবে কাজ আরম্ভ করিয়া অধুনা ভারতের অন্যতম বৃহৎ চা-পরিবেশনকারী সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। সমগ্র দেশে লাল গাড়ী ও চা-বিক্রেতা গ্রামসমূহের সকলের নিকটই পরিচিত।

এই কোম্পানী উচ্চ কার্যনির্বাহক পদে ভারতীয়গণকে নিয়োগ করিতে অগ্রণী হয়। বর্তমানে ইহার ডিরেক্টরগণের বোর্ডে দুই জন ভারতীয় আছেন। এই উভয় ব্যক্তিই বিক্রেতারূপে এই কোম্পানীতে কাজ আরম্ভ করেন এবং সংগঠন-নৈপুণ্য দেখাইয়া উচ্চ পদে সমাসীন হন।

এই কোম্পানীর কলিকাতা, কোয়ম্বাটুর, নাগপুর, ঘাটকেশর কারখানা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের শাখাকেন্দ্রগুলিতে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক সদস্য একটি বিশেষ বোনাস পাইয়াছেন।

সোমনাথ-মন্দির-সংস্কার-পরিকল্পনা—সোমনাথ-মন্দির-সংস্কারের পরিকল্পনা চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং দুই পর্যায়ে এই সংস্কার-কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ের কার্য ছয় মাসের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য শেষ হইতে তিন হইতে চারি বৎসর সময় লাগিবে।

এই সংস্কার-কার্যের জন্য মন্দিরের ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং বর্তমান মন্দিরটি সহ চারি শত একর পরিমিত জমি এই উদ্দেশ্যে দখল করা হইয়াছে।

মন্দিরটির সংস্কার-কার্য সমাপ্ত হইলে উহার গর্ভগৃহ বা আভ্যন্তরীণ মন্দির ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি প্রস্থ হইবে এবং উহার চতুষ্পার্শে উপযুক্ত প্রদক্ষিণ-স্থানও থাকিবে। মন্দিরের চূড়াটি হইবে ১৫৯ ফুট উচ্চ। মন্দিরের সম্মুখভাগে তীর্থ-যাত্রীদের সমাবেশের জন্য উন্মুক্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং উপ-মন্দির ও পাণ্ডাদের বাসভবনগুলি মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণটি ঘিরিয়া থাকিবে।

ধর্মগ্রন্থে মন্দিরটির মূল আয়তন ও আকারের যে বিবরণ আছে, তাহা বজায় রাখিয়া এই মন্দিরটি নির্মাণ করা হইবে।

প্রথম পর্যায়ে গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ-ক্ষেত্র, মন্দিরের চূড়া ও সমগ্র মন্দিরের কাঠামোর ভিত্তিটির নির্মাণকার্য শেষ করা হইবে। ইহাতে আড়াই লক্ষ টাকা লাগিবে। এই কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

এই সংস্কার-কার্যে খোদাইযোগ্য শ্বেত প্রস্তর ও রাজপুতানার মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হইবে। স্থানীয় মাল-মশলা ফাঁক-পূরণে এবং অন্তবর্তী কাঠামো-নির্মাণে ব্যবহৃত হইবে। যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নশ্বর দেহ রক্ষা করেন বলিয়া প্রকাশ, সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করিবেন বলিয়া মন্দিরের ট্রাষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একটি যাদুঘর, স্নানের ঘাট এবং ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস-নির্মাণ প্রভৃতি অন্যান্য পারিপার্শ্বিক উন্নতি-সাধনের পরিকল্পনাও ট্রাষ্ট করিয়াছেন।

জগতের উচ্চতম অট্টালিকা—একটি সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংটিকে আরও উঁচু করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার বর্তমান উচ্চতার সহিত আরও ১৯৯ ফুট যোগ করিয়া ইহাকে প্রায় ১,৪৫০ ফুট উঁচু করা হইবে। আকাশচুম্বী এই অট্টালিকার শীর্ষে টেলিভিসন-প্রচারের উপযোগী একটি মিনার থাকিবে।

'নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা' জানাইয়াছেন যে, ১৯৫০ সালের শেষ পর্যন্ত এই মিনার-নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যে সকল ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে এই মিনারটি নির্মাণ করা হইবে তাঁহাদের সম্মুখে কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে। শীতকালে মিনারটির উপরে যে বরফ জমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ তন্মধ্যে অন্যতম। যদি এইরূপ বরফ-জমা বন্ধ করা সম্ভব না হয় তবে মিনারটি শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। ইঞ্জিনীয়ারগণ এই আশঙ্কার নিরসনকল্পে কতকগুলি সম্ভাব্য প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন। বিমানের পাখার উপর হইতে যে উপায়ে বরফ সরাইয়া ফেলা হয়, সে উপায়টিও হয়তো এক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ইহার পর হইতে এ-পর্যন্ত ইহাতে বড় রকমের কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধিত হয় নাই। প্রস্তাবিত মিনারটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ইহার উপর হইতে কয়েকটি টেলিভিশন কোম্পানী তাঁহাদের প্রোগ্রাম প্রচার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের শরণার্থি-সেবাকার্য

রামকৃষ্ণ মিশন আসামের বিভিন্ন স্থান, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও পূর্বপাকিস্তানে শরণার্থি-সেবাকার্য পরিচালন করিতেছেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে জুন মাসের প্রথম পর্যন্ত মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র ৩,০৮,৮৭৯ জন শরণার্থিকে খাদ্যদান এবং ১০৬,২৩০ জন রুগ্ন ব্যক্তিকে ঔষধ, কলেরা ও টাইফয়েড-ইঞ্জেক্‌সন্‌ ও টিকা দান করিয়াছেন এবং ৩৭,০৩৮ জন রুগ্ন ব্যক্তি এবং শিশুকে দুগ্ধ ও পথ্য দিয়াছেন। শরণার্থিগণ যাহাতে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন

করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদের মধ্যে একদল ব্যক্তিকে মিশন ছোটখাট ব্যবসা আরম্ভ করিবার জন্য অর্থসাহায্যও করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় মিশন গত ৬ই জুলাই হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রতিদিন গড়ে দশসহস্রাধিক শরণার্থীকে একবার ডাল-ভাত দিতেছেন। বর্তমানে আতঙ্ক কতকটা প্রশমিত হইলেও বহুসংখ্যক সম্পূর্ণ নিঃস্ব শরণার্থী বিভিন্ন স্থানে জড় হইতেছেন। এই জন্য সাময়িক সেবাকার্য অপেক্ষা তাঁহাদের পুনর্বাসন-কার্য অধিকতর জরুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ত্রিপুরারাজ্যের আগরতলায় ১২৩টি শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসন করা হইয়াছে। সেখানে আরও ৫০টি পরিবারের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন কাছাড় জেলার দুইটি স্থানে বিস্তৃত জমিগ্রহণের ব্যবস্থা করা হইতেছে; সেখানে শরণার্থীদের জন্য গ্রাম্য উপনিবেশ স্থাপিত হইবে। এই জেলার কয়েকটি গ্রামে ২৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হইয়াছে। আমাদের শিলচর-কেন্দ্র কাছাড় জেলার বিভিন্ন চা-বাগানে ১৭,০০০ শরণার্থীর পুনর্বাসন-কার্যে সহায়তা করিতেছেন। অজ্ঞাত পরিবেশ এবং অনভ্যস্ত কার্যের প্রতি অহেতুক ভীতি ও উপেক্ষার ভাব পরিত্যাগ করিয়া সোৎসাহে কাজে লাগিয়া যাইতে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে। এই সকল শরণার্থীর ন্যায্য দাবী পূরণ এবং নানা অসুবিধা দূর করিতে আমাদের কর্মিগণ সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা বীভৎস অত্যাচার, অবর্ণনীয় দুঃখ এবং চিরাচরিত জীবনযাত্রার আকস্মিক বিপর্যয়ে হতোদ্যম এই নরনারীদিগের প্রাণে আশা ও উদ্যম সঞ্চার করিতেও যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান্ টি এসোসিয়েসনের অনুরোধে এই কার্য করা হইতেছে।

আমরা পশ্চিবঙ্গের মালদহে ৫০ হইতে ৬০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করিব স্থির করিয়াছি। যথাসম্ভব সত্বর এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার সিমুরালি রেল ষ্টেশনের নিকট কয়েকটি পরিবারকে পুনর্বাসন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থানে একটি আদর্শ গ্রাম্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা উপযুক্ত জমির সন্ধানে আছি। কয়েকটি স্থান আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; উহাদের মধ্যে যে কোন একটি যথাসম্ভব শীঘ্র সংগ্রহ করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইতেছি। জমি সংগৃহীত হইলেই আমরা কাজ আরম্ভ করিব। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-ক্রমে মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মহীশূর রাজ্যে ১৬,০০০টি শরণার্থী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

আমাদের বিভিন্নমুখী শরণার্থি-সেবাকার্যের বিশালতার অনুপাতে অর্থবল একেবারেই যথেষ্ট নহে। যথাযোগ্য অর্থানুকূল্যের অভাবে আমাদের পরিকল্পনার বিস্তৃতিসাধন সম্ভব হইতেছে না। এইজন্য আমরা সহৃদয় দেশবাসিগণকে এই মহৎ কার্যে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে: *

(স্বাঃ) **স্বামী বীরেশ্বরানন্দ**
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, (জেলা হাওড়া) পশ্চিম-বঙ্গ,

* কিছুদিন হয় সৌরাষ্ট্ররাজ্যে রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্বল্পপরিসরে বন্যা-সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

নিমাই পণ্ডিত

উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৫৭ শিল্পী : শ্রীনন্দলাল বসু
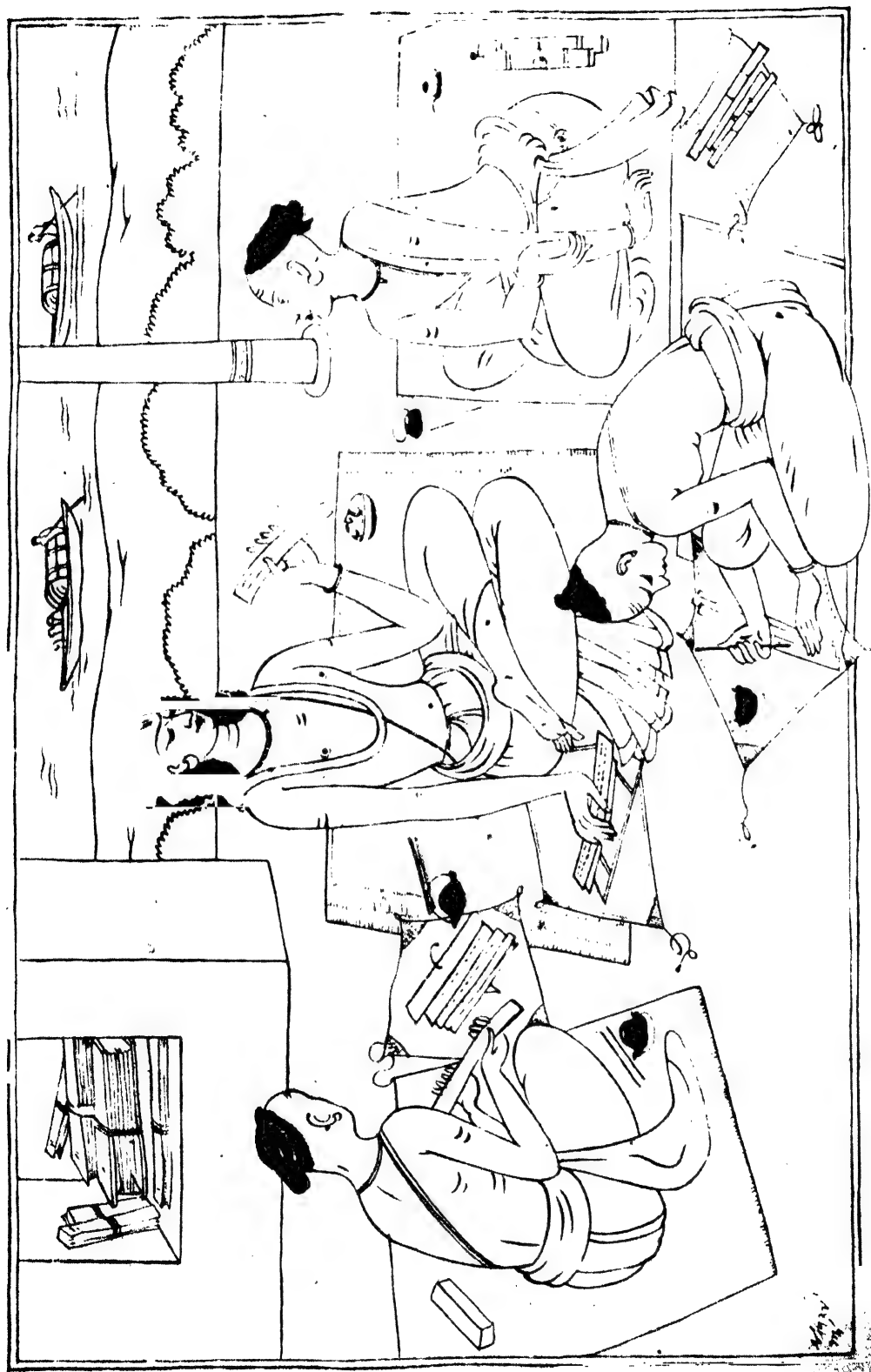
শক্তিপূজা

স্বামী সারদানন্দ

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

"জড়, চেতন, সকলের মধ্যে কোথাও গুপ্ত, কোথাও ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।"

গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্ত—শক্তির এই দুই ভাবের খেলা জগতে নিরন্তর সর্ব্বত্র বিরাজিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে শক্তির প্রথমোক্ত ভাবের খেলা হইতেছে, তাহাকেই আমরা জীবন্ত, উন্নতিশীল এবং ভাগ্যবান্ বলিয়া বোধ করিতেছি এবং যাহাতে শেষোক্ত ভাবের খেলা, তাহাতেই বার্দ্ধক্য, শ্রীহীনতা, অবনতি এবং মৃত্যুর ছায়া উপলব্ধি করিতেছি।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছি, মনের দ্বারা যাহা কিছু চিন্তা, বা কল্পনা দ্বারা যাহা কিছু অনুমান ও গঠন করিতেছি, সকলই শক্তিসহায়ে, সকলই শক্তিরাজ্যের অধিকারভুক্ত। বেদমুখে দেবী বলিতেছেন: "আমার দ্বারাই লোকে জীবিত রহিয়াছে, অন্নগ্রহণ এবং শ্রবণাদি করিতেছে। আমাকে যে অবহেলা করে সে বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মশক্তির হিংসক অসুরদিকের বধের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারী রুদ্রের বাহুতে আমিই শক্তিরূপে অবস্থিতা ছিলাম। আমিই লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্তা হই। আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছি।"—(ঋক্—দেবীসূক্ত)।

শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপ বিপরীত গুণধারিণী, এ কথাই পরম সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। আধুনিক দার্শনিকও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শক্তির বিনাশ বা পরিমাণের হ্রাস নাই; গুপ্ত ও ব্যক্তভাব হয় মাত্র। ভাবরাজ্যেও তাহাই। ভাবরাজ্যে বা সূক্ষ্ম মনোরাজ্যেও শক্তির এই খেলা বর্ত্তমান।

শক্তিরাজ্যের অদ্ভুত বিস্তৃতি যিনি একবার উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি বুঝিয়াছেন যে, শক্তিপূজাতেই জগৎ চিরকাল ব্যাপৃত। শক্তি-আরাধনা ভিন্ন সংসারে অন্য কোনরূপ উপাসনাই কখন হয় নাই বা হইবে না।

মানুষ জড় বা মনোরাজ্যে যাহা কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে, সব শক্তি-আরাধনার ফলে। জড়শক্তি বলিয়া যাহা সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষগোচর, তদারাধনার ফলেই তাহার

শরীর-বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, রোগ-শান্তি, মহামারীর প্রতিবিধান, আহার-সংস্থান, ধনাগমের বিবিধ উপায়, যুদ্ধবিগ্রহের উপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি করতলগত। তেমনি, মানসিক শক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত, তদুপাসনায় মানবের মনোবিজ্ঞান, কবিত্ব, সংযম, বিবাহ-বিধান, সভ্যতা, নীতি, সমাজগঠন, রাজনীতি প্রভৃতি ; এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, সন্তোষ, শমদমাদি সাধন-সম্পত্তি এবং পরিশেষে সর্ব্ববাধা-বিনির্ম্মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থও তাহার আয়ত্তীভূত। ঐ সকল বহুলোকের বহুকাল ধরিয়া বহুভাবে শক্তি-উপাসনার ফলে আসিয়া উপস্থিত হয়।

সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নির্ব্বীর্য্য, ধর্ম্মহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন! দোষ—পূজাবিধির ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন এবং নির্জ্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফলপ্রত্যাশা কোথায়? তাহার ইষ্টশক্তি উপাসনা-অঙ্গহীন। স্বদেশের কল্যাণসাধনের জন্য যিনি অহরহঃ বক্তৃতাদানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু স্বার্থত্যাগে সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ, তাঁহার উপাসনাই বা কি ফলপ্রদান করিবে? এইরূপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পূজা করিয়া বলিবে—'পূজার ফল পাইলাম না।' হায় মানব, তোমার সহজ বুদ্ধিরও কি একান্ত অভাব হইয়াছে?

বলিদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ। ছাগ-মহিষ-বলি ত অনুকল্প মাত্র। হৃদয়ের শোণিতদান, যে উদ্দেশ্যে পূজা সে উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব। সর্ব্বত্যাগে অমরত্ব-লাভ, বিদ্যার জন্য ত্যাগে বিদ্যালাভ, ধন-জন্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রভুত্বের জন্য ত্যাগে প্রভুত্বলাভ, এই রূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ বা বলি-মাহাত্ম্য নিত্যপ্রত্যক্ষ।

অন্য দেশে মা শতহস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে! অন্যের পদাঘাতপীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক। কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞান-সমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে, আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতিযত্নে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ! উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে, আর তুমি অবিদ্যা-সেবায় যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসুখ লইয়া বসিয়া আছ! জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? শাস্ত্র যে তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া রুধিরপ্রিয়া। দেবীর ঐ ভাব যে তাঁহার ধ্যান-মন্ত্রেই রহিয়াছে। ঐ শুন, ভারতের তন্ত্রকার তোমায় কি ভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন: "প্রতিকার্য্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখত্যাগে আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর, তাঁহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে—শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি প্রসন্না হইবেন।"

আমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান

স্বামী বোধানন্দ

(২)

রিপণ কলেজের প্রফেসার ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল। এক দিন টিফিনের ছুটির সময় তাঁহাকে ধরা গেল। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কথা উত্থাপন করা মাত্র তিনি দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে ৺রামচন্দ্র দত্তের বাগানের উৎসবের কথা বলিলাম। তিনি কেন উৎসবে যান নাই জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব নাই, তিনি সর্ব্বদা বিরাজমান। আমাদিগকে বরাহনগর মঠে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে দেখিতে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা "কাম-কাঞ্চন" ত্যাগ করিয়া নিভৃতে সাধন-ভজন দ্বারা পরমহংসদেবকে ঠিক্ ঠিক্ জানিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। রাম বাবু প্রমুখ গৃহী ভক্তদের সঙ্গে তুলনায় বলিলেন. "সন্ন্যাসী শিষ্যগণ জাত্-আম—যেমন ফজলী, ল্যাংড়া কিন্তু এখনও পাকে নাই। গৃহী শিষ্যগণ টোকো আম, কিন্তু পেকেছে।" তিনি বরাহনগর মঠে যাইয়া তাঁহাদের দর্শন ও সেবা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। অতঃপর আমরা ৪'৫ জন মিলিয়া এক দিন বৈকালে বরাহনগর মঠে গেলাম। পূজাপাদ শশী মহারাজকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিলাম। আমরা কলেজে পড়ি শুনিয়া তিনি পড়াশুনা সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যার্থীদের খুব পড়াশুনা করিতে বলিতেন। তাঁহার উপদেশ ছিল লেখাপড়ায় "বুদ্ধিশুদ্ধি" হয়। ক্রমে বেলা ৪টা হইল। ঐসময় ঠাকুর-ঘর খোলা হইলে শশী মহারাজ আমাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন এবং আর এক জন স্বামী আমাদিগকে একটি একটি প্রসাদী ফুল দিলেন। আমরা উহা মস্তকে ধারণ করিয়া চাদরের খুটে বাঁধিয়া রাখিলাম। তাহার পর ফল, মিষ্টান্ন, সরবৎ ইত্যাদি দিয়া ঠাকুর-ঘরে বৈকালিক ভোগের ব্যবস্থা এবং পরে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। আমরা প্রসাদ পাইয়া হাতমুখ ধুইয়া আবার তাঁহাদের আসনের নিকট যাইয়া বসিলাম।

বাড়ীটি অতি পুরাতন। প্রায় অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতলে মঠ অবস্থিত। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দরদালানের বাঁদিকের দরজা দিয়া মঠে প্রবেশ করিতে হয়। একটি বড় ঘর ও দালান। উহার পাশে রান্নাঘর ও খাইবার ঘর। তাহার পিছনে পায়খানা। দরজা দিয়া ঢুকিয়াই বাঁদিকে একটি ছোট ঘর ছিল। উহাতে পূজার জিনিস পত্র ও চাল, ডাল ইত্যাদি থাকিত, উহার পাশেই ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘরের দক্ষিণে আর একটি ছোট ঘর ছিল। উহার পূর্ব্ব দিকের দরজাটি দিয়া দরদালানে যাওয়া যাইত। ঐ তলাতেই দক্ষিণাংশে একটি বড় ঘরে লাইব্রেরী ছিল। সে ঘরটিতে সন্ন্যাসীরা কখন কখন বসিতেন; কিন্তু উহা মঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ভাড়া খুব অল্পই

ছিল। বোধ হয় মাসিক ১০ টাকা কি ১২ টাকা। বাড়ীটি বরাহনগরের এক জন সম্ভ্রান্ত জমিদারের। তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা খারাপ হওয়ায় মেরামতের অভাবে বাড়ীটি ঐ দশায় পরিণত হইয়াছিল। কোন গৃহস্থ নানা বিভীষিকার ভয়ে বাড়ীটি ভাড়া নেয় নাই। যে অংশটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল সেখানে স্তূপাকার ইঁট ছিল। উহার মধ্যে গোক্ষুর, কেউটে ইত্যাদি সাপ যথেষ্ট থাকিত। অনেকের ধারণা ছিল ঐ বাড়ীটিতে ভূত বাস করিত। যাহা হউক, ঐ সব বিভীষিকা সাহসী সন্ন্যাসিগণকে ভীত করিতে পারে নাই। ঐ মঠে তাঁহারা সর্ব্বদা সাধন-ভজনাদি অভ্যাস করিতেন এবং তাঁহাদের পবিত্র জ্যোতির সম্মুখে কোন দুষ্ট জীবজন্তু আসিয়া অনিষ্ট করিতে সাহস করিত না। পরে যখন পতঞ্জলির যোগসূত্রে—"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াম্ তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" পড়িলাম, তখন উক্ত মঠে ঐরূপ সর্পাদি সত্ত্বেও কেন স্বামীদের কোন অনিষ্ট হয় নাই তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। ঐদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া প্রণামানন্তর কলিকাতায় ফিরিলাম। শশী মহারাজ আবার যাইতে বলিলেন। তিনি সুবিধা হইলেই মাষ্টার মহাশয়ের (৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সঙ্গে দেখা করিতে ও তাঁহার মুখ হইতে ঠাকুরের কথা শুনিতে আদেশ দিলেন। ঐ সময় মাষ্টার মহাশয় প্রায় প্রতি শনিবার মঠে যাইয়া রবিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিতেন। ছুটির সময়ও অনেক দিন মঠে কাটাইতেন। তখন মাষ্টার মহাশয় কলুটোলায় থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে আমরা প্রায়ই যাইতাম।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শরীররক্ষা করেন। তাহার কয়েক মাস পরেই উক্ত মঠ স্থাপিত হয়। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), তারক (স্বামী শিবানন্দ) প্রমুখ শিষ্যেরা পরমহংসদেবের শিক্ষানুযায়ী ত্যাগব্রতে ব্রতী হইয়া তাঁহার লীলাকালেই এক প্রকার সন্ন্যাসে দীক্ষিত হন। সাধন-ভজন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের পদানুসরণ করাই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার শরীররক্ষার পর তাঁহারা একটি মঠ স্থাপন করিয়া সেইখানে সন্ন্যাসজীবন যাপন করিবার জন্য বরাহনগরে উক্ত বাড়ীটি ভাড়া লইয়াছিলেন। ভক্তবর ৺ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় ভক্তেরা ঐ বাড়ীটি ঠিক্ করিয়া দেন। ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (সুরেশ বাবু) প্রথমে উহার ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেন। মঠস্থাপনের দুই বা তিন বৎসর পরেই তাঁহার শরীরত্যাগ হয়। অতঃপর ৺বলরাম বসু মহাশয় খরচ-পত্র দিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারও শরীর গত হয়। তৎপরে ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংসারিক অনেক দারিদ্র্য সত্ত্বেও যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতেন।

বরাহনগরের বাড়ীতে মঠটি প্রায় ৪ বৎসর ছিল। উক্ত মঠে যাতায়াত-কালের দুই একটি ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। একদিন চৈত্র-সংক্রান্তির সময় মঠে গিয়াছিলাম। সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীত) আমাকে বলিলেন, "ওহে, আজ গ্রামে ভিক্ষা করতে যাবো, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?" আমি স্বীকার করিলাম। সিঁড়ি দিয়া নামিবার পর তাঁহার হস্তস্থিত একখানি গেরুয়া কাপড় আমাকে পরিতে এবং আমার সাদা ধুতিখানি খুলিয়া পুঁটলি পাকাইয়া এক কোণে রাখিতে বলিলেন। আমি তাহাই করিলাম। ঐ দিন আমার গেরুয়া কাপড় পরা আর কোন স্বামী দেখেন নাই। আমরা সিঁথির দিকে গিয়া পাঁচ বা সাত বাড়ীতে ভিক্ষা করিলাম। দ্বারে গিয়া "জয় রাধে কৃষ্ণ" বলিয়াছিলাম। মঠে ফিরিবার

সময় বরাহনগরের সর্ব্বমঙ্গলা দর্শন করিয়া আসিলাম! মঠে ফিরিয়াই সিঁড়ির নিম্নে গেরুয়া কাপড়খানি ছাড়িয়া আবার শাদা ধুতিখানি পরিলাম। তার পর দুই জনেই উপরে উঠিয়া শশী মহারাজ প্রভৃতিকে ভিক্ষা করার কথা বলিলাম। ঝুলি খুলিয়া চাউল বাহির করা হইল। ঐ ভিক্ষালব্ধ চাউলে বোধ হয় সেদিন ঠাকুরের ভোগ হইয়াছিল।

যখন বরাহনগর বাজারের নিকটস্থ রাস্তা দিয়া সিঁথির দিকে যাইতে ছিলাম, সেই সময় কলিকাতায় আমাদের প্রতিবেশী ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জামাতা রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত হঠাৎ দেখা হইল। তিনি তখন শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলেন। গেরুয়া পরিয়া এক জন সন্ন্যাসীর সহিত যাইতেছি দেখিয়া তিনি একটু চমকিত হইলেন। সে সময় কোন কথা হইল না। শ্বশুরবাড়ী পৌছিয়াই তিনি ঐ কথা তাঁহার সম্বন্ধীদের বলেন। তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া উহা আমাদের বাড়ীর লোকদের জানায়। ইহা শুনিয়া সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, ঐ দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিবার পর ঐ উদ্বেগ আর কাহারও রহিল না। রামলাল বাবু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া ঐ কথা সকলকে বলিবেন, এইরূপ সন্দেহ আমারও হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুবিধা হইলেই আমরা বরাহনগর মঠে আসিতাম। কখন কখন শশী মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসীদের আদেশ-মত দুই তিন দিন থাকিয়া যাইতাম। মঠে সমস্ত ধর্ম্মমত সম্মানিত হইত। বিশেষতঃ খ্রীষ্টমাসের সময় বাইবেল্ হইতে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত-পাঠ, পিষ্টক-উৎসর্গ, মেরী ও দ্বাদশ শিষ্যের গুণকীর্তন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা উপলক্ষে অষ্টপ্রহরব্যাপী পূজা করার নিয়ম ছিল। দিবাভাগে দশাবতারের ও রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে হোমান্তে পূজা শেষ হইত। উহার পরবর্ত্তী রবিবারে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগানে সাধারণের জন্য উৎসব হইত।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠের তিথিপূজা ও দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে আমরা প্রতিবৎসর যোগদান করিয়াছিলাম। ঐ সময় দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে প্রথম দুই তিন হাজার হইতে পরে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগম দেখিয়াছি। উক্ত তিথিপূজার ও উৎসবের বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। তখনকার মতন এখনও উহা বেলুড় মঠে সম্পাদিত হয়। তবে উভয় ব্যাপারেই আরও অনেক বেশী জনসমাগম হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বরাহনগর মঠের বাড়ীটি অতি পুরাতন ছিল। ৺শারদীয়া পূজা, ৺কালীপূজা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, খ্রীষ্টমাস্ প্রভৃতি পর্ব্বেও তিথিপূজার দিন বহু ভক্ত তথায় আসিতেন। বৈঠকী গান, কীর্ত্তন, আলোচনা ইত্যাদি খুব হইত। কখন কখন সকলে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতাম। তখন বাস্তবিকই বাড়ীটি কাঁপিত। এক দিন আরাত্রিকের পর ৺ সতীশচন্দ্র ঘোষ (মোট্‌কো) "হর হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" বলিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই সময় বাড়ীটি এত কাঁপিয়াছিল যে আমার ভয় হইল বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তিনি স্থূলকায়, দীর্ঘ, সবল ও ভাবুক লোক ছিলেন এবং নৃত্যের সময় উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন।

এক সময় কলেজ কামাই করিয়া দুই তিন দিন বরাহনগর মঠে ছিলাম। শশী মহারাজ উহা জানিতে পারিয়া আমাকে অত্যন্ত ধমকাইলেন এবং তখনই বাড়ী ফিরিয়া পড়াশুনায় মন দিতে বলিলেন। তাঁহার ধমক শুনিয়া আমি এত কাঁদিয়া

ছিলাম যে তাহা দেখিয়া তিনি সে দিনটা মঠে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তখন বেলা ১০ টা কি ১১ টা। উহার ঘণ্টাখানেক পরেই আমার পিতা আমার অনুসন্ধানে মঠে যাইয়া উপস্থিত হন। শশী মহারাজ প্রভৃতি তাঁহাকে খুব যত্ন করিয়াছিলেন। আমার পিতা বয়সে তাঁহাদের অপেক্ষা প্রাচীনতর হইলেও তাঁহাদের আসনের পাশে বসিয়া অনেক ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শশী মহারাজ তাঁহাকে স্নানাদি করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। সে দিন ছিল একাদশী। একাদশী দিন তিনি অন্নভোজন করিতেন না এবং একাহার করিতেন। তিনি পরগোত্র-পক্ক অন্ন ভোজন করিতেন না। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বরাহনগরের মঠটি গঙ্গার খুব সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল। তিনি গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। ঘাটে ৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় ও অনেক কথাবার্ত্তা হয়। মহেন্দ্র বাবু কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "মঠের সন্ন্যাসীরা গিরেবাজ পায়রার ন্যায়। অনেক উপরে উড়িয়া অন্য পায়রাদের আকর্ষণ করিয়া নিজেদের দলে আনে।" মহেন্দ্র বাবুর ঐ কথাটি তিনি কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন বলিতে পারিলাম না। বোধ হয় উহার লক্ষ্যার্থ না বুঝিয়া বাচ্যার্থই বুঝিয়াছিলেন। স্নানান্তে মঠে ফিরিবার পর সামান্য ফল ও সন্দেশ খাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে না আসিয়া ঐদিন সন্ধ্যার সময় ফিরিয়াছিলাম। শশী মহারাজ প্রমুখ যুবক সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়া আমার পিতা উঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার পর একবার দক্ষিণেশ্বরের উৎসবেও গিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে উঁহাদের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঐ সময় আহিরীটোলা হইতে আমাদের মত অনেকগুলি বালকও বরাহনগর মঠে প্রায়ই যাইত। তাহাদের মধ্যে কানাই, নন্দলাল ও নিবারণ মুখ্য ছিল। কানাই খুব দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল। ১৮৯২ বা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারের একটি বাড়িতে উঠিয়া যায়। আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিস নূতন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। কাপড় শুকাইবার জন্য প্রায় ৩০ হাত লম্বা একটি বাঁশ ছিল। লইয়া যাইবার অসুবিধা-বোধে ঐটি রাখিয়া যাইবার কথা হওয়ায় কানাই অনুনয় করিয়া বলিল, সে বাঁশটি কাঁধে করিয়া আলমবাজারের বাড়ীতে লইয়া যাইবে। কারণ, সেখানে উহার আবশ্যক হইবে। আলমবাজারের বাড়ীটি বরাহনগর হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে। কানাই সেই লম্বা বাঁশটি কাঁধে করিয়া বরাহনগরের বাজারের মধ্য দিয়া আলমবাজারের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল।

নিবারণকে পরে আমরা "বারণ ঠাকুর" বলিতাম। সে জাতিতে সুবর্ণবণিক্ ছিল। স্বামীজি আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর কয়েক জন ব্রাহ্মণেতর যুবককে উপবীত দান করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। নিবারণ উঁহাদের মধ্যে ছিল। সে উপবীতটির বিশেষ তোয়াজ করিত। আহিরীটোলার ঘাটে স্নান করিবার সময় পাড়ার ব্রাহ্মণদিগকে দেখাইয়া পৈতাটি তাঁহাদের মতন মাজিয়া গলায় ধারণ করিত। ব্রাহ্মণরা উহা দেখিয়া রোষপরায়ণ হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে ছাড়িতেন না। বারণ ঠাকুর বোধ হয় পাড়ার ব্রাহ্মণদের চটাইবার জন্যই পৈতাটির ঐরূপ যত্ন লইত।

"যত মত, তত পথ"

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

সকলেই এখন মেনে নিয়েছেন যে ভারতীয় (হিন্দু) সভ্যতার অন্যতম বড় কথা হ'চ্ছে "যত মত, তত পথ"। বিষয়টী হিন্দু শাস্ত্রে এত সংক্ষেপে সূত্রাকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের আগে কেউ বলেন নি, যদিও হিন্দু শাস্ত্রে অনুরূপ ভাবের উক্তির অভাব নেই, আর অনুরূপ ভাবের আচরণ ভারতের তাবৎ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ক'রে এসেছেন। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিল-নানা-পথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"—মহিম্নঃ স্তোত্রে প্রায় এক হাজার বছর আগে অনুরূপ কথাই বলা হ'য়েছে—'মানুষ নিজ নিজ রুচির বিশিষ্টতা হেতু, সরল বা কুটিল নানা রকমের পথ বেছে নেয়, কিন্তু সকল জল যেমন সমুদ্রের মধ্যেই গিয়ে পড়ে, তেমনি তুমি, হে ঈশ্বর, নানা বিভিন্ন রুচির মানব-সমূহের একমাত্র গম্য বা উদ্দেশ্য স্থান'। গীতাতেও একাধিক স্থানে এই ভাবেরই কথা আছে, উপনিষদে আছে, অন্য শাস্ত্রেও আছে। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—'যা আছে তা এক ; পণ্ডিতেরা নানা ভাবে তারই কথা বলেন,' এই ধরণে, আমাদের সব চেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেও সমস্ত ধর্মের মূল-গত এই একত্বের কথাই ঋষি ঘোষিত ক'রেছেন। এই বোধ বা বিচার, যে সদ্ভাবের সঙ্গে অনুশীলন ক'রলে সব ধর্মই ভগবানেই নিয়ে যায়, আর একটা বিশেষ ধর্মমত বা পথের প্রতি পরমেশ্বরের পক্ষপাত থাক্‌তে পারে না,—এটী যেন আমাদের হিন্দু জাতি, জীবনে জল বাতাস আলোর মত, সহজ প্রকৃতি-দত্ত ব্যাপার ক'রে নিয়েছে। হিন্দু উদারতা দেখিয়ে, দয়া প্রকাশ ক'রে, আর ধর্মের সম্বন্ধে কেবল এ কথা ব'লে না যে, "হাঁ তোমার ধর্মে সত্য আছে বৈ কি—নিশ্চয়ই অনেক কিছু সত্য চিন্তা, সত্য ধারণা, সত্য আদর্শ আছে। এই সব কারণে তোমার ধর্ম অনেকটা আমার ধর্মের কাছাকাছি পৌছায়।" না, এ ভাবে উদারতা দেখিয়ে, ব্যাজস্তুতি ক'রতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমাদের মনোভাব বরং এই প্রকারের—"দেখ, আমার ধর্ম আমার কাছে যেমন সত্য, তোমার ধর্মও তোমার কাছে তেমনি সত্য। আমি ভাবশুদ্ধির সঙ্গে আমার নিজের ধর্ম যদি পালন করি, তাতে যদি খাঁটি থাকি, তা হ'লে, আমি যেমন জীবনে সিদ্ধি বা পুরুষার্থ পাবার আশা রাখি, তেমনি তুমি যদি তাই করো, তোমার ধর্মকেই অবলম্বন ক'রে তোমারও সিদ্ধিলাভ হবে। তবে একটী কথা—কেউ কারো ধর্ম পালন করবার সময় অপরের মনে কষ্ট দেবে না, অপরের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারের উপরে হাত দেবে না, নিজের ধর্মের বিধি-নিষেধ অপরে যদি স্বীকার না করে, তার উপরে জবরদস্তি ক'রে চাপাবার চেষ্টা ক'রবে না।" এই ভাবে হিন্দু এই কথাটী বরাবর ভেবে এসেছে—ব'লেও এসেছে। সহজাত কবচের মত এটী হিন্দু সন্তান ব'লে, শ্রীশ্রীপরম-হংসদেব তাঁর চিন্তাধারার অচ্ছেদ্য অঙ্গ-স্বরূপে সঙ্গে নিয়েই ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন ; আর এটী তাঁর নিজের জীবনের বিশেষ কথা।

খালি এই সহজ বোধ নিয়েই তিনি অবতীর্ণ হন নি, তিনি জীবনে বিভিন্ন ধর্ম-সাধনার বিশিষ্ট রস আস্বাদন ক'রতে চেয়েছিলেন, ক'রেও ছিলেন। তাই এ যুগে, হিন্দু ভারতের চিন্তার এই মর্ম-কথাটা এত জোর ক'রে তিনি আধুনিক জগৎকে শোনাতে পেরেছিলেন। আর তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শিক্ষার ফলেই, পৃথিবীতে ধর্ম-সমন্বয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ প্রায় সব দেশে উদার মতের চিন্তাশীল লোকেদের মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে। "যত মত, তত পথ" এই সূত্রে নিহিত মনোভাব হ'চ্ছে সুসভ্য মনোভাব, বিশ্বমানবিকতার হাওয়া এর মধ্যে বইছে, মানুষে মানুষে ভেদ-দুরীকরণের মন্ত্র এটা।

আমরা হিন্দু জাতি বা সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্যাপকভাবে মনে প্রাণে এবং আচরণে এই মন্ত্র গ্রহণ ক'রতে পেরেছি কিনা, তা এখন বিচারের বিষয়। আমার মনে হয়, ধর্ম-বিষয়ে অসহিষ্ণু গোঁড়ামি আমাদের মধ্য থেকে পুরোপুরি দূর হয় নি। জাতীয়তা-বোধ, নিজের জাতির সম্বন্ধে একটা অনুচিত উচ্চ ধারণার পোষণ থেকে, যুক্তি-তর্ক-বিরোধী অহমিকার ভাব থেকে, আমাদের অনেকে মুক্ত হয় নি। এটা যদি কেবল positive অর্থাৎ বিষয়ৈক-মাত্র-নিবদ্ধ থাকৃত, তা হ'লে এতে আপত্তির কিছু হ'ত না। কিন্তু যখনই তুলনায় আমার জাতের চেয়ে পৃথিবীর তাবৎ জাতির মানুষকে, আমার ধর্ম আর আমার ঐতিহ্যের, আমার ভাষার, আমার সংস্কৃতির আর আমার জীবন-যাত্রা-পদ্ধতির অধিকারী তারা নয় ব'লে, তাদের একটু নীচু একটু ছোট ব'লে মনে করি, তখনই আমার এই কথা যে, "যত মত, তত পথ" তা বল্‌বার অধিকারকে আমি ক্ষুণ্ণ করি। "আমরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, আর সকলে আমাদের পরে"—এই রকম মনোভাবকে সভ্যজনোচিত বা সংস্কৃতি-পূত বলা চলে না। কিন্তু এই রকমের মনোভাবকে শিখিয়ে, পড়িয়ে, বুঝিয়ে, সত্যদৃষ্টির পথে আনা যায়; সত্য-সত্য যাদের চিন্তা-জগতের পটভূমিকা রূপে,—সমস্ত ধর্ম-চেষ্টার পিছনে যে সত্য জিনিস বিগুমান, সব ধর্ম-চেষ্টাই যে সার্থক, কেউ ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয় কেউ বিশেষ দ্বেষ্য যে নয়—এই রূপ বোধ আছে, তাদের মন থেকে, ঈশ্বর কেবল আমার জাতের বা আমার ধর্মের, কেবল আমরাই ঈশ্বরের খাস তালুকের প্রজা—এই ধরণের blasphemy বা ঈশ্বর-নিন্দা থেকে মুক্ত করা কঠিন হয় না।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা "যত মত, তত পথ" এই মহাবাক্য নিয়ে ভাব-বিলাস করে, কিন্তু বিশেষ কোনও একটা মত বা পথ ধ'রে চলাটাকে তারা অজ্ঞ, প্রাকৃত-জনের, অসংস্কৃত নিম্ন-পর্য্যায়ের মনের পরিচায়ক ব'লে মনে করে। মানুষের নৈতিক আর ধার্মিক জীবন যে হাওয়ায় উড়ে' বেড়ায় না, মানুষের এই নৈতিক আর ধার্মিক জীবন যে তার সামাজিক মাধ্যমকে, তার স্বজাতির আধ্যাত্মিক আর মানসিক পারিপার্শ্বিককে আশ্রয় ক'রেই মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে' থাকে, আর এই ভাবে সে ভীষণ দুঃখ-কষ্ট আর নৈরাশ্যের ধাক্কা পেয়েও নিজ প্রতিষ্ঠায় অটল থাকে,—এটা এরা বুঝতে চায় না, পারে না, বা বুঝবেই না। এ যেন বিশ্বনারীর সঙ্গে প্রেমে প'ড়বে, কিন্তু জীবনে একটা নারীকে বিবাহ ক'রে তার ভার নেবে না। সাধারণ ভাবে ধর্ম আর আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্য স্বীকার ক'রবে, কিন্তু কোনও বিশেষ ধর্ম—আর স্পষ্ট ভাবে যে ধর্মের আব-হাওয়ায় তার জন্ম-কর্ম, যে বিশেষকে ধ'রে তার নিজ জাতীয় আর ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব, অভিব্যক্তি বা বৈশিষ্ট্য—তার সম্বন্ধে কোনও

মমতা পোষণ ক'রবে না। তাকে এড়িয়ে' চলবার চেষ্টা ক'রবে। আবার এরা ইউরোপে religion বা ধর্মের যে সংজ্ঞা, ধর্ম অর্থে formal religion বা অনুষ্ঠান আর আস্থামূলক দৈব-প্রত্যয়, সেই সংজ্ঞা ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মের উপরও ভুল ক'রে আরোপ ক'রে, স্বধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার জন্য ঘটা ক'রে বাহ্যিক চেষ্টা দেখায়। হিন্দুর কাছে ধর্ম হ'চ্ছে একটা Way of Life, জীবন-যাত্রার পথ—কতকগুলো গায়ের জোরে-মেনে-নেওয়া creed বা আস্থামন্ত্র আর কতকগুলো অনুষ্ঠান মাত্র যে নয়, তা বুঝবে না। এই ধরণের লোকের "হিন্দু" নামেই আপত্তি। Religion in the Abstract, আদর্শ-রূপে অবস্থিত সাধারণ ধর্ম—এই আলেয়ার পিছনে ছোট্‌বার ফলেই দাঁড়িয়েছে, আমাদের জোর গলায় চেঁচিয়ে বলা Secularism—আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, Secular রাষ্ট্র। Secular ব'লে চেঁচিয়ে', আমরা হিন্দুত্বের বিষাক্ত ছোঁয়াচ থেকে নিজেদের অতি সন্তর্পণে পৃথক্ রাখতে চেষ্টা ক'রছি, অন্ততঃ আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে—আর কার্যতঃ আমরা যেমন একদিকে এর ফলে Godless বা ঈশ্বর-বর্জিত হ'য়ে প'ড়ছি, তেমনি অন্য দিকেও বিশ্বমানবিকতার প্রতি অতিমাত্রায় ঝোঁক দিয়ে denationalised বা স্বাজাত্য-বর্জিত এবং সঙ্গে-সঙ্গে deracine' বা মূলোৎখাত হ'য়ে প'ড়েছি। জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্ধ গোঁড়ামি আর তজ্জাত অহমিকা যেমন খারাপ, এই ধরণের স্বাজাত্য-বোধ-হীনতা আর স্বধর্ম-নিস্পৃহতাও তেমনি মারাত্মক। এতদিন পরে সোভিয়েট রুষ তার ভুল বুঝেছে, ঝোঁক অন্যদিকে এখন চ'লেছে; তাই Holy Russia-র কথাও শোনা যাচ্ছে, রুষের খ্রীষ্টান ধর্মের পুনরুজ্জীবনও ঘ'টছে, Igor ইগর প্রমুখ প্রাচীন রুষ শূর-বীরদের জীবন আর চরিত্রের আবাহনও চ'লেছে।

গোঁড়ামি বেশী দেখা যায় কূপমণ্ডুক-মনোভাবের লোকেদের মধ্যে—বাইরের জগতের কোনও খবর যারা রাখে না, তার সম্বন্ধে যাদের কৌতূহলও নেই। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ইংরেজীর সঙ্গে পরিচয়, আর বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা,—কূপমণ্ডুকতা দূর করবার একমাত্র উপায়। এই উপায়কে অস্বীকার করার ফল হবে মানসিক আত্মহত্যা। আমরা এখন স্বাধীন হ'য়েছি। স্বাধীনতা মানে বাইরের সব-কিছু থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করা নয়। আমি দেখেছি, ইংরেজ এদেশ থেকে যখন গেল, তখন ইংরেজের সঙ্গে যা কিছু এ দেশে এসেছে, বিশেষতঃ মানসিক জগতে, সে-সবকে দূর ক'রে দেবার আগ্রহ কোনও-কোনও স্থলে দেখা দিয়েছে, দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এই বহিষ্কার-করণের চেষ্টায় একটী নীতিনিষ্ঠতা নেই। যে-সব জিনিসে আমার বাহ্য জীবনে সুবিধা আছে, সেগুলি ছাড়বো না; কিন্তু যেগুলিতে আমার যুক্তিহীন গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রশ্ন জাগে, বাধা আসে, সেগুলিকে দূর ক'রে দাও। এই মনোভাব শিক্ষা-জগতে কোথাও-কোথাও আত্মপ্রকট হ'চ্ছে। মানব-চিন্তা আর মানসিক সংস্কৃতি এক এবং অখণ্ড, এরূপ উপলব্ধি যাঁদের আছে, তাঁরা ভারতে এখন কয় জন? তাঁদের প্রভাব, এই উৎকট ধরণের প্রত্যাখ্যান-ধর্মী বা বর্জন-পরায়ণ স্বাজাত্য-বোধকে কতটা রুখ্‌তে পারবে? বিশ্বজগৎ থেকে, আর পাঁচটা জাতির সংগে সংযোগের সাধারণ ক্ষেত্র থেকে, পৃথিবীর সব জাতির সঙ্গে আপসের মধ্যে সাংস্কৃতিক লেন-দেনের হাট থেকে, নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে নেবার একটা প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি যে আত্মকেন্দ্রী গোঁড়ামির মধ্যে আছে, সেটা যদি আবার শক্তিশালী হয়, তাহ'লে আমাদের মানসিক উদারতায় আর

তার সঙ্গে সত্যকার সংস্কৃতির পক্ষে বড় আশা নেই। এখানে "যত মত, তত পথ" এই শিক্ষার অন্তর্নিহিত ভাব-ধারার প্রচারের জন্য মস্ত বড় ক্ষেত্র আছে ; এই ভাবধারার সম্যক্ বিচার আর বোধের মধ্যে আমাদের হিন্দুজাতির বিশ্বাত্মবোধের সঙ্গে পরিচয় হবে, দৃষ্টিকোণ অন্য ধরণের হ'য়ে যাবে, গোড়ামির আতিশয্য থেকে আমরা মুক্তিলাভ ক'রবো—জগতে যেখানেই আর যে কোনও জাতির মধ্যে হোক্ না কেন, যা কিছু ভাল, যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু সুন্দর ও শোভন, আর যা কিছু সচ্চিন্তার পোষক, সে-সমস্ত ভগবানের তেজের অংশ আর তাঁর দান ব'লে গ্রহণ ক'রতে আমাদের আপত্তি হবে না।

বিশ্বাত্মা সম্বন্ধে অনুকম্পা বা সহানুভূতি, বিশ্বাত্ম-সাধন, এটা কঠিন কথা হয় না। কিন্তু এই বিশ্বাত্মার বিশিষ্ট প্রকাশ, যা আমার জাতির মধ্যে আমার ধর্ম আর আমার সংস্কৃতির মধ্যে হ'য়েছে, তার প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপনের মনোভাবকে দূর ক'রে, আবার তাতে স্থির আর সুস্থিত হ'য়ে চলা, বোধ হয় কঠিনতর ব্যাপার। আমাদের দেশে উপস্থিত কালে ভাব-জগতে এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ওদিকে বিশ্বজগতের সামনে ভারতের বৈধ প্রতিভূ পণ্ডিত জবাহরলাল ব'লেছেন যে তিনি হিন্দু সংস্কৃতি জানেন না, মানেন না, ভারতীয় সংস্কৃতিই বোঝেন ;—তাঁর কথায় কতদূর confusion বা চিত্ত-বিভ্রম যে ঘটে, তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন যে-কেউ বুঝতে পারবেন। আর এদিকে ইস্কুলের ছোকরাটাও ব'ল্‌ছে, "ওসব হিন্দু-ফিন্দু বুঝি না, মানি না।" আবার এই ছোকরাদের দল এসে ব'লবে—"স্যর্, আমরা একটা Cultural Conference ক'রছি, আপনি এসে বৃহত্তর-ভারতে হিন্দু জাতির দান সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।"

হিন্দুয়ানির ধ্বজা তুলে—জাতি-বিশেষের, হিন্দুজাতির নামে চড়াও হ'য়ে, অন্য জাতির ন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযান ক'রতে কোনও হিন্দু চিন্তা-নেতা তো কাউকে উপদেশ দিচ্ছেন না। হিন্দুর বিশ্বজনীন মতবাদের প্রতিকূল বা বিরোধী অন্য মতবাদকেও জোর ক'রে উৎখাত ক'রে দেবারও কথা নয়। কথা হ'চ্ছে, নিজেকে জানবার—নিজের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা বুঝে, নিজের জাতের মধ্যে ভাল আর মন্দ কি কি আছে তার পরীক্ষা ক'রে, তার ভালটুকুকে রক্ষা কর্‌বার চেষ্টা—নিজের জাতির মতের মধ্যে পুরুষার্থ-সাধনের, মনুষ্যত্ব-লাভের পথ কতটা পাওয়া যায়, সেইটুকু আবিষ্কার করা। আমরা পৃথিবীর আর পাঁচটা জাতের মতই মানুষ, তার বেশী তো নই। তবে আমার জাতের মধ্যে, অন্য জাতির মানুষের মধ্যে যেমন, ভাল-ও আছে মন্দ-ও আছে ; মন্দটুকুকে দূর ক'রবো ; ভাল যা আছে, তার দ্বারা নিজেদের সত্যকার উপকার আর তা ছাড়া বিশ্বমানবের কোনও সেবা হ'য়েছে কি না, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেটা বিচার ক'রে দেখবো। যদি দেখি যে, আমার জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা আর শ্রেষ্ঠ কর্ম মানুষের কাজে লেগেছে, তাহ'লে নিজের জাতির সম্বন্ধে লজ্জিত হ'য়ে মাথা হেঁট কর্‌বার তো কারণ থাকে না। মাথা হেঁট কর্‌বার মধ্যে যে লাঘব আছে, তাকে কাটিয়ে' উঠ্‌তে অনেক সময় লাগে, অনেক চেষ্টা ক'রতে হয় তার জন্যে। এই লাঘব-বোধ জীবনে একটা বড় handicap অর্থাৎ ভার বা বাধা। আমার অর্থাৎ আমার জাতির মানুষের মধ্যে গৃহীত বা প্রচলিত বা প্রচারিত চিন্তা, মত বা মনন, আমাকে পথ বাতলে দেয় কি না—এটা বিচার ক'রে দেখ্‌বার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যদি সে রকম পথ এর থেকে পাওয়া যায়, তা হ'লে তো এতে লজ্জিত

হবার কারণ নেই। বরঞ্চ অন্যের প্রতি সম্মান ও সৌজন্য দেখিয়ে' বিনীত ভাবে যদি বলা-ও যায়. "আমরা যা, তার জন্য লজ্জিত হবার কারণ দেখি না; বরং গৌরবের কথাও আমাদের কিছু আছে, যেমন অন্য নানা জাতির মানুষেরও আছে" —তাতে মানব-সমাজে আমরা ক্ষমার পাত্র-ই থাক্‌বো, তার জন্য কেউ আমাদের উপরে ন্যায়-সঙ্গত ভাবে উষ্মা প্রকাশ ক'রতে পারবেন না। ভবের হাটে মানুষের কারবার ক'রতে হ'লে, তার একটা স্থূল আর সহজ, খাঁটি আর ন্যায্য কর্মনীতি, আমাদের গ্রাম্য দার্শনিকের মুখ দিয়ে, মাণিকপীরের ছড়ার মাধ্যমে কবি ব'লেছেন—"আপনার গণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গণ্ডা পরকে দেবা—মানী লোকের রাখ্‌বা মান।" এখন কিন্তু এমন এক অদ্ভুত চিন্তা-ধারা এসে আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে কার্য ক'রছে, যে তার ফল জাতির মনের আর কর্মশক্তির খর্বতা আর বিনাশ ছাড়া আর কিছু হবে ব'লে মনে হয় না। ফরাসীতে জঙ্গলের পশু সম্বন্ধে একখানা বইয়ে কে লিখেছিল—Cet animal est tres mechant—il se defende quand on l'attaque—'এই পশুটী অতি পাজী—কেউ একে আক্রমণ ক'রলে এ আত্মরক্ষা করে'—এই উক্তি, ফরাসী ভাষায় একটী রসিকতার কথা রূপে প্রচলিত। হিন্দুত্ব অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে নাড়ীর যোগ যে আমার আছে, এই জিনিস যে একান্ত ভাবে আমার, এটা অস্বীকার ক'রে, তবে আমার আধুনিকতা, আমার জাতীয়তা প্রমাণ ক'রতে হবে? হিন্দু জাতির মানুষ অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, বিধ্বস্ত হ'য়ে গেলেও, তার আত্মরক্ষার অধিকার তো আমি অস্বীকার ক'রবোই—যন্ত্রণায় তার কাতরানিকে আমি তার সংকীর্ণ জাতীয়তার পরিচায়ক ব'লে মনে ক'রে উপেক্ষা ক'রবো,—তার কণ্ঠরোধ হ'লে হয় তো মনে মনে খুশীই হবো যে "হাঁ, এত দিনে আমরা সত্য সত্য secular, সত্যকার আন্তর্জাতিক হ'লুম"—এইটেই যে এখন ভারতীয় Secularism-এর নিশানা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরণের আত্মহননশীল চিন্তাধারা থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে "যত মত, তত পথ" এই মহামন্ত্রের একদেশদর্শী অর্থ আঁকড়ে প'ড়ে থাকলে চ'লবে না;—circumference বা পরিধির মোহে, centre বা কেন্দ্র, যাঁতার খোঁটা বা চক্রের নাভিকে ভুল্‌লে, সোনা ফেলে আঁচলে গিরা দেওয়া হবে। "যত মত, তত পথ"—নিশ্চয়ই; কিন্তু মতের উপর জোর দিয়ে, "পথ"কে ভুললে তো চ'লবে না। আর পথ আমার পক্ষে হ'চ্ছে—আমার জাতির অভিজ্ঞতা থেকে গ'ড়ে উঠেছে যে পথ সেইটাই। যদি তার মধ্যে কোনও দোষ ত্রুটী অসম্পূর্ণতা, যুগের পক্ষে অনুপযোগিতা থাকে, সে-সব সংশোধন ক'রে নেবার দায়িত্ব আমাদেরই। তাকে অস্বীকার করা—নিজের ঐতিহ্য আর নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করাই হবে। "যত মত, তত পথ"—আমাদের পথ কি? কঃ পন্থাঃ? এই পথ পাবার জন্য আমাদের কোন মত সব চেয়ে কার্যকর হবে? হিন্দু মত, অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতি, সেটী একটী স্থিতিশীল বিষয় নয়, সেটী জীবনের আর সব জিনিসের মতই গতিশীল। সেই গতিশীল, যুগোপযোগী, প্রাচীনের প্রতিষ্ঠায় আর আধুনিকের আবশ্যকতায় গঠিত হিন্দু সংস্কৃতি, সেইটী আমাদের সহজাত বস্তু ব'লে, তার সাহায্য আমাদের পক্ষে অনিবার্য, আমাদের অপরিহার্য। আর সে সংস্কৃতির বৃত্তের মধ্যে যারা আছে, আমার হিন্দু জাতির মানুষ, তারাও আমার পরম আত্মীয়, তাদের রক্ষা আমার প্রাথমিক ধর্ম। দরদের সঙ্গে সমান-ধর্মা আর

সমান-সংস্কৃতিকদের দিকে না চাইলে, এই ধর্ম আর সংস্কৃতির প্রতিই ন্যায় আর নীতি অনুসারে আমার প্রথম কর্তব্য তা মনে না ক'রলে, বিশ্ব-মানবের সেবা করার উপযোগী আমি হ'তে পারবো কি ক'রে? আমার নিজের একটা কিছু থাক্‌লে তবেই তো তার সঙ্গে আর কিছু মেলাতে পারবো। এই নিজের অত্যন্ত নিকট একটা কিছুকে রক্ষা করবার, তার ক্ষেম আর তার যোগ, উভয় প্রকারে তার উন্নতি করবার দিকে ভগবান্ আমাদের দেশের নেতাদের মনে তাঁদের সুপ্ত চেতনাকে জাগরিত করুন, তাঁদের বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে আকর্ষণ ক'রে এনে আত্মস্থ করুন;—তবেই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র ভারতের প্রজার মঙ্গল হবে, "যত মত, তত পথ" এই মহামন্ত্রের সাধনার জন্য আমরা তখন উপযুক্ত হবো।

কালের যাত্রী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্র অতলস্পর্শ সীমাহীন অশান্ত দুর্ব্বার
তীরে দাঁড়াইয়া তার নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেখিলাম—
কোটি জীবনের উদ্ভব-বিলয় বারংবার,
সেথায় বালুকা স্তরে যেন মোরে খুঁজিয়া পেলাম।

কোটি কোটি বালুকার অন্তহীন সমুদ্রবেলায়
কোটি কোটি মানুষের জীবনের ধ্বংস-অবশেষ,
অথবা কালের যাত্রা-সৈকতের বিক্ষিপ্ত ফেনায়
আপনার প্রতিবিম্ব বিচূর্ণ দেখিয়া পাই ক্লেশ।

অভ্রভেদী শৈলচূড়া ঊর্দ্ধমুখে করি নিরীক্ষণ,
নিম্নে পথচিহ্ন নাই, ঘন বনে লুপ্ত দিবালোক,
গিরিশৃঙ্গ-বিজয়ের উল্লাসে ভরিয়া উঠে মন,
পাষাণে উৎকীর্ণ নাম অহঙ্কারে আবৃত নির্মোক।

চলার গতির বেগ স্তব্ধতার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
অতিক্রান্ত জীবনের স্তরে স্তরে আছে সঞ্চারিত;
এ আমি যে সেই আমি, আজি তাহা করি না বিশ্বাস,
পলে পলে তাই আমি আপনারে করি প্রবঞ্চিত।

পথে আছে পদচিহ্ন পবিত্র ধূলির পরে আঁকা
দূর দুর্গমের পথ, তবু পথ অতিক্রমি শেষে
নির্মেঘ আকাশ পরে নেহারিব শান্ত পূর্ণ রাকা,
একটি জীবন পরে আর এক জীবনে চলি ভেসে।

তন্ত্রের সাধনা ও তাহার ভিত্তি

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

ভারতবর্ষে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধনার ভিত্তি তন্ত্রে আছে। তন্ত্র শুধু সাধনার স্বরূপ দেখিয়ে তৃপ্ত হয় নি, এর অন্তরালে একটি দর্শন আছে। এই দর্শনের ও সাধনার ভিত্তি হল শক্তি। শক্তিকে তন্ত্র উড়িয়ে দেয় নি, শক্তিকে ভিত্তি করে শক্তির অতীত ভূমিকা ও ভাব অনুভব করতে তন্ত্র সব সময় চেষ্টিত। শক্তিকে অবলম্বন করেই শক্তিকে উত্তীর্ণ করেছে। বেদান্তে শক্তিবাদের বিশেষ কোন স্থান দেওয়া হয় নি, কিন্তু তন্ত্র শক্তিকে অবলম্বন করেই অদ্বৈত-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুটি পথ আছে: এক পদার্থের স্বরূপের বিশ্লেষণ করে ধীরে ধীরে পদার্থ যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সেই স্বরূপকে অনুভব করা। এটি হল বিচারমার্গ। আর এক মার্গ হচ্ছে শক্তিকে অবলম্বন করে শক্তির উৎপত্তি যেখানে এবং শক্তির আশ্রয় যেখানে তাকে ধরা। এটি তন্ত্রের মার্গ।

জগতের উৎপত্তি শক্তির সঙ্কোচে হয়, ব্যাপক শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে হতে নানা তত্ত্বে পরিণত হয়। তন্ত্রের মার্গ হল শক্তির এই সঙ্কুচিত অবস্থা দুরীভূত করে ক্রমশঃ কারণ-তত্ত্বে এবং কারণাতীত তত্ত্বে অবগাহন করা। ভারতীয় মনস্বীদের নিকট বিশেষতঃ উপনিষদের ঋষিদের নিকট এই তত্ত্বগুলি হল আকাশ, বায়ু, তেজ, বরুণ ও পৃথ্বী। মানুষের মনোবৃত্তিও এই সব তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। তত্ত্ব যত সঙ্কুচিত হয়, প্রসার তত হ্রাস হয়ে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে পৃথ্বীতত্ত্ব সব চেয়ে সঙ্কুচিত তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলি থেকে আমাদের বুদ্ধি প্রাণ ও মনের বিকাশ হয়। এই বিজ্ঞান একটি পরম বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান জানতে পারলে আমাদের প্রাণের গতি, মনের গতি সবই ধরা পড়ে। এই জন্য তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও জ্ঞান তন্ত্রের সাধনায় বিশেষ আবশ্যক। সাধনার পথে এই তত্ত্বগুলির জ্ঞান মানুষকে ক্রমশঃ স্থূল হতে সূক্ষ্ম জগতে নিয়ে যায়। এই সূক্ষ্ম জগতের স্পন্দনের সহিত পরিচয় করায় ক্রমশঃ কারণ-জগৎ স্ফুটতর হতে থাকে। যত সাধক সূক্ষ্ম এবং কারণ-জগতে প্রবিষ্ট হয়, তার জ্ঞান হয় তত ব্যাপক, স্থূল ভূতের সূক্ষ্ম ভূতের এবং কারণ সত্তার সত্য জ্ঞান তার কাছে উদ্ভাসিত হয়। শুধু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিশ্লেষণ দ্বারাই এরূপ জ্ঞানসঞ্চয় করা সম্ভব নয়, প্রকৃত শক্তির যে স্পন্দন এবং সমস্ত স্থূল জ্ঞানের পেছনে যে স্পন্দন আছে, এটা তখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তন্ত্রের সাধনায় এই স্পন্দনের একটি বিরাট স্থান আছে। ক্রমশঃ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার অতিক্রম করে শুধু এই স্পন্দন-বোধ থাকে, সেখানে শক্তির সাবলীল ছন্দ উদ্ভাসিত হয় এবং ধীরে ধীরে শব্দচ্ছন্দে ও বর্ণ-চ্ছন্দে পর্য্যবসিত হয়।

তন্ত্রের সাধনমার্গে এই ছন্দেরই প্রধান স্থান। তত্ত্ব সূক্ষ্ম হতে হতে শব্দচ্ছন্দে পরিণত হয়, শব্দচ্ছন্দ তখন নাদরূপে প্রতিভাসিত হয়। তান্ত্রিক সাধকের এই নাদই পরম অবলম্বন। এই নাদ হল নীরবের রব, চিত্তের পরম নীরবতা

এলে নাদ আপনা আপনি উদ্ভাসিত হয় এবং চিত্তের সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভাব অতিক্রম করে এক পরম শব্দচ্ছন্দে প্রবিষ্ট হয়। তান্ত্রিক সাধকের কেন পরমার্থ-মার্গের সাধকেরও এই নাদ প্রধান অবলম্বন। কঠোপনিষদে উক্ত হয়েছে এই নাদরূপ অবলম্বন শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, একে অবলম্বন করে মানুষ ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শক্তির কোন রকম ব্যাঘাত ও গতি থাকে না এবং নাদ মানসিক অবস্থাকে অতিক্রম করে এবং পরম সুখময় সত্তার সঞ্চার করে। স্থূলের যা কিছু বাধা অপসারিত হয়, মানুষ এক নতুন রাজ্য পায় যেখানে সত্তা হয় ব্যাপক ও ছন্দোবদ্ধ।

ধীরে ধীরে এই শব্দচ্ছন্দ জ্যোতিশ্ছন্দে রূপান্তরিত হয়। তন্ত্রে একে বলা হয় বিন্দু। এই অবস্থায় শক্তির স্পন্দন এত সূক্ষ্ম ও দ্রুত হয় যে স্থূল জগতের অভিঘাত সাধকের হয় না, সাধক এক অখণ্ড জ্যোতিঃসমুদ্রে অবগাহন করে। এই সমুদ্র অপার সমুদ্র, এর কোন সীমা নেই, এই জ্যোতিঃসমুদ্রে সাধকের ভাব অনুযায়ী উদ্ভূত হয় নানা দিব্য মূর্তি ও দিব্য শক্তি। তখন মনের কাল ও দেশের সীমা থাকে না। কারণ, এই জ্যোতির্ধামে কাল ও দেশের ক্রিয়া নেই। এই পরম সত্তা সঙ্কুচিত হতে হতে কাল ও দেশের উৎপাদন হয়, স্থূল বিশ্বের আশ্রয়-রূপে. এমন কি দেবতাদেরও এইরূপ বিশ্বে অধিকার বা স্থান নেই মহা প্রকৃতির সমস্ত সঙ্কোচ দূরীভূত হলে এরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি হয়। এখানে শক্তি আছে কিন্তু শক্তির কোন বিশেষ ভাব বা প্রক্রিয়া নেই। এরূপ অবস্থা বড় উপভোগ্য। কারণ, সব সঙ্কীর্ণতার লয় হয় এখানে, রূপের বা গুণের সঙ্কীর্ণতাও থাকে না। তান্ত্রিক সাধক অনন্ত রূপ বা গুণের আশ্রয় হন. কিন্তু শেষ পর্যান্ত এই রূপ এবং গুণ কেন্দ্রস্থ স্বরূপে দেখতে পাওয়া যায় না। যাঁরা সাধনার উচ্চতম গ্রামে পৌছান নি, তাঁরা এই রূপ এবং গুণকে অনুভব বা ভোগ করেন। তন্ত্রমতে এই গুলি হল সিদ্ধি : মন সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়ে অনন্ত শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সঙ্কল্প-মাত্রেই নানা ভাবের উদ্দীপ্তির কারণ হয়। এই জন্য তান্ত্রিক সাধকের একটা শক্তির প্রভাব বিশ্ব অনুভব করে, যে প্রভাব দিগন্তবিস্তৃত হয় এবং যাকে অবলম্বন করে নানাবিধ চিন্তাপ্রভাব ও কর্ম্মপ্রভাব বিগলিত হয়। কিন্তু তন্ত্র-সাধনার লক্ষ্য আরও উর্ধ্বে—পূর্ণ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠায়। শক্তির বিগলিত প্রবাহে পতিত হলে তাকে অতিক্রম করে যাওয়া কঠিন, কিন্তু অন্তর্মুখী শক্তির আকর্ষণ হলে শক্তি সাধককে পরিচয় করিয়ে দেয় পরম শিবের সহিত। শক্তি কখনও কেন্দ্রগতি-শূন্য হয় না ; কেন্দ্রগতি তার গতি। এই জন্য শক্তি-সাধনায় পরম সিদ্ধি, পরম শিবপ্রাপ্তি।

এই জন্য তন্ত্র-সাধকের প্রকৃতি তত্ত্ব, প্রকৃতি উর্ধ্ব সদ্বিদ্যাতত্ত্ব, তদূর্ধ্ব ঈশ্বরতত্ত্ব, তদূর্ধ্ব সদাশিব তত্ত্ব অতিক্রম করে নাদ এবং বিন্দুর ভেতরে প্রবিষ্ট হতে হয়। সদাশিব তত্ত্বে বিশ্ব অহং-রূপে স্ফুট হয়, কিন্তু নাদবিন্দুতে এরূপ অবস্থা নেই। সমস্ত সঙ্কুচিত অবস্থা অতিক্রম করে সেখানে আছে শুধু শব্দচ্ছন্দ, জ্যোতিশ্ছন্দ। এই ছন্দসত্তার উদ্দীপ্ত প্রকাশ এখানে থাকলেও সত্তার পূর্ণ প্রকাশ এখানে নেই।

সেজন্য এরূপ স্থলে এই প্রকাশের অতীত হতে হলে শুধু শিবদৃষ্টি ভাব আনতে হবে। তন্ত্রের পরম সত্তা শিব। সেই শিব যখন দ্রষ্টা-রূপে জ্যোতিঃ ও শব্দতরঙ্গগুলি দেখেন, তখনই ব্রহ্মশান্তি অনুভূত হয়। এই পরম ভূমিকা শিব-ভূমিকা। তন্ত্র ও শক্তির উপর আরূঢ় হতে হতে যে স্তরে শক্তি নেই সেই স্তরেই স্থিতি লাভ করে।

তন্ত্রের সাধনার ভেতর প্রকৃতির অতিক্রমের

পর শক্তির প্রকাশ এবং তাহাও অতিক্রম করে শিবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শিবত্ব ভূমিকায় দুটো ভূমিকার সহিত পরিচিত হতে পারে; একটি ভূমিকায় সমস্ত সৃষ্টি এই সৃষ্টির অতীত ভূমির সহিত ভিন্নত্ব অনুভব করা যেতে পারে। শৈবাচার্য অপ্পয় দীক্ষিতের প্রসারিত দৃষ্টি এই অবধিই ছিল, কিন্তু এই প্রসারিত দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যে দৃষ্টি, তার পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় না। এখানে শক্তির কোনও ক্রিয়া থাকে না, কি সঙ্কুচিত অবস্থা বা প্রসার, শিবকেন্দ্রে শক্তি উপসংহৃত হয়। সৃষ্টি-অভিমুখী সঙ্কোচ থাকে না, মুক্তি-অভিমুখী প্রসারও থাকে না, থাকে কেবল সঙ্কোচ ও প্রসারের অতীত শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। তন্ত্রের সাধনার শেষ এখানে, এইটিই বেদান্তেরও প্রতিপাদ্য তত্ত্ব।

মিনতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

এমন ধারা ছন্ন ছাড়া,
করলে কারা বঙ্গরে?
একি মা মোর ভয়ঙ্করী
রঙ্গময়ীর রঙ্গ রে?
হেরি যে মা রক্ত খালি,
পা ডোবালি, গা ছোপালি,
গলের ছিন্ন মুণ্ডমালা
লুটায় ধূলা কঙ্করে।

'ঘর দে গো মা,' 'অন্ন দে মা'
উঠ্‌ছে রোদন দেশ ভরি,
কোথায় তুমি অন্নপূর্ণা
কোথায় ভুবনেশ্বরী।
কোথায় দয়া? কোথায় ক্ষমা?
শেষে হলি চামুণ্ডা মা—
মহামায়া সকল মায়া
এমন করে বিস্মরি'।

তোমার মহাপীঠ যে এদেশ
দুর্গে তোমার দুর্গ গো—
এই খানেতে খস্‌লো প্রথম
তোমার হাতের খড়্গ গো।
কোটি বুকে পাতলে ডেরা,
ধরলে ঝিনুক, বাঁধলে বেড়া,
তোমার চরণস্পর্শে হলো
সোনার বাংলা স্বর্গ গো।

হেথায় মানব দানব হলে
কঠোর শাস্তি দিস্ তারও,
সর্ব্বহারা পুত্র কন্যা
দশ ভুজে আজ নিস্তারো।
দুঃখ হর, দৈন্য হর,
সর্ব্বজয় যুক্ত করো
দাও বরাভয়, অভয় মা
বিশাল নয়ন বিস্তারো।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-সংবাদ

(৩)

বেঙ্গলী, ৬ই জুলাই, ১৯০২ সন—পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ—আমরা গভীরতম দুঃখের সহিত জানিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ আর ইহলোকে নাই। শিকাগো-প্রখ্যাত সেই গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণের অতি প্রিয় ও স্নেহভাজন শিষ্য, নব হিন্দুধর্মের মহান্ প্রচারক জাগতিক কর্ম শেষ করিয়া তাঁহার প্রভুর পার্শ্বে চলিয়া গিয়াছেন। এই প্রভুর মহিমা ও প্রেম তিনি বহু সভায় প্রচার এবং বিদেশেও তাঁহার পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। স্বামীর ব্যক্তিত্ব হৃদয়গ্রাহী এবং জাতীয় ধর্মে তাঁহার অবদান অপরিসীম ছিল। তাঁহার খ্যাতনামা ও পরমপূজ্য গুরু হইতে আধুনিক হিন্দু-জাগরণের তরঙ্গ উত্থিত হইলেও তিনিই নিজ জীবন ও চরিত্র দ্বারা ঐ আরব্ধ কার্য পরিচালন করিয়াছিলেন। আজ যে হিন্দুধর্মের অনুবর্তিগণের মধ্যে অনেক ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ভদ্র মহিলা ও ভদ্রলোককে গণনা করা হয়, ভারতের প্রাচীন ধর্ম যে ইউরোপীয় এবং আমেরিকানদের নিকট সম্মানিত হইয়াছে, পরলোকগত স্বামীই প্রধানতঃ এই সুখকর ও বহু-আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণত্বসাধনের সম্মান লাভের অধিকারী। স্বামীর মৃত্যু প্রকৃতই সাধকোচিত হইয়াছে। কারণ গত শুক্রবার তিনি নিয়মিত সান্ধ্য ভ্রমণের পর বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিয়া সামান্য অসুস্থ বোধ করেন এবং অনুগামিগণকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সমবেত করিয়া বলেন যে, তিনি নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিতেছেন। অতঃপর তিনি তিন বার গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রশান্ত ভাবে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্বদেশবাসিগণের সহিত আমরা তাঁহার পরলোকগমনে দুঃখ প্রকাশ করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত বন্ধু ও শিষ্যগণকে সেই সর্বজন-পরিজ্ঞাত বাক্য "ভাল লোকই আগে মরেন" বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।[১]

বেঙ্গলী, ৮ই জুলাই, ১৯০২ সন—পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ—'ইংলিশম্যান' পত্রিকা পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দকে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহার জীবন ও

[১] ***The Bengalee, July 6, 1902—The Late Swami Vivekananda***—It is with the deepest regret we learn that Swami Vivekananda is no more. The orange-monk of Chicago fame, the loving and beloved disciple of Ramkrishna, the great apostle of neo-Hinduism has finished his earthly labour and been gathered by the side of the Lord, whose glory and love he had proclaimed on a hundred platforms, and whose banner he had unfurled even in foreign lands. His was a striking personality and his services to the cause of the national religion were immense. If the wave of modern Hindu revival had emanated from his illustrious and revered preceptor, he by his life and conduct had continued the glorious work begun by the latter. If Hinduism to-day

কার্যাবলী সম্বন্ধে গুণগ্রাহক মন্তব্যের প্রভাব নষ্ট করিয়াছেন! স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ধর্ম স্থাপন করিয়াছেন এবং পরলোকগত হিন্দু-প্রচারক যাহার সুযোগ্য নেতা ছিলেন, উহা অপেক্ষাও ঐ বর্ণনায় বৌদ্ধধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে লেখকের অধিকতর অজ্ঞতা পরিব্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মে মাংসাহার নিষিদ্ধ, পক্ষান্তরে পরলোকগত স্বামী তাঁহার এই অভিমত গোপন রাখেন নাই যে, হিন্দুরা মাংসাহার না করিলে তাহাদের পুনরভ্যুদয় আনয়ন করিতে কখনও সমর্থ হইবে না। এই মত কপিলবাস্তুর যোগীকে (সবিস্ময়ে) তাঁহার কবরে মুখ ফিরাইতে বাধ্য করিবে! রামকৃষ্ণের অনুসরণকারিগণ ধার্মিক হিন্দু, তাঁহারা রামকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করেন, যদিও পরমহংস স্বয়ং কখনও—অন্ততঃ প্রকাশ্যে এইরূপ কোন দাবী করেন নাই। তিনি গভীর বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন এবং লেখাপড়া না জানিলেও কেবল বিশ্বাসসহায়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানুষের সর্বাপেক্ষা অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিক সত্য ধারণা করিবার শক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সারল্য, ধর্মানুরাগ, জাগতিক সকল বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা বহু সুযোগ্য ও এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মানুষের পক্ষে কেবল তাহার স্রষ্টার জন্যই নির্ধারিত রাখা সংগত। সম্ভবতঃ এই অনন্যসাধারণ মানুষটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ। এই অচেতন অবস্থা তিনি যেরূপ উপভোগ করিতেন, এইরূপ আর কিছুই নহে। —ইহাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার আত্মা স্রষ্টার সংগে মিলিত হইত। যে পর্যন্ত না কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে পর্যন্ত মরুভূমিতে প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের নির্জনতায় লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি অপরিজ্ঞাত ছিলেন।

তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যোগ্যতম। কতকটা উগ্র কিন্তু অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ধরনের বাগ্মিতাসম্পন্ন ও নির্ভীক এই বাঙ্গালী প্রচারক প্রথমতঃ স্বদেশে সম্মানিত না হইয়া সুদূর পাশ্চাত্যে গমন করেন এবং আটলান্টিকের পরপারে যাইয়া ধর্মান্তরিতকরণের আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহা নূতন মহাদেশে কম উত্তেজনা সৃষ্টি করে নাই। তাঁহার চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব, গেরুয়া পরিচ্ছদ, বৃহদায়তন ও বুদ্ধিমান জনোচিত ললাটের ঊর্ধ্বদেশ-বেষ্টিত প্রশস্ত পাগড়ি, মধুর কণ্ঠস্বর এবং বাগ্মিতা-পূর্ণ ভাষা—এই সকল যেন ষড়যন্ত্র করিয়া অত্যন্ত অভাবনীয় রূপে তাঁহার অভিযানকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছিল। হিন্দুদর্শন এবং যোগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার ভাষণ আমেরিকার শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে স্বপ্নাতীত চিন্তাক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইহা দ্বারা তথাকার স্ত্রী-পুরুষ উভয়-শ্রেণীর ধনবানগণকে স্বমতে দীক্ষিত করা

counts among its votaries many European and American ladies and gentlemen, if the ancient religion of India has risen in the estimation of Europeans and Americans, the late lamented Swami must mainly have the credit for the happy and much-desired consummation. The Swami's death was truly saintly. For on Friday last, he had his usual evening walk and on returning to the Muth at Belur he felt a little indisposed and gathered his followers by his bedside and after telling them that he was going to leave this mundane world, thrice drew heavy breaths and passed off quietly. With his countrymen, we regret his death and desire to console his disconsolate friends and followers with the well-known saying—"The good die first."

তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। কৃতকার্যতায় উৎসাহিত হইয়া তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তাঁহার প্রচারকেন্দ্র তুলিয়া নেন, কিন্তু জন্‌ বুলকে মাসতুত ভাই জোনাথান্‌ এবং তাহার স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অত্যন্ত কম অনুভবক্ষম দেখিতে পান। আমেরিকা তাঁহার মহত্তম বিজয়ের রঙ্গভূমি ছিল এবং মার্কিন ডলারই কতক-পরিমাণে তাঁহার প্রচার-কার্যপরিচালনের শক্তি জোগাইতে সাহায্য করিয়াছিল। দেশবাসীর নিকট তাঁহার বিশেষ কোন বাণী ছিল না, কিন্তু বিদেশে 'হিন্দু' নামটিকে সম্মানিত করিবার জন্য দেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতা তিনি দাবী করিতে পারেন। তিনি এখন এরূপ স্থানে গিয়াছেন, যেখানে এই কথাগুলি পৌঁছিবে না—যেখানে শান্তি বিরাজমান। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত অভিনেতার অভিনয় এবং প্রস্থান সমভাবে নাটকীয় হইয়াছে।[২]

বেঙ্গলী, ৮ই জুলাই ১৯০২ সন—পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ—জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন: ষ্টেটস্‌ম্যান ইহার গত-

[২] ***The Bengalee, July 8, 1902—The Late Swami Vivekananda***—The Englishman has spoiled the effect of an otherwise appreciative notice of the life and life-work of the late Swami Vivekananda by describing him as a Buddhist! The description betrays the writer's ignorance of Buddhism as well as of the sect, rather than the religion, founded by the late Ramkrishna Paramhansa, of which the departed Hindu preacher was far and away the ablest leader. Buddhism forbids animal food, whereas the late Swami never concealed his opinion that until the Hindus take to animal food, they would never be able to work out their regeneration--an opinion which would make the hermit of Kapilavastu turn in his grave. The followers of Ramkrishna are pious Hindus and the only point on which they differ from the bulk of the Hindus is that they regard him as an incarnation of God, although the Paramhansa himself never advanced, or, at any rate, publicly advanced, any such claim. He was a man of deep faith and, though unlettered, he had been able, by means of faith alone, to grasp spiritual truths which are the most priceless heritage of humanity. His simplicity, his religious fervour, his aversion to all worldly pursuits attracted to him many able and educated men, some of whom rendered to him a homage which one ought to reserve for his Maker alone. Perhaps, the most remarkable things about this most remarkable man were his religious trances. He enjoyed nothing so much as this state of unconsciousness in which his soul communed with the Creator, oblivious of his surroundings. Like the desert flower, it had been his lot to blush unseen for many years in the seclusion of the Temple of Kali at Dakshineswar, until Keshub Chunder Sen discovered him and dragged him into the light of day. Of his disciples, the late Swami Vivekananda was the ablest. Gifted with eloquence of a somewhat rude but most impressive order and with a dauntless spirit, this young Bengalee preacher, at first unhonoured in his own country, proceeded to the far west and began, beyond the Atlantic, a proselytising campaign which was destined to make no little stir in the New World. His striking personality, his saffron garb, his prodigious turban, surmounting a massive and intellectual forehead, his resounding voice and his fluent tongue—all these conspired to make his mission successful beyond the most sanguine expectations. His discourses on Hindu Philosophy and the Yoga system opened up undreamt of fields of speculation before his American audiences and enabled him to make converts, and wealthy ones too, among persons of both sexes. Encouraged with success, he shifted his camp from America to England, but found John Bull far less impressionable than cousin Jonathan and his womankind. America was the arena of his greatest triumphs, and it was the American dollar which enabled him to

কল্যকার সংখ্যায় পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতে যাইয়া বস্তুতঃ বলিয়াছে যে, তাঁহার শিক্ষা প্রবেশিকা মানের উপরে যায় নাই। প্রকৃত ঘটনা অন্য প্রকার। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গ্রাজুয়েট, জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ উপাধি লাভ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহা ত্যাগ করিয়া জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউটে ভর্তি হন। তিনি বি-এ ক্লাসে এই কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল ডক্টর হেষ্টির অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন।"[৩]

secure to a certain extent the sinews for keeping up the propaganda. He aad no particuler mission to deliver to his own countrymen, but he had every claim to their gratitude for making the Hindu name respected abroad. And now that he is gone to where beyond these voices there is peace, all will admit that the exit of the wellgraced actor has been as dramatic as had been his performance on the stage.

৩ *The Bengalee, July 8, 1902—The Late Swami Vivekananda.*—A Correspondent writes:—"The Statesman, in its yesterday's issue, in giving a biographical sketch of the Swami Vivekananda in effect says that his education did not go beyond the entrance standard. The fact, however, lies the other way. He was a graduate of the Calcutta University, having taken his B. A. degree in 1884 from the General Assembly's Institution. He was a student in the first year class of the Presidency College in 1880 and left it for the General Assembly's Institution in 1881. He was a great favourite of Dr Hastie, Principal of the Institution, and was a pupil of his in the B. A. classes."

একটি দিন

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

পরাণে আমার একটি দিনের লাগি
অধীর পিপাসা সতত রয়েছে জাগি।
দিনে আর দিনে যত না জমিছে ভার
হাসি মুখে বহি মিলন আশায় তার।
জানি যত দুঃখ যত সন্তাপ জ্বলে
নিমেষে ঘুচিবে সেই শুভ দিন এলে।
একটি পলকে যুগ যুগ ঘেরা তম
টুটি দিবে সেই ঊষালোক নিরুপম।

সুদূর অজানা সেই মংগল দিন
তবু যেন কাছে আমারি হৃদয়ে লীন।
যাহা কিছু মোর জীবন-সার্থকতা
তাহারি সংগে অংগে অংগে গাঁথা।
জনমের পর জনম যদি বা যায়
তবু বসে রব তাহারি প্রতীক্ষায়।

"ত্বমেব মাতা চ"

স্বামী পবিত্রানন্দ

ভগবানকে মাতৃভাবে সম্বোধন করা বা উপাসনা করা একমাত্র হিন্দুধর্মেরই বিশেষত্ব। মানুষে মানুষে যে সব সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্যে মাতৃত্বের সম্বন্ধই সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর। সন্তান তাহার মাতাকে সব চেয়ে আপনার জন মনে করে, মায়ের নিকট তাহার কোন সঙ্কোচ থাকে না, কোন রকম ভয় থাকে না, মায়ের প্রতি তাহার যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহার তুলনা হয় না। সেইজন্যই ভক্ত ভগবানকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া ভগবানের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলে শুধু যে অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করা হয়, তাহা নয়, ভগবান যে অত্যন্ত আপনার জন তাহারও নিদর্শন দেওয়া হয়। তাই এক শ্রেণীর ভক্ত ভগবানকে স্বীয় মাতারূপে উপাসনা করেন বা কল্পনা করেন। তাহাদের মতে ভগবানকে উপলব্ধি করিবার ইহাই একমাত্র সহজ ও সুগম উপায়। মা সন্তানের সহস্র অন্যায় ও দুর্বলতা ক্ষমা করেন; সহস্র আব্দার সহ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং রক্তমাংস-নির্মিত দেহবিশিষ্ট, অসীম দুর্বলতার সমষ্টি মানব ভগবানের প্রতি মাতৃভাব আরোপ করিয়া ভগবান ও নিজের মধ্যে যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান তাহা এক মুহূর্তে দূর করিয়া দিয়া ভগবানের আশ্রয় প্রার্থনা কিংবা আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে।

কোন্ প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষে এই মাতৃভাবে ভগবানের পূজা আরম্ভ হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। উপনিষদে ভগবানকে উমা হৈমবতী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র শত্রু ধ্বংস করিবার জন্য মায়ের পূজা করিয়াছিলেন। চণ্ডীতে পাওয়া যায় যুগে যুগে দেবতাগণ অসুরদিগকে বিনাশ করিবার জন্য জগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। পৌরাণিক যুগে, তান্ত্রিক যুগে, ঐতিহাসিক যুগে কত শত ভক্ত জগন্মাতার উপাসনা করিয়া তাঁহার কৃপা, আশ্রয় ও দর্শনলাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতীত কালের মাতৃভক্ত সাধকগণের যে সব ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও পৌরাণিক গল্পের মত মনে হয়। কিরূপে মহা বিপদের সময়, একান্ত অসহায় অবস্থায়, ভক্তের আকুল ক্রন্দন জগন্মাতার নিকট পৌঁছিয়াছে এবং তিনি কৃপাকটাক্ষে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন ও আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, সেই সব ঘটনার কথা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। সেই সব বৃত্তান্ত অলৌকিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সে সব ঘটনা ছিল বাস্তব। যাহাদের মন সন্দেহযুক্ত, যাহারা সব জিনিষ যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝিতে চায়, তাহারাও ভক্তের প্রতি মাতৃ-রূপী ভগবানের কৃপার নিদর্শনমূলক ঘটনার বৃত্তান্ত শ্রবণ ও পাঠ করিয়া অবাক হইয়া যায়। যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ স্বভাবতই বিশ্বাসী ও ভক্তিপ্রবণ, তাহারা ঐ সব ঘটনা হইতে আধ্যাত্মিক জীবনে সমধিক বল ও উৎসাহ লাভ করিয়া থাকে। ভগবান যদি মায়ের মতই হন, তবে এই কথা বলা যায় না যে তিনি

প্রাচীনযুগে সন্তানকে কৃপা করিয়াছিলেন, এখন আর তাহা করিবেন না। তাঁহার করুণার ধারা আর বন্ধ হইবার নয়—অবাধ গতিতে তাহা চিরকাল প্রবাহিত হইবে—তাঁহার নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বলিয়া সময়বিভাগ নাই। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনি শাশ্বত, অব্যয়; তাঁহার করুণাও অবিশ্রান্ত ও অবিরামগতি। সুতরাং সুদূর অতীত যুগে এক জন সাধক জগদম্বার কৃপালাভ করিয়া থাকিলে, বর্তমান যুগেও অন্য এক জন তাহা লাভ করিবে—এই আশায় ভক্ত সন্তান বুক বাঁধিয়া দাঁড়ায়। আর কৃপালাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাই বা করিবে কেন? ভগবানের প্রতি মাতৃভাব দৃঢ় হইলে ভক্ত কোন কামনাই করে না। ব্রহ্মময়ী যাহার মা, সে আবার কি কামনা করিবে? কৃপার জন্যই বা আর কামনা কেন? সন্তানের প্রতি ত মায়ের কৃপা স্বতই বিদ্যমান, তাহার জন্য আবার আকাঙ্ক্ষা কেন, কামনা কেন, প্রার্থনা কেন? জগজ্জননী আমারও জননী—এই ভাব দৃঢ় হইলেই সব হইয়া গেল, এই ভাব উপলব্ধি হইয়া গেলে জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকা চলিয়া যায়, সমস্ত কামনা-বাসনা, ভয়-ভাবনা, সূর্যালোকের সম্মুখে অন্ধকারের মতন বিলীন হইয়া যায়। এই ভাব সাধনা করাও কত সহজ! যে ভক্ত আপনা হইতেই ভগবানকে আপনার জননী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, সে সৌভাগ্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহার সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এত সহায়ক নহে, যাহার মনের গতি অন্য রকম, সেও একটু চেষ্টা করিলেই এই ভাবের অনুশীলন করিতে পারে। যে সব সাধক ভগবানকে জগদম্বারূপে লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী পাঠ এবং চিন্তা করিলে সহজেই ভগবানের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের উদয় হয়। কারণ নিজকে ভগবানের সন্তানভাবে পরিকল্পনা করিবার মধ্যে কষ্টসাধ্যতা কিছুই নাই—ইহা অতি সহজ ও সরল সাধনপথ। সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই ফল লাভ করা যায় এবং উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সামান্য একটু বিশ্বাসে ভগবানের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হয়; সামান্য একটু অনুরাগে আবার বিশ্বাসের পরিমাণ বর্ধিত হয়। এইরূপ ভাবে একটি অপরটিকে সাহায্য করে এবং ভক্ত দ্রুতগতিতে ভগবানের নিকটবর্তী হয়।

ভগবানকে জননীজ্ঞানে পূজা করিলে কিরূপ সহজে মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়, সমগ্র বাংলাদেশে দুর্গাপূজার সময় তাহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শরৎকালে গ্রামে গ্রামে এবং প্রতি শহরে কত শারদীয়া পূজা হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা নাই। পূজার আনন্দে সমস্ত দেশ ভরপুর হইয়া যায়—সেই আনন্দ জাগতিক আনন্দকেও অতিক্রম করে। পূজার কয় দিন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে এক নির্মল, অপার্থিব আনন্দে মগ্ন হয়। যে সব সমালোচক প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যদি একটু গভীরদৃষ্টি লইয়া পূজার কয় দিন পূজাবাড়ীতে যে আনন্দ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা লক্ষ্য করেন, তবে তাঁহাদের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হইবে। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, যে ধর্মানুষ্ঠান মনকে সাময়িক ভাবেও এত উন্নত করিয়া দেয়, তাহা পৌত্তলিকতা বলিয়া উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়। তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, প্রতিমা-পূজার পিছনে এমন কিছু মহান সত্য নিহিত আছে, যাহার প্রভাবে এত লোকের মনে যুগপৎ এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে পূজার কয় দিন অকস্মাৎ শত সহস্র অধার্মিক নরনারীও ধার্মিক হইয়া যায়। পরন্তু ইহাই বলিতে চাই, যে যেরূপ অধিকারী পূজার সময় সে সেই রূপ উচ্চতর জীবনের

আস্বাদ লাভ করিয়া থাকে। একান্ত অবিশ্বাসীর মনেও সেই কয় দিন ভগবান সম্বন্ধে চিন্তার উদয় হয়।

তবে প্রশ্ন হইতে পারে, মাতৃপূজার কয় দিন যে শত শত লোক বিমল ও উচ্চ আনন্দের অধিকারী হয়, সারা বৎসর তাহাদের জীবনে তাহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? পূজার কয় দিন তাহারা "মা" "মা" বলিয়া ভক্তির উল্লাস বা ক্রন্দন করে বটে কিন্তু বিজয়া দশমীর পর পূজার আনন্দের কোলাহল শান্ত হইলে, তাহারা অনেকেই পূর্ব্বের মত হইয়া যায়, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তাহাদের মনের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াই পরিচয় পাওয়া যায় না। পূজার কয় দিন যেন স্বপ্নের মত কাটিয়া যায়, স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেলে দৈনন্দিন কর্ম ও কর্তব্যের চাপে পূজার স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়। সকলের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু অনেকের পক্ষেই যে ইহা প্রযোজ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার কারণ কি?

কারণ এই যে, জগতে কোন স্থায়ী সম্পদ বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে লাভ করা যায় না। কোন মূল্যবান শাশ্বত জিনিষ পাইতে হইলে উহার পূর্ণ মূল্য প্রদান করিতে হয়। যদি কেহ মনে করে যে বিনা পরিশ্রমেই, কোন রকম চেষ্টা ব্যতীতই আধ্যাত্মিক বস্তু তাহার করতলগত হইবে, তাহা হইলে উহা আত্মপ্রতারণা মাত্র। ভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, তাঁহার ইচ্ছায় অঘটনও ঘটিতে পারে, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল—অতি বিরল। তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। সুতরাং পূজার সময় আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে আস্বাদ পাওয়া যায়, তাহা স্থায়ী বা বর্ধিত করিতে হইলে অবিরাম চেষ্টার প্রয়োজন। অকস্মাৎ পূজার কয় দিন যে উচ্চরাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, উহাও ভগবানের অশেষ করুণাই বলিতে হইবে। উপযুক্ত পরিমাণ চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়াই সাধারণ লোকের জীবনে আধ্যাত্মিকতার স্থায়ী চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।

যে সব মহাপুরুষ এই সকল পূজাপার্বণাদি প্রবর্তন করিয়াছেন তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়, কেন না তাঁহারা এমন ধর্মানুষ্ঠান প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, যাহার দ্বারা সাধারণ লোকও প্রভূত উপকৃত হইয়া থাকে। অবশ্য সে উপকার স্থায়ী হয় না। কিন্তু সাময়িক উপকারও কম লাভের নয়। যাহা সাময়িক ভাবে লব্ধ হয়, চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা তাহাই স্থায়ী হইতে পারে। এমন কি চেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিলে এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা খুব তীব্র হইলে, এক দিন আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতম সত্যলাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করাও সম্ভব। এই কথা মাঝে মাঝে আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য।

প্রতিধ্বনি

ডাঃ শচীন সেন গুপ্ত

তোমার কথা ছড়িয়ে আছে
বিশ্বভুবন জুড়ে।
আমরা যাহা বলি
তোমারই তো বুলি,
সেই কারণে মৌনী আছ
বেঁধে প্রেমের ডোরে।
ভুলে যাই যে
কথা কওনা তুমি,
ভুলে যাই যে আমার কথা
তোমারই যে বাণী।
তাই যখনি
ধরতে তোমায় কথার জাল বুনি,
অলক্ষিতে বুঝিয়ে দাও—
আমি প্রতিধ্বনি।

ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

(২)

আমরা সাধারণতঃ অক্ষপাদ-সূত্রানুসারী নৈয়ায়িকগণকে দ্বৈতবাদী বলিয়াই জানি। দ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করেন। এই স্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অনাত্মবস্তুর সত্যত্ব স্বীকার করিলে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য কখনও সম্ভাবিত হয় না। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সমর্থন করিবার জন্যই অনাত্মবস্তুর মিথ্যাত্ব অদ্বৈতবাদিগণ অঙ্গীকার করেন। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র প্রারম্ভে মধুসূদন সরস্বতী—"অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাৎ" বলিয়াছেন। শ্রুতি যে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন-পূর্ব্বক প্রতিপাদন করেন। দ্বৈতমিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন না করিয়া অদ্বৈততত্ত্বের সিদ্ধি করা যায় না। সুতরাং দ্বৈতমিথ্যাত্বাদি বিচার জীবব্রহ্মের ঐক্যসিদ্ধির জন্য বুঝিতে হইবে। অক্ষপাদ-সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" (১।১।২২) রূপ সূত্রের ভাষ্য-প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকসম্মত অপবর্গের স্বরূপ কি—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে নৈয়ায়িক কোন নূতন অপবর্গের কথা বলেন নাই। অপবর্গবিদ্‌গণ যাহাকে অপবর্গ বলিয়া থাকেন, আমরাও তাহাই বলি। অপবর্গের স্বরূপ কি? প্রাপ্তাপবর্গ জীব কি অবস্থায় অবস্থান করেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্মক্ষেমপ্রাপ্তিঃ"—এই মোক্ষ অভয় অজর অমৃত্যুপদ ব্রহ্ম এবং ক্ষেম-প্রাপ্তি। 'ব্রহ্মসিদ্ধি'কার মণ্ডনমিশ্র 'ব্রহ্মসিদ্ধি'র ২২পৃঃ ৭ পঙ্‌ক্তিতে অপবর্গকে ক্ষেমপ্রাপ্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র বলিয়াছেন—"পরা হি ইয়ং ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ।"

এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে 'তাৎপর্য্যটীকা'কার বলিয়াছেন যে, মোক্ষকে অভয়-রূপে অভিহিত করায় পুনঃ সংসার-ভয় নাই, ইহাই উক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বার বার অভয়পদ দ্বারা মোক্ষের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, আর তাহাই অভয়। ভাষ্যকার মোক্ষদশাকে অজর বলিলেন কেন? 'তাৎপর্য্যটীকা'কার ইহার উত্তর দিয়াছেন—যাঁহারা ব্রহ্মই নামরূপ-প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া থাকেন বলেন, তাঁহাদের মত প্রত্যাখ্যানের জন্য ভাষ্যকার প্রাপ্তমোক্ষ পুরুষকে অজর-পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের পরিণাম অতীব দুর্যুক্তি। যাঁহারা ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করেন তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্ম কি সর্ব্বাত্মনা পরিণত হন, অথবা একদেশে পরিণত হন? ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মনা পরিণাম স্বীকার করিলে সর্ব্বাত্মনা ব্রহ্ম অন্যথাভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহার বিনাশ-প্রসঙ্গ হইবে, একদেশ-পরিণাম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সাবয়বত্বপ্রাপ্তি হইবে। এই স্থলে বক্তব্য এই যে ন্যায়মতে ব্রহ্ম জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা, জীব স্রষ্টা নহে। ব্রহ্ম যদি জগদ্রূপে পরিণতও হন

তাহাতে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির আপত্তি কি? অন্যের অন্যথাভাবে অন্যের হানি হইবে কেন? ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মনা পরিণাম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বিনাশ-প্রসঙ্গ হয় হউক তাহাতে জীবের মোক্ষের হানি কি? জীবের মোক্ষ-বিবেচনাতে ব্রহ্মের পরিণাম-খণ্ডনের অবসর কোথায়? জীব-ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করিলেই ব্রহ্মের বিনাশে জীবের বিনাশের আপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে এই দোষ হয় না। যাঁহারা মনে করেন, জীব-ব্রহ্মের অত্যন্ত ভেদ ন্যায়মতে স্বীকার করা হইয়া থাকে, তাঁহারা 'তাৎপর্য্যটীকা'কারের এই উক্তির কি গতি করিবেন? জীব-ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার না করিলে প্রদর্শিত বাক্যের কোনরূপ ব্যাখ্যা সম্ভাবিত নহে।

'তাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি'-গ্রন্থে আচার্য্য উদয়ন ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী নিরূপণ করিবার জন্য বলিয়াছেন—"শাস্ত্রান্তরলব্ধব্রাহ্মণত্বাদিশিষ্যঃ তস্য চ রূপাণি শমদমাদিসম্পত্তিঃ নিত্যানিত্যবিবেকঃ ঐহিকামুষ্মিকভোগবৈরাগ্যম্ মুমুক্ষুতা চ"—ইহার ব্যাখ্যাতে বর্দ্ধমানোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে শাস্ত্রান্তরলব্ধ ইত্যাদি কথার অর্থ—"শাস্ত্রান্তরাদ্ বেদাৎ লব্ধানি জ্ঞাত্বা অনুষ্ঠীয়মানানি ব্রাহ্মণত্বাঙ্গে সতি রূপাণি যেন সঃ তথা"—ইহার অর্থ এই যে শমদমাদিসম্পত্তি, নিত্যানিত্যবিবেক প্রভৃতি অধিকারীর রূপগুলি (বিশেষণগুলি) বেদবাক্য হইতে জানিয়া যে পুরুষ সম্পাদন করিয়াছেন, এইরূপ ত্রৈবর্ণিক ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী। "শান্তো দান্তোপরতস্তিতিক্ষুঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে শমদমাদিসম্পত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। "তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমিহ পুণ্যচিতো লোকো ক্ষীয়তে"-রূপ ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে (৮।১।৬) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা মুমুক্ষুতা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর ইহাই বর্দ্ধমানোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে বেদবাক্য হইতে অধিকারী পুরুষ এই রূপগুলি জানিয়া অনুষ্ঠান করিলে সেই ব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্রে অধিকারী হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উদয়ন-প্রদর্শিত অধিকারী পুরুষের এই চারটি রূপ; "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের 'শঙ্করভাষ্যে' অথ-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী পুরুষের এই চারিটি রূপ বলিয়াছেন। অতঃপর উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রদর্শিত চারিটি রূপ সম্পাদন না করিয়াই যে অনধিকারী পুরুষ এই ব্রহ্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবে সে কখনও ফলভাক্ হইতে পারিবে না। উদয়ন ন্যায়শাস্ত্রকে ব্রহ্মকাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যস্ত্বনধিকার্য্যেব প্রবর্ত্ততে কর্ম্মকাণ্ডে ইব ব্রহ্মকাণ্ডে নাসৌ ফলভাক্।" (তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, পৃঃ ১৩, ১৭, Asiatic Society Edition).

'তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ (১।১।২২) এই অক্ষপাদসূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মোক্ষদশাতে সুখ থাকে কি না ইহার অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"নিত্যং সুখমাত্মনো মোক্ষে ব্যজ্যতে তেনাভিব্যক্তেন অত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতি ইতি কেচিন্মন্যন্তে।" ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, কোন কোন আচার্য্য মোক্ষে নিত্যসুখাভিব্যক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। এইজন্য মুক্তপুরুষ মোক্ষ-দশাতে অভিব্যক্ত নিত্যসুখদ্বারা সুখী হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মোক্ষে নিত্য সুখসত্তা থাকে ইহা কোন কোন আচার্য্যের মত। এই স্থলে ভাষ্যকার কোন আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা অতি কঠিন। আমরা কাশ্মীরী ন্যায়প্রস্থানে ভাসর্ব্বজ্ঞ-বিরচিত 'ন্যায়সার' গ্রন্থ দেখিতে পাই। এই 'ন্যায়সার'

গ্রন্থের 'ন্যায়ভূষণ' নামক সুপ্রসিদ্ধ টীকার উল্লেখ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ভাসর্ব্বজ্ঞ নিজেই 'ন্যায়-সার' গ্রন্থের উপর 'ন্যায়ভূষণ' টীকা লিখিয়াছিলেন এইরূপ বুঝিতে পারা যায়। তিনি 'ন্যায়সার'-গ্রন্থে মোক্ষদশাতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাসর্ব্বজ্ঞ ন্যায়ৈকদেশী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণত্রয়বাদী ছিলেন। ভাষ্যকার-প্রস্থানের নৈয়ায়িকগণ চারিটি প্রমাণ স্বীকার করেন। ভাসর্ব্বজ্ঞ যে ন্যায়প্রস্থান রচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি নিজের উৎপ্রেক্ষিত মত বলেন নাই, কোন প্রাচীন ন্যায়প্রস্থানের মত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারও এস্থলে সেই প্রাচীন ন্যায়প্রস্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন মোক্ষে নিত্য-সুখাভিব্যক্তি স্বীকার কুমারিলভট্টের মতেই করা হইয়া থাকে। কুমারিলভট্ট মোক্ষে নিত্য-সুখাভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, আবার কেবল নির্দুঃখতার কথাও বলিয়াছেন। এইজন্য 'শ্লোক-বার্ত্তিকে'র ব্যাখ্যাতা অতি প্রাচীন সুচরিতমিশ্র (ইনি ১১শ শতকের লোক) এই নিত্যসুখাভি-ব্যক্তি পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। সুচরিতমিশ্রের পরবর্ত্তী পার্থসারথি মিশ্র নিত্যসুখাভিব্যক্তি সমর্থন করেন নাই, তিনি কেবল নির্দুঃখতাই সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক কুমারিলভট্ট যে নিত্যসুখাভিব্যক্তি পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, এই পক্ষটি তাঁহার বহুপূর্ব্বে ভগবান বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। (ন্যায়দর্শন পৃঃ ২২৬, মেট্রো সং)। ভাষ্যকার যে বলিয়াছেন মোক্ষদশাতে কেহ কেহ নিত্যসুখাভিব্যক্তি স্বীকার করেন ইহাতেই ভাষ্যকারের এই পক্ষে অরুচি সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যকার মোক্ষে নিত্য-সুখাভিব্যক্তি স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। ভাষ্যকার কেন অনিচ্ছুক তাহার বহু কারণ নিজেই এইস্থলে প্রদর্শন করিয়াছেন, এইস্থলে সমস্ত কারণগুলির আলোচনা করা সম্ভব নহে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যদিও মোক্ষে সুখসত্তার কথা শ্রুতি বার বার বলিয়াছেন তথাপি শ্রুতিস্থিত সুখপদদ্বারা দুঃখাভাবমাত্র বুঝিতে হইবে, দুঃখা-ভাব-অভিপ্রায়েই সুখপদ শ্রুতিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুখপদের দুঃখাভাব অর্থ গ্রহণ করিলে সুখপদের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, সুখপদের লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, মুখ্যার্থ-গ্রহণ করা যাইবে না। কেন যাইবে না ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—মোক্ষে নিত্য-সুখাভিব্যক্তি স্বীকার করিলে মুমুক্ষু পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তিই হইবে না। মুমুক্ষু পুরুষ যদি নিত্যসুখে রাগবশতঃ প্রবৃত্ত হন তবে রাগী পুরুষের কখনও মোক্ষ হইতে পারে না বলিয়া মুমুক্ষুর মোক্ষপ্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া পড়িবে। মুমুক্ষুর প্রবৃত্তিও রাগীর প্রবৃত্তি হইবে। রাগী পুরুষের কখনও মোক্ষলাভ হয় না। রাগই ত বন্ধন। যে রাগী পুরুষ সে বদ্ধ। রাগরূপ বন্ধন থাকিতে মুক্তি হইবে কিরূপে? এইজন্য আত্য-ন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্যই মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। দ্বেষী পুরুষের বা মোক্ষ হইবে কিরূপে? রাগের মত দ্বেষও ত বন্ধন; বন্ধন থাকিতে মুক্তি সম্ভব নয়। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে মুমুক্ষু পুরুষের তীব্র প্রসংখ্যানবশতঃ দুঃখের লেশ থাকিতে পারে না। এইজন্য প্রদর্শিত আপত্তি হইবে না। ইহাতে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে তীব্র প্রসংখ্যানবশতঃ মুমুক্ষুর যেমন দুঃখে দ্বেষ থাকে না এইরূপ সুখেও ত রাগ থাকিবে না। আর তাহাতে প্রদর্শিত দোষেরও সম্ভাবনা হইবে না। ইহাতে ভাষ্য-কার বলিয়াছেন—"যদ্যেবং মুক্তস্য নিত্যং সুখং ভবতি তথাপি ন ভবতি নাস্যোভয়পক্ষয়োঃ

মোক্ষাধিগমঃ বিকল্প্যতে ইতি”—ইহার অর্থ প্রসংখ্যানবশতঃ মুমুক্ষুর যদি নিত্যসুখে রাগ না থাকে, তবে মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখ থাকুক আর নাই থাকুক উভয়পক্ষে বীতরাগ পুরুষের মোক্ষাধিগমে কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্ত উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় ভাষ্যকার শেষ পর্যন্ত যেন মোক্ষে সুখের সত্তা স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন। মোক্ষে সুখস্বীকারে ভাষ্যকারের স্বারসিক ইচ্ছা নাই, তাঁহাকে যেন বলপূর্ব্বক স্বীকার করান হইয়াছে। মোক্ষ নির্দুঃখসুখ-স্বরূপ অথবা কেবল নির্দুঃখস্বরূপ। এই উভয় পক্ষেই তুল্য যুক্তি থাকিলেও ভাষ্যকার মোক্ষে সুখ স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। ভাষ্য-কারের এরূপ আপত্তির কারণ কি তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়া-ছেন যে, মুমুক্ষুর রাগনিবন্ধন প্রবৃত্তি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যথা মোক্ষে নিত্যসুখের অবধারণ করিয়া নিত্যসুখাবধারণ-জনিত নিত্যসুখতৃষ্ণা-পিশাচী মুমুক্ষুর নিকটও লব্ধপ্রসর হইয়া অনিত্যবিষয়সুখেও পুরুষকে প্রবৃত্ত করাইবে, আর তাহাতে তাহার মোক্ষ-লাভ সুদূরপরাহত হইয়া যাইবে। এইজন্য মুমুক্ষুর নিকট লেশতঃ সুখরাগের অবকাশ দিতে হইবে না। মুমুক্ষুর যাহাতে রাগ উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ কোন কথাই বলিতে হইবে না। এই কথা ‘আত্মতত্ত্ববিবেকে’ উদয়না-চার্য্য বলিয়াছেন যে মুমুক্ষু যদি বিশিষ্ট সুখা-ভিলাষী হয় তবে বৈষয়িক সুখেও মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হইবে। আর তাহাতে ‘অলাভে মত্ত-কাশীন্যায়ে’র আপাত হইবে। ইহার টীকাতে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, নিত্যসুখাভিলাষী পুরুষের বৈষয়িক সুখেও অভিলাষ হইবে। আর বৈষয়িক সুখাভিলাষ মোক্ষবিরোধী, উৎকৃষ্ট বিষয়াভিলাষী পুরুষের কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বস্তুর অলাভে তৎসমজাতীয় অপকৃষ্ট বস্তুতেও অভিলাষ দেখা যায়। ইহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ন্যায়ভাষ্যকার প্রভৃতি মোক্ষে সুখ-সত্তার বিরোধী নহেন, কিন্তু মুমুক্ষুর সুখরাগ উদ্বুদ্ধ করিতে কোন মতেই ইচ্ছা করেন না।

মুমুক্ষুর পতনশঙ্কা-ভয়েই তাহা করেন নাই। ভাষ্যকারের এই আশঙ্কার উত্তর ‘ব্রহ্ম-সিদ্ধি’-গ্রন্থে মণ্ডনমিশ্র প্রদান করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র ‘ব্রহ্মসিদ্ধি’-গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে নিত্যসুখরাগে মুমুক্ষুর পতনশঙ্কা যাহা ন্যায়ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর, কারণ সম্রাটপদলাভার্থী বিজিগীষু নরপতিরও ইন্দ্রিয়জয়, অরিষড়বর্গজয়ের ব্যবস্থা নীতিশাস্ত্রকারগণ করিয়াছেন। এরূপ সুদৃঢ় কামগ্রাহ লইয়া প্রবৃত্ত বিজিগীষুর যদি ইন্দ্রিয়-জয়াদি সম্ভাবিত হইতে পারে তাহাতে তাহার পতন না ঘটে তবে নিত্যসুখরাগমাত্রেই মুমুক্ষুর পতন ঘটিবে এইরূপ বলা যায় না। মিথ্যাজ্ঞান-প্রসূত রাগই বন্ধন ও পতনের কারণ। যথার্থ জ্ঞানবশতঃ সুখকামনা কখনও পতনের কারণ হইতে পারে না। যাহা হউক মোক্ষে যাঁহারা সুখসত্তা স্বীকার করেন না, কেবল নির্দুঃখতাই মোক্ষের স্বরূপ বলেন, সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি তাঁহাদেরও আশয় ন্যায়-ভাষ্যকারের উক্তির দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মহাশক্তি-পূজা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

সর্ব্বত্র শ্মশান-দৃশ্য, ঘিরে আছে ঘোরা নিশীথিনী,
দুর্নিবার আশঙ্কার ঘনছায়া ঘনায় অম্বরে!
হৃত-ঋদ্ধি এ ধরিত্রী প্রাণহীনা কঙ্কাল-মালিনী,
জীবনের বোধ যেন কিছু মাত্র নাহিক' সঞ্চরে!

মদদর্পী অসুরের অত্যাচারে, পীড়নে পীড়নে,
কত প্রাণ হয় ক্ষীণ, হয় লীন মৃত্যুর কবরে!
ধ্বংসের বীভৎস-চিত্র ফুটে ওঠে নয়নে নয়নে,
হিংসার মারণ-অস্ত্র জয়ী আজ মহাবিশ্ব 'পরে!

পিশাচের নৃত্যতালে, অট্টহাস্যে কাঁপে দিগন্তর,
ধরণীর বক্ষ কাঁপে দুর্বিষহ ব্যথা-বেদনায়!
কোটি কোটি ভীত-কণ্ঠে পীড়িতের ওঠে আর্ত্তস্বর,
কাঁদে যত নিরাশ্রয়, মুমূর্ষু ও দীন অসহায়!

দেবত্ব নির্জ্জিত আজ, মনুষ্যত্ব চরণে দলিত,
নন্দন-মন্দার-পুষ্প শুষ্ক যেন নাগিনী-নিঃশ্বাসে!
ধরিত্রীর শ্যামলিমা মরু-দৃশ্যে হেরি রূপায়িত,
হৃদয়ের প্রীতি লুপ্ত দানবের নৃশংস উল্লাসে!

হে নির্জ্জিত, তবু জাগো, তবু জাগো ভয়ার্ত্ত মানব,
নিপীড়িত প্রাণ জাগো, সম্মুখের দুর্ব্বার আহ্বানে!
গর্জ্জিয়া উঠুক যত পাপপুষ্ট অসুর-দানব,
তবু কিছু নাহি শঙ্কা—বজ্রশক্তি আছে তব প্রাণে!

আঁধারের বক্ষ টুটি' জেলে দাও অন্তরের আলো,
দূর কর কল্পান্তের স্তূপীকৃত ক্লেদাক্ত জঞ্জাল!
নিজ হস্তে দাও মুছে—যাহা কিছু ম্লান আর কালো,
তোমার সহায় হের শিবরূপী রুদ্র-মহাকাল!

তোমার সম্মুখে জাগে সর্ব্বময়ী জননী চিন্ময়ী,
বহুবল-বিধারিণী, মুক্তিদাত্রী দশদিগ্‌ভুজা!
কণ্ঠে ল'য়ে মাতৃ-মন্ত্র, তুমি হও মহাশঙ্কাজয়ী,
পুণ্য-লগ্নে কর সিদ্ধ মহাবিশ্বে মহাশক্তি-পূজা!

নবজাতক (Novœ)

অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

যীশুখৃষ্টের জন্মকালে বেথেল্‌হামের ঐতিহাসিক উজ্জ্বল নক্ষত্রটির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। মহামানবের জন্মের সঙ্গে এই নক্ষত্রের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলা কঠিন, কিন্তু বিজ্ঞানীর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ এই যে এরকম ঘটনা নক্ষত্রের মধ্যকার বিশেষ পরিবর্ত্তনের জন্যই ঘটে থাকে। কোন পূর্ব্বাভাস নেই, হঠাৎ একটি নক্ষত্র উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হ'তে থাকে; এমন কি এর উজ্জ্বলতা প্রায় লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পায়। আবার ছ'মাস থেকে এক বৎসরের মধ্যে উজ্জ্বলতা হ্রাস পেয়ে পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই এরূপ ঘটে থাকে এবং এই শ্রেণীর নক্ষত্রকে বলা হয় নবজাতক বা Novœ (newly born)। ১৫৭২ সনে জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রা এমন একটি নবজাতকের সন্ধান পেয়েছিলেন—নক্ষত্রটি এতই উজ্জ্বল ছিল যে দিনের বেলাও একে দেখা যেত। ১৬০৪ সনেও এরূপ নবজাতকের দেখা পাওয়া গেছে। অনেক নক্ষত্রেরই এরূপ অবস্থা আমাদের লক্ষ্যে না আসবার কারণ এদের বিরাট দূরত্ব। রাত্রির আকাশের আলোক-চিত্র গ্রহণ ক'রে স্থির সিদ্ধান্ত করা হ'য়েচে যে বৎসরে অন্ততঃ ২০টি নক্ষত্রে এরূপ বিস্ফোরণ হয়। এখানে বলা যেতে পারে যে এক একটি নবজাতকের জ্যোতি সূর্য্যের চাইতে ২০০,০০০ গুণ বেশী। যে নক্ষত্র এর চাইতেও অনেক বেশী জ্যোতিষ্মান হ'য়ে ওঠে তাকে বলা হয় অতিনবজাতক (Super novœ)। এক একটি অতিনবজাতক সূর্য্যের তুলনায় কয়েক কোটি গুণ উজ্জ্বল। প্রতি ৩৩৮ বৎসরে একটি অতিনবজাতকের আবির্ভাব হয়। বেথেলহামের নক্ষত্রটি একটি অতিনবজাতক সন্দেহ নাই।

পৃথিবী থেকে সব চাইতে দূরে যে নক্ষত্র অবস্থিত তার চাইতেও আরও অনেক দূরে কোটি কোটি নক্ষত্রের এক একটি দল সারা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে। এরূপ বহু দলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই নক্ষত্রপুঞ্জকে বলা হয় দ্বীপজগৎ (island universe)। ডাঃ জিকি এই সব নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকচিত্র গ্রহণ করে এতে অতিনবজাতকের সন্ধান পাবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি হঠাৎ এই দলের মধ্যে অতি-উজ্জ্বল আলোর সন্ধান পেয়ে বুঝলেন সেখানে অতিনবজাতক জন্মলাভ ক'রেছে। অবশ্য যে বিরাট বিস্ফোরণের ফলে অতিনবজাতকের জন্ম হ'য়েছিল তা ঘটেছিল পৃথিবীতে মানুষ-আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৪০ লক্ষ বৎসর আগে। এই ৪০ লক্ষ বৎসর ধরে আলো ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে (আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে) ১৯৩৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞানী জিকির দূরবীক্ষণ যন্ত্রে প্রবেশ ক'রে এই ঘটনা জানিয়ে দিয়েছে। এইরূপে আর ২০টি অতিনবজাতকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীর মত এই যে, প্রত্যেকটি নক্ষত্র তার জীবদ্দশায় (যতদিন ধ'রে আলো বিকিরণ করে) একবার নবজাতকের অবস্থা প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ একবার এতে বিস্ফোরণ ঘটবে। ফলে এর তেজ-নির্গমণ লক্ষ লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পাবে। বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের গ্যাসীয় পদার্থ প্রচণ্ড বেগে নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে; এমন কি কখন কখন বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় নক্ষত্রটি দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায়—এরও প্রমাণ আছে। কাজেই নক্ষত্রের নির্গত তেজ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

বিস্ফোরণের কারণ-সম্বন্ধে কারুর মত—একটি নক্ষত্রের সঙ্গে অপর একটি নক্ষত্রের সংঘর্ষ। এরূপ ঘটনা অত্যন্ত বিরল। হিসাবে জানা গেছে যে এক শত কোটি বৎসরে এই রূপ সংঘর্ষ দুটির বেশী সম্ভব নয়। আর এক মত এই যে, এক প্রকার অতিশয় হাল্কা গ্যাসীয় পদার্থ ঘনীভূত হবার দরুণ নক্ষত্র জন্মলাভ করে। ব্রহ্মাণ্ডের নানা স্থানে এই গ্যাসীয় পদার্থ ছড়িয়ে আছে। একটি উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে চলবার সময় যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উল্কাপিণ্ডের তাপ বৃদ্ধি পায় এবং উল্কাপিণ্ডটি ভস্মে পরিণত হবার সময়ে আকাশে একটি আলোর রেখা ছড়িয়ে যায়। তেমনি অতিশয় বেগশালী নক্ষত্র গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে চলবার সময়ে ঘর্ষণজনিত তাপের ফলে তেজ-বিকিরণ করে এবং এটাই হ'চ্ছে নক্ষত্রের নবজাতকের অবস্থা। এমতও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রত্যেকটি নবজাতক বা অতিনবজাতকের অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেক নক্ষত্র একই বেগে একই প্রকার গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে, এটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া অতিনবজাতকের ক্ষেত্রে যে বিরাট তেজ নির্গত হয় তার এরূপ ব্যাখ্যা অচল।

নক্ষত্রের কেন্দ্রে পরমাণুর বিবর্ত্তনের ফলেই সম্ভবতঃ এই ঘটনা ঘটচে। সূর্য্য এবং নক্ষত্রের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ম (helium) গ্যাসে রূপান্তরিত হবার ফলে স্বাভাবিক ভাবে তেজ নির্গত হয় এবং নক্ষত্রও আকারে ছোট হতে থাকে। কাজেই নক্ষত্রের বহিঃস্থ ভারী গ্যাস মধ্যস্থ গ্যাসকে প্রচণ্ড চাপ দেয় এবং মধ্যকার গ্যাসের এই প্রচণ্ড চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা নেই। ক্রমাগত চাপের ফলে নক্ষত্রের গ্যাসের ঘনত্ব জলের চাইতে দশকোটি গুণ বৃদ্ধি পায়। এত ঘন পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই। যদি একটি বালুকণিকা এই পরিমাণ ঘনত্ব লাভ করে তবে তার ওজন হবে কয়েক টন্। এই বিরাট সঙ্কোচনের জন্য নক্ষত্রের তেজ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তেজ-জনিত বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের বহিঃস্থ আবরণ নক্ষত্র থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যে সব নক্ষত্রে বিস্ফোরণ হ'য়ে গেছে, তার আর নবজাতক হবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের সূর্যও একটি নক্ষত্র মাত্র। কাজেই প্রশ্ন এই—সূর্য্যের অবস্থাটা কি প্রাক্‌নবজাতক না নব-জাতকোত্তর? যদি পরের অবস্থায় থাকে অর্থাৎ বিস্ফোরণ ঘটে গিয়ে থাকে, তবে পৃথিবীর কোন আশঙ্কা নেই; আর যদি তা না হয় তবে যে কোন মুহূর্ত্তে সূর্য্যে বিস্ফোরণ ঘটা বিচিত্র নয়; ফলে মুহূর্ত্তমধ্যে এই জীবনচঞ্চল বসুমতী ভস্মে পরিণত হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়বে। মুশ্‌কিল এই যে, যে সব নক্ষত্রে বিস্ফোরণ হয়েচে আর যাতে হয় নি, এই উভয় প্রকার নক্ষত্রের গঠন এবং প্রকৃতির এমন কোন তারতম্য দেখা যায় না যার দ্বারা জানা সম্ভব কোনটি নবজাতকত্ব পার হয়ে গেছে, কোনটি যায় নি। কাজেই সূর্য্যের ভবিষ্যৎ তথা আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত

অনিশ্চিত। ভরসা এই যে যদি বিস্ফোরণ ঘটেই তবে তার প্রচণ্ড তেজে আমরা কিছু জানতে পারার পূর্ব্বেই পঞ্চভূতে মিশে যাব।

যদি এটা ধ'রে নেয়া যায় যে অন্যান্য নক্ষত্রেও আমাদেরই মত প্রাণী বাস করে এবং সেখানে আমাদেরই মত সভ্যতা গড়ে উঠেচে, তবে সূর্য্যের নবজাতক অবস্থার দরুন সেখানকার বিজ্ঞানীদের দূরবীক্ষণে সূর্য্যের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন ধরা পড়বে। তাঁরা শুধু দেখতে পাবেন—অন্তরীক্ষে হঠাৎ একটি নক্ষত্র উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠে, আবার নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়চে। তাঁরা দেখবেন একটি নবজাতক। তাঁরা জানতেও পাবেন না যে এই নবজাতকত্বের ফলে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ী আমাদের এই বসুন্ধরা অকস্মাৎ শূন্যে বিলীন হ'য়ে গেছে।

'কবে হবে সেই দিন ?'

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

হিংসা-কালিমা-বর্ব্বরতার হবে নাকি নিঃশেষ,
উষার নবীন রবির প্রভায় রাঙিবে না দিক দেশ ?
শুভ্র দল দম্ভোলি হানি' নাশিবে ধরিত্রীরে,
সুন্দর-শিব ব্যথিত হৃদয়ে মন হতে যাবে ফিরে ?
অত্যাচারীই লভিবে আসন, মানুষ মরিবে ধুঁকে',
পঙ্কিলতার কণ্টকলতা বাড়িবে ধ্বংস-সুখে ?

বহু পুরাতন পৃথিবীর প্রতি রন্ধ্রে জমেছে ধূলি,
মনের গহনে বিষ শুধু তার বাহিরে মধুর বুলি !
আকাশে বাতাসে কেবলি বিষের কণিকা ফিরিছে ভেসে,
আর তাই টানি' বক্ষে মানুষ মরিতেছে নিঃশেষে !
লক্ষ্মী কোথায় ? অলক্ষ্মীদের গর্জ্জে ভীষণ বাজ ;
মুক্তি কোথায় ? প্রলয় যে হায় ঘনিয়ে এসেছে আজ !

তবুতো আশায় বুক বেঁধে আছি সেই সে দিনের তরে,
যে দিন শুভ্র শংখ বাজিয়া উঠিবে প্রতিটি ঘরে।
এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বাঁচিবে 'মানুষ'-রূপে,
দূরে ঠেলে দেবে পরগাছা আর কুঁড়ের বাদশা-ভূপে !
সেই দিন কবে ? প্রশ্ন আজিকে সবার কণ্ঠে ভরা—
দানবে বিতাড়ি' মানবে লভিবে কবে এ বসুন্ধরা ?

পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

(২)

ঢাকার অধিবাসিগণ স্বামী বিবেকানন্দের শুভাগমন-প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে সত্যসত্যই সেই শুভ দিন সমুপস্থিত হইল। স্বামীজির ঢাকায় যাইবার প্রধানতঃ তিনটি কারণ ছিল—প্রথমতঃ, স্বাস্থ্যলাভের জন্য বায়ু-পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন তিনি কিছু কাল যাবৎ অনুভব করিতেছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, ঢাকা-বাসিগণ তাঁহাকে পূর্ববঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন; তৃতীয়তঃ, স্বামীজির গর্ভধারিণী বহু দিন হইতে পূর্ববঙ্গের তীর্থস্থানগুলি দর্শনের ইচ্ছা পোষণ করিতে-ছিলেন—এই উপলক্ষে তাহাও পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে ১৯০১ সনের ১৮ই মার্চ কয়েক জন সন্ন্যাসী শিষ্য সহ স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা যাত্রা করিলেন। পর দিন নারায়ণগঞ্জে ঢাকা অভ্যর্থনা সমিতির কতিপয় ভদ্রলোক স্বামীজিকে সাদর সম্বর্ধনা করেন। অপরাহ্নে ঢাকা রেলষ্টেশনে উকিল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র ঘোষ ঢাকা নাগরিকগণের পক্ষ হইতে স্বামীজিকে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং ফরাশগঞ্জের জমিদার ৺মোহিনীমোহন দাসের বাটীতে লইয়া যান। শারীরিক অসুস্থতা ও ক্লান্তির জন্য তিনি প্রথম কয়েক দিন কোন জনসভায় বক্তৃতা না দিয়া মোহিনী বাবুর বাটীতেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের নিকট ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। বুধাষ্টমী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্রস্নান আসন্ন জানিয়া স্বামীজি ১৬নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতার ঠিকানায় তদীয় গুরু-ভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট এইরূপ একখানা জরুরি তার প্রেরণ করিয়াছিলেন—Start yourself Kanai bring mother also aunt carefully—অর্থাৎ আপনি কানাই সহ রওনা হউন, গর্ভধারিণী ও কাকীমাকে সযত্নে সঙ্গে আনিবেন। স্বামীজি সশিষ্য নৌকাযোগে ঢাকা হইতে লাঙ্গলবন্ধ যাত্রা করিলেন। পূর্ব বন্দোবস্ত অনুসারে নারায়ণগঞ্জের নিকটে স্বামীজির জননীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। জননী স্বামী-জির কতিপয় শিষ্যের তত্ত্বাবধানে নারায়ণগঞ্জের নিকট উপনীত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রে স্নান সমাপন করিয়া স্বামীজি আবার নৌকাযোগে ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গা অতিক্রম করিয়া ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

স্বামীজির ঢাকায় অবস্থানকালে মোহিনী বাবুর বাটীতে প্রত্যহই অপরাহ্নে ২।৩ ঘণ্টা প্রায় শতাধিক লোক তাঁহার তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন। ৩০শে মার্চ স্থানীয় জগন্নাথ কলেজে দুই সহস্র শ্রোতার সম্মুখে "আমি কি শিখিয়াছি?" (What have I learnt?) সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত রমাকান্ত নন্দী সভাপতি হইয়াছিলেন। পরদিন স্বামীজি পগোজ স্কুলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তিন সহস্র শ্রোতার নিকট "আমাদের জন্মপ্রাপ্ত

ধর্ম" (The Religion We are born in) সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা ইংরেজীতে আর একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া নীরবে বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। প্রথম বক্তৃতায় স্বামীজি সনাতন হিন্দুধর্ম, ত্যাগ, মুক্তি, ব্যাকুলতা, গুরুকরণ ও সাধন এবং দ্বিতীয় বক্তৃতায় বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র, ঋষি, অবতারবাদ, মূর্তিপূজা, ধর্মসংস্কার, ধর্মসংস্কারকগণ, হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ও আলোকসম্পাতকারী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুইটি বক্তৃতাই বাগ্মিতায় ও ভাবগাম্ভীর্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনের উপর কি আশ্চর্য রেখাপাত করিয়াছিল উহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা তদানীন্তন 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' (The Indian Mirror) নামক পত্রিকায় লিখিত জনৈক সংবাদদাতার বিবরণ হইতে পাই। সংবাদদাতার বিবরণটির * বঙ্গানুবাদ এই—

ঢাকায় স্বামী বিবেকানন্দ

"বেদান্তের সুবিখ্যাত প্রচারক, অধিকতর প্রথিতযশা পরমহংস রামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কতিপয় শিষ্যসহ গত ১৯শে মার্চ এই নগরীতে পদার্পণ করেন। বাবু ঈশ্বর-চন্দ্র ঘোষ, গগনচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি স্থানীয় বার লাইব্রেরীর উকিলগণ এবং শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল—তিলধারণের স্থান ছিল না। দৃশ্য বড়ই চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক

* To
The Editor of 'The Indian Mirror'
Sir,
I would deem it a great favour if you would kindly publish the following letter through the medium of your much-esteemed and widely circulated journal.

Swami Vivekananda at Dacca—Swami Vivekananda, the illustrious preacher of Vedantism, disciple of the more illustrious Paramhansa Ramakrishna, visited this town on the 19th March with some of his disciples. Some elite of the town including Baboos Iswar Chandra Ghose and Gagan Chandra Ghose, pleaders of the local bar and others were present in the station to receive him. The station was crowded to overflowing. The scene was a grand and imposing one. Cordially received by the assembled gentlemen he was led to the palatial residence of the late Babu Mohini Mohan Das where he passed the few days of his flying visit to the capital of East Bengal. Inspite of ill-health which disabled him from delivering any lecture in the first few days of his visit, he delighted the inquisitive visitors with his profound and learned discourse. After his return from the immersion in the Brahmaputra he delivered on the 30th March his first lecture on "What have I learnt?" in the premises of the Jagannath College. The hall was filled to its utmost capacity and many had to return disappointed for want of room. On the next day he addressed his second lecture on "The Religion We are born in" in the compound of the Pogose School, which was surpassing in its telling effect. The public here have not been favoured with such a long, learned and intelligent lecture these many days. His modest and amiable behaviour, his pleasing and reverend face, his perfect command over the Sastras and his unfolding of the mysteries hidden therein in beautiful, flowing and easy style—all conspired to produce a deep and lasting impression on the audience.

The Swami left Dacca for the Shrine of Chandranath on the 5th April. May God confer upon him His highest blessings and grant him a long life so that he may spread out still more the hidden mysteries of Vedanta for the amelioration and welfare of humanity.—*The Indian Mirror.*

হইয়াছিল। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী কর্তৃক আন্তরিক-ভাবে সম্বর্ধিত হইয়া স্বামীজি স্বর্গীয় মোহিনী-মোহন দাসের প্রাসাদোপম ভবনে নীত হইলেন। পূর্ববঙ্গের রাজধানীতে যে অল্প কয়েক দিবস ছিলেন তিনি এখানেই অবস্থান করেন। প্রথম কয়েক দিবস শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কোন বক্তৃতা প্রদান করিতে অসমর্থ হইলেও তিনি গভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ দ্বারা জিজ্ঞাসু দর্শনার্থিগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্র-স্নানের পর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ৩০শে মার্চ জগন্নাথ কলেজ-প্রাঙ্গণে 'আমি কি শিখিয়াছি?' সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা-গৃহে এত অধিক জনসমাগম হইয়াছিল যে স্থানাভাবে অনেককেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। পর দিবস পগোজ স্কুলের প্রাঙ্গণে তিনি 'আমাদের জন্মগত ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার প্রভাব হইয়াছিল অভাবনীয়রূপে চিত্তাকর্ষক। এই কয়েক দিনের মধ্যে জন-সাধারণ এইরূপ সুদীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানপ্রদ বক্তৃতা শ্রবণ করে নাই। তাঁহার বিনম্র ও অমায়িক আচরণ, প্রসন্ন ও ভক্তিরসাপ্লুত বদন, শাস্ত্রে পরিপূর্ণ নিপুণতা এবং সুন্দর সহজ সাবলীল ভাষায় শাস্ত্রের রহস্যোদ্ঘাটন শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছিল।

"১৫ই এপ্রিল স্বামীজি চন্দ্রনাথতীর্থ-দর্শনে যাত্রা করেন। ভগবান তাঁহাকে ভূয়িষ্ঠ আশীর্বাদ ও দীর্ঘজীবন দান করুন—তিনি যেন লোক-কল্যাণের নিমিত্ত বেদান্তের রহস্যসকল আরও ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে পারেন।"—দি ইণ্ডিয়ান মিরর।

ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামীজি এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য সাধু নাগমহাশয়ের (দুর্গাচরণ নাগ) জন্মভূমি নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে গিয়াছিলেন। নাগ-মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রদ্ধা-ভক্তিতে ও আদর-যত্নে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। নাগমহাশয়ের স্ত্রী তাঁহাকে অনেক উপাদেয় আহার্য রাঁধিয়া খাওয়াইয়া-ছিলেন। সেখানে এক পুকুরে তিনি সাঁতার কাটিয়া বেলা ২॥ টা পর্যন্ত সুনিদ্রা উপভোগ এবং তৎপর প্রচুর আহার করেন। স্বামীজি পরে ভক্তদের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনে যে কয় দিন সুনিদ্রা হইয়াছে, নাগমহাশয়ের বাড়ীতে নিদ্রা তন্মধ্যে এক দিন। নাগমহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়াছিলেন, উহা মাথায় বাঁধিয়া স্বামীজি ঢাকায় রওনা হইলেন। নাগমহাশয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া-ছিলেন, "ও সব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝবে? যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধন্য। নাগমহাশয়ের মত মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক আলোকে পূর্ববঙ্গ আলোকিত।"

ঢাকা হইতে স্বামীজি চট্টগ্রামের নিকটবর্তী চন্দ্রনাথ ও আসামের কামাখ্যা পীঠ দর্শন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া তিনি কয়েক দিনের জন্য গোয়ালপাড়ায় ও গৌহাটীতে বিশ্রাম-লাভ করেন। গৌহাটীতে স্বামীজি ৪টি বক্তৃতা দেন কিন্তু এইগুলির কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। তথা হইতে তিনি আসামের স্বাস্থ্যকর স্থান শিলং যাত্রা করেন। আসামের চিফ কমিশনার ভারতহিতৈষী স্যার হেনরী কটন স্বামীজিকে অতিশয় আদর-যত্ন করেন এবং তাঁহার অনুরোধে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি শিলং-এ ইউরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট একটি বক্তৃতা দেন। স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হওয়ায় মে মাসের মধ্য-ভাগে স্বামীজি বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পূর্ববঙ্গের নদনদীপূর্ণ শস্যশ্যামলাঙ্গ ভূভাগ ও সরল সুস্থদেহ ধর্মপরায়ণ নরনারী দর্শনে

স্বামীজি বিশেষ আনন্দিত হন এবং বলিয়াছিলেন, "আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায়। যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া-দাওয়াতে খুব তেল-চর্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল-চর্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে। ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম—দেশের লোকগুলো খুব conservative অর্থাৎ প্রাচীন প্রথার অনুগামী। বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় বেশী দেখলুম। এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটার আরও বিকাশ হবে। যে দেশে নাগমহাশয়ের মত মহাপুরুষ জন্মান, সে দেশের আবার ভাবনা? তাঁর আলোতেই পূর্ববঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে।"

বাস্তুহারার আগমনী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

আসিতে মা গজে সুপথে সহজে
হাতে লয়ে শুভ বর,
যে দেশ হইতে আসিত সে গজ,
সে দেশ হয়েছে পর।

তরণীর পথ রুদ্ধ তোমার,
মূল্য যোগাতে এ স্বাধীনতার
হারায়েছি তাহা, তব পথ আজি
দুর্গম দুস্তর।

উষর ধূসর কান্তার পথে
অশ্বে আসিবে তবে?
যদি তা না পার ওলাউঠা সাথে
দোলায় আসিতে হবে।

সিংহ-আসন আর না মা সাজে,
শবাসনা হ'য়ে এ শ্মশান মাঝে,
বাস্তুহারার পূজা লও, হেথা
মিলিবে না পূজাঘর।

আকালে মড়কে ভরা এ নরকে
আসিবার কথা নয়,
তবু যদি আস, আনিবে না সাথে
সান্ত্বনা বরাভয়?

নহে আমাদের ইহলোকই সার,
পরলোক আছে করি যে স্বীকার।
তাই তোমা পূজি, ছাড়িনি এখনো
তব পদে নির্ভর।

মৃত্যুকাল

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম্-এ, পি-আর্-এস্

কোথায় পড়িয়াছিলাম মনে নাই—মরিবার সময় নাকি গত জীবনের শুভ অশুভ দুই রকম কর্মের ছবি চকিতে মানসপটে ফুটিয়া ওঠে। পরপারে চিত্রগুপ্তের খাতায় উঠিবার পূর্বে বোধ হয় একবার হিসাবটা pre-audit করিয়া লইতে হয়, নতুবা ঠিকে গোল হইতে পারে। নিছক পুণ্যবান বা নিছক পাপী কয় জন আছেন, কেহ আছেন কি না—বলিতে পারা সম্ভব নয় ; তবে অধিকাংশ লোকই অনবরত পুণ্য করে না, অনবরত পাপও করে না—আমরা জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, ভাল-মন্দ কাজ করিয়া চলিতেছি ; একটি কাজই আবার হয়তো পুরা ভাল নয় অথবা পুরা মন্দ নয়। মোটকথা, টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবই খুব কঠিন, তাহাতে আবার কাজের ভাল-মন্দ হিসাব আরও কঠিন। সেইজন্য মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণটিতে হিসাবটা party concernedকে একবার একনজর দেখাইয়া লওয়া অসংগত বলিয়া মনে হয় না, হিসাবনবীশের দিক থেকে তাহা খুবই সুবিবেচনার বলিতে হইবে।

ব্যাপারটি বাস্তবিকই ঘটে কি না, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার কিছু নাই। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি—বহুবার যমরাজার দরজার কাছ হইতে নাকি আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাকে ঐ হিসাবটা—কাজ-কর্মের, অর্থাৎ কৃত শুভাশুভ কর্মের—হিসাব, যমরাজার দপ্তরের কেহ এক ঝলক দেখাইয়াছেন বলিয়া কখনও মনে করিতে পারি নাই। ভয় হয়, এই একটি কারণেই যমরাজার হুজুরে আমাকে হাজির করা হয় নাই—হিসাব এবং অডিটের ভয়ংকরত্ব এখানে যেমন, পরলোকেও তেমন হওয়া সম্ভব এবং কেরাণীদের কারসাজিতে এখানে যেমন ওখানেও তেমন কর্মকর্তা অর্থাৎ administrator-গণ শিব অথবা বানর—দুই-ই হন।

তাই মাঝে মাঝে কৌতূহল হয়, মরিবার পূর্বে মনের ভাব কিরূপ হইবে? চিত্রগুপ্তের সঙ্গে কো-অপারেট্ করিব না নন্-কো-অপারেট্ করিব? কি বলিতে কি বলি, তাইতো! হঠাৎ যদি মরিয়া যাই, ভাবিবারও সময় থাকিবে না, শেষটায় গোলমাল করিয়া না বসি! তাসের একটা নিয়ম আছে মনে পড়ে, When in doubt play trump. ইস্কুলেও মাষ্টার মশাই সেকালে খুবই ধমকাইতেন, When in doubt consult the dictionary! আচ্ছা, একবার reference বই ঘাঁটিয়া দেখা যাক, লোকে মরিবার সময় কি বলিয়া মরে। আমাদের মত লোকের কথা কেহ লিখিয়া রাখে না, কিন্তু বড় বড় লোক, যাঁহারা কি না প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁহাদের কথা কি আর না লিখিয়া উপায় আছে! বই বিক্রী হইবে কেমন করিয়া! সুতরাং সোক্রাটিস থেকে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সকলের অর্থাৎ মহাজনদের মৃত্যুবাণী ইতিহাস (সে-ও যে বড়-লোকঘেঁসা শাস্ত্র) সযত্নে বুকে ধারণ করিয়া আছে।

গ্রীক দার্শনিক সোক্রাটিসকে তরুণদের

'চরিত্র' নষ্ট করিবার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়, স্বহস্তে বিষপান ছিল এই দণ্ডের একটি রূপ। উহা গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি শিষ্যকে একটা কথা বলিয়া যান; উহাই তাঁহার শেষ কথা। শিষ্য যে একেবারে 'কাছাখোলা' তাহা তিনি জানিতেন বলিয়া সাবধান করিয়াও যান—Crito, we owe a cock to Aesculapius; pay it, therfore, and do not neglect it. আশা করি ক্রীটো এই ঋণ শোধ করিয়াছিল এবং পরলোকে সোক্রাটিসকে আর এখানকার ধারের জের টানিতে হয় নাই। নীরো (খ্রীঃ ৩৭-৬৮) রোম আগুনে পুড়াইবার হুকুম দিয়া, যেমন রাজধানী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল তেমনি নিজে বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। এহেন হৃদয়বান পুরুষ—একেবারে art for art's sake যাঁহার ধুয়া—মৃত্যুর সময় বলিয়া উঠিয়াছিলেন—বেচারির সবে ত্রিশ বৎসর বয়স—Qualis artifex perco! What an artist dies with me! পোপ সপ্তম গ্রেগরি (১০২০-৮৫) এঁর দ্বিগুণ বয়সেরও বেশি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুতে তাঁহার ক্ষোভ হইয়াছিল বেশ। নীরোর দুঃখ নিজের জন্য তেমন নয়, art-এর জন্য; খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক, impersonal ব্যাপার। কিন্তু গ্রেগরির কথায় ব্যক্তিগত দুঃখের, এমন কি তিক্ততার সুর আসিয়া মিশিয়াছে—Dilexi justitiam et odi iniquitatem, proptera morior in exilio—I have loved justice and hated iniquity, therefore I die in exile. আমি ন্যায় বিচার ভালবাসি ও অন্যায়কে ঘৃণা করি, তাই নির্বাসনে মরিলাম। মরণে যাহার ক্ষোভ নাই, এ সুর তো তাহার নয়! বরং ধর্মবিশ্বাস-রক্ষার্থে প্রাণদানকারী জন হাস (John Huss)-এর (১৩৭৩-১৪১৫) কণ্ঠে সে সুর বাজিয়াছিল। তাঁহাকে যখন বধ্যদণ্ডে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন লাগাইবার ব্যবস্থা হয় জীবন্ত পোড়াইয়া মারা হইবে এই অভিপ্রায়ে, তখন এক পলিতকেশ কৃষককে এক বোঝাই কাঠ সেই আগুনে জ্বালাইবার জন্য লইয়া আসিতে দেখিয়া তিনি সেই বৃদ্ধের সরলতা-দর্শনে অভিভূত হন, আর বলেন—O Sancta Simplicitas! O holy simplicity! কী পবিত্র সরলতা!

সাহিত্যিকদের মধ্যে র‍্যাবেলে Rabelais (১৪৯৪-১৫৫৩) ফরাসী জাতীয় ছিলেন, হাস্য-বিদ্রূপ ছিল তাঁহার প্রধান উপকরণ। মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন—Ring down the curtain, the play is over…I go to seek a great perhaps— ইংরাজ কবি টমাস-হুড্‌ও এমনিধারা হাস্যরসিক ছিলেন, উনিশ শতকের কবি তিনি—মরিতে বসিয়া স্ত্রীকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "Madam, you will lose your lively Hood!" প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল—livelihood—এই pun-এর প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। গেটের (১৭৪৯-১৮৩২) কথা কিন্তু তাঁর জীবনেরই অনুরূপ ছিল—আলোকের সন্ধানে তিনি যেমন প্রাণপাত করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালেও তেমনই বলিয়াছিলেন, Open the second shutter, so that more light can come in. আরো আলো আসবার পথ খুলে দাও, ওপরের জানালাটা খুলে দাও।

কর্মীদের শেষ কথা বলিতে গেলে প্রথমে উল্লেখ করিতে হয় স্যর ফিলিপ সিডনির সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—Thy necessity is greater than mine. আমার চেয়ে তোমার প্রয়োজন বেশী। মৃত্যুর কাছে আসিয়াও, মরণের দুয়ারে দাঁড়াইয়াও তাঁহার সংযমের বাঁধ ভাঙ্গে নাই, তিনি আপনার দুঃখকে ছোট করিয়া

সাধারণ সৈনিকের পিপাসাকে বড় করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন। আবার তাঁহারই সমসাময়িক স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে—সুলেখক, কৌশলী ও সাহসী যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ্, পণ্ডিত র‍্যালে—কুঠারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড লাভ করিবার পূর্বে দুইটি কথা বলিয়াছিলেন—দুইটিতেই তাঁহার হৃদয়ের অদম্য সাহসের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—কুঠারটি হাতে লইয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 'Tis a sharp remedy, but a sure one for all ills. ধারাল ঔষধ কিন্তু সর্বরোগ-মহৌষধ। আবার ঘাতক যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি যূপের কোন্ দিকটায় মাথা রাখিবেন, তখন তিনি বলিলেন—So the heart be right it is no matter which way the head lies. হৃদয় যদি ঠিক থাকে তবে মাথাটা যেদিকে থাক ক্ষতি নাই।

ইংলণ্ডপতি চার্লস যখন প্রজাবিদ্রোহে অত্যাচারের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হন, তখন বধ্যমঞ্চে (scaffold) দাঁড়াইয়া তিনি বিশপ জুক্‌সন (Juxon)-এর দিকে তাকাইয়া বজ্রনিনাদে বলেন—Remember! মনে রেখো! পরবর্তী যুগের ইতিহাসে এই শব্দটি শোণিতের অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। সে দিনটি ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্মরণীয়—১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী। আবার তাহার কয়েক বৎসর পরে ডিউক অফ মন্মাউথ ১৬৮৫ খ্রীঃ বধ্যমঞ্চে ঘাতককে বলিতেছেন—বাপু হে, লর্ড রাসেলকে যেমন থেঁতলাইয়া মারিয়াছিলে, আমাকে তেমন ধারা করিও না, এক চোটেই কাবার করিও। Do not hack me as you did my Lord Russell. আর কোন চঞ্চলতা, অস্থৈর্য কিছু নাই, বাস্!

যোদ্ধাদের মধ্যে জেমস উলফ্ (১৭২৭-৫৯) কুইবেক জয় করিয়া মৃত্যুর পূর্বে বলিয়াছিলেন,—Now, God be praised, I will die in peace—আর কোন অশান্তি নাই, যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে, আর কি চাই, পরম নিশ্চিন্ততা। নেলসনও তাই বলিয়াছিলেন—Thank God, I have done my duty. Kiss me, Hardy—ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে, বিদায় হার্ডি। এই বলিয়া বিশ্বস্ত অনুগত যোদ্ধার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের বিরাটের ধ্যান মৃত্যুর আসন্ন করাল ছায়ায়ও ভাঙ্গে নাই—তিনি মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, Tête d'armée —Head of the army—সৈন্যবিভাগের মহানায়ক।

রাজনৈতিকেরা কিন্তু সর্বদা এরূপ ভাবে বিভোর হইতেন না; মৃত্যুর জন্যও কি তাঁহারা সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, বা আছেন? বলা সুকঠিন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুযোগ্য মন্ত্রী ভাইকাউণ্ট পামারষ্টোন মৃত্যুশয্যায় (১৮৬৫ খ্রীঃ); প্রবীণ চিকিৎসক তাঁহাকে সংকটাপন্ন অবস্থার কথা জানাইলেন। পামারষ্টোন অমনি চমকাইয়া উঠিলেন—সে কী! মরিব কী! ডাক্তার, সে তো সব শেষের কাজ! 'Die, my dear Doctor, that's the last thing I shall do!'—কিন্তু যখন লুসিটানিয়া সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায় ১৯১৫ খ্রীঃ ৭ই মে—এই তো পঁয়ত্রিশ বছরের বড় বেশি হয় নাই—তখন সেখানে চার্লস ফ্রম্যান (Charles Frohman) একটি কথা বলিয়াছিলেন, ভারি চমৎকার কথা—নানাজাতীয় বালবৃদ্ধবনিতা লইয়া তরণী ধীরে ধীরে সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হইতেছে, আর তিনি বলিতেছেন—Why fear death? It is the most beautiful adventure in life. মৃত্যুর ভয় কেন? জীবনে এর চেয়ে সুন্দর মজার

ব্যাপার আর কিছু নাই যে! মানুষের মধ্যে যে প্রাণ এই অনিশ্চিতকে স্বচ্ছন্দে বরণ করিতে পারে, সকৌতুকে বরণ করিতে পারে, তাহাকেই তো প্রশংসা করিব, তাহারই তো তারিফ!

আমাদের শাস্ত্রে তো বলাই আছে, মৃত্যু হইবেই, জীবন থাকিলেই মৃত্যু। গীতা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে—এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বলা আর চলে না—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ। আমরা মরণকে বেশি করিয়া ভয়ানক বলিয়া দেখি বলিয়াই সিদ্ধার্থের মত ছন্দককে কখনও জিজ্ঞাসা করিতে হয় নাই, 'ছন্দক, আমরা সকলেই কি মরিব? পিতা, মহারানী মাতা, গোপা, আমি—সকলেই মরিব?' প্রথম জ্ঞানের সেই সবিস্ময় দৃষ্টি আমাদের নাই। মহাভারতে আছে—যাহা বস্তু তাহার ক্ষয় আছেই, উপরে উঠিলে নীচে পড়িতে হইবেই, একত্র হইলে বিদায় লইতে হইবে, জীবনের শেষ মরণে।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তাঃ মরণান্তং হি জীবিতম্॥

শান্তিপর্ব, ২৭।৩১

আমরা দেহবাদী নই, আত্মার অবিনাশিত্বে আমাদের আজন্ম বিশ্বাস। মাতৃস্তন্যের মত এই বিশ্বাসে আমরা মানুষ হইয়াছি। তাই যখন গীতায় পড়ি—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

যখন পড়ি—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি' তখন মনে একটা ভাব হয় যে অতি পরিচিত সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি, নূতন কোন সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছি না। তাই আমাদের মরণে 'হরিবোল,' 'রামনাম সত্য হ্যায়'। আর আমাদের শেষের দিনে, যখন 'অন্তে বাক্য করবে, তুমি রবে নিরুত্তর,' তখন সকলের পক্ষে মুমূর্ষুকে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' নাম শুনাইবার বিধান। অজামিল পুত্রজ্ঞানে নারায়ণকে ডাকিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান পাইয়াছিল। সেদিনও ভক্ত রামপ্রসাদ মৃত্যুর আগে চারখানি গান গাহিয়াছিলেন। তার একটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি—

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাষ, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে॥
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য
মান্য করে সব খোয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করেছে পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হলে আপনা আপনি যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই!
তাই হবে রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
লয় হয়ে সে মিশায় জলে॥

অতি সহজ ভাষায় কঠিন সমস্যার সাধনলব্ধ উত্তর।

গিরিশ ঘোষের 'অশোক' নাটকে অশোকের কনিষ্ঠ বীতশোক সম্বন্ধে সুন্দর একটি উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া আছে। যোগীর নিঃস্পৃহ ভোগকে তিনি বিদ্রূপ করিতেন। অশোকের চক্রান্তে তিনি 'সপ্তাহান্তে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত' এই আদেশ বিজ্ঞাপিত হইলেন। তবে ঐ সপ্তাহটুকু যথেষ্ট

ভোগ, পরিপূর্ণ রাজভোগের সুবিধা তাঁহাকে দেওয়া হইল। কিন্তু সপ্তাহান্তে মৃত্যু হইবে—এই চিন্তা তাঁহার নিকট সকল ভোগকে বিস্বাদ করিয়া তুলিল। তিনি ঠেকিয়া বুঝিলেন, মৃত্যু-চিন্তা অহরহ করিলে ভোগস্পৃহা আর কিছুই থাকে না। অশোকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, বীতশোকের প্রকৃতির পরিবর্তন হইল। আজকার এই অল্পক্ষণব্যাপী মৃত্যুচিন্তা কি আমাদের প্রকৃতিকে—তা সে যতই অল্পক্ষণের জন্যই হউক—বিশুদ্ধ করিবে না?

আবার আশ্বিন

শ্রী—

আবার আশ্বিন আকাশের বৃষ্টিস্নাত নীল,
এক ঝাঁক সাদা মেঘে কত কথা রোদে ঝিল্ মিল্,
বাতাসে ছুটির হাওয়া, জ্যোতির্ময় সূর্যসখা হাসে,
পুরোনো স্মৃতিরা সব বেঁচে থাকে নতুন আশ্বাসে।
আবার আশ্বিন, ধূপ দীপ পুষ্প মাঙ্গলিক,
পূজামন্ত্রে ঘিরে থাকে প্রাণনের সুর প্রাত্যহিক,
শুভ্র গন্ধে চিত্ত ঘিরে অলোকের নামে আশীর্বাদ,
জীবন-প্রয়াসী মন ফিরে চায় শান্তির সংবাদ।

এদিকে স্বাক্ষর দেখি জীর্ণবস্ত্রে দৈন্যানত চোখে
সমাগত দুর্ভিক্ষের; ফেলে আসা বাস্তুভিটা থেকে
এখনও আহ্বান আসে, ভুলে থাকা প্রাণদীর্ণ শোকে
আবার বেঁধেছি ঘর, জীবনের পথ গেছে বেঁকে
অজানিত ভবিষ্যতে, অনির্দিষ্ট প্রাণের প্রয়াণে,
তবুও মনের তলে, সেই পদ্মা তরঙ্গের গানে,
'আবার আশ্বিন' বলে দূর থেকে ডাক দিয়ে যায়,
তীরে তীরে কাশবন দুলে দুলে কাঁপে ইশারায়।

ত্যাগী ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন

স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁহার ও তাঁহার সন্তানদের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে ত্যাগী ভক্তগণের প্রথম দর্শন ও দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনকাল সম্বন্ধে বিশেষ মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উহার আলোচনা করিয়া কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব কি না—তাহাই পরীক্ষা করিব। কাহারও দোষোদ্‌ঘাটন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা জানি যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও প্রমাদশূন্য হইবে না। তথাপি বিষয়টির অবতারণা করিলে অপর কেহ হয়ত ভবিষ্যতে আরও আলোকপাত করিয়া সত্যনির্ধারণের সহায়তা করিবেন—এই ভরসায় আমরা এই কঠিন কার্যে অগ্রসর হইলাম। আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সর্বক্ষেত্রে প্রথম দর্শন ও প্রথম আগমন এক নাও হইতে পারে। যথাস্থানে আমরা উহার উল্লেখ করিব।

'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, দিব্যভাব' ৫০ পৃষ্ঠায় আছে—"আমরা শুনিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে সুপরিচিত স্বামী ব্রহ্মানন্দই ঠাকুরের নিকট প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন।....১২৮৭ সালের শেষভাগ ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের লীলা-সহচর ত্যাগী ভক্তবৃন্দ একে একে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।" আবার 'লীলাপ্রসঙ্গ, সাধক-ভাব' এর পরিশিষ্টে ২২ পৃষ্ঠায় আছে—"৺যোগানন্দ স্বামীর বাটী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে ছিল। সেজন্য তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে, ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ ১২৮৫ সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৭ সালে ইংরাজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।" উদ্ধৃতাংশে দুইটি মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়; কারণ 'লীলাপ্রসঙ্গে'র অন্যত্র স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শনকাল ১৮৮১ বলিয়াই উল্লিখিত আছে। 'লীলাপ্রসঙ্গ দিব্য-ভাব,' ৫৫ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—"ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পরস্পর পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা ঐরূপে (সুরেন্দ্র-নাথের বাটীতে) সংঘটিত হইয়াছিল। তখন সন ১২৮৭ সালের হেমন্তের শেষভাগ—ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইবে।" 'কথামৃত' ও 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থদ্বয় এই ১৮৮১ সনেরই সমর্থন করে। শেষোক্ত গ্রন্থে 'তত্ত্বমঞ্জরী' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—"১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পৌষ মাসে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও এই দীন সেবক (ভক্ত মনোমোহন) একখানি শকটারোহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন (৭৮ পৃঃ)।" দ্বিতীয় ভুল ১২৮৭ সাল স্থলে ১২৮৮ হইবে; কারণ 'হেমন্তের শেষ' অগ্রহায়ণ ধরিয়া ইংরেজী নভেম্বর, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের সহিত মিলাইলে আমরা ১২৮৮ বঙ্গাব্দই পাই। অন্যান্য ঘটনার আলোচনাও আমাদিগকে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত করে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের

প্রারম্ভে নরেন্দ্র ও রাখাল ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার-পত্রে সহি করেন; তখনও তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে যান নাই। 'লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব' ৫৫ পৃষ্ঠায় আছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ প্রায় সমকালে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। ব্রহ্মানন্দ গমন করেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। আরও যুক্তি এই যে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পিতার সহিত মধ্যপ্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ঐ বৎসরের শেষে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। উহার দুই বৎসর পরে এফ-এ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে ঠাকুরের সহিত দেখা হয়। অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Life of Swami Vivekananda' গ্রন্থে ১৮৮১ সালই গৃহীত হইয়াছে (২২-২৪পৃঃ)। অতএব রোমাঁ রোলাঁর 'The Life of Ramakrishna' এ (২৬০ পৃঃ) উল্লিখিত ১৮৮০ ভুল বলিয়াই মনে হয়। শেষোক্ত গ্রন্থের ২০৩ পৃষ্ঠায় কিন্তু ১৮৮১ সালই উল্লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ১ম ভাগ, ৬ পৃষ্ঠার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—"রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন। কেদার, সুরেন্দ্র তার পরে আসিলেন। চুনী, লাটু, নৃত্যগোপাল, তারকও পরে আসিলেন। ১৮৮১র শেষ ভাগ ও ১৮৮২র প্রারম্ভ—এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, যোগীন আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, ছোটগোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ, শশী; ১৮৮৪ মধ্যে সান্ন্যাল, গঙ্গাধর, কালী, গিরিশ, দেবেন্দ্র, সারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি; ১৮৮৫ মধ্যে সুবোধ, ছোটনরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ, আসিলেন।" বলা বাহুল্য, 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতের' মধ্যে কিছু কিছু অমিল আছে। আবার ইহাও দ্রষ্টব্য যে, 'লীলাপ্রসঙ্গ দিব্যভাব' অপেক্ষা 'লীলাপ্রসঙ্গ-সাধকভাব' এর উক্তির সহিত 'কথামৃতে'র অধিক মিল আছে।

এখন আমরা প্রত্যেকের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনায় অগ্রসর হই। প্রথমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা ধরা যাউক। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থে (৪৮ পৃঃ) আছে—"রাখালের আগমনের ছয় মাসের পর নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম সিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথের গৃহে দর্শন করেন।" ঐ গ্রন্থেরই ২০ পৃষ্ঠায় আছে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাখালের পরিণয় হয় এবং ২১ ও ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, বিবাহের পর মনোমোহনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া রাখাল ঠাকুরের প্রথম দর্শন পান। 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থেও (৭২ পৃঃ) ইহার সমর্থন পাই। এখন বিবেচ্য এই—নরেন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনের ছয় মাস পূর্বে ব্রহ্মানন্দের দক্ষিণেশ্বরে গমন হইলে উহা মে মাস হইয়া পড়ে। 'লীলা প্রসঙ্গে' (দিব্যভাব, ৫৩ পৃঃ) কিন্তু আছে—"শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের তিন-চারি মাস পরেই পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন।" স্বামী বিবেকানন্দের প্রথমাগমনকাল (প্রথম দর্শনকাল নহে) ডিসেম্বর-জানুয়ারী—পৌষ মাস; সুতরাং এই হিসাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আগমনকাল হয় প্রায় ভাদ্র মাস—আগষ্ট-সেপ্টেম্বর। 'লীলা-প্রসঙ্গো'ক্ত বিবেকানন্দের প্রথম আগমনকে অপর গ্রন্থোক্ত প্রথম দর্শন ধরিলে উভয় গ্রন্থে অধিক অমিল থাকে না; কিন্তু সঠিক কিছু বলা কঠিন। তবে 'কথামৃতে'র পূর্বোক্ত নজিরে আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে (১৮৮১ এর শেষভাগে) স্বামী ব্রহ্মানন্দ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গমন করেন বলিলে 'লীলা 'প্রসঙ্গে'র সহিত অধিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গে' (দিব্যভাব, ১০৪ পৃঃ) বলা হইয়াছে—"নরেন্দ্রনাথের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী প্রেমানন্দ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।" 'কথামৃত'কার কিন্তু ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লিখিতেছেন (৫ম ভাগ, ৩য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ)—"বাবুরাম নূতন নূতন আসিতেছেন।" উভয় উক্তির মধ্যে কয়েক মাসের ব্যবধান আছে বলিয়া মনে হয়। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, 'লীলাপ্রসঙ্গে'র উক্ত স্থলের মতে প্রথম দর্শনের দিন রাখাল ও রামদয়াল সঙ্গে ছিলেন; কিন্তু 'প্রেমানন্দ', ১ম ভাগ, ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"আমার (প্রেমানন্দের) সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মদর্শনের তিন চার দিন পরে এক দিন হঠাৎ রামদয়াল বাবুর সঙ্গে বাগবাজারে দেখা হয়। তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন, 'তোমায় পরমহংসদেব ডেকেছেন —একবার যেয়ো।' আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লুম, 'আমায় ডেকেছেন? —কেন?' আহা, তিনি যে এত দয়াময় তখন তা বুঝতে পারি নি। তারপর এক দিন দক্ষিণেশ্বরে গেলুম।... যাওয়ামাত্রই আমায় বল্লেন, 'এই কাঠগুলো পঞ্চবটীতে নিয়ে যাও তো।' সেদিন ঠাকুর সেখানে চড়ুইভাতি করেন।" 'লীলাপ্রসঙ্গে'র বর্ণনাদৃষ্টে (দিব্যভাব, ১০৪ ও ১৪৮ পৃঃ) জানা যায় যে, প্রথম দর্শনের দিনে ঠাকুর বাবুরামের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং ভক্তপ্রীতি ও বাবুরামের প্রতি স্নেহের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। সুতরাং উহাই যদি প্রথম দর্শন হয়, তবে রামদয়ালের মুখে আহ্বান পাইয়া বাবুরাম অবাক হইলেন কেন? 'লীলাপ্রসঙ্গে'র বর্ণনাকে দ্বিতীয় দর্শন ধরিলে এই অসামঞ্জস্যের উদয় হয় না। বিশেষতঃ 'কথামৃতে'র বর্ণনা অধিক গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। 'কথামৃতে' ডিসেম্বরে 'নূতন' আসার কথা বলা হইয়াছে; 'প্রেমানন্দে' চড়ুইভাতির উল্লেখ থাকায় দ্বিতীয় দর্শনও শীতকালেই হইয়াছিল মনে হয়; কারণ চড়ুইভাতি সাধারণতঃ শীতকালেই প্রশস্ত। আরও যুক্তি এই যে, 'স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী'র ভূমিকায় স্বামী শিবানন্দ লিখিয়াছেন, "তিনি পরমহংসদেবের পরমপ্রিয় ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার) মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁহারই নিকট তিনি প্রথমে পরমহংসদেবের বিষয় শুনেন এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার দর্শনার্থে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন।" বিষয়টি 'প্রেমানন্দ' ১ম ভাগে (৬ পৃঃ) আরও খুলিয়া বলা হইয়াছে —"শুনা যায় বালক বাবুরাম এইরূপে তাঁহার শিক্ষাগুরু পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গেই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম শুভদর্শন করেন।"* বাবুরাম মহারাজও এক দিন বেলুড় মঠে মাষ্টার মহাশয়ের পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতে করিতে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন যে, মাষ্টার মহাশয়ই তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে লইয়া যান। সুতরাং 'কথামৃতে'র কথাই স্বীকার্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চড়ুইভাতি বিষয়টি 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'প্রেমানন্দ' উভয়গ্রন্থে দ্বিতীয় দর্শনকালে বর্ণিত হওয়ায় এবং 'লীলাপ্রসঙ্গের' প্রামাণ্য বহুবিষয়ে অবিসংবাদিত হওয়ায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে কিছু বলা যায় না—মনে হয়, কোথায় যেন কি একটা ভ্রম রহিয়া গিয়াছে।

পরের সমস্যাটি আরও জটিল। 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে— "শিলচর হইতে প্রকাশিত 'বিবেকানন্দ চরিত' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী শিবানন্দ লিখিয়াছেন, '১৮৭৯ বা ৮০ সালে আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণদর্শনলাভ হয় এবং তাঁহার দয়া প্রাপ্ত হই।' প্রথম দর্শন যে রাম বাবুর বাড়ীতেই হইয়াছিল, তাহাও ঐ

ভূমিকায় উল্লিখিত আছে।" 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' এর ২৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনকালে শিবানন্দের সঙ্গীটি আম কিনিয়া আনিয়াছিলেন। কলিকাতার বাজারে আজকাল আম প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে বোধ হয় ধরিয়া লওয়া চলে যে, আমের ঋতুই ঐ পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ বিশেষ কোনও হেতু না ঘটিলে সময়োচিত ফলই লোকে ক্রয় করে এবং ঐ সময়ে কলিকাতায় আম অন্য ঋতুতে হয়ত সুলভ ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থের এই উক্তিগুলির সহিত 'লীলাপ্রসঙ্গ-দিব্যভাবে'র (৫০ পৃঃ) বিরোধ সুস্পষ্ট; তবে 'সাধকভাব'-এর সহিত বিরোধ নাই, 'কথামৃত' ১ম ভাগ ৬ পৃষ্ঠার সহিতও বিরোধ নাই। তথাপি প্রশ্ন এই—ঠিক কোন্ বৎসরে সাক্ষাৎ হয়? সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে আর একটি প্রশ্নের উত্তরের উপর—রাম বাবুর বাটীতে ঠাকুর কবে প্রথম পদার্পণ করেন?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী নীহার গুপ্তা, বি-এ, বি-টি

'মা' শব্দ শ্রবণে প্রত্যেক নারী-হৃদয়ে স্বভাবতঃ অজ্ঞাতসারেও একটা আনন্দ অনুভূত হয়, মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়-বীণার তারগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, অন্তর দেবভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। এ মাতৃত্ব প্রত্যেক নারীর স্বাভাবিক বৃত্তি। প্রত্যেক নারীর অন্তরে এটি সুপ্তভাবে অবস্থান করছে। এ শক্তি নারীর অন্তরে বিরাজিত থেকে প্রেম প্রীতি স্নেহ ও ভালবাসারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

সাধারণ নারী যখন সংসারের দীর্ঘ-পথ চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, জগতের কোলাহল এবং ঝড়-ঝঞ্ঝায় যখন শ্রবণ বধির হয়ে আসে, দৃষ্টি হয়ে আসে আচ্ছন্ন, অন্তরের দিকে তাকিয়ে যখন প্রকৃত শান্তির আভাস পায় না, তখন সে শান্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে, আপনাকে ফতুর করে দিয়ে সে চায় শান্তি, অনন্ত শান্তি, যে পাওয়ার শেষ পাওয়া আর নেই।

এই চাওয়াই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে এবং তখনই তার সুরু হয় পথের সন্ধান। সে পথের সন্ধান বলে দিতে জ্ঞান-বর্ত্তিকা হাতে শক্তিস্বরূপিণী মা আমাদের সম্মুখে আজ দণ্ডায়মানা। তিনি যে আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন, যে আনন্দ তিনি উপভোগ করেছেন, সে আনন্দ দুহাতে বিলিয়ে দেবার জন্য তিনি ব্যাকুল। এ অনন্ত আনন্দের অধিকারী যে শুধু নারী তা নয়। তিনি যে মা, তাই তাঁর পুত্র-কন্যাকে তিনি সমভাবে তাঁর কোলে স্থান দিয়ে তাদের অন্তরের মলিনতা দূর করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রেম, তাঁর স্নেহ তো সাধারণ নয়। প্রেমানন্দের

প্রেমস্পর্শে তিনি যে আনন্দময়ী। তাঁর সুশীতল হস্তের পুণ্যস্পর্শ লাভ করতে হবে—তাইত এই জন-সমাবেশ। প্রত্যেক ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনন্ত বাসনা এ পরশমণি-স্পর্শে পূজার অর্ঘ্য হয়ে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে নিবেদিত হোক, জীবন মধুময় হ'য়ে উঠুক।

স্ত্রী জাতির আদর্শ-স্বরূপা শ্রীশ্রীমা যেন লোক-শিক্ষার জন্যই মানবজীবন ধারণ করেছিলেন। তাঁর জীবনী পর্য্যালোচনা করলে বহু জায়গায় তাঁর অতিমানবতার পরিচয় পাই।

বালিকা-বয়সেই তিনি রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে নিপুণা ছিলেন। মায়ের কাজের সাহায্যে সর্ব্বদাই থাকতেন অগ্রণী। এ অল্প বয়সেই (১১ বৎসর) তাঁর সেবাপরায়ণতার ছবি আমাদের চোখে পড়ে যখন তাঁকে দেখি পাখা হাতে গরম খিচুড়ি জুড়িয়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীকে খাইয়ে তৃপ্ত করতে। বালিকা-শক্তির অন্তরালে ক্ষণেকের জন্য দেখা দেয় মাতৃমূর্ত্তি। তারপর ১৪ বৎসর বয়সে স্বামিগৃহে আরম্ভ হ'ল সংসারধর্ম্ম এবং এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ-মিলনের সাথে আরম্ভ হ'ল সাধনজীবন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহের আশ্রয়ে থেকে বিশ্ব-পিতার সেবাবুদ্ধিতে সংসারের প্রতিটি কর্ত্তব্যকর্ম্ম তিনি সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতে লাগলেন। তাঁর সহজ সাধারণ জীবন-যাত্রার ভেতর দিয়ে তাঁর সরল সাধুভাব এবং অন্তরের গভীরতা প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যবহারে আমাদের কাছে উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে। সে সময়কার কথা মায়ের মুখে আমরা শুনতে পাই—"সে সব কি দিনই গিয়েছে। জ্যোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলেছি—তোমার এ জ্যোছনার মত আমার অন্তর নির্ম্মল করে দাও। রাতে যখন চাঁদ উঠত, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে তাঁর প্রতিবিম্ব দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।"

যে হৃদয় আপন পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বালিকা-বয়স থেকে কেঁদে কেঁদে ওঠে, তার সে চরিত্রের দৃঢ়তা পরিমাপ করবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের কই? সে আধ্যাত্মিক গতি যে হাউই বাজির মত ছুটে চলেছে সেই অসীমের সন্ধানে!

স্বামীকে তিনি পেয়েছিলেন নররূপী দেবতা। তাঁকে তিনি তাঁর প্রভু গুরু ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছেন। প্রতিবেশীরা যখন তাঁর স্বামীকে পাগল এবং তাঁকে পাগলের স্ত্রী আখ্যা দিয়েছিল তখন তিনি পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে অস্থির চিত্তে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হয়েছিলেন। পথে বহু ক্লেশ সহ্য করে এবং নানারকমে ভগবৎকৃপা লাভ করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পেরেছিলেন। সেখানে ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবানজ্ঞানে সেবা ও পূজা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে তাঁর অতি প্রিয় ভক্তের ন্যায় ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই আরম্ভ হল মায়ের সাধন-ভজন। এক বৃহৎ-শক্তির সাথে নিত্যযুক্ত থেকে যেমন অন্যান্য শক্তিগুলি শক্তিময় হয়ে ওঠে এবং তাদের গতিপথ থেকে একবিন্দু বিচলিত না হয়ে সমতা রক্ষা করে, ঠিক তেমনি ছিল মায়ের জীবনের গতিধারা। ঠাকুরের সেবায় তিনি হয়ে থাকতেন সেবাময়ী, তন্ময়।

নহবৎঘরে ঠাকুরের জননীর কাছে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। সেখানে তিনি মনের আনন্দে সেবাকাজে নিযুক্ত রইলেন।

ঠাকুর তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য একান্তে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'কি গো, তুমি কি আমাকে সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ?'

উত্তরে মা বলেছিলেন—'না, আমি তোমাকে সংসার-পথে কেন টানতে যাবো? তোমার ইষ্ট-পথেই সাহায্য করতে এসেছি।'

নহবৎঘরের স্বল্পপরিসর জায়গায় সংসারের যাবতীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে অতি সুশৃঙ্খল ভাবে সব কিছু পরিপাটী করে নিয়েছিলেন। ঘরের নীচু দরজার চৌকাঠের সাথে কত সময় মাথা ঠুকে যেত, ঘরের ভিতরে কত সন্তর্পণে থাকতে হতো, বাইরে স্নান ইত্যাদির জন্য কত অসুবিধা ভোগ করতে হতো তবু তাঁর মনের কোন রকম বিকার দেখা যায়নি। ঠাকুরের আহারবিহার-সম্বন্ধীয় নিত্য-নৈমিত্তিক সেবার কোনরকম ত্রুটি না হয় সে বিষয়েই তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকতো।

দিনের পর দিন ভক্তসমাগম বেড়ে যেতে লাগলো। সাধনভজন-বিষয়ে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কোন কোন ভক্ত মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে লাগলেন। মায়ের আর সারাদিন বিশ্রামলাভের সময়টুকু রইল না। তবু তাঁর ক্লান্তি নেই, তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্মে তিনি দৃঢ়হস্ত। পরে এমন অবস্থা হলো যে তিনি সারাদিনে শুধু ঠাকুরের আহারের সময় একবার মাত্র তাঁর দর্শন পেতেন, আবার কোন দিন তাও মিলতো না, এত ভক্তের ভিড়। তাতেও তিনি বিচলিত হতেন না। ঠাকুরকে যেন তখন তিনি সাধারণের সম্পত্তি বলে মনে করতেন। তিনি যে সকলের গুরু, ইষ্ট, পিতা। আর তিনি নিজে—নির্লিপ্ত যোগী যেন যোগসাধনায় বিভোর। ঠাকুর এ সময় মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন।

যে অর্থের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন আকর্ষণ ছিল না সে অর্থে তাঁরও কোন আকর্ষণ দেখতে পাই না। তারই একটি দৃষ্টান্ত—এক মাড়োয়ারী ভক্ত এক বার ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। ঠাকুর তা নিতে অস্বীকার করলেন, আর মার মন বুঝবার জন্য তাঁকে ঐ অর্থ গ্রহণ করতে বললেন, তার উত্তরে মা বলেছিলেন—ঐ অর্থ গ্রহণ করলে আমি তোমার সেবায়ই লাগাবো এবং তাতে তোমারই তা গ্রহণ করা হবে। তোমার ত্যাগের জন্য লোকে তোমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, অতএব ও গ্রহণ করা হবে না।' শ্রীশ্রীঠাকুর তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

এ ভাবে প্রতি বিষয়ে আমরা তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তাঁর চরিত্রমাধুর্য্য বেশীদিন লুক্কায়িত থাকতে পারলো না। যে জ্যোতিঃ জগৎ আলোকিত করবার জন্য অপেক্ষমাণ সে তো এক দিন প্রকাশিত হবেই।

ক্রমশঃ জেগে উঠল মাতৃশক্তি। অন্তরে 'মা' ডাক শুনবার আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শত শত নরনারীর মাতৃসম্বোধনে চিত্ত পরিতৃপ্ত হ'ল। স্বয়ং ঠাকুর তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজো করলেন। মা সমাধিস্থা হয়ে জগন্মাতারূপে বিরাজ করতে লাগলেন। নারীশক্তি বিশ্বশক্তিরূপে প্রকাশিত হ'ল।

যে সত্যস্বরূপ দেবতা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত তাঁর পূজোর আয়োজন করতে প্রতিটি নারীহৃদয় আজ জেগে উঠুক। বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা কেন্দ্রীভূত হোক, অনুসন্ধিৎসু মনের জিজ্ঞাসা আঘাতের পর আঘাত করে মূলাধারস্থিত সুপ্ত ভুজঙ্গিনীকে জাগিয়ে তুলুক। তরঙ্গসংঘাতে জাগ্রত বেলাভূমির অতলস্পর্শী সমুদ্র দর্শনের মত আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মানবচিত্ত আপনার অন্তরস্থিত দেবতাকে দর্শন করে শুদ্ধ হয়ে যাক, পরিপূর্ণ আনন্দ উপলব্ধি করুক।

সর্ব্বাতীত

শ্রীতারাকুমার ঘোষ

স্তব্ধভাবে চেয়ে থাকি একান্ত বিস্ময়ে,
তব সৃষ্টি চলিয়াছে পরম আগ্রহে
রূপ হ'তে রূপান্তরে ; মহাশূন্য পথে,
গ্রহ-উপগ্রহ চলে কাহার সঙ্কেতে
অনন্তের রহস্যসীমায় : অবশেষে
অসীম বারিধি তীরে চন্দ্র ওঠে হেসে,
অসংখ্য বালুকা জাগে রহস্যেরে লয়ে ।
পত্র, পুষ্প, কীট আদি পতঙ্গম বহে
কি এক বারতা : শীত গ্রীষ্ম বারিধারা
চলেছে আপন পথে দিতে কার সাড়া
নাহি জানি ; মনে হয় পরম নিয়মে
অণু পরমাণু আদি ব্রহ্মাণ্ডেরে ভ্রমে
কি এক নির্দ্দেশে । পরে কখন সহসা
ভীম কৃষ্ণ জাগে মেঘ হ'তে তীব্র কশা
বিজলীর, মহাভীম মহা বেগ ভরে
ভাসায়ে ভাঙ্গায়ে লয়ে চলে থরে থরে
রুদ্র পথে : মানে নাক দীর্ণ আঁখিজল,
নাহি ক্ষমা, নাহি শান্তি, দুর্বার সম্বল
চলে বিধ্বংসের পথে ; ভাঙ্গনের শেষে
প্রভাত সূর্য্যের আলো ওঠে জেগে হেসে,
প্রকৃতির রুদ্র ভালে প্রশান্তির টিকা
প্রসন্ন উজ্জ্বল ভাবে জেগে ওঠে লিখা
প্রতিনিয়তের এই উত্থান পতন,
সীমা অসীমের মাঝে সদা আন্দোলন :
নাম-রূপ-স্থিতি মাঝে জেগে ওঠে কলি
কার্য্য-কারণ যেন ধরিয়াছে হাল
বৈজ্ঞানিক গতিরথে । তার মাঝে বসি
মহে হয় বিরাজিছে দীপ্ততম শশী,
এ সবার পারে তব অনন্ত সঙ্গীত
আলোক উজ্জ্বলি চলে দীপ্ত তরঙ্গিত ।
তুমি পূর্ণ, তাই তুমি হও মহাকাল,
হও দীপ্তি, তৃপ্তি, শান্তি, পরম দয়াল,
আঁধার আলোক ছায়া কম্পন, স্থিরতা,
ভালমন্দ উচ্চনীচ চলে ভিন্ন গাথা—
কিন্তু জানি এ সবার তুমিই অতীত
নহ আদি, অন্ত, তুমি বিধান. বিহিত
নহ কর্ত্তা, নহ কর্ম্ম, নহ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
নহ সুখ, নহ দুঃখ, নহ মর্ম্মামর্ম্ম,
নহ বেদ, নহ বেত্তা, নহগো সঙ্গীত
সর্ব্বভাবে, সর্ব্বপারে সবার অতীত

স্বামী বিবেকানন্দ*

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

অনুবাদক—স্বামী শ্যামলানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নব জাগরণ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ভারতীয় নব জাগরণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ উহারই একটি সুন্দরতম অভিব্যক্তি। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পুনরভ্যুদয়। শতাব্দী-ব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় ভারতের সমাজ অধঃপতিত, ধর্ম্ম গোঁড়ামি ও আচার-অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত এবং সামাজিক জীবন গতিহীন। সাময়িক ভাবে ভারত যেন আত্ম-সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া অনুভূত হইল। তখন ভারতীয় নব জাগরণের নেতৃবর্গ তাঁহাদের সংস্কৃতির প্রাচীন সম্পদশীল ঐতিহ্যের বাণী শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা বেদান্ত (বেদ ও উপনিষদ্) হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিলেন। একটি প্রাচীন সংস্কৃতি-ধারার পুনর্জ্জন্ম হইল। যে আধ্যাত্মিক শক্তি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, উহা বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় উহাতে পুনঃ প্রাণশক্তির সঞ্চার করা হইল।

সকল ধর্ম্ম দর্শন কলা বিজ্ঞান প্রভৃতি একই পরম সত্যলাভের বিভিন্ন পন্থা বলিয়া উহাদের অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান-নির্দ্দেশই বেদান্তের লক্ষ্য। ইহার বাণী অপৌরুষেয়, অলৌকিক, বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্পন্ন ও অসাম্প্রদায়িক। ইহা ঘোষণা করে—মানুষ স্বরূপতঃ ঈশ্বর। সে নিজেই নিজের কর্ত্তা ও ভাগ্যনিয়ন্তা। ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক ঐক্যের এবং সামাজিক জীবনের আপাত প্রতীয়মান বিভিন্ন প্রবাহ ও রূপের অন্তর্নিহিত সমন্বয়ের উপর গুরুত্বারোপ বেদান্তের প্রধান শিক্ষা হইতে উদ্ভূত।

স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় ভারতীয় সংস্কৃতির এই মহামানবীয় জীবনধারায় গুরুত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ধনি-দরিদ্র বলিয়া কিছু ছিল না। তাঁহার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবই শিব এবং মানবসেবাই ভগবৎসেবা।

স্বামী বিবেকানন্দ—মহাত্মা গান্ধীর অগ্রদূত

সম্ভবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের অতিশয় শক্তিশালী অদ্বিতীয় প্রভাবই মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

* নিউইয়র্ক-স্থিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্রে মিঃ ম্যালভিনা হফ্‌ম্যান কর্ত্তৃক গত ৪ই জুন স্বামী বিবেকানন্দের ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বক্তৃতার সারাংশের বঙ্গানুবাদ।—উঃ সঃ

আবার তাঁহাদের অনেক বাণীর প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ একরূপ। স্বামীজী ও মহাত্মা গান্ধী এই উভয়ের সাধারণ মৌলিক বিশ্বাস-সমূহের মধ্যে সকল ধর্ম্মের একত্ব ও ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন নিষ্কাম ভগবদ্বুদ্ধিযুক্ত জীবসেবার পরম মূল্য-নির্ধারণ, সকল প্রকার দাসত্ব ও বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ, শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি প্রেম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবেকানন্দের নির্ভীক নিষ্কাম সেবার আহ্বান মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ-আচরণে যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। উভয়েই দরিদ্রনারায়ণের উপাসক। উভয়েই বিশ্বাস করিতেন—জীবসেবাই ভগবৎ-সেবা। ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উভয়েই সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। দেশবাসীর আত্মমর্য্যাদা-বোধ ও অভীষ্ট ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস জাগ্রত করিতে উভয়েই সাতিশয় অনুরাগী ছিলেন। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমেরিকার ভিনসেণ্ট সিয়ান "Lead Kindly Light" নামক মহাত্মা গান্ধীর জীবনী-গ্রন্থে এই বিষয় সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সহজেই প্রত্যয় জন্মে যে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবই মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ভাবসমূহের রূপ দান করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কখনও সাক্ষাৎভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন নাই এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভাবসমূহের অন্তর্গত সামাজিক কর্ম্মসূচী প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে স্বামীজীর উপদেশ ও বাস্তব উদাহরণের নিকট ঋণী। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কর্ম্মক্ষেত্র অনন্তগুণে বিস্তৃত হইল এবং উহা অন্যান্য যে সকল শক্তি জাতীয় মুক্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, উহাদিগকে আত্মস্থ করিয়া লইল। তাঁহার যে সকল শিষ্য, শুধু সঙ্কীর্ণ রাজনীতি-ক্ষেত্রে নহে পরন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে—যেমন বাস্তব ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্রতা ও প্রেমের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে ভুলেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ—আন্তর্জ্জাতিক

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক মনোভাব-সম্পন্ন। জীবনের অতি প্রারম্ভেই তিনি বুঝিয়াছিলেন ভারতীয় অধঃপতনের প্রধান কারণ প্রগতিশীল জগৎ হইতে উহার সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা। অন্যান্য জাতি কি ভাবে বাস করিতেছে তাহা দেখিয়া সেই অভিজ্ঞতা হইতে কি প্রকারে মাতৃভূমির মুক্তি সাধিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে তিনি ভারতীয় যুবকগণকে ভারতের বাহিরে যাইতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। ভারতীয়দের পাশ্চাত্য জড়বাদের অনুকরণ-অভ্যাস এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামি এবং অত্যাচারেরও তিনি নিন্দা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার কতিপয় প্রসিদ্ধ উক্তি মনে পড়েঃ

"খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।"

"কোন ব্যক্তি, কোন জাতি অন্যকে হিংসা করিয়া বাঁচিতে পারে না।"

"জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে আমরা মূর্খের মতই মন্তব্য করিয়া থাকি। নাগাল পাই না বলিয়া ফলগুলি টক বলিয়া থাকি। যে ভগবান আমাকে দুইটি অন্ন দিতে পারেন না, তিনি পরলোকে মুক্তি দিতে পারেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

"বহির্জ্জগৎকে বাদ দিয়া আমাদের চলে না। ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করা আমাদের মূর্খতা। আমরা তাহার জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছি, আর যেন এরূপ না করি।"

ভারতের পঙ্গুতাসাধনকারী বিচ্ছিন্নতা দূর করিবার জন্যই যেন তীর্থযাত্রিরূপে স্বামীজী ১৮৯৩ খৃঃ আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই বৎসর চিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেই সময়ে আমেরিকা ভারত হইতে অনেক দূরে বলিয়া প্রতিভাত হইত এবং ইহা বিশ্ব রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে আবর্ত্তিত ছিল না। স্বামীজী উভয় দেশের মধ্যে ধর্ম্মীয় সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যা ও বিশ্বব্যাপারে ভারতের যথার্থ দৌত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা এই দেশীয় লোকের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সাড়া জাগাইয়াছিল। ভাবী কালের সভ্যতা-অভিযানে আমেরিকার অবদান ও ভারতের ভাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার দিব্যদর্শন হইয়াছিল। স্বামীজীর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে হয়—"দেশ পতিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা আবার উঠিবে নিশ্চয় এবং সে অভ্যুত্থান জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক বৎসর আমেরিকায় বাস এবং সমস্ত সময় অধ্যয়ন ও প্রচারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভারত-আমেরিকা-সহযোগিতার ভিত্তিভূমি তৎকর্ত্তৃক অন্নাধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যদিও আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অনুসরণে ভারত কনিষ্ঠ সহযোগী বলিয়া প্রতিভাত, তবুও ইহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতের পরম্পরাগত স্বাধীনতা ও পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের শত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। বস্তুতঃ বেদান্তের মুখ্য উপদেশই মুক্তি— ভয় হইতে মুক্তি, জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধিজীবী ভারতের আন্তর্জ্জাতিক দিক্‌চক্রবালের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। নবাভ্যুদীয়মান ভারতের নেতৃবর্গ পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতিরূপ প্রস্রবণের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-সমন্বয়ের ফলস্বরূপ গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সুন্দরতর বস্তুর কল্পনা দুষ্কর। স্বামী বিবেকানন্দের দুই বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ এবং ছয় বৎসর পরে গান্ধীজী জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক বলিয়া মনে হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য—বর্ত্তমান জগতে উহার সার্থকতা

স্বামী বিবেকানন্দ কল্পনাপ্রিয় ভাবুক ও বিশ্ব-পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হইলেও গভীর বাস্তব জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সঙ্ঘগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ত্যাগ ও সেবার আদর্শে তাঁহার গুরুর নামানুসারে রামকৃষ্ণ মিশন নামে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। অকালে উনচল্লিশ বৎসরে স্বামীজীর দেহত্যাগ হয়। পূর্ব্বে তিনি এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে কয়েক জন মাত্র অনুরাগী সহযোগী ও শিষ্যকে একত্র সমবেত করিতে সমর্থ হন। তবুও এই সঙ্ঘ পঞ্চাশ বৎসরে উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। শুধু যে সমগ্র ভারতে উহার শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা নহে, বিদেশে—এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্নদেশেও উহার কার্য্যসমূহ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

এই সঙ্ঘ স্থায়ী এবং উহার কার্য্যসমূহ বিস্তৃত হইল কেন? নিশ্চয়ই স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শের মধ্যে এরূপ সার্ব্বজনীন আবেদন রহিয়াছে, যাহা উহাতে প্রেরণা দিতেছে। তিনি উপলব্ধি করেন—যে বিজ্ঞান ও শিল্প পাশ্চাত্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার সমাজ-সেবাকার্য্যের ভিতর দিয়া ভারতীয়

রহস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার অন্তর্নিহিত মানবপ্রেম, জীব-শিবত্ব ইত্যাদি আদর্শের বাস্তব রূপ-দান সম্ভব। বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত বর্ত্তমান কালে এরূপ আদর্শসমূহ ভাববিলাস মাত্র। স্বামীজী ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্প-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞান যদি আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উহার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ক্ষমতা ও যশোলোলুপতা জন্মায় এবং ধ্বংসাত্মক যন্ত্রে পরিণত হয়। এইরূপে তিনি পাশ্চাত্যদেশেও ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম-জ্ঞান প্রচারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম অদ্বিতীয় সত্যানুভূতির দুইটি পন্থা এবং উহারা পরস্পরের সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের পরিশুদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। রামকৃষ্ণ মিশন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়-সাধনে সতত যত্নবান রহিয়াছেন। আজ জগতের সন্দেহ ও নৈরাশ্যপূর্ণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশসমূহ নূতন অর্থে উপলব্ধ হইতেছে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ও তৎপরিচালিত বেদান্তকেন্দ্রসমূহের কার্য্যাবলীর ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান জগৎ যদি নব্যভারত ও নব্যজগতের প্রবর্ত্তক স্বামীজী কর্ত্তৃক সূত্রাকারে রচিত আদর্শবাদের চিন্তা ও অনুধ্যান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লাভবান হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কাঁকুড়গাছি, শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান—গত ১৯শে ভাদ্র জন্মাষ্টমী দিবসে এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির বিশেষ ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ভজন কীর্তন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি ভক্তগণের মনে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। প্রায় দশ হাজার ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত জীবনী ও বাণী আলোচনা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ১৯৪৯ সনের কার্য-বিবরণী—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাপূত বৃন্দাবনস্থিত জনকল্যাণকর এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান বৎসরে ৪৪তম বর্ষে উপনীত হইয়াছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র সেবাশ্রম-রূপে কার্য আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ একটি উচ্চাঙ্গের হাসপাতালে পরিণত হয়। ইহাতে এখন ৫৫টি রোগিশয্যা (bed) আছে; ক্রমেই অধিকতর আধুনিক উপকরণ-সমন্বিত হওয়ায় হাসপাতালটির উপযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সেবাশ্রমের চক্ষু-বিভাগের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগে প্রতি বৎসর বিভিন্ন

স্থান হইতে আগত বহু চক্ষুরোগীর চিকিৎসা হইয়া থাকে; অনেকের চক্ষুর অস্ত্রোপচারও হয়। আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে চক্ষুরোগী সমেত ১৩৫৫ জন চিকিৎসিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ১২৪২ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেন। এই বিভাগে চক্ষুরোগী সমেত ১১০৫ জন রোগীর অস্ত্রোপচার হইয়াছে। নন্দবাবা চক্ষু হাসপাতাল ১৯৪৩ সনে স্থাপিত হয়। মুখ্যতঃ বম্বের দুই জন ধনবান ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে হাসপাতালটি পরিচালিত হইতেছে। বৃন্দাবনের সমীপবর্তী গ্রামগুলিতে চক্ষুরোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। এইজন্য এই চক্ষু হাসপাতালটি দরিদ্র গ্রামবাসিগণের নিকট বিধাতার আশীর্বাদ-স্বরূপ। আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের বহির্বিভাগে ৩১,০৮৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন; ইহার পৌনঃপুনিক রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৭,২১৬ জন। ১৯৪৯ সনে এই বিভাগে ১,৪১৪ জন রোগীর অস্ত্রোপচার হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুলনায় এই বৎসর সেবাশ্রমের বহির্বিভাগে অধিকসংখ্যক রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছেন। আলোচ্যমান বর্ষে প্রতিষ্ঠান-টির রঞ্জনরশ্মি-বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়। ইহা বৃন্দাবন ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের বহু-কালের একটি অভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই বৎসর রঞ্জনরশ্মি যন্ত্রসাহায্যে ২৩০ জন রোগী পরীক্ষিত হইয়াছেন। সেবা-শ্রমের রোগ-পরীক্ষাগারে (Clinical laboratory) ৭৪৭টি নমুনার মল মূত্র রক্ত এবং থুথু পরীক্ষিত হইয়াছে। Inducto-therm-therapy দ্বারাও ২১ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সেবাশ্রম ৩১ জন দুর্গত ব্যক্তিকে মাসিক ও সাময়িক সাহায্য করিয়াছেন। এই বাবত ২৮২৷৷০ ব্যয়িত হইয়াছে। প্রধানতঃ অসহায় ব্যক্তি এবং দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের বিধবাগণকে এই অর্থসাহায্য দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রম রুগ্ন শরণার্থিগণেরও সেবা করিয়াছেন। সেবা-শ্রমের অন্তর্বিভাগে ১৮ এবং বহির্বিভাগে ১৫,৮৭৫ জন শরণার্থী রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে।

সেবাশ্রমটি যমুনার তীরে অবস্থিত। প্রতি-বৎসর বন্যার প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট আশঙ্কা সৃষ্টি করে। এতদ্ভিন্ন ইহা অনেকটা দূরবর্তী বলিয়া বহু রোগী ইহার অসামান্য উপযোগিতার সুযোগ নিতে পারেন না। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য সেবাশ্রমটিকে মথুরা বৃন্দাবন মেন্ রোডের ধারে একটি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নূতন স্থানে হাস-পাতাল, চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মিগণের বাসস্থান, মঠ ও মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি বাবত বহু অর্থের প্রয়োজন। সেবাশ্রমের স্থায়ী তহবিল ব্যয়ের অনুপাতে মোটেই যথেষ্ট নহে। ইহার আশানুরূপ বৃদ্ধিসাধনও নিতান্ত আবশ্যক। সহৃদয় ব্যক্তিগণ মৃত আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতিকল্পে সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে প্রতি রোগিশয্যার জন্য ৫০০০৲ দান করিতে পারেন। আমরা আশা করি, বদান্য দেশবাসিগণ যথেষ্ট অর্থানুকূল্য দ্বারা সেবাশ্রমের এই সকল আশু ও অপরিহার্য প্রয়োজন মিটাইতে সাহায্য করিবেন। আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ৫৬,৮২৮৵৬ পাই এবং মোট ব্যয় ৫৬,১২২৵৯ পাই।

মায়াবতী (আলমোড়া) দাতব্য চিকিৎসালয়, ১৯৪৯ সনের কার্যবিবরণী—স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্ররূপে হিমালয়স্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহা ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত। এই আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়টিও আর্ত নর-

নারায়ণ সেবা দ্বারা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই সেবা-প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। ইহা ১৯০৩ সনে প্রতিষ্ঠিত। ক্রমশঃই ইহার উপযোগিতা সবিশেষ অনুভূত হইতেছে। অজ্ঞ নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসিগণ ৫০।৬০ মাইল দুর হইতে ৪।৫ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া এখানে ঔষধ লইতে আসেন। প্রতিষ্ঠানটি যোগ্য চিকিৎসকের পরিচালনাধীন। ইহার অন্তবিভাগে ১৩টি রোগিশয্যা আছে। কখন কখন রোগিসংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে অধিকতর রোগিশয্যার ব্যবস্থা করিতেই হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অস্ত্রোপচার-গৃহ আধুনিক উপকরণ-সমন্বিত। ইহাতে নানাপ্রকার অস্ত্রোপচার হইতেছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহা দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইতেছেন। গ্রামোফোনের সাহায্যে রোগীদের চিত্তবিনোদের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সেবা প্রতিষ্ঠান-সংলগ্ন লাইব্রেরী হইতে রোগিগণকে পড়িবার জন্য পুস্তক দেওয়া হয়। আলোচ্যমান বর্ষে ইহার অন্তর্বিভাগে ৩০২ এবং বহির্বিভাগে ৮৭৮৫ জন রোগী চিকিৎসালাভ করিয়াছেন। এই বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের মোট আয় ১৭,৫৭১৷৷১১ পাই এবং মোট ব্যয় ১৪,০০১৷৷৩ পাই।

কনখল (হরিদ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—১৯৪৯ সনের কার্য-বিবরণী— আমরা এই সেবা-প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকরূপে এক সময়ে পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরস্থ হরিদ্বারে আসিয়া তত্রত্য রোগগ্রস্ত তীর্থযাত্রী ও সাধুগণের দুঃখ-ক্লেশদর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের সেবা, শুশ্রূষা ও যত্ন করিবার কেহই ছিল না। স্বামীজী তাঁহার প্রিয় শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দকে অসহায় তীর্থযাত্রী ও সাধুগণের সেবার ভার গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। সাহসী সৈনিকের মত শিষ্য গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া হরিদ্বারের অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার অনতিদূরে কনখল গ্রামে ১৯০১ সনে বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রারম্ভিক কার্যের সূচনা করেন। সামান্য অবস্থা হইতে সেবাশ্রম বর্তমানে পঞ্চাশটি রোগিশয্যা-যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপায়িত হইয়াছে। হরিদ্বারে ইহাই একমাত্র বৃহৎ হাসপাতাল। এখানে রোগীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা এবং বিনামূল্যে খাদ্যসরবরাহ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসী ও তীর্থযাত্রিগণ ব্যতীত উত্তরকাশী, নরেন্দ্রনগর, গারোয়াল, নেপাল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে রোগিগণ চিকিৎসার্থ এই সেবাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরিদ্বার সর্বশ্রেণীর হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থান এবং কেদারনাথ ও বদরীনাথের প্রবেশদ্বার-স্বরূপ। কুম্ভমেলার সময় এই প্রতিষ্ঠান সহস্র সহস্র রোগগ্রস্ত তীর্থযাত্রীর সেবা করিবার সুযোগ পায়। সেবাশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাসপাতাল ব্যতীতও একটি সাধারণ পাঠাগার আছে। এইরূপ একটি সেবা-প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

আলোচ্যমান বর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ৬১,৭২৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন। অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে রোগীর দৈনিক গড় সংখ্যা ছিল ১৮৮। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে রোগীদিগকে বিনামূল্যে পথ্য ও ঔষধ প্রদান এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। বিহার উড়িষ্যা বঙ্গদেশ বোম্বাই মান্দ্রাজ মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ দিল্লী পূর্ব-

পাঞ্জাব, নেপাল, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের রোগিগণকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছিল।

১৯৪৭ সনে শরণার্থিগণের জন্য যে সেবা-কার্য আরম্ভ করা হয় উহা আলোচ্যমান বর্ষেও অব্যাহত ছিল। হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ৮৩ জন শরণার্থী রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন এবং বহির্বিভাগে ৩০,২১২ জন রোগীর মধ্যে ঔষধ বিতরিত হইয়াছে। অনেককে ঔষধের সহিত আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের চিকিৎসা-ব্যয়-নির্বাহের জন্য ভারত-সরকারের সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষের হস্তে দিয়াছেন। সেবাশ্রম এইজন্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। গত শীতকালে শরণার্থী বিধবা, রোগী ও শিশুদের মধ্যে ৩০০ রাজাই, ২০০ পশমী কম্বল এবং ৩৭৫ গরম গেঞ্জি বিতরিত হইয়াছে। এই জিনিসগুলিও ভারত-সরকার সরবরাহ করিয়াছিলেন।

কনখল কুমহার বস্তীর চল্লিশ খানা কুটির আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হওয়ায় দরিদ্র অধিবাসিগণ গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন কুটির নির্মাণ করিবার জন্য ২৫ জন দরিদ্র লোককে ৪৭৫৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে দুই হাজারের অধিক হরিজন ও উদ্বাস্তুকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল।

সেবাশ্রমের ও রোগীদের গ্রন্থাগার দুইটিতে মোট ৩,৯৬৫ খানি পুস্তক ও বাঁধান সাময়িক পত্র আছে। উভয় গ্রন্থাগার হইতে পাঠকগণ পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। আলোচ্যমান বর্ষে ২,৪৮৩ খানি পুস্তক পাঠের জন্য ধার দেওয়া হইয়াছিল। জনসাধারণের নিকট হইতে ১৩৭ খানি পুস্তক, ২২ খানি সাময়িক পত্র ও ৩ খানি সংবাদপত্র বিনামূল্যে পাওয়া গিয়াছে এবং ৩৮৵০ আনা মূল্যের গ্রন্থ ক্রয় করা হইয়াছে।

সেবাশ্রম বহুদিন যাবৎ ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সরঞ্জামাদির অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছেন। গত সাত বৎসর যাবৎ উত্তর-প্রদেশ সরকারের হস্তে ইহার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর অস্বাভাবিক অবস্থার দরুন পরিকল্পনাটি কার্যে রূপায়িত হইতে পারে নাই। বর্তমানে গভর্নমেণ্ট সমগ্র পরিকল্পনার একাংশের জন্য ৭৮,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করায় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ১৯৫০ সনের জুনের মধ্যভাগে কাজ সম্পূর্ণ হইবে। গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে আরও অর্থ পাওয়া গেলে বাকী বিভাগগুলির কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। সেবাশ্রমকর্তৃপক্ষ উত্তর-প্রদেশ সরকারের নিকট এই আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ।

আলোচ্যমান বর্ষে সাধারণ তহবিলে আয় ছিল ৭৮,২৪২৮২ পাই এবং ব্যয় ৫৭,৫২৪৶২ পাই; গৃহনির্মাণ-তহবিলে এবং বিশেষ তহবিলে আয় যথাক্রমে ৭,০৬৪।৵০ ও ৮,১৮৩৸৶৯ পাই এবং ব্যয় যথাক্রমে ২,০০৫৻৬ পাই ও ১৩,০৬৮৵৮ পাই।

সেবাশ্রমের আশু প্রয়োজন—(১) উন্নত স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত সহ ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর জন্য ৬২,০০০৲ টাকা, (২) একটি গোশালার জন্য ১০,০০০৲ টাকা, (৩) ভাণ্ডার ও ভোজনালয় সহ একটি রন্ধনশালার জন্য ১৫,০০০৲ টাকা, (৪) চিকিৎসকদের বাসস্থানের জন্য ১৫,০০০৲ টাকা, (৫) আবশ্যকীয় সরঞ্জামসহ বিশটি অতিরিক্ত রোগিশয্যার জন্য ৬,০০০৲ টাকা,

(৬) রোগীদের খাদ্য-ভাণ্ডার, শয্যা ও বস্ত্র-প্রকোষ্ঠের জন্য ৫,০০০৲ টাকা এবং (৭, হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ৩৩টি শয্যার জন্য (প্রত্যেক শয্যার জন্য ৮,০০০৲ টাকা) ২,৬৪,০০০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত সেবাশ্রমের দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের জন্য অন্ততঃ ৫০,০০০৲ টাকা প্রয়োজন। সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ সহৃদয় দেশবাসীর নিকট অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছেন। সাহায্য (১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া (পশ্চিমবঙ্গ) অথবা (২) সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, পোঃ কনখল, জেলা সাহরাণপুর, উত্তর প্রদেশ—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

নব প্রকাশিত গ্রন্থ

Vedanta Through Stories—By Swami Sambuddhananda. Published from Sri Ramakrishna Ashram, Khar, Bombay—21 by the author. Pages 178. Price Rs. 2/4.

Foreword by The Hon'ble Sri Syama Prasad Mookherjee.

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত শ্রাবণ ও ভাদ্র দুই মাসে এই প্রতিষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে সাপ্তাহিক অধিবেশনে ভগবান বুদ্ধের বাণী 'ধম্মপদ' নামক পালিগ্রন্থ, শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ' ও 'শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পত্রাবলী' এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব 'গীতা' ধারাবাহিক-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী 'চণ্ডীতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি, শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে 'শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী' সম্বন্ধে একটি এবং শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র জানা কলিকাতায় ও মফস্বলে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে দুইটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

চৌধুরীহাট (কুচবিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১৮ই ভাদ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী দিবসে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ঐ দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজাদি হয় এবং কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভজন-গান করেন। অপরাহ্নে স্বামী সুন্দরানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আশ্রমের কার্য-বিবরণী পাঠ করিলে কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ সেন ও স্বামী অজয়ানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি

'সর্বধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরদিন পদকীর্তন ও যাত্রাগান হয় এবং দুই হাজার ভক্ত নরনারী পরিতোষ-সহকারে প্রসাদগ্রহণে তৃপ্ত হন। এই উৎসবে বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

আণবিক শক্তির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা—মানব-দেহের উপর আণবিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং দ্বিতীয় প্রজন্মে (অর্থাৎ পরবর্তী বংশধরগণের উপর) উহার বংশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য হিরোসিমাকে এক বিরাট বীক্ষণাগারে পরিণত করা হইয়াছে।

আণবিক শক্তি কমিশন উপরোক্ত ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, আণবিক বোমায় হতাহত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিশন ইতোমধ্যেই বোমাবিধ্বস্ত এলাকার দেড়লক্ষাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে হিরোসিমায় আণবিক বোমা পড়িয়াছিল। বংশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইলে শুধু আণবিক বোমা-প্রভাবিত ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততিদিগকে পরীক্ষা করিলে চলিবে না, তাহাদের পৌত্রদিগকেও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সাল হইতে এপর্যন্ত প্রায় ৩৫ হাজার নবাগত শিশুকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। শিশুদের মধ্যে জন্ম ও বংশগত কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা গিয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য অন্ততঃ দুই লক্ষ শিশুকে পরীক্ষা করা হইবে।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত অঞ্চলের ব্যক্তিদের উপর বিলম্বে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে চক্ষুতে ছানি পড়া। হিরোসিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ৩ হাজার ফুটের মধ্যে যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রতি হাজারে চল্লিশ জনের চোখে ছানি পড়িতে দেখা গিয়াছে।

কমিশনের তথ্যে প্রকাশ, হিরোসিমার অধিবাসীরা আপাততঃ আণবিক শক্তির আশু প্রতিক্রিয়া (যথা কেশ-পতন, সাময়িক বন্ধ্যাত্ব ও রক্তকণিকার পরিবর্তন) কাটাইয়া উঠিয়াছে। তবে বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া (যথা চোখে ছানিপড়া ও প্রজনন-শক্তির পরিবর্তন) সম্পর্কে গবেষণা করিতে অনেক বৎসর লাগিবে। প্রতিবৎসর কমিশন হিরোসিমায় ৭ শত নবাগত শিশু ও নাগসাকিতে ৮ শত শিশু পরীক্ষা করিতেছেন। নাগাসাকিতেও অনুরূপ গবেষণা চলিতেছে।

গভীর সমুদ্রে মৎস্য-শিকার—জানা গিয়াছে যে, গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুইটি ট্রলার ক্রয় করিয়াছেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হইতে গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকার সুরু হইবে। আশা করা যাইতেছে যে এতদ্দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের ঘাটতি কিছু পরিমাণ মিটান সম্ভব হইবে।

ভারতের মৎস্যবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এবং পশ্চিমবঙ্গের সেক্রেটারী ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া দুইটি ট্রলার ক্রয় এবং উহা পরিচালনের জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি সংগ্রহ করেন। ৩।৪ মাস শিক্ষার পর ভারতীয়গণ গভীর সমুদ্রে মৎস্য-শিকারে অভ্যস্ত হইবে। ততদিন পর্যন্ত ড্যানিস ধীবরগণ ট্রলার চালনা করিবেন।

একটি ট্রলার প্রতিবার. তিন টন মৎস্য আনিতে পারিবে। সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে উড়িষ্যা সরকারও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনায় যোগদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতীয় লিপিমুদ্রণের জন্য আধুনিক টাইপ—ভারতের বিভিন্ন লিপিমুদ্রণের উপযোগী আধুনিক সহজ ধরনের টাইপ-প্রস্তুতি-কার্যের জন্য যুক্তরাজ্যের মনোটাইপ কর্পোরেশন লিমিটেড মেজর জন উইলসনকে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতায় 'ষ্টেট্স্ম্যান' পত্রিকার ম্যাগাজিন বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। কমার্শিয়াল শিল্পী এবং ব্যঙ্গ অভিনেতা হিসাবেও তাঁহার সুনাম আছে। মেজর উইলসন কর্পোরেশনের তরফ হইতে মুদ্রণ-শিল্প সম্পর্কে গবেষণা এবং কর্পোরেশনের কলিকাতা হেডকোয়ার্টার্সের (পূর্বাঞ্চলের) পরামর্শদাতা-রূপে কার্য করিবেন। যুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় বাহিনীর সহিত যুক্ত ছিলেন; পরে উত্তর-ভারতে প্রচার ও বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের কাজ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আসাম ভূমিকম্প সেবাকার্য

আবেদন

সমগ্র উত্তর-আসাম প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছে। ফলে বহু অধিবাসী হতাহত হইয়াছেন এবং অনেকে অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করিতেছেন। উত্তর লখিমপুর অঞ্চল সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই জন্য সেখানে সেবাকার্য আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কয়েক জন কর্মী পাঠাইয়াছেন। বদান্য ব্যক্তি-গণের সাহায্যের উপর এই জনহিতকর কার্যের সাফল্য নির্ভর করে। আমরা এই সৎকার্যে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতে সকলকে অনুরোধ করি। এতদুদ্দেশ্যে সর্ববিধ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে:

(স্বাঃ) **স্বামী বীরেশ্বরানন্দ**

৩১শে আগষ্ট, ১৯৫০

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া)
পশ্চিম-বঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি-সংবাদ

সম্পাদক

(সমাপ্ত)

ইণ্ডিয়ান্ মিরর্, ৮ই জুলাই, ১৯০২ সন—পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ— স্বামী বিবেকানন্দের পরলোক-গমন আমাদের নিকট আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় নাই। কারণ, আমরা জানিতাম যে, একটি অত্যুন্নত শক্তির সঙ্গে নানাবিধ জাগতিক অশুভ দ্বারা বিধ্বস্ত একটি দৈহিক কাঠামের অবিরাম সংগ্রাম দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। যাহা হ'ক, এই সংগ্রাম যে এতদিন চলিয়াছিল ইহাই আশ্চর্য। স্বামী যখন আমেরিকায় তাঁহার গৌরবময় ও চমকপ্রদ ধর্মাভিযান শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখনই মৃত্যু তাঁহাকে আপনার বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। যে অদম্য শক্তি তাঁহার ভিতরে প্রজ্জলিত ছিল, উহাই তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে আরামকে অবজ্ঞা করিয়া শ্রমকর দিন যাপনে তাঁহাকে যোগ্য করিতে থাকে। আমরা সাধারণ জীব সামান্য দৈহিক অবসাদেই দমিয়া যাই, সামান্য কষ্টই আমাদিগকে শয্যাশায়ী করে, সাধারণ নৈরাশ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মার্টিনিক্ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বৃহদাকারে পরিণত হয়, কিন্তু পরলোকগত স্বামীর সমগ্র জীবন এইরূপ অমানুষিক হতাশার বিরুদ্ধে জীবন্ত শিক্ষাস্বরূপ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালী ছিলেন; বাংলায় তাঁহাকে লোকে খুব কমই জানিত। তিনি সাহায্য-নিরপেক্ষ চেষ্টায় মাদ্রাজে সামান্য খ্যাতি লাভ করেন এবং আমেরিকায় তিনি গৌরবের উচ্চ-শিখরে অধিষ্ঠিত হন। আজ এই নক্ষত্র অস্তমিত হইয়াছে; এইজন্য আমরা বাঙালীরা আমাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। সংক্ষেপতঃ ইহাকেই বলে বস্তুর অসারতা, তথাপি ইহা মানুষের উদ্যমের একটি প্রমাণ, সম্ভবতঃ ইহা বহু বৎসর মানুষ বিস্মৃত হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ যাহা ছিলেন তদপেক্ষা যদি ন্যূন হইতেন, তাহা হইলে এই পৃথিবী—বিশেষতঃ ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্রতর হইত। কিন্তু স্বামীর কর্ম ছিল মহৎ। স্বদেশের অতীতে তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভারতের প্রাচীন আচার্যগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, জাতীয় ধর্মে তিনি নিরতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন, যথার্থ মহাপুরুষের ন্যায় তিনি নিজকে অবিচলিত ভাবে বিশ্বাস করিতেন। ইহাই স্বামীর আশ্চর্য সাফল্যের

গূঢ়রহস্য। কোন ব্যক্তি নির্দোষ জীবন যাপন করিলে, উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত থাকিলে এবং নির্বিচারে ও সবিনয়ে তাঁহার গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিলে, কালক্রমে তিনি নিজেই গুরু হন এবং অনুরূপ শ্রদ্ধা ভালবাসা ও ভক্তি লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাদাতা ছিলেন। কার্যে ও চরিত্রে দৃশ্যতঃ এই মুক্তজীবনের আদর্শ ভক্ত-উপাসককে ক্রমিক উন্নততর আদর্শে উন্নীত করিয়াছিল; পরিণামে এই মনুষ্যদেহটি পবিত্র শাশ্বত অখণ্ড ও সর্বোচ্চ বিশ্বব্যাপী শক্তির সহিত একীভূত হইয়াছিল।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী জনহিতকর কার্য সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। আজ এই বিষয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব। আমরা কেন স্বামীকে আদৌ আমল দিয়াছি—ইহা আমাদের বন্ধুবর্গ ও অপরিচিতগণের নিকট আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। আমরা থিয়োসফি মতবাদের অপেক্ষাকৃত গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচিত। কিন্তু গোঁড়া বা অন্যবিধ যাহাই হই না কেন, আমরা ভুলি নাই যে, ভগবান অসংখ্য ভাবে তাঁহার দাক্ষিণ্য ও উদ্দেশ্য সাধন করেন। মতবাদ ও গৌণবিষয়সমূহে মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। যাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না বা করিবে না এবং কেবল অমসৃণ উপরিভাগ খোঁচাইয়া বাহির করে, তাহারা একের সঙ্গে অপরের ঝগড়া বাধাইতে পটু। আশা করি, আমরা ইহা ভালই জানি! এই ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতভেদ-জনিত বাহ্য বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে ইচ্ছা করিয়াই আমরা উদাসীন থাকি। আমরা কি এইরূপে খৃষ্টধর্মের অন্তর্নিহিত অর্থ ও অভিপ্রায়ের সর্বদা প্রশংসা করি নাই? থিয়োসফিক্যাল্ সোসাইটি ও আর্য সমাজের অনুসরণকারীদের কতিপয়ের মধ্যে অশোভন বিবাদ আমরা কখনও বেশি গ্রাহ্য করি নাই। আমরা জানিতাম এবং স্মরণ করিতাম যে, উভয় প্রতিষ্ঠানই আপন আপন ভাবে একই লক্ষ্যে ভারতের কল্যাণের জন্য কার্য করিতেছে। পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধেও ব্যক্তিগত ও সাধারণ ভাবে বরাবর আমরা এই মতই অবলম্বন করিয়াছি। সম্ভবতঃ থিয়োসফিক্যাল্ সোসাইটির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা বেশী ছিল না এবং এক বিশেষ সময়ে তাঁহার অশ্রদ্ধার কথা তিনি গোপন করেন নাই। কিন্তু এই জন্য তাঁহার নৈতিক শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে আমাদের মত পরিবর্তিত হয় নাই, ঐ শিক্ষা সকল দিক দিয়াই অবিমিশ্র বা খাঁটি থিয়োসফি। সত্যই ঈশ্বরের ইচ্ছা নানা ভাবে কার্যে পরিণত হয় এবং সময়ে সময়ে আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত ভাবেও হইয়া থাকে। তিনি বাহ্যতঃ বিভিন্ন আকার ও শক্তির যন্ত্রসমূহ নির্বাচন করেন। কিন্তু জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে। আমাদের বিশ্বাস যে, স্বামী বিবেকানন্দকে অঙ্কে ধারণ করিয়া তাঁহার স্বাগত সম্ভাষণ হইবে—"হে ভৃত্য, তুমি ভালই করিয়াছ।" ১

১ ***The Indian Mirror, July 8, 1902.—The Late Swami Vivekananda.***—To us, the death of Swami Vivekananda has not been in the nature of a surprise, for we knew that the prolonged conflict between a towering spirit and a physical frame, shattered by various earthly ills, could not last long. It is, however, a wonder that the conflict did last as long as it did. The moment the Swami returned from his glorious and wonderful religious campaign in America, death had marked him for its own. But it was the undaunted spirit that burned within,

ইণ্ডিয়ান্ মিরর্, ৯ই জুলাই, ১৯০২ সন—পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ—পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দ যদি শিকাগো ধর্মসভায় যোগদান ভিন্ন অন্য আর কিছু না করিতেন এবং যে বক্তৃতাটি ভারতবর্ষ ও আমেরিকাকে প্রায় তৎক্ষণাৎ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিল, কেবল সেই বক্তৃতাটি দিতেন, তাহা হইলেও তিনি আমাদের পরিপূর্ণ

that continued to qualify him—as it did since the Swami was a mere lad—to "scorn delights and to live laborious days". We, comparative non-entities, are easily put out by slight mortifications ; little troubles place us abed ; common disappointments swell as large as the Martinique Volcano ; but the late Swami's whole life was a living lesson against such unmanly despondency. Swami Vivekananda was a Bengalee ; little was known of him in Bengal ; he rose to some slight fame, by almost unaided effort in Madras ; he gained the pinnacle of distinction in America. To-day when the star has set, we Bengalees mourn our utter loss. This, in brief, is the vanity of things. But still it is a record of human effort which is not likely to be forgotten many a long year. Had Swami Vivekananda been less than what he was, the world, specially India, would have been much poorer. But the Swami's Karma was great. He believed in the past of his country ; he revered India's ancient teachers , he possessed supreme faith in his national religion ; and truly great man that he was, he believed implicitly in himself. That was the secret of the Swami's astonishing success. When a man lives a clean life, and is inspired by high ideals, and accepts his Guru's teachings in all humility and without question, then does he himself become a preceptor in his turn, receiving like respect and love and reverence. Swami Vivekananda's inspirer was Sri Ramkrishna Paramhansa. And the one ideal of a visibly realised life, in act and conduct, lifted the devout worshipper to still loftier ideals, till the mere clay-man was absorbed in the Pure, Eternal, Undividable, Supreme Universal Spirit.

Of Swami Vivekananda's many-sided beneficent activity in India and abroad, we shall have to speak again and again. To-day we shall content ourselves with our own immediate connection with the subject. It has been a matter of surprise to our friends as well as to strangers, that we should have taken the Swami by the hand at all. We have been known as being rather "bigoted" followers of the Theosophical cult. But bigoted or otherwise, we have never lost sight of the truth that God works his goodness and purpose in infinite ways. Men may differ in their creeds and differ in nonessentials. People, who cannot or will not go deep down, and will merely rake up the rough surface, are apt to fasten quarrels upon one another. We hope, we know better. Thus we shut our eyes deliberately to the superficial estrangements, born of misunderstandings, between the followers, respectively, of Hinduism and Buddhism. Have we not lauded invariably the inner meaning and drift of Christianity in the like spirit ? We never cared much about certain unseemly squabbles between certain followers, respectively, of the Theosophical Society and the Arya Samaj. We only knew and remembered that both institutions were working, each in its own way, with a singleness of purpose for the good of India. And that was the view we all along adopted in regard to our personal and impersonal relations with the late lamented Swami Vivekananda. He had perhaps little regard for the Theosophical Society. He did not conceal his dislike at one particular time. But that didnot alter to us the worth of his own ethical teachings, which to all intents and purposes were undiluted Theosophy. Truly, God works His will in many, and sometimes seemingly contrary, ways ! He chooses instruments of apparently different moulds and diverse capacities. But consciously or unconsciouly they all perform His will. And taking Swami Vivekananda into His bosom, we are confident that His welcome will be—"Servant of God, well done !"

কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেন। পদ্ধতি ও সারবত্তায় উভয়তঃ ঐ বক্তৃতাটি সকলের মনোযোগ আকর্ষণে বাধ্য করিয়াছিল। আমেরিকার শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে জনৈক বিশ্বস্ত হিন্দুধর্মপ্রচারকের বক্তৃতা শ্রবণ এই প্রথম। তিনি (বক্তা) বহুল পরিমাণে জ্ঞানে বাগ্মিতায় ও ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তিতে সমৃদ্ধ ছিলেন। মনোবিজ্ঞানের উন্নততর স্তরের প্রথম নিদর্শন এবং প্রথম চিন্তার বিনিময় সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্বামী বিবেকানন্দ "গিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন এবং জয় করিয়াছিলেন।" সত্য বটে, পূর্বে এই ক্ষেত্রে খ্যাতনামা অগ্রণীগণ ছিলেন, এবং তাঁহারাও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং করতালিদ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিলেন। থিয়োসফিক্যাল্ সোসাইটির কর্মীরাও ছিলেন। মিঃ জাজ্ এশিয়ার ভ্রাতৃগণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, কিন্তু হায়! তিনি আর জীবিত নাই। মিঃ মোহিনীমোহন চাটার্জিও কিছুকাল এই ক্ষেত্রে কার্য করিয়াছেন। সুস্পষ্ট কারণবশতঃ আমরা প্রসঙ্গক্রমে হেলিওনা পেট্রোভনা ব্ল্যাভ্যাটস্কি এবং হেনরী ষ্টিল অলকটের প্রাথমিক কাজের উল্লেখ করিলাম না। এই ইঙ্গিত করিলেই যথেষ্ট হইবে এবং আমরা জোরের সহিত নিশ্চিত বলিতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দ যে বীজ বপন করিয়াছিলেন ঐ বীজ-গ্রহণের ক্ষেত্র ভাল করিয়াই তৈরী করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না জানিয়াই স্বামী উহা করিয়াছিলেন; সসীমশক্তিবিশিষ্ট জীব আমরা পূর্বে কি হইয়াছে এবং পরে কি হইবে তাহা আমাদের আবদ্ধ দৃষ্টির নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেও দেখি না। এইজন্যই একই ক্ষেত্রে এবং একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্মিগণের মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান বিরোধিতা দেখা যায়। এই কারণেই রোগোৎপাদী জীবাণু এবং রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু-বিশেষের এই মিশ্রিত মতবাদ! সমগ্র সত্য বিদিত থাকিলে দেখা যাইত যে, প্রকৃতির বিশ্ব-অর্থনীতি-বিজ্ঞানে মানুষ ও ইঁদুর একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে।

কিন্তু আশংকা হয় যে, আমরা বিষয়ান্তরে যাইতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্যতা এবং কার্য সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিতে যাইয়া আমরা বলি যে, উহাদিগকে কোন ভাবে অথবা বিচারার্থ নিয়োজিত বুদ্ধিমান মানুষের নিকট তুচ্ছ প্রতিপাদন করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্বেষভাবাপন্ন ও স্বভাবতঃ বিরোধী হিন্দু এবং খৃষ্টান সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে। কোন মৃত যোগ্য ব্যক্তির গুণাবলী সম্বন্ধে এইরূপ মতৈক্য আমরা কদাচ দেখিয়াছি। স্বামী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে যেরূপে সম্মিলিত করিয়াছেন এরূপ সুদীর্ঘ কাল যাবৎ আর কেহ করেন নাই। প্রায় তিন বৎসর মাত্র আমেরিকায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিলেও তিনি সেখানে অবিস্মরণীয় থাকিবেন—বিস্মৃত হইবেন না। আমেরিকার অধিবাসিগণ দ্বিগুণ ত্রিগুণ সংখ্যক স্বামী চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও হিন্দু প্রচারক এবং উপদেশক হিন্দুস্থান হইতে পাঠাইবার জন্য তাঁহার নিকট তাঁহারা অর্থ পাঠাইয়াছিলেন; এই অর্থ কলিযুগে আগ্রহশীলতার নিশ্চিত নিদর্শন। এই অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল এবং দুই জন হিন্দু প্রচারক গিয়াছেন। এখন আমেরিকার বহু লোক বেদান্ত বুঝিতে পারেন। কি কৃতিত্ব! কি পূর্ণতা! এই জন্য আমরা পুনরায় বলি যে, "স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান ভিন্ন যদি আর কিছু না করিতেন," ইত্যাদি **।[২]

[২] ***The Indian Mirror, July 9, 1902.—The Late Swami Vivekananda.***—Had the late lamented Swami Vivekananda done nothing more than attend the Parliament

ইণ্ডিয়ান্ মিরর্, ১০ই জুলাই, ১৯০২ সন—পরলোকে স্বামী বিবেকানন্দ—পরলোকগত স্বামীর শেষ বৎসরগুলির নিরতিশয় প্রয়োজনীয় অপর একটি দিক এখনও আলোচনা করিবার আছে, ইহা সংবাদপত্রে দেহত্যাগ-সংবাদের স্তম্ভে প্রকাশিত হয় নাই, অথবা প্রকাশিত হইলেও উহা দুই এক ছত্রে লিখিত হইয়াছে। স্বামী যখন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দানে বিরত হইয়াছিলেন, মনে হয় তখন সম্ভবতঃ জনসভায় আর তাঁহার চাহিদা ছিল না; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক কারণ এই ছিল যে, তখন তিনি কার্যকর ভাবে অনাড়ম্বর জনহিতসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সকল কার্যে তাঁহার স্বদেশবাসী অথবা স্বধর্মিগণ অংশ গ্রহণ না করিলেও তাঁহার আমেরিকার বিশ্বাসী অনুরাগিগণ অত্যন্ত প্রয়ো-

of Religions in Chicago, and delivered that one speech which brought India and America together in juxtaposition almost immediately, he would still have been entitled to our fullest gratitude. That speech compelled attention both in method and substance. It was the first time that an American audience had listened to an accredited Hindu missionary—to a man who enjoyed in a very large measure the advantages of knowledge and of speech, and of personal magnetism. It may be said of that first impression, and that first interchange of thought in the higher plane of metaphysics, that Swami Vivekananda "went, saw, and conquered." It is true that there had been distinguished pioneers in the same field previously, and that they too had commanded attention and applause. There had been the workers of the Theosophical Society. Mr. Judge—alas! now no more—had rendered yeoman's service in the cause of his Asiatic brothers. Mr. Mohini Mohan Chatterjee had also, for a brief space of time, served in the same field. For obvious reasons, we had rather not allude to the still earlier work of Heliona Petrovna Blavatsky and Henry Steel Olcott. It will suffice to suggest —and we do say with confidence—that the ground had been very well prepared to receive the seeds which Swami Vivekananda sowed. Possibly, the Swami did that without immediate knowledge of the purposes of Providence. We creatures of limited capacities do not, and cannot, know of what has gone before or what will come after—not even within the prescribed limits of our confined vision. Hence the seeming antagonism between workers in the same field and the same cause. Hence these mixed theories of microbes and bacteria. If the whole truth were known, it would be found that men and mice serve the same purpose in Nature's universal economy.

But, we fear, we are digressing. To return to the worth and work of Swami Vivekananda, it is even impossible to belittle them in any sense, or before any intelligent jury of human beings. As a matter of fact, even prejudiced and naturally antagonistic Hindu or Christian journals have paid every respect to the Swami's memory. We have seldom seen such a consensus of opinion about a dead worthy's merits. The Swami brought the East and West together as no other man did for a long, long time. A sojourn of scarcely three years in America—a roving preacher all that while —but he is unforgotten, and will not be forgotten. In America they want duplicates and triplicates of the Swami. They sent him money—which is an infallible test of earnestness in the *Kali Yuga*—to send from Hind more Hindu teachers and preceptors like himself. The request was attended to, and two Hindu preachers went, and to-day Vedantism is understood by a large number of the American people. What an achievement! What a consummation! Therefore, we repeat that had Swami Vivekananda done nothing more than attend the Parliament of Religions in Chicago and delivered that one speech which brought India and America together in juxtaposition almost immediately, he would still have been entitled to our fullest respect.

জনীয় ও কার্যকর অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোগ বেদনা ও নিরুৎসাহ সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ আত্মপ্রত্যয় এবং তাঁহার প্রতি বন্ধুদের বিশ্বাসের সাহায্যে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে মঠ এবং আশ্রম স্থাপন করেন। উপর্যুপরি দুইটি দুর্ভিক্ষ যে সকল হিন্দু বালককে অনাথ ও গৃহহীন করিয়া বদান্য ব্যক্তিগণের করুণার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহাদের জন্য তিনি আশ্রম স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনও বিদ্যমান এবং উন্নতিশীল, ইহাদের উপযোগিতা ও স্বাবলম্বনশক্তি সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই তদ্বিষয়ে উচ্ছ্বসিত সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। এতদ্ভিন্ন স্বামী মাদ্রাজে একটি এবং আলমোড়ায় মায়াবতীতে একটি—এই দুইটি ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় পত্রিকা স্থাপন করিয়াছেন, অথবা স্থাপন করিতে সাহায্য করিয়াছেন। এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং বেদান্ত-চিন্তাক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে।

পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ অনেককে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন এবং কয়েক জনকে শিষ্য করিয়াছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে সেই প্রিয়দর্শনা ইংরেজ ভদ্রমহিলা মিস্ মারগারেট নোবল অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত বিশ্বস্ত বাগ্মী ও ত্যাগী আর কেহ নাই। ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা। এই ভগিনীর সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন সময়ে তাঁহাদের বক্তৃতা চিন্তা ও কর্ম-প্রণালীর অভ্রান্ততা বা পূর্ণতা দাবী করেন নাই, ফলের জন্যও তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। স্থানীয় আবেষ্টনীতে রোগ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাঁহারা একটি দরিদ্র পল্লীর দরিদ্র গৃহে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের চারিদিকে যে সামাজিক দৈন্য-দুঃখ ছিল উহা উপশম করিবার জন্য তাঁহারা জীবন বাক্য এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐকান্তিক ভাবে সকলকে সতত উদ্বুদ্ধ করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কলিকাতায় প্লেগের প্রবল প্রকোপ দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। আমরা সকলেই পরলোকগত ইংলণ্ডের জাতীয় কবির গীতিকাব্যের সহিত পরিচিত। ইহার আরম্ভিক চরণ—"অশ্রু, বৃথা অশ্রুপ্রবাহ! তাহাদের অর্থ আমি জানি না।" প্লেগের উৎসাদন ও বিনাশকর কার্য দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামিগণ রক্তের ন্যায় বিষাদময় অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐগুলি নিরর্থক ছিল না। ঐ অশ্রুপাত হইতে উদ্ধার ও দাক্ষিণ্যের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছিল। আমরা প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণ কর্তৃক পরিগৃহীত ও অনুষ্ঠিত 'উদ্ধার ও ও সেবাকার্যে'র বিষয় স্মরণ করি; মনে পড়ে কিরূপে তাঁহারা নৈতিক ও জাগতিক মলিনতাপূর্ণ বস্তীসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, প্লেগাক্রান্ত জনগণকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, কি উপায়ে নৈতিক ও জাগতিক ক্ষতস্থানগুলির পরিষ্করণে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে তাঁহারা সর্বত্র ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এই নিঃস্বার্থ পরোপকারের নিদর্শন এই নগরের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।[৩]

[৩] *The Indian Mirror, July 10, 1902.—The Late Swami Vivekananda.*—There is yet another aspect of the surpassing usefulness of the late Swami's closing years, which has not been noticed in the obituary testimonials in the Press; or, if noticed at all, in a brief line or two. When the Swami ceased to be a public speaker, it was, perhaps, he was not any longer wanted on the public platform, but

a great deal more, because he was absorbed in the work of silent but practical philanthropy. In that work, if his own countrymen or co-religionists would not take share, his American believers and admirers did take a very considerable and very practical share. Disease and pain and discouragement notwithstanding, Swami Vivekananda, with the help of the faith which he had in himself, and with the help of the faith which his friends had in him, establis ed Muths and Ashrams in different localities in Bengal and the Punjab. He created asylums for Hindu orphans—the waifs and strays left to the world's charity by two successive famines. These institutions still exist and flourish, and as to their excellence and self-sustaining power, every one who knows anything about them has borne eloquent and repeated testimony. The Swami also founded, or helped to found, two religio-philosophical Magazines—one in Madras and the other at Mayavati in Almorah. These literary ventures have proved successful, and stimulated much research in the field of Vedantic religious thought among the Hindus. Swami Vivekananda made many friends in the West, and acquired some few disciples, and among the latter there is none more learned and loyal, and eloquent & self-sacrificing than that charming English lady, Miss Margaret Noble, who has become a Sanyasin and prefers to be known by the name of Sister Nivedita. With this Sister's help, Swami Vivekananda achieved remarkable success in the work of social reform among the Bengali-Hindu community in Calcutta. They at no time claimed infallibility or perfection for their speech, or thought, or methods of work. They did not strive for effect. They lived in a poor locality, in a poor house, facing disease and death itself in their local surroundings, but ever stimulating by life, voice, and example earnest effort in others to alleviate the social misery which all around them was only too much in evidence. To refer to only one thing among many, Swami Vivekananda saw and wept for the abundant plague misery of Calcutta. We are all familiar with the late Laureate's lyric which begins with the verse—

"Tears, idle tears ; I know not what they mean." The followers of Swami Vivekananda "wept tears better as blood" at the sight of the plague devastation and destruction. But those were no "idle tears." From those tears flowed the streams of Rescue and Chariry. We remember, with admiration and gratitude, the work of rescue and succour, undertaken and accomplished by the members of the Ramkrishna Mission—we remember how they penetrated into the filthiest bustis, full of moral and material filth, how they consoled the plague-stricken population ; how they helped to cleanse the moral and material plague-spots, and how they won love and gratitude everywhere. This altruistic work has a permanent record in the city's annals.

"জ্ঞানলাভ হলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না ; জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন না। তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত ব্রহ্মকে জেনে উহাদের পারে পৌঁছেন এবং এই ভাবে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

আমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান

স্বামী বোধানন্দ

(৩)

বরাহনগর মঠে যাতায়াত করিবার সময়ও আমরা মাঝে মাঝে কাঁকুড়গাছির বাগানে যাইতাম। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের তিরোভাব-উৎসবের পূর্ব্বে যে দিন আমরা সকলে মিলিয়া প্রথম কাঁকুড়গাছির বাগানে গিয়াছিলাম সে দিনটিতে প্রতি বৎসর আমরা একটি ছোটখাট ভাণ্ডারা দিতাম। পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা কাঁকুড়গাছির বাগানে বড় আসিতেন না। রাম বাবু বলিতেন, একটি ভাব অবলম্বন করিয়া তাহাতেই দৃঢ় হওয়া ভাল। নানা ভাবে মন দিলে ফলে কোনটাতেই চিত্তস্থৈর্য্য না হইয়া ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির বাধা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কূপখননকারীর গল্পটি বলিতেন। রাম বাবু শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকেই সাক্ষাৎ পরমদেবতা জ্ঞানে জীবনসর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে অনেক বার এই গানটি শুনিয়াছি—

"নাথ সর্ব্বস্ব আমার, প্রাণাধার পরাৎপর।
নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে আপনার
বলিবার।" ইত্যাদি।

কিন্তু সন্ন্যাসী ভক্তেরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন ভাবটি আদর্শ করিয়া তাহারই অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষানুযায়ী ও তাহারই জীবনের অনুষ্ঠিত গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন, সাধুদর্শন, সর্ব্ব দেবদেবীর পূজা, শাস্ত্রাদি-পাঠ, ধ্যান-ভজন ইত্যাদির অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। রাম বাবু বলিতেন, সন্ন্যাসীরা পরমহংসদেবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহাকে জীবনের সর্ব্বস্ব জানিয়া তাঁহার অনুসরণ করেন না। সন্ন্যাসীরাও বলিতেন, রাম বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ধর্ম্মভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নামে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিতেছেন। যাহা হউক্, এ বিষয়ে বেশী সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। রাম বাবু প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাও তাঁহার প্রদর্শিত পথে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন। এইরূপ শিক্ষাই শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের অমানুষিক উদারতার ও ব্যক্তিগত অন্তর্দর্শিতার বিশেষ পরিচায়ক। প্রত্যেক শিষ্যকে তিনি এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেন যাহাতে নিজ স্বভাবানুযায়ী তাঁহার অন্তর্নিহিতা শক্তির বিকাশ হয়। ব্যক্তিগত ভাবে ঐ অন্তর্নিহিতা ঐশী শক্তি কুণ্ডলিনী নামে অভিহিতা হন। ইহারাই সমষ্টির বিকাশকে প্রতীকরূপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব "কালী" বলিতেন। তাঁহার দৃষ্টিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যে কালীমূর্ত্তি আছে তাহা মৃন্ময়ী বা পাষাণময়ী নয়, তিনি কেবল চিন্ময়ী। তিনি তাঁহাকে সচ্চিদানন্দঘন বলিতেন এবং সেই জ্ঞানেই তাঁহার পূজা করিতেন। দ্বৈতভাবে তিনি তাঁহার মা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার পুত্র ছিলেন।

ঐ অন্তর্নিহিতা ঐশী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করাই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। সেইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহজধর্ম বা স্বধর্ম অনুষ্ঠান

করিতে বলিতেন। তিনি অধিকারি-বিশেষে কাহাকে জ্ঞানমার্গ, কাহাকে ভক্তিমার্গ, কাহাকে যোগমার্গ ও কাহাকে কর্ম্মমার্গ অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতেন। অতএব সহজেই বোঝা যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব কেন এত উদার ও অসাম্প্রদায়িক। সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁহার এই ভাবটি সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন এবং ইহাতে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ হইবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা পরমহংসদেবের জীবনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং তাঁহার উদার ও গভীর ধর্ম্মমতটিকে জীবনাদর্শ করিয়া তাঁহাকে যুগাবতার-বোধে পূজা করিতেন। রাম বাবু প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাদের প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসীম কৃপা ও স্নেহ স্মরণ করিয়া এবং তিনি তাঁহাদের মুক্তির ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন বা "বকলমা" লইয়াছেন, ইহা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকেই জীবনসর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন। মোট কথায় সন্ন্যাসীরা তাঁহার ব্যক্তি ও বার্ত্তা উভয়কেই আদর করিতেন এবং গৃহী ভক্তেরা তাঁহার ব্যক্তিরই পূজা করিতেন।

শিষ্যদিগের মধ্যে এই মতভেদের মীমাংসা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি সহজ দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেন, যেমন একই কুম্ভকারের তৈয়ারী হাঁড়ি, কলসী, সরা, মালসা ঠেকাঠেকি হইলে শব্দ হয়, তেমনই একই গুরুর বিভিন্ন ভাবাপন্ন শিষ্যদের মধ্যেও মতপার্থক্য-বশতঃ বাদানুবাদ হইয়া থাকে।

ঐ সময় একদিন রাম বাবুর সঙ্গে কথা কইবার সময় আমি ধৃষ্টতা ও মূর্খতা বশতঃ বলিয়াছিলাম, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনেক মাঝিমাল্লাও দেখিয়াছে। তাহাদের কি হইয়াছে?" ঐ কথা শুনিয়া রাম বাবু অন্তরে ব্যথিত হইয়া আমাকে বলিলেন, "পাষণ্ড, তুই শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের দ্বারে ভিক্ষুক, আর কিনা বল্‌ছিস্ তাঁহাকে মাঝিমাল্লারা দেখিয়াছে, তাহাদের কি হইল? নিশ্চয় জানিস্, যে যে মাঝিমাল্লা সুকৃতি-বশতঃ তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, তাহারা তোর চেয়ে অনেক ভাগ্যবান্।" আমি ঐ কথা শুনিয়া রাম বাবুর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। অনেক পরে বুঝিয়া-ছিলাম বাস্তবিক যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একবার মাত্রও দর্শন করিয়াছিল সে মহা ভাগ্যবান্। আমি তাহার পাদস্পর্শ করিবার যোগ্য নই।

এক সময় কাঁকুড়গাছির বাগানের পূজারি ব্রাহ্মণের অভাব বা অসুখ বশতঃ রামবাবু ৩৪ দিনের জন্য আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিতে আদেশ দেন। তখন বর্ষাকাল; প্রত্যহই ভারি বৃষ্টি হইতেছিল। সন্ধ্যাকালীন আরাত্রিক ও ভোগাদি ক্রিয়ার পর আমি নারিকেলডাঙ্গায় কালীকৃষ্ণদের বাড়ীতে আসিয়া রাত্রি কাটাই-তাম। প্রত্যূষে উঠিয়া আবার কাঁকুড়গাছি যাইতাম। কালীকৃষ্ণদের বাড়ী হইতে কাঁকুড়-গাছির বাগান প্রায় দুই মাইল। বর্ষাবশতঃ রাস্তা হইতে বাগান পর্য্যন্ত গলিটি জলে ডুবিয়া থাকিত। একটি স্থানীয় ঝি আসিয়া বাসন মাজা, রান্নাঘর ধোওয়া, মসলা বাঁটা ইত্যাদি বাহিরের কাজগুলি করিয়া দিত। ফুলতোলা, ভোগরান্না, পূজা, ঠাকুরঘর ধোওয়া প্রভৃতি কার্য্য আমিই করিতাম। খগেন, সুধীর, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি সুবিধা হইলেই কয়েক ঘণ্টার জন্য আসিয়া আমার সঙ্গী হইত। একদিন তরকারীতে কাঁচা লঙ্কা দিয়া এত ঝাল করিয়াছিলাম যে সুধীর খাইবার সময় প্রত্যেক গ্রাসে ঢেকুর তুলিয়াছিল। "কথক ঠাকুর" (শিরোমণি মহাশয়) পূজার পদ্ধতি আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। মনোমত পূজারি না পাওয়ায় সেবায় ত্রুটি হইতেছে দেখিয়া রাম বাবু স্বয়ং বাগানে বাস

করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হইতে তিনি নিজেই প্রত্যহ পূজাদি করিতেন। একজন বেতনভোগী ব্রাহ্মণ ভোগরান্না করিত। তাহার নাম ছিল কৃত্তিবাস। পরে সে ভক্ত হইয়াছিল। সকালে পূজা, ভোগাদির পর প্রসাদ পাইয়া রাম বাবু কলিকাতায় কর্ম্মস্থলে আসিতেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার বাগানে ফিরিয়া আরাত্রিকাদি কার্য্য করিতেন। প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য একখানি গাড়ী করিয়াছিলেন। সেই সময় ২।৪টি শিষ্যও তাঁহার সঙ্গে বাগানে থাকিত। উহারা ঠাকুরসেবার কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিত। ঐ সময়ে বাগানটির বিশেষ সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। বাগানে যাইবার গলিটিরও ভাল করিয়া মেরামত করাও হইয়াছিল।

ঐ সময় রাম বাবুর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে আমরা তাঁহার সিমুলিয়ার বাড়ীতে যাইয়া পরিবেশনাদি করিয়াছিলাম। রাম বাবুর ৪।৫ জন কন্যা ছিলেন। সকলকেই সদ্বংশজাত, শিক্ষিত পাত্রে বিবাহ দিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার অনেক অর্থব্যয় হয়। এমনকি তিনি ঋণ গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

ক্রমে আমাদের দলটি বেশ বাড়িতে লাগিল। রাম বাবুর প্রধান শিষ্যদের একজন আমাদের সঙ্গেই প্রথমে মিশিয়াছিল। তখন তাহার নাম ছিল সুরেশ। পরে সে যোগেশ্বর নামে অভিহিত হয়। সে ছাড়া শুকুল, যদুপতি, ললিত, বিধুভূষণ, নারায়ণ, অতুল, সুপ্রকাশ (ধানু), ভোলাদাদা (সুরেন) প্রভৃতি আমাদের দলেই প্রথমে যোগদান করিয়াছিল। পরে আমাদের দলটি তিনভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। কেহ কেহ বিবাহাদি করিয়া গৃহস্থ হইল। তাহারা সুবিধামত কাঁকুড়গাছির বাগানে এবং মঠেও যাইত। খগেন, সুধীর, সুশীল, কালীকৃষ্ণ, শুকুল মঠে যোগ দিল এবং আমিও মঠে যোগদান করিলাম। অনেকে রাম বাবুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অধিকাংশ সময় কাঁকুড়গাছির বাগানেই থাকিত। তাহারা রাম বাবুর জীবিতাবস্থায় বড় একটা মঠে আসিত না।

১৮৯৭ বা ১৮৯৮ সালে রাম বাবুর দেহত্যাগ হয়। তার পর তাঁহার প্রধান শিষ্যেরা মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া পরম পূজনীয় স্বামীজি ও মহারাজজির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী কাঁকুড়গাছির ঠাকুরবাড়ীর কার্য্য চালাইত। আমাদের দলের যাহারা মঠে যোগদান করিয়াছিল তাহারাও তার পর কাঁকুড়গাছির বাগানে বেশী যাইত না।

রাম বাবুর জীবদ্দশায় একদিন পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কাঁকুড়গাছির বাগানে গিয়াছিলেন। তাঁহার যাইবার সংবাদ পাইয়া আমিও গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে যোগেন মহারাজ প্রমুখ তিন চারি জন স্বামীও গিয়াছিলেন। উহার পূর্ব্বে বা পরে মা আর কখন কাঁকুড়গাছির বাগানে গিয়াছিলেন কি না আমি জানি না। রাম বাবুর শরীর-ত্যাগের অতি অল্প পূর্ব্বেই স্বামীজি ভারতে প্রত্যাগত হন। এক দিন তিনি রাম বাবুকে দেখিতে যান। রাম বাবু অসুস্থতা বশতঃ শয্যাশায়ী থাকিতেন। অতিকষ্টে উঠিতে পারিতেন। স্বামীজি যখন তাঁহার ঘরে ছিলেন সেই সময় রাম বাবু বিছানা হইতে উঠিয়া নীচে নামিবার সময় স্বামীজি তাঁহার জুতা তাঁহার পায়ের নিকট আনিয়া দেন। রাম বাবু উহা করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও স্বামীজি রাম বাবুর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-বশতঃ উহা করায় রাম বাবু প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল বিলাত-আমেরিকা হইতে ফিরিয়া মান যশ পাইয়া স্বামীজি বুঝি অন্যরকম হইয়া গিয়াছেন।

কাঁকুড়গাছির বাগানে যাইবার পর হইতে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গৃহস্থ শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ হয়। আমরা ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও ৺বলরাম বসু ভিন্ন তাঁহার প্রায় সমস্ত গৃহী ভক্তদের দেখিয়াছি। গিরিশ বাবুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনেই আমরা তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের কৃপালাভের পূর্ব্বে গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ইত্যাদি শ্লোকটি মাত্র শুনিতাম, কিন্তু তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তির পর উহার অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি।" ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের আকর্ষণ-শক্তির কথা উঠিল। গিরিশ বাবু একদিন শুনিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব রাম বাবুর বাড়ীতে আসিবেন। গিরিশ বাবু অভিমানী লোক ছিলেন। রাম বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব আসিবেন বলিয়াই তিনি সেখানে যাইবেন কেন বিচার করিতে লাগিলেন। ঐ বিচার-কালে শ্যামবাজার হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে রাম বাবুর সিমুলিয়ার বাড়ীর নিকট পর্য্যন্ত রাস্তাটি ৩।৪ বার যাতায়াত করিয়া পরে রাম বাবুর বাড়ীতে যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "সেখানে না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না। কে যেন টানিয়া লইয়া গেল।"

অরূপের রূপ

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

বিশ্বের সকল বস্তু সকল সম্পদ
মোর মাঝে লুক্কায়িত।
সকল সৃষ্টি ও কৃষ্টি, সকল সাধনা,
সকল গৌরব গর্ব্ব, সব আরাধনা
স্ফুরিত সে মোর মাঝে
পরম প্রকাশে।

এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট বিস্ময়,
সকল স্মৃতি ও ধৃতি অনন্ত বিজয়,
অসীম রূপের খেলা, প্রাণের প্রবাহ,
জীবন জোয়ারে যত জাগে অহরহ,
সে আমারই—
সে তো মোর এই আমি মাঝে।

অন্তকাল ধরি যত
চলিছে সৃষ্টি ও স্থিতি, প্রলয় সংঘাত,
প্রমত্ত উল্লাসে হাসে, নাচে, কাঁদে, গায়,
আসে আর যায় যত, জাগে ও মিলায়,
জাগরণ, সুপ্তি, স্বপ্ন, প্রকাশ, বিলয়
সে আমারি মাঝে।

অনাদি সঙ্গীত ধারা, সুরের লহরী,
ধ্বনিছে গম্ভীর রোলে, মরি আহা মরি,
অনন্ত ওঁকার।

কে সে আমি?
এ বিরাট বিস্ময়ের অন্ত নাহি যার,
কে সে আমি?
এ অসীম কুহেলীর কৌতুক-লীলায়
প্রফুল্ল করিয়া রাখে আপন অন্তরে!
সকল ধ্যান ও জ্ঞান, অনন্ত শকতি,
অনন্ত, অনন্ত মাঝে অনন্ত সে স্থিতি,
অন্তহীন আনন্দের প্রবাহ দোলায়,
দুলিছে আপন হারা।
কেবা সেই আমি?

কোথা মুক্তি? কেবা মুক্তি চায়?
চিরমুক্ত, সত্য, নিত্য, সে সত্তা ভাস্বর
কোথা মুক্তি তার?
সে অরূপ,
বিকাশিয়া অনন্ত সে রূপে
জাগিছে আপন মাঝে
শাশ্বত স্বরূপ—
ওঁ তৎ সৎ।

ভারতীয় স্থাপত্য

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

মধ্যযুগে ভারতীয় স্থাপত্য দানা বাঁধিয়াছিল। ভারতীয় স্থাপত্যে বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু স্থাপত্য বলিয়া কোনো তারতম্য নাই। প্রদেশ-অনুসারে ইহার ভিন্নতা হইয়াছে।

উত্তর-ভারতে বা ভারতীয় আর্য্যরীতিতে নাগররীতি প্রাধান্য পাইয়াছে; যদিও বিভিন্ন প্রদেশে এবং কালে মন্দিরের শিখর বা চূড়ার গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দক্ষিণের দ্রাবিড় মন্দিরের চূড়া পিরামিডাকারে থাকে থাকে উঠিয়া গিয়াছে। এই দুই রীতির সম্মিলনে এক নূতন রীতির উদ্ভব হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্র এবং ফার্গুসনের বিভাগ-অনুযায়ী এই রীতিকে নিম্ন-লিখিত উপায়ে প্রকাশ করা যায়:

উত্তর (বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরে)	নাগর	ভারতীয় আর্য্য অথবা আর্য্যাবর্ত্ত
মধ্য (পশ্চিম-ভারত, দাক্ষিণাত্য এবং মহীশূর)	বেসর	চালুক্য
দক্ষিণ (মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি এবং উত্তর-সিংহল)	দ্রাবিড়	দ্রাবিড়

উড়িষ্যা (নবম-ত্রয়োদশ খৃঃ)

ভুবনেশ্বর পুরী এবং কোনারকে উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। এক ভুবনেশ্বরেই নাকি ৫০০।৬০০ মন্দির আছে। এই সকল নাগ-মন্দিরের নিদর্শন।

প্রধান মন্দিরগুলির কাল—পরশুরামেশ্বর ৯ম শতাব্দী, মুক্তেশ্বর ৯৫০ খৃঃ, রাজরাণীও জগন্নাথ ১১৫০খৃঃ, কোনারক ১৩শ শতাব্দী, লিঙ্গরাজ ১০০০ খৃঃ, লিঙ্গরাজ নাট্য মণ্ডপ ১৩শ শতাব্দী।

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ভারতের সকল মন্দিরের মধ্যে মহিমান্বিত; পাশে কতগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে, লিঙ্গরাজের শিখর সব ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শিখরের রেখাগুলির পুনরাবৃত্তি এবং চূড়ার বক্রতা ইহাকে গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছে। শিখরের বক্রতাকে শিল্প-শাস্ত্রের পরিভাষায়—"শুকনাসাকৃতি" বলে। চূড়ার উপরে আছে, প্রকাণ্ড আমলক, তার উপর কলস।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পরিকল্পনা লিঙ্গ-রাজের নিম্নে। গঙ্গবংশের কলিঙ্গরাজ অনন্ত-বর্ম্মন্ চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৮) এই মন্দির আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পরশুরামেশ্বর প্রাচীনতম, ইহাতে ডবল ছাদওয়ালা মণ্ডপ রহিয়াছে, উড়িষ্যার পরিভাষায় মণ্ডপকে জগমোহন বলে। জগমোহনে প্রচুর কারুকার্য্য আছে। ইহা শৈবমন্দির। মুক্তেশ্বর মন্দির সম্বন্ধে ফার্গুসন বলিয়াছেন, "The gem of Orissan art."

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি ভাস্কর্য্যের জন্য বিখ্যাত। এইগুলি নাগনাগিনী ও নরনারীর প্রেমলীলার মূর্ত্তিতে পূর্ণ। মুক্তেশ্বর ও রাজরাণীর নাগনাগিনীর মূর্ত্তি মনোহর। লতাপাতার সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক কারুকার্য্য এবং স্থাপত্যের নানা অলঙ্কারে উড়িষ্যার শিল্পীর ধৈর্য্য ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।

রোমান্টিক দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে জগন্নাথ-মন্দিরের মাতাপুত্রের মূর্ত্তি একটা পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। বেতাল দেউলের (১০০০ খৃঃ) মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রীতিকর মূর্ত্তি, দেবী বাম হাতে মহিষের মুণ্ড চাপিয়া ধরিয়াছেন, ডানহাতে বর্শা বিদ্ধ করিয়াছেন। হাতের ভঙ্গিতে একটা শক্তিমত্তা এবং অনায়াস ভাব আছে। রাজরাণী ও কোনারকের মন্দিরে উড়িষ্যার ভাস্কর্য্য চরম উৎকর্ষে পৌছিয়াছে।

কোনারকের মন্দির বিদেশী পর্য্যটকদের কাছে 'ব্ল্যাক্‌প্যাগোডা' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহা প্রথম নরসিংহ (আনুমানিক ১২৪০-৬৪ খৃঃ) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ ইহা তাঁহার মন্ত্রী শিবাই সাঁতরার নেতৃত্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। কোনারকের মন্দির ও ভাস্কর্য্যের ভারতীয় শিল্পে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কোনারকের প্রধান মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অথবা ইহা অসমাপ্ত ছিল। কোনারকে মণ্ডপ বা জগমোহন আছে। ইহার গায়ে নানা কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি দর্শনীয়। জগমোহনের ছাদ পিরামিডাকার তিন থাকে উঠিয়া গিয়াছে; প্রতি থাকে কতগুলি করিয়া কার্নিস আছে।

কোনারক অর্থাৎ কোনার্ক সূর্য্যমন্দির, সেজন্য রথের আকারে করা হইয়াছে। ভিত্তিতে ৮টি প্রকাণ্ড চাকা খোদিত আছে, প্রত্যেকটির ব্যাস ৯ ফুট ৮ ইঞ্চি। প্রত্যেকটি চাকা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে পূর্ণ। বাহিরে ৮টি ঘোড়া আছে। এই মন্দির দুইটি বিরাটাকার হাতী ও ঘোড়ার মূর্ত্তির জন্য বিখ্যাত; মন্দিরের দুই দিকে এই দুটি মূর্ত্তি রহিয়াছে। যুদ্ধের ঘোড়া, ভঙ্গিতে তীব্র বেগ ও শক্তি সূচিত হইতেছে। ঘোড়ার পাশে একটি বৃহদাকার মনুষ্যমূর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে বেগ ও শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। হ্যাভেল সাহেব এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

"Here the Indian sculptors have shown that they can with as much fire and passion as the greatest European art the pride of victory and the glory of triumphant warfare; for not even the Homeric grandeur of the Elgin marble surpass the magnificent movement and modelling of this Indian Achilles, and the superbly monumental horse in its massive strength and vigour is not unworthy of comparison with Verrochio's famous masterpiece at Venice."

মন্দিরের কার্নিসের উপরে কতগুলি প্রায় প্রমাণ আকারের সঙ্গীতনিরত মূর্ত্তি আছে; বাঁশী বাজাইতেছে, ঢোলক বাজাইতেছে, নৃত্য করিতেছে। কোনারকের সূর্য্য, বিষ্ণু এবং বালকৃষ্ণের মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য; বালকৃষ্ণ দোলায় দুলিতেছেন, দোলনার শিকল নিপুণতার সহিত খোদাই করা হইয়াছে। সূর্য্যের বড় মূর্ত্তি, পায়ে বুটজুতা পরান আছে। কোনারক প্রণয়াত্মক কামশাস্ত্র অনুযায়ী কামমূর্ত্তির জন্য খ্যাত; এ সব কোনো কোনো মূর্ত্তিতে শিল্পনৈপুণ্য আছে। আকবরের দরবারে ১৬শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক আবুল ফজল কোনারকের মন্দিরকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, উড়িষ্যার মন্দিরের পাথর চুন-সিমেণ্টের সাহায্যে জোড়া লাগান নহে। পালিশকরা পাথর পর পর সাজান। চূড়ার দিকে, পাথরগুলি ভিতরের দিকে ক্রমশঃ একটু আগাইয়া উপরে মিলিয়াছে; এর উপরে আমলক নামে ভারী পাথর আছে। স্থাপত্যে ইহাকে corbelling process বলে।

এয়োদশ শতাব্দীর অবসানে উড়িষ্যার শিল্প শেষ হয়।

খাজুরাহো (দশম-একাদশ শতাব্দী)

উড়িষ্যার মন্দিরের পরই খাজুরাহোর জৈন ও হিন্দু মন্দিরশ্রেণী উল্লেখযোগ্য। এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বুন্দেলখণ্ডের (জেজাক-ভুক্তি) চন্দেল্লবংশের নৃপতিগণ।

খাজুরাহোর শ্রেষ্ঠ মন্দির মহাদেবের মন্দির ১১৬ ফুট উচ্চ; ইহা উচ্চ প্রাঙ্গণের উপর স্থাপিত। মন্দির ঘেরিয়া প্রাঙ্গণের উপর প্রদক্ষিণপথ আছে। সু-উচ্চ ভিত্তি এবং উচ্চ প্রাঙ্গণ মন্দিরকে গাম্ভীর্য্য ও উচ্চতা দান করিয়াছে। উড়িষ্যার মন্দিরের ন্যায় ইহা ভাস্কর্য্য ও অলঙ্করণে পূর্ণ। কোনারকের ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরেও কামশাস্ত্রের মূর্ত্তি আছে।

মন্দিরের প্রধান শিখরের সঙ্গে আরো কতগুলি চূড়ার পুনরাবৃত্তি আছে। খাজুরাহো মন্দিরের শিখরের বক্রতা লিঙ্গরাজ মন্দিরের বক্রতা অপেক্ষা অনেক কম। পরবর্ত্তী যুগে শিখরের বক্রতা—বিশেষ করিয়া কাশীর মন্দিরে এই বক্রতা আরো কমিয়া গিয়াছে। বাংলার আধুনিক মন্দিরের শিখর একেবারে সোজা (যেমন বিক্রমপুরের মঠ) হইয়া গিয়াছে। ইহা ইউরোপের ক্যাথিড্রালের চূড়াকে স্মরণ করায়।

বাংলার স্থাপত্য

বাংলায় পাথরের অভাবে পাথরের মন্দির হইতে পারে নাই বটে কিন্তু ইটের বহু সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এই কয় শ্রেণীর মন্দির উল্লেখযোগ্য : (১) শিখর মন্দির, (২) খড়ের ঘরের ন্যায় আটচালা, চৌচালা ও দোচালা মন্দির, (৩) কাঠের রথের অনুযায়ী একশ্রেণীর মন্দির। অনেক মন্দির টেরাকোটার মূর্ত্তিতে ও অলঙ্করণে শোভিত। অধুনা বাংলায় চৌচালা ও দোচালা ঘরের প্রথায় মন্দির নির্ম্মিত হয় না। এখন অধিকাংশ মন্দিরই আটচালার রীতি অনুসরণে নির্ম্মিত। কালীঘাটের মন্দিরও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বাংলার স্থাপত্যের ঘড়ের ছাঁচ উত্তরভারত ও রাজপুতানার স্থাপত্যকে প্রভাবিত করিয়াছে। রাজপুতনার অনেক অট্টালিকায় বাংলার এই ছাঁচ দেখা যায়।

বাংলার প্রাচীন মন্দিরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখা যায় বাঁকুড়ায়—প্রাচীন মল্লভূমের বৈষ্ণব রাজাদের নির্ম্মিত (১৬২২-১৭৫৮ খৃঃ) মন্দিরে। এই মন্দিরগুলি টেরাটোকাতে সজ্জিত। দিনাজপুর জেলার কান্তানগরের সুদৃশ্য মন্দির (১৭২২ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য। ইহা কাঠের রথের আকারে নির্ম্মিত। ইহাতে মূল শিখরের সঙ্গে কতগুলি ছোট ছোট চূড়া আছে। চূড়ার সংখ্যানুসারে পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, প্রভৃতি নামে এই মন্দিরগুলি পরিচিত। এইগুলি দ্বিতল, ত্রিতল হইয়া থাকে। আর্য্যাবর্ত্ত-স্থাপত্যের ইহা বিশেষ সংস্করণ। বাংলার বাহিরে এই ধরনের মন্দির দেখা যায় না। কান্তানগরের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে আধুনিক মন্দির আছে। ইহাতে মূল চূড়া ছাড়া আরো ৮টি চূড়া বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন বীরভূম দিনাজপুর পাণ্ডুয়া, হুগলি, এবং ঢাকায়ও প্রাচীন মন্দিরে টেরাকোটার অলঙ্কার আছে।

ত্যাগী ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন

স্বামী গম্ভীরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি সমাপ্ত)

মনোমোহন ও রাম বাবু ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর ('ভক্ত মনোমোহন' ৩২ পৃঃ)। ঐ গ্রন্থের মতে ঠাকুর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কামারপুকুরে ছিলেন (৫৪ ও ৫৭ পৃঃ)। 'কথামৃত' ৫ম ভাগের ১২ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় স্পষ্টই আছে[১]—"১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আটমাস ছিলেন—৩রা মার্চ্চ বুধবার ২১শে ফাল্গুন হইতে ১০ই অক্টোবর ২৫শে আশ্বিন পর্য্যন্ত।" অতএব ঐ সময়ের মধ্যে রামের বাড়ীতে যাওয়া অসম্ভব। রামচন্দ্র-প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত' গ্রন্থে আছে যে, বৈশাখী পূর্ণিমার ফুলদোলের দিন ঠাকুর রামগৃহে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন (১০০-১১০ পৃঃ)। প্রথমবারের আগমন ব্যয়কুণ্ঠ রামচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়াছিল; দ্বিতীয় বারের আগমনটি তিনি সর্বান্তঃকরণে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং ঐ সময় হইতে তাঁহার কাঞ্চনাসক্তি দূরীভূত হয়। সুতরাং নবজীবন লাভ করিয়া রামচন্দ্র এই দিনটিকে স্মরণ করিবার জন্য প্রতি বৎসর ঐ দিনে ভক্তোৎসব করিতেন। এই ফুলদোল হয় মে মাসে; সুতরাং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কামারপুকুর গমনের পূর্বে ইহা অসম্ভব—ইহা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তাহা হইলে রামগৃহে ঠাকুরের আগমন ১৮৮১ খৃঃ এর মে মাসের পূর্বে একবার মাত্র হইতে পারে। 'ভক্ত মনোমোহন' এর মতে কামারপুকুর হইতে ফিরিয়াই (১৮৮০ অব্দে) ঠাকুর দুর্গাপূজায় রামগৃহে যান (৫৭ পৃঃ)। ইহাই তাহা হইলে ঠাকুরের প্রথম পদার্পণ।

স্বামী শিবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে রামচন্দ্রের গৃহে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৬দুর্গাপূজার সময় দর্শন করিয়াছিলেন বলিলে শিলচরের 'বিবেকানন্দ চরিতের' ভূমিকার সহিত অসামঞ্জস্য ঘটে না। আর ঐরূপ দর্শন অসম্ভবও নহে; কারণ তখন তিনি সিমলা পল্লীতে রাম বাবুর বাড়ীর নিকটেই বাস করিতেন এবং পূর্ব হইতেই ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। এইরূপে ১৮৮০ খৃঃ, অক্টোবর মাসে প্রথম দর্শন ধরিয়া লইলে "অচিরেই" আমের দিনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের "শুভ সুযোগ" (মহাপুরুষ শিবানন্দ, ২৪ পৃঃ) ঘটিতে পারে না। অতএব এই বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে গেলে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ফুলদোলের সময় প্রথম দর্শন এবং উহার পরে ঐ গ্রীষ্মকালেই দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন ধরিতে হয়। আমরা কিন্তু আম্রক্রয়ের ঘটনাটিকে এরূপ প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করি না—বরং স্বামী শিবানন্দের নিজের লিখিত ১৮৭৯ বা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, আম্রক্রয়ের ঘটনাটি বিভিন্ন সময়ের স্মৃতি-বিজড়নের ফলে প্রথমাগমনের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে—

১ আমি দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পাইয়াছি; অন্য সংস্করণে পাই নাই। তবে এই মত 'ভক্ত মনোমোহন' ও 'লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' গ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে।

উহা অনেক পরের ঘটনা। অথবা তখন অসময়েই (১৮৮০ অক্টোবর মাসে) আম ক্রয় করা হইয়াছিল—যদিও এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই উচিত।[২]

স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রথম দর্শনের বিবরণ তিনি নিজেই তাঁহার ১৯।৯।১৭ তারিখের পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই দিন দীননাথ বসুর বাড়ীতে ঠাকুর আসিয়াছিলেন। তুরীয়ানন্দ সেখানে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে যান। তখন কেশব সেনের সহিত ঠাকুরের "সবে পরিচয় হইয়াছে।" প্রথম দর্শনের ২ বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রথম আগমন হয়। প্রথম দর্শনের সময় তুরীয়ানন্দের বয়স ছিল তের চৌদ্দ বৎসর। কেশব সেনের সহিত ঠাকুরের প্রথম পরিচয় হয় ১৮৭৫ এর প্রারম্ভে (কথামৃত ৫ম ভাগ, ১০ পৃঃ; লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ১৪ পৃঃ)। তুরীয়ানন্দের বয়স তখন মাত্র ১২ বৎসর (তাঁহার জন্ম ১৮৬৩ এর জানুয়ারী মাসে)। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে সাক্ষাৎ হইলে প্রথম দর্শন ১৮৭৬ বা ১৮৭৭ এ সংঘটিত হয়—তখন অবশ্য কেশব সেনের সহিত ঠাকুরের "সবে পরিচয়" নহে, নাতিদীর্ঘ পরিচয়ের সময়। ইহার দুই বৎসর পরে তুরীয়ানন্দের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন এই হিসাবে ১৮৭৮ কিংবা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ঠাকুরের প্রথম দর্শন পান বসুপাড়ার দীনু বসুর বাড়ীতে ('স্মৃতিকথা' ১ পৃঃ) —সম্ভবতঃ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। ঐ দিবস স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের কাল তিনি নিজে এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—"১৮৮৩।৮৪ সাল, গ্রীষ্মকাল। লর্ড রিপনের আমলে এবং আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর (Calcutta International Exhibition) পূর্বে আমি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই। তখন আমার বয়স ১৫।১৬ হবে; কিন্তু তখনও আমার ন্যাংটা হতে লজ্জা বোধ হত না" ('স্মৃতিকথা,' ১ পৃঃ)। প্রদর্শনী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হয়; সুতরাং তিনি আসেন ১৮৮৩ তে। কিন্তু ইহা প্রথম আগমন নহে বলিয়া সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এই আগমনটি তাঁহার মনে বিশেষ দাগ রাখিয়াছিল, পূর্ববর্তী আগমন তাহা করে নাই। তাঁহার জন্ম হয় 'আশ্বিনের ঝড়ের' বৎসর। 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৫৪ পৃষ্ঠায় মাষ্টার মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, "আশ্বিনে ঝড়" হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর এবং তাঁহার বয়স তখন নয় দশ বৎসর। প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার এই সাক্ষ্য অবশ্য গ্রহণীয়। অতএব 'স্মৃতিকথার' ভূমিকায় যদিও উল্লেখ আছে যে ১২৭২ বঙ্গাব্দে (১৮৬৫ ইং) ঐ ঝড় হয়, তথাপি আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অধিক কারণ এই যে, ঐ বৎসর মহালয়া পড়িয়াছিল কার্তিক মাসে। অখণ্ডানন্দের জন্ম কিন্তু আশ্বিনের মহালয়ায়। আমাদের হিসাবে তাঁহার জন্ম হয় ২৩শে আশ্বিন, শনিবার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ (১২৭১ বঙ্গাব্দ)। এই হিসাবে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বয়স হয় ১৯ বৎসর। তখন উলঙ্গ হইতে লজ্জা না হওয়া অস্বাভাবিক। আমাদের হিসাবে স্বামী অখণ্ডানন্দের উল্লিখিত ১৫ বৎসর বয়স হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁহার পক্ষে দক্ষিণেশ্বরে আসা অসম্ভব নহে; কারণ তাঁহার বাল্যবন্ধু তুরীয়ানন্দ ঐ বৎসরই দক্ষিণেশ্বরে যান এবং আমরা অবগত আছি যে উভয় বন্ধু একই

২ এই সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা শুনিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গমনকালে মহাপুরুষ মহারাজের বন্ধুটি 'আম-সন্দেশ কিনিয়াছিলেন'—এই কথাই মহাপুরুষজী বলিয়াছিলেন; পরে উহাই 'আম ও সন্দেশে' পরিণত হইয়া বর্তমান বিভ্রাট ঘটাইয়াছে। 'আম-সন্দেশের' প্রচলন তখন ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সঙ্গে অন্য সময়েও সাধুদর্শনে যাইতেন। ফলতঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে গমন সমর্থন করা কঠিন।

স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে 'কথামৃত'কার ১৮৮৪ খৃঃ, ৯ই মার্চে লিখিতেছেন —"শরৎ, শশী ইহারা সবে ২।১ বার দেখিয়াছেন।" স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৮৮৩ খৃঃ এর অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম দর্শনলাভ করেন—ইহা ব্রহ্মচারী প্রকাশ প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ' (১৫-১৬ পৃঃ), Life of Ramakrishna (৪৭২ পৃঃ), ভগিনী দেবমাতা কৃত Sri Ramakrishna and His Disciples (৯৫ পৃঃ), Disciples of Ramakrishna (৫২ পৃঃ) ও 'লীলাপ্রসঙ্গ-দিব্যভাব' (২৪ পৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

'স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনী' (৫৩ ৫৪ পৃঃ)তে প্রকাশ যে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলঘরিয়ায় কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যানে ঠাকুরের প্রথম দর্শন পান ('কথামৃত', ৫ম ভাগ, ১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য), দ্বিতীয় দর্শন হয় বেলঘরিয়ার দেওয়ান গোবিন্দ মুখার্জ্জির বাড়ীতে ১৮৮৩ খৃঃ-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী ('কথামৃত' ৫ম ভাগ, ৩১ পৃঃ)। তৃতীয় দর্শন হয় দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন। ঐদিন স্বামী শিবানন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ২৪ পৃঃ)।

স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে 'কথামৃত' ৫ম ভাগ, ১২১ পৃষ্ঠায় আছে—"আজ রবিবার, ৯ই মার্চ্চ, ২৭শে ফাল্গুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।...তখনও গিরিশ, কালী, সুবোধ প্রভৃতি আসিয়া জুটেন নাই।" 'কথামৃতে'রই ১ম ভাগে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় আছে, "১৮৮৪র মধ্যে...কালী ...আসিলেন।" কলিকাতার বেদান্ত সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 'স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কথা', গ্রন্থে আছে যে, তিনি ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কাঁকুড়গাছিতে সুরেন্দ্রের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন —দক্ষিণেশ্বরে দর্শন ইতঃপূর্বেই হইয়াছিল। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ঐ বৎসর ৯ই মার্চ এবং ১৫ই জুন এর মধ্যে কোনও একদিন অভেদানন্দ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন।

'কথামৃত' ৪র্থ ভাগ, ২৯১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট ঠাকুর মাষ্টার মহাশয়কে বলিতেছেন, "দুটী ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ)।" সুতরাং সুবোধের আগমন কাল ঐ বৎসর আগষ্ট বালয়াই ধর যাইতে পারে।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের আগমনকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। 'লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাবের' ২৯৩ পৃষ্ঠায় আছে—"শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন মিত্র, মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অনেক যুবক ভক্তেরাও এখানে (অর্থাৎ শ্যামপুকুরে) ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।" ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়ীতে আসেন। সুতরাং 'লীলাপ্রসঙ্গের' মত গ্রহণ করিলে ত্রিগুণাতীতানন্দ তৎপূর্বে ঠাকুরকে দর্শন করেন নাই। অথচ 'কথামৃত'কার লিখিয়াছেন যে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন (১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা)। 'কথামৃত', ২য় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠায় আছে—"মাষ্টার ও প্রসন্ন (দক্ষিণেশ্বরে) আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার ঘরের দক্ষিণ দিকের দালানে রহিয়াছেন। ..... ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সারদাপ্রসন্ন এই প্রথম দর্শন করেন।" ইহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বরের ঘটনা। ঠাকুরের শ্যামপুকুরে আগমনের পূর্বে সারদাপ্রসন্ন আরও কয়েক বার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন ('কথামৃত', ৩য় ভাগ, ১৪০ পৃঃ)।

'শ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা' গ্রন্থে (২৫-৩৫ পৃষ্ঠা) স্বামী অদ্ভুতানন্দের প্রথম আগমনকাল

রামচন্দ্রের আগমনের প্রায় সমকালীন বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঠাকুরের কামারপুকুরে যাইবার অব্যবহিত পূর্বে লাটু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। রোমাঁ রোলাঁর Life of Ramakrishna ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দেরই সমর্থক (২০৩ পৃঃ)।

স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের নিকট ঠিক কবে আসিয়াছিলেন বলা কঠিন। 'কথামৃত' ১ম ভাগ ৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, তিনি ১৮৮১ এর শেষে কিংবা ১৮৮২ এর প্রারম্ভে আসেন। রোমা রোলাঁর Life of Ramakrishna (২০৩ পৃঃ) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দেরই পক্ষপাতী। আমরা কিন্তু ইহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না ; কারণ 'লীলাপ্রসঙ্গে' স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আগমন করেন। ইহাই যুক্তিসম্মত ; কারণ স্বামী যোগানন্দের বাটী কালীবাড়ীর নিকটেই ছিল, কালীবাড়ীতে তিনি যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী হইতে জানা যায় যে, তিনি অল্পবয়সেই ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। 'লীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব পূর্বার্দ্ধ' ২৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ একটি ঘটনার বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে যে, তখন যোগানন্দের বয়স ছিল ১৪।১৫ বৎসর। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। আমরা ইহাও অবগত আছি যে কেশবচন্দ্র ঠাকুরের বিষয় প্রকাশ্যে প্রচার করিতে থাকার অব্যবহিত পরেই যোগানন্দ ঠাকুরের নিকট আগমন করেন। সুতরাং উহা ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়া থাকিবে।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সম্বন্ধে কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৩০৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার বয়স ছিল ২৫।২৬ বৎসর, শুনা যায় দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনকালে তাঁহার বয়স ছিল ১৮ বৎসর। এই হিসাবে তাঁহার আগমন-কাল হয় ১৮৮০। কিন্তু কোন গ্রন্থেই ইহা স্বীকৃত হয় না যে, তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বে আসেন। বরং কথামৃতে ১৮৮১-৮২ এর উল্লেখ আছে। লীলা-প্রসঙ্গের মতেও উহা ১৮৮১ এর পরের ঘটনা।

স্বামী অদ্বৈতানন্দের প্রথমদর্শন-কাল কথামৃতে (১ম ভাগ, ৬ পৃঃ) ১৮৭৫ খৃঃ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ দর্শন সম্ভবতঃ সিঁথিতেই হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে আগমন অনিশ্চিত।

অতঃপর আমরা এই আলোচনার ফল সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম :

নাম	আগমন-কাল
বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র)	ডিসেম্বর ১৮৮১
ব্রহ্মানন্দ (রাখাল)	আগষ্ট (?) ১৮৮১
প্রেমানন্দ (বাবুরাম)	ডিসেম্বর (?) ১৮৮২
শিবানন্দ (তারক)	অক্টোবর (?) ১৮৮০
তুরীয়ানন্দ (হরি)	১৮৭৯
অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর)	১৮৭৯ (?)
সারদানন্দ (শরৎ)	অক্টোবর ১৮৮৩
রামকৃষ্ণানন্দ (শশী)	" "
বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন)	৮ই জুন ১৮৮৩
অভেদানন্দ (কালী)	মার্চ-জুন ১৮৮৪
সুবোধানন্দ (খোকা)	আগষ্ট ১৮৮৫
ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা)	২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮৪
অদ্ভুতানন্দ (লাটু)	১৮৭৯-৮০
যোগানন্দ (যোগীন)	১৮৭৫-৭৬
নিরঞ্জনানন্দ	১৮৮২
অদ্বৈতানন্দ (বুড়ো গোপাল)	১৮৭৫ (প্রথম দর্শন)

ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

(৩)

মোক্ষস্বরূপ বিচারে ন্যায়-ভাষ্যকার সম্পূর্ণভাবে বৈদিক সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছি যে ভারতীয় বৈদিক দার্শনিকগণ বেদের রেখামাত্র লঙ্ঘন করিয়া কোন কথা বলেন নাই। অক্ষপাদ-সূত্রের (৪।১।৫৯) ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে—

"ঋচশ্চ ব্রাহ্মণানি চাপবর্গাভিবাদীনি ভবন্তি, ঋচশ্চ তাবৎ—

কর্ম্মভির্মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ
প্রজাবন্তো দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ।
অথাপরে ঋষয়ো মনীষিণঃ
পরং কর্ম্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুঃ॥
ন কর্ম্মণা প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি এইরূপে ভাষ্যকার অপবর্গ-প্রতিপাদক ঋঙ্-মন্ত্রসমূহ প্রদর্শন করিয়া অনন্তর ব্রাহ্মণবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি—(ছান্দোগ্য ২।২৩।১)। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি—(বৃ উ, ৪।৪।২২) অতঃপর ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অথ খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে—(বৃ উ, ৪।৪।৫) ইতি কর্ম্মভিঃ সংসরণমুক্ত্বা প্রকৃতমন্যদুপদিশন্তি।" অর্থাৎ শ্রুতি কামময় পুরুষ বর্ণনা করিয়া কর্ম্মের ফল সংসার হইয়া থাকে ইহাই বলিবার জন্য বলিতেছেন—'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি—(বৃ-উ, ৪।৪।৬)। এই স্থলে ন্যায়-ভাষ্যকার মোক্ষের স্বরূপ যাহা বলিয়াছেন বেদান্তশাস্ত্রেও ঠিক তাহাই বলা হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রে ইহা অপেক্ষা নূতন কিছুই বলা হয় নাই। ভাষ্যকার প্রথমেই মোক্ষাবস্থাকে ব্রহ্মাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'এতদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্মক্ষেমপ্রাপ্তিঃ (১।১।২২); আবার ন্যায়ভাষ্যে (৪।১।৫৯) সূত্রেও 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'—এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া ন্যায়সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। মোক্ষপ্রাপ্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। ন্যায়-ভাষ্যে ভাষ্যকার অকস্মাৎ কোন স্থলে ব্রহ্মবাদের অবতারণা করেন নাই, আদ্যন্ত আলোচনা করিলে একটিই কথা বুঝিতে পারা যায় যে ভাষ্যকার প্রাপ্তমোক্ষ জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বেদবাক্যানুসারেই তাহা করিয়াছেন এবং বেদবাক্যার্থবিদ্‌গণকেই ভাষ্যকার ১।১।২২ সূত্রে অপবর্গবিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ইহাই মনে করিয়া উদয়নাচার্য্য 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি'-গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রকেও ব্রহ্মকাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া ন্যায়শাস্ত্রকে অবৈদিক অশ্রৌত বলিয়া মনে করেন, তাহা তাঁহাদের দুঃসাহস বুঝিতে হইবে।

বৈশেষিক-সূত্রে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ গুণ-গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

নিবৃত্তিলক্ষণঃ কেবলো ধর্ম্মঃ পরমার্থদর্শনজং সুখং কৃত্বা নিবর্ত্ততে'—মুমুক্ষু পুরুষের নিবৃত্তিলক্ষণ শুদ্ধ ধর্ম্ম পরমার্থদর্শন-জনিত সুখ উৎপন্ন করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে অতি প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য ব্যোমশিবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার যে পরমার্থদর্শন বলিয়াছেন পরমার্থ শব্দদ্বারা ভাষ্যকার কাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে ব্যোমশিবাচার্য্য বলিয়াছেন যে—'পরমার্থসর্ব্বপদার্থানামাত্মা তদ্দর্শনজাতং সুখং পরমার্থদর্শনজং সুখম্।' সমস্ত পদার্থের মধ্যে আত্মাই পরমার্থ। যদি সমস্ত পদার্থই পরমার্থ হইত তবে কেবল আত্মাকে পরমার্থ বলা সঙ্গত হইত না। কেবল আত্মাকে পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় অনাত্মবস্তু-মাত্রই যে অপরমার্থ তাহা বলাই হইয়াছে। বৈশেষিকাচার্য্য আত্মাকে পরমার্থ ও অনাত্মাকে অপরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; বেদান্ত-সিদ্ধান্তেও আত্মাকেই পরম সত্য ও অনাত্মবস্তুকে অসত্য বলা হইয়াছে। 'আত্মতত্ত্ববিবেক'-গ্রন্থে (১০৮ পৃঃ) আচার্য্য উদয়ন বাহ্যার্থভঙ্গ নিরূপণের উপসংহারে বলিয়াছেন যে 'তস্মাদতথ্যমেব বিশ্বং মন্দপ্রযোজনত্বাত্তু, সত্ত্বৈর্ম্মুমুক্ষুভিরুপেক্ষিতম্'—ইহার অভিপ্রায় এই অনাত্ম-বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্যই বটে কিন্তু সত্য হইলেও তাহা নিষ্প্রয়োজন। অনাত্ম জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। এইজন্য সত্বর মুমুক্ষু বেদান্তিগণ অনাত্মপ্রপঞ্চের নিষ্প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনাত্মপ্রপঞ্চের উপেক্ষাই করিয়াছেন। ইহার টীকাতে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে অনাত্মপ্রপঞ্চ যদি সত্যই হয় তবে বেদান্তিগণ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলেন কেন? ইহার উত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন—'মন্দপ্রয়োজনত্বাৎ', অনাত্মপ্রপঞ্চ সত্য হইলেও তাহা নিষ্প্রয়োজন। এই নিষ্প্রয়োজনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ অনাত্মপ্রপঞ্চকে অপরমার্থ বলিয়াছেন। অতঃপর শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে উপনিষদভ্যাস-জনিত আত্মসাক্ষাৎকার বেদান্তিগণ মোক্ষের জন্য ত্বরান্বিত হইয়া অনাত্মপ্রপঞ্চবিচারে উদাসীন হইয়াছেন। নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই অদ্বৈত-বেদান্তিগণ অনাত্মপ্রপঞ্চ-বিচারে উদাসীন।

'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ' গ্রন্থে (৩৬ পৃঃ, নির্ণয়সাগর সংস্করণ) মধুসূদন বলিয়াছেন যে—ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের সত্তা যদি তুল্যই নৈয়ায়িকগণ মনে করেন তবে প্রপঞ্চ তিরস্কারপূর্ব্বক অতিস্ফুটরূপে ব্রহ্মের প্রতিপাদন যাহা উপনিষদে করা হইয়াছে তাহা তো সঙ্গত হইবে না। দেখা যায়—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্,' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,' 'সত্যস্য সত্যম্' 'অতোঽন্যদার্ত্তম্' 'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এতদুত্তরে যদি নৈয়ায়িক বলেন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সাক্ষাৎ পরমপুরুষার্থ উপযোগী, প্রপঞ্চসাক্ষাৎকার পরমপুরুষার্থ উপযোগী নহে; ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রুতিসমূহে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মেরই নিরূপণ করা হইয়াছে, প্রপঞ্চের নিরূপণ করা হয় নাই। এতদুত্তরে মধুসূদন বলিয়াছেন তবে তো পুরুষার্থ-হেতু বলিয়া মাত্র ব্রহ্মই উপাদেয় ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত ইতর প্রপঞ্চের স্বীকার তো ন্যায়মতে বৃথাই হইতেছে। অনাত্ম-প্রপঞ্চ অনুপাদেয় ইহা নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন। এতদুত্তরে নৈয়ায়িকগণ যদি এরূপ বলেন যে অনাত্মপ্রপঞ্চ অনুপাদেয় নিষ্প্রয়োজন, অপরমার্থ হইলেও তাহা সত্য বলিয়া তাহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে মধুসূদন বলিয়াছেন নৈয়ায়িকগণের ভ্রান্তি অপার, যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহার সত্যত্বাবধারণে নৈয়ায়িকগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নিষ্প্রয়োজন বস্তু শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত নহে। উপক্রম, উপ-

সংহারাদি ষড়বিধ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গ দ্বারা নিষ্প্রয়োজন বস্তুতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই সিদ্ধ হয় না। নিষ্প্রয়োজন ও বটে সত্যও বটে ইহা শাস্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। আর এইজন্যই যথার্থ-দর্শী বৈদিক নিষ্প্রয়োজন দুঃখমাত্রহেতু প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়াই অবধারণ করিয়া থাকেন। মিথ্যা বলিয়া অবধারণ করিলেও ইহাদের ব্যাবহারিক সত্তার অপলাপ করেন নাই। প্রপঞ্চ যাবদ্ব্যবহারকাল অবাধিতই থাকে। যাঁহারা জীবের মোক্ষাবস্থাকেও ব্যবহারাবস্থা বলিয়াই মনে করেন, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বিষ্ণুলোক প্রভৃতিতে গমনকেই মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মোক্ষ লোকবিশেষ। তাহাতেও ব্যবহারের সত্তা আছে। এইজন্য যাবদ্ব্যবহার কাল অবাধিত, প্রপঞ্চও আছে। সুতরাং বিশিষ্টলোক-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষবাদীর নিকটে প্রপঞ্চ সত্যই বটে। ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তি উপাসনার ফল, উপাসনা-কাণ্ড পরিণামবাদে ব্যবস্থিত। পরিণামবাদে জগতের সত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং জগতের সত্যত্ব মিথ্যাত্ব লইয়া বিচারের কোন অবসরই হইতে পারে না। উপাসনাপ্রাপ্য লোকবিশেষকে মোক্ষ বলিলে জগন্মিথ্যাত্বের কোন প্রসঙ্গই তাহাতে আসিতে পারে না।

আমরা ন্যায়বৈশেষিক মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ মোক্ষাবস্থাকে ব্যবহারাতীত অবস্থা বলিয়াছেন। এইজন্য তাহাদের মতে প্রাপ্তমোক্ষ জীবের নিকটে কোন প্রপঞ্চই বিদ্যমান থাকে না। যাহাদের নিকটে বিদ্যমান থাকে তাহারা ব্যবহারের অন্তর্গত প্রাপ্তমোক্ষ নহে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মতে মোক্ষের যে স্বরূপ দেখান হইয়াছে তাহাও অদ্বৈতবাদিগণ সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন নাই। বিবরণের চতুর্থ বর্ণকের অবসানে বলা হইয়াছে যে—সৎস্বপি পৃথিব্যাদিষু অন্তঃকরণাধ্যাসনিবৃত্তৌ প্রমাতৃত্বা-ভাবাদাত্মচৈতন্যস্য স্বতো বিষয়োপরাগাভাবাদ্ দ্বৈতদর্শনং ন প্রাপ্নোতি অনিন্দ্রিয়স্যৈব রূপাদি-দর্শনমিত্যেকঃ পক্ষঃ—সর্ব্বদ্বৈতনিবৃত্তিপক্ষঃ সমন্বয়-সূত্রে বক্ষ্যতে। ইহার অর্থ পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তি স্বীকার না করিয়াও অর্থাৎ পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকিলেও জীবের মোক্ষ হইতে পারে। সর্ব্বজীব-সাধারণ পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চ জীবের বন্ধকারক নহে। কিন্তু অসাধারণ-প্রপঞ্চ অন্তঃকরণই জীবের বন্ধজনক। এইজন্য সর্ব্বজীব-সাধারণ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকিলেও জীবের বন্ধজনক অসাধারণ প্রপঞ্চ অন্তঃকরণের নিবৃত্তিতেই মোক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্তঃকরণাধ্যাসের নিবৃত্তিতে জীবের প্রমাতৃত্বের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রমাতৃত্ব-নিবৃত্তিতে কর্তৃত্বের নিবৃত্তি এবং কর্তৃত্বের নিবৃত্তিতে ভোক্তৃত্বের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বভোগনিবৃত্তিই মোক্ষ। অন্তঃকরণাধ্যাসের নিবৃত্তিতে আত্মচৈতন্যের সহিত কোন বিষয়েরই সম্বন্ধ হইতে পারে না। বিষয় বিদ্যমান থাকিলে সেই বিষয়ের দ্বারা আত্মচৈতন্য উপরক্ত হইতে পারে না। এইজন্য দ্বৈতবস্তু বিদ্যমান থাকিলেও তাহা প্রাপ্তমোক্ষ জীবের নিকট অবিদ্যমান সমান বুঝিতে হইবে। বিবরণাচার্য্য-প্রদর্শিত এই পক্ষটি প্রকটার্থ-বিবরণকার সমর্থন করিয়াছেন। প্রকটার্থ-বিবরণ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের একটি টীকা। এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের নামের নির্দ্দেশ নাই। সিদ্ধান্তলেশাদি বেদান্ত-গ্রন্থে প্রকটার্থবিবরণের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। বিবরণ ও প্রকটার্থবিবরণে মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রদর্শিত এই পক্ষটিই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের সম্মত। বিবরণাচার্য্য

নবমবর্ণকে সর্ব্বদ্বৈতনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যাহা অদ্বৈতবেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ন্যায় বৈশেষিক আচার্য্যদের সিদ্ধান্তের সহিত বেদান্তিগণের কোন বিরোধ নাই। প্রশস্তপাদ ভাষ্যের মঙ্গলশ্লোকের ব্যাখ্যাতে অতি প্রাচীন টীকাকার ব্যোমশিবাচার্য্য মোক্ষ-সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ভাষ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্যের অভিপ্রায় আমরা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি, আর তাহাতে বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্তও বলা হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণের সহিত বিবরণাচার্য্যের যে বিরোধ নাই তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রায় ইতঃপর আরও বিস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিব।

বন্ধন

শ্রী—

সহস্র ইচ্ছার বহ্নি হৃদিমাঝে জ্বলিছে সদাই
বাসনার লাভা-স্রোতে বিপর্য্যস্ত আমি ভেসে যাই।
জীবনের পথে পথে চাওয়া মোর রহিল অশেষ,
অপ্রাপ্তির দুঃখে তাই চোখে বহে তপ্ত অশ্রুরেশ।
তবু জানি সে ত মোর সত্যিকার চাওয়া কভু নয়,
আন্তর আকৃতি মোর লুপ্ত করি দেহ জেগে রয়।
আমি যাহা চাই সে ত সুন্দরের সাথে অভিসার,
বাস্তবের ক্লিন্ন পথে কেন তবু ঘুরি বারম্বার ?
আমার মনের ইচ্ছা কেঁদে মরে দেহের সীমায়—
সংসারের বাঁকা পথে মিথ্যা মোহ নয়ন ধাঁধায়।
মনের মহান ইচ্ছা সে যে শুভ্র গোলাপের কুঁড়ি,
—একান্ত কোমল, তাই রূঢ় স্পর্শে ওঠে না মুঞ্জরি!
অন্তর-এষণা-দীপ নিভে যায় প্রতিকূল ঝড়ে,
দেহের দুয়ারে এসে 'চিরন্তন আমি' যায় মরে।
এ ধরার রূপজালে আপনারে আপনি জড়াই,
মিথ্যা চাওয়া পেতে গিয়ে বারে বারে নিজেরে হারাই।
অন্তরে আমি যে কবি, সুন্দরের চির সহচর
বাস্তবের রূপলোকে, মহাসত্য—হইগো বিস্মর।
মিথ্যা কামনার লোভে ঘাটে ঘাটে ভেসে যাই আমি,
দুহাতে ধরিগো যাহা কভু নাহি চাই তাহা স্বামী!
সংসারে যা কিছু চাই, সে ত মোর নহে সত্য চাওয়া,
বারে বারে পেয়ে তাই আজো মোর হলো না ত পাওয়া।
পাওয়ার আনন্দ-স্বর্গ ম্লান হয় না-পাওয়া ব্যথায়,
মনের সকল ইচ্ছা এ জীবনে রূপ নাহি পায়।

পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

(৩)

ঢাকা পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। এই সহরকে কেন্দ্র করিয়াই বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার বহুল প্রচার হইয়াছে। ঢাকায় স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন এবং তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তদঞ্চলের বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব জীবনবেদ ও সার্বভৌম ধর্ম সাগ্রহে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ সনে ঢাকা ফরাশগঞ্জ অঞ্চলের জমিদার স্বর্গীয় মোহিনী-মোহন দাসের গৃহে কতিপয় ভক্তের উদ্যোগ ও আগ্রহে সাপ্তাহিক অধিবেশনে যে ধর্মপ্রসঙ্গপাঠ, আলোচনা প্রভৃতি হইতেছিল, উহাই ক্রমে বিবিধ সেবাকার্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। লাঙ্গলবন্ধের যোগস্নানে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর সেবার জন্য সেবকদল-গঠন, পীড়িত-দের শুশ্রূষা, দুর্গতগণের দুঃখমোচন, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ও স্বামীজির জন্মোৎসব-উদ্‌যাপন ও তদুপ-লক্ষে তাঁহাদের দিব্য জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠ প্রভৃতি জনকল্যাণকর কার্য দ্বারা ঢাকাবাসিগণ প্রভূতপরিমাণে উপকৃত হইতেছেন দেখিয়া তথায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি স্থায়ী শাখাকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। তদুদ্দেশ্যে স্থানীয় ভক্ত-উদ্যোক্তা-দের চেষ্টায় উয়ারী অঞ্চলে ক্রীত একখণ্ড ভূমির উপর মঠ ও মিশন স্থায়িভাবে গড়িয়া উঠিল। ১৯০৮ সনে স্থানীয় মঠের সহিত সেবা-বিভাগ যুক্ত হয় এবং ১৯১৪ সনে বেলুড় মঠের সাধুগণ এই কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। ৺প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ঠাকুরচরণ মুখোপাধ্যায়, ৺হরপ্রসন্ন মজুমদার, শ্রীহরেন্দ্র নাগ, শ্রীহরিশ দাস (স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ), শ্রীবীরেন্দ্র বসু, শ্রীযোগেশ ঘোষ, ৺যতীন্দ্র দাস, শ্রীমধুসূদন বসু, শ্রীযোগেশ দাস, শ্রীশরদিন্দু ঘোষ (স্বামী বিশ্বনাথানন্দ), ৺চিন্তাহরণ মুখার্জি, শ্রীরমণীমোহন গোস্বামী, শ্রীসুরেশ ঘোষ প্রমুখ ভক্ত-কর্মিগণের চেষ্টায় ও আগ্রহে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপিত এবং পরবর্তী কালে উহার বহুল সম্প্রসারণ সাধিত হয়।

ভক্তগণের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের মধ্যে কয়েকজন গুরুদেবের ভাবধারা প্রচার করিবার জন্য পূর্ববঙ্গে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ বরিশাল গমন করিয়া স্বদেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার দত্তের বাসভবনে কয়েক দিন অবস্থান করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীপ্রচারে ব্রতী হন। ১৮৯৯ সনের ডিসেম্বর মাসে স্বামী সারদানন্দ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ঘুরিয়া বরিশালে যান। তিনি বরিশালে আট দিন অবস্থান করেন এবং ২টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী বক্তৃতা দেন। দুইটি প্রশ্নোত্তর-সভায় তিনি ধর্মার্থিগণের বহু প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া সকলের প্রীতি আকর্ষণ করেন। তাঁহার শুভাগমনে বরিশালের ধর্ম-

জিজ্ঞাসু নরনারী ও ছাত্রসমাজের মধ্যে সবিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তথায় অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে তিনি দর্শকগণের সহিত ধর্মালাপাদি করিয়াছিলেন। জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও অশ্বিনী দত্তের সাধু চরিত্র ও জনসেবা দেখিয়া তিনি প্রীত হন। ১৯০৮ সনের মার্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দও বরিশাল গিয়াছিলেন এবং তথায় দশ দিন অবস্থান করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় স্থানীয় ধর্মরক্ষিণীসভাগৃহে সমবেত জিজ্ঞাসুগণের বিবিধ সমস্যার সমাধান করেন। ফলে বরিশাল শহরের বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত লোক ও স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হন। স্বামী প্রেমানন্দ কয়েকবারই ধর্মপ্রচারার্থ পূর্ববঙ্গে যান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী (পটলডাঙ্গার মাষ্টার) মহোদয়ের সনির্বন্ধ আগ্রহ ও অনুরোধে স্বামী প্রেমানন্দ ইং ১৯১৩ সনে ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগাও গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে যোগদান করেন। নিকটবর্ত্তী কলমা গ্রামেও তিনি শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া এবং উদ্দীপনাময় উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীভূপতি দাশগুপ্ত, শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত প্রমুখ ভক্তগণ উক্ত কলমা গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা-প্রচারের কেন্দ্ররূপে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করেন। স্বামী প্রেমানন্দ কর্তৃক ভগবান বুদ্ধের শুভ জন্মতিথি বৈশাখী পূর্ণিমা-দিবসে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি স্বামী প্রেমানন্দের পবিত্র স্মৃতি বহন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে সমাজহিতকর বহুবিধ কার্য করিয়া আসিতেছে। ১৯১৪ সনে ভক্তগণের আগ্রহে স্বামী প্রেমানন্দ ধর্মপ্রচারার্থ আবার পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে যান। ১৯১৫ সনেও তিনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুর জন্মস্থান ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাড়ীখাল গ্রামে ভক্তগণের আগ্রহে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহার প্রেরণাতেই পরবর্তী কালে এই গ্রামে ৺মুকুন্দ বসু, শ্রীবঙ্কিম দাস প্রমুখ ভক্ত কর্মিগণের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয়। স্বামী প্রেমানন্দের দিব্য সান্নিধ্যে আসিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াই ইং ১৯১৫ সনে শ্রীধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত (স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ) নারায়ণগঞ্জের নিকবর্তী সোনারগাঁ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থাপন করেন।

১৯১৬ সনে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের গৃহ-নির্মাণের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে ঢাকার কতিপয় ভক্ত-উদ্যোক্তার আগ্রহাতিশয্যে স্বামী প্রেমানন্দ এবং আরও কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তসহ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঢাকায় শুভ পদার্পণ করেন। পথে আসামের কামাখ্যাতীর্থে তিন দিন অবস্থান করিয়া তিনি প্রথমতঃ পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ পরিদর্শন করেন। ভক্ত-কর্মী শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে ও চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদ্বয় ময়মনসিংহে যান এবং তথায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচার করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহে স্বামী প্রেমানন্দ অধিকাংশ সময় সমবেত নরনারীগণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজির প্রসঙ্গ তুলিয়া নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন। এখানে কয়েক দিন পরমানন্দে অবস্থান করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ দলবলসহ রেলপথে ঢাকা গমন করেন। ঢাকা রেলষ্টেশনে তাঁহাদের বিপুল সম্বর্ধনা হইয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঢাকায় কাশীমপুর-জমিদারের ভবনে অবস্থান করেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া অগণিত ভক্ত-নরনারীর

প্রাণ শীতল হইল। ১৩ই জানুয়ারী তিনি যথাবিধি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের নূতন গৃহের ভিত্তিস্থাপন করেন। কাশীমপুরের জমিদার তখন পুত্রশোকে অত্যন্ত অশান্ত ও বিষণ্ণ ছিলেন। করুণার্দ্র ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী ব্রহ্মানন্দ যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার দগ্ধ হৃদয় শান্ত করিলেন।

জমিদার বাবুর আন্তরিক আগ্রহে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জয়দেবপুরের নিকটবর্ত্তী তাঁহার কাশীমপুর গ্রামস্থ বাড়ীতেও গমন করেন। তথায় তিনি এক দিন স্বামী প্রেমানন্দ-সহ হস্তিপৃষ্ঠে নিকটস্থ গভীর জঙ্গল দেখিবার জন্য যান। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপায় জমিদার বাবুর শোকদগ্ধ হৃদয় ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া অধ্যাত্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। কয়েক দিন পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া তিনি স্বামী প্রেমানন্দ-সহ নিকটবর্ত্তী দেওভোগ গ্রামে সাধু নাগ মহাশয়ের বাড়ী দর্শন করিতে যান। নাগ মহাশয়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে স্বামী প্রেমানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া গাত্র হইতে জামা-কাপড় খুলিয়া গড়াগড়ি দিলেন। ভক্তেরা খোলকরতালসহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভাবোন্মত্ত স্বামী প্রেমানন্দ গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট অর্দ্ধস্ফুটবাক্যে বলিলেন, "মহারাজ, এদের একটু কৃপা—।" এই কথা শুনিতে না শুনিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ দিব্যভাবে আরূঢ় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার দিয়া গাহিলেন—'হরিনামে গগন ছাওরে'। দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সমবেত সকলের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার তরঙ্গ বহিল। ভাবসংবরণের পর কিছু সময় তথায় অবস্থান করিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ সদলবলে নারায়ণগঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে বহু ভক্ত নরনারীকে কৃপাপূর্বক সাধনপথের নির্দেশ দিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের সফর শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ইং ১৯১৭ সনে স্বামী প্রেমানন্দ শেষবার পূর্ববঙ্গে প্রচারকার্য্যে যান। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও নেত্রকোণায় প্রচারকার্য শেষ করিয়া তিনি ঢাকায় আসিয়া কয়েক দিন অবস্থান করেন। এবার তিনি শ্রীনীরদচন্দ্র সান্যাল (স্বামী অখিলানন্দ) এবং শ্রীশৌর্যেন্দ্র মজুমদারের চেষ্টায় ও আগ্রহে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও টাঙ্গাইল যান। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া সোনারগাঁ, হাসারা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবাদি করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন—গ্রামের জলাশয়গুলি কচুরিপানায় পরিপূর্ণ থাকায় উহাদের দূষিত জল পান করিয়া গ্রামের নরনারীগণ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইতেছে। তিনি ঐ জলাশয়গুলি পরিষ্কার করিবার জন্য গ্রামবাসিগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিরসঞ্চিত ঔদাসীন্যে নিরুদ্যম হইয়া পড়ায় তাহারা মহাপুরুষের কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন জনকল্যাণচিকীর্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং জলাশয়ে নামিয়া কচুরিপানা তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মহান্ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবকগণ নিজেরাই পানা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ২।৩ মাস শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। জ্বর লইয়াই তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। চিকিৎসকগণ উহা কালাজ্বর বলিয়া স্থির করেন। স্বামী প্রেমানন্দের কয়েক বার পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণের ফলে তথায় বহু স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপিত হইয়া লোককল্যাণ সাধিত হইতেছে। তাঁহার শুভাগমনে পূর্ববঙ্গবাসিগণের মধ্যে সত্যসত্যই

একটা অভূতপূর্ব উদ্দীপনা অনুভূত হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গের যে সকল স্থানে গিয়াছেন তত্রত্য অধিবাসিগণ—কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেই তাঁহার অপার্থিব প্রেম ও সাধুত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন জন জ্ঞান করিয়াছে। নিরক্ষর মুসলমানও হিন্দু সন্ন্যাসীর অপূর্ব প্রেম ও চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছে—ইহা দেখিবার বিষয়। তিনি প্রকৃতপক্ষেই 'প্রেমানন্দ' ছিলেন। 'তস্য প্রীতিঃ তৎপ্রিয়কার্যসাধনঞ্চ'—ইহাই ছিল তাঁহার কামগন্ধহীন সাধুজীবনের আদর্শ। ইং ১৯১৬ সনে স্বামী তুরীয়ানন্দ আলমোড়া হইতে গুরু-ভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দকে তাঁহার পূর্ববঙ্গে প্রচার-কার্যের জন্য অভিনন্দিত করিয়া একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এবার ঢাকা খুলে গিয়ে সকলে জেনেছে—তুমি এক ভিন্ন আর কিছু জান না। একজন লিখেছে—'শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজের কাছে গেলে, পর থাকবার যো নেই; তিনি আপনার করে নেবেনই নেবেন।' প্রভু তৃণকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারেন। আর তোমাদের দ্বারা এই সব করাবেন, এর আর কোন সংশয় হতে পারে কি? তোমাদের দেহস্থিতি প্রভুর মহিমা-প্রচারের জন্য, ইহাতে ভুল কি? প্রভু ত আপনার কর্ম্ম আপনি করেন, তথাপি আধারবিশেষ দিয়ে উহা সম্পন্ন করেন—ইহা সিদ্ধান্তবাক্য। মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) অকাতরে কৃপাবিতরণ শুনে বড়ই আনন্দ হচ্ছে। ধন্য প্রভু, ধন্য তাঁর মহিমা।"

আশার আলোক

(Light of Hope)

স্বামী পরমানন্দ

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ওহে জীবনবল্লভ,
ওহে প্রেমিক দুর্লভ!
বসে আছি তব আশে দিন যায় রাত যায়,
তবু আশা মনে জাগে,
ভরসা যে অনুরাগে,
আশার আলোক তব গতি-পথ চেয়ে রয়।

ঘন সে তমসা রাতি
নিবে গেছে গৃহে বাতি
তবুও ভরসা আছে, তোমা পানে আঁখি ধায়।

যুগ যুগ ধরি হরি!
তোমারি চরণ স্মরি
থাকিব বসিয়া হেথা তোমারি আশায়।

অনুভূতি

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা বা চরম তত্ত্ব। তিনিই সকলের আদি, সমস্ত পদার্থের তিনিই কারণ। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ আর কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ কি একই? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বলছেন:

"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥"

দেবতাগণ পর্য্যন্ত আমার উৎপত্তি জানেন না, যোগী ঋষিমুনি তপস্বী মহর্ষিগণ পর্য্যন্ত জানেন না, কেন না আমি যে সকল দেবতা ও সকল মানুষের আদি, পরন্ত আমার আদিতে আর কেউ নেই। জন্মগ্রহণ আমার লীলাবিলাস, আকার আমার বিভূতি। আমি পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম। দ্বারকাতে এবং কুরুক্ষেত্রে আমি পূর্ণ, মথুরাতে পূর্ণতর নিত্য বৃন্দাবনে পূর্ণতম। সংসারে যারা অপূর্ণ তাদের পক্ষে পূর্ণত্বলাভ সম্ভব কি? আমি স্থূল, আমি দেহবিশিষ্ট, এ অবস্থায় আমার পক্ষে কি সূক্ষ্মত্ব-প্রাপ্তি সম্ভব? সাকারের পক্ষে নিরাকার রাজ্যে পৌঁছানো কি সম্ভব?

যিনি পূর্ণ বা পূর্ণতম, তিনি তো অপরিজ্ঞেয়, অচিন্তনীয়, এমন কি তিনি বাক্য ও মনের অতীত, অবাঙ্‌মনসোগোচর—ভাষা দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যায় না, চিন্তাদ্বারাও তাকে জানা যায় না; তাঁকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা কিরূপ সম্ভব? উত্তরে ভগবান্ বললেন:

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥"

আমি চরাচর নিখিল জগতের উৎপত্তিস্থল, আমা হ'তে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হয়—এই মনে করে ভক্তগণ প্রেমভাবে বিভোর হ'য়ে আমাকে ভজন করে।

"উৎপত্তি-কারণ আমি সবার নিশ্চিত,
আমা হ'তে সমুদয় হয় প্রবর্ত্তিত।
এ'প্রকার, জ্ঞাত হ'য়ে বুদ্ধিমানগণ।
প্রেমবান হ'য়ে মোরে করেন ভজন॥"

ভগবানের সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য ভাব লাভ করতে প্রধান সহায় ভক্তি। ভক্তির উৎস মন। আমাদের মন যদি পূর্ণকে চিন্তা করবার সংকল্প করে, তবে সেই মনের একটি বিশেষণ প্রয়োগ করতে হয়—সঙ্কল্পাত্মক (মন)। সেই মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণ পরমাত্মার উপরও বিশেষণ আরোপ করতে হয়—সসীম বা অসীম।

কিন্তু একের মধ্যে এই দুই বিশেষণ পরস্পর-বিরুদ্ধ। এই সসীম ও অসীমকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করায় জীবের ভিতরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত জ্ঞান বা চৈতন্য। সোজা কথায় অসীমকে আমরা সসীম দেখি এবং সসীমও অসীমত্ব লাভ করতে পারে এই বোধ ব্যবহার-ক্ষেত্রে নিত্যপ্রত্যক্ষ। এই বোধকে বলা যেতে পারে জীবচৈতন্য। এই চৈতন্যের বলেই মনের মধ্যে আসে সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের পর অনুভূতি (intuition)। অনুভূতি ও চৈতন্য তখন এক। জীবচৈতন্য ও পরমাত্ম-চৈতন্য অভিন্ন।

মনের সূক্ষ্ম অংশ অনুভূতি। পূর্ণ অজ্ঞেয় হ'লেও উহা এমন একটা পদার্থ যাহা প্রকৃত পক্ষে বাস্তব, সত্য বা সৎ। ইহা—ইদংশব্দের

বাচক—ইনি। আমিও নয় তুমিও নয়। (যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের অবিষয়); অর্থাৎ 'আমি' ও 'তুমি' উভয়ের বাইরে ইনি সৎ পদার্থ, সত্য। যেই মুহূর্ত্তে ইনি স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন তখন ইনি সাকার, সাবয়ব।

উপনিষদে পরম পদার্থকে সদ্‌রূপে প্রতিপন্ন করা হ'য়েছে। সৎপদার্থ চৈতন্যময়, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানময়, অধিকন্তু উহা আনন্দময় বা মঙ্গলময়। নিখিল জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁর অস্তিত্ব। কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে রাখাই তাঁর ধর্ম্ম। ধর্ম্মই তিনি। যে হেতু কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ পায় সেই হেতু তিনি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। এই ইচ্ছাবলে বা ঈক্ষাবলে একের মাঝে বহুর প্রকাশ।

'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।'

সেই একমাত্র পরম পুরুষ—ঈক্ষা করলেন,—বহু স্যাং—বহু হ'ব, প্রজায়েয়—জন্মগ্রহণ করব। 'সোঽকাময়ত, স লোকানসৃজৎ।' সেই পরমাত্মা—অকাময়ত, কামনা করলেন; তিনি লোক, সকলকে সৃষ্টি করলেন। উপনিষদের এই পূর্ব্বোক্ত বাণী পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তি ব্যক্ত করছে। এতে প্রকাশ পায় সূক্ষ্মের স্থূলত্ব-প্রাপ্তি বা অসীমের মাঝে সীমা। কবি তাই গেয়েছেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও মোহন সুর।"

যাহা ছিল বাক্য ও মনের অতীত, তাহা তখন স্থূল রাজ্যে শতধা ব্যাপ্ত—সহস্রধা বিস্তৃত, তখন কত না জীবজন্তু—প্রাণীর সৃষ্টি। প্রত্যেকের ভিতর পরমাত্মার অস্তিত্ব।

পরম পুরুষ অর্জ্জুনকে বললেন—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"

হে ধনঞ্জয়! জগতে আমার বাইরে কেউ নেই, কিছুই নেই, আবার ভেতরে আমি, আমার ভেতরে সব। তাই ভক্ত সাধক যে দিকে তাকান সেই দিকেই দেখেন আনন্দময় ভগবান্—

"জলে হরি স্থলে হরি সূর্য্যে হরি চন্দ্রে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল।"

'তাঁকে কখনো জানা যায় না' এই মতবাদকে অজ্ঞেয়বাদ বলা যেতে পারে। ধর্ম্মের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হয় তিনি আছেন, বিজ্ঞানের অনুশীলনেও প্রতিপন্ন হয় সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য-শক্তি বিদ্যমান। শাস্ত্রে তিনিই সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। কার্য্য-কারণ তত্ত্বের তাৎপর্য্য বুঝলে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের এই ঐক্য ধরা পড়ে, সৃষ্ট পদার্থসমূহ কার্য্য, সৃষ্টিকর্ত্তা হলেন কারণ। ভাষান্তরে বলতে হয়—"হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ।"—হরি ত জগদভিন্নতনু। হরিই জগৎ, জগৎই হরি, হরি ও জগৎ অভিন্ন। অর্থাৎ—হরির ভেতরে জগৎ অবস্থিত, জগতের ভেতরে হরি বিদ্যমান, কেন না নিমিত্তকারণরূপী হরি, উপাদানকারণ-রূপ জগতে মিশ্রিত হ'য়ে আছেন। এ যেন পুরুষে ও প্রকৃতিতে আলিঙ্গন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার যুগলমিলন।

পরিদৃশ্যমান জগৎ কার্য্য, যিনি দৃশ্যও নন অদৃশ্যও নন সেই পরমতত্ত্ব হ'লো সমস্ত জগতের কারণ। প্রথমেই বলা হ'য়েছে পরম-তত্ত্ব 'সর্ব্বকারণ-কারণ' স্থূল পদার্থ—ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু ও আকাশ; এদের মাত্রা হল গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ। জ্ঞানেন্দ্রিয় হল পাঁচ—নাসিকা রসনা চক্ষু চর্ম্ম ও শ্রবণ। উপরি উক্ত পনেরটি তত্ত্ব পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভূত; নাসিকা গ্রহণ করে পৃথিবীর গন্ধ, রসনা দ্বারা জলের রস, চক্ষুদ্বারা তেজের রূপ, চর্ম্মদ্বারা বায়ুর স্পর্শ এবং কর্ণের সাহায্যে আকাশস্থ শব্দের শ্রবণ। এই পনেরটির অতিরিক্ত পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়,

বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ। কর্ম্মযোগসিদ্ধির পক্ষে কর্ম্মেন্দ্রিয় হল সাধন। দশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন; মন ভক্তিযোগ-সাধনের সহায়। জ্ঞানযোগ-সাধনের সহায়ক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। আত্মাকে অবলম্বন পূর্ব্বক এই বাদের প্রবৃত্তি, তাই এর নাম অধ্যাত্মবাদ। সূক্ষ্ম আত্মার সঙ্গে সূক্ষ্ম মনের সংযোগ, তারপর মনের স্থূল অংশের সঙ্গে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, পরে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগ। বিষয়-দর্শনের পক্ষে মানবের স্থূল চক্ষুই শুধু কারণ নহে, এর কারণ স্থির মন, যেই মনের উপরে অপর কারণ আত্মা। এই জন্যে সমস্ত কারণের কারণ এই আত্মা। জীবের ভিতরে অবস্থিত আত্মা—জীবাত্মা, বিশ্ব-জগতে অবস্থিত আত্মা পরমাত্মা।

জন্মমৃত্যু-প্রবাহকে অতিক্রম করবার জন্যে সেই আত্মলাভ প্রয়োজন। বিক্ষিপ্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করলে, চঞ্চল মনকে অচঞ্চল করতে পারলে আত্মলাভ বা আত্মজ্ঞান সম্ভব, একেই বলা হয় আত্মদর্শন। দৃশ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। সেই জ্ঞানরাজ্যে অজ্ঞানের অস্তিত্ব নেই, আলোর রাজ্যে অন্ধকার নেই, আনন্দের দেশে নিরানন্দ নেই। শুধুই শান্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

লীলা-আস্বাদন

শ্রীশিবদাস সুর

পর্য্যটক সাধু এক ভ্রমিতে ভ্রমিতে
ক্রমে হয় উপনীত মহানগরীতে,
মধ্যাহ্নে লভিয়া স্থান অতিথিশালায়
পানাহার বিশ্রামান্তে দেখিবারে যায়—
রাজপথে সৌধমালা বিপণীর সারি
চলিছে বিচিত্রবেশে বহু পথচারী।
আমোদ-প্রমোদে মত্ত আনন্দ-মুখর
সাক্ষীর স্বরূপে সন্ত হেরিছে নগর।
হেনকালে সহযাত্রী তাহারে শুধায়—
'নিশ্চিন্তে ভ্রমিছ হেথা তল্পি কোথায় ?'
উত্তরিল হর্ষে সাধু—'ঠিক করি বাসা
তল্পি সেথা রেখে দেখি বিবিধ তামাসা।'

* * *

সর্ব্বত্যাগে ব্রহ্মজ্ঞান লভে যেই জন
তারি ভাগ্যে ঘটে সৃষ্টি-লীলা-আস্বাদন।*

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত অবলম্বনে।

গীতাঞ্জলির ভাবধারা

শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ, বি-কম্

১৩১৭ সাল হইতে ১৩২১ সালের ৩রা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সময়টা রবীন্দ্রনাথের নিরবচ্ছিন্ন গানের যুগ। কবি স্বয়ং তাঁহার জীবনের এই যুগটিকে 'গানের ক্ষণ' আখ্যা দিয়াছিলেন। এই সময়ে অন্য কোন লেখায় বিশেষ নিজেকে পরিকীর্ণ করেন নাই, একমনে একতারাতে একটি তারই বাজাইয়াছেন, নিজের আনন্দে বিভোর হইয়া পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে গানের অঞ্জলি দান করিয়াছেন।

কাব্যরূপে গানগুলি তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার চরম নিদর্শন। জগতে যে পুরস্কারের দ্বারা কবি বিশ্বসমাজে পরিচিত হইয়াছেন, Nobel Prize লাভ করিয়াছেন, সেই ইংরেজী গীতাঞ্জলি এই সময়েরই রচনা।

কবির মনে চিরকাল এক জন 'ভাব-উদাসী' বাস করিতেন। সংসারের অসংখ্য বন্ধন যখনই তাঁহাকে চারিপাশ হইতে গ্রাস করিতে আসিত, তখন গানের সুরের মধ্যে তিনি মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করিতেন। এই মুক্তি বন্ধন হইতে মুক্তি নয়, সংসার হইতে বৈরাগ্য নয়, রূপ রস গন্ধ বর্ণ হইতে বঞ্চনা নয়, প্রকৃতির, নরনারীর সৌন্দর্য্যকে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' উপভোগ করিয়াই তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন। এই রসনিবিষ্ট অবস্থাকে মরমী সাধক জনের জীবনের সঙ্গেও তুলনা করা চলে।

সূক্তি অর্থাৎ 'সু+উক্তি'র মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার গূঢ়তত্ত্ব বিশ্লেষণ আমাদের দেশের সাধকগণের চিরাচরিত সংস্কার। কবীর নানক, দাদূ, চণ্ডীদাস প্রমুখ সাধক কবিগণের ধারাতেই কবি এই যাত্রা সুরু করেন। Mystic সাধনা ঠারে ঠোরে—অর্থাৎ সাধারণের নিকট আপাতদৃষ্টিতে এক রস, অধিকারীর নিকট পরম রস, উৎকর্ষে সুন্দর কাব্যরূপ মাত্র, সাধনায় জীবন উৎসর্গ।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু সাধনায়, বহু আরাধনায় যে নিগূঢ় সম্বন্ধটি পরমপুরুষের সঙ্গে লাভ হইয়াছে, কবি সেই পুরাতন ভাবটিকে নবীন ভাষায় নিবেদন করিয়াছেন 'গীতাঞ্জলি'তে। বাংলায় অন্ত্যজ, অপরিচিত লৌকিক সাধনা ও তাঁহার ভাবধারায় স্থান পাইয়াছে।

গীতাঞ্জলির যুগে যে সাধনপথের সম্পূর্ণতা, তাহার সূচনা বহু পূর্ব্বেই 'নৈবেদ্য' কবিতার যুগে (১৩০৮ সালে)। নৈবেদ্যের কাব্যধারায়ই কবি তাঁহার প্রথম মনোলোকের সন্ধান পাইলেন। এই আধ্যাত্মিক মানস-যাত্রা পথের সূচনা—

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে!
করি যোড় কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে
কর্ম্ম-পারাবার পারে হে,
নিখিল জগৎ-জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—

নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে।
ওগো রাজরাজ একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

ইহাই 'গীতাঞ্জলি'র মূল সুর। গীতাঞ্জলির গানেও বলিয়াছেন—

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!

কিন্তু অরূপের দেখা তো এই ভাবে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব কবিরা যেমন নরনারীর বিরহ-মিলনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে রূপকের আশ্রয়ে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কবি প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের বৈচিত্র্যময় প্রকাশে সেই অপরূপের স্পর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মুক্তির সন্ধান, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বর্ণ-সমারোহে এই যে অসীম তৃপ্তি অনুভব, ইহাই কবির নিজস্ব ভাব। তিনি বলিয়াছেন—"হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরেজিতে যাহাকে emotion বলে, তাহা আমাদের হৃদয়ের আবেগ অর্থাৎ গতি; তাহার সহিত বিশ্ব-কম্পনের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, ধ্বনির সহিত, তাপের সহিত তাহার একটা স্পন্দনের যোগ, একটা সুরের মিল আছে; বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য-মাত্রই একটা অনির্দ্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়, মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরূপ ভাবকে অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলিয়া নাম দিয়া থাকেন।"

রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটিকে লাভ করেন বিহারীলালের কাব্য হইতে। সুদূরের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁহার গানের ধারার একটি মূল সুর—

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী।

বিশ্বজগতে যে সম্মিলিত সুরপ্রবাহ নদী-নদে, গিরি-গুহা-প্রান্তরে, ধাতু-বৈচিত্র্যে, ফুলে পল্লবে, বারিধারায়, নির্ঝরে বহিতেছে, কবির গানে তাহাও রূপ পাইয়াছে। কবি বলিয়াছেন—"সঙ্গীত ও সন্ধ্যাকাশের সূর্য্যাস্তচ্ছটা কত বার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব-জগতের হৃৎস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে; যে একটি অনির্বচনীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে, তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের কোনো যোগ নাই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সঙ্গীত ও সূর্য্যাস্ত কেন, যখন কোনো প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে, তখন তাহাও আমাদের সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয় তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশকালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মতো অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।"

আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সাধারণ সুখ-দুঃখের অতীত যে ভাবালোক, কবির বিচরণ এই যুগে সেইখানেই—পার্থিব জীবনের কলুষ হইতে মুক্ত। 'গীতালি'র অবসান হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক কাব্য বলাকায়। 'বলাকা'র নবদর্শন গতিবেগের সম্ভাবনায় স্তব্ধ গীতালির গানগুলি। এই যুগের সমস্ত কবিতাই 'গীতি-কবিতা'—কিন্তু সবগুলিই গান অর্থাৎ সুর-যোজিত নয়। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গান এখানে সম্মিলিত, গাহিবার জন্য সবগুলিকে নির্দিষ্ট না করা থাকিলেও প্রতিটিই গান বলাই শ্রেয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-সম্বন্ধে কবি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কাব্য-সম্বন্ধে সেই কথাই বলা চলে—"কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নয়, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুর-তালের অপেক্ষা রাখে—সেগুলি সাহিত্য-সমালোচকের অধিকার-বহির্ভূত। আর কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ—যাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করে। যদি চ সে গানগুলির মাধুর্য্যও সম্ভবতঃ সুর-সংযোগে অধিকতর পরিস্ফুটতা গভীরতা এবং নূতনত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি ভালো এনগ্রেভিং হইতে তাহার আদর্শ অয়েল পেণ্টিংয়ের সৌন্দর্য্য যেমন অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায় তেমনি কেবলমাত্র সেই সকল কবিতা হইতে গানের সমগ্র মাধুর্য্য আমরা মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে পারি।" ভগবানকে আপন ভাবে, তাঁহাকে দয়িতরূপে কল্পনা ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহার প্রেমাভিসারের চিত্র আঁকিয়াছেন। আমাদের ধর্ম্মে বলে—ভক্ত যেমন ভগবানের সঙ্গ কামনা করেন, ভগবানও তেমনি ভক্তের মধ্যে নিজেকে পাইতে চান—তাঁহার সার্থকতা ভক্তের, সাধকের তপস্যায়, সাধনায়—

তাই তোমার আনন্দ আমার'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

মঙ্গলকাব্যে জোর করিয়া পূজা আদায়ের যে রূপক কবিরা কল্পনা করিয়াছিলেন; বৈষ্ণব-গাথায় শ্রীমতীকে নানা দুঃখের মধ্য দিয়া যে যাইতে হইয়াছে—এই সবই সেই অসীমের তপস্যা। সেই অসীম যে সীমার নিবিড় সঙ্গ চান—কবি তাহাই গাহিয়াছেন। ভগবান ঝড়-বাদলের অন্ধকারে ভক্তের বাহির দুয়ারে অপেক্ষা করিতেছেন; 'বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে আপনি তুমি ছোটো হয়ে এস হৃদয়ে'—কবিরও তাহাই প্রার্থনা।

বেদনা দূতী গাহিছে, "ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে
প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।"

বৈষ্ণব-দর্শন বলে, ভগবান আনন্দের অতীত, তিনি নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার জন্য দ্বৈত হইয়াছেন, জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তের পেমে তিনি আনন্দকে অনুভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ভাবধারা তাহাই। প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্যে, দুঃখ-সুখের উচ্ছ্বাসে, আনন্দের উৎসে জীবনের সত্তাকে অনুভব করা হইয়াছে, লীলাময় সুন্দরের রূপময় প্রকাশ হইয়াছে।

সুদূরেরর জন্য যে বিরহ, যে আকুলতা; প্রিয়ের জন্য যে উদ্বেগ অশান্তি তাহার মধ্যেই একটি দুঃখ-অনুভূতির নিবিড় আনন্দ আছে—গীতিমাল্য-গীতালির গানে কবি তাহা অনুভব করিয়াছেন—

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহিরে মোর নাহি রে!
তাকিয়ে রব দ্বারের পানে,
সে তান খানি লইয়া কানে,
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে।

কখনও কখনও কোমলতা, দীনতা ছাড়িয়া উদ্দীপনার ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন, প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা সত্ত্বেও মূল সুরটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রশান্তি, তাঁহার সাধনা শান্ত রসের।

অল্প সময়েই তিনি নিজেকে ছাড়া অন্য জনের

কথাও ভাবিয়াছেন, দেশের দুঃখ-দৈন্য তাঁহার চিন্তায় আসিয়াছে, সঙ্গী দলকে আশ্বাস দিয়াছেন, উৎসাহিত করিয়াছেন—

আপনা হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া ;
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

অবশেষে মৃত্যুকে, শেষকে আগত জানিয়া স্বাগত জানাইয়াছেন, বিদায় চাহিয়াছেন—

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মা ভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

ভগবানের সঙ্গে আমাদের মিলনের একটি প্রধান অন্তরায় অহংকার, এই দম্ভের দুর্গের অভ্যন্তর হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আকুলতা কবিকে ব্যাকুল করিয়াছে।

অহংকার যে পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্ত ভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—

'গীতাঞ্জলি'তে যে দূরত্ব ছিল, যে বাধা-বিপত্তি ছিল, 'গীতিমাল্যে' তাহা অনেকটা দূর হইয়াছে। কবির সঙ্গে মহারাজার সম্বন্ধ তো কেবল সুরেই—গান ছাড়া আর তো কোন সম্বলই তাঁহার নাই—

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বস্‌ব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে।
বল্‌ব বিনা ভাষায়,
বল্‌ব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে।

'গীতালি'তে কবি জানিয়াছেন এই যে দুঃখ-আঘাতের অজস্র ধারায় আমাদের জীবন বিব্রত,—এই সবই তাঁহার খেলা, আমাদের দুঃখ দিয়া ছলনাই তাঁহার উদ্দেশ্য—দুঃখকে ভয় করিবার কিছুই নাই, এই যে মস্ত বড় সান্ত্বনা—

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।

* * *

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

এই গানের যুগে কবি কোথাও সুরের কৌশল দেখাইতে চাহেন নাই, কোথাও বিজ্ঞানের ভারে কাব্যকে অযথা ভারাক্রান্ত করেন নাই, ব্রহ্মসঙ্গীতের যুগের রাগিণী-বৈশিষ্ট্য, ছন্দোবৈচিত্র্য সবই কবি বর্জন করিয়াছেন। অধিকাংশ গানে মিশ্র রাগিণীতে সহজ সুরে সহজ ছন্দে গভীর ভাবের কথাই বলিয়াছেন।

সর্বশেষে তৃপ্ত হইয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' যে তীর্থদেবতা ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিয়া বিশ্ববাসীকেও কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন—

যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত।
যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছে মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

বিরহ-মিলন

শ্রীমতী মলিনা

জগতের বিরহ-মিলন যা তুমি করেছ সৃষ্টি,
ওগো মহাকাল অসীম রহস্যময় !
যেথায় ব্যথার অশ্রু হয়েছে সঞ্চয়,
নীরবে আবরি আছে জলদের জাল
বাজিছে সে সিন্ধুনীরে তরঙ্গ ভয়াল
তারি তীরে বসে তুমি যাপিয়াছ কত নিশিদিন,
হয়ে সতীহারা।
দেখিয়াছে সে দহন আকাশের প্রতি গ্রহতারা,
দেখিয়াছে বিশ্বের মানব, দেখিয়াছে দেবগণ,
হয়েছে বিস্মিত যবে হল সমুদ্র-মন্থন
হলাহল করিলে গ্রহণ।
কণ্ঠ হল গাঢ় নীল টলিলে না তুমি এক তিল,
হে অটল পারনি সহিতে তবু বিরহ সতীর,
স্কন্ধে লয়ে দেহভার উন্মাদ অধীর
যজ্ঞ করি ছারখার ছুটেছিলে লক্ষ্যহীন।
গেল দিন
রাত্রি এল ফিরে প্রলয় ঘোষণা হল
উন্মত্ত সমীরে।
বিষ্ণুনিদ্রা টুটে গেল চক্রধারী দাঁড়ালেন আসি
সুদর্শন চক্র হাতে লয়ে,
হেরিলেন শঙ্করের ব্যথা কি বিস্ময়ে !
তারপর কোন শুভ মুহূর্ত্তের মাঝে নির্ব্বাপিত হয়
ক্রোধরাশি।
আনন্দিত দেবগণ গায় গান স্বর্গের আবাসে,
আকাশে উছলি উঠে সুধাস্নিগ্ধ চন্দ্রমার হাসি
বাতাসে শান্তির কথা কয়ে যায় ধীরে,
কুলায়ে জাগিছে পাখী প্রভাতের তীরে।

ধ্যানমগ্ন শিবেরে ঘিরিয়া
কত দিন বর্ষ মাস চলেছে ফিরিয়া।
নাহি জানে কেহ, অকস্মাৎ গিরিরাজ গৃহ হতে-
আনন্দের ধ্বনি
ভরিল ধরণী
কন্যা-রূপে জন্ম নিল দেবী মহামায়া।
তপস্যায় ক্ষীণতম কায়া।
বল্কল ভূষণ তার ঘন মেঘ কেশভার
লুটে ভূমি পরে
অরণ্যের অন্ধকারে ভ্রমিছেন কার লাগি
সানন্দ অন্তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেবী হেরিলেন অরণ্যের
গহন গভীরে,
ধ্যানমগ্ন মহাশিব শিরে তাঁর লক্ষ ফণী ঘিরে।
অযুত সূর্য্যের আলো ম্লান হয় অনন্তের
তনুর প্রভায়,
অধরের কোণে হাসি জটাজুট পড়ে খসি
আনন্দে মগন তিনি অরণ্য-সভায়।
সেই শুভলগ্নে দেবী কণ্ঠ হতে কমলের মালা
পরালেন শিবের গলায়,
স্বর্গের গবাক্ষগুলি একে একে গেল খুলি,
হেরিবারে মিলন-লীলায়।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের উপদেশ

শ্রী—

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ ১৯২৯ সালের ২৬শে মে সেবা-বিষয়ে বলিলেন, "যার সেবা করবি তার কিসে সুখ হয়, তাই লক্ষ্য রাখবি। তার যে সময় যা দরকার তা না চাইলেও তাকে জিজ্ঞেস করে দিবি। তাকে সর্বদা যত্ন করবি; তবে ত যথার্থ সেবা করা হবে।"

কাহারও সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা সম্বন্ধে বলিলেন, "কোন লোকের সম্পর্কে ভাল বা মন্দ মত প্রকাশ করার সময় তাকে প্রত্যক্ষ দেখে যে রকম তোমার মনে হয় তাই বলবে। খবরদার! লোকের মুখে শুনে এক জনের উপর খারাপ ধারণা রাখবে না। যতটুকু দেখবে—তার বেশি বলবে না।"

২৯শে মে সন্ধ্যারতির সময় তিনি ঠাকুর-মন্দিরে যেয়ে আরতির পর—

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনির্নমোঽস্তু তে॥"

এই গায়ত্রী-আবাহনটি তিনবার উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং ভাল করিয়া ভজন করাইলেন। ভজনের পর সকলে তাঁহার কাছে বসিলে বলিতে লাগিলেন, "সন্ধ্যাবেলা হরিবোল বলা যে কত ভাল তা ঠাকুরই বলে গিয়েছেন। তিনি বলতেন, যেমন নানা দেশের নানা রকম পাখী সন্ধ্যাবেলায় একটি গাছের উপর বসিয়া কল্‌কল্‌ করছে, সেই গাছের তলায় গিয়ে যেমনি হাততালি দেবে অমনি সব পাখী উড়ে যাবে, সেই রকম মনরূপ গাছে চিন্তারূপ নানা পাখী সারা দিন কল্‌কল্‌ করছে, সন্ধ্যাবেলা হাততালি দিয়ে হরিবোল করলে বিষয়চিন্তা চলে গিয়ে শ্রীভগবানকে মনে পড়ে; এই জন্যে সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বাললেই 'হরিবোল হরিবোল' করতে হয় এবং হাততালি দিতে হয়।"

৩১শে মে মহারাজ অনেক পূর্বকথা বলিলেন, "আহা, তমালগাছ কেমন কালো। ঠাকুরের সময় আমাদের কি ভাবই ছিল! তমালগাছ দেখলে ভাবে বিভোর হয়ে যেতাম। কুমারটুলিতে এক জনের বাড়ীতে একটি তমালগাছ ছিল, মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম। ঠাকুরের কাছে ঐ তমাল-সম্বন্ধে কত গানই হত, আর আমরা ভাবে ভরপুর হয়ে যেতাম, ঠাকুরেরও সমাধি হয়ে যেত।

গান

শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়
সম্মুখে তমাল তরু ধরিবারে ধায়।
আহা, কৃষ্ণ কালো তমাল কালো
তাই, তমাল বড় ভালবাসি।

কি মধুর ভাবের সব গান! [এক দিন ঠাকুর খাবার পর শুয়েছেন, স্বামীজিও আর এক জায়গায় শুয়েছিলেন, বাঁয়াতে একটি টোকা দিয়ে গান ধরেছি—'এস এস বঁধু, এস.... নয়ন ভরিয়া দেখি।' স্বামীজি উঠে পড়লেন, বললেন, 'তুই আমাকে আর শুতে দিলি নি। ভিতরটা কেমন করে উঠেছে!' ঠাকুরও তাঁর ঘরে ভাবে বিভোর! আজকাল এসব

কীর্তন হলে অনেকে হাসে। সে সব দিন আর নেই। এক দিন সন্ধ্যাবেলা মঠের বারান্দায় বসে আছি—গঙ্গায় সন্ধ্যারতির ধূপধুনা দেবামাত্র 'হরিবোল হরিবোল' বলেছি, এমন সময় বাবুরাম মহারাজ হরিনাম শুনেই দুবাহু তুলে নৃত্য আরম্ভ করলেন। তারপর একে একে মঠের সকলে তাঁকে ঘিরে হরিনামে মত্ত হয়ে 'হরিবোল হরিবোল' করে নাচতে লাগল।"

১লা জুন। জনৈক ব্রহ্মচারী তাহার করণীয় কাজ কিছুক্ষণ করিয়া উহা আর এক জনের হাতে দিয়া চলিয়া যায়। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "তোমাদের পক্ষে সেবা করা ভাল। সাধু হতে এসেছ, সেবা করবে না ত কি? আর কাতর হওয়াটা কি জান? ব্রহ্মচর্যের অভাব। যে বীর্যধারণ করে, যার ওজোধাতু আছে—তার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। সে চাঁদ পেড়ে আনতে পারে, সূর্য পেড়ে আনতে পারে। যার বীর্যক্ষয় হয়েছে—সে ত কিছুই করতে পারে না, তার ক্ষমতা আর কতটুকু? দেখছ ত আমাদের (ঠাকুরের সন্তানদের) এখনও পর্যন্ত খাটবার ক্ষমতা! যদি শরীরটা ভাল থাকত তা হ'লে এই বুড়ো বয়সেই দেখিয়ে দিতাম—এখনও মনের মধ্যে যে সব ভাব আছে তা তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। জানি, এই ভাব পূর্ণ করতে আবার আসতে হবে; ঠাকুর আবার পাঠাতে পারেন।

"ছোট বেলায় ওজোধাতুক্ষয় হয়ে থাকে ত কোন ভাবনা নেই; এখন ঠাকুরের শ্রীচরণে এসে পড়েছ—এখন আর নয়। যত তুমি বীর্যধারণ করতে পারবে—তত তোমার শক্তি-বৃদ্ধি হবে এবং আত্মদর্শনলাভ করবার ক্ষমতা আসবে। আত্মার শক্তিতে কাজ করবে, আত্মা অনন্ত শক্তির আধার।

"একটু কাজ করেই ভাববে না যে, আমি একটা কিছু করে ফেলেছি। তা হলে তুমি ছোট হয়ে যাবে। যত তুমি মনে করবে আমি কিছুই করি নি, ততই তোমার শক্তিবৃদ্ধি হবে। শরীর মন সর্বদা পবিত্র রাখবে। তবেই শক্তি বাড়বে। ছোট ছেলেদের অপরাধ ভগবানের খাতায় লেখা থাকে না। তাদের পাপ পুণ্য তিনি দেখেন না। ছোটছেলেরা বড় পবিত্র।

"সেবা করতে হলে খুব ধৈর্য থাকা চাই, নইলে সে সেবা করতে পারে না। সেবা কি যে সে করতে পারে? যার পূর্ব জন্মের পুণ্য থাকে সেই সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করে এবং ঠিক ঠিক সেবা করতে পারে।"

৪ঠা জুন। "জপ সব সময় করা চলে। ভগবানের নাম সব সময় করা চলে মনে মনে। সব সময় জপ করতে পারো। ঠাকুরের কথায় আছে—পাখী উড়ে যেতে যেতে ভগবানের নাম করছে। * * খুব সরল হ'বি, কুটিল হবি না। যত সরল হ'বি তত তোর হৃদয় প্রশস্ত হবে। সব বিষয়ে খোলাখুলি ব্যবহার করবি। ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ করবি না। খোলাখুলি ব্যবহার খুব ভাল। যে মানুষ যত সরল তার অন্তর তত পবিত্র। সর্বদা শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র থাকবার চেষ্টা করবি। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করবি। এই আশ্রম আগে একটা পোড়ো বাড়ীতে ছিল, তখন বাড়ীটি এমন ছবির মত সাজিয়ে রাখতাম যে রেশমকুঠীর সাহেবরা দেখতে এসে খুব খুসি হ'ত, বলতো—'স্বামীজি, তুমি এই ভাঙ্গা বাড়ীটা এমন ভাবে সাজিয়ে রাখো ঠিক যেন ছবির মত। সাহেববাচ্চা কিনা তাই ও সব বোঝে!

"আমি খুব পবিত্র ভাব ভালবাসি। তাই

দেখ না ঠাকুর সেই ছোট বেলায় আমাকে হিমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কেমন পবিত্র স্থান, সব সময় ফুল ফুটে আছে! প্রকৃতি দেবী যেন হাসছেন! অমন পবিত্র স্থান কি আর আছে? সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। আমি ত আসতাম না। ভ্রমণ করতে করতে কাশ্মীরে এসে পড়লাম। সেখানে স্বামীজির চিঠি পেলাম। তখন স্বামীজিকে ও আর আর গুরু-ভাইদের দেখবার খুব ইচ্ছা হওয়ায় এলাম, না হলে আর ফিরতাম না, ঐ খানেই থেকে যেতাম।"

১৫ই জুন। "তোমরা ভাল হতে ঠাকুরের জায়গায় এসেছ! এজন্য ভাবতে হবে 'কিসে আমরা ভাল হবো'। ভাল হতে চেষ্টা করতে হবে, তবে ত শান্তি পাবে? যখন দেখবে একজনের কথায় খুব রাগ হবে, তখন তার উপর রাগ না করে তাকে আরো বেশি ভালবাসবার চেষ্টা করবে। তুমি রাগছ না দেখে সে তোমাকে আর রাগাতে পারবে না। এই রকম করে চরিত্রগঠন করতে চেষ্টা কর, তবে ত ঠাকুরের স্থানে শান্তি পাবে। সেবা যদি আপনা হতে কর তবে তা বড় মিষ্টি লাগে। যে সেবা বলে বলে করাতে হয়—সে ত জোর করে করানো। খুব ব্রহ্মচর্যের জোর থাকলে তবে ধৈর্য ধরে সেবা করতে পারে। খুব সহ্যগুণ থাকা চাই। সহ্যগুণ না থাকলে আর সাধু কিসের? খুব সহ্য করতে অভ্যাস করবে, সহ্য না করলে কিছুই হবে না।"

২৬শে জুন। "হৃদয় না থাকলে কিছু হবে না। হৃদয়ের স্ফুরণ হওয়া চাই, তা যদি না হয় ত কিছুই হবে না। চোখ বুজে বসে থাকলে কিছুই হবে না, ওতে ঠাকুরকে পাবি না। তাইতেই যদি হ'ত তা হলে আমরা হিমালয়ের নানান জায়গায় সাধনা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতাম।

"ঠাকুর নিজে আমাদের চোখ বুজে ধ্যান করতে শিখিয়েছিলেন, তাই তিব্বতে গিয়েছিলাম ধ্যান করতে। আবার দেখ, ঠাকুর কোথায় এনে ফেলেছেন। এখন যে তোদের নিয়ে সংসার করছি, এতে আমার কি স্বার্থ আছে?

"হৃদয় দরকার, হৃদয় না থাকলে চোখ বুজে বসে থাকলে কিছুই হবে না। এ যুগে যদি তাই হ'ত, তা হলে আমরা আর এমন কর্ম আরম্ভ করতাম না। দশ জনের জন্য প্রাণ কাঁদা চাই। দশ জনের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া চাই, তবে ঠাকুরকে পাবি। যদি কারো হৃদয় আছে দেখতেন, তা হলে স্বামীজি তার হাজার দোষ ক্ষমা করতেন।"

১১শে জুলাই, আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিন মহারাজ বলিলেন, "আজ গুরু ও ব্যাসদেবের পূজার দিন। গুরুকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়।" আজ সকালে তিনি ঠাকুরমন্দিরে গিয়া প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ জপ করিলেন এবং পরে নীচে নামিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঘরে বালি করকর করছে, ঝাঁট দেওয়া হয় না নাকি?" জনৈক সেবক বলিল, "ঝাঁট দেওয়া হয়েছে, তবে পায়ে পায়ে আবার বালি গিয়েছে।" উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুর সেবা তন-মন-ধন দিয়ে করতে হয়। শুধু বসে বসে জপ করলে হবে না। একটু 'তন' দিয়েও ঠাকুরের সেবা কর, যতক্ষণ বসো তার অর্ধেক সময় ব'সে আর অর্ধেকটা দিয়ে ঠাকুরের মন্দির ঝাঁট দিও, এতে ভাল হবে। আর শুধু বসে থেকে কি ফল? এই ত দেখি কথায় কথায় রেগে ওঠ, মনে সর্বদা রাগ গজ্ গজ্ করছে—এত ঠাকুরঘরে বসার ফল কি এই রাগ? ঠাকুর বলতেন, সিদ্ধ হওয়া কি না নরম হওয়া, আলু পটল সিদ্ধ হলে যেমন হয়। নির্বিকার থাকবে, সব অবস্থাতেই শান্ত ভাব ঠিক রাখা চাই।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী এম্-এ, সাহিত্যবিনোদ

সুভাষচন্দ্র এক সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দই আধুনিক বাংলার স্রষ্টা এবং বাংলার জাতীয় জাগরণের ঋত্বিক হিসাবে একমাত্র তাঁহারই নাম করা যাইতে পারে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এই রকমের পূর্ণাঙ্গ মানুষ—যিনি ত্যাগে বেহিসাবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন ও জ্ঞানে সদা ভাস্বর—আমাদের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

জাতীয় আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের নিকট জীবন্ত আদর্শরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। আদর্শজীবন-গঠনের প্রেরণা তিনি স্বামীজীর জীবনাদর্শের মধ্যেই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছিলেন, "আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন ছাত্রমহলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণসমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। এ কথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্য-সমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তাহার মনোবৃত্তিও তদ্রূপ গড়িয়া ওঠে। চরিত্র-গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।"

যে তেজ, বীর্যবত্তা, দেশপ্রেম তথা মানবপ্রেমের প্রকট আদর্শ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—যে আদর্শের প্রেরণায় নবীন বাংলার প্রাণস্পন্দন জাগিয়াছিল, যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশসেবায় ও জনসেবায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের ফকির হইয়াছিলেন—তাহারই যেন শেষ পরিণতি নেতাজী সুভাষ। সুভাষচন্দ্রের জীবনে যে নিষ্কাম কর্মের অভিব্যক্তি তাহা স্পষ্টতঃই স্বামীজীর প্রভাবের ফল। "The Queen of my heart is Motherland"—স্বামীজীর এই উপলব্ধিকে যেন বাস্তবে পরিণত করিবার জন্যই সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয়। স্বামীজীর শিক্ষা ও সমাজ-গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সুভাষচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণীয়: ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জাতীয়-শিক্ষাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য একান্ত নিষ্ঠার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র। বাংলা দেশের এই প্রচেষ্টাকে স্বয়ং গান্ধীজিও প্রশংসার চক্ষে দেখেন নাই। গান্ধীজি এই জাতীয় শিক্ষালয়ের উদ্বোধন-ভাষণে বলিয়াছিলেন যে এইরূপ শিক্ষার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। অথচ জাতি গঠনের মূল কথাই জাতীয় শিক্ষা। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় নাই—তাহা দেশেরই দুর্ভাগ্য। সুভাষচন্দ্র জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে যে শিক্ষা-প্রণালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোনমতেই জাতীয় শিক্ষা

হইতে পারে না। আজ যদি গভর্নমেণ্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্কও না থাকিত, তবু এই বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারিতাম না।" জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন: "আমাদের এই শিক্ষায় যে মানুষ গড়িয়া উঠিবে, সে সত্যকে আশ্রয় করিবে, আনন্দকে লাভ করিবে, প্রকৃতিকে মাতৃপদে বরণ করিবে, দেশকে ভালবাসিবে, বিশ্বমানবকে পরমাত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিবে।" পরবর্তী কালে পূর্ব-এশিয়ায় আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনায় তিনি অনুরূপ আদর্শের পরিচয় দিয়াছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ হইতে প্রচারিত 'Religious Instructions' হইতে জানা যায় যে নেতাজীর শিক্ষাবিভাগীয় পরিকল্পনায় পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা সর্বপ্রথম দৈহিক স্বাস্থ্য ও চরিত্র-গঠনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল অনেক বেশী। এ শিক্ষার আদর্শ ছিল—'মানুষ হও'। ভারতের সর্বজাতির মিলনই ছিল এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। সুভাষচন্দ্রের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ আজ বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ অশেষ দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। শিক্ষামন্দিরের মধ্যেও যে কালোবাজারী কারবার চলিয়াছে, তাহার ফল ভবিষ্যৎ বংশধরের উপর গিয়া কিরূপ বর্তাইবে তাহা বর্তমানের শিক্ষার কুফল দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। প্রকৃত শিক্ষার ভিতর দিয়াই জাতির অভ্যুত্থান ও অগ্রগতি। স্বামীজীরও আদর্শ ছিল প্রকৃত মানুষ গড়া। তিনি বলিতেন: Man-making is my mission—মানুষ গড়াই আমার ব্রত। দেশে যদি সত্যিকার মানুষ তৈরী হয়, তবে সংগঠনের কাজে বিলম্ব হয় না। সেইজন্য তিনি বলিতেন—কতকগুলি তথ্য কণ্ঠস্থ করার মানে শিক্ষা নহে—মনুষ্যত্বের উদ্বোধনেই শিক্ষার সার্থকতা। সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর আদর্শ-অনুসরণে এই কথাই উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—যাহা প্রকৃত শিক্ষা তাহাই জাতীয় শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার মত—জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় আদর্শ, জাতীয় ধর্ম ও সমাজ-নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নূতন প্রণালীর প্রবর্তন।

স্বামীজীর অভ্যুদয় হইয়াছিল এক যুগ-সন্ধিক্ষণে। আত্মবিস্মৃত জাতি যখন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার মোহে আপন সত্তা ভুলিতে বসিয়াছিল, স্বামীজী তাঁহার উদাত্ত আহ্বানে জাগাইয়া তুলিলেন সেই মোহগ্রস্ত জাতিকে। কণ্ঠে তাঁহার অমোঘ বাণী বজ্র-নির্ঘোষে ধ্বনিত হইল: "বল দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"—দেশাত্মবোধের জ্বলন্ত বিগ্রহ ছিলেন স্বামীজী। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়—"সত্যের সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ, জাতির ও মানবসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত।" দেশের ও দশের জন্য নিয়োজিত-প্রাণ মহাপুরুষের জীবন-মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র। স্বামীজীর দরিদ্রনারায়ণ সেবার আদর্শ তাঁহার মনে কী প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, 'তরুণের স্বপ্নে'র নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়: "অন্তর থেকে যে কর্মশক্তি আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে, যে নৈতিক বল আমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত করবে, সেই শক্তি, সেই বলকে আহুতির অগ্নির মত চির কালের জন্য উদ্দীপ্ত রাখতে হবে। আশা চাই, উৎসাহ চাই, সহানুভূতি চাই, প্রেম চাই, অনুকম্পা চাই, সবার উপর মানুষ হওয়া চাই। মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠাই

আমাদের সাধনা। জীবনব্যাপী এই সাধনার মধ্যেই আমাদের মুক্তি—নান্যঃ পন্থাঃ।"

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের কথার কথা ছিল না। তরুণের স্বপ্নকে তিনি নিজ সাধনার দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শক্তি ও বীর্যবত্তার সাধক ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এই বীর্যবত্তার প্রেরণা তিনি স্বামীজীর জীবনাদর্শের মধ্যেই লাভ করিয়াছিলেন। এই বীর্য-সাধনার দ্বারা নেতাজী বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। যে সংঘ ও সংগঠনশক্তির কথা স্বামীজী বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—সেই সংগঠন-শক্তির আশ্চর্য সফলতা সুভাষচন্দ্র স্বীয় জীবনে প্রকট করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র স্বামীজী-প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন: "স্বামীজী ছিলেন মনে প্রাণে সংগ্রামী—সেই জন্যই তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক, তিনি তাই দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'শক্তি' 'শক্তি' 'শক্তির কথাই' উপনিষদ বলেছেন—স্বামীজী এই কথাই বরাবর বলিয়া গিয়াছেন।"

ব্যক্তিগত জীবনেই হউক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক—দুর্বলতাই পরাজয়ের হেতু। স্বামীজী বলিতেন—'If there is a sin in the world, it is weakness, weakness is sin, weakness is death.'—যদি পৃথিবীতে পাপ বলিয়া কিছু থাকে তাহা দুর্বলতা—দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতাই মৃত্যু। সুভাষচন্দ্র নিজ জীবনে এই বীর্যের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের এই 'অভয় মন্ত্রই' ছাত্রজীবন হইতেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁহাকে অতি-নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিল। ছাত্র-জীবনে অন্যায়ের প্রতিরোধে এই নির্ভীকতার পরিচয় দিতে গিয়াই তিনি কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতাই তাঁহার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই নির্ভীক আদর্শ চরিত্রের মানুষটিই বৃটিশ সিংহের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীক চরিত্র ও পুরুষকারের জন্য বিরুদ্ধদল সব সময় সংকুচিত হইয়া থাকিত, এ কথা বলা আদৌ অন্যায় হইবে না। সুভাষচন্দ্রের মতে রাজনৈতিক দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে শুধু দূরদর্শিতা নয়, দুর্দ্ধর্ষ চরিত্রবত্তারও প্রয়োজন—তাহা না হইলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই শক্তি, তেজও দূরদর্শিতার আধার ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি দেশের সামনে যে কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয় দেয়। ভয় ও সংকোচপ্রবণতার জন্যই দেশ সেই কর্মসূচী তখন গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই শাণিত বুদ্ধি, কর্ম-উদ্দীপনা ও সংগঠন-শক্তির ক্ষেত্র স্বামীজী বহু পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাঁহার সংগঠন-কার্যক্রম ও সংঘগঠনের ভিতর দিয়া। সুভাষচন্দ্র সংগঠনের উপর সবিশেষ জোর দিয়াই বলিয়াছেন: "আমাদের অভাব উপযুক্ত সংঘের। সংঘের মধ্যে সামরিক কঠোরতা আনিতে হইবে। কঠিন নিয়মানুবর্তিতার উপর যদি গাড়িয়া ওঠে তবে ঐ সংঘ অটল হইয়া সকল প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারিবে।....ভবিষ্যতে আমাদের এমন একটি আদর্শ সংঘ গঠন করিতে হইবে যে একদিকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকিবে, এবং অপরদিকে সংঘের ভিতর সকল ব্যক্তির মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও অধিকার থাকিবে। স্বাধীন চিন্তার বিরোধিতা ও পরমত-অসহিষ্ণুতা আমাদের চরিত্রের মহৎ দোষ।" স্বামীজী স্বাধীন চিন্তা প্রসারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি বলিতেন—একটা বড় গাছের আওতায় অন্য একটি বড় গাছ কখনও বাড়তে পারে না। সেইজন্য তিনি নিজের শিষ্যদিগকেও অধিককাল

নিজের কাছে রাখিতেন না। স্বামীজীর চরিত্রের এই দিক্‌টি সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন—পরের যুগের মহান ব্যক্তিদের সংগে তাঁহার কতখানি প্রভেদ। এই বিশিষ্টতার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে নেতাজী নিজ জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী প্রত্যক্ষ ভাবে কোন রাজনীতি প্রচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বাণীর মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা আজ আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি যে ভারতীয়তার প্রচার করিয়াছেন তাহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ-নীতি বা সমাজনীতি। তিনি যে সমাজ-জীবনের ভাবধারা পোষণ করিতেন, তাহা উদার মানব-ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত, বৈদান্তিক সাম্যবাদের প্রভাবে তাহা উজ্জ্বল। আমরা যে অর্থে Cultural State-এই কথাটি ব্যবহার করি তাহাই তাঁহার লক্ষ্য বস্তু ছিল। ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত জাগ্রত দৃষ্টি ছিল বলিয়াই জাতীয়তাবোধকে তিনি সাংস্কৃতিক মিলনের মধ্যে সংহত করিতে চাহিতেন। তাই তিনি বলিয়াছেন —"অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ হইতে ঐতিহ্য-মণ্ডিত ভারতের সমস্যা জটিলতর। জাতীয় বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী এই সমুদায় লইয়াই একটি জাতি গঠিত। যদি একটি জাতি লইয়া এই জাতির সহিত তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, অন্যান্য জাতি যে যে উপাদানে গঠিত, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক। আর্য, দ্রাবিড়, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইউরোপীয়—যেন জগতের সকল জাতির শোণিত এদেশে রহিয়াছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ —আর আচার-ব্যবহারে দুইটি ভারতীয় শাখা জাতির যে প্রভেদ ইউরোপীয় ও প্রাচ্যজাতির মধ্যে তত প্রভেদ নাই। কেবল আমাদের পবিত্র পরম্পরাগত উপদেশ, আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মেলন-ভূমি—এই ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় জীবনের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই এই ঐক্যের সূত্র। অতএব ভাবী ভারতগঠনে ধর্মের ঐক্য-সাধন অনিবার্য-রূপে প্রয়োজনীয়।....আমাদের সম্প্রদায়সমূহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে, আর ঐ গুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্যের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে।....আর আমরা চাই—আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক। —সকলেই সেইগুলি জানুক, বুঝুক আর নিজেদের জীবনে পরিণত করার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রধান কার্য। আমরা জানি ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই নাই—ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর ইহাও আমরা জানি, আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য করিতে সমর্থ।"

ভারতের ঐতিহ্যই তাহার প্রাণ-সম্পদ। এই ঐতিহ্যকে বাদ দিয়া ভারত কখনও পূর্ণাঙ্গ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বামীজী ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি নির্ভীক পৌরুষের সহিত ভারতের অধ্যাত্মসত্তাকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিয়াছেন: "When the life-blood is strong, no disease germ can live in that body. Our life blood is spirituality. If it flows clear, if it flows strong, pure and vigorous, everything is right; political, social, and any-

other material defects, even the poverty of the land will all be cured if that blood is pure."—ইহাই স্বামীজীর বলিষ্ঠ জীবনবাদ। যদি আমাদের আপন ঘরের ভিত্তি দৃঢ় হয় তবে বাহিরের শত আঘাতেও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ভারত বহু বাধাবিপত্তি স্বীকার করিয়া আজিও সগৌরবে বাঁচিয়া আছে ইহাই তাহার প্রাণধর্মের পরিচয়। ভারতের এই টিকিয়া থাকিবার অসাধারণ শক্তি তাহার অধ্যাত্ম-জীবন প্রেরণার মূলেই নিহিত। আমাদের উপর মধ্যে মধ্যে দুর্যোগের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে—সেই সম্পর্কে স্বামীজী বলিয়াছেন যে তাহারও প্রয়োজন ছিল। সেই অবনতি হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। ভারতধর্ম কাহাকেও আঘাত করে নাই, গ্রহীষ্ণুতাই তাহার স্বধর্ম, বিরোধের মধ্যে ঐক্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়ই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এই গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা—এই উন্মেষশালিনী প্রতিভা, ভারতকে যুগে যুগে নূতন দৃষ্টিদান করিয়া নূতনকে বরণ করিবার সামর্থ্য দিয়াছে। ভারতের এই আশ্চর্য শক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন স্বামীজী—তাই তিনি যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া দেশের প্রতি সাবধানী বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে আমরা পাশ্চাত্যের শিল্প-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিব কিন্তু ভারতীয়তাকে বর্জন করিয়া নয়। তাঁহার উপদেশের সার কথা—"Make a European society with Indian background."—তাই স্বামীজী এই জীবনবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন—"It would not be possible for this country to give up her characteristic courage of religious life and take up for herself a new career of politics or something else. You can only work under the law of least resistance and this religious line is the line of life, this is the line of growth and this is the line of well-being in Bharat to follow the track of religion."—সেইজন্যই এই দেশের মাটিতে জাতীয় আদর্শকে বাদ দিয়া পাশ্চাত্যের কোন রাজনীতিক মতবাদই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতিকে অন্তর দিয়া অনুভব করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পাশ্চাত্যের কোন মতবাদকে মূলতঃ গ্রহণ করিতে নারাজ ছিলেন। অধ্যাত্ম-জীবনকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র বস্তুবাদকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী তিনি কোন কালেই ছিলেন না। তাঁহার জীবন-স্বীকৃতির মধ্যে জাতীয়তার একটি সামগ্রিক উপলব্ধি দেখিতে পাই, সেইজন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্যের আদর্শ আমাদের আদর্শ নহে। বস্তুবাদ ও অধ্যাত্ম-সাধনার সমন্বয়ই আমাদের বর্তমানের আদর্শ। "To strike the golden mean between the demands of spirit and matter of the soul and of the body and thereby progress simultaneously on both fronts."—নেতাজীর মতে ধর্মের আতিশয্য বা বস্তুবাদের আতিশয্যের দিকটাই মারাত্মক। এইজন্য তিনি গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ ও ফ্যাসি-বাদের বিরোধী ছিলেন, কারণ উক্ত মতবাদগুলি বিশেষ বিশেষ একটি আতিশয্যেরই প্রতীক—সেইজন্য সমগ্র জীবন-স্বীকৃতির বিরোধী। তিনি তাঁহার বিখ্যাত Indian Struggle গ্রন্থে যে অর্থে সাম্যবাদ কথাটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কোন বিশিষ্ট মতবাদ নহে—সমন্বয়

অর্থেই তিনি সাম্যবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সাম্যবাদ অর্থে তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি বহুস্থানে বক্তৃতায় একটি কথারই বারবার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন: "India will have to work out her own methods and adapt herself to her environment and to her special needs."—কারণ ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যেই তাহার যে স্বকীয়তা রহিয়া গিয়াছে—তাহা কখনই কোন মতবাদকে নির্বিচারে গ্রহণ করে নাই—এবং অন্ধ অনুকরণের দ্বারা কোন প্রকারেই তাহার মঙ্গল হইতে পারে না। সেইজন্যই তিনি ভারতবর্ষকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে মস্কোর আদর্শ ভারতের আদর্শ নহে। ইহা ভারতের স্বকীয়তার বিরোধী—প্রাণধর্ম্মের বিরোধী। "I should therefore strike a note of warning to those who may feel tempted to follow blindly the tenets of Bolshevism."—(Naojiwan Bharat Sabha Speech, 1931) "We should not surrender to the dictates of Amsterdam or Moscow."—(TUC Speech, 1931). ভারতের পক্ষে কী ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হইতে পারে তাহারই নির্দেশ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"What we in India would like to have is a progress in system which will fulfil the social needs of the people and will be based on the national sentiment. In other words it will be a synthesis of nationalism and socialism. (—Tokyo Speech, 1934)

স্বামীজীর মতই নেতাজীও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ধর্মই ভারতের প্রাণশক্তি এবং এই প্রাণশক্তি-জাগরণের দ্বারাই স্বল্পতম বাধার পথে আমরা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব। বহু অনৈক্যের মধ্যে ভারতবর্ষ এই অধ্যাত্ম-শক্তির দ্বারাই ঐক্যের পথ প্রস্তুত করিয়াছে। নেতাজী স্বীকার করেন যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিই ভারতের ঐক্যের মিলনসেতু। "The most important cementing factor has been the Hindu religion."—হিন্দুরা যে অর্থে ধর্ম কথাটি ব্যবহার করে তাহা ঠিক ইংরেজীর religion কথাটির ভাবদ্যোতক নহে। ধর্ম অর্থে সমগ্র-জীবন-সাধনাকেই হিন্দুরা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্যই হিন্দুধর্মের ঔদার্য ও গ্রহীষ্ণুতা সকলকেই আপন করিয়া লইতে পারে—এইজন্যই ভারতের রাষ্ট্রনীতি ভারতীয় জীবন-সাধনকে বাদ দিয়া স্বয়ম্ভূ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্যই সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি * করিয়া বলিয়াছেন: "India of the past lives in the present, and will live on in the future....We want to build up a new and a modern nation on the basis of our old culture and civilisation." এই অধ্যাত্ম-সাধনাকে ত্যাগ করিলে ভারত আপন সত্তা হারাইয়া একদিন বিরুদ্ধ ভাবের তরঙ্গে অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতকে বিশ্বজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার উপদেশ স্বামীজী কিংবা নেতাজী কেহই দান করেন নাই।

* "আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমাণ। তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাসবলে, সেই অতীত মহত্ত্বের জ্বলন্ত ধারণা হইতেই, পূর্বে যাহা ছিল, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে।"—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতবর্ষে যখনই সংকোচ-প্রবণতা ও আত্ম-প্রসারণের অভাব দেখা দিয়াছে, তখনই তাহার দুর্দশার সূত্রপাত হইয়াছে। সেইজন্যই আমাদের ঐতিহ্য-সম্পদ সত্ত্বেও আমরা তাহার প্রকৃত ব্যবহারে ব্যর্থ হইয়াছি—কতকগুলি সংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়া নৈতিক অবনতিকে আহ্বান করিয়াছি। স্বামীজী ইহা অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাই স্বাধীন চিন্তার তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন—এবং সেই স্বাধীন ও উদার চিন্তার পরিপোষণের জন্য আন্তর্জাতিকতার বাণী আমাদের মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বকেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে—নতুবা বিশ্বপ্রগতির পথ হইতে আমাদের স্খলিত হইতে বিলম্ব হইবে না। স্বামীজী বলিতেন: "It is becoming everyday clearer that the solution of any problem can never be attained on racial or national or narrow grounds." নেতাজী এই সত্যটি গভীর ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই স্বাধীনতা-সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সাহায্য গ্রহণ করাকে তিনি অসমীচীন মনে করেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে বর্তমান যুগে অন্যান্য দেশের সহানুভূতি ব্যতীত কোন এক পরাধীন জাতির পক্ষে পরাধীনতার বন্ধন মুক্ত করা এক প্রকার অসম্ভব। সেইজন্যই ভারতবাসীর ঘরে বাহিরে সর্বস্থানে একসঙ্গে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইতে হইবে—এই মত তিনি শুধু প্রচার নহে, নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের আজাদ হিন্দ ফৌজ তাঁহার এই নীতির পরিচায়ক! শুধু তাহাই নহে, জাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁহার 'Indian Struggle' গ্রন্থে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন—তাহাতেও তাঁহার আন্তর্জাতিক ভাবধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ভারত গঠনে এমন একটি শক্তিশালী দলের প্রয়োজন, যে দল ভারতের সংকোচ-প্রবণতাকে ঘুচাইয়া বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবে—ভারতের ভাগ্য আজ বিশ্ব-মানবের ভাগ্যের সহিত জড়িত—এই দৃঢ় প্রত্যয় আজ পোষণ করিতে হইবে।

আজ ভারতের নানাবিধ সংকটের মধ্যে স্বামীজী ও নেতাজীর আদর্শ যত প্রচারিত হয় ততই কল্যাণের পথ মুক্ত হইবে॥

জাগরণ

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, কাব্যতীর্থ-শাস্ত্রী

মেঘবরণ হরিল চিত্ত
বিজলী-বীণার তারে,
নীলনিবিড় নবীন আঁখি
দেয় ডাক বারে বারে।

নৃত্য পাগল পবন পরশে
বক্ষ ভরিল মোর।
সোনার কিরণে কাটিল কুহেলি
ভেঙে গেল ঘুমঘোর।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কথা

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৯২৫ খৃঃ, ১৬ জুলাই, রবিবার। এখনকার মত বাসের প্রচলন না থাকায় তখন বেলুড় মঠে যাওয়ার তত সুবিধা ছিল না। কলিকাতা হইতে ষ্টীমারযোগেই আমরা বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতাম। বৈকালে ষ্টীমারে সু—বাবুকে সঙ্গে লইয়া বেলুড় মঠে পৌছিলাম। শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী তখন পুরাতন মঠবাড়ীর দোতলার উত্তরদিকের বড় ঘরটিতে ছিলেন।

আমরা উভয়েই মহারাজকে প্রণাম করিতে উপরে গেলাম। তখন মহাপুরুষজী জনৈক ভক্তের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। শুনিয়া বুঝিলাম lightning conductor (বিজলী-দণ্ড) সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কি—বাবুর বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গে উক্ত কথোপ-কথন হইতেছিল। সেই ছেলেটি কি—বাবুর ভুবনেশ্বরের বাড়ীতে কি ভাবে বাজ পড়িল, কি ভাবে তাঁদের চাকরের মৃত্যু হইল ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রায় ১৫।২০ মিনিট বলিয়া গেল। এমন সময় আমাদের ভ— বাবু আসিয়া মহা-রাজকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপুরুষজী তাঁহার কুশলাদি ও কাজকর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাপুরুষ— তুমি কি পড়াও?

ভ- বাবু— Physics পড়াই I. Sc Class এ।

মহাপুরুষ— B. Sc পড়াও না?

ভ- বাবু— এখনও B. Sc. Class খোলা হয় নি। আশু বাবু মারা গেলেন, তাই আমাদের আশা-ভরসা গেল। তিনি থাকলে সব এতদিনে হয়ে যেত। মহারাজ, আমরা পূর্বে বুঝতে পারি নি তিনি কি ছিলেন। এমন perso-nality বড় দেখা যায় না।

মহাপুরুষ— নিশ্চয়ই তিনি খুবই বড় ছিলেন! তা না হ'লে এত লোক কেন মানবে তাঁকে?

ভ- বাবু— দেখুন মহারাজ, আমাদের দেশের কি অদৃষ্ট। এই সি আর দাশ মারা গেলেন। এ দেশের বড় বড় লোক বেশী দিন থাকেন না। পাশ্চাত্যে বড় লোক প্রায়ই ৭০ বৎসরের পূর্ব্বে মারা যান না। যেরূপ দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় শীঘ্রই যেন দেশ মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে।

মহাপুরুষ— তা নয়। আবার এমন এমন লোক জন্মাবেন। মার ইচ্ছা নয় যে এই দেশ এই ভাবে উৎসন্ন যায়, আমার ত মনে হয় না। তাঁর ইচ্ছাতেই এ সব হচ্ছে। তিনি কাকেও political দিকে বড় করে তুলেন, কাকেও Science-এ ইত্যাদি, কিন্তু শক্তি ত মার নিকট হতেই সব আসছে। তবে এতদিন একটা শক্তিতে কাজ হচ্ছিল। এক জনের ভিতর দিয়ে এখন তা না হ'য়ে সকলের ভেতর দিয়ে সেই ভাবে কাজ হবে। এখন সকল দেশেই সাড়া পড়ে গেছে। ভারতের মঙ্গল হবেই। চৈতন্য-শক্তির বিকাশ হচ্ছে—তবে ধীরে ধীরে।

এমন সময় জ—বাবু তাঁহার বন্ধু দ— বাবুর

সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণামান্তে বন্ধুকে মহাপুরুষজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

দ— বাবু—মহারাজ, সংসারে সদ্ভাবে থেকে যদি কেহ ভগবান লাভ করতে চায় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন বাধা দেয়, তখন সে তাঁদের ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে সাধন-ভজন করবে কি?

মহাপুরুষ— কখনো না। বরং যাঁরা বাধা দেন তাঁদের নিয়ে ধর্ম্ম করবে—যাতে তাঁদেরও ভগবানে মতিগতি হয় এ চেষ্টা করবে। কারণ তুমি যদি বাইরে গিয়ে ধর্ম্মলাভ কর, তবে তাহা তোমার নিজেরই হ'ল। অন্যের তাতে কি লাভ হবে? সেজন্য বলছি, সকলে মিলে একটা সময়নির্দ্দেশ করে সকালে হোক, বৈকালে হোক, ভগবানের নাম করা উচিত। সংসার অনিত্য। সংসার যে অনিত্য এ বিষয়ে রোজই একবার ভাবা উচিত। মনে মনে ভাববে—এইত বেশ চলছে, কিন্তু এভাবে ত চিরদিন চলবে না। তবেই মনে বিবেক, বৈরাগ্য আসবে, ভগবানকে মনে পড়বে। কোথাও দেখতে পাই নে যে একটা familyতে (পরিবারে) একটা সময়নির্দ্দেশ করে ভগবানের নাম কচ্ছে। কেবল, বাজে বকছে।

দ-বাবু— মহারাজ, তাঁকে ডাকতে হলে সময়ের দরকার, নানা বাধা-বিঘ্নও পড়ে। এমন অবস্থায় তাঁকে কি করে ডাকব?

মহাপুরুষ— তুমি কি বলছ? সময় নেই, বাধাবিঘ্ন! যদি ইচ্ছা থাকে তবে নিশ্চয়ই হয়। তোমাদের খাওয়া-দাওয়া, শয়ন প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, আর কি না ভগবানকে ডাকতে পাঁচ মিনিট সময়ও পাও না! এ কি কথা? বিঘ্ন যা বলছ, তা'ত আছেই এবং থাকবে। তা' কখনও যায় না। এই সব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই struggle (সংগ্রাম) করতে হবে। তাতেই life (জীবন) তৈরী হয়ে যাবে। যেখানে বাধা নেই সেখানে lifeও (জীবন) নেই।

দ-বাবু— মহারাজ, বাড়ীতে এমন অবস্থা যে একজন যদি জপ-ধ্যান করে তবে সে যাতে তা' না করতে পারে, অন্যান্য সকলে সে ভাবে তাকে কষ্ট দেয়। এমন অবস্থায় অন্যত্র থাকা সঙ্গত কি?

মহাপুরুষ— শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করতে হয়। বাড়ীতে এ বিষয়ে কিছু বলতে নেই; মধ্যে মধ্যে ৩।৪ দিন অন্যত্র গিয়ে সাধন-ভজন করে আসবে।

দ-বাবু— হাঁ, তা বটে, কিন্তু তারা খবর পেলে আবার যন্ত্রণা দেয়। এ অবস্থায় ভগবানের দিকে কি করে যাওয়া যায়?

মহাপুরুষ—(একটু বিরক্ত হইয়া) আপনার মাথার মধ্যে এ সব idea (ভাব) রয়েছে। যদি বাস্তবিক আপনার আন্তরিকতা থাকে, তা হ'লে ভগবান নিশ্চয়ই পথ করে দিবেন। God helps those who help themselves. (যাদের চেষ্টা ও আত্ম-নির্ভর রয়েছে ভগবান তাদের সাহায্য করেন)—আমরা ইহা বেশ জানি।

দ-বাবু— মহারাজ, এখানে থাকবার কোন উপায় হয় কি?

মহাপুরুষ— না, কারণ এখানে জায়গা নেই।

দ-বাবু— আমাদের খরচ আমরা নিজেরাই চালিয়ে নেব।

মহাপুরুষ— না. এখন এমন কোন বন্দোবস্ত হয় নি।

দ-বাবু— এখানে একটা College (মহাবিদ্যালয়) হলে বেশ হয়।

মহাপুরুষ— তা হবে, যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয়। আমাদের কাজ slow but sure (ধীর কিন্তু নিশ্চিত)। দেখতেই পাচ্ছ কাজ কি ভাবে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে! আমাদের

কোন লোক পর্য্যন্ত যেখানে যায় নি, সেখানেও centre (প্রচারকেন্দ্র) হয়ে গেছে।

দ-বাবু—(তার ছোট ছেলেটিকে দেখাইয়া) একে আশীর্ব্বাদ করুন, মহারাজ।

মহাপুরুষ—তা হবে। এখন এরা শিশু। এরা ধর্ম্মের কি বুঝে? এখন বাবা মাকেই ওরা জানে। তাঁরাই ওদের গুরু। ছেলেদের বাবারা যদি ভাল হয়, তবে ছেলেরাও ক্রমে ভাল হবে। বাপকে যদি ছোটবেলা থেকে সাধন-ভজন করতে দেখে, তবে ছেলেরাও তাই শেখে।

হঠাৎ গঙ্গার উপরে নৌকা দেখিয়া মহারাজ বলিয়া উঠিলেন—"এ বছর ইলিশ মাছ পড়ে নি। বৃষ্টি না হলে হয় না। যাক, ওদেরও পরমায়ু।" উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

মহাপুরুষ—এদেশে যে লোকে মাছ খায়, তা একবার মনেও ভাবে না যে এর দরুন একটা জীবের প্রাণ নষ্ট হয়। পশ্চিম দেশে এটা হবার জো নেই; সেখানে মাছ খেলে আর রক্ষা নেই। অবশ্য যদি কাঁরও ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁর পক্ষে কোন খাদ্যই চলে না, কারণ তখন তিনি vegetable (শাকসব্জী)-এর মধ্যেও life (জীবন) দেখতে পান।

তারপর এক ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহারাজকে দু'খানা গানের বই উপহার দিলেন। উক্ত ভদ্রলোক সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে কাজ করেন। মহারাজ গান পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"বেশ হয়েছে।"

ঐতিহাসিক মহামানব শ্রীকৃষ্ণ

(দ্বিতীয় প্রস্তাব) *

সাহাজী

তৃতীয় কৃষ্ণ সূর্যবংশীয় হর্যশ্ব-নন্দন যদুর পুত্র মাধবের বংশধর (৩৭-৩৮ বিষ্ণু, হরিবংশ)। দ্বিতীয় কৃষ্ণ চন্দ্রবংশীয় যযাতি-নন্দন যদুর পুত্র ক্রোষ্টুর বংশধর। (১২-১৫।৪ বিষ্ণু; ৩৬-৩৯ হরি, হরিবংশ; ৯৬ বায়ু; ৪৫-৪৬ মৎস; ৬৯ পূর্ব, লিংগ; ২৪ পূর্ব, কূর্ম)। মহাভারতে (১৪৭ অনু)'ও দেখা যায়, যযাতির পুত্র যদু হইতে ক্রোষ্টার, ক্রোষ্টা হইতে চিত্ররথের জন্ম, সেই চিত্ররথের পবিত্র বংশে শূরের, শূর হইতে বসুদেবের এবং বসুদেব হইতে বাসুদেবের (কৃষ্ণ) উৎপত্তি। কিন্তু প্রথম কৃষ্ণ যে চন্দ্রবংশীয় যযাতি-নন্দন যদুর পুত্র সহস্রজিতের বংশধর,

* গত ভাদ্রের উদ্বোধনে 'ঐতিহাসিক মহামানব শ্রীকৃষ্ণ' প্রকাশিত হয়; উহা পাঠ করিয়া অনেকেই আমাকে অনেক প্রকার প্রশ্ন করিয়া পাঠান। সেই কারণেই এই দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহার মধ্যে তাঁহারা স্ব স্ব প্রশ্নের উত্তর পাইবেন আশা করি।—লেখক

কোনও পুরাণেই সে কথার স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নাই। বিষ্ণু (১১।৪) পুরাণে আছে, যদুর পুত্র সহস্রজিতের বংশে মধুর জন্ম এবং মধুর বৃষ্ণিপ্রমুখ বহু পুত্র; কিন্তু হরিবংশে (৩৩) দেখা যায়, মধুর বহু পুত্র; তন্মধ্যে বৃষণ প্রধান। বৃষ্ণিগণ তাঁহারই সন্তান। এই পার্থক্য মারাত্মক নয়।

যদু, মধু এবং বৃষ্ণির বংশধর বলিয়াই কৃষ্ণ প্রমুখের যাদব, মাধব এবং বার্ষ্ণেয় খ্যাতি। এই বিষয়ে উভয় পুরাণই একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হরিবংশের সহস্রজিদ্‌বংশবর্ণন-প্রসংগে বসুদেবের উল্লেখ থাকিলেও—কৃষ্ণের কিন্তু নাম-গন্ধও নাই। যযাতি-নন্দন যদুর স্বনামধন্য দুইটি পুত্র, সহস্রজিৎ এবং ক্রোষ্টু; তন্মধ্যে সহস্রজিদ্‌-বংশপ্রসংগের সূত্রপাত উক্ত পুরাণের ৩৩শ অধ্যায় হইতে; পক্ষান্তরে ক্রোষ্টুবংশ-প্রসংগের সূত্রপাত আবার ৩৬শ অধ্যায় হইতে। মধ্যবর্তী ৩৪শ অধ্যায়ের ক্রোষ্টু যে তাহা হইলে সহস্রজিৎ বংশীয় ক্রোষ্টু, সুতরাং স্বতন্ত্র আরেক জন ক্রোষ্টু, সে কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ক্রোষ্টু কে, সেখানে তাহার স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নাই। তবে, ৩৩শ এবং ৩৪শ অধ্যায় দুইটি মিলাইয়া পড়িলে মনে হয়, বৃষ্ণির পুত্রগণের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁহার বংশতালিকাটি নিম্নোক্তরূপ এবং উহার মধ্যে বন্ধনীযুক্ত নামগুলি বসাইয়া লইলে বেশ মিলিয়াও যায়:

প্রথম কৃষ্ণ যে সহস্রজিতের বংশধর, উক্ত তালিকা হইতেই সে কথার প্রতিপত্তি হয়।

৩৪শ অধ্যায়টি মনোযোগ পূর্বক অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, অনমিত্র দুইজন—ক্রোষ্টুর পুত্র অনমিত্র এবং বৃষ্ণির কনিষ্ঠ পুত্র অনমিত্র। সুতরাং যুধাজিৎও অনুমান হয় দুইজন—ক্রোষ্টুর পুত্র যুধাজিৎ এবং বৃষ্ণির পুত্র যুধাজিৎ। উভয়ত্র হেবর ডেবর হইয়া যাওয়া সেইজন্যই অন্যায় নয়। পরবর্তী সংকলিত তালিকাটি হইতে সে কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়।

ঐ তালিকা দৃষ্টে জানা যায়, প্রথম কৃষ্ণ প্রথম কংসের পিতৃষ্বসার পুত্র (২২, ২৮ বিষ্ণু, হরি-

বংশ)। ঐ পিতৃষ্বসার নাম দেবকী (৪ বিষ্ণু, হরিবংশ)। কংস শূরসেনের (রাজ্য) অধিপতি (১।১০ ভাগবত; ৩৪ বিষ্ণু, হরিবংশ)। শূরসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাঁহার ঐ রাজ্যের নাম শূরসেন হয়। শূরসেন কৃষ্ণের পিতামহ (১৪।৪ বিষ্ণু) ইহা হইতেই বুঝা যায়, কংস বসুদেবের পৈতৃক রাজ্য কাড়িয়া নেন। ফলে, বসুদেবকে তখন গোবর্ধন গিরিতে গিয়া ঐ দুর্বৃত্তের করদ হইয়া বাস করিতে হয় (৫৫ হরি, হরিবংশ)।

অন্ধক উগ্রসেনের পিতামহ (২৩ বিষ্ণু, হরিবংশ)। ঐ অন্ধক আবার যুধাজিতের পুত্র (৩৪ হরি, হরিবংশ)। আহুকের আহুকান্ধক খ্যাতি লক্ষ্য করিবার মতন (৯৬ বায়ু)। উহা হইতেই বুঝা যায়, ঐ আহুক অন্ধকের পুত্র।

কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু যে বৃষ্ণিকুলোদ্ভব মৎস (৪৭) পুরাণের 'নষ্টে ধর্মে তথা জজ্ঞে বিষ্ণুর্বৃষ্ণিকুলে প্রভুঃ' ইত্যাদি উক্তিই সে কথার প্রমাণ। মধু যদুর স্বনামধন্য বংশধর; মধুর বৃষ্ণিপ্রমুখ শতপুত্র; ঐ বৃষ্ণি এবং মধুই যদুবংশের বৃষ্ণি এবং মধু সংজ্ঞার কারণ (১১।৪ বিষ্ণু)। মানব বিষ্ণু কৃষ্ণ ঐ মধু এবং ঐ বৃষ্ণিরই বংশধর এবং সেইজন্যই তাঁহার মাধব ও বার্ষ্ণেয় খ্যাতি। অথচ, কী আশ্চর্যের বিষয়! বৃষ্ণি এবং মধুর ঐ প্রসিদ্ধি যে প্রথম কৃষ্ণের জন্য, পুরাণকারেরা সে কথা একদম ভুলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ একাধিক, সে কথা ভুলিয়া গেলে ঐরূপ হওয়া স্বাভাবিক। তিনটি ভারতযুদ্ধের মধ্যে ঘটনার বৈচিত্র্যে দ্বিতীয়টি যেমন সর্বপ্রধান, তিন জন কৃষ্ণের মধ্যে কীর্তি-বাহুল্যে ক্রোষ্টুর বংশধর দ্বিতীয় কৃষ্ণও তেমনি সমধিক প্রসিদ্ধ। অপর দুই জনের কীর্তি তাঁহাতে আরোপিত হওয়া সেইজন্যই অন্যায় নয়। দ্বিতীয় কৃষ্ণের তুলনায় অপর দুই জন কৃষ্ণ যে কতকটা অস্পষ্ট, উহাই তাহার কারণ। সেই জন্যই হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে ক্রোষ্টুর বংশবর্ণন-প্রসংগ ভিন্ন কী সহস্রজিৎ, কী হর্যশ্ব, অন্য কারুরই বংশবর্ণন-প্রসংগে কৃষ্ণের নামগন্ধও নাই এবং না থাকিবারই কথা, কেন না, কৃষ্ণ একাধিক, পুরাণকারেরা সে কথা আমাদিগকে জানিতে দিতে রাজী নন—তাহাতে তাঁহার মনুষ্যত্ব সমধিক প্রকটিত হইয়া পড়ে বলিয়া! কথাটা সেইজন্যই তাঁহারা ঘুরাইয়া বলিবার পক্ষপাতী—একই কৃষ্ণ একাধিক বার, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বার, জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এইমাত্র। সহস্রজিৎ এবং হর্যশ্ববংশ বর্ণনপ্রসংগে বসুদেবের উল্লেখ থাকিলেও কৃষ্ণের উল্লেখ যে আমরা দেখিতে পাই না উহাই তাহার কারণ।

যাহা হোক, মৎস্য (৪৭) পুরাণকারের আরেকটি শ্লোকও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। সূতের প্রতি ঋষিদের প্রশ্ন:

আদির্দেবস্তথা বিষ্ণুঃ
ব্রহ্মক্ষত্রেষু শান্তেষু কিমর্থমিহ জায়তে॥
যদর্থমিহ সম্ভূতো বিষ্ণুর্বৃষ্ণ্যন্ধকোত্তমঃ।
পুনঃ পুনর্মনুষ্যেষু তন্নঃ প্রব্রূহি পৃচ্ছতাম্॥

শ্রীরামচন্দ্র প্রমুখের প্রচেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ মিটিয়া যায়। সুতরাং অতঃপর বিষ্ণুর আর অবতীর্ণ হইবার কারণ দেখা যায় না। আর, যদিই বা দেখা গিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই গুরুতর কারণ কী, যাহার জন্য বৃষ্ণি অন্ধক-বংশীয় বিষ্ণুকে (কৃষ্ণ) এক বার নয়, একাধিক-বার 'পুনঃ পুনঃ' মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল? ইহাই ঋষিদের প্রশ্ন। কৃষ্ণ যে বৃষ্ণি-অন্ধকবংশীয় এবং একাধিক বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঋষিদের ঐ প্রশ্নই কি তাঁহার প্রমাণ নয়? কিন্তু শুধু কৃষ্ণের নয়, তাঁহার প্রপিতামহ দেবমীঢ়ুষেরও পুনর্জন্ম হইয়াছিল, দেখা যায় (১ বায়ু; ১ ব্রহ্মাণ্ড)।

সমালোচনা

জপসূত্রম্—শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিত। প্রথম খণ্ড। প্রকাশক—কালীপদ মৈত্র, ৭৭ যতীনদাস রোড, কলিকাতা-২৯। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ২৭৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲ মাত্র।

এই পুস্তকে শ্রদ্ধেয় স্বামীজি জপবিজ্ঞান ও জপরহস্যের সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং তদুপরি প্রগাঢ় অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন। এই পুস্তকখানি তাঁহার ঐই পরিচয় আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জপবিজ্ঞান-সম্বন্ধে এইরূপ পুস্তক পূর্ব্বে কখনও পড়ি নাই। সংস্কৃত ও বাংলায় এইরূপ গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। পাণ্ডিত্য ও সাধনাপ্লুত জ্ঞান এই পুস্তকের মহিমা বর্দ্ধিত করিয়াছে। যাঁহারা সাধক এবং সাধন-বিজ্ঞানের রহস্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এই পুস্তক হইতে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ করা উচিত।

এই গ্রন্থে এত কথা আছে যে উহার সুবিস্তৃত সমালোচনা সাধারণরূপে সম্ভব নয়। দর্শন ও বিজ্ঞানে গভীরজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া এই পুস্তক পাঠ করিলে যথার্থ আনন্দ ভোগ করা যায়। ইহাতে মন্ত্র লইয়া বিচার আরম্ভ হইয়াছে। স্বাভাবিক শব্দ ও মন্ত্রের ভেদনির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে স্বামীজি মনে করেন—মানুষের অনুভূতি এত সূক্ষ্ম হইতে পারে যে, মানুষ মন্ত্রের সূক্ষ্মতম স্পন্দন পর্য্যন্ত আপনা হইতে গ্রহণ করিতে, এমন কি তন্মাত্রগুলি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পারে। দিব্য প্রত্যক্ষে এই জগৎ সুবিশাল ও ব্যাপক। সাধনার এক অবস্থায় এই জগতের পরিচয় হয়। এই জগতের পরিচয়ে বিশ্বের সূক্ষ্ম অবস্থা প্রতিভাত হইয়া থাকে। শব্দের মৌলিক স্পন্দনই শব্দব্রহ্ম। এই মৌলিক স্পন্দন হইতে সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি। ব্রহ্মের মৌন অবস্থা অশব্দ অবস্থা। তাহার উপরেই শব্দের চাঞ্চল্য, বাণীর প্রথমা মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিই প্রণব।

শব্দের সহিত অর্থের এত নিকট সম্বন্ধ যে শব্দের সহিতই অর্থের প্রকাশ হয়। এইরূপ শব্দ নিরতিশয় শব্দ। বিশুদ্ধ শব্দ হইলেই সে অর্থরূপে প্রকাশিত হইবেই। এই নিরতিশয় শব্দ দিব্য কর্ণেই গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, এই নিরতিশয় শব্দগুলি বিজ্ঞান-কোষে অভিব্যক্ত। তন্ত্রের যত বীজমন্ত্র সকলই এই নিরতিশয় শব্দ। এইজন্য বীজমন্ত্রের মধ্যে ঘনীভূত শক্তি। বীজমন্ত্রে সাধকেরা স্থূল, সূক্ষ্ম জগৎকে অতিক্রম করিয়া একটা নবীন অভিজ্ঞতার জগতে উপস্থিত হন।

শব্দের পাঁচটি স্তর—অশব্দ, পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ, স্থূলশব্দ। সাধারণতঃ স্থূল শব্দ লইয়াই আমরা থাকি। যোগে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ শব্দতন্মাত্রে প্রবিষ্ট হন। যোগীরাই এই সূক্ষ্মশব্দ জগতে সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজ লাভ করেন। পাতঞ্জল দর্শন এই ভাবে যোগীদের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ব কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপে যোগজ বিভূতির পূর্ণ বিকাশ হয়। ঈশ্বর পরমযোগী। নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য দ্বারা যাহা শব্দরূপে গৃহীত হয় তাহাই বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্রের শক্তি অদ্ভুত। ইহার স্পন্দনে আধার আপনি প্রস্তুত

হয়। সাধারণতঃ এই শক্তি সুপ্ত থাকে। মন্ত্রচৈতন্য দ্বারা এই শক্তি জাগাইতে হয় এবং জপের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য হইয়া থাকে।

যোগীর দৃষ্টিতে এই শক্তি-প্রকাশের নানা স্তর আছে। এই স্তরগুলি সাধারণতঃ ষট্‌চক্র নামে অভিহিত। ষট্‌চক্রের এক এক স্তরে বিরাটের ছন্দ স্বয়ং অনুভূত হয়। পৃথ্বী, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই তত্ত্বগুলি মন্ত্র-শক্তিতে জাগ্রত হয় এবং কারণস্তরে চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে।

মন্ত্রচ্ছন্দে অনেক সূক্ষ্ম ও অশুভ সংস্কার শিথিল হইয়া যায়। জপে দুই প্রকার ছন্দেরই বিচার করিতে হয়। মিত্রচ্ছন্দ ও অরিচ্ছন্দ জপের ফলে এইগুলি জাগ্রত হয়। পাপ পুরুষ বিতাড়িত ও বহির্গত হয় এবং বিজ্ঞান ও আনন্দের ছন্দ খুলিয়া যায়। এখানেই সত্তার রূপান্তর আরম্ভ হয়। মধুর ছন্দে সত্তা উদ্বেল হইয়া বিশ্বে সর্ব্বত্র মধুময় দৃষ্টি উপস্থাপিত করে। আলোক মধু, পবন মধু, ভুবন মধু, সবই মধুময় হইয়া উঠে। মন্ত্রের ছন্দে জীবনের সমস্ত কিছুই মধুময় হয়। এইরূপ হইতে হইতে জীবনের গভীর স্তরে শরণাগতি জাগিয়া উঠে। এই শরণাগতি আসিলেই জীবনের চরম অর্ঘ্যদান এবং তখনই কৃপাঘন মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। ইহাই এই গ্রন্থের সার কথা।

ইহা ভিন্ন এই পুস্তকে এরূপ অনেক বিষয় আছে যাহা পাঠককে মন্ত্রবিশ্বাসে, গুরুভক্তিতে ও ইষ্টনিষ্ঠায় উদ্বোধিত করে। এই মন্ত্র-শক্তি শুধু ভাবই উদ্বোধিত করে না, ক্রমে ক্রমে জ্ঞানে পৌঁছাইয়া দেয়। প্রত্যেক মন্ত্রটিতে ক্রিয়া, ভাব ও জ্ঞান অনুস্যূত। এই মন্ত্রচ্ছন্দ ক্রমশঃ ক্রিয়া ও ভাবের স্তর অতিক্রম করিয়া শান্ত আত্মায় প্রতিষ্ঠিত করে। মন্ত্র শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মানুভূতিতে পৌঁছাইয়া দেয়। বৈষ্ণবেরা মন্ত্রের ভিতর রসচ্ছন্দ দেখিতে পান। কিন্তু মন্ত্রচ্ছন্দ সমস্ত ভাবকে অতিক্রম করিয়া শান্তজ্ঞানে পূর্ণ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সৃষ্টির কোন ছন্দই এখানে জাগে না। জ্ঞানময় শিবস্বরূপে-দ্বন্দ্বাতীত চিদানন্দ রসে প্রতিষ্ঠিত করে।

পুস্তকে সংস্কৃত শ্লোকভাগে জপের এই সকল কথা আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে গভীর সাধনার সত্য প্রকাশ পাইয়াছে।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলেও চিত্তের মলিনতা অবশ্যম্ভাবী রূপে বিদূরিত এবং নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা এবং পূর্ণ সত্ত্বশুদ্ধির বিকাশ হইবে।

(ডক্টর) শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

ভারতশিল্পে মূর্ত্তি—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ৬২ সংখ্যক গ্রন্থ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১, সচিত্র, মূল্য আট আনা।

এই প্রবন্ধ ১৩২০ সালে 'প্রবাসী'তে ধারা-বাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। ইহা বহু পূর্ব্বেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বাংলায় ইহা এত দিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বিশ্বভারতী ইহার পনর্ম্মুদ্রণ করিয়া শিল্পামোদীদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পুস্তিকাটি এই কয় ভাগে বিভক্ত: ভূমিকা, তাল ও মান, আকৃতি ও প্রকৃতি, ভাব ও ভঙ্গি। সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ভারতীয় মূর্ত্তি-শিল্পের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শিল্পগুরুর হাতে এই ভারতীয় মূর্ত্তিপরিচয় অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। ভারতীয় শিল্প-সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা ইহা হইতে দূর হইবে। ভারতীয় শিল্পের শারীর-সংস্থানবিদ্যা বা য়্যানাটমি সম্বন্ধে অধিকাংশই অজ্ঞ। শিল্পীরা প্রকৃতিকে অস্বীকার

করে নাই, প্রকৃতি হইতেই তাহাদের অ্যানাটমির প্রেরণা পাইয়াছে। হরিণনয়ন, কমল-নয়ন, পদ্মপলাশ-নয়ন প্রভৃতি উপমা প্রকৃতির পর্য্যবেক্ষণই সূচিত করিতেছে। এই গ্রন্থ ভারতীয় অ্যানাটমি বুঝিতে সাহায্য করিবে। বিভিন্ন ভঙ্গির চিত্র ও মাপজোকাদি দ্বারা বিষয়টি সহজ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার ভূমিকায় ঠিকই লিখিয়াছেন "শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র। আগে মূর্তি রচিত হয়, পরে মূর্তিলক্ষণ, মূর্তি-বিচার, মূর্তিনির্মাণের মান-পরিমাণ নির্দিষ্ট ও শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। মুক্তি ধার্মিকের, আর ধর্মার্থীর জন্য ধর্মশাস্ত্রের নাগপাশ।" ইহা নিতান্ত প্রণিধানযোগ্য।

এই পুস্তিকা শিল্পরসপিপাসু এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষার্থীদের জন্য অনুমোদন করিতেছি।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীতামসরঞ্জন রায় প্রণীত। জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড কর্তৃক ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো-বক্তৃতাকালীন তেজস্বী প্রতিকৃতির প্রচ্ছদপট-সম্বলিত এই নাতিবৃহৎ জীবনীপাঠে কেবল বাংলার তরুণ-সমাজ নহে, পরন্তু অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ইহার সাবলীল, সুন্দর, তেজোময়ী ভাষা এবং ঘটনা-পরম্পরা-সুসন্নিবেশের সহিত পরিচিত হইয়া উপকৃত হইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে কেবল সন্ন্যাসী ছিলেন না, পরন্তু স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার মূর্তবিগ্রহ ছিলেন, ইহা কৃতী লেখকের তুলিকায় বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। জাতি-ধর্ম-কর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নরনারী এই উপাদেয় গ্রন্থপাঠে আপন আপন জীবনের আদর্শ এবং উহাতে উপনীত হইবার উপায়ের সন্ধান পাইবেন। আমরা এই সুলিখিত পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী অদ্বয়ানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উত্তর-ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি রবিবার ও বুধবার নিয়মিত ভাবে বেদান্তের সাধারণ তত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ইহার অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী গত আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা-গুলি প্রদান করেন: (১) "যে অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হয়", (২) "ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ-সমূহ", (৩) "চেতনা কাহাকে বলে?" (৪) "কর্মনীতি", (৫) "আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্নাপসারণের উপায়", (৬) "যুদ্ধক্ষেত্রের ধর্ম" (৭) "জ্যোতির রাজ্য", (৮) "ভারতীয় মহাপুরুষগণ"। এতদ্ভিন্ন এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী "সাধকগণের শক্তি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় এই সোসাইটি-ভবনে স্বামী অশোকানন্দজী সদস্য ও শিক্ষার্থিগণের নিকট ধ্যানযোগ ও বেদান্ত ব্যাখ্যা করেন এবং রবিবাসরীয় ক্লাসে বালক-বালিকাগণকে সার্বভৌম

বেদান্তের সাধারণ তত্ত্ব এবং সকল ধর্ম ও আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ রূপ শিক্ষা দেন।

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র—৮ বেলসাইজ এভেনিউ, লণ্ডন, এন্ ডব্লিউ-৩। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজী অক্টোবর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, (১) 'গুরুর আবশ্যকতা' (২) 'গুরু-শিষ্য', (৩) 'গুরু ও অবতারগণ', (৪) 'মন্ত্র : ওঁ : বর্ণ ও প্রজ্ঞা'।

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস—১৯৪৯ সনের কার্যবিবরণী—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই সেবাশ্রম কার্যারম্ভ করে এবং সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতিতে আলোচ্যমান বর্ষে ইহা ৪৯ বৎসরে পদার্পণ করিল। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নলিখিত সেবাকার্য সম্পন্ন হইতেছে : (১) স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইতে পারে এরূপ ১১৫টি বেড-সম্বলিত ইনডোর বিভাগ, (২) আউটডোর দাতব্য চিকিৎসালয়, (৩) কর্মশক্তি-রহিত বৃদ্ধদের জন্য ২৫টি ও অক্ষম বৃদ্ধাদের জন্য ৫০টি বেডবিশিষ্ট দুইটি আশ্রয়াবাস, (৪) দুঃস্থ নরনারীগণকে অর্থ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সাহায্য, (৫) সম্ভ্রান্ত অথচ দরিদ্র জনসাধারণকে সাহায্য দান।

আলোচ্যমান বর্ষে ইনডোর বিভাগে বিনামূল্যে ২৪৪৭ জন রোগী চিকিৎসিত হন। পূর্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ২২৭১ জন। এই বৎসর রাস্তা ও ঘাট হইতে আনীত রোগীর সংখ্যা ৮৩ জন এবং মৃত্যুহার শতকরা ৫·৩ জন। ইনডোর বিভাগে চিকিৎসিত রোগীদের মধ্যে ১৯৭৪ জন রোগমুক্ত হন, ১৪৩ জন আংশিক আরোগ্য লাভ করেন, অন্যান্য ভাবে চলিয়া যান ৯৩ জন, ১২৫ জনের মৃত্যু হয় এবং বৎসর-শেষে ১১২ জন চিকিৎসিত হইতে থাকেন। আউটডোর দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্যমান বর্ষে ৩,৮৯,৯৪০ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ইহাদের মধ্যে ১,১২,৬০২ জন নবাগত ও ২,৭৭,৩৩৮ জন পুরাতন রোগী। চিকিৎসিতের সংখ্যা প্রত্যহ গড়ে ১০,৬৮·৩ জন। পূর্ব বৎসরে এই বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ৩,৪০,১৫১ জন। কর্মশক্তিরহিতদিগের আশ্রয়াবাসে ৭৫টি বেড থাকিলেও অর্থাভাবে মাত্র ১৭ জনকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এই বার সেবাশ্রমের জেনারেল ফণ্ডে আয় ১,২৫,৬৪৯৶০ ও ব্যয় ১,৩৯ ১৮৬৷৶৮ পাই, বিল্ডিং ফণ্ডে আয় ১৮,১২৫।৭ পাই ও ব্যয় ১৩,৯৩৫।০ আনা, এন সি দাস এষ্টেট হইতে আয় ৬১৫৲ ও ব্যয় ৬৪২৸৶০। সুতরাং আলোচ্য বর্ষের মোট আয় ১,৪৪,৩৮৯।৶৭ পাই ও মোট ব্যয় ১,৫৪,৫৬৪৸৴৮ পাই।

সেবাশ্রমের আশু প্রয়োজন : (১) সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের প্রতি বেডের জন্য ৬০০০৲, জেনারেল ওয়ার্ডের প্রতি বেডের জন্য ৫০০০৲, কর্মশক্তি-হীনদের আশ্রয়াবাসের প্রতি বেডের জন্য ৪৫০০৲, (২) আউটডোর চিকিৎসালয়ের জন্য ৬০,০০০৲, (৩) দুইটি সেপটিক সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের জন্য ৯৫০০০৲, (৪) গৃহ ও রাস্তা সংস্কারের জন্য ২৫,০০০৲।

দুঃস্থ ও পীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ সহৃদয় নরনারীর নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার্থে দাতাগণ এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। যে সকল দাতা এই প্রতিষ্ঠানে এককালীন ২৫০৲ বা তদূর্ধ্ব অর্থ দান করিবেন, ইনকামট্যাক্স আইনের (১৯২২) ১৫বি ধারা অনুযায়ী ভারত-সরকার তাঁহাদিগকে আয়কর হইতে অব্যাহতি দিবেন। এই উদ্দেশ্যে সাহায্যাদি যতই নগণ্য হউক না কেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে :—

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া (পশ্চিম বাংলা) (২) সহকারী সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সারভিস্, লাক্সা, বেনারস।

নয়া দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন—১৯৪৮ ও ১৯৪৯ বর্ষদ্বয়ের কার্যবিবরণী—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সনের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে মিশন নিয়মিত ধর্মপ্রসঙ্গ-ব্যাখ্যান ও সাময়িক বক্তৃতাদি দ্বারা বেদান্তের সার্বভৌম জীবন-প্রদ ভাবধারা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রাণস্পর্শী বাণী প্রচার করিয়াছেন এবং ভজন-সংগীত, পূজার্চনা, ধ্যান-ধারণা ও উৎসব-উদ্‌যাপনের সহায়তায় জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা-সঞ্চারের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। এই দুই বৎসরে যথাক্রমে ১২৫ ও ১৬৫টি ধর্মপ্রসঙ্গ এবং ৩০ ও ৬১টি বক্তৃতা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ নবীন ভারতের লোকোত্তর মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনবেদ ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। দরিদ্রনারায়ণ-ভোজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ এবং ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা ও তামিল ভাষায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে বক্তৃতা ও আবৃত্তির প্রতিযোগিতা স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মোৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতিযোগিতায় ছাত্রগণের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নয়া দিল্লী রামকৃষ্ণ-উৎসব-সমিতি জন্মোৎসবাদির আয়োজন এবং তৎসংক্রান্ত ব্যয়ভার-বহন করেন। সমিতির সদস্যগণ এই জন্য মিশন-কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে মিশনের গ্রন্থাগারে যথাক্রমে ২৪৪৩ ও ২৫০২ খানি পুস্তক ছিল এবং ৭৪৭ ও ৯৮০ খানি পুস্তক পাঠকদিগকে পাঠের জন্য দেওয়া হইয়াছে। পাঠাগারে ৮ খানি সংবাদপত্র এবং ৩৫ খানি মাসিকপত্র রাখা হইয়াছিল। দৈনিক গড়ে ২০ জন পাঠক উপস্থিত ছিলেন।

মিশনের সাধারণ ডিস্‌পেন্‌সারি স্থানীয় দরিদ্র লোকদের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ২২০৭৫ ও ১৮৪৪২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন; রোগীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের অধিক ছিলেন স্ত্রীলোক। চিকিৎসা প্রধানতঃ হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়াছে। মিশন-কর্তৃপক্ষ ডাঃ এন্ এস্ রায়কে তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবাকার্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

মিশনের যক্ষ্মাচিকিৎসা-কেন্দ্র (Tuberculosis Clinic) বর্তমানে কারলবাগ অঞ্চলে নিজস্ব প্রশস্ত ত্রিতল ভবনে স্থায়িভাবে অবস্থিত আছে। ভারতসরকারের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর নূতন ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাস হইতে যক্ষ্মা ক্লিনিকে রোগীদিগকে ভর্তি করা হইতেছে। মিশনের এই ক্লিনিক যক্ষ্মারোগ-প্রতিরোধ-কল্পে দিল্লী প্রদেশের সর্বপ্রথম সুপরিচালিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটি-কর্তৃক পরিচালিত কুইন্‌স্ রোড্ ক্লিনিক এবং অখিলভারত যক্ষ্মা সমিতি দ্বারা পরিচালিত নিউ দিল্লী ক্লিনিক নামে আরও দুইটি প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে স্থাপিত হইয়াছে। চিকিৎসার সৌকর্যার্থ সমগ্র দিল্লী নগরী তিনটি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দিল্লী প্রাদেশিক যক্ষ্মা সমিতির টেক্‌নিক্যাল সাব কমিটির পরামর্শে ও পরিচালনায় এই তিনটি ক্লিনিক সম্পূর্ণ সহযোগে কার্য করিতেছে। মিশনের যক্ষ্মা-ক্লিনিক সাধারণ চিকিৎসা ও ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সর্ববিধ সরঞ্জামাদি দ্বারা সুসজ্জিত। রোগবীজাণু

পরীক্ষার জন্য ক্লিনিকে একটি গবেষণাগার আছে। বিনামূল্যে বিশেষ পরীক্ষাকার্য-পরিচালনার জন্য মিশন-কর্তৃপক্ষ ডাক্তার এস্-কে সেনের নিকট কৃতজ্ঞ। ১৯৪৯ সনে ডাঃ এ কে দত্তের পরিচালনায় কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠের চিকিৎসার জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। যে সকল অবৈতনিক ও বৈতনিক অভিজ্ঞ চিকিৎসক ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য করিয়াছেন মিশন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। ক্লিনিকে দুই বৎসরে যথাক্রমে ১২,২০২ এবং ৩৩,০৯০ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন।

অনেক বৎসর যাবং সাধারণ ডিস্পেন্সারি, পাঠাগার ও গ্রন্থাগার এই তিনটিকে প্রশস্ততর গৃহে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে ৪০,০০০৲ আবশ্যক। কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্যে ১৯৪৯ সনের অক্টোবর মাসে প্রস্তাবিত দোতলা গৃহের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫০ সনের মধ্যভাগে নির্মাণকার্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নবনির্মিত ভবনে ডিস্পেন্সারি, পাঠগৃহ ও গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হইলে কার্য অধিকতর সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত। হইবে মিশনের বিভিন্ন বিভাগের কার্য-পরিচালনার জন্য সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছেন।

নয়া দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের দুইটি পৃথক তহবিল আছে: (১) মিশন-আশ্রম তহবিল এবং (২) মিশন যক্ষ্মা-ক্লিনিক তহবিল। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে আশ্রম-তহবিলের আয় যথাক্রমে ৩৭,৩৩০৲ এবং ৩২,১৫২৲: ব্যয় যথাক্রমে ৩৬,৪৭৬৲ এবং ৩৯,৫১১৲। তন্মধ্যে ১৯৪৮ সনের তহবিলে পাঞ্জাব সেবাকার্যের জন্য ১০,২২২৲ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৬,৭০৭৲ খরচ করা হইয়াছে; আর ১৯৪৯ সনের তহবিলে নূতন ডিস্পেন্সারি ও লাইব্রেরী বিল্ডিং ফণ্ডের জন্য ২২,১১৯৲ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৭,৮১৪৲ খরচ করা হইয়াছে।

বর্ষদ্বয়ে যক্ষ্মা-ক্লিনিকের আয় যথাক্রমে ১১,৬৫৪৲ এবং ৩৮,০৭৫৲; ব্যয় যথাক্রমে ৯৬০৪৲ এবং ২৫,০৭৭৲। প্রথম হইতে ১৯৩৯ সনের শেষ পর্যন্ত ক্লিনিকভবন ও সরঞ্জামাদির জন্য ১,৮১,১১৪৲ পাওয়া গিয়াছে এবং ১,৭০,৩৩৮৲ খরচ করা হইয়াছে।

মিশনের আশু প্রয়োজন: (১) পুরাতন গৃহের সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য ৫০০০৲। (২) গ্রন্থাগারটিকে পুস্তক ও সরঞ্জামাদি দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার জন্য এককালীন ১০,০০০৲ এবং বার্ষিক ২০০০৲। (৩) একটি বক্তৃতা-ভবনের জন্য ৫০,০০০৲। (৪) যক্ষ্মা-ক্লিনিকের ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মীদের বাসস্থানের জন্য ৩০,০০০৲। (৫) চরিত্র-গঠনোপযোগী একটি বিদ্যার্থি-ভবনের জন্য ৪০,০০০৲ এবং (৬) মিশনের দৈনন্দিন বিভিন্নমুখী কার্যের সুষ্ঠু পরিচালন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থ-সাহায্য। মিশন-কর্তৃপক্ষ এই সকল জনহিতকর কার্যের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানাইতেছেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, নয়া দিল্লী—এই ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিতব্য।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত গিরিজাচরণ অধিকারী—তমলুকের বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দিরের সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত গিরিজাচরণ অধিকারী গত ৩রা আশ্বিন ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৯১৬ সনে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৫ সনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ বর্গভীমা দেবীর মন্দিরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুতসঙ্গে গিরিজা বাবুর অন্তরে ভগবান লাভ ও শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শে দেশের সেবা করিবার এক প্রবল প্রেরণা জাগ্রত হয়। সেই সময় হইতে তিনি প্রায়ই বেলুড় মঠে যাতায়াত করিতেন এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের বিশেষ আদর যত্ন পাইতেন। তিনি তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। যাঁহাদের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় এই আশ্রমের হাসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারী লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। গিরিজা বাবু দরিদ্র হইলেও সংসারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহার সেবা ও অমায়িক ব্যবহার প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন—গত ভাদ্র সংখ্যার 'উদ্বোধনে' "আমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান" শীর্ষক প্রবন্ধের ফুটনোটে লেখকের পরিচয়-দানপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি (স্বামী বোধানন্দ) আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য। প্রকৃতপক্ষে, তিনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য এবং আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন।

আসাম ভূমিকম্প-সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনের

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন উত্তরলখিমপুর শহর হইতে সাতাশ মাইল দূরবর্তী গোগামুখ গ্রামে ভূমিকম্প-সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই গ্রামটি সুবনশিরি নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এবং মহকুমার অন্যতম দুরধিগম্য ও অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চল। হঠাৎ নদীর জলপ্লাবনে নিমজ্জিত পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। দুর্গত লোকদের বাসস্থান ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। ভূমিকম্প ও উহার পরবর্তী জলস্ফীতির দরুন অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নির্জীবপ্রায় হইয়া নরনারী ও শিশুগণ নানাপ্রকার রোগের কবলে পতিত হইতেছে। পরিষ্কার পানীয় জলের অভাবহেতু এবং নদীর জল দূষিত হওয়ায় কলেরা ও টাইফয়েড সংক্রামকরূপে দেখা দিবার খুবই সম্ভাবনা।

আসামের এই সব দুর্গত নরনারীর উপযুক্ত সেবার জন্য ঔষধ, গুঁড়া দুধ, বস্ত্র, বাসন, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির দরকার। এই জন্য প্রচুর অর্থের আশু প্রয়োজন। এই অত্যাবশ্যক সেবাকার্যে মুক্তহস্তে সাহায্য করিবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আমরা আবেদন জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ববিধ সাহায্য ধন্যবাদের সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(স্বাক্ষর) **স্বামী বীরেশ্বরানন্দ**

সাধারণ সম্পাদক,

রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ—পোঃ, (হাওড়া)
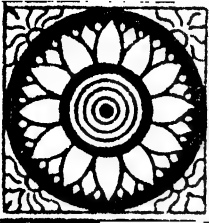
ধর্মসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আইন্‌ষ্টাইন্‌

সম্পাদক

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আল্‌বার্ট আইন্‌ষ্টাইন্‌ তাঁহার 'আউট্‌ অব্‌ মাই লেটার ইয়ার্স্‌' নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়া ধর্ম-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ধর্মবিশ্বাসহীন নিছক জড়বাদী ব্যক্তিগণেরও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আশা করি, এই প্রখ্যাতনামা মনীষীর বস্তুতন্ত্র-মূলক বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহের আলোকে অনেকেই ধর্ম-সম্বন্ধে নূতনভাবে চিন্তা করিবার উপাদান পাইবেন।

আইন্‌ষ্টাইন্‌ লিখিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক কার্যাবলীর একটি অপরটির সহিত কিরূপ সম্বন্ধাশ্রিত আছে, তাহাই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে। এই সম্বন্ধে মানুষকে বস্তুতান্ত্রিক বা বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী করা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আদর্শ। কিন্তু ঐ কার্যাবলীর একটি অপরটির সহিত কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া সঙ্গত তৎসম্পর্কে বিজ্ঞান কোন নির্দেশ দিতে পারে না। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য কি হওয়া উচিত বিজ্ঞান তাহা বলিতে অসমর্থ। কতকগুলি উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান সকলের পক্ষেই আবশ্যক, কিন্তু মানুষের চরম আদর্শ-নির্ণয় বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে। পক্ষান্তরে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, আমাদের জীবনের ও কার্যাবলীর যদি একটি চরম লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে সকলই নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। অনেকের মতে সকল বিষয়ে সত্য জ্ঞানলাভই মানব-জীবনের আদর্শ হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আইন্‌-ষ্টাইন্‌ বলেন যে, ইহা প্রশংসনীয় হইলেও মানুষের জীবনের পথ-প্রদর্শকের কার্য করিতে অক্ষম। তিনি লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধিযুক্ত চিন্তা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও নীতি-নিরূপণে কতকটা সাহায্য করিতে পারে। অধিকন্তু আদর্শ ও উহাকে লাভ করিবার উপায়—এতদুভয়ের সঙ্গে যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে, তাহাও বুদ্ধি স্পষ্টভাবে দেখাইতে সমর্থ। কিন্তু উহা মানুষকে তাহার চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানদান এবং উহাতে উপনীত করিতে পারে না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, একমাত্র ধর্মই সামাজিক জীবনে মানুষের চরম আদর্শনির্ণয়, উহার প্রকৃত মূল্য-অবধারণ এবং উহাকে লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন

করিতে সক্ষম। এই তিনটিই সংস্কৃতিমান সুস্থ ও প্রগতিশীল মানবসমাজের চিরন্তন ঐতিহ্য বা বহুকালের প্রথা। এই কয়টি দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যষ্টির জীবনযাত্রা-প্রণালী, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিচার-বুদ্ধি বহুলাংশে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং এইগুলি মৃত নয়, ইহারা এরূপ কিছু যাহাকে জীবন্ত বলা চলে। ইহাদিগকে বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে দেখা যায় না বটে, কিন্তু মানব-সমাজের উপর প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায়। ইহাদিগকে অতি উত্তম বলিয়া প্রমাণ করা অপেক্ষা ইহাদের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়াতেই ইহাদের সার্থকতা নিহিত।

আইনষ্টাইন্ বলেন যে, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের মধ্যে মানুষের চরম লক্ষ্য ও ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ নীতিসমূহের বিকাশ দেখা যায়। এই আদর্শ অত্যুচ্চ। তিনি লিখিয়াছেন যে, আমাদের শক্তি দুর্বল বলিয়া আমরা ইহা সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহাই মানুষের উচ্চাশার প্রকৃত মূল্যনির্ধারণের নিশ্চিত ভিত্তি। ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানসমূহ হইতে মুক্ত করিয়া ঐ আদর্শকে যদি কেহ গ্রহণ করিতে পারেন এবং উহার মানবতার দিক বিকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন বিশ্বমানবের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সার্থক হইবে; —তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মানুষের উপর প্রভুত্ব করা অপেক্ষা মানুষের সেবাতেই মানুষের মহত্ব প্রকটিত।

ধর্মের সংজ্ঞা-সম্বন্ধে আইনষ্টাইন্ বলেন, 'ধর্ম কি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অপেক্ষা ধার্মিকের জীবনের লক্ষ্য কি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই আমি পছন্দ করি।' তাঁহার মতে যথার্থ ধর্মালোকিত ব্যক্তিগণ স্বার্থ-বাসনা-বিমুক্ত এবং তাঁহাদের চিন্তা ভাব ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত গণ্ডীর বহু ঊর্ধ্বে (super-personal)। ব্যক্তিগত বিষয়সমূহের বহির্দেশীয় বিষয়ের ও লক্ষ্যের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে এই ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কোন সন্দেহ পোষণ করেন না। তাঁহাদের নিকট ঐগুলি অমূল্য ও বাস্তব। আইনষ্টাইনের মতে এই দিক দিয়া ধর্মজীবনের চরম আদর্শের যথার্থ মূল্য ও আবশ্যকতা-নির্ণয়ে মানুষের বহুকালের প্রচেষ্টা। তিনি বলেন যে, এই ভাবে ধর্মকে গ্রহণ করিলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার বিরোধ অসম্ভব হইবে। বিজ্ঞান কেবল বলিতে পারে—কোন্ জিনিস কি, কিন্তু কোন্ জিনিস কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বলিতে অসমর্থ। এই জন্য ইহার আয়ত্তের বহির্দেশীয় সকল বিষয়ের সর্ববিধ মূল্য-নির্ণয়ের আবশ্যকতা আছে। ধর্ম মানুষের চিন্তা ও কার্যের মূল্যনির্ণয় করিতে সমর্থ, কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বলিতে পারে না। আইনষ্টাইন্ বলেন যে, এই ব্যাখ্যা-অনুসারে বলা যায় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সর্বজনবিদিত সকল বিরোধই উভয়ের সম্বন্ধে ভুল বুঝিবার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন যে, বাইবেলে লিখিত বিজ্ঞান-বিরোধী মতগুলিও অভ্রান্ত বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও, ডারউইন্ প্রমুখ উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের অনেক প্রতিনিধি বৈজ্ঞানিক প্রথায় সকল বিষয়ের মূল্য ও চরম লক্ষ্য নির্ণয় করিতে যাইয়া ভ্রমাত্মক ধারণা-বশে সময়ে সময়ে ধর্মের বিরুদ্ধে কার্য করেন। সুতরাং উভয়তঃ ভ্রম হইতেই ধর্ম ও বিজ্ঞানে বিরোধ চলিতেছে বলা যায়।

আইনষ্টাইন্ বলেন যে, ধর্ম মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেও ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞান হইতেই শিক্ষা করিতে হয়। একমাত্র যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই বিজ্ঞান-সৃষ্টি করিতে পারেন। ধর্ম মানুষের এই ভাবের উৎস। এই বিশাল জগতের নিয়মাবলী যুক্তি ও বিচার-গম্য বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। আইনষ্টাইন্ লিখিয়াছেন, এই ধারণায় বিশ্বাসহীন কোন বৈজ্ঞানিকের কল্পনাও আমি করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।

মানুষের ঈশ্বরধারণা সম্বন্ধে তিনি বলেন, একজন সর্বশক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ, সকল বিষয়ে দয়াবান ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ঈশ্বরের (Personal God) ধারণা মানুষকে শান্তি ও সাহায্যদান এবং পরিচালন করিতে সক্ষম। অত্যন্ত অনুন্নত মনও ব্যক্তিক ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সহজ ধারণা করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার মতে এই ধারণা দুর্বলতা হইতে উদ্ভূত এবং যুক্তিযুক্ত নহে।

আইনষ্টাইনের মতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক ধারণা ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ করায় ঐতিহাসিক যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত সভ্য নরনারীগণ দেবদেবীগণকে মূলতঃ মানবরূপে জগতের সকল প্রাণী ও বস্তুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা বলিয়া কল্পনা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা দুঃখবিমুক্তি বা সুখলাভের জন্য নানা প্রকার রাহস্যিক উপায়-অবলম্বনে এবং প্রার্থনা দ্বারা এই দেবদেবীগণের কৃপালাভে প্রয়াসী হয়। আইনষ্টাইন্ বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মের ঈশ্বর-ধারণা ঐ প্রাচীন দেবদেবী-সম্বন্ধীয় ধারণারই এক উন্নত সংস্করণ। ইহা প্রধানতঃ ঈশ্বরের উপর এক প্রকার মানবীয় ভাব আরোপ (anthropomorphic idea) মাত্র। মানুষ এই সর্বশক্তিমান শরীরী বা অশরীরী দৈব শক্তির (Divine Being) নিকট নানাবিধ ভোগ-সুখ ও সর্ববিধ দুঃখ-বিমুক্তি প্রার্থনা করে। অধিকাংশ ধর্মই এই ব্যক্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু বিজ্ঞান তাহা করে না। এই জন্যই ধর্ম ও বিজ্ঞানে বিরোধ চলিতেছে।

আইনষ্টাইন্ লিখিয়াছেন, ঈশ্বরানুসন্ধান বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়। বিশ্বপ্রকৃতির কার্যাবলী যে সকল নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইতেছে উহাদের আবিষ্কারই বিজ্ঞানের আদর্শ। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ কোন কোন প্রাকৃতিক নিয়মের কতকটা রহস্য যে উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা সর্বজনস্বীকৃত। বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা এখন প্রাকৃতিক কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে সঠিকরূপে ভবিষ্যদ্বাণীও করিতে পারেন। কিন্তু এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রাকৃতিক ঘটনার সমাবেশ হইলে অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অনেক বিষয়ের কারণ নির্ণয় করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিকগণের মতে এই নিয়মের উপর ঈশ্বর বা কোন মানুষের কোন প্রভাব নাই। এই প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিতে পারে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। আইনষ্টাইনের মতে বিজ্ঞান এই পর্যন্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিয়ামক ব্যক্তিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে অপ্রমাণ করিতে পারে নাই ইহার কারণ—এই মতবাদের সমর্থনে ধর্মের প্রতিনিধিগণ যে সকল যুক্তি দেখান, ঐ যুক্তির রাজ্যে বৈজ্ঞানিকগণ তথা বিজ্ঞান এ পর্যন্তও প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্যক্তিক ঈশ্বর বরাবর অন্ধকারে আছেন. তাঁহাকে আলোকে আনয়ন করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। আইনষ্টাইনের মতে

ধর্মের প্রতিনিধিগণের পক্ষে এই বৈজ্ঞানিক যুগে ব্যক্তিক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার না করিয়া যে শক্তি মানুষের সত্য শিব ও সুন্দরের বিকাশ করিতে সক্ষম, উহার অনুশীলন করিতে শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত। তাঁহার দৃষ্টিতে এ কাজ কঠিন হইলেও অধিকতর মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন, ধর্মপ্রচারকগণ এই বিশুদ্ধীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে নিশ্চিতই আনন্দসহকারে দেখিতে পাইবেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত ধর্ম মহত্তর ও গভীরতর হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে আইন্‌ষ্টাইন্ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষকে তাহার আত্মকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা বাসনা ও ভয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করাই ধর্মের একটি লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক বিচার ইহার প্রতিবন্ধক নয়, পরন্তু সহায়ক। বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের একটির সঙ্গে অপরটির অপরিহার্য সম্বন্ধ দেখাইয়া উহাদিগকে যথাসম্ভব অল্পসংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা বিজ্ঞানের অন্যতম আদর্শ। আমরা যদি বুঝিতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখ এই পৃথিবীর বহু প্রাণী ও বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহা হইলে আমরা সকলকে প্রকৃত আপনার জ্ঞানে তাহাদের প্রতি তদনুরূপ আচরণ করিয়া একত্ব ও অভিন্নত্বের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইব। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আত্মকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সাম্য ও মৈত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে। আইন্‌ষ্টাইন্ লিখিয়াছেন, আমার মতে ইহাই ধার্মিকের মনোবৃত্তি। মানুষকে এইরূপ বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত করাই ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ। এই ভাবে বিজ্ঞান কেবল ধর্মকে মানবীয় ভাবারোপিত কাল্পনিক ঈশ্বর হইতেই মুক্ত করে না, পরন্তু মানুষের জীবনকে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করিতেও পারে।

এই প্রবন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইন্‌ষ্টাইন্ বিজ্ঞানের দিক হইতে ব্যক্তিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়াও মানুষের পক্ষে ধর্মের আবশ্যকতা স্বীকার করিতে কোন দ্বিধা করেন নাই। তিনি অদ্বৈত একত্ব সমদর্শন ও বিশ্বপ্রেমকে বিশ্বমানবের পরম ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই মহান্ ভাবসমূহ বেদান্তে যেরূপ পরিস্ফুট অন্য কোন কিছুতে তদ্রূপ নহে। এই জন্যই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বেদান্তই পৃথিবীর সুশিক্ষিত মানব-সাধারণের ধর্ম হইবে। মনীষী আইন্‌ষ্টাইনের ধর্ম-সম্বন্ধীয় স্বাধীন অভিমত বেদান্তের অত্যন্ত নিকটবর্তী—মনে হয় ইহা তাহারই পূর্বাভাস।

"জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই ধর্ম। ধর্মদ্বারা মানব অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্তমানে যাহা, তাহা এই ধর্মের শক্তিতেই হইয়াছে, আর উহাই এই মনুষ্যনামক প্রাণীকে দেবতা করিবে। ধর্ম ইহাই করিতে সমর্থ। মানবসমাজ হইতে ধর্মকে বাদ দাও—কি অবশিষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে সংসার শ্বাপদসমাকীর্ণ অরণ্য হইয়া যাইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বন্ধন

নচিকেতা

পাওয়ার আনন্দ-খনে অন্তরের কবি মোর কাঁদে,
তবু বারে বারে আমি পা বাড়াই পুরানো সে ফাঁদে।
অন্তরে আমি যা চাই সে চাওয়া যে সুন্দর মহান্
চোখেরে আমার কেন করিলে না দিব্য দৃষ্টিদান ?
চাই যাহা তা পাওয়ায় চিত্তে মোর তৃপ্তি কেন নাই,
চোখেরে বিশ্বাস করি নিত্য নব দুঃখ শুধু পাই।
দৃষ্টিহীন চোখ কেন অন্তরের কথা নাহি শোনে ?
ভুলদেখা রূপস্বপ্নে মন কেন মিথ্যা জাল বোনে ?
জীবনের শুভ্র পটে যারে আমি রূপ দিতে চাই,
জীবনে চলার পথে তারে আমি কেবলি হারাই।

আমারে দিয়েছ দৃষ্টি বুদ্ধি বৃত্তি পরশ-চেতনা,
কেহই আমার নহে—সেই মোর চরম বেদনা।
মিথ্যা যন্ত্রে যন্ত্রী করে এ জগতে আমারে পাঠায়ে
নিজে তুমি হে সুন্দর, দূরে কেন রহিলে দাঁড়ায়ে ?
মন চায় মগ্ন হতে সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে,
দেহ মোরে নিয়ে যায় মিথ্যা মায়া-মরীচিকা পানে।
এমন করিলে কেন, হে নিষ্ঠুর জীবন-দেবতা ?
আকুল আগ্রহ জাগে—জানিবারে তোমার বারতা।

শ্রীশ্রীমা'র দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ *

শ্রীনীরদকুমার রায়

সারদামণি মেয়েটি ছোটবেলায় অন্যান্য মেয়েদের মতই পুতুল-খেলা করত এবং সেই শৈশব-ক্রীড়ার বিস্ময়-লোকের মায়ায় মগ্ন হয়ে থাকত। সেই খেলার আকর্ষণ তার ক'মে গেল এক অভিনব কল্প-লোকের পুতুল-খেলা নিয়ে; এই নতুন খেলা তার বেশ কিছুকাল চলেছিল। শৈশবেই হ'ল তার বিবাহ। কিন্তু তার পিতামাতার আনন্দ-প্রবাহ সহসা যেন বাধা পেল। সেই আদরের কন্যাটিকে দেখলেই একটা চাপা বেদনার উৎস তাঁদের বুকে ঠেলে উঠত। এই ছোট্ট মেয়েটির গ্রাম্য জীবনের শ্যামল পরিবেশটুকু সময়ে সময়ে কেমন এক করুণরসের শিশির-পাতে চিক্‌মিক্ ক'রে উঠত, কি একটা ব্যথার দীর্ঘশ্বাস তার আশেপাশে অর্ধোচ্ছ্বসিত হ'য়ে মিলিয়ে যেত। সারদা এ সবের কিছুই জানত না—জানবার বা বোঝবার বয়সও তখন তার নয়। না-জানার সুখেই তার দিনগুলি ছিল প্রভাতের আলোর মত উজ্জ্বল মধুর। কিন্তু তার পিতামাতা ত সবই জানতেন। জামাইএর নাকি মস্তিষ্ক বিকৃত—এ ত বড় কম দুঃখের কথা নয়। মেয়ের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে গভীর ভাবনা তাই তাঁদের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। এর মূলে সেই সর্বনাশী দেবী মা কালী! 'মা' 'মা' ক'রেই তাঁদের জামাই পাগল হ'য়ে গিয়েছে—এই কথা গ্রামের সকলেই শুনেছে।

এই কথাটার আভাস পেতে সারদার খুব বেশী দিন লাগেনি। নানারকম বিদ্রূপের ও তুলনামূলক টুকরো টুকরো কথার বিসদৃশ সুর তার কানে এসে তার শিশুমনের মধ্যে নিজের ভাবী কাল সম্বন্ধে একটা অনির্দেশ্য শঙ্কার ভাব এনে দিতে লাগল। হয়ত তার সামনেই; তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই, তার অদৃষ্টের কথা লোকে বলাবলি করত; তুলনা দিত—'এ ঠিক যেন পর্বত-নন্দিনী উমা—তারও বিয়ে হয়েছিল পাগল বরের সঙ্গে—সে বরের সবই অদ্ভুত; পরনে বাঘছাল, ভীষণ সাপ ও হাড়ের মালা হ'ল তার অলঙ্কার, গতিবিধি শ্মশানে মশানে, আর সঙ্গী ও অনুচর হলো যত সব ভূত প্রেত ভৈরব; আরও কত কি বিশ্রী জীব, বুদ্ধিমান লোকেরা যাদের ভয়ে ভয়ে এড়িয়েই চলে। এই রকম নানা কথা শুনে শুনে নিজের ভবিষ্যতের দিকে কোনও আলোর ঠিকানা না পেয়ে সারদা সেই অতি কোমল কাঁচা বয়সেই যে নিজের মনের ভেতরেই নিজে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়; এর ফলে তার চিন্তাশক্তি লাভ করেছিল অসাধারণ বেগ ও অপরিমেয় প্রগাঢ়তা। সে সময়ে তার এইটুকু জানা ছিল যে, তার স্বামী যেখানে থাকেন তার নাম দক্ষিণেশ্বর—কলকাতার কাছে একটা জায়গা। উন্নতশীর্ষ তাল নারকেল ও খেজুর গাছের প্রহরি-পরিবৃত তার গ্রামটুকুর বাইরে, ঐ শ্যামল ক্ষেত্র ও প্রান্তরের ওপারে যে নীলায়মান দিগন্ত দেখা যাচ্ছে, ওইটুকু ছাড়া সারদার ভূগোলের জ্ঞান আর অগ্রসর হয়নি; তবে হাঁ, কামারপুকুর—তার বরের গ্রাম—শ্বশুরবাড়ী—সেটা তার দেখা আছে বটে!

* ১৯৪৯ সনের মার্চ-সংখ্যা 'বেদান্তকেশরী' হ'তে অনূদিত।

সারদার বয়স যখন তের বছর, তখন একদিন খবর পেলেন, তাঁর স্বামী কামারপুকুরে এসেছেন, তাঁকে সেখানে যেতে হবে। শুনে লজ্জায় ও ভয়ে তাঁর মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। যাহোক তিনি সেখানে গেলেন, স্বামীকে দেখলেন এবং দেখা মাত্রই তাঁর সকল চিন্তা ও দুঃস্বপ্নের অবসান হ'য়ে গেল। এতদিন নানা লোকের রচিত কথা শুনে শুনে যে সব বিভীষিকা তাঁর মনের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল, নিজের চোখে এক মুহূর্তের দেখাতেই সে সমস্ত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সারদা দেখলেন, তাঁর স্বামী সকল মানুষের মতই একজন মানুষ; শুধু এইটুকু বিশেষত্ব যে, তিনি আশ্চর্য সুন্দর ও পরম হৃদয়বান এবং বিস্ময়কর তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা; সারদা এমন কখনও দেখেননি। তবে সত্য বলতে গেলে একটু অসাধারণত্ব আছে বৈকি, হৃদয়হীন লোকেরা যেটাকে পাগলামি আখ্যা দিতেও পারে। জয়রামবাটীর লোকেরা যে অনবরত তাঁকে 'পাগলা জামাই' 'পাগলা জামাই' বলে, তাতে তাঁদের সব সময় দোষও দেওয়া যায় না একেবারে। দেখ না, জামাই শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েছেন, বেশ আছেন; হঠাৎ এক সময়ে এক লাফ মেরে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, 'এবারে আমি কাউকে ছাড়ছি না—যবন হোক, চণ্ডাল হোক, যে-ই হোক না কেন?' সেখানে লোকেরা তখন বলে উঠলো, 'এই দেখ! দেখেছ! পাগল, পাগল! একেবারে বদ্ধ পাগল!'

স্বামীর সঙ্গে সারদামণির এই যে প্রথম সত্যিকারের সংস্পর্শ হয় এই তের বছর বয়সে, তার মধুময় স্মৃতি তিনি পরে এই ভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: 'বুকের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন রেখে দেওয়া হয়েছে, সেই সময় থেকে সর্বদাই এমনি অনুভব করতাম; সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কি রকম পূর্ণ থাকত তা ব'লে বোঝাবার নয়।' বালিকা পত্নীর প্রতি গদাধরের আচরণ-সম্বন্ধে অনেকের মনে নানা রকম আশঙ্কা ছিল; কিন্তু দেখা গেল, সকল আশঙ্কাই অমূলক। উদার স্বার্থ-শূন্য ভালবাসা দিয়ে তিনি সেই কিশোরী বধূকে একেবারে আপনার করে নিলেন; আবার, নিজের অম্লান পবিত্রতার উজ্জ্বল শিখাটি তাঁর সামনে ধরে গৃহকর্মের খুঁটিনাটি থেকে আরম্ভ করে মানবজীবনের উদ্দেশ্য পর্যন্ত সকল বিষয়ে তাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্রদীপে সল্‌তেটি কি ভাবে দিতে হয়, বাড়ীর বিভিন্ন লোকের মধ্যে কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, রেলে বা ষ্টীমারে ভ্রমণ করতে হলে কখন কি রকম ব্যবস্থা করতে হয়—এই সব বিষয়ও যেমন শিখিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর-উপলব্ধিই মনুষ্য-জীবনের পরম লক্ষ্য। শুদ্ধ-হৃদয়া সারদামণিও স্বামীর এই সকল কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতেন এবং কথাটা কোনও সময়েই তাঁর মনে আসেনি যে তাঁর স্বামীর ভগবৎসাধনা ও দিব্যোন্মাদ কখনও কোনও রকমে তাঁর নিজের জীবনের সাধ ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর যে গভীর ভালবাসা, তাকে শুধু সাংসারিক ভাবে স্বামীর প্রতি পত্নীর ভালবাসা বলা যায় না। এই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয় একদিন সারদামণিকে একটা অসঙ্গত প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল, "মামী, মামাকে তুমি 'বাবা' বলতে পার?" সারদামণি ঈষৎ হেসে বললেন, "কেন পারব না? উনি আমার বাপ মা ভাই বন্ধু—আমার সবই।" এই উত্তর শুনে হৃদয় খুব আমোদ পেয়ে গেল; উচ্চ হাসির রোল তুলে হাততালি দিতে

দিতে সে ঐ কথাটা জাহির করে বেড়াতে লাগল, "দেখ দেখ! সবাই শোন, মামী মামাকে বাবা বলেছে!" কথাটা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে সারদামণিকে বললেন, "একি গো, এমন কি বলতে হয়? লোকে কি বলবে?"

মনে হয় এই প্রথম সাক্ষাতে উভয়ের সামাজিক সম্বন্ধটাই বালিকা পত্নীকে শ্রীরামকৃষ্ণ বেশী ক'রে তখন বোঝাতে চেয়েছিলেন; জানতেন, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাবে।

পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নীকে ত মাতৃরূপেই দেখতেন এবং ষোড়শীপূজা ক'রে উভয়ের মধ্যে সেই ভাব দৃঢ় করে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমার বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এক কৌতুহলী ভক্ত শিষ্য হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন ক'রে বসেছিল, "মা, ঠাকুরকে আপনি কি ভাবে দেখেন?" আচম্‌কা সেই প্রশ্নে মা নিজকে একটু সামলে নিয়ে অতি শান্তস্বরে বলেছিলেন, "তাঁকে আমি ছোট্ট ছেলেটির মত দেখি।"

আঠার বছর বয়সে যখন সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বার্তা লোকমুখে শুনে নিজ কর্তব্য-সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন এবং স্বামীর সঙ্গে আটমাস কাল একত্র থেকে আত্মজয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, সেই সময়ে বহু চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা তিনি জেনেছিলেন, তাঁর স্বামী এক অসাধারণ পুরুষ। প্রায় প্রতিরাত্রেই তাঁর ঐশ্বরিক আবেশ ও ভাব-সমাধি হ'ত। অদৃষ্ট-পূর্ব এই ব্যাপার দেখে আশঙ্কায় ও উদ্বেগে শ্রীসারদামণি ঘুমোতে পারতেন না। আটমাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জানতে পারলেন, তাঁর জন্যে সারদাদেবীর নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে, তখন নহবতে তাঁর আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যরূপে চিরদিনের জন্যে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন ক'রে, সারদাদেবী পৃথিবীর নারীজাতির মধ্যে এক চিরস্থায়ী গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আর এই ভাবেই এই দুটি মহাপ্রাণ নর-নারীর মিলিত জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এবং পরস্পরের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রকাশ উপলব্ধি করবার সকল অন্তরায়ও দূর হ'য়ে গেল।

ষোড়শী পূজায় পরস্পরের এই আত্মিক সম্বন্ধ সুসিদ্ধ ও দৃঢ়বদ্ধ হল।

এ সমস্ত ছিল তাঁদের জীবনের গভীর অন্তস্তলের কথা। সামাজিক স্তরের দৈনিক জীবনে, শ্রীশ্রীমার যাতে কোন রকম সুখসুবিধার ত্রুটি না হয় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক অগ্রগতির কোন বাধা না হয়, সেজন্য শ্রীরাম-কৃষ্ণ যে কতভাবে কত দিক দিয়ে মনোযোগ রাখতেন তা বলে শেষ করা যায় না। শ্রীশ্রীমা নিজে বলেছেন, "আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার কি চমৎকারই যে ছিল! আমার মনে আঘাত দিতে পারে এমন কথা তিনি একটি বারও বলেন নি। ফুলের ঘায়ে যতটুকু বাজে ততটুকু ব্যথাও তিনি আমায় কখনও দেননি। আমার ভালর জন্য তিনি সতত উৎসুক থাকতেন। তিনি বলতেন, 'কাজে লেগে থাকতে হয়; কখনও অলস হয়ে ব'সে থাকতে নেই; আলস্য হ'ল যত বাজে ও দুষ্ট চিন্তার বীজ।' একদিন কিছু পাট এনে আমায় বললেন, 'দেখ, এই দিয়ে একটা শিকে আমার জন্যে তৈরী করে দিও ত, ছেলেদের জন্যে লুচি ঝুলিয়ে রাখব।'....দুষ্ট প্রকৃতির মেয়েরা পাছে আমায় অসৎ পরামর্শ দেয়, সেজন্য আমায় তাদের থেকে তফাৎ থাকতে বলতেন।.... একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার

হাতখরচের জন্যে কত টাকা দরকার ?' তিনি এত বড় ত্যাগী ছিলেন, তবু আমার যাতে কোন বিষয়ে কষ্ট না হয় সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।" তাঁর কথা বলতে বলতে পরম আনন্দভরে শ্রীশ্রীমা বলতেন, "আমার স্বামী ছিলেন সর্বত্যাগী নাগা সন্ন্যাসী।"

এমনি বহু ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে যার ভেতর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ভালবাসা শ্রীশ্রীমায়ের ওপর বর্ষিত হ'য়ে তাঁর জীবনকে একটা উন্নত ছাঁচে গ'ড়ে তুলেছিল। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের মহনীয় জীবনের পটভূমিকার ওপরে নিজের জীবনকে শ্রীশ্রীমা এক মুহূর্তের জন্যেও তুচ্ছ বোধ করবার কোনও কারণ বা অবসর পাননি। তিনি নিজ জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ ছিলেন। দুজনে দুজনের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। শ্রীশ্রীমা যেমন স্বামীর সহধর্মিণী শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি তাঁর যথার্থ সহধর্মী ছিলেন। একজনের জীবন অপরের জীবনের পরিপূরক।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার পরিসমাপ্তি হ'য়েছিল ষোড়শী-পূজায়। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট বারো বছর কেটেছিল একদিকে ভগবদ্-রসের আস্বাদনে, অপর দিকে আধ্যাত্মিক রসের পরিবেশনে। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প সময়ের ব্যবধান ছাড়া এই বারো বছর শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই ছিলেন এবং তাঁর অধ্যাত্ম-শিক্ষা-দানের বিচিত্র ভাব ও পদ্ধতি লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার অনেক সময়ের উক্তিতে সেই সকল ভাব ও পদ্ধতির সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেই সব উক্তি একত্র করলে গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি মনোহর চিত্র ফুটে উঠবে।

শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "ভগবান ছাড়া ঠাকুরের আর কোন চিন্তা ছিল না। ষোড়শী-পূজায় যে শাঁখা ও শাড়ী তিনি আমায় নিবেদন করেছিলেন, সেগুলো কি করব জিজ্ঞেস করাতে তিনি একটু চিন্তা করে আমায় বলেন, 'ওগুলো তুমি তোমার মাকে দিতে পার, কিন্তু মনে রেখো, মানুষ ভেবে তাঁকে দিলে চলবে না, স্বয়ং জগদম্বাকে দিচ্ছ এই বিশ্বাস থাকা চাই।' আমার মা তখন বেঁচে ছিলেন, আমি সেই ভাবেই তাঁকে ঐ শাঁখা ও শাড়ী দিয়েছিলাম। এমনিই ছিল ঠাকুরের শিক্ষা দেওয়ার ধরন।"

"আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়া ঠাকুর আর কোন কথাই বলতেন না। আমায় বলতেন, মানুষের এই দেহ দেখ্‌ছ ত—এই আছে এই নেই; সংসারে কত দুঃখকষ্ট; তবে আবার এই দেহ-ধারণ করে কি হবে?"

"সত্যে দৃঢ় হ'লে এই কলিযুগেই ঈশ্বরসাক্ষাৎ হ'তে পারে। ঠাকুর বলতেন, 'সত্যকে যে শক্ত ক'রে ধ'রে থাকে সে যেন ঈশ্বরের কোলে শুয়ে আছে।' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের একবার অসুখ করেছিল। তাঁর দুধটা আমি অনেকক্ষণ ধ'রে ফুটিয়ে ঘন ক'রে তবে তাঁকে খেতে দিতুম, যতখানি দিতুম তার অর্ধেক দিয়েছি বলতুম। এক দিন ধরা পড়ে গেলাম; তখন ঠাকুর বলেন—এমন করবার কি দরকার আমি ত কিছু বুঝি না। সত্যে আঁট থাকা চাই।"

"তিনি ত টাকা পয়সা ছুঁতেই পারতেন না; ছুঁলে তাঁর হাত বেঁকে যেত। তিনি বলতেন, দেখ রামলাল, যদি জানতুম জগৎ সত্য, তাহ'লে তোর কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়ে যেতুম। জানি, সব মিথ্যা, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য।"

"একবার তাঁর মাসহারা নিয়ে কিছু গোলযোগ হয়েছিল; তাঁর যা প্রাপ্য, তার চেয়ে কম পাচ্ছিলেন। এ বিষয়ে খাজাঞ্চিকে কিছু বলবার জন্যে আমি যখন তাঁকে বললাম, অমনি তিনি

বলে উঠলেন, 'ছি ছি! টাকাকড়ির হিসেব নিয়ে নাড়াচাড়া!'....ত্যাগই ছিল তাঁর ধনসম্পত্তি। আমার মনে পড়ে, একদিন কিছু মশলা নেবার জন্যে তিনি নহবতে গেলেন। আমি তাঁর হাতে কিছু মশলা দিয়ে আরও কিছু একটা কাগজে মুড়ে বললাম, 'এইটুকুও নিয়ে যাও।' এখন হ'ল কি, তিনি তাঁর ঘরে না গিয়ে সোজা দক্ষিণদিকের নহবতের সামনে নদীর বাঁধে চলে গেলেন। পথ খুঁজে না পেয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'মা, আমি কি নদীতে ডুবে মরব?' আমি ভয় পেয়ে গেলুম—গঙ্গায় তখন জোয়ার। গঙ্গায় প'ড়ে যাবার উপক্রম, তখন হৃদয় তাঁকে ধরে নিয়ে এল। কয়েক দানা মশলা তাঁর হাতে বেশী দেওয়াতে এই কাণ্ড হ'লো! সাধুর যে সঞ্চয় করতে নেই! তাঁর ত্যাগের মধ্যে যে কোন ভেজাল ছিল না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ব্রহ্ম—সত্যবস্তু যেমন সহজ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর গুরু ভাবও তেমনি ছিল সহজাত। তিনি যে গুরুগিরি করছেন এটা তাঁর মনেই হ'ত না। তিনি নম্রতা শিক্ষা দিতেন নিজে তৃণাদপি সুনীচ হ'য়ে। কেউ তাঁকে গুরু বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না, এতে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর একটা বিতৃষ্ণা ছিল। বলতেন, কে কার গুরু, তিনিই একমাত্র গুরু, আমি সকলের রেণুর রেণু! অথচ সরস কথা, গান ও কীর্তনের মধ্য দিয়ে সেই সত্য-স্বরূপের বার্তা এমন মধুর ও সহজবোধ্য ক'রে পরিবেশন করতে আর কেউ পারেনি।

শ্রীশ্রীমা বলেন, ঠাকুর চির-আনন্দময় ছিলেন, —আনন্দ ছাড়া তাঁকে কখনও দেখা যায়নি। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই আনন্দের হাট বসত। মানবচিত্ত-ক্ষেত্রের এই অদ্ভুত কর্ষক কত উষর ক্ষেত্রে আনন্দের সার ছড়িয়ে উর্বর ক'রে তুলে তাইতে ভগবৎসত্যের বীজ এমন ভাবে বুনে দিয়েছিলেন যে, স্বভাবতই তা থেকে আশানুরূপ উপাদেয় দিব্য ফসলের ঢেউ খেলে গিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আনন্দের একটু আভাস দিয়ে শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "আহা! দক্ষিণেশ্বরে সে সব কী দিনই গিয়েছে! যেন আনন্দের হাট বসে যেত! দিনে রাতে লোকের আসা যাওয়া চলছে স্রোতের মত; ঈশ্বর-কথার আর বিরাম নেই; নাচ গান কীর্তন সমাধি চলেছে অফুরন্ত। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আমার ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতুম আর হাত জোড় করে প্রণাম করতুম।' যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর থেকে শ্রীশ্রীমার ঘরের ব্যবধান ছিল কয়েক হাত মাত্র, তবু হয়ত মাসের পর মাস তাঁদের এক মুহূর্তের জন্যেও দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হবার সুযোগ মেলেনি এমনও হয়েছে। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে আমরা মনে করি যে এই মানুষটির ত্রিভুবনে কোনই কাজ ছিল না, কিন্তু এই 'অকাজের' মানুষটিই যে সর্বদা কি রকম ব্যস্ত থাকতেন তা ভেবে দেখলে বিস্ময় লাগে। কত যে নরনারী বালক-বালিকা তাঁর কাছে আসত, আর তিনি স্নেহমাখা করুণা দিয়ে সকলকে আকর্ষণ করে নিতেন তাদের দুঃখ-কষ্ট সংসারতাপ দূর করবার জন্যে এবং ধীরে ধীরে তাদের হৃদয়ে ঢেলে দিতেন সেই অমৃতময় আনন্দের বার্তা, যে আনন্দের তিনি নিজে ছিলেন নয়নরঞ্জন ভাবঘন মূর্তি।

অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের গ'ড়ে তোলবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়ে তাঁদের নিজের কাছে রেখে যে বিশেষ রকম যত্ন নিতেন, তার অনেক-খানি ঝুঁকি সইতে হ'ত শ্রীশ্রীমাকে। দিনে রাতে, অনির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে রকমারি রান্না করতে হ'ত তাঁদের রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে। তাঁদের জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনার অন্ত ছিল না।

কত সময় কত লাঞ্ছনা গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে তাদের জন্যে; এমন কি, কোন কোন সময়ে তাঁর প্রাণহানি করবার চেষ্টাও যে না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এ সবে তাঁর মনে কোনও দাগ লাগত না; তিনি অতি সহজ ভাবেই তাঁর অভিলষিত কাজ ক'রে যেতেন। পরবর্তী কালে একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "এখানে যেমন লেখা রয়েছে, 'ওল যদি ভাল হয় তার মুখীটিও ভাল হয়'—ঠিক এই কথা বলতেন ঠাকুর রাখালের বাপকে তার মনটা সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে। রাখালের বাপ এলেই ঠাকুর তাঁকে এটা ওটা দেখাতেন, পরিতোষ ক'রে খাওয়াতেন, আর তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা কইতেন। কেন জানো? তাঁর মনে মনে ভয় ছিল পাছে তাঁর রাখালকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাঁর কাছ থেকে।" আর এক সময়ে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "একবার বাবুরামকে আমি একটু মিছরির পানা খেতে দিয়েছিলাম; ঠাকুর তা দেখেছিলেন। একদিন তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবুরামকে সেদিন কি খেতে দিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'মিছরির পানা।' শুনে তিনি বললেন, 'ওরা সাধু হ'তে যাচ্ছে, ওদের এই সব বদ অভ্যাস করিয়ে দিচ্ছ তুমি?' এ থেকে বোঝা যায় কতদূর পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি চলত।"

তা ছাড়া কলকাতায় ভক্তদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা ছিল—কখনো নিমন্ত্রণে, কখনো নিজের ইচ্ছায় বা আগ্রহে। কোনও ছোকরা ভক্ত ঈশ্বর চিন্তা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করতে ভালবাসে, কিন্তু বাড়ীর লোকের ভয়ে ঠাকুরের কাছে আসতে পারে না, তার কাছে ত একবার না গেলে নয়! এমন অনেক দিন হয়েছে, তাঁর খাবার নিয়ে শ্রীশ্রীমাকে অনেক রাত অবধি বসে থাকতে হয়েছে; আর তিনি, নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে ফিরে এসে, অনেক কষ্টে দারোয়ানকে জাগিয়ে তাকে প্রচুর মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে তবে মন্দিরের বাগানের ফটক খোলা পেতেন।

এত করবার তাঁর কী দরকার ছিল? এত ক্লেশ স্বীকার তিনি করতে গেলেন কেন?—এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জেগে ওঠে। জীবনে তাঁর পাবার আর বাকি কি ছিল? অগণিত শতাব্দী ধ'রে লক্ষ লক্ষ মানব চতুর্বর্গের যা কিছু পাবার জন্যে প্রয়াস ক'রে এসেছে সে সমস্তই ত তাঁর করতলগত হয়েছিল। স্থির চিত্তে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, যে বিপুল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল, তারই বেদনা তাঁকে এমনি ভাবে প্রয়াসী করেছিল—জগদ্ধিতায় সব কিছু উজাড় ক'রে দিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে উৎসুক ক'রে তুলেছিল। এ ঐশ্বর্য ত দানে কমে না, বেড়েই যেতে থাকে। এই সুমহৎ দানই ছিল তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধির উত্তর-সাধনা। জগতে এ এক অপূর্ব ঘটনা! এমনিই—অপূর্ব ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব!

জগতকে দেবার জন্যে এই যে তাঁর বেদনা, এই বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছিল তাঁর অপরিমেয় প্রেমের মধ্য দিয়ে। কী ভালবাসাই ছিল তাঁর ভক্ত ছেলেদের ওপর! শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "বাবুরাম তার মাকে বলত, 'তুমি আর আমাকে কতই ভালবাস মা? ঠাকুর যে আমাদের কী ভালই বাসেন; তুমি সে রকম ভালবাসতে জানই না। তার মা তাই শুনে বলত, কি বলিস বাছা? আমি তোর মা, আর আমি ভালবাসতে জানি না?" শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অগাধ ভালবাসাই ছিল তাঁর গুরুরূপে সাফল্যের মূল কথা।

কিন্তু এই ভালবাসাই তাঁর দেহকে তিলে তিলে ক্ষয় ক'রেছিল। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "অপরের পাপের বোঝা নিজের দেহে নিজেন

বলেই তিনি এত রোগে ভুগতেন। তিনি বলতেন, 'গিরিশ যে কত পাপ জমিয়েছে? কিন্তু সে যে কষ্ট সইতে পারে না।' ইচ্ছা-মাত্র মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল, ইচ্ছা করলে সমাধিতে তিনি দেহত্যাগ করতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন, 'এদের (অন্ত-রঙ্গ শিষ্যদের) একবার এক ক'রে বেঁধে ফেলতে পারলেই আমার কাজ শেষ।' তখনও পর্যন্ত এক-জন আর একজনকে বলত, 'কেমন আছেন নরেন বাবু?' ও তখন বলত, 'ভাল আছেন ত রাখাল বাবু?' এই জন্যেই অত দেহের কষ্ট সয়েও তিনি শরীর ছাড়েন নি।" তিনি যে জগদ্গুরু! অনাগত বহু কল্পের কোটি কোটি মানবের আত্মিক উন্নতির জন্যে ও ভ্রাতৃত্বে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যে তাঁকে খাটতে হয়েছিল।

আবার মায়াপাশ-ছেদনের প্রসঙ্গে একদিন শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "একদিন হাজরা ঠাকুরকে বললে, 'আপনি নরেন্দ্র আর ঐ সব ছোকরাদের জন্যে অত ভাবেন কেন? ওরা ত বেশ আরামেই আছে—খায় দায় আমোদ-আহ্লাদ করে। তার চেয়ে বরং ঈশ্বরচিন্তায় মন লাগান, কাজ হবে। ওদের প্রতি এত আসক্তি কেন?' এই কথায় ঠাকুর ঐ বালক ভক্তদের থেকে মনটাকে একেবারে তুলে নিয়ে পুরোপুরি ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন ক'রে দিলেন। অমনি তাঁর সমাধি-অবস্থা; তাঁর দাড়ি চুল সব কদম ফুলের মত খাড়া হ'য়ে উঠল। ভাবো দেখি, কী মানুষ ছিলেন তিনি! তাঁর দেহ একেবারে কাঠের মূর্তির মত শক্ত হ'য়ে গেল। রামলাল তাঁর কাছে ছিল; সে বলতে লাগল, 'নেমে আসুন, নেমে আসুন, সহজ অবস্থায় আসুন।' অনেকক্ষণ পরে তাঁর সমাধি ভাঙল, দেহের ওপর মন এল। মানুষের দুঃখে কাতর হ'য়েই তিনি দেহে মন রাখতেন।"

আধ্যাত্মিক সাধনা-সম্বন্ধে উপদেশের জন্যে একদিন এক ভক্ত আবদার করায় শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "আমি আর কি উপদেশ দেবো বাবা? ঠাকুরের সব উপদেশের বই বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁর একটি মাত্র কথাও যদি তুমি ঠিক ঠিক বুঝে কাজে লাগাতে পার, তা'হলেই সব হয়ে যাবে।"

বিদুষী সন্ন্যাসিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণীই প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে শাস্ত্রের প্রমাণ মিলিয়ে তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে লোকসমক্ষে প্রচার করেন। তখনকার কয়েক জন বড় বড় পণ্ডিতও সেই সিদ্ধান্ত করেন। জগতের লোক সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণকে জগদম্বার ভক্তসন্তান বলেই গ্রহণ করে। ক্বচিৎ কখনও তিনি তাঁর অতি অন্তরঙ্গ কোন কোন শিষ্যের কাছে নিজ ঐশ্বর্যের কথা ব্যক্ত করেন। জবরদস্ত নরেন্দ্র-নাথ ত প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনিও নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে, 'যেই রাম, যেই কৃষ্ণ, সে-ই অধুনা এই দেহে রামকৃষ্ণ।' স্বামীজি স্বরচিত স্তবে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন, 'অবতারবরিষ্ঠ'। এখন দেখা যাক এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমা তাঁকে কি চোখে দেখতেন।

১৯০৯ সনে জয়রামবাটীতে এক শিষ্যের সঙ্গে শ্রীশ্রীমা'র এই রকম কথাবার্তা হয়—

শিষ্য—মা, লোকে বলে ঠাকুর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন; আপনি কি বলেন?

শ্রীশ্রীমা—হাঁ, আমার কাছে তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

শিষ্য—এ তো ঠিকই যে প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে তাঁর স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আমি প্রশ্নটা সে ভাবে করছি না।

শ্রীশ্রীমা—হাঁ, তিনি আমার কাছে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামিরূপেও, সাধারণ ভাবেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকেও সময়ে সময়ে বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি ঘরে ঘরে পূজা পাবেন! শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "একবার যখন ঠাকুর কাশীপুরে অসুখে ভুগছেন, জন কয়েক ভক্ত মা কালীর পুজোর জন্যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কিছু নৈবেদ্য এনেছিল। ঠাকুর কাশীপুরে আছেন শুনে তারা সমস্ত নৈবেদ্য ঠাকুরের ছবির সামনে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পেল। এই কথা ঠাকুর যখন শুনতে পেলেন, তখন বললেন, 'জগদম্বার জন্যে ঐ সব এনে এখানে (নিজেকে দেখিয়ে) দিলে?' আমার বড় ভয় হ'ল—ভাবলুম, ইনি এই সংকটাপন্ন রোগে ভুগছেন—কি হবে কে জানে—কী বিপদ! ওরা এমন করলে কেন? পরে অনেক রাত্রে ঠাকুর আমায় বললেন, দেখো, কালে ঘরে ঘরে আমার পুজো হবে—সকলেই এঁকে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে) গ্রহণ করবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা যে সময়ে সময়ে নিতান্ত সংকটকালে বা একান্ত তদ্‌গতচিত্ত হয়ে তাঁর ঐশ্বরিক সত্তার প্রমাণ পেয়েছিলেন, সে কথাও শ্রীশ্রীমা উল্লেখ করেছেন। আর শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনদান ত ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু নানা রকমের লোক যখন শ্রীশ্রীমার কাছে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের জন্যে তাঁকে জ্বালাতন করত, তখন তিনি বলতেন, "বাবার দর্শন পাইয়ে দাও, বাবার দর্শন পাইয়ে দাও বলে যত লোক এসে এই আবদার করে আমার কাছে। তিনি ওরকম বাবা কারও ন'ন। কেউ তাঁকে 'গুরু' 'প্রভু' বা 'বাবা' বলে ডাকলে তাঁর গায়ে যেন কাঁটা বিঁধত। কত তপস্বী সাধু যুগ যুগ ধ'রে তপস্যা ক'রেও তাঁকে পায়নি, আর কোনও সাধনা-তপস্যা না করেই এখানে আসে এক্ষুণি তাঁর দর্শন পেতে! আমি অত সব পারি না বাপু।"

আধুনিক যুগের কথায় শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "আজকালকার লোকেরা খুব কাজের কিন্তু; দেখ না, তারা তাঁর ফটো পর্যন্ত তুলে নিয়েছে। এই যে মাষ্টার মশাই—তিনি কি সাধারণ লোক মনে কর? ঠাকুরের সব কথা তিনি লিখে নিয়েছেন। এমন আর একটিও অবতার দেখাও দেখি যাঁর ফটোগ্রাফ আছে, আর যাঁর কথাবার্তা এমন ছেঁকে তুলে নেওয়া হয়েছে।....তাঁর কথা যে বেদবাক্য;....তাঁর ধ্যান করলে সব রকম আধ্যাত্মিক দর্শনলাভ হয়।"

আর এক সময়ে তিনি বলেছিলেন, "একটু ধ্যান-জপ করতে না করতে লোকে নানা রকম অদ্ভুত দর্শন চায়। কি লাভ হবে ওই সব অলৌকিক দর্শন পেয়ে? আমাদের ঠাকুর রয়েছেন, তিনিই সব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের বিশেষ তাৎপর্য বা বাণী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার ধারণা কি ছিল তা এই নীচের কথাবার্তায় বোঝা যাবে। কেদার মহারাজ জিজ্ঞেস্ করলেন, "মা, ঠাকুর কি এবার একটা নতুন জিনিষ দিতে এসেছিলেন, আর সেই জন্যেই কি তিনি সর্বধর্মের সমন্বয় করে দেখিয়েছেন?" শ্রীশ্রীমা বললেন, "কিন্তু বাবা, দেখ, এ তো আমার কখনো মনে হয়নি যে, সকল ধর্মের সমন্বয়ের কথা প্রচার করবার জন্যে আগে থেকে ভেবে চিন্তে ঠাকুর নানা পথের সাধনা করেছিলেন। তিনি সর্বদা ঈশ্বরের ভাব-রসে মগ্ন হয়ে থাকতেন; তাঁর বিভিন্ন লীলার আস্বাদনের জন্যেই বিভিন্নভাবে তাঁকে পুজো করতেন—খৃষ্টানেরা, মুসলমানেরা, বৈষ্ণবেরা এবং অন্য পন্থীরা যেমন ঈশ্বরের পুজো করে—আর

তাই ক'রে তিনি সেই একই বস্তু লাভ করতেন। দিনরাত্রি কোথা দিয়ে চলে যেত কোন হুশই তাঁর থাকত না। দেখ বাবা, এই কথাটি জেনে রেখো যে, এই অবতারে ত্যাগই হচ্ছে তাঁর বিশেষত্ব। এমন সহজ ভাবে সর্বত্যাগ কেউ কখনো দেখেছো কি? অবশ্য ধর্মসমন্বয়—তুমি যা বলেছ—সেও একটা কথা বটে। অন্য অন্য বারে একটামাত্র ভাবের ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত ব'লে অন্য ভাবগুলো চাপা পড়ে যেত।"

শ্রীশ্রীমা তাঁর স্বামীর ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করেছিলেন নিজ সহজাত বোধশক্তির দ্বারা, যুক্তিবিচার বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ক'রে নয়। তিনি বলতেন, "সত্যি সত্যিই ঠাকুর স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন। অপরের দুঃখকষ্ট দূর করতেই তিনি এই মানবদেহ ধারণ করেছিলেন। রাজা যেমন সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে নগরের ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করেন, সেই রকম প্রচ্ছন্ন ভাবে তিনি চলাফেরা করতেন। যে মুহূর্তে লোকে তাঁর স্বরূপ জানল, অমনি তিনি অন্তর্ধান করলেন।"

যাদের উপযুক্ত ধারণাশক্তি হয়নি, তাদের কাছে হয়ত অদ্ভুত মনে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন শোনা গেল শ্রীশ্রীমা কেঁদে কেঁদে বলছেন, "ও মা কালী, আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে!"

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর যে চৌত্রিশ বছর শ্রীশ্রীমা বেঁচেছিলেন, তার মধ্যে সকল সময়েই তাঁর চাল-চলনে আচরণে কথাবার্তায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের মনের মধ্যেই এই ধারণা দিয়েছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করার পরে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন—সেই সূক্ষ্ম যোগসূত্র ছিল অচ্ছেদ্য, অনির্দেশ্য, অনির্বচনীয়!

সেই সত্য বস্তু যখন নিজকে ব্যক্ত বা বিস্তার করে, অলীক ছায়াছবি তখন কি তার সামনে দাঁড়াতে পারে?

সার্থক শরণি

শ্রীতারাকুমার ঘোষ

এ তো প্রভু পলায়ন এ তো কৃতঘ্নতা,
সর্বজনে বিরাজিত তোমার বারতা,
পুনঃ পুনঃ ঘোষিয়াছে সকলের তরে,
সফল ক'রতে তব অমৃত-নিকরে।
আজিকার এই দৈন্য এই খণ্ড ভাব,
এই অন্ধকার, এই গভীর সন্তাপ,
এই হাহাকার মাঝে ইহাদেরে ফেলি,
আপনারে লই যদি আর সব ঠেলি,
তোমার অমৃতলোকে ধিক ধিক মোরে।

ভাবিতেছি আর বার যত দিন ধরে
এ বিশ্বে রয়েছে গ্লানি দীন অক্ষমতা,
বঞ্চিতের হাহাকার হিংসার বারতা,
তত দিন কোন মতে তব রাজ্য পরে
নাই মোর অধিকার; ততদিন ধরে
কেবল বলিতে পারি—হে দয়াল, মোর
শক্তি দাও প্রাণে প্রাণে, দৈন্য ঘোর
ঘুচায়ে তোমার বিশ্বে অমরার বাণী,
স্থাপন করিয়া যেই সার্থকতা মানি।

আমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান

স্বামী বোধানন্দ

(৪)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূজনীয় শশী মহারাজ সর্ব্বদাই মঠে থাকিতেন। শুনিয়াছি প্রথম চারি বৎসরের মধ্যে তিনি একদিনও কলিকাতায় যান নাই। মঠের সমস্ত কার্য্য একাই করিতেন। রাঁধিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ ছিল, তবুও তিনি অনেক সময় নিজে কোন কোন তরকারী রাঁধিতেন। সমস্ত কাজগুলি ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঠিক্ ঠিক্ ভাবে হইত। ঠাকুরঘর খোলা, প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর, বৈকাল ও সন্ধ্যার সেবা প্রভৃতি যথাসময়ে সম্পন্ন করিতেন। ঠাকুরঘর দর্শন করিলে মহাপাষণ্ডেরও মনে ভক্তির উদয় হইত। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরমের দিন বৈকালেও রাত্রে একখানি বড় তালপাতার পাখা লইয়া ঠাকুরের শয্যার উপর দুই তিন ঘণ্টা অবিশ্রাম বাতাস করিতেন। শশী মহারাজের সেবা দেখিলে মনে হইত ঠাকুর যেন সশরীরে সর্ব্বদাই তাঁহার সমক্ষে বিরাজমান হইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেছেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষজী, শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি মঠে থাকিলে শশী মহারাজকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু তিনি এমন উদ্যমশীল দক্ষ ও স্বাধীন লোক ছিলেন যে কাহারও সাহায্যের আশা বা অপেক্ষা করিতেন না। এমনকি প্রয়োজন হইলে অন্য স্বামীদের সশ্রদ্ধ ভাবে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। তিনি নিজে কিন্তু তামাক সেবন করিতেন না। আমরা মঠে যাওয়া আরম্ভ করিলে কখন কখন আমাদিগকে একটু আধটু ঠাকুরঘরের কাজ করিতে আদেশ করিতেন। উহার জন্য আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতাম। কুঠিঘাটার হরিদাস বড়াল নামক একটি ছোকরা শশী মহারাজের খুব প্রিয় ছিল। সে প্রত্যহ স্কুলের ছুটির পর মঠে আসিয়া আরাত্রিক পর্য্যন্ত থাকিয়া অনেক কাজ করিয়া দিত।

বরাহনগর মঠে থাকিবার সময় শশী মহারাজ একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে না ফিরিয়া প্রব্রজ্যা করিবার জন্য চলিয়া যান। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছিবার পর তাঁহার ম্যালেরিয়া হয়। সেই জন্য আর বেশী দূর না যাইয়া মঠে ফিরিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত প্রায় দুই সপ্তাহ বাহিরে ছিলেন। এই ঘটনাটি বরাহনগরের মঠ আলমবাজারে উঠিয়া যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বলরাম বসুর দেহত্যাগের পর পরমপূজনীয় স্বামীজি তপস্যা করিবার জন্য উত্তরাখণ্ডাভিমুখে যাত্রা করেন। উহার পূর্ব্বে আরও দুইবার পশ্চিমাঞ্চলে গাজিপুর কাশী প্রয়াগ মথুরা হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তপস্যাদি করিয়াছিলেন। প্রথমবার মথুরা যাইবার পথে হাতরাস্ জংসনে গুপ্ত মহারাজের (স্বামী সদানন্দ) সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ঐ ষ্টেশনে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২২ বা ২৩ বৎসর।

বিবাহ করেন নাই। স্বামীজী তাঁহার অতিথি হইয়া ২।৪ দিন ঐ ষ্টেশনে ছিলেন। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই গুপ্ত মহারাজ স্বামীজির প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে স্বামীজি চলিয়া যাইবার সময় চাকরি ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইলেন। গুপ্ত মহারাজই স্বামীজির প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য। হাতরাস্ হইতে অনেক স্থান ভ্রমণান্তে তাঁহারা হৃষীকেশে পৌঁছিয়াছিলেন। শুনিয়াছি গুপ্ত মহারাজ একদিন ক্লান্তিবশতঃ নিজের কম্বলখানি পর্য্যন্ত বহনে অসমর্থ হওয়ায় স্বামীজি তাঁহার জিনিসগুলি নিজপৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন। ঐগুলির সঙ্গে নাকি গুপ্ত মহারাজের জুতা পর্য্যন্ত ছিল।

প্রথম দুই তিন বৎসরের মধ্যে আমরা স্বামীজি, মহারাজজি ও হরি মহারাজ ছাড়া সকল স্বামীদিগকেই দেখিয়াছিলাম। বলরাম বাবুর দেহত্যাগের পর মঠ ছাড়িয়া ভ্রমণে যাইবার পর ও ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বম্বে হইতে আমেরিকা যাত্রার মধ্যে দুই তিন জন গুরুভাই ভিন্ন আর কোন গুরুভাইয়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামীজির আমেরিকা হইতে ভারত ফিরিবার পর আমি তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করি। এই সঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীররক্ষার পর কয়েক মাস স্বামীজি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বউবাজার ব্রাঞ্চ হাইস্কুলে হেডমাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি সেই স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িতাম। স্কুল বাড়ীর প্রধান দরজার সম্মুখে খানিকটা ফাঁকা জমি ছিল। স্বামীজি স্কুলে আসিবার সময় যখন সেই স্থানটি দিয়া যাইতেন, আমি দোতলায় জানালা দিয়া তাঁহার গতি নিরীক্ষণ করিতাম। তিনি প্যাণ্টালুন ও চাপকান পরিতেন। এক হাতে এণ্ট্রান্স কোর্সের এক কপি ও অপর হাতে ছাতা থাকিত। তাঁহার ঐরূপ ধীর গতি ও জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু দুইটি দেখিয়া তখনই তাঁহাকে এক অসাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে হইয়াছিল। মঠে যাতায়াত কালে যখন শুনিলাম তিনিই স্বামীজি তখন তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি আবার স্মরণে আসিল। পরে বুঝিলাম কেন প্রথম দর্শন হইতে তাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। গুরুভাইদের স্বামীজির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল এবং তিনিও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন। সকলেই তাঁহার গুণবর্ণনা-কালে গদগদ হইতেন। শশী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, মহাপুরুষজী আমাদিগকে বলিতেন, “নরেন মঠে ফিরিলেই তোমাদের সন্ন্যাস হইবে।”

আমরা যখন কাঁকুড়গাছির বাগানে ও বরাহ-নগরের মঠে যাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের সঙ্গে মিশিতাম, তখন আমাদের পাড়ার কেহ কেহ আমাদের অনুরাগের আতিশয্য দেখিয়া আমাদিগকে ‘রামক্রীশচান’ বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। কিন্তু দুই চার বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের অনেকেই ভক্ত হইয়াছিলেন। আমাদের বয়ো-জ্যেষ্ঠ এক আত্মীয় আমাদের পড়াশুনায় অবহেলা দেখিয়া একদিন হিতোপদেশের নিম্নলিখিত শ্লোকটির আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :

“অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥”

ভোলাদাদা (সুরেন) এই গানটি রচনা করিয়াছিলেন :

“বেণী বাবুর বাড়ীর সবে হলো যে যোগী।
দুর্গাপদ প্রধান যোগী, তার চেলাটি রজনী,
নগেন খগেন হরিপদ কালী মণি ইত্যাদি।”

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় আমার কাকা ছিলেন। আমাদের সহপাঠীরাও সুযোগ পাইলেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তামাসা করিত। এক দিন এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মহেন্দ্র বাবুর (মাষ্টার মহাশয়) সঙ্গে আপনাদের কি পরমহংস বলে?" কেহ কেহ খগেন, কালীকৃষ্ণ ও আমাকে লেক্ পোয়েট্স্ (Lake Poets) বলিত। বিবাহ দিবার জন্যও বাড়ীর লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় সে বন্ধনে পড়িতে হয় নাই।

১৮৯১ বা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের কয়েক জনের শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনলাভ হয়। খগেন সুশাল ভোলা দাদা ও আমি একত্রে যাইবার মতলব করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার হঠাৎ জল বসন্ত হওয়ায় উহাদের সঙ্গে যাওয়া ঘটে নাই। খগেন প্রভৃতি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিয়া জয়রামবাটী হইতে ফিরিবার পর তাহাদের মুখে তাঁহার অসীম দয়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পাইল। ঐ সময় শুনিলাম পূজনীয় নিরঞ্জন মহারাজ গিরিশ বাবুকে লইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনার্থ জয়রামবাটী যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। আমারও যাইবার ইচ্ছা নিরঞ্জন মহারাজকে বলামাত্র তিনি সস্নেহে উহা অনুমোদন করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। নিরঞ্জন মহারাজের ঐ অনুগ্রহ আমি সারা জীবনে ভুলিতে পারিব না। তিনি যাইবার পথে ও জয়রামবাটীতে থাকিবার সময় আমাকে ভারি যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনার্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব-দিন গিরিশ বাবুর বাড়ীতে নিরঞ্জন মহারাজের আদেশ মত দেখা করিলাম। তিনি আমাকে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে এবং তার পর দিন প্রত্যূষে গিরিশ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইতে বলিলেন।

ভারতবর্ষ ও 'রেয়ার-আর্থ' শিল্প

শ্রীদীনেশ্বর সেন

'রেয়ার-আর্থ' একটি ইংরেজী কথা, ইহার শব্দগত অর্থ 'দুষ্প্রাপ্য মাটি'। এই মাটিগুলি সাধারণতঃ কতকগুলি মৌলিক পদার্থ বা ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেন, ফস্‌ফরাস্, সিলিকা প্রভৃতির রাসায়নিক সম্মিলনের ফল। এইগুলির সম্যক ব্যবহার এখনও জ্ঞাত হয় নাই। এই দ্রব্যগুলির কয়েকটির দাম বাজারে অন্যান্য ধাতু বা লবণ হইতে কিছু বেশী এবং কয়েকটির দাম সাধারণ। 'দুষ্প্রাপ্য' কথা দ্বারা যাহা সচরাচর বোঝায়, এগুলি ঠিক সেইভাবে দুষ্প্রাপ্য নয়; তবে সিলিকন অক্সিজেন এলু-মিনিয়াম লৌহ প্রভৃতির মতন পরিচিত বা সহজপ্রাপ্যও কোন কোন স্থানে নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

শিল্পক্ষেত্রে ইহাদের কয়েকটির ব্যবহার প্রসার-লাভ করিয়াছে। ইহাদের রসায়ন আর অন্যান্য গুণাগুণ-নির্ধারণের বিরাম নাই। পরিচিত 'রেয়ার-আর্থগুলি'কে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—সিরিয়াম, টারবিয়াম ও ইট্রিয়াম শ্রেণী। এদের গুণাগুণ অনেকটা প্রায় সমান। 'ইট্রিয়াম' নিজে 'রেয়ার-আর্থ' নয়, তবু 'রেয়ার-আর্থ'-গুণসম্পন্ন, আর প্রকৃতিতে 'রেয়ার-আর্থ' এর সঙ্গেই মিলে বলিয়া ইট্রিয়াম-শ্রেণীর 'রেয়ার-অর্থ'গুলিকে ইট্রিয়াম-শ্রেণী-ভুক্ত করা হয়। ইহাদের 'এটমিক সংখ্যা-নির্দেশ' বা এটমিক নাম্বার, 'এটমিক ওজন' বা এটমিক ওয়েট প্রভৃতিকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায় :

রেয়ার আর্থের মৌলিক পদার্থ	এটমিক সংখ্যানির্দেশ : 'এটমিক নম্বর'	এটমিক ওজন : 'এটমিক ওয়েট'
সিরিয়াম শ্রেণী :		
ল্যানথানাম	৫৭	১৩৮.৯৩
সিরিয়াম্	৫৮	১৪০.১৩
প্রেসোডিমিয়াম	৫৯	১৪০.৯২
নিওডিমিয়াম	৬০	১৪৪.২৭
সামারিয়াম	৬২	১৫০.৪৩
টারবিয়াম শ্রেণী :		
ইউরোপীয়াম্	৬৩	১৫২.০
গ্যাডোলিনিয়াম্	৬৪	১৫৬.৯
টারবিয়াম্	৬৫	১৫৯.২
ডিসপ্রোসিয়ম্	৬৬	১৬২.৪৬
ইট্রিয়াম শ্রেণী :		
হোলমিয়াম্	৬৭	১৬৩.৫
আরবিয়াম্	৬৮	১৬৭.২
থুলিয়াম্	৬৯	১৬৯.৪
ইটারবিয়াম্	৭০	১৭৩.০৪
ল্যুটেসিয়াম্	৭১	১৭৪.৯৯
"ইট্রিয়াম্"	৩৯	৮৮.৯২

ইহাদের নাইট্রেট ক্ষারজাতীয় ধাতুসমূহের সহিত উৎপন্ন 'ডবলনাইট্রেট', সালফেট, ক্লোরাইড্ প্রভৃতি লবণ জলে দ্রবণীয় এবং 'অক্সালেট,' ফ্লুরাইড, হাইড্রক্সাইড, ফসফেট্ প্রভৃতি লবণ জলে অদ্রবণীয়।

আধুনিক নিম্নলিখিত শিল্পে ইহাদের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে :

কাচশিল্প

কাচকে রংহীন করণে—সিরিয়াম (৪) ব্যবহার করিয়া কাচকে রংহীন করা যায়। কাচে অনেক সময় যে লোহার অংশটুকু থাকে, সেটুকুকে অক্সিডাইজ করে এই সিরিয়াম। ডিডিসিয়াম-কার্বনেটও এই কাজে ব্যবহার করা হয়।

কাচের রংকরণে—'টিটানিয়াম'এর সঙ্গে হলদে রংএর 'সিরিয়াম টিটানেট' যোগ করিয়া হলদে রং করা যায়। নিওডিমিয়াম ঈষৎ লাল (পার্পল) রং উৎপন্ন করে।

চশমার লেন্স্ তৈরী করণে—যেখানে হলদে রং চুষে নেওয়া দরকার, সেখানেও লাগে। সিরিয়ামের একটি গুণ 'আলট্রা-ভায়লেট' বা বেগুনী উত্তর আলোতরঙ্গের প্রতিরোধক (ওপেক) এই গুণসম্পন্ন কাচ তৈরীকরণেও 'সিরিয়ামের' দরকার।

চশমা প্রভৃতির কাচ পরিষ্কার করণে—আগে পালিশ চূর্ণ হিসাবে 'রুজ' পাউডার প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। এখন ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে কাজ করা যায় 'সিরিয়াম অক্সাইড' ব্যবহার করে।

দামী ক্যামেরা ও এরোপ্লেন হইতে ছবি তুলবার জন্য ক্যামেরাতে দামী লেন্স দরকার। এদের জন্য দরকার বেশী 'রিফ্রাকশন' আর কম 'ডিসপার্শন,' এক রকম 'বালুহীন' নূতন কাচ তৈরী করা হয় পরিস্রুত ল্যানথানাম্

অক্সাইড্ দিয়া। এই কাচের লেন্স উপরোক্ত টাইপ ক্যামেরা ও 'এরিয়েল ফটোগ্রাফী'র কাজে ব্যবহৃত হয়।

আলোকশিল্প

সিনেমা ষ্টুডিওর আলোতে বা অন্যস্থানে যেখানে স্বাভাবিক সূর্য্যের আলোর নকল করা দরকার সেখানে ব্যবহৃত হয় 'কার্বন-আর্ক'। দুটী কার্বন বা কয়লার কাঠির মধ্যে উগ্র আলোর এবং তাপের ক্ষুদ্র সংস্করণ এই 'কার্বন আর্ক'। এই কয়লার কাঠির ভিতর মধ্যস্থলে থাকে সিরিয়াম শ্রেণীর অক্সাইড ও ফ্লুরাইড লবণগুলির মিশ্রণ।

থোরিয়াম যদিও 'রেয়ার-আর্থ' নয় তবু মনাজাইট বালুতে মোটামুটি শতকরা ৬ ভাগ থাকে থোরিয়াম অক্সাইড। ইহা হইতে তৈরী হয় থোরিয়াম নাইট্রেট। এই থোরিয়াম নাইট্রেট এবং অতি সামান্য পরিমাণে সিরিয়াম, আধুনিক কালের উজ্জ্বল আলোর আর একটি উপায় বিভিন্ন গ্যাসলাইটের 'ম্যান্টল' তৈরী-করণে অপরিহার্য্য।

রাসায়নিকের রাসায়নিক দ্রব্য (রিএজেন্ট কেমিক্যাল) হিসাবে একটী নূতন 'কেমি-ক্যাল' আবিষ্কার হয়েছে। এর নাম 'এমো-নিয়াম হেক্সানাইট্রো-সিরেট্'।

ধাতুশিল্প

বিভিন্ন বিশুদ্ধ ধাতু দ্রব্যনির্মাণের পুরাতন উপাদান; 'রেয়ার-আর্থ'গুলি এই সকলের সাহায্যেও আসে। মিশ্ মেটাল্ বা মিক্সড্ মেটাল্ শতকরা ৪৫ হইতে ৫০ ভাগ 'সিরিয়াম্'; ২২ হইতে ২৫ ভাগ 'ল্যানথানাম্,' ১৫-১৭ ভাগ 'নিও-ডিমিয়াম,' ৮ হইতে ১০ ভাগ অন্যান্য রেয়ার-আর্থ, ৫ ভাগ লৌহ ও ১ ভাগ সিলিকন, ক্যাল-সিয়াম, কার্বন ও এলুমিনিয়াম খুব সামান্য মাত্রায় থাকে।

'ফেরোসিরিয়াম্' শতকরা ১০-১৫ ভাগ লোহা, বাকীটা 'মিশ্ মেটাল্' 'ফ্লিন্ট্' বা অগ্নি-উৎপাদক ঘর্ষক হিসাবে যে লোহার টুকরা ব্যবহার করা হয়, তাতে বেশীর ভাগ 'সিরিয়াম্,' ১৮ হইতে ৩০ ভাগ লোহা, সামান্য দস্তা, এলুমিনিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম্, ক্যাল্সিয়াম্ এবং সিলিকন্ও থাকে।

এনামেল— সিরিয়ামের উচ্চ অক্সাইড্ বা সিরিক-অক্সাইড এনামেল তৈরীতে লাগে। এনামেল 'ফ্লিন্ট' এর সঙ্গে শতকরা দুই ভাগ দেওয়া হয়।

চীনামাটির বাসন বা পোর্সিলেন শিল্প

চীনামাটির বাসন চকচকে করবার জন্য দেওয়া হয় 'গ্লেজ'। এই 'গ্লেজ' তৈরী-করণেও 'সিরিক অক্সাইড' ব্যবহৃত হয় বিশেষ বিশেষ স্থানে।

'রেয়ার-আর্থ'গুলির একটি প্রধান খনিজ বা কাঁচা মাল 'মনাজাইট' বালু। পরিস্রুত 'মনাজাইট' বালুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ মোটামুটি ল্যানথানাম্ অক্সাইড্ ১৫·৬, সিরিয়াম্ অক্সাইড্ ২৮·৮, প্রেসোডিমিয়াম্ অক্সাইড্ ৩·৬, নিও-ডিমিয়াম্ অক্সাইড্ ১১·৪, সামারিয়াম্ অক্সাইড ১·২, টারবিয়াম শ্রেণীর রেয়ার আর্থ অক্সাইড্ ·৮, ইট্রিয়াম শ্রেণীর ·৩২, থোরিয়াম অক্সাইড্ ৬·৫, ইউরেনিয়াম অক্সাইড ·২, ক্যালসিয়াম, আইরণ, এলুমিনিয়াম প্রভৃতির অক্সাইড্ ১, বালু ১·৫ ও ফসফরাস পেণ্টঅক্সাইড্ ২৮; খুব সামান্য পরিমাণে রেডিয়াম ও মেসোথোরিয়াম থাকে।

মনাজাইটকে রাসায়নিক পরিভাষায় কিঞ্চিৎ 'থোরিয়াম'-বিশিষ্ট সিরিয়াম-শ্রেণীর অর্থো-ফসফেট্ লবণ বলা হয়। এগুলি দানাদার

একরকম বালু, নদী ও সমুদ্র-সৈকতে ম্যাগনেটাইট্, ইলমেনাইট্, রুটাইল্, জারকন, গারনেট প্রভৃতির ছোট বালুকণার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। মনাজাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫ হইতে ৫·৫। ম্যাগনেটাইট ইলমেনাইট প্রভৃতি হইতে আপেক্ষিক গুরুত্বের সুযোগ নিয়ে বা বৈদ্যুত চুম্বক উপায়ে মনাজাইটকে পৃথক করা হয়। বিশুদ্ধ মনাজাইট-এর দানার আপেক্ষিক শক্ততার (হার্ডনেস্) পরিমাণ 'মহ'র স্কেল (Moh's Scale) অনুযায়ী ৫ হইতে ৫.৫।

ভারতবর্ষে ত্রিবাঙ্কুরে মনাজাইট বালু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পৃথিবীর চাহিদা মিটাইবার একটি প্রধান স্থল ভারতবর্ষ; সুতরাং কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এখান হইতে বহু পরিমাণ মনাজাইট বালু চালান গিয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকার মনাজাইট চালান নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মনাজাইট হইতে প্রাপ্তব্য থোরিয়াম প্রভৃতি মৌলিক ধাতুগুলি তদ্দেশীয় এটোমিক এনার্জি কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভারতেও একটি এটমিক এনার্জি কমিশন স্থাপিত হইয়াছে।

অথচ ভারতবর্ষে 'রেয়ার-আর্থ' শিল্প বলিয়া কোন শিল্প নাই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এবং এখনও বহুসংখ্যক 'গ্যাসমাণ্টল' সিনেমা কার্বন, ক্যামেরা চশমা উচ্চ শ্রেণীর কাচ এবং কাচবিশিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানী হইতেছে। ক্যামেরাবাহী, চশমাধারী, সিগারেটসেবী ও সিনেমা-অনুরাগীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহাদের কল্যাণে ক্যামেরা চশমা সিগারেট সিনেমাকার্বন প্রভৃতি বাবদ আমরা ক্রমবর্দ্ধমান টাকার সংখ্যা বাহিরে পাঠাই, যদিও কাঁচামাল আমাদেরই হাতে।

প্রার্থনা

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য

নয়নে আমার দাও প্রেমের অঞ্জন,
অপরূপ তব লীলা করি দরশন।
সূর্য্যে চন্দ্রে আকাশের লক্ষ তারকায়,
স্থাবরে জঙ্গমে দেখি জাগরে নিদ্রায়,
ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে পরিদৃশ্যমান
গেয়ে ওঠে শুনি তারা তব জয়গান।
ধরিয়া তোমার মূর্ত্তি বিশাল জগৎ,
ইঙ্গিতে দেখায় তব মন্দিরের পথ।
খুলে দাও, খুলে দাও দেউলের দ্বার
বহি' আনিয়াছি দেব পূজা-উপচার।
কৃপা করি কৃপাময় করহ গ্রহণ,
পরশ করিতে চাহি রাতুল চরণ।
পরশনে একাকার, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ব্যোম
প্রণব-নিনাদে ঘোষে 'তৎ সৎ ওম্'।

ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্‌-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

(৪)

পূর্ব্বমীমাংসকগণের সিদ্ধান্তের আলোচনা

পূর্ব্বমীমাংসকগণের দুইটি প্রস্থানের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি—ভট্টপ্রস্থান ও প্রভাকর-প্রস্থান। কুমারিল-ভট্টপাদ রচিত 'শ্লোকবার্ত্তিকে' 'চোদনা'-সূত্রের ২১ শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রাচীন ব্যাখ্যাতা সুচরিত মিশ্র (ইনি মৈথিলী এবং পার্থসারথি মিশ্রের পূর্ব্বভাবী) বলিয়াছেন—প্রভাকর-সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে বেদবাক্য-মাত্রই কার্য্যার্থের প্রতিপাদক, কিন্তু সিদ্ধবস্তুর প্রতিপাদক বেদবাক্য হইতেই পারে না। ইহাতে শঙ্কা এই যে বেদবাক্য-মাত্রই যদি সিদ্ধবস্তুর প্রতিপাদক না হয় তবে অনাদি অনন্ত বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম উপনিষদ্‌-বাক্য হইতে সিদ্ধ হইবেন কিরূপে?—'কথমনাত্মনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম উপনিষদ্ভ্যঃ সেৎস্যতি, (৭০ পৃঃ ত্রিবান্দ্রম্‌ সিরিজ)। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু, তাহা কার্য্যরূপ নহে। বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু বলিয়া তাহা প্রাভাকর-মতে উপনিষৎপ্রতিপাদ্যই হইতে পারিবে না। আরও কথা এই যে, উপনিষদ্বাক্যসমূহ বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক না হইলে তাহারা কোন্‌ কার্য্যরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইবে? কার্য্যরূপ অর্থই যদি বেদবাক্যের প্রামাণ্য হয়, তবে উপনিষদ্রূপ কার্য্য অর্থের কোন প্রামাণ্য হইবে? এতদুত্তরে প্রভাকর বলেন, উপনিষদ্বাক্যসমূহ বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতার উপদেশ করিয়া থাকে। সর্ব্বত্রই বেদবাক্য কোন না কোন কর্ত্তব্য অর্থেরই উপদেশ করিয়া থাকে। সিদ্ধবস্তুর উপদেশ বাক্যের স্বভাবই নহে। লৌকিক বাক্যও কোন না কোন অর্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে। উপনিষদ্বাক্যসমূহ তাদৃশ ব্রহ্মের প্রতিপত্তির কর্ত্তব্যতাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।' বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম জানীয়াৎ'—উপনিষদ্‌-বাক্যে জ্ঞানেই বিধি করা হইয়া থাকে। জ্ঞানে বিধি হয় না এরূপ বলা যায় না। 'আত্মা দ্রষ্টব্যঃ'—ইত্যাদি বিধি উপনিষদ্বাক্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান-বিধায়ক উপনিষদ্‌-বাক্য হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ আত্মাকে জানিবে। ইহাতে শঙ্কা এই যে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের কর্ত্তব্যতাতে যদি উপনিষদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হয়, তবে উপনিষদ্‌-বাক্য হইতে ব্রহ্মস্বরূপের সিদ্ধি হইতে পারে না। একটি বাক্যের দুইটি অর্থে তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্যের ভেদ স্বীকার করিলে বাক্যেরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। তাৎ-পর্য্যের ভেদে বাক্যের ভেদও পড়িবে। আর তাহাতে বাক্যভেদই দোষ হইবে। মাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানের কর্ত্তব্যতাতে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে সেই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের সিদ্ধি হইতে পারে না। অন্যতাৎপর্য্যক শব্দ অন্য অর্থের প্রমাণ হইতে পারে না। তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত অর্থেই

শব্দের প্রমাণ হইয়া থাকে। জ্ঞানের কর্ত্তব্যতাতেই যদি উপনিষদ্‌-বাক্যের তাৎপর্য্য হয়, তবে ব্রহ্মস্বরূপে সেই বাক্যের তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইবে না। আর তাহাতে উপনিষদ্‌বাক্য ব্রহ্মস্বরূপের প্রমাণও হইবে না। উপনিষদ্‌বাক্যই যদি ব্রহ্মস্বরূপের প্রমাণ না হয়, তবে ব্রহ্মস্বরূপ-সিদ্ধি আর কোন প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হইবে না—ব্রহ্মস্বরূপ অপ্রামাণিক হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মজ্ঞানের কর্ত্তব্যতা-বিধান করিলে ব্রহ্মস্বরূপসিদ্ধি হয় না বলা হইয়াছে, যেমন যদি কাহাকেও এরূপ উপদেশ করা যায় 'এবং জানীয়াৎ'—ইহাকে এইরূপ জানিবে। তাহাতে বস্তুরও এবংরূপতা সিদ্ধ হয় না। অনেবংরূপ বস্তুকেও 'এবং জানীয়াৎ' এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ এই যে, বনগমনের সময়ে সুমিত্রা লক্ষ্মণকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্॥"

ইহার অর্থ—'হে লক্ষ্মণ, তুমি রামকে দশরথ বলিয়া জানিবে, সীতাকে আমি সুমিত্রা বলিয়া জানিবে এবং অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া জানিবে।' সুমিত্রা জ্ঞানেই বিধি করিয়াছেন। রামকে দশরথ বলিয়া জানিবে—এই বাক্যদ্বারা রামের দশরথরূপতা সিদ্ধ হয় নাই। অদশরথ রামকেই দশরথরূপে জানিবার বিধি করা হইয়াছে। এইরূপ অব্রহ্ম জীবকে ব্রহ্মরূপে জানিবার জন্য বিধি করা যাইতে পারে। ইহাতে জীবের ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয় না। এইরূপ যাহা জ্ঞানানন্দরূপ নহে তাহকেও জ্ঞানানন্দরূপ বলিয়া জানিতে বিধি করা যাইতে পারে। লোকেও এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে—'ইহাকে পিতা বলিয়া জানিবে'—অপিতাকে পিতারূপে জানিবার বিধি হইতে পারে। তাহাতে অপিতার পিতৃত্বসিদ্ধি হয় না। বেদেও এইরূপ দেখা যায় অনুদ্গীথ ওঙ্কারকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবার বিধি করা হইয়াছে।

'ওঁ ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত'—এই বিধিবাক্যদ্বারা ওঙ্কারের উদ্গীথরূপতা সিদ্ধ হয় নাই। ইহাতে যদি প্রাভাকরগণ এরূপ বলেন—ব্রহ্মজ্ঞানবিধায়ক উপনিষদ্‌ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপসিদ্ধি হইতে পারিবে, তাহা হইলে সুচরিতমিশ্র বলিয়াছেন যে, প্রাভাকরগণের এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে, কারণ প্রমাণান্তর দ্বারা জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিবে কে? সংসারী পুরুষ না মুক্তপুরুষ? বদ্ধজীব না মুক্তজীব? সংসারী পুরুষ শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাতাতিরিক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে অধিকারী নহে। সংসারী জীব দেহকেই আত্মরূপে জানিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহারা আত্মাকে দুঃখী অনিত্য এবং জড়রূপ বলিয়া জানেন। সুতরাং সংসারী জীব প্রমাণান্তর দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। আর যাঁহারা অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তিতে অবিদ্যোপাদানক শরীরেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চকে উৎখাত করিয়া মিতি মাতৃ মেয় ও মান এই চতুর্ব্বিধ বিভাগকে সমূলে উৎখাত করিয়াছেন, আর তাহাতে অপরিস্পন্দ আনন্দৈকরস-ফলীভূত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন্‌ প্রমাণের সাহায্যে ব্রহ্মকে জানিবেন? সুতরাং প্রমাণান্তর দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে এইরূপ বলা যাইতে পারে না। অতএব প্রাভাকরগণ যে বলিয়াছিলেন কর্ত্তব্যরূপ অর্থেই বেদবাক্য প্রমাণ তাহা নিতান্তই অসঙ্গত। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি যেমন কার্য্যরূপ অর্থের প্রতিপাদক, সেইরূপ ব্রহ্মকাণ্ডীয় শ্রুতি নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক ইহাই বলিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম আর বেদার্থ হইতে

পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কুমারিল ভট্টের প্রস্থানানুসারী এবং প্রভাকরের প্রস্থানানুসারী মীমাংসকগণ ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপতা এবং জীবের ব্রহ্মরূপতা স্বীকার করেন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য ইহাই শ্রৌতসিদ্ধান্ত। ইহা নৈয়ায়িকগণও বলিয়াছেন, মীমাংসকগণও বলিতেছেন। অতএব আপাতদৃষ্টিতে মতবিরোধ থাকিলেও নৈয়ায়িক বৈশেষিক ও মীমাংসকগণ সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—যাহা উপনিষৎসিদ্ধান্ত। যাঁহারা পৌরুষেয় আগমান্তর হইতে ঈশ্বরোপাসনা বা ভগবদুপাসনাতে পৌরুষেয় আগমান্তরের তাৎপর্য্য থাকায় উপনিষৎসমূহেরও তাহাই তাৎপর্য্য ইহা মনে করিয়া ঈশ্বর বা ভগবানের উপাসনাতেই উপনিষৎসমূহ বিশ্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া জগতের সত্যত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াস করেন ও জীব এবং ব্রহ্মের সুদৃঢ় ভেদ ব্যবস্থাপনের চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপাসনাতেই বিশ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের সহিত কাহারও বিরোধ নাই। উপাসনা পরিণামবাদে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে জগতের সত্যত্ব ও উপাস্য-উপাসকের ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। যাঁহারা উপাস্যতত্ত্ব ব্যতীত জ্ঞেয়তত্ত্ব বলিয়া কিছু স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্বকীয় মর্য্যাদায় স্থিত না থাকিয়া জ্ঞেয়তত্ত্ববাদিগণের সিদ্ধান্তে বৃথাই দোষারোপ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ প্রপঞ্চ-সত্যত্ব জীবব্রহ্মের ভেদ প্রভৃতি আপামর জনসাধারণের কোন উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই সিদ্ধ আছে। তাহার সিদ্ধির প্রয়াস বিড়ম্বনা ও অনধিকার আলোচনামাত্র। যাহা হউক আমরা মীমাংসকগণের দুই একটি কথা বলিয়াছি, আরও দুই একটি কথা বলিব। ১।১।৫ 'জৈমিনিসূত্রে'র ব্যাখ্যাতে মহামতি প্রভাকর মিশ্র আত্মার স্বরূপনির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা। ভোগের জন্য জীব ধর্ম্ম করে, আবার সেই জীব কর্ম্মের ফলভোগ করে। এইরূপে আপাত-সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া প্রভাকর শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন যে আত্মাকে ত কর্ত্তা ও ভোক্তা বলা যায় না। কারণ, শাস্ত্রে অহঙ্কার ও মমকার অনাত্মাতে আত্মাভিমান-মাত্র বলা হইয়াছে। অহমভিমান দ্বারা আত্মা কর্ত্তা ও মমত্বাভিমান দ্বারা আত্মা ভোক্তা হইয়া থাকেন। 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে' (গীতা)। সুতরাং আত্মাকে কর্ত্তা ভোক্তারূপে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় নাই। এতদুত্তরে প্রভাকরমিশ্র বলিয়াছেন যে পূর্ব্বপক্ষিগণ যে অনাত্মাতে আত্মাভিমানের কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু সে কথা মৃদিতকষায় মুমুক্ষু পুরুষের নিকটে বলিতে হইবে—'তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় পরং পারং দর্শয়তি ইতি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।' বীতরাগ পুরুষের নিকট যাহা বলা উচিত তাহা রাগী পুরুষের নিকট কখনও বলিতে হইবে না। আমরা বেদের কর্ম্মকাণ্ড-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কর্ম্মসঙ্গী পুরুষ রাগী পুরুষ। রাগী পুরুষের নিকটে সেই কথা কখনও বলা যাইতে পারে না। 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্'—ইহা ভগবান্ দ্বৈপায়ন-প্রণীত মহাভারতান্তর্গত গীতোক্তি। সুতরাং ভগবান ভাষ্যকার শবরস্বামীও শাবরভাষ্যে রহস্যাধিকারের কথা আলোচনা করেন নাই। দ্বৈপায়নের রচনানুসারেই ভাষ্যকার তাহা করেন নাই। কিন্তু আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ যে ভাষ্যকার জানেন না তাহা নহে। আত্মার যাদৃশ স্বরূপ জানিলে আত্মার কর্ম্মাধিকার উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাদৃশাত্মস্বরূপের উপদেশ কর্ম্মসঙ্গী পুরুষের নিকট কখনই করিতে হইবে না। (বৃহতী, ২৩ পৃঃ

Madras University Edition). আমরা 'সিদ্ধান্তবিন্দু'র টীকা 'ন্যায়রত্নাবলী'তে দেখিতে পাই যে গৌড়ব্রহ্মানন্দ প্রাভাকর-গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়া বেদান্ত-মতের সহিত প্রাভাকর-মতের অবিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। "আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মৈব তথাপি কর্ম্মপ্রসঙ্গে ন তথা বাচ্যম্, উক্তং হি কৃষ্ণেন ভগবতা—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্' ইতি প্রাভাকরগ্রন্থগতোক্তেঃ" (৩৫৪ পৃঃ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'সিদ্ধান্তবিন্দু')। কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার 'শ্লোকবার্ত্তিকে' বলিয়াছেন যে ভাষ্যকার শবরস্বামী তাঁহার ভাষ্যে আত্মার ততটুকু রূপই প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা জানিলে মানুষের নাস্তিক্যের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে তাহারা নাস্তিক। দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মবাদীই আস্তিক। ভাষ্যকার শবরস্বামী মাত্র নাস্তিক্য-নিরাকরণের জন্যই আত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু আত্মার যথার্থস্বরূপের উদ্‌ঘাটন করেন নাই। যাঁহারা আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিলে বিশেষ ভাবে জানিতে পারিবেন—"ইত্যাহ নাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণুরাত্মাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা। 'দৃঢ়ত্বমেতদ্-বিষয়স্ত বোধঃ প্রযাতি বেদান্তনিষেবণেন॥" ('শ্লোকবার্ত্তিক-আত্মগ্রন্থ') সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত-সিদ্ধান্তে যাহা বলা হইয়াছে ভট্ট এবং প্রভাকরও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্যই 'ন্যায়রত্নাবলী' গ্রন্থে গৌড়ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, "ভট্টপ্রভাকরয়োস্ত বেদান্তদর্শনে বিদ্বেষাভাবঃ"। এইস্থলে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে বৈদিক দার্শনিকগণ কখনও বেদবিরুদ্ধ মতের প্রচার করিতে পারেন না। যে স্থলে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ কথা আছে তাহার অভিপ্রায়ও ভিন্ন বুঝিতে হইবে। অধিকারীর বৈচিত্র্য-প্রযুক্তই কোন স্থলে মূল সিদ্ধান্তের অনুকূলে কিঞ্চিৎ অন্যথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাতে তাঁহাদের তাৎপর্য্য নাই। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে মহর্ষি অক্ষপাদ যদি কেবল আত্মাদি দ্বাদশটি প্রমেয়ের উপদেশ করিয়া বিশ্রান্ত হইতেন—সংশয়-প্রয়োজনাদি চতুর্দ্দশটি পদার্থের আলোচনা না করিতেন, তবে এই শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র না হইয়া উপনিষদের মত অধ্যাত্মবিদ্যা-মাত্র হইয়া থাকিত। উপনিষদ ত্রয়ীর অন্তর্গত, আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রও ত্রয়ীর অন্তর্গত হইয়া পড়িত, আর তাহাতে বিদ্যা আর চতুর্ব্বিধ থাকিত না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অধ্যাত্মবিদ্যা ইয়ং স্যাৎ যথা উপনিষদঃ"—সূত্রকার অক্ষপাদ আত্মা শরীর ইন্দ্রিয় অর্থ বুদ্ধি মন প্রবৃত্তি দোষ প্রেত্যভাব ফল দুঃখ ও অপবর্গ এই দ্বাদশটি প্রমেয় বলিয়াছেন। ভাষ্যভায় বলিয়াছেন এই দ্বাদশটি প্রমেয়ের আদি ও অন্ত দুইটি প্রমেয়, অর্থাৎ আত্মা ও অপবর্গ এই দুইটি উপাদেয় প্রমেয় এবং মধ্যবর্ত্তী দশটি হেয়। এই হেয়বর্গের সত্যতা উপপাদনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত।

ভারতের সমাজে নারী

শ্রীমতী অমিয়া সেন, এম্‌.এ

পরিবর্তনই জগতের ধর্ম। বদলায় না এরূপ পদার্থ নেই সমাজে। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা সবই পরিবর্তনশীল। এক যুগের রীতি, নীতি, সামাজিক ব্যবস্থা অন্য যুগে অচল হয়ে পড়ে—পুরাতন স্থান ছেড়ে দেয় নূতনকে। তাই বিখ্যাত ইংরেজ কবি টেনিসন্ (Tennyson) বলেছেন—"Old order changeth, yielding place to new." কিছুদিন আগেও যে সমাজ-ব্যবস্থা, যে শাসনব্যবস্থা আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছিলাম তা আজ আমরা আর যথেষ্ট বলে গ্রহণ করতে পারছি না। আজ আমরা ভারতের নারীকে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত দেখি। রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী, রাজ্যপাল, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী—এক কথায় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই আপন প্রতিভাকে নারী প্রতিষ্ঠিত করেছে। সারা বিশ্বের নারীসমাজ আজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাকিয়ে রয়েছে ভারতের নারীর দিকে—শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করছে তার বিরাট সম্ভাবনার নিকট। এই সময়ে যদি আমরা বৈদিক যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের নারী সম্বন্ধে আলোচনা করি তবে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বৈদিক যুগে পরিবারে পিতার প্রাধান্যই ছিল সব চেয়ে বেশী। সাধারণতঃ তখনকার লোক পুত্রকামনায় যাগযজ্ঞ করতেন, যদিও কন্যাসন্তান কেউ কামনা করতেন না তবুও কন্যা জন্মালে তাকে যত্নের সহিত লালন করা হ'ত। মেয়েরা পিতৃগৃহে যথেষ্ট শিক্ষা পেতেন; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেদের সূক্ত রচনা করে ইতিহাসে পণ্ডিত বলে পরিচিতা হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশ্ববারা, অপালা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাল্যবিবাহ-প্রথা বৈদিক যুগে অচল ছিল। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হলে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হ'ত। সাধারণতঃ পিতামাতা কন্যার বিবাহ স্থির করতেন, তবে কখনও কখনও কন্যা স্বয়ংই নিজের পতি নির্বাচন করত। কন্যার পিতৃগৃহে বিবাহকার্য সম্পন্ন হ'ত। পুরুষের বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকলেও তার সংখ্যা খুব কম ছিল। বিধবা-বিবাহের উদাহরণও আমরা এই যুগে পাই। গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন স্ত্রী; তিনি স্বামীর সঙ্গে নানারূপ উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। মেয়েরা অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন বটে, কিন্তু পর্দাপ্রথা ছিল না এবং দৈনন্দিন জীবনে স্ত্রী গৃহের বাইরেও স্বামীর সহকর্মিণী ছিলেন। সে যুগের সমাজে ঋষিরা ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী—তাঁরা মেয়েদের এই সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন নি। অনেক ঐতিহাসিকের মতে মেয়েরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন এবং পুরোহিতও হতে পারতেন।

এর পরে আমরা উপনিষদের যুগে আসি। বৈদিক সমাজ হতে এ যুগের সমাজে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কন্যাসন্তান কেউ কামনা করতেন না। শাসনব্যবস্থায় মেয়েদের যোগ দেবার অধিকার ছিল না, উত্তরাধিকার-সূত্রেও তাঁরা কিছু পাবার যোগ্যা বলে গণ্য হ'তেন না। প্রায় প্রতি পরিবারেই এক জন

পুরুষের একাধিক স্ত্রীর অবস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই স্বামীর সঙ্গে উপাসনা ও যাগযজ্ঞাদিতে যোগ দিতে পারতেন। এ যুগের মেয়েরাও উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়—বহু দার্শনিক বিচারসভায় মহিলারা সভানেত্রীর কাজ করছেন। রাজর্ষি জনকের সভাগৃহে যখন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সভাস্থ সকলকে পরাজিত করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে প্রচার করলেন, তখন মহিলা ঋষি গার্গী তাঁর সঙ্গে বাদে প্রবৃত্তা হন। আবার যখন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করে তপস্যায় যাওয়ার উদ্যোগ করলেন—মৈত্রেয়ী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি আমায় যা দিতে চাচ্ছেন তা দিয়ে কি আমি অমরত্ব লাভ করতে পারবো ?" উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য জানালেন—"না, তা পারবে না, তবে তুমি পৃথিবীতে কোন দিন কষ্ট পাবে না।" যাজ্ঞবল্ক্যকে বিস্মিত করে দিয়ে মৈত্রেয়ী বল্লেন—"যা দিয়ে আমি অমরত্ব লাভ করতে পারবো না তা নিয়ে আমি কি করবো ?" সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য সম্পত্তি কাত্যায়নীকে দান করে মৈত্রেয়ী লাভ করলেন ব্রহ্মজ্ঞান। বিবাহের রীতি-নীতি এযুগে কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং বাল্যবিবাহের উদাহরণ এই সময়ে পাওয়া যায়।

উপনিষদের পরে এল মহাকাব্যের যুগ। সমস্ত ভারতবর্ষে আর্যদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল, ফলে সামাজিক অবস্থারও বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। যে সকল প্রথা উত্তরে প্রচলিত ছিল সেগুলি মধ্যভারতে অনুষ্ঠিত হলে গণ্য হ'ত—উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দক্ষিণভারতের মেয়েরা মধ্যভারতের ভগ্নীদের অপেক্ষা স্বাধীন ছিলেন। তবে মোটামুটি বলা যায় যে স্বগোত্রে বিবাহ চলত এবং বিধবা-বিবাহ সমগ্র ভারতেই শাস্ত্রসম্মত ছিল। প্রাচীনতম শাস্ত্রকারগণও বিধবাদের সহমরণ অনুমোদন করতেন না। কিন্তু তবুও উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন কোন স্থানে সতীদাহ-প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রী উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে স্বামীর চিতায় প্রবেশ করতেন। স্ত্রীলোকের বহু বিবাহের উদাহরণ পেলেও সাধারণতঃ উহা প্রচলিত ছিল না। মহাকাব্যের যুগের মেয়েরাও যে আপন স্বাতন্ত্র্য, ন্যায়নিষ্ঠা হারান নি তার প্রমাণ মহাকাব্য হতেই পাওয়া যায়। অজ্ঞাতবাসের শেষে যখন পঞ্চপাণ্ডব দুর্যোধনের নিকট শুধু পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করেছিলেন, তখন দ্রৌপদী তাঁদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আপনার দুঃসহ অপমানের কথা এবং ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তাঁদের। আবার মাতা গান্ধারী যুদ্ধযাত্রী পুত্র দুর্যোধনকে কখনও বলেন নি—"তুমি জয়ী হও", বরং বলেছিলেন, "ধর্ম যেন জয়ী হন।"

তার পর এল বৌদ্ধ যুগ। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস আমরা গ্রীকদূতগণের বিবরণ ও বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক হতে পাই। মেয়েরা তখন শিক্ষা পেতেন; তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং কৌমার্যব্রত গ্রহণ করতেন। তবে সাধারণতঃ বিবাহিতা রমণীদের শাস্ত্রে ও দর্শনে অধিকার ছিল না, কারণ ব্রাহ্মণদের ভয় ছিল যে হয় তারা ঐ জ্ঞান অব্রাহ্মণের নিকট প্রকাশ করবে, নয়তো সংসার ত্যাগ করে চলে যাবে; কারণ প্রকৃত জ্ঞানলাভ হলে জন্ম, সুখ-দুঃখ তুচ্ছ বোধ হয়। ইহা হ'তে বোঝা যায় যে সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের বলা হ'ত 'থেরী'; তাঁদের রচিত শত শত গাথা পাওয়া যায়। মেয়েদের মঠের অস্তিত্বও আমরা পাই; মেয়েরা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে জীবনের ব্রত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন—এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। নারী আপন স্বাতন্ত্র্য ঐ যুগে হারান নি, কারণ আমরা দেখি মা তাঁর পুত্রকে যুদ্ধে যেতে উৎসাহ দিচ্ছেন ও বলছেন, "ঘরের কোণে লুকিয়ে জীবনকাটানো অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা ভালো।" গ্রীক দূতগণের লিপি হতে জানা যায় যে রাজার দেহরক্ষী ছিলেন মেয়েরা, এমন কি যখন রাজা মৃগয়ায় যেতেন তখনও তাঁর নিরাপত্তার ভার দেহরক্ষিণীদের উপরই ন্যস্ত থাকত। পর্দাপ্রথা ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করছিল—তার প্রমাণ আমরা অশোকের অনুশাসন-লিপি হতে পাই; তাঁর শিলালিপি হতে আরও জানা যায় যে মেয়েদের মধ্যে নানারকম অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন এই যুগে ছিল। স্ত্রী স্বামীর পাশে ধর্মকার্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতেন। বিধবারা পুণ্যলাভের আশায় নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠান এবং প্রাত্যহিক জীবনে সত্য ত্যাগ দয়া ক্ষমা তিতিক্ষা প্রভৃতির অনুসরণ করতেন। বহু রাজপরিবারের মেয়েরা তাঁদের সন্তানদের নামে রাজকার্য পরিচালনা করেছেন এরূপ উদাহরণও আমরা ইতিহাসে পাই। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ভারতীয় নারী ভারতের মর্মবাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজকন্যা সংঘমিত্রা গিয়েছিলেন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে।

পরবর্তী গুপ্তযুগের সমাজে খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল। বিদেশীদের আগমন ও ভারতের সমাজে তাহাদের অন্তর্ভুক্তিই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়। এ যুগের মেয়েদের সম্বন্ধে বেশ চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। কোনও কোনও জায়গায় মেয়েরা শাসনকার্যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতেন—এর প্রমাণস্বরূপ চন্দ্রগুপ্ত-মহিষী কুমারদেবী ও হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর নাম উল্লেখ করতে পারি। কাশ্মীর অন্ধ্র এবং উড়িষ্যা প্রদেশে আমরা রাণীকে রাজ-প্রতিনিধি-রূপে দেখতে পাই। প্রদেশ ও গ্রামের শাসনকর্ত্রীও মেয়েরা ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণে রাজ্যশ্রী তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলেন বলে আমরা জানতে পারি। উচ্চবংশীয়া মেয়েরা নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে সর্বসমক্ষে আপন আপন নৈপুণ্য প্রদর্শন করতেন। সাধারণ মেয়েদেরও শিক্ষার অভাব ছিল না। উভয়ভারতী এই যুগেই শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্তা হয়েছিলেন। ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতী প্রবাদবাক্য-অনুসারে বীজগণিতের স্রষ্টা। আবার জ্যোতিষশাস্ত্রে খনা তাঁর শ্বশুর বিখ্যাত বরাহমিহিরের ত্রুটি সংশোধন করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে পর্দাপ্রথা তখনও ব্যাপকতা লাভ করে নি। স্বয়ংবরপ্রথা তখনও ছিল; তবে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং মেয়েরা সাধারণতঃ দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারতেন না। সতীদাহ-প্রথা ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করছিল ও বিধবাবিবাহ-প্রথা লুপ্ত হচ্ছেছিল।

গুপ্তযুগের পর এক অন্ধকার যুগের আবির্ভাব হয়েছিল। এই তমসাচ্ছন্ন যুগের সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা পাই না। সেইজন্য এর পরেই সাধারণতঃ মুসলমান যুগ এসে পড়ে। এ যুগের পূর্ব পর্যন্ত মেয়েরা যে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে এসেছিলেন, যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন ক্রমশঃ তা সঙ্কীর্ণ হতে থাকে। এই সময়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই পর্দাপ্রথার প্রচলন দেখা যায়। সম্ভ্রান্ত-

বংশীয় মেয়েরা নানা শিক্ষার সুযোগ পেতেন, কিন্তু সাধারণ মেয়েরা, বিশেষ করে গ্রামের মেয়েরা গৃহকর্মের ভেতরই আবদ্ধ থাকতেন। শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে পদ্মিনীর নাম আমরা পাই। এযুগের বিশেষত্ব জহরব্রত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হিন্দুরমণী পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতেন এবং যখন জয়লাভের আশা আর থাকত না তখন জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করতেন। সুলতানা রাজিয়াও ছিলেন এই যুগের মেয়ে। নানা গুণের, এমন কি যুদ্ধবিদ্যারও অধিকারিণী ছিলেন তিনি—যার জন্য পিতা ইলতুৎমিস্ পুত্র বর্তমান থাকতেও তাঁকে সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারিণী বলে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু এই সম্মানের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে প্রাণ দিয়ে করতে হয়েছিল ; কারণ, রাজ্যের প্রধানগণ নারীর বশ্যতা স্বীকার করতে পারেন নি।

পরবর্তী যুগের মহিলাদের নাম সাহিত্যজগতে বিশেষ সুপরিচিত—বাবরকন্যা গুলজান বেগম, জাহানারা ও জেবউন্নিসার রচিত কাব্যগুলি ইতিহাস-বিখ্যাত। কেবল সাহিত্যজগতে নয়, নৃত্যে গীতে বাদ্যে অঙ্কনে এঁরা প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কূটরাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এঁদের দক্ষতা ছিল অসীম। মীরাবাইও ছিলেন মোগল যুগের রমণী। তিনি ছিলেন রাজকুলবধূ, কিন্তু রাজ-ঐশ্বর্য তাঁকে বাঁধতে পারে নি, পার্থিব কোন কিছুই তাঁকে আসক্ত করতে পারে নি, সব কিছু ত্যাগ করে তিনি নিজকে রণচোড়জীর চরণে উৎসর্গ করেছিলেন। ক্রমশঃ সমাজে সতীদাহপ্রথা, পণপ্রথা, কৌলীন্য-প্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রসারলাভ করতে থাকে—এগুলি বিশেষ করে বাংলাদেশেই আধিপত্য- বিস্তার করেছিল সবচেয়ে বেশী। সমস্ত দেশের রীতি-নীতির সর্বাংশে ঐক্য ছিল না। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে এবং পাঞ্জাব ও যমুনা উপত্যকায় জাঠদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও নারীর বহুবিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণ গৃহেও স্ত্রী-শিক্ষা কিছু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল ; কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পেতেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের ধর্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল বলে জানা যায়।

বাইরের শত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ হীন হয়ে পড়লো। দেশ বহু খণ্ডে বিভক্ত হয় ; চারিদিকেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। নারী-সমাজের ভাগ্যেও ঘনিয়ে এলো চরম দুর্দিন। আপন সাধনা, মর্যাদাবোধ সব কিছুই হারিয়ে রিক্ত হয়ে পড়লো ভারতের নারী। অজ্ঞানের অন্ধকারে তার সমগ্র সত্তা চাপা পড়ে গেলো। লহনার খুল্লনার গল্প হতে আমরা বহু বিবাহের কুফল দেখতে পাই ; চাঁদসদাগরের গল্পে, বেহুলা যখন বিধবা হলেন তখন সনকার কণ্ঠে যে অভিসম্পাত আমরা শুনি, তা থেকেই প্রমাণ করা যায় সমাজে বিধবাদের অবস্থা সুখের ছিল না। এই অন্ধকারের মধ্যেও একটু আলোর মত আমরা দেখি কবি চন্দ্রাবতীকে—যিনি রামায়ণ লিখে যশস্বিনী হয়েছেন।

এর পরেই আসে বৃটীশ আমল। মোগল যুগে ইংরেজগণ বণিকের বেশে এসে ক্রমে সারা ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন। এই যুগের প্রথমে শত বন্ধনের সৃষ্টি হ'ল নারীসমাজের জন্য। তাদের শিক্ষা হয়ে পড়লো অপযশ ও বিদ্রূপের সামগ্রী। নানা কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলো তাদের মন। বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, পণপ্রথা, কৌলীন্য-প্রথা, সহমরণ সব কিছুই নারীকে অধীন রাখবার জন্য সমাজে বেশ কায়েমী ভাবে আসন নিলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর এলো উনবিংশ

শতাব্দী। অন্ধকার যে. চিরদিনের জন্য নয় তারই প্রমাণ হতে চল্লো এ শতাব্দীতে। বিদেশী শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজের প্রতি ক্ষেত্রই গ্লানিতে ভরে উঠেছিল। নারীসমাজও দৃষ্টিহারা হয়ে প্রায় জড় পদার্থে পরিণত হতে চলেছিল। এমন সময় এসে দাঁড়ালেন কয়েক জন দেশী ও বিদেশী মহাপ্রাণ ব্যক্তি। রাজা রামমোহন প্রমাণ করলেন সহমরণ-প্রথাকে জঘন্য বলে, বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন বিধবা-বিবাহ-প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিরোধ করবার জন্য। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়েও বিদ্যাসাগরের অবদান কম নয়।

ক্রমশঃ ঊনবিংশ শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দী এসে পড়লো। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নারী আপন মহিমা বিস্তার করল। স্বাধীনতা-যজ্ঞেও নারী আত্মবিসর্জন দিয়েছে। শহরে বাস করে মনে হয় নারীসমাজের একটি বিরাট অংশকে সুশিক্ষিতা বলা যায়; কিন্তু গ্রামের দিকে তাকালে দেখা যাবে আমাদের গ্রামের ভগিনীরা এখনও রয়েছেন অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। আমরা আমাদের মনের তেজ, দৈহিক শক্তি সব কিছুই হারিয়েছি—যার জন্য নারীসমাজ আজ এত লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করছেন। ১৯৪৬ সনের দাঙ্গার সময় অনেক হিন্দুনারী অপহৃতা হয়েছেন। সমাজ তাঁদের রক্ষা করতে পারে নি এবং আত্মরক্ষার শিক্ষাও দেয় নি। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়—তার সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক শক্তিরও বিকাশ করা দরকার। এ যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে পুজো করে, ভারতীয় নারীর বিরাট ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন, "শ্রীশ্রীমা জগন্মাতার অংশ; তিনি ঠাকুরের চেয়ে বড় ছিলেন। ... দেখ না, মা আসার পর থেকেই নারীজাতির মধ্যে কি রকম জাগরণ সুরু হয়েছে। তারা নিজেদের জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বৈদিক যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ীর কথা শুনেছ—এযুগের মেয়েরা তাঁর চাইতেও বড় হবে। রাজনীতি, বিজ্ঞান সব কিছুতেই তাদের অধিকার থাকবে। শ্রীশ্রীমাঠাকরুণই হলেন এ যুগের আদর্শ।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "মেয়েদের শিক্ষা দাও, তারা নিজেরাই কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য ও কোন্‌টা বর্জনীয় বুঝতে পারবে।" মহাত্মা গান্ধীও নারীর সম-অধিকারের কথা স্বীকার করে গিয়েছেন।

নারী সমাজের অর্ধাঙ্গ; তাকে বাদ দিয়ে সমাজ কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ভারত বহুপূর্বেই একথা স্বীকার করেছে, তাই ভারতীয় সাধনায় আমরা অর্ধনারীশ্বর মূর্তির কল্পনা দেখতে পাই। আজ যে যুগসন্ধিক্ষণে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি তাতে ভারতের নারী-সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। আজও আমরা শুনি, 'ওঁ' এই মহামন্ত্র নারীর উচ্চারণ করবার অধিকার নেই। নারীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার জন্য মনুর শ্লোকও আমাদের শোনান হয়, কিন্তু মনুই যে বলেছেন—"কন্যাসন্তানকে যত্ন করে লালন করবে. তাকে শিক্ষা দেবে"; আবার "যে গৃহে নারীরা পূজিতা হন না, সে গৃহের সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়"—এ সব বাক্য আমাদের কেউ শোনান না। আজকের ভারতের নারী-সমাজকে প্রমাণ করতে হবে, আত্মায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। স্বাধীন ভারতে পুরুষের সঙ্গে নারীও সকল বিষয়ে সমান অধিকার এবং উন্নতিলাভের সমান সুযোগ অবশ্য পাবে।

পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

(৪)

পূর্ববঙ্গের ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দকে ঐ অঞ্চলে লইয়া যাইবার জন্য অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্য ও আন্তরিকতা দেখিয়া তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। ১৯২২ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ এবং কতিপয় সন্ন্যাসী ও ভক্তকে লইয়া বেলুড় মঠ হইতে ঢাকা রওনা হইলেন। নারায়ণগঞ্জে ও ঢাকায় স্বামী শিবানন্দ ও তদীয় গুরুভ্রাতার বিপুল সম্বর্ধনা হইয়াছিল। তাঁহারা ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন।

স্বামী শিবানন্দ প্রায় দেড় মাসকাল ঢাকায় ছিলেন; তাঁহার অবস্থান-কালে তথাকার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ যেন তীর্থে পরিণত হইয়াছিল—শত শত ভক্ত-যাত্রীর নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার নিকট সর্বশ্রেণীর অসংখ্য ধর্মপিপাসু নর-নারীর সমাবেশ হইত এবং তিনি সকলকেই অমৃতময় উপদেশ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি অনেক সময় ভক্তগণকে বলিতেন, "আমি বাবা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানি নে—সাধু-ফকির মানুষ; ঠাকুরই আমার অন্তরাত্মা—তিনি যা বলাবেন তাই বলব, যা করাবেন তাই করব। অন্য কিছুর খবরাখবর জানি নে—জানবার দরকারও নেই।" বহু নর-নারী তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদেশ পান নাই বলিয়া কাহাকেও প্রথমতঃ দীক্ষা দিতে চাহিলেন না। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি নিতাই চলিতেছিল—মহাপুরুষ মহারাজ স্বয়ং ঐ সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের ধর্মপিপাসা মিটাইতেন। অবশেষে ভক্তগণের তীব্র ব্যাকুলতায় তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত করুণার্দ্র ও অস্থির হইল। তিনি আগ্রহশীল ভক্তগণের দীক্ষার একটা উপায় করিয়া দিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। এতদিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তদীয় শরণাগতের আকুল প্রার্থনা শুনিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, জগদ্গুরু মুমুক্ষু নরনারীগণের সাধনপথ নির্দেশ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। তিনি গুরুভ্রাতা সংঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশের কথা জানাইয়া পত্র লিখিলেন। গুরুভ্রাতা সানন্দে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—"খুব দিন, প্রাণ খুলে দীক্ষা দিন। আপনার কাছে যারা দীক্ষা পাবে তাদের তো জীবন ধন্য হয়ে যাবে।" এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও সংঘনায়কের সম্মতি পাইয়া মহাপুরুষ মহারাজ ঢাকাতেই প্রথম মন্ত্রদীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং প্রায় একশত নরনারীকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্য জীবনের ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ প্রেরণা ও আদেশের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি আমরা

পরবর্তী কালে 'সহস্র সহস্র মুমুক্ষু জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যদিও ১৯০৯-১০ সন হইতেই বহু মুমুক্ষু ভক্ত স্বামী শিবানন্দকে গুরুর আসনে বসাইয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে নিজেদের ধর্মজীবন গঠন করিতেছিল, তথাপি তিনি ইতঃপূর্বে কাহাকেও আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। এই সম্বন্ধে তিনি পরবর্তী কালে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ঢাকাতে আমি প্রায় দেড় মাস ছিলাম। সেখানে অনেক নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার নাম পেয়েছে। সে সময় ঠাকুরের প্রেরণায় আমার ভিতরও একটা ভাব এসেছিল।" ঢাকাতেই তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজি,মহারাজ ও আমাকে বলেছিলেন—'কালে তোদের বহু লোককে দীক্ষা দিতে হবে।' আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম যে আমি কিন্তু ওসব পারব না। শুনে ঠাকুর বল্লেন—'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরে দেখা যাবে—তুই এখন এত ভাবিস্ কেন?' ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়? সেই কত কালের কথা এতদিনে সত্য হ'ল! কে জানত, বাবা, যে আমার দীক্ষা দিতে হবে?"

মহাপুরুষ মহারাজ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ঢাকা মঠে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে সমবেত ভক্তদের নিকট সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ-উপাসনা সম্বন্ধে কার্যকর উপেদেশাদি প্রদান করিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ একদিন মহাপুরুষ মহারাজ বর্তমান লেখককে তদীয় পাদসেবার সুযোগ দিয়াছিলেন। এই অপূর্ব সুযোগকে লেখক তাহার জীবনের পরম দুর্লভ সম্পদ বলিয়া মনে করিয়াছিল। আচার্য শঙ্কর যথার্থই বলিয়াছেন—"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহ-হেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥" এই পৃথিবীতে তিনটি দুর্লভ বস্তু ভগবানের কৃপায় লব্ধ হয়—মানবজন্ম, মুক্তিলাভের ইচ্ছা এবং মহাপুরুষের সঙ্গলাভ। আবার ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ পাইতে হইলে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হয়—ইহাও শাস্ত্রের নির্দেশ। পাদসেবা করিতে করিতে লেখকের স্বতঃই মনে হইতেছিল—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর দিব্য সান্নিধ্য আধ্যাত্মিক জীবন-বিকাশের পক্ষে একান্তই অনুকূল ও অপরিহার্য। স্বামী শিবানন্দের ঢাকায় অবস্থানকালে গান্ধীজি-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং আন্দোলনের প্রবর্তককে সরকার গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ সেদিন সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক উপাদেয় কথা বলার পর গান্ধীজির গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে বর্তমান লেখক বলিল—"গান্ধীজি তাঁহার নিজ পত্রিকা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় (Young India) 'বৃটিশসিংহ কেশর নাড়িতেছে' (The British Lion Shakes his Manes) এবং 'মেরুপ্রমাণ ব্যবধান' (Poles Asunder) নামক দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ দুইটি রাজদ্রোহাত্মক বিবেচিত হওয়ায় সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। লেখায় সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে খুব নির্ভীক প্রতিবাদ ব্যক্ত হইয়াছে।" মহাপুরুষ মহারাজ প্রবন্ধ দুইটি শুনিতে চাহিলেন। তখনই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' হইতে প্রবন্ধ দুইটি তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনান হইল। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "গান্ধীজি মহাত্মা লোক, তপস্যার জোর না থাকলে এরূপ নির্ভীকভাবে রাজশাসনের সমালোচনা করতে পারতেন না। তিনি নিজেই ত লিখেছেন, ভগবানের নিকট প্রার্থনার পর প্রবন্ধগুলি রচনা করতে আরম্ভ করেছেন। বাস্তবিক, প্রার্থনার অসীম শক্তি—উহা অসম্ভবকে সম্ভব করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের

শক্তির মূল উৎস। ভারতে ধার্মিক ব্যক্তিই নেতৃত্ব করতে পারেন; নেতা ধার্মিক না হলে ভারতে কেহ তাঁহার কথা শোনে না।" পরে প্রসঙ্গান্তরে কবিদের সম্বন্ধেও বলিলেন, "ঠিক ঠিক কবি হ'তে হলেও আধ্যাত্মিক অনুভূতি চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল কবিদের অনেকেরই ইহা নেই। অনেকেই তাঁদের কবিতায় গভীর তত্ত্বের কথা লিখেন বটে, কিন্তু তাঁদের জীবনের সঙ্গে সেই সকল তত্ত্বের সম্বন্ধ খুব অল্পই আছে। উপনিষদে 'সর্বদর্শী' অর্থে কবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মাকে 'পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' ইত্যাদি বলা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মা সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, ক্ষতবিহীন, শিরাহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম এবং নিজেই নিজের কারণ—বলা হয়েছে।"

একদিন বৈকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন ছাত্র আসিয়া স্বামী শিবানন্দকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আমরা আপনার নিকট জানতে এসেছি—আমেরিকায় কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ বেদান্তপ্রচারের কাজ হচ্ছে।" তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বলিলেন, "আমি ত বাবারা, আমেরিকায় যাই নি, আমি ও সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর তোমাদিগকে দিতে পারব না। (স্বামী অভেদানন্দ যে ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই ঘরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশে) ঐ ঘরে স্বামী অভেদানন্দ আছেন, তিনি বহু বৎসর আমেরিকায় ছিলেন, তোমরা যাহা জানতে চাও তাঁর নিকট জানতে পারবে। আমি ভগবান সম্বন্ধে দু-চার কথা জানি—জিজ্ঞেস করতো কিছু বলতে পারি।" ছাত্রগণ তখন সে স্থান হইতে উঠিয়া স্বামী অভেদানন্দের নিকট গেল। তাহারা চলিয়া যাইবামাত্র নিকটে উপবিষ্ট বর্তমান লেখক ও আর একজন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "দেখলে, এরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে আসে নি, ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানবার এদের আগ্রহ নেই। খালি দেশ-বিদেশের খবর জানতেই ব্যস্ত। যার যেমনি ভাব, তার তেমনি লাভ। সাধুর নিকট ধর্মকথা শুনতেই আসতে হয়; সাধু ভগবানের খবর রাখেন। দেশবিদেশের খবর বই-পুস্তকেই ত ঢের পাওয়া যায়।"

ঢাকা মঠের অল্প দক্ষিণদিকে স্বামী ভোলানন্দ আশ্রম অবস্থিত। এই আশ্রমটি স্বামী ভোলানন্দ গিরির মন্ত্রশিষ্য জমিদার শ্রীযোগেশ দাস কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজের ঢাকায় অবস্থানকালে স্বামী ভোলানন্দ হরিদ্বার হইতে ঢাকায় আসিয়া কিছুদিন যাবৎ ঐ আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। স্বামী শিবানন্দের ঢাকা মঠে অবস্থানের কথা শ্রবণ করিয়া গিরিজী একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী ভোলানন্দকে যথোচিত সম্মানের সহিত আপ্যায়িত করিলেন। সাক্ষাৎমাত্র স্বামী ভোলানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের পাদস্পর্শ করিয়া সশ্রদ্ধ প্রণাম ও তৎপর সপ্রেম আলিঙ্গন করিলেন। প্রণামের সময় মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "গিরিজী, পাদস্পর্শ করিয়া আবার প্রণাম কেন? আপনি সাধু লোক।" তদুত্তরে স্বামী ভোলানন্দ বলিলেন, "সে কি! আপনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ও পার্ষদ, আপনি নমস্য; আপনাকে প্রণাম করব না?" তৎপর উভয়ের মধ্যে অনেক হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপাদি হইল। গিরিজী বিদায় লইয়া যাইবার সময় মহাপুরুষ মহারাজকে ভোলানন্দ আশ্রম (ঢাকার) একবার দর্শন করিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। গিরিজী চলিয়া গেলে স্বামী শিবানন্দ ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "স্বামী ভোলানন্দ খুব সাধু লোক। আমরা

যখন উত্তরাখণ্ডে তপস্যাদি করেছিলাম তখনই তাঁকে কঠোর তপস্বী দেখেছি। আমাদের তপস্যাস্থানের নিকটেই তিনি সাধনভজন করতেন এবং প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতো।" দুই দিন পর মহাপুরুষ মহারাজ ভক্তগণ সহ পদব্রজে ভোলানন্দ আশ্রম পরিদর্শন করিতে যান। আশ্রমের ফটকের নিকট এক ভিখারী মহাপুরুষ মহারাজের সম্মুখে আসিয়া কাতরভাবে কিছু ভিক্ষা চাহিল। করুণার্দ্র স্বামী ভিক্ষার্থীর দিকে একবার চাহিয়াই সঙ্গীয় ভক্তগণের কাহারও নিকট কিছু টাকা-পয়সা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। জনৈক ভক্ত তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া মহাপুরুষ মহারাজের হস্তে দিলেন। "নে বাবা দরিদ্রনারায়ণ"—এই কথা বলিয়া তিনি টাকাটি ভিখারীকে দিলেন। আশ্রমটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া তিনি খুব প্রীত হইলেন এবং সন্ধ্যার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন স্বামী শিবানন্দ ভক্ত শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়ের বুড়ীগঙ্গার অপরতীরস্থিত বেঙ্গারা গ্রামের বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের গ্রামদর্শন বোধ হয় এই তাঁহার প্রথম। হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামানন্তর তিনি বলিলেন, "হরেনের ঐকান্তিক ভক্তি-বিশ্বাসে ও একনিষ্ঠ সেবা-পূজায় শ্রীশ্রীঠাকুর জাগ্রত হয়ে আছেন। এরূপ ভক্তি-বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায়ই ত ভগবান ঘরে বাঁধা থাকেন। হরেন, ধন্য তুমি ও তোমার স্ত্রী!" গৃহস্বামী ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্মিণীর সেবাযত্ন ও আদর-আপ্যায়নে মহাপুরুষ মহারাজ অতিশয় পরিতৃপ্ত হন।

শহরের ফরাসগঞ্জ-অঞ্চলে শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস মহাশয়ের 'গৌরাবাস' নামক প্রাসাদোপম ভবনের সম্মুখভাগে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র ছিল। তথায় প্রতি শনিবার একটি সান্ধ্য অধিবেশনে ভজন-সংগীত এবং ধর্মশাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা হইত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী, ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-জীবন-চরিতাদি-সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারও ছিল। গ্রন্থাগার হইতে ঐ অঞ্চলের পাঠকগণ পুস্তকাদি নিয়া পড়িতেন। স্বামী শিবানন্দ ভক্তগণের আগ্রহে একদিন এই সান্ধ্য অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ পদার্পণে তত্রত্য ভক্ত নরনারীগণের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া গেল। গৃহস্বামীর আগ্রহাতিশয্যে মহাপুরুষ মহারাজ বাড়ীর ভিতরে গিয়া পরিবারস্থ সকলকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। বহির্বাটির একটি প্রকোষ্ঠের দেয়ালে অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতির সহিত শ্মশান-কালীর একখানা সুচিত্রিত বৃহৎ প্রতিকৃতিও শোভা পাইতেছিল। মহাপুরুষ মহারাজ একে একে প্রতিকৃতিগুলির উদ্দেশে ভক্তিবিনম্র প্রণাম নিবেদন করিয়া গৃহস্বামীকে বলিলেন, "শ্মশান-কালীর প্রতিকৃতি গৃহস্থের বাড়ীতে রাখতে নেই। যদি রাখতেই হয়, তবে নিত্য নিয়মিত ভাবে তাঁর পূজার্চনাদি করতে হয়; না করলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে। আশ্রমে, মঠে, ঠাকুরবাড়ীতে রাখাই ভাল—সেখানে নিত্য নিয়মিত পূজার্চনাদি হয়।" মহাপুরুষ মহারাজের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া গৃহস্বামী কিছুকাল পর শ্মশানকালীর পটখানি ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পাঠাইয়া দেন। তদবধি উহা ঢাকা মঠের মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে। পরবর্তী কালে একদিন বেলুড় মঠে কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ এই 'গৌরাবাস' ভবন সম্বন্ধে বর্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "ফরাসগঞ্জে প্রসন্ন-বাবুর 'গৌরাবাস' ভবনটি বেশ চমৎকার। তুমি ওখানে থাক এবং কিছু কিছু ঠাকুরের কাজ

করছ—বেশ ভাল স্থানেই আছ। ঠাকুর-স্বামীজির কথা ওখানে নিয়মিত ভাবে পাঠ ও আলোচনা করা হয়। তোমরা আমাকে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে ত্রিতলের ছাদের উপর নিয়ে গিয়েছিলে। ছাদের উপর ছোট ঘরটি ধ্যান-জপাদি করবার সুন্দর স্থান—কি নির্জন ও উন্মুক্ত! সম্মুখেই দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আর নদীর ওপারে গ্রামের বাড়ীগুলি, বিস্তীর্ণ শস্যপূর্ণ হরিৎক্ষেত্র, উচ্চশির মঠ প্রভৃতি শোভা পাচ্ছিল। দূরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে প্রাণ জুড়ায়। ওখানকার লাইব্রেরী হতে ভক্তগণ ঠাকুর-স্বামীজির বই বাড়ীতে নিয়ে পড়ে—এতে তাদের খুবই কল্যাণ হবে। তোমার কাছেই শুনলুম, গৃহস্বামীর ভক্তিমতী স্ত্রী ঠাকুরের 'কথামৃত' বই নিয়ে পড়ছে। খুব ভাল। 'কথামৃত' পড়লে আর কোন ভাবনা নেই। ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা পড়ে ও শুনে বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই ক্রমে ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি ভালবাসা হবে, নিশ্চয়ই। ও বাড়ীর মঙ্গল হবেই হবে, জান্‌বে।"

পরম প্রাপ্তি

শ্রীমতী বিভা সরকার

দুঃখময় এ জগতে মানুষ চলেছে নিরন্তর
মোহগ্রস্ত অন্ধসম অতিক্রমি মরুর প্রান্তর।
কণ্টক-আঘাতে রক্ত চরণ, তবু চলে কণ্টকিত পথে,
ঘুমন্ত চেতনা তার জাগে না তথাপি সুতীব্র আঘাতে।
সম্মুখে মরণ তার, তবু দেখি সদা স্বার্থের সাধনা,
অন্তর-দেবতা কেঁদে মরে, তথাপি পাশব কামনা!
হৃদয় মন্দির-মাঝে প্রাণের দেবতা কর জাগরণ,
চাওয়া পাওয়া শেষ হবে শান্তি-সুখে হইবে মগন।

বিভিন্ন বৈদিক দার্শনিক মতবাদ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১। **কর্মবাদ**—ইহা জৈমিনীয় পূর্ব-মীমাংসাসম্বন্ধীয় শবরস্বামীর মত। এঁদের মতে আত্মা বহু এবং দেহ হ'তে ভিন্ন ও নিত্য। শুভাশুভ কর্মের দ্বারা অপূর্ব-সহায় আত্মার উচ্চনীচ জন্মান্তর হয়ে থাকে। পদার্থ প্রায় সব বৈশেষিকদের মত। বার্তিককার কুমারিল্ল সমবায় ও বিশেষ মানেন না এবং প্রভাকর বিশেষ ও অভাব মানেন না, পরন্তু সংখ্যা শক্তি ও সাদৃশ্য অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন। এঁদের মধ্যে 'ঋত'ই (Law of Karma) হচ্ছেন ঈশ্বর। আবার কেউ বলেন, ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা বটে, তবে কর্মফলদাতা নন, ঋতই কর্মফলদাতা। কর্মভিন্ন দেবতারাও ফল দিতে অসমর্থ। মন্ত্রই দেবতাদের শরীর। ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তিই মোক্ষ। বেদ অনাদি আক্ষরিক জ্ঞানরাশি এবং অপৌরুষেয়; ঋষিরা মাত্র উহার দ্রষ্টা। মণ্ডনমিশ্র-মতে বর্ণ অনিত্য কিন্তু শব্দস্ফোট নিত্য; কুমারিল্ল-প্রভাকর-মতে বর্ণই নিত্য, স্ফোট কল্পনা-গৌরব। মহাপ্রলয় বলে কিছু নেই, বিচিত্র আণবিক স্বতঃস্পন্দন-শীলতাই নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপ্রবাহ সিদ্ধ করে। তবে প্রভাকর তাঁর 'প্রকরণ-পঞ্চিকাতে' আত্যন্তিক দেহচ্ছেদ-হেতু মোক্ষ স্বীকার করেন। কুমারিল্ল-মতে, পরমাত্মপ্রাপ্তি একটি দুঃখ-হীন অবস্থামাত্র। মুরারিমিশ্রের মতে চিত্তের দ্বারা স্বাত্মসুখানুভূতিই মোক্ষ। পূর্বমীমাংসক-দের মতে বেদ-অসম্মত যাবতীয় কর্মই অসৎ। যজ্ঞ ও যুদ্ধভূমি ভিন্ন স্থানে এঁরা অহিংসা স্বীকার করেন।

২। **অদ্বৈত বা ব্রহ্মবাদ**—শ্রীশংকরের, (৬৩২—৬৬৪ খৃঃ), ব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র-সম্বন্ধীয় মত। এঁদের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা। জগতের মিথ্যাত্ব কেবল অনিত্য নয়, 'রজ্জুসর্পে'র ন্যায় কল্পিত। এর অপরাপর পারিভাষিক আখ্যা—সৎকারণবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈত-বাদ, নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, নির্গুণ-ব্রহ্মবাদ, অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদ, ব্রহ্মবাদ এবং জ্ঞানকর্মাসমুচ্চয়বাদ। এর মূলভিত্তি গৌড়-পাদাচার্যের অজাতিবাদ।

৩। **জাত্যদ্বৈতবাদ**—বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বর-কৃষ্ণের নব্যসাংখ্যকে আশ্রয় করে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন। সেখানে অদ্বৈতশ্রুতি রক্ষার জন্য সর্বপুরুষের মধ্যে এক 'আত্মত্ব'-রূপ জাতিস্বীকারের দ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করেছেন। তাঁর ব্রহ্মসূত্রের 'বিজ্ঞানামৃতভাষ্য'কে দার্শনিক পরিভাষায় জাত্যদ্বৈতবাদ বলে।

৪। **সদৃশাদ্বৈতবাদ**—এতদ্‌ভিন্ন নব্য-সাংখ্যসম্প্রদায়ীরা পুরুষসকলের চৈতন্যস্বরূপত্ব অসঙ্গত্ব নিত্যত্ব বিভুত্ব কূটস্থত্ব ও অবিকারিত্ব-রূপ সাদৃশ্য ও সামান্য হেতু তাদের ঐক্য স্বীকার করেন। কারিকাসাংখ্যের উক্ত প্রেক্ষাভঙ্গিকে সদৃশাদ্বৈতবাদ বলে।

৫। **অবিভাগাদ্বৈতবাদ**—কোন কোন ন্যায়বৈশেষিক-সম্প্রদায় বলেন, সকল আত্মাই চেতন, বিভু ও সর্বগত। তারা পরস্পর বিভিন্ন হলেও তাদের বিভাগ লক্ষ্য করা যায় না বলে অভেদেরই প্রতীয়মানতা মাত্র হয়,

স্বরূপতঃ তারা অদ্বৈত নয়। দর্শনের এই প্রেক্ষাভঙ্গিটি বিভাগাদ্বৈতবাদ।

৬। **সাময়িকাদ্বৈতবাদ**—কোন কোন অতি প্রাচীন বেদান্তী ঔড়ুলোমি : প্রভৃতি বলেন, যতক্ষণ সংসার ততক্ষণ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার্য। কিন্তু মোক্ষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অনুভূত হয়। এই মতটি ঔপনিষদ দার্শনিকদের নিকট সাময়িকাদ্বৈতবাদ বলে পরিচিত।

৭। **অসৎকার্য বা আরম্ভবাদ**—ইহা গৌতমগুরুর মত। দ্বৈতদর্শন, তর্কপ্রধান সগুণাত্ম-বাদ, আস্তিকদর্শন, জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য এবং শব্দপ্রমাণান্তরাঙ্গীকার, উৎপত্তিসাধনাদৃষ্টবাদ, ষোড়শপদার্থবাদ এবং অন্যথাখ্যাতিবাদ। এঁরা বলেন, কারণ নিত্য বা অনিত্য হোক, ইহা সৎ, কিন্তু কার্যটি উৎপত্তির পূর্বে অসৎ ; কারণ, এরা কার্যের প্রাগভাব স্বীকার করেন না।

৮। **সৎকার্যবাদ**—বর্ষগণ্যের শিষ্য বিন্ধ্য-বাস, ছদ্মনামা ঈশ্বরকৃষ্ণের নব্যসাংখ্য-মতকে আশ্রয় করে যাবতীয় মত। জগৎ সত্য—মিথ্যা নয়, কিন্তু অনিত্য। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে অব্যক্ত থাকে। কার্য অসৎ হ'লে উৎপত্তি হ'ত না। এ মতে বহু পুরুষ ও এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। মতটি নিরীশ্বর তর্কপ্রধান নির্গুণাত্মবাদ কিন্তু আস্তিক্যদর্শন। এঁরা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার না করলেও বেদ এবং জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করেন এবং অনুমানকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেও বেদকে অবজ্ঞা করেন না। এঁরা বিপর্যয়জ্ঞানকে সদসৎখ্যাতি বলেন।

[দ্রষ্টব্য :—সৎকার্যবাদের মধ্যে অবৈদিক নিরীশ্বর জৈনদর্শন স্যাদ্বাদও পড়ে। এঁরা বেদ মানেন না বটে, কিন্তু পড়লে মনে হয় না যে এটি কোন অবৈদিক দর্শন। এঁদের মূল গুরু হলেন ঋষভদেব, ভাগবতে ইনি অবতার বলে খ্যাত। এঁর পর অজিতনাথ এবং অরিষ্টনেমি। এইরূপ ২২ জন তীর্থংকরদের মধ্যে শেষ গুরু হচ্ছেন মহাবীর বা বর্ধমান বা নাথপুত্ত (খৃঃ পূঃ ৫৯৯)। এঁদের পদার্থ দ্বিবিধ—জীব ও অজীব। জীব বা পুদ্গল দেহপরিমাণ। অজীব হচ্ছে ক্ষিতি অপ্ তেজঃ বায়ু আকাশ ব্যান দিক্ এবং মনঃ। এঁরা পুনর্জন্মবাদী। এঁদের মতে জগৎ দুভাগে বিভক্ত—লোক (সংসার) এবং অলোক (সিদ্ধস্থান)। জীব ও অজীবের সংসর্গের হেতু কর্ম। এর বিচ্ছেদই মোক্ষ। (অর্থাৎ বৈশেষিকের পদার্থ এবং সাংখ্যের মোক্ষহেতু সমবায়ে জৈনদর্শন)। মোক্ষের উপায় সম্বর = কর্মরোধ এবং নির্জর = পাপরোধ। এ দুটির বিরোধী হচ্ছে আশ্রব = অন্তরে বিষয়প্রবাহ এবং বন্ধ = শরীরাসক্তি। আশ্রব ও বন্ধের হেতু—মিথ্যাদর্শন অবিরতি প্রমাদ কষায় এবং যোগ।]

৯। **মায়াবাদ**—শূন্যবাদী মাধ্যমিক, যোগাচারাদি বৌদ্ধ সম্প্রদায়সমূহ, অর্থাৎ যাঁরা শূন্যে আকাশকুসুমবৎ মায়ার পরিণামে জগৎ স্বীকার করেন। মাধ্যমিক-মত অসৎখ্যাতি এবং যোগাচার মত আত্মখ্যাতিবাদের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে যাঁরা 'নির্বাণধাতু' 'মহাবস্তু' প্রভৃতি মায়ার অধিষ্ঠান স্বীকার করেন, তাঁরা এ বাদের মধ্যে পড়েন না। লোকে ভুল করে সাধারণতঃ অদ্বৈত বেদান্তকে মায়াবাদ বলে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জগৎ ব্রহ্মবিবর্ত মায়াপরিণাম হলেও, তত্ত্বজ্ঞানে সদ্-সদ্ভিন্নাভিন্ন মায়াও অন্তর্হিত হন এবং এক কেবল-ব্রহ্মই মূলে বর্তমান থাকেন বলে অদ্বৈতোপনিষৎ 'ব্রহ্মবাদ' বা 'ব্রহ্মমায়াবাদ', পরন্তু 'মায়াবাদ' নয়। যথার্থ দার্শনিকেরা মায়াবাদ বলতে বৌদ্ধ মাধ্যমিকাদি মতকেই লক্ষ্য করে থাকেন। পরন্তু কোন কোন অল্পমেধা ভক্তি-

বাদী অদ্বৈত-বেদান্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপ্রণালী অনুধাবন না করতে পেরে একে মায়াবাদ বা কূটতর্ক বলেন। তাঁরা 'মায়া'-পদের বাক্‌ছল অবলম্বন করে অর্থ করেন 'কুটিল' এবং 'বাদ' শব্দের অর্থ করেন 'তর্ক'।

১০। **দ্বৈত বা স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ**—শ্রীমন্মধ্বাচার্য (জন্ম ১১৯৯ খৃঃ) দ্বৈতবেদান্তী। দ্রব্য গুণ ক্রিয়া জাতি বিশেষত্ব বিশিষ্ট অংশী শক্তি সাদৃশ্য ও অভাব এই দশটি পদার্থের দ্বারা তিনি জাগতিক যাবতীয় ব্যাপার ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রব্য ২০টি। তার মধ্যে প্রথম পরমাত্মা বা নারায়ণ এবং দ্বিতীয় লক্ষ্মী, যিনি শ্রীভগবানের স্বকীয়া অচিন্ত্যশক্তি। শক্তি চতুর্বিধা—(১) অচিন্ত্য শক্তি নারায়ণে সম্পূর্ণ, অন্যত্র আশ্রয় ভেদে কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয়; (২) প্রতিমায় প্রাণাদি প্রতিষ্ঠা করলে আধেয় শক্তি হয়; (৩) সহজ শক্তি হ'ল বস্তুর স্বভাব; এবং (৪) পদশক্তি = বাচ্যবাচকভাবরূপ সম্বন্ধ। জীব বহু ও নিত্য। দিকই অব্যাকৃত আকাশ। অন্যান্য পদার্থ দ্রব্যগুণাদি কতক সাংখ্য, কতক ন্যায়, কতক মীমাংসা-সম্মত। ইনি মীমাংসকদের ন্যায় বর্ণদ্রব্যবাদী। যাবতীয় পদার্থই পরমাত্মা শ্রীহরির অধীন। কাজে কাজেই পরমাত্মা ভিন্ন সর্বপদার্থ স্বতন্ত্র হয়েও অস্বতন্ত্র। এইজন্য মাধ্বমতকে স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ বলে। এর আর একটি পারিভাষিক নাম পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন। মাধ্বদর্শন স্বরূপতঃ স্পষ্টাদ্বৈতবাদ, তর্কপ্রধান, সগুণাত্মবাদ এবং আস্তিক্য-দর্শন। প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতদর্শন বলতে যাবতীয় দুই বা বহু পদার্থ-বাদীকেই বোঝায়, কিন্তু মাধ্বমতে 'দ্বৈত' শব্দ যোগারূঢ়ি-শক্তিসম্পন্ন।

১১। **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ**—শ্রীরামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী (জন্ম ১০২৭ খৃঃ)। চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনটি পদার্থ নিয়ে এক ব্রহ্ম—এইটি হ'ল তাঁর ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীভাষ্যের তাৎপর্য; যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'বেল বলতে—শাঁস বীজ ও খোল তিনই। এর একটা বাদ দিলে ওজনে কম পড়ে যাবে।' ঈশ্বর কল্যাণগুণবিশিষ্ট, জীব ও জগৎ তাঁর শরীর, তিনি শরীরী। জীব ব্রহ্মের শরীর হলেও জড়া প্রকৃতির তুলনায় সে শরীরী কর্তা ভোক্তা অণু নিত্য স্বয়ংপ্রকাশ চেতন ও প্রতি-শরীরে ভিন্ন। যেমন মানুষের দেহ বলতে চেতন জীবাণু ও জড় অস্থিমাংসাদির সমষ্টি। ঈশ্বর যাবতীয় জীব-জগতের অন্তর্যামী—জীবজগৎ তাঁতে সূত্রে মণিমালার ন্যায় গ্রথিত। ঈশ্বর অংশী, জীবজগৎ তাঁর অংশ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, জীব অণুজ্ঞ। জীব ও ব্রহ্মে স্বগত ভেদ আছে, যেমন সূর্য ও তার বিশিষ্ট কিরণসমূহ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও প্রভু, জীব ঈশ্বরতন্ত্র ও তাঁর দাস। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জীব ও জগৎ রূপ বিশেষ স্বীকার করায় এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। মুক্তি ঈশ্বরকৃপা-সাপেক্ষ। মুক্তিতেও জীবের বৈশিষ্ট্য থাকে। জীব তখন বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের দাস্যলাভ করে এবং তার পাঞ্চভৌতিক শরীর নাশ হয়ে দিব্য-শরীরলাভ হয়। ঈশ্বরের চতুর্ভাব—(১) বৈকুণ্ঠে তিনি ঈশ্বর, (২) জীব-জগতের মধ্যে তিনি অন্তর্যামিরূপে বর্তমান, (৩) জীব-জগতের কল্যাণের জন্য তিনি বিশিষ্ট অবতার মূর্তি ধারণ করেন এবং (৪) ভক্তের অর্চা বা বিগ্রহে তিনি সদা প্রকাশিত থাকেন। জগৎ সত্য, তবে পরিণামশীল। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ 'তস্য ত্বম্ অসি।' চিদচিদীশ্বর-বিশিষ্ট অদ্বৈতব্রহ্মে ঈশ্বরে জীবে, জীবে জীবে, জীবে জগতে, জগতে জগতে, এবং জগতে ঈশ্বরে এই পঞ্চবিধ ভেদ নিত্যরূপে স্বীকার্য বলে জীব-জগৎ ব্রহ্ম হ'তে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। শ্রীরামানুজাচার্য জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। তিনি প্রকৃত পক্ষে ভ্রমও স্বীকার করেন না। তিনি বোধায়নের বিরাট 'কৃতকোটি'

বৃত্তির অনুযায়ী জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় স্বীকার করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর 'সপ্তধা অনুপপত্তি' প্রসিদ্ধ। তিনি সংখ্যাতিবাদী বলে পরিচিত। এই 'ভিন্নাভিন্ন-সম্বন্ধ'কে আশ্রয় করেই পরবর্তী কালে ভাস্কর নিম্বার্ক প্রভৃতি ভেদাভেদ-বাদী দার্শনিকদের অভ্যুদয় ঘটে। এ মত প্রচ্ছন্ন-দ্বৈতবাদই এবং শ্রুতিপ্রমাণাপেক্ষা তর্কই ইহাতে প্রধান। এই সগুণাত্মক আস্তিক্যদর্শন জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদও সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

১২। **ভেদাভেদবাদ**—শ্রীভাস্করাচার্য (৯০০ খৃঃ) ভেদাভেদবাদী এবং 'কৃতকোটি'-ভাষ্যকার বোধায়নমতাবলম্বী জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়-বাদী। জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ, পরন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চ-স্বরূপ নন—"ব্রহ্মাত্মকো হি নামরূপপ্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চাত্মকং ব্রহ্ম"—(ভাস্করভাষ্য ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪)। ভাস্কর ও Spinoaza Pantheismএ এইখানেই ভেদ। ভাস্কর-ব্যাখ্যাত অস্থূলমনণ্ব-হ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৩) সূত্রটি শ্রীশংকর ও শ্রীরামানুজ-ভাষ্যে দেখা যায় না। তিনি এরূপ সূত্র স্বীকার করেছেন, অথচ ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তা-হেতু বিকারও স্বীকার করেছেন। জীব ব্রহ্মপরিণাম। সেই জন্য জীব ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা তার সসীমতা অতিক্রম করে ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, যেমন ঘটোপাধি বিনষ্ট হলে ঘটমধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে লয় পায়। "যথা চ ভগ্নে ঘটে ঘটাকাশো মহাকাশ এব ভবতি দৃষ্টত্বাৎ এবমত্রাপীতি। জীবপরয়োস্তু স্বাভাবিকোঽভেদ ঔপাধিকস্তু ভেদঃ স নিবৃত্তো নিবর্ততে"—(ব্রঃ সূঃ ভাস্করভাষ্য ৪।৪।৪)। শ্রীশংকর জীবোপাধিকে বিবর্ত বলেছেন। শ্রীরামানুজ জীব ও ব্রহ্মে নিত্য স্বগত ভেদ স্বীকার করেছেন। নিম্বার্ক জীব ব্রহ্মপরিণাম স্বীকার করেও মোক্ষেও জীব ও ব্রহ্মের সনাতন ভেদ রক্ষা করে চলেছেন। শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ ভাস্করের মোক্ষে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যভাব স্বীকার করেন। কিন্তু ভাস্করের ব্রহ্মসাযুজ্য উপাসনালভ্য। জ্ঞান-শব্দে তিনি মুখ্যতঃ উপাসনাকেই লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে জীব-জগৎস্থ ভেদ ঔপাধিক, তাদের সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদই স্বাভাবিক। এই তাদাত্ম্যটি তিনি ব্রহ্মপরিণামের মধ্য দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সর্বব্যাপীতে পরিণামই তাঁর পক্ষে নিগ্রহ-স্থান। ইনিও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না এবং মোক্ষের নিমিত্ত জ্ঞানীর উৎক্রান্তিও স্বীকার করেন।

১৩। **দ্বৈতাদ্বৈতবাদ**—এই প্রাচীন মতের সংস্কারক বৈষ্ণব নিম্বার্কাচার্য (১১শ শতাব্দী ?)। ইনি রামানুজ ও মধ্বাচার্যের সময়ের মধ্যবর্তী। এঁর মতে ব্রহ্ম কারণ-রূপে নিরাকার, কার্যরূপে তিনি জীব ও প্রপঞ্চ। জীব তাঁর ভোক্তৃশক্তি এবং জগৎ তাঁর ভোগ্যশক্তি। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি সত্য। সেইজন্য সশক্তিক ব্রহ্মপরিণাম জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য। কার্য কারণের সহিত অভেদ বলে জীবকে ব্রহ্ম বলা চলে। পরন্তু কার্যে কারণের বৈরূপ্যও থাকে—এই সাংখ্য-মতকে আশ্রয় করে তিনি ব্রহ্ম ও জীবে ভেদস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মোক্ষেও জীব ও ব্রহ্মের সনাতন ভেদ থাকে, পরন্তু জগৎ ব্রহ্মাকারিত হয়। এইটিই তাঁর মতের নিগ্রহস্থান। রামানুজ-মতে নির্গুণ মানে নিকৃষ্ট গুণ-রহিত, কিন্তু তিনি 'কল্যাণগুণমহোদধিঃ'। নিম্বার্কমতে ব্রহ্ম অনন্তগুণ, শ্রীশংকরমতে ব্রহ্ম সর্বগুণ-রহিত। নিম্বার্কাচার্যের এই অচিন্ত্য শক্তিকে আশ্রয় করে পরবর্তী কালে গৌড়দেশীয় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের উৎপত্তি।

১৪। **অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ**—বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যকার অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেব বিদ্যাভূষণ নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-সম্প্রদায়ভুক্ত ও উৎকলনিবাসী। ইনি

রামানুজের অচিৎ (প্রকৃতি) পদার্থটি বিশ্লেষণ করে ঈশ্বর ও চিতের (জীবের) সহিত আরও দুটি পদার্থ সংযোগ করেন। সে দুটি কাল ও কর্ম। অবশ্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের ২।৫।১৪ শ্লোকে দ্রব্য কর্ম কাল স্বভাব জীব ও বাসুদেব তত্ত্বের উল্লেখ আছে। বিদ্যাভূষণের মতে ঈশ্বর জীব প্রকৃতি ও কাল নিত্য পদার্থ এবং কর্ম বা অদৃষ্ট অনিত্য ও বিনাশী। জীব হ'ল ঈশ্বর, কাল ও প্রকৃতি বশ্য। কাল ও প্রকৃতি হল ঈশ্বরবশ্য। ইনিও নিম্বার্কের মত জীবকে ঈশ্বরের ভোক্তৃশক্তি এবং প্রকৃতিকে ভোগ্যশক্তিরূপে স্বীকার করেছেন। জীব ঈশ্বরের গুণ দেহ বা শক্তি; ঈশ্বর গুণী দেহী বা শক্তিমান। মোক্ষেও জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে, কিন্তু গুণ ও গুণী ভাবে অভেদ। এই ভেদাভেদটি ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। মধ্ব ও শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় শ্রীমদ্‌ভাগবতকে তাঁদের মতানুকূল বেদান্তভাষ্য বলে স্বীকার করেন। কিন্তু তা হলেও শ্রীধরাদি অদ্বৈতবেদান্তীরা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে একখানি উৎকৃষ্ট ত্যাগবৈরাগ্যমূলক অদ্বৈতগ্রন্থ বলেই জানেন। প্রমাণ—ব্রহ্মস্তুতির "আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং, তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্। জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে, রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥" (বিষ্ণুভাগবত ১০।১৪।২৫)। তা ছাড়াও ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অদ্বৈতপর বলেই বোধ হয়। যথা—১।১।১ ॥ ১।৩।৩৩,৩৪ ॥ ১।৫।২৭ ॥ ২।২।১৭, ১৮॥ ২।৬।৪০ ॥ ২।৯।৩২, ৩৩ ॥ ২।১০।৩৪, ৩৫ ॥ ৩। ৭।১০,১১॥ ৭।১৪।৩৪, ৩৫, ৬২-৬৫॥ ৮।৩।১৩॥ ৮।৬।৮॥ ১০।১৪।২২ ইত্যাদি।

তবে শ্রীমদ্‌ভাগবতে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই প্রধান ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলদেব এই সগুণ ব্রহ্মে সেব্যসেবকভাব দ্বারাই মুক্তির কথা বলেছেন। এই সেব্যসেবকভাব পঞ্চধা বিভক্ত—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর। এর মধ্যে মাধুর্যভাবই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। বলদেবের প্রকৃতি-বিভাগ নব্য-কারিকাসাংখ্যের অনুকূল নয়, পরন্তু প্রাচীন সাংখ্য অর্থাৎ মহাভারতে কথিত ঋষি-নারায়ণের ও ভাগবতের ঋষি কপিলের মতের অনুকূল। নব্য-সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্রা, পরন্তু প্রাচীন সাংখ্যের প্রকৃতি ঈশ্বরতন্ত্রা। কাল তত্ত্বটি তিনি অধিক সময়ই ন্যায়ের অনুকূলেই নিয়েছেন—"ভূত-ভবিষ্যদ্‌বর্তমানাদি ব্যবহারের হেতু"। পরন্তু ভাগবত-মতে কালশক্তি নির্গুণাত্মার প্রথম সগুণাভিব্যক্তি। বহির্জগতের পরিমাপক-রূপে তিনি কাল এবং জগদ্‌দ্রষ্টারূপে তিনি ভোক্তৃশক্তি। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ত্রিধা বিভক্ত—(১) স্বরূপশক্তি নিত্য লীলাধামে—সন্ধিনী (অস্তি), সম্বিৎ (ভাতি) এবং হ্লাদিনী (প্রীতি); (২) তটস্থা—জীবশক্তি বা ভোক্তৃশক্তি; এবং (৩) বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা, যার পরিণাম এই দৃশ্য জগৎ। এই বহিরঙ্গ মায়াশক্তি ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না—রামানুজেরই মত পরমাত্মা অতিপ্রাকৃত-গুণশালী এবং চিৎ জড় শক্তির আশ্রয়স্থল। হেতু—"অবিচিন্ত্যশক্তিকত্বাৎ"। অদ্বৈত-বেদান্তীরা মায়ার অনির্বচনীয়তা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বলদেব শক্তি অবিচিন্ত্য বলে আর তা বিশ্লেষণ করেন নি। এঁরাও জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তির সহিত কর্মের সমুচ্চয় স্বীকার করেন না (গীতোপক্রমণিকা—বলদেব-ভাষ্য)।

১৫। **শুদ্ধাদ্বৈতবাদ**—এ মতের আবিষ্কারক বল্লভাচার্য (১৬শ শতক)। ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব—জীব জগৎ তাঁর পরিণাম কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। এই অবিকৃত পরিণামবাদ কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্তীদের অনির্বচনীয়া

মায়াশক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত নয়; এতে ব্রহ্মও সত্য, জীব-জগৎও সত্য, ব্রহ্ম নিগুর্ণও বটেন, সগুণও বটেন; ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান হ'য়েও গুণাতীত। ব্রহ্মে এই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ তাঁর অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ঘটে থাকে। "অচিন্ত্যানন্তশক্তিমতি সর্বভবনসামর্থ্যে ব্রহ্মণি বিরোধাভাবাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭—বল্লভকৃত অনুভাষ্য)। এঁর মতে নিত্য গোলোক-লীলায় শ্রীভগবানকে পতিভাবে সেবা করাই জীবের মোক্ষ। কারণরূপে জীব ও জগৎ উভয়ই শুদ্ধ।

১৬। **শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা পাশুপতমত**—শ্রীকণ্ঠ (১০ম শতাব্দী) এই মতের সংস্কারক। এই মতের প্রাচীনাচার্য ভাষ্যকার নীলকণ্ঠ। তিনি ভগবান শংকরাচার্য কর্তৃক পরাজিত হয়ে অদ্বৈতমত আশ্রয় করেন এবং অদ্বৈতপক্ষে দেবী-ভাগবতের টীকা প্রণয়ন করেন। অতঃপর এই সম্প্রদায় অপ্রকাশিত ভাবে থাকে। এইরূপ প্রবাদ আছে, শ্রীরামানুজাচার্য এই ভাষ্যের সন্ধান পান এবং উহা হতেই বোধায়ন-বৃত্তি সংগ্রহ করেন। কথিত আছে, উহার সমগ্র জিনিষটি তাঁর হস্তচ্যুত হয়। ওতে যে বোধায়ন-বৃত্তি উদ্ধৃত হয় এবং ওর যে ত্রিবিধ তত্ত্ব, তারই ভিত্তিতে তাঁর বৈষ্ণব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে ব্যাখ্যাত হয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে উহাতে শ্রীরামানুজাচার্যের মৌলিকতা অত্যদ্ভুত। কিন্তু তাঁর কিছু কাল পরেই শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকণ্ঠ প্রাচীন নীলকণ্ঠের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করেন। উভয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তত্ত্ব একই, কেবল রামানুজের ব্রহ্ম বিষ্ণু, স্বরূপশক্তি লক্ষ্মী, প্রকৃতি অচিৎ এবং জীব চিতের স্থলে শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্ম শিব, স্বরূপশক্তি পরাশক্তি, প্রকৃতি মায়া এবং জীব পশু। রামানুজ-মতে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দাস্যলাভই মুক্তি, কিন্তু শ্রীকণ্ঠমতে সার্ষ্টি ও স্বারূপ্য অর্থাৎ শিবের সমানরূপ জ্ঞান ঐশ্বর্য ও আনন্দলাভই মুক্তি উপায় 'শিবোঽহম্' ভাবনা বা উপাসনা। ইনি জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী। অপ্পয়দীক্ষিত একজ অদ্বৈতাচার্য হলেও সম্প্রদায়-অনুরোধে শ্রীকণ্ঠে শৈবভাষ্যের ওপর 'শিবার্ক-মণিদীপিকা' না টীকারচনা করেন। ইনি নৃসিংহ আশ্রমে নিকট পরাজিত হয়ে অদ্বৈতমতে দীক্ষিত হন।

এঁদের মত ৩৬ তত্ত্বে বিভক্ত। মায়ার পং কঞ্চুক বা পাশে জীব আবদ্ধ। এই পঞ্চকঞ্চু (১) নিয়তি (Order or Law of Causation কাল (time), রাগ (attachment or interest অবিদ্যা (worldly knowledge) এবং ক (power)। এই পঞ্চকঞ্চুকের মূল হলেন অবি মায়া ও বিদ্যামায়া। এঁর অধীশ্বর হলেন ঈশ্ব (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী শিব)। পরমকারুণি সর্বজ্ঞানগুরু সদাশিব (পঞ্চমন্ত্রমূর্তি) মূল সশক্তি ব্রহ্মস্বরূপ শিবের আর এক প্রকাশ।

শ্রীকণ্ঠের মতে মায়ার এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তি কর্ম। এই কর্মই পশুপাশ নির্মাণ করে। কি এই কর্মই যখন ঈশ্বরার্থে হয়, তখন জীব পশুপা মুক্ত হয়ে শিবত্ব লাভ করে। খৃষ্টানদের ম এঁরাও পাপের জন্য অতিরিক্ত অনুশোচনাকারী

[বিঃ দ্রঃ—প্রাচীন নীলকণ্ঠের সহিত আম সাধারণতঃ দু'জন আচার্যকে গুলিয়ে ফেলি প্রথম নীলকণ্ঠ শিবাচার্য (১৬শ শতাব্দী)। ই লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ভুক্ত। ইনিও প্রাচীন নীলকণ্ ভাষ্যের প্রবাদাবলম্বনে 'ক্রিয়াসার' নামে এক ভা রচনা করেন। দ্বিতীয়, নীলকণ্ঠসূরি (১৭শ শত ইনি অদ্বৈতপক্ষে মহাভারতের টীকা রচ করেন। বোধ হয়, কাশ্মীরী শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদ্বৈত বাদই দক্ষিণদেশে পরবর্তী কালে নীলকণ্ঠের সহি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রূপ গ্রহণ করে। এঁরা প্রত্যভি জ্ঞাবাদীদের আগমপ্রমাণের সহিত শ্রুতি প্রমাণ গ্রহণ করে বৈদিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন।]

হিন্দী লোক-সাহিত্য

শ্রীগোপীনাথ সেন

ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা গৌরবান্বিত হিন্দীভাষা ও সাহিত্য-সম্পদকে এখনও ভালভাবে আমরা জানবার চেষ্টা করিনি। আমরা হিন্দী-সাহিত্যের মধ্যে তুলসীদাসের রামায়ণ ছাড়া আর যে বিশেষ কোন গ্রন্থ আছে তা জানি না। সমগ্র ভারতে হিন্দীভাষা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। আমরা ভারতের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই হিন্দীভাষায় আদান-প্রদান করে থাকি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেমন ইংরেজী ভাষা জানলে অসুবিধা হয় না, সেরকম হিন্দীভাষা জানলে ভারতের সকল স্থানে কাজ চালাতে পারা যায়। হিন্দীভাষায় বহু গ্রন্থ লেখা হচ্ছে, তা কোন কোন বাঙ্গালী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি আলোচনা করেছেন, কিন্তু এর লোকসাহিত্য-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি। হিন্দি লোক-সাহিত্যের যে বিরাট ক্ষেত্র আছে, তা কষ্ট করে কর্ষণ না করলে বোঝা যায় না। হিন্দী-সাহিত্যের প্রচারক এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন লোক-সাহিত্যের কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রণ করে এর গৌরব ও ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অমরনাথ ঝা বলেছেন, 'গ্রাম্য-সাহিত্য সাহিত্যকা এক বহুত বড়া অংগ হৈ। কোই ভী সাহিত্য জীবিত নহী রহ সকতা হৈ জিসকা মৌলিক সম্বন্ধ জনসাধারণসে ন হো'; অর্থাৎ গ্রাম্য-সাহিত্য সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অঙ্গ। কোন সাহিত্য জীবিত থাকতে পারে না যতক্ষণ না এর মৌলিক সম্বন্ধ জন-সাধারণের সঙ্গে না থাকে। হিন্দী লোক-সাহিত্যকে রক্ষা করবার জন্য এখন সাহিত্যিকগণ বিশেষ সচেতন হয়েছেন। এর সৌন্দর্য্য রাজস্থানী ও বুন্দেলখণ্ড, ব্রজধাম ও ছত্রিশ-গড় লোকগীতের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী লোক-সাহিত্যের মধ্যে গাথা গল্প ছড়া প্রবাদ এবং গীত সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। এর ভেতর ভারতীয় ইতিহাসের নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লোক-সাহিত্য কেবলমাত্র বর্ণজ সনাতনধর্ম্মী গ্রামসমূহে বদ্ধ ছিল না, ইহা আদিবাসীদের সাহিত্যের সঙ্গেও নিকট-সম্বদ্ধ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে হিন্দী লোকসাহিত্য-সংগ্রহ রাঁচীর বিখ্যাত উকিল শরৎচন্দ্র রায় তাঁর সম্পাদিত 'Man-in-India' মাসিক পত্রিকায় ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন। লেঃ কর্ণেল আর সি টেম্পলের 'A Dictionary of Hindusthani Proverbs', ভেরিয়ার এলউইন, আর্চার, ডন হাইমানড্রফ এবং আরও কয়েক জন পণ্ডিত উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য-ভারতীয় হিন্দী লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করে সামাজিক নৃতত্ত্বপাঠের নূতন দিক খুলে দেন। বর্ত্তমান যুগে বহু হিন্দীসাহিত্য-সেবক—যথা, কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়, দুর্গাশংকর প্রসাদ সিংহ, রাম ইকবাল সিংহ, সূর্য্যকরণ পারীক, কৃষ্ণ-নন্দ গুপ্ত, ডাঃ সত্যেন্দ্র, গণেশ চোবে প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করে ভারতীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন। আমরা মূর্খ অজ্ঞ ও শাস্ত্র-অনভিজ্ঞ বলে যে গ্রামবাসীদের হেয় মনে করি, তাদের মধ্যে যে জ্ঞানের খনি আছে তাদের রচিত

দুএকটি কথা ও কাহিনী এবং গানের মধ্য দিয়ে পরিচয় পাব।

হিন্দী লোক-সাহিত্যে একটি লোক-মহাকাব্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কাব্যটির নাম 'দোলা'। ইহা বহুকাল ধরে লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। হিন্দী লোকসাহিত্য-সংগ্রাহক ডাঃ সত্যেন্দ্র বলেছেন, "যহ দোলা বর্ষা ঋতুমে হী প্রায়ঃ সুনা জাতা হৈ। দোলা সাধারণতঃ চিকাড়ে পর গায়া জাতা হৈ।" দোলা বর্ষা ঋতুর কাব্য। যখন শারেঙ্গী বাজিয়ে গ্রাম্য গায়ক গাইতে থাকে, তার কণ্ঠ ও যন্ত্র হতে যে অপূর্ব্ব সুরের সমাবেশ হয় তাহা শ্রোতাকে অভিভূত করে। দোলার উত্তর-ভারতে, মধ্যপ্রদেশে, উত্তরপ্রদেশে ও রাজপুতানায় বিশেষ সুর আছে, কিন্তু ব্রজে ইহা ভজনের সুরে গাওয়া হয়। এর বিষয়-বস্তু হচ্ছে প্রেম-কাহিনী। দোলার ভেতর লোক-জীবনের পূর্ণচ্ছবি দেখা যায়। এই কাব্যে ভাষার বন্ধন, সৌন্দর্য্য এবং সুষ্ঠুতার ও পৌরাণিক তথ্যের পরিচয় পাই। যেখানে লোক-মহাকাব্য এরকম বিশদ হয়, সেস্থানে কবিকে মাঝে মাঝে নানা অবান্তর কথা ঢুকিয়ে মেলাতে হয়, কিন্তু দোলা কাব্যটি পড়লে এরকম কোন কিছু মনে হয় না। দোলার সঙ্গে 'কথা-সরিৎসাগরে' বর্ণিত বাসবদত্তার প্রেমকাহিনীর সবিশেষ মিল দেখা যায়। এর সঙ্গে মহাভারতের দময়ন্তীর স্বয়ংবরের তুলনা করা যেতে পারে। ব্রজের লোক-কথাকার নলের কাহিনীর সঙ্গে দোলা কাব্যকে এমন কৌশলে যোগ করে দিয়েছেন যে, এর আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত খেই হারাননি। কাব্যটির বিশেষত্ব হচ্ছে, কবি তাঁর কাব্যের নায়কদের মানবীয় মর্য্যাদা দিয়েছেন ও আদর্শ পুরুষ এবং সচ্চরিত্রা প্রেমপরায়ণা ও পতিপ্রাণা নারীদের চিত্র অংকন করেছেন।

হিন্দীতে অজস্র লোক-গীতের পরিচয় পাই। রাজস্থানী মৈথিলী ভোজপুরী প্রভৃতি লোক-সংগীতগুলি নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে। সকল গীতগুলির ধারাবাহিক গতি হিন্দুস্থানী মনোভাবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মৌখিক সাহিত্যের বনিয়াদ একশ বছর আগে এমন দৃঢ় ছিল যে, সকল প্রদেশে গ্রামবাসীরা বংশ-পরম্পরায় উহা বিস্তার করত। তাদের নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন গানের মধ্য থেকে ব্যক্ত হত। গ্রাম্য গৃহকর্ত্তা ও গৃহিণীরা সুষ্ঠুভাবে সংসার পরিচালনের কার্য্য-কুশলতা গান কথা ছড়া ও প্রবাদের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়ে যেত, যা থেকে তাদের বংশধরগণ সকল সময়ই সংসারকে আনন্দময় করে রাখত। রাজস্থানী লোকগীত-সংকলনকর্ত্তা পণ্ডিত সূর্য্যকরণ পারীক বলেছেন, "লোক-গীতোমে ব্যক্ত জীবন কিতনা স্বস্থ, কিতনা স্বাভাবিক, কিতনা সুংদর, কিতনা নির্ম্মল, পুষ্ট ঔর সজীব হৈ, যহ কহনে কী আবশ্যকতা নহী হৈ। জিস কালকে পরিচায়ক যে গীত হৈ, বহ বাস্তবমে কিতনা মধুর ঔর পূর্ণ রহা হোগা, যহ কল্পনা হী হমারে বর্ত্তমান সামাজিক জীবনকী অনেক বিষম জটিলতাও ঔর সংতাপোকো শমন কর সকতী হৈ। জিস কালমে প্রত্যেক সমাজ ঔর ব্যক্তিকে দৈনিক কার্য্যোমে মধুর সংগীতকা আলাপ ধ্বনিত হোতা থা, বহ কাল বাস্তবমে স্বর্গীয় কাল থা। গাঁওমে হমারী মাতাএঁ ঔর বহনে আজভী ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত মে উঠ কর ঝাড়ু দেতী হুই, দুধ দুহতী ঔর দহী বিলোতী হুই গায়-ভৈসোকী সেবা করতী হুই—গাতী হৈ। বে চক্কী পীসতা হুই গাতী হৈ, জলাশয় অথবা কুএঁসে জল লাতী হুই গাতী হৈ। উনকে গীতোমে ঘরেলু জীবনকে আদর্শ প্রেমকী ভাবনাএঁ তরংগিত হোতী হৈ।"

হিন্দী লোক-গীতকে ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) চন্দন নিম পিপুল প্রভৃতি বৃক্ষকে পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের অঙ্গ মনে করে গান রচনা করা হয়।

(২) পাখীদের মধ্যে চিল ও কাককে প্রেমের সংবাদবাহক হিসাবে ধরা হয়; এই সম্বন্ধে নানা গীত প্রচলিত আছে।

(৩) বধূর শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ী ও ননদের কাছে নব জীবন-আরম্ভে গঞ্জনার বেদনা এবং পতির সঙ্গে প্রথম জীবন-আরম্ভ গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

(৪) এর বিপরীত বধূর জীবনের সুখস্বপ্ন ও জীবনের প্রবহমাণ গীত।

(৫) চরকা চাকী সরোবর কুয়া খেত ও দৈনন্দিন দরকারী জিনিষ নিয়ে বাস্তব জীবনের গান।

(৬) গ্রামবাসীদের ঘরকরনার গান।

গীতসাহিত্যের অধ্যয়ন করে বর্ত্তমান যুগে কি লাভ হয়, তা এ গানগুলির আলোচনা না করলে বুঝে ওঠা কঠিন। সত্য শিব ও সুন্দরের মত গানগুলিও সরল স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে শ্রবণ ও মনকে তৃপ্ত দেয়। যেমন একটি গানে দেখি:

"সীতাকে সখিয়া পুছতী হৈ
সীতা কৌন তপস্যা তুঁ কহলিউ
রাম বর পউলিউ।
ভুখল রহিলিউঁ একাদসিয়া
দুয়াদসিয়া ক পারণ।
বিধিসে রহিউ অহত বার
রাম বর পায়ো॥"

'সখী সীতা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি কোন তপস্যার বলে তুমি রামের মত পতি পেয়েছ। তুমি একাদশীর উপোস করে দ্বাদশীতে তার পারণ করেছ। বিধি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে রামের মত পতি পাইয়ে দিয়েছেন।'

লোক-সংগীতকারদের নাম বড় একটা পাওয়া যায় না, কারণ কবে কোন সময়ে কোন কবির আবির্ভাব হয়েছিল বলা কঠিন। হিন্দীতে কয়েক জন বিখ্যাত কবিদের নাম পাওয়া গেছে, তাঁদের মধ্যে কবি ইসুরীর নাম সবচেয়ে আগে করা যেতে পারে। তিনি ঝাঁসীর মউরানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'ফাগে' কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বুন্দেলখণ্ডে ইসুরীর কবিতাগুলি চৌকড়িয়া নামে প্রসিদ্ধ। এখনও ইসুরীর বহু শিষ্য তাঁর রচিত গান গেয়ে থাকেন। তাঁর ওপর সমগ্র হিন্দুস্থানী সমাজের শ্রদ্ধা একটি দোঁহায় ব্যক্ত হয়েছে—

"রামায়ণ তুলসী কহী
তানসেন জ্যো রাগ।
সোই যা কলিকাল মে,
কহী ইসুরী ফাগ॥"

ইসুরীর গান হিন্দী লোক-সংগীতের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাঁর এক হাজারের বেশী গান সংগৃহীত হয়েছে। এই কাব-সম্বন্ধে হিন্দী পত্রিকায় ইতোমধ্যে বহু আলোচনা হয়ে গেছে; এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়।

বিহারে আদিবাসীদের সংগীত থাকা সত্ত্বেও বিহারের নিজস্ব গান আছে। বিহারী লোক-গীতের মধ্যে যে কয়েকটি করুণ চিত্র দেখতে পাই, তা আমাদের বাংলার মন্বন্তরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। চাষীরা জলের জন্য যে ভগবানের কাছে আবেদন করে তাদের একটি গানে তা ফুটে উঠেছে—

"ইনর দেবা বড়া বয়মান
জল বিনু কেসরি সুখিয় গইলে।
অব কা করী ভগবান
জল বিনু কেসরি সুখিয় গইলে।"

'ভগবান ইন্দ্র বড় নিষ্ঠুর, জল ছাড়া কেসরী শুখিয়ে গেল। হে ভগবান, বল আমি কি করব। জল না হ'লে কেসরী শুখিয়ে যাচ্ছে।'

হিন্দী লোক-সাহিত্যের মধ্যে লোক-কাহিনী একটি বিশেষ ক্ষেত্র অধিকার করে আছে। লোক-কাহিনীকার বিভিন্ন রূপে গল্প রচনা করেছে। 'ব্রজকী লোক-কহনিয়া' এবং 'বুন্দেলখণ্ডকী লোককহানিয়া' এ দুটি কাহিনীর মধ্যে হিন্দীর লোককথার বিরাট রূপ ধরা পড়েছে। লোককাহিনী-সমালোচক একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন:— (১) রামলীলা, (২) রাধাকৃষ্ণলীলা, (৩) পৌরাণিক কাহিনী, (৪) জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় (৫) ঘরকন্না-সম্বন্ধীয় এবং (৬) সাময়িক ঘটনাসম্বন্ধীয়।

এ ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে লোক-কাহিনীর পরিচয় পাই। হিন্দী লোককথা এখন কিছু কিছু ব্রজসাহিত্য-মণ্ডল ও হিন্দীসাহিত্য-মণ্ডলের উদ্যোগে সংগৃহীত হচ্ছে। ভারতীয় লোককাহিনী বিশেষতঃ হিন্দীকথাগুলির ওপর বহু বৈদেশিক লোকসাহিত্য-বিশারদ বিশেষ করে নজর দিয়েছিলেন। জার্ম্মাণপণ্ডিত জেকব লুড্‌বিগ গ্রিম—যাঁর নামে 'Grimm's Fairy Tales' খ্যাতি লাভ করেছে—সর্ব্বপ্রথমে লোককথার ঐতিহ্য বর্ণনা করেন। ইউরোপের সকল নীতিবিদরা বলেছেন, "All merchants came from India just because the Indian Panchatantra was translated and transmitted to Europe." পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক-কুলক বলেন, অনেক ইউরোপীয় কাহিনীর ঘটনাতে পূর্ব্বদেশীয় ও পৌরাণিক নাম ও ঘটনার সহিত মিল পাওয়া যায়। কেবল লোকসাহিত্য সংগ্রহ করা এ সকল পণ্ডিতদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁরা ভাষা ও মনুষ্যজাতি-সম্বন্ধে বিশেষ করে শিক্ষা করে ছিলেন। যে জাতির লোক-কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করি, তাদের চরিত্র কার্য্যকলাপ ও সমাজকে সহজে উপলব্ধি করতে পারি। এ সকল কথার মধ্যে ইতিহাসের ছিটেফোঁটা খবর পাই, কিন্তু আসল ইতিহাসের ইতি-কথার সঙ্গে কতখানি মিল আছে তা বলা কঠিন। বহু রাজার নাম শোনা যায় যাঁরা রাজপুত রাজা বাপ্পারাওয়ের মত অলীক গল্প মুখে মুখে চলে আসছে। সে রকম 'পোপাবাই,' 'ভোলে বাবা' প্রভৃতি ইতিকথার সঙ্গে পরিচিত হই। 'পোপাবাই'-সম্বন্ধে একটি সুন্দর ঐতিহাসিক তথ্য আছে। 'পোপাবাই' গুজরাটের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উদারতা অমায়িকতা ও নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। এ ঐতিহাসিক গল্পটি মধ্য-ভারত ও গুজরাটে বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। পোপাবাই ঠিক রাণী দুর্গাবতী, অহল্যাবাই প্রভৃতি অসামান্যা নারীদের মত যোদ্ধা ও দেশভক্ত ছিলেন। ভোলে বাবা বুন্দেল খণ্ডের রাজা ছিলেন। একজন জৈন শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে টাকা ধার নেন। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে ভোলে বাবার কাছ থেকে রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেল সে কাহিনীটি সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। লোককথার মধ্যে গ্রাম্য দেবতাদের নিয়ে বহু পৌরাণিক উপাখ্যান রচনা করা হয়েছে। যেমন বরৌডা বাবা, জগদেবা বাবা, ডাবর দেবতা, পিপরী দাই, খংজা বাবা, বঁড়োলে বাবা, রতন বাবা, বোলিস বাবা প্রভৃতি দেবতার বিশেষ বিশেষ গুণ আছে এবং তাঁরা গ্রামকে রক্ষা করে থাকেন। গ্রাম্য পূজারীরা নিজেদের রচিত মন্ত্র উচ্চারণ করে শীতলা বা অন্য কোন দেবীকে সন্তুষ্ট করে যাতে গ্রামের ওপর তাদের প্রকোপ না হয়—'শ্রী নমো মাতু বংদী অনংদী ভবানী ভুবনমে বিরাজী

যা ধারণ পর্বত উজারণ: মহাকালী ক্রপালিনী নৌ সখী নৌ সুন্দরী, জালপা সব মহারাণী দুবারে অথারা লগৌ। দুধভাত সিকরণ খবাবে নীম দোর-চঁবর ডোলাএ সিদ্ধকর সিদ্ধকর হিরদৌ মে জ্ঞান দে মহা বরদান দে দুখ কো দূর কর মুখ ভরপুর কর।' এ মন্ত্রটির মধ্যে যা থাকুক না কেন এ থেকে আমরা ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনের কথা জানতে পারি। বুন্দেলখণ্ডে কারসদেব নামে পশুপালক জাতির বীর দেবতা আছেন। এর একটি মস্তবড় কাব্য প্রচলিত আছে। কারসদেবের জন্ম-বৃত্তান্তের সঙ্গে পৃথ্বীরাজ চৌহানের দু-একটি সুন্দর গল্প শোনা যায়। শ্রীরামস্বরূপ যোগী 'হিন্দী লোকবার্ত্তা' পত্রিকায় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

হিন্দী লোক-সাহিত্যের উদ্যোক্তা ভক্ত তুলসীদাস জ্ঞানদাস কবীর দাদু প্রভৃতি সন্তদের ধরা যেতে পারে। তাঁরা আসলে উচ্চস্তরের কবি হলেও তাঁদের জীবন আরম্ভ হয়েছিল সাধারণ পল্লীগ্রামে। হিন্দী লোক-কবিরা নিজেদের সাধকসম্প্রদায়-ভুক্ত করেছিলেন। কবীরের মত কত শত সাধক-মণ্ডলী গেয়েছিলেন। তাদের কয়েকটি ছোট ছোট গানের উদাহরণ দিচ্ছি—

"ঝুটি মায়া ঝুটি কায়া
ঝুট জগত পশেরা
অন্ত সমে কোই কামনআতা
চত্র প্রভু এক তেরা।"

মায়া আর দেহ মিথ্যা, জগতের সকল বস্তুই অলীক, যখন শেষ সময় আসে তখন কোন কিছুই কাজে লাগে না। চত্র বলেন একমাত্র ভরসা সেই জগৎপ্রভু। দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে সংযুক্ত ক'রে লোক-কবিগণ নিজেদের সহজ সুরে গান বেঁধে সকল জনগণকে বুঝাতে লাগলেন—

"কাম ক্রোধ মদ লোভ নিভারো
ছোড় বিরহ তু সন্ত জনা ;
নানক কহে সুনো ভগোবন্ত
যা জগ মে নাহ কোই আপনা।"

কাম ক্রোধ মোহ এবং মাৎসর্য্য ত্যাগ কর ও সাধুজন তুমি শত্রুতা ত্যাগ কর। নানক বলেন, 'হে প্রভু, কেহই জগতের আপনার জন নয়।'

আজ সমস্ত জগৎ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে মারামারি করছে, যেন শান্তি কোথাও নেই। এ দুর্দ্দিনে এমন কবি নেই যে আমাদিগকে সাম্যগানের সুধারাশি ঢেলে এক করে দিতে পারে। কিন্তু শত শত সাম্যবাদী কবিদের গান কবিতা গল্প ও বাণী পরিত্যক্ত ভাবে পড়ে আছে ; উহা কাল-বিলম্ব না করে সংগ্রহ ও প্রচার করলে পুনরায় ভারতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট ; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র—তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না ? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না ?"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

An Introduction to Indian Philosophy—By Satish Chandra Chatterjee, M. A., Ph. D., Lecturer in Philosophy, Calcutta University and Dhirendra Mohan Datta, M. A., Ph. D., Professor of Philosophy, Patna College: Third Edition (revised). Published by University of Calcutta. Pp. 496; Price Rs. 6/8.

আলোচ্যমান গ্রন্থ ভারতীয় দর্শনের একখানি অতীব সুলিখিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্যবহুল প্রবেশিকা। গ্রন্থকারদ্বয় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত থাকায় এবং দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনায় বিচক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হওয়ায় বিষয়বস্তুগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং জ্ঞানার্থী সাধারণ পাঠকগণের উপযোগী করিয়া বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ পরিচিতি রূপে দর্শনের স্বরূপ, ভারতীয় দর্শনের তাৎপর্য ও লক্ষ্য, ভারতীয় দর্শনের শ্রেণী-বিভাগ, ভারতীয় দর্শনে প্রামাণ্য ও বিচারের স্থান, ভারতীয় দর্শনসমূহের ক্রমবিকাশ, তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, দেশকালের পটভূমিকা এবং চার্বাক-জৈন-বৌদ্ধ-ন্যায়-বৈশেষিক-সাংখ্য-যোগ-মীমাংসা-বেদান্ত-দর্শনসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে যথাক্রমে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শনগুলির সবিস্তার ও বিশদ আলোচনা স্থান পাইয়াছে। সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির বিচারে, ব্যাখ্যানে ও মীমাংসায় গ্রন্থকারদ্বয়ের পাণ্ডিত্যের গভীরতা, অধ্যয়নের পরিসর, নির্মল অনুভূতি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বর্তমান। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখকদ্বয় প্রয়োজনবোধে স্থানে স্থানে পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করিয়া তুলনামূলক আলোচনাও করিয়াছেন। 'সত্য-দর্শন'-ই যে ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য—তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হওয়ায় ইহা ছাত্র, অধ্যাপক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণের অতিশয় উপযোগী হইয়াছে। এইরূপ সুলিখিত গ্রন্থের সহায়তায় দেশীয় ও বিদেশীয় ছাত্র, অধ্যাপক ও জ্ঞানার্থী পাঠকগণ ভারতীয় দর্শনসমূহের যুক্তিপূর্ণ সার্বভৌম উদার সমন্বয়মূলক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাইবেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দৃষ্টি ও ও আদর্শ এতকাল যাবৎ পশ্চিমমুখী ছিল—প্রাচ্য দর্শনসমূহের পঠন-পাঠন ছিল না বলিলেই চলে। বৈদেশিকশাসনমুক্ত ভারতে ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ও অভ্যুদয় একান্ত আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যোপযোগী

করিয়াই পুস্তকখানা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইলে সাধারণ পাঠকদের নিকটও ইহা সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থখানির মুদ্রণ ও কাগজ উত্তম; ভাষা বেশ সহজ ও সাবলীল। আমরা ইহার বহুল প্রচার ইচ্ছা করি।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

The Way to Peace, Power and Long Life—By Swami Narayanananda. Messrs N. K. Prasad & Co, Publishers, Rishikesh (U. P.) Pages 190. Price : Rs. 2/8/-

মানুষমাত্রই স্বাধীন ভাবে ও সুখ-শান্তিতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু ইহার সাধন বা পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অধিকাংশেরই নাই। এই জন্য জগতে এত দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি। সকল শক্তির আধার কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণে ইহা দূর হইতে পারে; ইহাই লেখকের অভিমত। কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য-রক্ষাই ইহার সাধন। এই কারণে গ্রন্থকার ব্রহ্মচর্য-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। What is meant by Brahmacharya, The Aim of Brahmacharya, The Necessity of Brahmacharya, The Means to Brahmacharya, The Aid to Brahmacharya ইত্যাদি একাদশটি অধ্যায়ে পুস্তকখানি বিভক্ত। ব্রহ্মচর্য-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীর বাণী এবং বেদব্যাস, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ-সমূহ আলোচিত হইয়াছে। বক্তব্য বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যালয়াদিতে ব্রহ্মচর্যশিক্ষার একান্ত অভাব এবং সমাজও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই জন্য মানবজীবন সমস্যাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া লেখক সকল-শ্রেণীর বিবাহিত ও অবিবাহিত নরনারীকে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য অটুট থাকিলে মানুষ স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তিতে কত বলশালী হইতে পারে তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচর্য যে জগতের পক্ষে হিতকারী সাত্ত্বিক শক্তি ও সকল শ্রেণীর লোকেরই ইহা পালনীয়, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। প্রথম প্রথম ব্রহ্মচর্য-সাধন দুষ্কর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইলেও পরিণামে সুকর ও আশাব্যঞ্জক। গ্রন্থকার সকলকে নৈরাশ্য পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠার সহিত ইহার সাধনে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। দেশে ব্রহ্মচর্য-সম্বন্ধে উপযুক্ত পুস্তকের একান্ত অভাব। এ সম্বন্ধে প্রচলিত পুস্তকাদি পড়িয়া অনেককেই নিরাশ হইতে হয়। লেখক অতি সার্থকতার সহিত ব্রহ্মচর্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা সহজ সরল ইংরেজী ভাষায় লিখিত। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু যে কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

মিলনবাণী (১ম খণ্ড)—স্বামী সিদ্ধানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য, কলিকাতা, সারস্বত-সঙ্ঘ, ৯৬ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৮, মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তিকাখানি সারস্বত সংঘের মিলনসভা উপলক্ষে রচিত ধর্মভাবব্যঞ্জক কবিতা-সমষ্টি। ইহার পরিচয়পত্রে বলা হইয়াছে—"ভোজনের সাথে ভজনের তরে প্রধানতঃ এর সূচনা।" ইহা প্রধানতঃ সঙ্ঘবিশেষের ভক্তগণের উদ্দেশে রচিত হইলেও ইহাতে একটি সার্বজনীন আবেদন আছে। লেখকের ভাষায় ও ছন্দে আড়ষ্টতা

নাই এবং সর্বত্রই একটি সাবলীল গতি বিদ্যমান। কবিতাগুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত তাহা সার্থক হইয়াছে। একদিকে যেমন জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য-মূলক কবিতা রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি হাস্যরসাত্মক বিদ্রূপাত্মক ও উপদেশাত্মক গল্প-কবিতাও আছে। সকলেই নিজ নিজ গুরুকে পরব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবে ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ। তদনুযায়ী লেখকও নিজ গুরুর প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া কোথাও সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত 'যত মত তত পথ,' ও জ্ঞান-কর্ম ভক্তি-সমন্বয়াত্মক বাণী কবিতাকারে উদাহরণ-সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

আধুনিকী—শ্রীঅটলচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রভাত লাইব্রেরী, ২ সি নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—১। পৃষ্ঠা ৩১, মূল্য আট আনা মাত্র।

পুস্তিকাখানি আধুনিক ঘটনা-অবলম্বনে রচিত কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। সাম্প্রদায়িকতা, দেশবিভাগ, গরীবদের উপেক্ষা, চোরা-কারবার, নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা ইত্যাদি দৃষ্টে ব্যথিত হইয়া লেখক কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন। স্বাধীনতা-লাভে দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণ হইবে ভাবিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে আশা ভঙ্গে ব্যথিত হইয়াছেন। বইখানির ভাব ও ভাষা উত্তম।

আমি কি চাই—স্বামী নিগমানন্দজীর উপদেশাবলীর সংকলন। প্রকাশক—শ্রীমৎ নলিনী ব্রহ্মচারী। দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, হালিশহর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৫, মূল্য চারি আনা মাত্র।

'নররূপী নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,' 'আদর্শ গৃহস্থই সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক'—এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশে এই সুলিখিত পুস্তিকাখানি পরিপূর্ণ।

রাঙ্গা জবা—শ্রীবিমলানন্দ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবিমলেন্দু রায়, সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, দমদম। পৃষ্ঠা ৮৯ মূল্য এক টাকা। আলোচ্যমান পুস্তিকাখানি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি ভাবুকতায় পূর্ণ। ইহা ছেলেদের জন্য লিখিত। ইহাতে যথেষ্ট মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে। মূল্যও বেশী বলিয়া মনে হইল।

পরম আত্ম-দর্শন বা স্বরূপস্থিতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। গ্রন্থকার-কর্তৃক ৫৫ নং সুন্দরবন স্কুল রোড, ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪৪, মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। ইহার নামকরণ ঠিকই হইয়াছে। গ্রন্থকার উপনিষদ যোগদর্শন গীতা চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থের সাহায্যে আলোচ্যমান বিষয়ের বিশদ আলোচনা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বনে অধ্যাত্মদর্শন বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা যুক্তিবাদিগণের পক্ষে খুব উপযোগী; ইহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং গতি স্বচ্ছন্দ। স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি আছে। আমরা ইহার প্রচার কামনা করি।

স্বামী শ্যামলানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা—বেলুড় মঠ, আসানসোল, কনখল, কাশী, কাঁথি, জয়রামবাটী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মালদহ, মেদিনীপুর, বরিশাল, বালিয়াটী ও শিলং কেন্দ্রে এবং রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত আনন্দনগর (আগরতলা) পূর্ববঙ্গ বাস্তুত্যাগীদের উপনিবেশে ও মোকামা (বিহার) বাস্তুত্যাগীদের ক্যাম্পে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন মাতৃভবন (৭এ, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা) গত ২৬শে আশ্বিন শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাস ও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠা—গত ৫ই কার্তিক মহীশূরে ভারত-সরকারের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেন। তিনি ছাত্রদিগকে নৈতিক চরিত্রগঠনের উপদেশ দিয়া বলেন যে, চরিত্র সমগ্র পৃথিবীতে অতি মূল্যবান বস্তু। মহীশূরের মহারাজা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে মহীশূরের অর্থ ও শিল্প-সচিব শ্রী এইচ সি দাসাপ্পা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক রিপোর্টটি পাঠ করিয়া বলেন যে, তরুণের দল যাহাতে উপযুক্ত বলিষ্ঠ পৌরুষদীপ্ত আত্মনির্ভরশীল নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠে তজ্জন্য আদর্শ পরিবেশসৃষ্টি ও সুযোগসুবিধা-প্রদানই উক্ত ছাত্রাবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের কথা উল্লেখ করিয়া রাজাজী বলেন, "আমাদের দেশ নূতন যাত্রা সুরু করিয়াছে। আমাদের অনেক কিছুই করিতে হইবে। পরিবর্তনের যুগে অনেক কিছু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। সন্তান-প্রসবের পূর্বে জননীকে অনেক বেদনা সহ্য করিতে হয়। আমাদের এই পরিবর্তন শিশুর নবজন্মের ন্যায়। নূতন শাসনব্যবস্থার উপর সকল দোষারোপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। স্বাধীনতার ফলে আমাদের মধ্যে বিপর্যয়সৃষ্টি হইয়াছে মনে করা ভুল। যথাসময়ে আমরা স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইব। পরিবর্তনের যুগের সমস্ত দুঃখকষ্টও আমরা ভুলিয়া যাইব।"

মহারাজা তাঁহার ভাষণে বলেন, "স্বাধীন ভারতকে এক বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং উহার জন্য প্রকৃতগুণসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিবর্তনের মধ্যেই ছাত্রদের চরিত্র ও নৈতিক জ্ঞান গড়িয়া উঠিতে পারে এবং ঐরূপ নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করাই এই ছাত্রাবাসের লক্ষ্য। সাধনা ব্যতীত কোন ছাত্রই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় তাঁহার ঐতিহাসিক যাত্রা আরম্ভের পূর্বে মহীশূর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্টির দূত। মহীশূরের সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে এবং উক্ত মিশনের মহান আদর্শ এবং ঐতিহ্যকে তাঁহারা সর্বদাই ঊর্ধ্বে স্থান দেন।"

গত ৮ই কার্তিক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ কর্তৃক মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের অনেক সাধু বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে আগত প্রায় চল্লিশ জন সাধু-ব্রহ্মচারী ও দুই শতাধিক ভক্ত শোভাযাত্রা করিয়া পূর্বতন গৃহ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নবনির্মিত ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর যথারীতি বেদপাঠ, বাদ্য, পূজা ও হোমাদি হইয়াছে।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী—গত ৩রা কার্তিক ভারতের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতব উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো, রাজস্বমন্ত্রী মাননীয় শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠী ও জনসংযোগ-মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান-সমভিব্যাহারে পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন।

তাঁহারা সকলেই এই পাঠাগারের কার্যপ্রণালী ও পরিচালন-পদ্ধতি দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন। এই পাঠাগার উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ পাঠাগারগুলির মধ্যে অন্যতম এবং ইহা সংস্কৃতির একটি উপযুক্ত পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় মাননীয় মহাতব মন্তব্য করেন যে, এই পাঠাগারটির যাহাতে কোন অর্থাভাব না হয়, তজ্জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। তিনি এই পাঠাগারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জনসাধারণের নিকট বিশ হাজার টাকা সাহায্যের আবেদন জানান। মাননীয় মহাতব উড়িষ্যায় তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে এই নূতন পাঠাগারের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং ইহার নির্মাণকার্যের ব্যয় বাবত উড়িষ্যা-সরকার প্রায় তের হাজার টাকা সাহায্য দান করেন।

রহড়া (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, ১৯৪৮-৪৯ সনের কার্যবিবরণী—১৯৪২-৪৩ সনের দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের সমাজজীবনে এক যুগান্তকারী বিপর্যয় দেখা দেয়। ইহাতে অগণিত নরনারী যেমন অনশনে প্রাণত্যাগ করেন, তেমনি সহস্র সহস্র বালক-বালিকা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। সেই চূড়ান্ত দুর্যোগে বঙ্গীয় সরকারের সক্রিয় সাহায্যে রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকটি অনাথ বালকের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। ঠিক সেই সময় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কন্যা ৺প্রীতি মুখোপাধ্যায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রিয় পুত্র-কন্যার মৃত্যুতে মর্মাহত সতীশ বাবু অনাথ বালকগণের সাহায্য দ্বারা রামচন্দ্র ও প্রীতির স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প করেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইবার পূর্বে তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার রহড়াস্থ উদ্যানবাটী ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তি অনাথ বালকদের সেবায় নিয়োজিত করিতে তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়া যান। সতীশ বাবুর মৃত্যুর পর তদীয় সম্পত্তির অছিগণ তাঁহার রহড়াস্থ সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে সমর্পণ করেন। সতীশ বাবুর ধর্মপ্রাণা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ইন্দুপ্রভা দেবীও তিন লক্ষ টাকা মূল্যের সরকারী প্রমিসারী কাগজ এবং নগদ দশ হাজার টাকা ঐ উদ্দেশ্যে মিশনকে দান করেন। এই দানের পটভূমিকায় ১৯৪৪ সনে বালকাশ্রমটির উদ্বোধন হয়। বঙ্গীয় সরকারও এই প্রতিষ্ঠানটির ১৫০ হইতে ২৫০টি অনাথ বালকের ব্যয়নির্বাহ করিতে স্বীকৃত হন।

আশ্রমটি কলিকাতার নাগরিক জীবনের কোলাহল হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অনুকূল পরিবেশের অভাবে অনেক বালক-বালিকা আপনাদের অন্তঃস্থিত সুপ্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে সমর্থ হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন গুরুকুলপ্রথায় শিক্ষাদানের নির্দেশ দিয়াছেন। সুপ্রাচীন ব্রহ্মচর্য-আদর্শের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বৃত্তিমূলক শিক্ষা সমন্বিত হইলেই

যে উহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিবে; বালকাশ্রম-কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর এই শিক্ষাদান-আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর।

প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯৪৮ সনের প্রারম্ভে ১৮৮ এবং ১৯৪৯ সনের শেষে ১৯৪ টি বালক ছিল। বালকগণ প্রতিদিন প্রাতে এবং সন্ধ্যায় প্রার্থনা-গৃহে সমবেত হইয়া স্তোত্রাদি আবৃত্তি এবং ব্যক্তিগত ভাবে জপধ্যানাদি করে। নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দান করা হয়। বালকাশ্রমের প্রতি বালক বালকাশ্রমের আবাসিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৪৯ সনে যে চার জন বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল তাহাদের সকলেই কৃতকার্যতা লাভ করে। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে আশ্রমবালকগণ 'আশ্রম' নামে হস্তলিখিত একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে। ইহার বার্ষিক সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছিল। পত্রিকাটি বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণেরও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বালকগণ যোগ্যতার সহিত একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও প্রকাশ করিয়াছে। বালকদের মধ্যে কয়েক জন দলপতি আছে। তাহাদের নেতৃত্বে বালকগণ সাধারণ গৃহকর্ম নিজেরাই করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বালকগণ বাগানের কাজ করে। বালকগণের ছোটখাট অপরাধের বিচার হয় তাহাদের নিজস্ব বিচারালয়ে। তাহারা আপনাদের দলপতি এবং বিচারক নিযুক্ত করে।

বালকাশ্রমের প্রত্যেক বালককে প্রতিদিন এক ঘণ্টা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিতে হয়। অভিজ্ঞ কয়েক জন শিক্ষক তাহাদিগকে বয়ন, খেলনা-নির্মাণ, দর্জির কাজ এবং টাইপরাইটিং শিক্ষা দেন। আনন্দের বিষয় কয়েকটি বালক এই সকল কাজে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে। বালকগণ সঙ্গীতশিক্ষাও লাভ করিতেছে। তাহারা ব্রতচারী নৃত্য, ফুটবল, হা-ডু-ডু, ভলিবল প্রভৃতি ক্রীড়াকৌতুকেও নিয়মিতভাবে যোগদান করে। সন্তরণ এবং অশ্বারোহণেও তাহাদের অনুরাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে বালকগণের স্বাস্থ্য সন্তোষজনকই ছিল। প্রতিমাসে তাহাদের ওজন নেওয়া হইয়াছে। এই দুই বৎসরের মধ্যে লেডি মাউণ্টব্যাটেন, পশ্চিবঙ্গের প্রদেশপাল মহামান্য ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক ও সাংবাদিক মিঃ ভিন্‌সেণ্ট সিয়ান্ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি বালকাশ্রম পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

আমরা বালকাশ্রমের কয়েকটি আশু প্রয়োজনের প্রতি সহৃদয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি:—(১) ২৫০ টি বালকের সমবেত প্রার্থনার উপযুক্ত একটি প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ; এইজন্য ৫০,০০০৲ টাকা আবশ্যক। (২) একটি রন্ধনশালা এবং আহারগৃহ-নির্মাণ; ইহার জন্য অন্ততঃ ২০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। (৩) ২০টি বালকের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত অর্থের ব্যবস্থা। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া এবং সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, পোঃ রহড়া (খড়দহ), ২৪ পরগনা—এই ঠিকানায় অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করিতে আমরা সহৃদয় ব্যক্তি-বর্গকে অনুরোধ করি।

আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে বালকাশ্রমের মোট আয় যথাক্রমে ১,৩২,১৯১৷৵১ পাই ও ১,৪৪,৬২০৵১ পাই এবং মোট ব্যয় ১,১০,৩২১৷৵৬ পাই ও ১,২৫,৬৫৮৵৮ পাই।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ১৯৪৯ সনের কার্যবিবরণী—জনসেবা শিক্ষা ধর্ম এবং সংস্কৃতিমূলক কার্যদ্বারা প্রতিষ্ঠানটি বিহার প্রদেশের সমাজজীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান

অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষে এই আশ্রম-পরিচালিত ভুবনেশ্বর দাতব্য ঔষধালয়ে পাটনা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত ৪৩,৮৯২ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ১৯৪৮ সনের রোগিসংখ্যা ছিল ৩১,৪৫৮। ইহা হইতেই প্রতিষ্ঠানটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা অনুমিত হয়। দুই জন বিশিষ্ট চিকিৎসক এই ঔষধালয়টির কার্যে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বিহারের রাজ্যপাল মহামান্য শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি য্যানে, ভারতীয় রেড ক্রস্ সোসাইটি এবং জনৈক পাটনাবাসীর অর্থানুকুল্যে প্রাথমিক সেবা ও অস্ত্রোপচার বিভাগের কার্য আরব্ধ হয়। আলোচ্যমান বর্ষে ৩৯৪৬ জন ব্যক্তি প্রাথমিক সেবা ও অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করিয়াছেন। এই বৎসর আশ্রম পরিচালিত স্বামী অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪০ টি দরিদ্র বালককে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হরিজন-সম্প্রদায়ভুক্ত। স্থানাভাব-বশতঃ বহু ছেলেকে ভর্তি করা সম্ভব হয় নাই। আশ্রমের বিদ্যার্থি-ভবন ১৯২৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচ্যমান বর্ষে বিদ্যার্থি-ভবনের ১৩ জন ছাত্র পাটনার বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছে। আশ্রম-সংলগ্ন তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী ও পাঠাগার জনসাধারণের বিশেষ উপকার-সাধন করিতেছে। এই বৎসর লাইব্রেরী হইতে ৭৫৪ খানা পুস্তক পাঠকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠাগারে ৬ খানা মাসিক এবং একখানা দৈনিক পত্র আছে।

ধর্ম এবং সংস্কৃতি-মূলক কার্যাবলী দ্বারাও এই প্রতিষ্ঠান একটি পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। আশ্রমে ও বাহিরে আলোচ্যমান বর্ষে ২৩৩টি শাস্ত্রীয় আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত এবং ৬৪টি সাংস্কৃতিক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এই সকল আলোচনাতে ভারতীয় আদর্শের লোকপাবন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। আলোচ্যমান বর্ষে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ত্যাগী সন্তানের এবং অন্যান্য অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসবও সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল উৎসবউপলক্ষে স্মৃতিসভা ও ধর্মালোচনারও ব্যবস্থা হয়। এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবও যথাযোগ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে প্রায় ২০০০ দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ পূর্বক ভোজন করান হয়। এই উপলক্ষে আহূত জনসভায় বিহারের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি য্যানে সভাপতি পদে বৃত হন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান উন্নয়নে এই আশ্রমের ২৭ বর্ষব্যাপী অব্যাহত ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আশ্রমে বিস্তৃত প্রার্থনাগৃহ-যুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

আমরা আশ্রমের কয়েকটি আশু প্রয়োজনের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—(১) প্রাথমিক চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচার বিভাগের দৈনন্দিন ব্যয় নিবাহার্থ ২০০০৲ টাকার প্রয়োজন। (২) আশ্রম-সংলগ্ন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিস্তৃতিসাধন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি আসবাবপত্র, সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা-বিষয়ক বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণের ব্যবহার্য পায়খানা নির্মাণ, বিদ্যালয়গৃহের আমূল সংস্কার ইত্যাদি বাবত ৭২০০০৲ টাকার অবিলম্বে প্রয়োজন। (৩) বর্তমান লাইব্রেরী ও পাঠগৃহের বিস্তৃতিসাধন হেতু আর একটি গৃহনির্মাণ করিতে হইবে। তদুপরি লাইব্রেরীর পুস্তক-

সংখ্যার যথেষ্ট বৃদ্ধিসাধনও দরকার। এই সকল পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হইলে ৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। (৪) ছাত্রাবাসে ২৫ জন ছাত্রের বাসোপযোগী একটি পৃথক্ গৃহ-নির্মাণ অত্যাবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে ২০,০০০৲ টাকা দরকার। (৫) নিকটবর্তী মিউনিসিপ্যাল পয়ঃ-প্রণালী দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় আশ্রমের আবহাওয়া দূষিত হওয়া স্বাভাবিক। বর্ষাকালে এই জল আশ্রম-প্রাঙ্গণকে প্লাবিত করে। ইহা বন্ধ করিতে হইলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করা দরকার। আশ্রমের প্রবেশপথটিরও উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। সর্বোপরি আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। এই দীর্ঘানুভূত অভাবটি অচিরেই দূর করা প্রয়োজন। আমরা আশা করি সহৃদয় দেশবাসিগণ অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্য দ্বারা এই লোককল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানের বহুধাবিস্তৃত কার্যাবলীর পোষকতা করিবেন। আলোচ্যমান বর্ষে আশ্রমের মোট আয় ১,৮৮১৩৵১ পাই এবং মোট ব্যয় ১৩০৮১৷৵৯ পাই।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মনীষী জর্জ বার্ণার্ড শ'—বিশ্ববিখ্যাত মনীষী জর্জ বার্ণার্ড শ' গত ২রা নভেম্বর লণ্ডনের য়্যায়ট সেণ্ট লরেন্স-স্থিত তাঁহার নিভৃত পল্লীভবন 'শ'জ কর্ণারে' ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মুমূর্ষু শ'র শয্যা-পার্শ্বে চার্চ অব ইংলণ্ডের স্থানীয় রেক্টর রেভারেণ্ড ডেভিস তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য শেষ প্রার্থনা করেন। ডেভিস বলেন, "মিঃ শ' নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। মিঃ শ'র 'সেণ্ট জোয়ান' পুস্তক পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।"

আইরিশ মনীষী বার্ণার্ড শ' একাধারে নাট্যকার সমালোচক ঔপন্যাসিক সাংবাদিক এবং সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার লেখা ও সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যসমূহ মানুষের চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন আনিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই কার্যে তিনি বৈজ্ঞানিকদের অপেক্ষাও অধিকতর সাফল্য দাবী করিতে পারেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার তিনি ভাঙ্গিয়া দেন। তাঁহার বিভিন্ন নাটক ও তাহাদের বিখ্যাত ভূমিকাগুলিতে তিনি বর্তমান যুগের বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সম্পর্কে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ফলে লোকে নূতন ভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য হয় এবং ক্রমশঃ বিদগ্ধসমাজে এই কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয় যে, সেক্সপিয়রের পর ব্রিটেনে বার্ণার্ড শ'র মত অনন্যসাধারণ প্রতিভা-শালী নাট্যকার আর দেখা যায় নাই। তিনি পঞ্চাশটি নাটক লিখিয়াছেন—এইগুলি পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

বার্ণার্ড শ'র রচনাবলীর মধ্যে যে আকর্ষক

সজীবতা ছিল, তজ্জন্যই সকলে তাঁহাকে চিরনবীন বলিয়া মনে করিতেন। মানুষের ভুলভ্রান্তির উপর তিনি নির্মম আঘাত হানিতেন—সে আঘাতে প্রচণ্ডতা ছিল, কিন্তু তাহা কোন দাগ রাখিত না। আমরা তাঁহার ক্ষুরধার মেধা ও তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার দুর্জয় সাহস ও গভীর মানবতা-বোধ আর দেখিতে পাইব না। পৃথিবীর ক্রমাবনতির প্রত্যেকটি পদক্ষেপের দিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং অনেক ধ্বংস ও সর্বনাশ হইতে তিনি পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি এই চিন্তানায়কের সহানুভূতি ছিল অতুলনীয়। পৃথিবীর কল্যাণকর সব কিছুর প্রতিই তাঁহার গভীর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত।

বার্ণার্ড শ'র পল্লীভবনের প্রকোষ্ঠে সোভিয়েট-নেতা মার্শাল ষ্টালিনের একটি ছবি টাঙ্গানো ছিল। ঐ ঘরের দেয়াল-আলমারির মধ্যে একটি বুদ্ধের মূর্তিও ছিল, বুদ্ধদেবের মূর্তির দিকে মুখ রাখিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সমাজতন্ত্রবাদের তিনি এক জন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন।

শ'র প্রতিভা সমগ্র জগৎকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। যে মনীষী দুই পুরুষ যাবৎ অসংখ্য মানবের চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার বিয়োগবেদনা ভারতবর্ষ অন্যান্য সকলের মতই সমানভাবে অনুভব করিবে।

কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৯৩৬—১৯৪৫ সনের কার্যবিবরণী—আমরা এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইতে দশ বৎসরের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দজীর উৎসাহে ও প্রেরণায় এবং স্থানীয় ভক্ত ও কর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতায় ১৯৩৬ সনে আশ্রমটি স্থাপিত হয়। ধর্মগ্রন্থপাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতা, ভজন-কীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-উদ্‌যাপন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দুঃস্থনারায়ণ-সেবা, দরিদ্র কৃষক-বালকগণের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষাবিস্তার, রোগীদিগের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, পাঠাগারের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা-প্রচার প্রভৃতি আশ্রমের জনকল্যাণকর অনুষ্ঠান। উৎসবাদি উপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে সন্ন্যাসিগণ শুভাগমন করিয়া ধর্মোপদেশ ও বক্তৃতাদির দ্বারা জনগণের প্রাণে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিয়া থাকেন।

১৯৪৩ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় আশ্রম-কর্মিগণ প্রশংসনীয় সেবাকার্য করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। গভর্নমেণ্ট, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সহৃদয় জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ ও দ্রব্যাদি বাবত প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমকর্মিগণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর সেবা করিয়াছিলেন। সেবাকার্যের সৌকর্যার্থ আশ্রম শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিশটি সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া চাল, ডাল, আটা, ময়দা, দুগ্ধ, বার্লি, কাপড়, জামা, কম্বল ও ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন। ত্রিপুরা হোমিওপ্যাথিক এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আশ্রম একটি হাসপাতালও খুলিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের সেবার জন্য বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন ১৪০৲ ও ১২০ মণ চাউল; বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ৩৩৫০৲, ৮০ খানা ধুতি ও সাড়ী, ১০৮ খানা জামা ও প্যাণ্ট; বাংলা সরকার ৬৩০০৲, ৩৭০০ মণ চাউল, ১৩৭৪ খানা ধুতি ও সাড়ী, ২০০ চাদর, ৮৬১ কম্বল, ২০০০ ট্যাবলেট কুইনাক্রিন; দাতা শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ৩০০০৲; কুমিল্লার জনৈক বন্ধু ২১০০৲; বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা ২২০০৲ ও ৫০০০ ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক পিল; কলিকাতাস্থ নিখিল ভারত নারী সমিতি ২৫৫৲

ও ৩০০০ ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক পিল; পাঞ্জাব আর্যসমাজ রিলিফ সোসাইটি ৪৫০্ ও ৭৭৬ ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক পিল; কণ্ট্রাক্টর মিঃ এন্ এল্ সেন ১০০১্; শ্রীযুক্ত ত্রাণদাসুন্দর পাল ৬৫০্; রেড্‌ক্রশ সোসাইটি ২৫১৭ পাউণ্ড ঘন দুগ্ধ; বেঙ্গল রিলিপ কমিটি ১৩০০০ ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক পিল; কুমিল্লা নারীরক্ষা সমিতি ৪১ খানা জামা ও প্যাণ্ট; কুমিল্লা টাউন রিলিপ কমিটি ৫৭ খানা জামা ও প্যাণ্ট এবং অন্যান্য বহু বদান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানারূপ সাহায্যদান করিয়াছেন। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ এই সকল বদান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ। আশ্রম দুর্ভিক্ষে সেবার জন্য দানস্বরূপ মোট ৩১,১৯২্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ব্যয় করিয়াছেন মোট ৩০৫৭৬৶৯ পাই।

১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের পর উহার জের স্বরূপ আশ্রমে একদল অনাথ বালক থাকিয়া যায়। বালকদের প্রতিপালনের ভার আশ্রম গ্রহণ করেন। আশ্রমের সেবাকার্যে প্রীত হইয়া ১৯৪৫ সনের এপ্রিল হইতে সরকার মাসিক অর্থ-সাহায্য করিতেছেন এবং অনাথ বালকদের বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য এককালীন সাহায্যও দিয়াছেন। অনাথ বালকদের সংখ্যা বর্তমানে ৬০ জন। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, রেডক্রশ সোসাইটি ও কুমিল্লার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ অনাথ বালকদের ভরণপোষণের জন্য সাহায্য করিয়াছেন।

আশ্রমের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনাথ বালকদের সঙ্গে অন্যান্য বালকেরাও পড়িয়া থাকে। মধ্য ইংরেজী মান পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করাই আশ্রমের বর্তমান পরিকল্পনা। এতদুদ্দেশ্যে একটি বৃহৎ টিনের ঘর নির্মিত হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদির সংগ্রহ কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

আশ্রমের গ্রন্থাগারে ছয় শতের উপর পুস্তক আছে। স্বর্গতা কিরণশশী চক্রবর্তী ও কুমিল্লা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীক্ষিতিমোহন দাশগুপ্ত প্রায় তিন শত পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। গ্রন্থাগার-সংলগ্ন একটি পাঠাগারও আছে। পাঠাগারে পাঠকগণের জন্য মাসিক পত্র ও দৈনিক পত্রিকাদি রাখা হয়। আলোচ্যমান দশ বৎসরে গ্রন্থাগার খাতে মোট ২৬১৵১৫ ব্যয় হইয়াছে।

আলোচ্যমান দশ বৎসরে আশ্রমের আয় মোট ৩৪,৩৫৫৷৶৫ এবং মোট ব্যয় ৩১,৯১১৷৵১০।

আশ্রমের আশু প্রয়োজন: (১) পাকা শ্রীমন্দিরের নির্মাণকার্যের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা; (২) সাধু-সন্ন্যাসী ও বিশিষ্ট অতিথিদের বাসের জন্য উপরে চারিটি প্রকোষ্ঠ এবং নিম্নতলে অফিস গৃহ, কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন-স্থান, ষ্টোর গৃহ, আলোচনা-ভবনের জন্য চারিটি প্রকোষ্ঠসহ একটি দ্বিতল পাকা গৃহ; রান্নাঘর ও কর্মীদের আবাসগৃহের জন্য পাকা গৃহ; গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য দুইটি পাকা গৃহ। এই গৃহগুলি নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা। (৩) এতদ্ব্যতীত আশ্রমের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার-গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট অর্থ-সাহায্যের জন্য আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আবেদন জানাইতেছেন। সর্ববিধ সাহায্য আশ্রম-সম্পাদক শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা, পূর্ব-পাকিস্তান—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীবিবেকানন্দ-মণ্ডলী পাঠচক্র—আমেদাবাদ (গুজরাট)—আমেদাবাদ শহরে 'শ্রীবিবেকানন্দ-মণ্ডলী পাঠচক্র' নামে একটি নূতন সংঘ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সাপ্তাহিক বৈঠক শহরের বিভিন্ন স্থানে ভক্তগণের গৃহে হইয়া থাকে।

এ-পর্য্যন্ত ইহার আটটি সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই পাঠচক্রের বৈঠকে সাধারণতঃ বেদমন্ত্রোচ্চারণ, ধ্যান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-পাঠ (গুজরাটি ও হিন্দি), ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আরতি, নামধুন, ভজন ও বৈদিক প্রার্থনাদি হইয়া থাকে।

এ পর্যন্ত যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা, রাণী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীরামকৃষ্ণের পূজকপদ-গ্রহণ, বিগ্রহপূজায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা হইয়াছে। আলোচনাদি সাধারণতঃ হিন্দি ও গুজরাটি ভাষায় হইয়া থাকে। পাঠ, আলোচনা, বক্তৃতা, ভজন-সঙ্গীত, প্রার্থনা প্রভৃতির দ্বারা পাঠচক্রের সভ্যবৃন্দের মধ্যে সবিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইতেছে।

সৌর রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা—সৌর-রশ্মির রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য বোম্বাই-এর মিঃ এ বি সাহিয়ার ও তিন জন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জুংফ্রাও পর্বতের তুষার ও নির্জনতার মধ্যে সাড়ে চারি মাস কাল অবস্থান করিবেন। উক্ত চারিজন বৈজ্ঞানিক ১১,২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত আন্তর্জাতিক গবেষণা-কেন্দ্রে তাঁহাদের গবেষণাকার্য্য চালাইবেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা নিম্নাঞ্চলে নামিয়া আসিবেন। তাঁহারা বিশিষ্ট বৃটিশ আণবিক বৈজ্ঞানিক প্রফেসার এম জি ব্লাকেটের (ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন) নির্দ্দেশে কাজ করিবেন। উক্ত দলের অন্যতম বৃটিশ বৈজ্ঞানিক মিঃ জে এ নিউইথ বলেন, আণবিক গবেষণার সহিত তাঁহাদের কাজের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। তবে তাঁহাদের কাজ নিশ্চিতরূপে ঐ দিক দিয়াই শেষ হইবে। সৌর রশ্মি সম্পর্কে গবেষণাকার্যে বৃটিশ বিশেষভাবে কাজ করিতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহাদের কাজ প্রায় এক বৎসর ধরিয়া চলিবে।

খননযন্ত্রের বিস্ময়কর কার্য—সোভিয়েট রাশিয়া ভল্‌গা নদীর নয়া বিদ্যুৎষ্টেশন ও বৃহৎ তুর্কম্যান খাল খননের কার্য ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে এক সঙ্গে ২০ ঘন গজ ভূমি খননে সমর্থ হাজার টনের খনন-যন্ত্র নির্মাণ করিতেছে। দৈনিক ইহা দ্বারা ২৬ হাজার ঘন গজ ভূমি অপসারণ চলিবে। এইরূপ ২৫টি খনন-যন্ত্র এক বৎসরে মস্কো-ভল্‌গা খালের মত বৃহৎ খাল খনন করিতে পারে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে এই খালের সাহায্যে কাস্পিয়ান সাগর হইতে আমুদরিয়া নদী পর্যন্ত ১ লক্ষ ১০ হাজার বর্গ মাইল মরুভূমি উর্বর তুলা-উৎপাদন-ভূমি ও গো-চারণ-ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব—এই বৎসর আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর সি ভি রমণ সমাবর্তন-ভাষণ প্রদান করেন। স্নাতকদের উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়া জীবনে কিরূপে সাফল্যলাভ করা যাইতে পারে তাহার উল্লেখ করেন। নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যের সাধুতা লইয়া কর্তব্যপথে নিরত থাকিলে শেষ পর্যন্ত সাফল্য আপনা হইতেই আসিবে। ডক্টর রমণ নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দেন এবং বলেন তাঁহার পিতা ছিলেন একজন শিক্ষক। মাসে তিনি মাত্র ১০৲ টাকা উপার্জন করিতেন। কাজেই বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে অতি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার জীবনকে সাফল্যের পথে লইয়া গিয়াছে অনেকখানি। তিনি মনে করেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। যুবসমাজই ভবিষ্যৎ ভারতের মেরুদণ্ড। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি যুবজনের দেহ ও মনকে বলিষ্ঠরূপে গড়িয়া তুলিতে না পারে তাহা হইলে সে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

মাতৃবন্দনা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

পরমশুদ্ধা পূজারিণী তুমি
জীব-ধাত্রী মহামায়া,
তোমার নয়ন হতে
অপার আনন্দ-জ্যোতি
ক্ষরে, তুমি মূর্ত দয়া!

বিশ্বের জীবন-স্রোত
যেই পথ অতিক্রমি
চলিতেছে অলক্ষ্য নির্দেশে,
তোমার জীবনধারা
রামকৃষ্ণ পরশিয়া
অবিশ্রাম সেই পথে মেশে।

কৌমার্য বহন করি
মাতা-রূপে ধর মাগো,
এই ধরিত্রীরে,
রাজেশ্বরী হয়ে তবু,
দীনতার মূর্তি ধরি
সেবা কর বিশ্বের সবারে।

জীবন-রহস্য জানি
দুঃখের প্রবাহমুখে
থাক নির্বিকার।
তোমারে প্রণাম দেবি,
তাই আমি করি বারংবার।

তোমার প্রভুরে তুমি নিদ্রা-জাগরণে,
রাখিয়াছ নিয়ত ধেয়ানে
নহ বিস্মরণ!
সেই মত তব স্মৃতি,
মোরাও বুকেতে রাখি
স্মরি যেন জীবন-মরণ।
মহাদ্যুতি তুমি মাগো
জ্যোতির্ময় দেব সবিতার,
সংশয়-পরিখা হতে
ঊর্ধ্বে তুলি ধর
দূর কর সংশয়-বিকার।

শাশ্বত যে মন্দাকিনী,
ক্ষীর-ধারা মত
বহিতেছে অনন্ত প্রবাহে,
দুগ্ধসম শ্বেতশুভ্র অনন্ত বাহিতা!

তাহাই স্বরূপ তব,
ধ্যানগম্যা তুমি মাগো
বিশ্বের বন্দিতা!

করুণার সুধাস্রোতে নেমেছ ধরায়
শান্তিরূপা, প্রেমরূপা
তুমি আনন্দিতা।

ইষ্টের সহিত নিত্যযুক্তা তুমি
গভীর ধেয়ানে,
রামকৃষ্ণ হতে ভেদ
নাহিক তোমার,

এই কথা জানি মনে প্রাণে
লীন হতে চাহে দীন
অভয় তোমার ঐ
রাতুল চরণে।*

* 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকায় প্রকাশিত ডি পি লিংউড-বিরচিত "Hymn to the Holy Mother" কবিতা অবলম্বনে।

খৃষ্টীয় ধর্ম ও রাজশক্তি

সম্পাদক

মধ্যযুগের প্রারম্ভে ইউরোপের খৃষ্টপন্থী জনসাধারণের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল: 'সম্রাট কোথা হইতে তাঁহার শক্তি লাভ করিয়াছেন—স্বর্গ হইতে, অথবা প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে?' 'স্বর্গ হইতে ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে সরাসরি স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের নিকট হইতে, কিংবা তাঁহার মর্ত্য-প্রতিনিধি ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুরু পোপের মারফতে?' 'রাজা পোপের ভৃত্য, না পোপ রাজার কর্মচারী, অথবা স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয়েই প্রধান?' 'কেবল দেশশাসনই রাজধর্ম, কিংবা ধর্ম বা গির্জা-সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণও উহার অন্তর্গত?' সুদীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য দেশসমূহে খৃষ্টীয় ধর্মযাজক ও রাজপ্রতিনিধিগণের মধ্যে এই সকল প্রশ্ন লইয়া তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা চলে। কোন সময়ে শক্তিশালী ধর্মাধিনায়ক সম্রাটের উপর এবং কোন সময়ে শক্তিশালী সম্রাট প্রচলিত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন।

ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, মধ্যযুগে ফ্রান্স জার্মানী স্পেন ও ইতালির একচ্ছত্র সম্রাট চার্লস্ দি গ্রেট, সম্রাট প্রথম ওটো এবং সম্রাট তৃতীয় হেনরী আপনাদিগকে প্রজাসাধারণের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিষয়ের সর্বময় নিয়ামক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই শক্তিমান সম্রাটগণের রাজত্বকালে খৃষ্টধর্ম রাজনীতির একটি বিভাগরূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টধর্ম-যাজকগণ রাজকর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অন্যান্য রাজ-কর্মচারীদের ন্যায় রাজসরকার কর্তৃক নিযুক্ত এবং পরিচালিত হইতেন। এই সম্রাটগণ খৃষ্টধর্মকে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধীন রাখিয়া ইচ্ছামত পরিচালন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে,

ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ প্রথম নিকোলাস, পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট প্রভৃতি ইউরোপের খৃষ্টপন্থী রাজন্যবৃন্দের উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এই শক্তিশালী পোপগণ রাজশক্তিকে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা খৃষ্টান রাজন্যবৃন্দ ও সম্রাটগণের সামান্য পারিবারিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ ও আবশ্যক হইলে দূত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে ভৎর্সনা করিতেন এবং দণ্ডাদেশ দিতেন—এমন কি সিংহাসনচ্যুত করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে খৃষ্টীয় রাজশক্তি খৃষ্টধর্ম যাজকদের সম্পূর্ণ অধীন হইয়াছিল।

পাশ্চাত্যে সমশক্তিসম্পন্ন পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিরোধের ফলে বহুবার বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়। জনগণের অনেকে পোপের এবং অনেকে সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করায় সংঘর্ষ অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইউরোপের ইতিহাসে এইরূপ চারিটি তুমুল সংঘর্ষের বিবরণ দেখা যায়: (১) পোপ সপ্তম গ্রেগরী বনাম সম্রাট চতুর্থ হেনরী, (২) পোপ চতুর্থ হ্যাড্রিয়ান ও তৃতীয় আলেক্‌জেণ্ডার বনাম সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক, (৩) পোপ নবম গ্রেগরী ও চতুর্থ ইনোসেণ্ট বনাম সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, (৪) পোপ দ্বাবিংশ জন্ বনাম সম্রাট চতুর্থ লুই। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম-যাজকদের সহিত খৃষ্টীয় রাজশক্তির এই বৈপ্লবিক বিরোধ কয়েক শতাব্দী পূর্ণ বেগে চলিয়াছিল। এই সর্ববিধ্বংসী দ্বন্দ্বে বহু জনপদ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী নির্যাতিত ও হতাহত হইয়াছে।

কতিপয় পোপ ও সম্রাট তাঁহাদের বিরোধ আপসে মিটমাট করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। নির্যাতিত পোপগণ প্রতাপশালী সম্রাটগণের এবং উৎপীড়িত সম্রাটগণ শক্তিশালী পোপগণের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার আশায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ধর্মগুরু পোপ সকল নরনারীর ধর্মের অর্থাৎ আত্মার বা পারলৌকিক বিষয়সমূহের এবং রাষ্ট্রপতি সম্রাট সকল মানুষের সাংসারিক অর্থাৎ শারীরিক বা ঐহিক ব্যাপারগুলির নিয়ামক; স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয়েই প্রধান। এই আপস-নীতিমূলে সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক—পোপ তৃতীয় য়ুজেনিয়াস্‌কে লিখিয়াছিলেন, "ঈশ্বর বিশ্বমানবের শাসন-কার্য পরিচালনের জন্য পোপ ও সম্রাট এই দুই শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।" পক্ষান্তরে পোপ চতুর্থ হ্যাড্রিয়ান ঘোষণা করিয়াছিলেন, "পোপ ও সম্রাট উভয়েই ঈশ্বরের মনোনীত। ধর্মপ্রচারক পিটার বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরকে ভয় এবং রাজাকে সম্মান কর।' সুতরাং যাঁহারা বলেন, 'আমরা পোপের কৃপায় রাজমুকুট পাইয়াছি' তাঁহাদের কথা সাধু পিটারের উপদেশ-বিরোধী এবং এই জন্য তাঁহারা মিথ্যাবাদী।" মধ্যযুগে কোন কোন শক্তিহীন সম্রাট ও পোপ এইরূপ আপস-মনোবৃত্তি পোষণ করিলেও খৃষ্টীয় ৮০০—১৩০০ পর্যন্ত পাঁচ শত বৎসর সমগ্র ইউরোপে সম্রাটগণের উপর পোপগণের অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল। এই সময়ে পোপগণের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটগণ শাসন-কার্য পরিচালন করিয়াছেন।

ধর্মগুরু পোপের প্রাধান্য-প্রচারকারীদের মধ্যে চারি জন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন: ( ) সাধু বার্নার্ড (১০৯১—১১৫৩ খৃঃ) ঐহিক বিষয় অপেক্ষা পারত্রিক বিষয়ের উপর সকল নরনারীকে গুরুত্ব আরোপ করিতে বলেন। তিনি মানুষের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য (saving the souls of men) গির্জাকে সর্ববিধ ঐহিক বিষয় হইতে মুক্ত রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। (২) সলিসবারীর জন্ (১১১০—১১৮০ খৃঃ) তাঁহার

বিখ্যাত পলিক্র্যাটিকাস্ (Policraticus) গ্রন্থে মানব-সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিষয়বিরাগী ষ্টোয়িকদের (Stoics) ন্যায় কতকগুলি সার্বজনীন শাশ্বত আইনের উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, উহা ধর্মযাজক এবং সম্রাট উভয়েরই পালন করা উচিত। তাঁহার মতে যদি কোন সম্রাট ঐ আইন মান্য করিতে সম্মত না হন বা গির্জার উপর উৎপীড়ন করেন, তাহা হইলে সেই অত্যাচারীকে হত্যা করা সঙ্গত! (৩) সাধু টমাস্ য়্যাকুইনাস্ (১২২৭—১২৭৪ খৃঃ) বিশেষ জোরের সহিত সালিসবারীর জনের প্রচারিত অত্যাচারি-হননের (tyrannicide) প্রতিবাদ করেন। এই খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিতের মতে আইন শাশ্বত (eternal—যাহা দ্বারা পৃথিবী পরিচালিত), স্বর্গীয় বা দৈবী (divine), প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক (natural) এবং মানবীয় (human) এই চারি ভাগে বিভক্ত। তিনি প্রাকৃতিক আইনকে ঈশ্বরের অপ্রকাশিত আইন নামে অভিহিত করেন। (৪) এজিডিয়াস্ রোমানাস্ (১২৪৭—১৩১৬ খৃঃ) তাঁহার গুরু য়্যাকুইনাসের মতবাদ এরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন যে, উহাদ্বারা চতুর্দশ শতাব্দীর অনেক দার্শনিকও প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান যুক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পাশ্চাত্যের খৃষ্টপন্থী রাজন্যবৃন্দ ক্রমেই পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করিতে থাকেন। ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভে পোপ অষ্টম বোনিফেস্ খৃষ্টজগতে পোপের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত বিখ্যাত 'পবিত্র আদেশ' (Unam Sanctam) কার্যকর হয় নাই। এই সময় হইতে জনমতের চাপে ইউরোপের খৃষ্টপন্থী রাজন্যবৃন্দ ক্রমেই জাতীয়তাবাদদ্বারা প্রভাবিত হইতে আরম্ভ করেন। এই কালে পোপের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় রাজশক্তির পক্ষে খ্যাতনামা লেখক প্যারিসের জন্ পিটার ডুবইস্ এবং জন্ ওয়াইক্লিফ প্রভৃতির অভিমত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মধ্যযুগের প্রগতিশীল লেখকগণের মধ্যে পডোয়ার মারসিগ্‌লিও (খৃঃ ১২৭৮—১৩৪৩) সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পোপ ও সম্রাট উভয়ের ব্যক্তিগত প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, পোপ ও সম্রাট কেহই ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্ষমতা পান নাই, জনসাধারণই তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন। তাঁহার মতে অসামরিক রাষ্ট্রের আদর্শ শান্তিপ্রতিষ্ঠা। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই শান্তিরক্ষার জন্য প্রজাতান্ত্রিক শাসন অপেক্ষা রাজতান্ত্রিক শাসন ভাল। তবে রাজাদের কোন দৈবশক্তি বা রাহস্যিক ক্ষমতার বিদ্যমানতা তিনি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে সম্রাটদের সকল ক্ষমতা প্রজাসাধারণ হইতে প্রাপ্ত। কাজেই প্রজাপুঞ্জের অভিমত-অনুসারেই তাঁহারা ক্ষমতাপ্রয়োগ করিতে পারেন, স্বেচ্ছায় নহে। মারসিগলিও গির্জাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, কেবল ধর্মযাজকগণকে লইয়াই গির্জা নহে, সমগ্র খৃষ্টপন্থিগণকে লইয়াই গির্জা। কাজেই ধর্মযাজক বা পোপ গির্জার সর্বোচ্চ নিয়ামক হইতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে ধর্মযাজক বা পুরোহিত এবং সাধারণ খৃষ্টভক্ত নরনারীর সম্মতিক্রমে গঠিত 'সাধারণ সভা'ই গির্জার প্রকৃত মালিক। মারসিগলিও বলিয়াছেন যে, ধর্মযাজকগণের পক্ষে কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকা উচিত, তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা সঙ্গত নহে। পোপ খৃষ্টপন্থীদের 'সাধারণ সভা'র কেবল

এজেণ্ট-মাত্র, অন্য কোন খৃষ্টপন্থীর উপর তাঁহার প্রাধান্য থাকা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। রাষ্ট্রের সঙ্গে গীর্জার সম্বন্ধ-সম্বন্ধে মার্‌সিগ্‌লিও বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের শক্তিতেই উভয়ের শক্তি। গির্জা বা আধ্যাত্মিক শক্তি পরজগতের উপর প্রাধান্য দাবী করে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষয়িক রাষ্ট্রীয় বা ঐহিক শক্তির প্রভাব ইহজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মার্‌সিগ্‌লিওর সময় হইতে মেকিয়াভেলীর (খৃঃ ১৪৬৯—১৫২৭) পর্যন্ত ইউরোপের জাতীয় নবোত্থানের যুগ। এই সময়ে গণতন্ত্রের আবির্ভাবে পাশ্চাত্যের সকল দেশের সম্রাট-গণের ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিনষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের প্রভুত্বও ভক্তগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। প্রধান প্রধান দেশ-সমূহে আধুনিক গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্রের (Modern Democratic National State) অভ্যুদয়, যুদ্ধের অভিনব পদ্ধতি এবং বারুদ-আবিষ্কার, মুদ্রণপ্রক্রিয়া-উদ্ভাবন, আমেরিকা আবিষ্কার, বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান আবিষ্ক্রিয়া এবং ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধারণার মিথ্যাত্ব প্রতি-পাদন, কোপারনিকাস কর্তৃক বিশ্বের বিশালত্ব প্রতিপাদন প্রভৃতি সমগ্র ইউরোপের অন্ধকার-ময় মধ্যযুগের অবসান আনয়ন করে এবং ইঞ্জিন ইলেক্‌ট্রিসিটি ও মটর গাড়ীর বৈজ্ঞানিক সভ্যযুগ উহার স্থলাভিষিক্ত হয়। পাশ্চাত্য হইতে এই যুগও অন্তর্হিত হইতেছে, এখন সেখানে এরোপ্লেন ও আণবিক শক্তি ক্রমেই উহার স্থান অধিকার করিতেছে। বর্তমানে ইউরোপের প্রায় সকল দেশই গণ-তান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দিকে কমবেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং তথাকার খৃষ্টধর্ম এখন কার্যতঃ সমাজতান্ত্রিক খৃষ্টান রাষ্ট্রসমূহের বাহনে পরিণত হইয়াছে!

ইতিহাসপাঠে জানা যায়, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কোন সময়ে সম্রাট ধর্মসম্প্রদায়ের শক্তিকে এবং কোন সময়ে ধর্মসম্প্রদায়ের অধিনায়ক রাজশক্তিকে সম্পূর্ণ করতলগত করিয়া জনসাধারণের উপর আপন আপন প্রভাব-বিস্তারে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। অতীত কালেও ইহার ফল কোন দেশে উভয়ের পক্ষেই সকল দিক দিয়া কল্যাণকর হয় নাই এবং এখনও হইতেছে না। ইদানীং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম-সম্প্রদায়বিশেষের একচ্ছত্র প্রাধান্য-পরিচালিত রাষ্ট্রে (Theocratic State) অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য অধিকারসমূহ কার্যতঃ রক্ষিত হইতেছে না। এই জন্য এইরূপ রাষ্ট্রকে যথার্থ গণতান্ত্রিক বলা যায় না। পক্ষান্তরে সত্যের অনুরোধে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্মনিরপেক্ষ ঐহিক রাষ্ট্রে (Secular State) সংযমবিবর্জিত উচ্ছৃঙ্খল ভোগ এবং ইহার আনুষঙ্গিক কুফলস্বরূপ অধর্ম অসত্য অন্যায় দুর্নীতি ও গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাতন্ত্র বন্ধ করা সম্ভব হইতেছে না। এই সকল কারণে 'সর্বধর্মসমন্বয়' বা 'যত মত তত পথ' নীতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রমাত্রেরই ধর্মনীতি হওয়া যুক্তিযুক্ত। ইহাতে সকল ধর্মেরই সম্মানিত স্থান আছে, অথচ কোন সম্প্রদায়বিশেষের বা সাম্প্রদায়িকতার এবং কোন দুর্নীতির কোন স্থান নাই। এইজন্য ইহার তুল্য যথার্থ গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ধর্ম আর হইতে পারে না।

আমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান

স্বামী বোধানন্দ

(সমাপ্ত)

পূজনীয় নিরঞ্জন মহারাজ ও গিরিশ বাবু ছাড়া আমাদের দলে খোকা মহারাজ ছিলেন, কানাই এবং কালীকৃষ্ণও ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কার্য্যের সুবিধার জন্য গিরিশ বাবু এক পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন চাকর লইয়াছিলেন। ৮টা ৯টার সময় চা ও তৎসহ সামান্য কিছু খাওয়ার পর আমরা গিরিশ বাবুর বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া আধ ঘণ্টার পর হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। সেখান হইতে ট্রেন্ ধরিয়া প্রায় ১২টার সময় বর্দ্ধমানে পৌছানো গেল। এক চটিতে আশ্রয় লইয়া ভাত, মাছের ঝোল, ডাল, তরকারী ও দুধ যোগে মধ্যাহ্ন-ভোজন হইল। তখন গ্রীষ্মকাল, বৈকালে একটু নিদ্রার পর কেহ কেহ চা খাইলেন। গিরিশ বাবুর প্রত্যহ দুই বার চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। এক সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত পদ্ধতিমতে যে দ্রব্যে রোগের উৎপত্তি হয় তাহারই অল্পমাত্রায় ব্যবহারে সেই রোগের নিবৃত্তি হয়। "সমঃ সমম্ শময়তি"—অত্যন্ত গরম বলিয়া উহার নিবৃত্তির জন্য তিনি আমাদিগকেও চা খাইতে বলিতেন।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ৫ খানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া বর্দ্ধমান হইতে রওনা হওয়া গেল। একখানি গাড়ীতে নিরঞ্জন মহারাজ, একখানি গাড়ীতে গিরিশ বাবু ও বাকী তিন খানিতে আমরা ৬ জন চড়িলাম। বর্দ্ধমান হইতে এক হাঁড়ি লুচি ও তদুপযোগী আলুভাজা, হালুয়া ও মতিচুর পথে খাইবার জন্য সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। কামারপুকুরের রামলালদাদা প্রভৃতির জন্য ও জয়রামবাটীর জন্য ২।৩ হাঁড়ি ভাল মিষ্টান্ন আলাদা লওয়া হইয়াছিল। উহা নিরঞ্জন মহারাজের গাড়ীতে ছিল। বর্দ্ধমান হইতে দামোদর নদী ২।৩ মাইল দূরে। তখন উহা এক রকম শুষ্ক। দুই এক জায়গায় খুব সংকীর্ণ স্রোতজল ছিল। উহা বোধ হয় একহাত গভীর ও দুই তিন হাত চওড়া। কিন্তু ঐ জল অতি উপাদেয়। দামোদর পার হইয়া উহার তীরে বসিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত লুচি, আলুভাজা, হালুয়া ইত্যাদি যোগে সান্ধ্যভোজন করিলাম। রাত্রি যখন আন্দাজ ১০টা তখন আবার গাড়ীতে উঠিয়া গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করা গেল। দুই তিন ঘণ্টা যাইবার পর গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে গিরিশ বাবুর পেটটা ওলট পালট হওয়ায় ২।৩ বার তাঁহার পাতলা দাস্ত হইল। তখন আমরা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে। অতি সন্নিকৃষ্ট গ্রামটিও প্রায় ৪ মাইল দূরে। সকলেই মহা উদ্বিগ্ন হইলাম। নিরঞ্জন মহারাজের আদেশে তখনই গাড়ী হইতে গরু খুলিয়া গাড়ী থামান হইল এবং সকলেই কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। ঘণ্টাখানেকের ভিতর গিরিশ বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভোরের সময় তিনি নিজেই বলিলেন তাঁহার পেট ভাল আছে। তারপর

আবার গাড়ীতে গরু যোগ করিয়া তাহাতেই অগ্রসর হওয়া গেল। যদি গ্রামের সন্নিকট হইত ও পাল্কি পাওয়া যাইত, নিরঞ্জন মহারাজ গিরিশ বাবুর পাল্কিতে যাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

প্রাতে ৯৷১০ টার সময় আমরা উচালঙ্গ নামক গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে এক দীঘি আছে। সেখানকার এক চটিতে পূর্বদিনের মত ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, তরকারী ইত্যাদি রান্না হইল। আহারান্তে বিশ্রামাদির পর চা পান করিয়া আবার গাড়ীতে চড়া গেল। এই দিনও পূর্ব্বদিনের ন্যায় এক দোকান হইতে সান্ধ্য ভোজনের জন্য লুচি আলুভাজা হালুয়া ইত্যাদি করাইয়া লওয়া হইল। উচালঙ্গ বর্দ্ধমান হইতে প্রায় ১৬ মাইল এবং কামারপুকুর হইতেও ১৫৷১৬ মাইল হইবে। সমস্ত রাত্রি সেখানে যাইয়া পরদিন সকাল আন্দাজ ৯টার সময় আমরা কামারপুকুরে পাড়ি জমাইলাম। সেখানে পৌঁছিবার পরই গাড়োয়ানদের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রামলাল দাদা ও লক্ষ্মীদিদি তখন কামারপুকুরে ছিলেন। স্নানাদির পর রঘুবীরের দর্শন হইল। তারপর প্রসাদ পাইয়া বৈকালে ঘুমান হইল। সে রাত্রিটা আমরা কামারপুকুরেই কাটাইলাম। কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটী প্রায় ৪ মাইল, কিন্তু মেঠো পথ। গিরিশ বাবুর যাইবার জন্য একখানি পাল্কির বন্দোবস্ত হইল। আমরা সকলে হাঁটিয়াই যাইলাম। জিনিসপত্রগুলি মুটের দ্বারা লইয়া যাওয়া হইল। বেলা প্রায় ১০টা ১১টার সময় আমরা জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। গিরিশ বাবু তালপুকুরে স্নান করিয়া একটি আম হাতে লইয়া ভিজে কাপড়েই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া উঠানে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ঐ দৃশ্যটি আমার স্মৃতিপটে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

জয়রামবাটী অবস্থানকালে গিরিশ বাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। এক ঘরে শয়ন, একত্রে ভোজন, স্নান, ভ্রমণ ইত্যাদি হইত। তিনি নিরঞ্জন মহারাজ ছাড়া আমাদের সকলকে 'তুই' বলিয়া কথা কহিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এক মাইল দূরে ফাঁকা মাঠে যাইয়া কথাবার্তা হইত। গিরিশ বাবু তখন মদ খাইতেন না। কিন্তু প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় গাঁজা খাইতেন। তাঁহার খানসামা শিউপাল গাঁজা দলিয়া প্রস্তুত করিত। সন্ধ্যার সময় মাঠেই গাঁজা খাইতেন। গাঁজা টানিবার পর মনটা খুব খুলিয়া গেলে গান গাহিতেন। তিনি বিশেষ সুর করিয়া গান গাহিতে পারিতেন না। তবে তাঁহার ভক্তিযুক্ত গীত খুব মনোরম হইত। "চমকে চপলা চমকে প্রাণ চাহ মা চপলা-হাসিনী" ইত্যাদি ও "মদমত্তা মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়; তড়িতকুণ্ডল-জাল বিজড়িত পায় পায়" ইত্যাদি দুইটি গান তিনি গাহিয়াছিলেন আমার স্মরণ আছে।

আমরা এতগুলি লোক জয়রামবাটীতে থাকিবার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আমাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির বন্দোবস্তে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। সকাল হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম পাইতেন না। যদিও বামুন ও চাকর কাজকর্ম্মের সাহায্য করিত, তবু আরও এত কাজ ছিল যাহার জন্য তাঁহাকে অনেক ভাবিতে ও দেখিতে হইত। পাড়াগাঁয়ে সকালে দুধ পাওয়া সহজ নয়। আমাদের সকলের চা-র জন্য তিনি নিজে পাড়া হইতে দুধ আনিতেন। আমরা চা-র সঙ্গে মুড়ি ও সন্দেশ-যোগে প্রাতর্ভোজন করিতাম। স্নানান্তে আবার কিছু খাওয়া হইত। দুপুর বেলা দস্তরমত ৮৷১০টি তরকারী ও দুগ্ধ দধি মিষ্টান্ন-যোগে ভোজন হইত। বৈকালে চা ও কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। তারপর

রুটি লুচি ভাত নানাবিধ তরকারী, মোহনভোগ বা ক্ষীর যোগে সান্ধ্য ভোজন হইত।

গিরিশ বাবু সেখানকার চাষাভুষা লোকদের সঙ্গে তাহাদের গ্রাম্যভাষা অনুকরণ করিয়া সময়ে সময়ে কথা কহিতেন। তাহারা বোধ হয় উহা বুঝিতে পারিত না। একজনকে তিনি সঙ্গে আনিয়া থিয়েটারে গ্রাম্যভাষায় চাষার পার্ট অভিনয় করাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ থাকিবার পর খোকা মহারাজ, কানাই, কালীকৃষ্ণ ও আমি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলাম। নিরঞ্জন মহারাজ ও গিরিশ বাবু আরও কিছুদিন ছিলেন। রাঁধুনি বামুন এবং চাকরটীও উহাদের সঙ্গে রহিল। আমরা দুইখানি গরুর গাড়ী লইয়া ঘাটাল পর্য্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে ষ্টীমারযোগে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। আমাদের জয়রামবাটী অবস্থান-কালে কলিকাতা হইতে আমাদের দলের খেলাৎ ও শশী ২।৩ দিনের জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনার্থ সেখানে আসিয়াছিল।

সেখানে থাকিবার সময় সন্ধ্যাকালে দুই তিন বার আমি রুটি বেলিয়া দিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উহা সেকিতেন। তিনি অতি লজ্জাশীলা ছিলেন। কিন্তু আমাদিগকে নিজ সন্তানজ্ঞানে পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার স্নেহ অকৃত্রিম ও অমানব। উহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যে উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছে, সেই উহার মহিমা জানে। জয়রামবাটীতে যে কয়েক দিন ছিলাম সে কয়েক দিন যে মহা আনন্দে কাটিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণাকে লাভ করা তাঁহার অহেতুকী কৃপা ভিন্ন সম্ভব হয় না। ইহার পর আমি আরও দুইবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনার্থ জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বার ১৯০০ সালের মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে ও তৃতীয় বার ঐ বৎসরের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে। প্রথম-বার জয়রামবাটী যাইয়া দর্শন ও (তৃতীয়) শেষবার সেখানে যাইয়া দর্শনের মধ্যে ৭।৮ বৎসরের ভিতর বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগান-বাড়ীতে ও বাগবাজারে অনেকবার তাঁহার শ্রীচরণদর্শন লাভ হইয়াছিল।

সন্দেহ

স্বামী পরমানন্দ

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মনের দুরন্ত রোগ সন্দেহে যে জন
বাস করে পূতিগন্ধ তিমির গহ্বরে,
নারকীয় চিন্তা সেই করে গো সৃজন
দূর দূর কর সযত্নে তাহারে।

মনের স্বচ্ছতা সেই করে গো বিনাশ
আত্মার পুণ্যালোক করে নির্ব্বাপিত,
মায়াময় এ সংসারে ঘটে সর্ব্বনাশ
তাহারই নিক্ষিপ্ত জালে হইয়া পতিত।

এমন যে শত্রু তারে রাখ অতি দূরে
আত্মার কল্যাণ যদি চাও লভিবারে।

শ্রীশ্রীমা ও নারীশিক্ষা

শ্রীইলারাণী বসু

মেয়েদের জীবনে মায়ের প্রভাব যেমন সব চেয়ে বেশী এমন আর কারও নয়। মেয়েরা সাধারণতঃ মায়ের কাছে থেকেই সাংসারিক শিক্ষা লাভ করে। মা যদি ভাল ভাবে শিক্ষা দেন এবং নিজের জীবনের মধ্য দিয়া ঠিক পথ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে মেয়ের জীবন সার্থক হইয়া উঠে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মায়ের প্রভাব কেবল তাঁহার আপন কন্যার উপর, কিন্তু শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণী সারদা-দেবীর প্রভাব সমস্ত নারীসমাজের উপর। তিনি তাঁহার আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা এবং ছোট বড় সকল কার্য্যের মধ্য দিয়া নারীজীবন-গঠনের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন নারীচরিত্রের পূর্ণ চিত্র। তিনি কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা পরোক্ষ ভাবে সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ও আচরণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের ভিতর দিয়াই ভারতের তথা বিশ্বের নারী-সমাজ আপন পথের সন্ধান পাইবে। শ্রীশ্রীমা শুধু যে উপদেশই দিতেন তাহা নয় নিজে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার শিক্ষাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন। তিনি অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তাঁহাকে সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে তাঁহার চরিত্র অতি অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কার্য্যাবলী বলিতে বসিলে সহজে শেষ করা যায় না। তিনি মেয়েদের সর্ব্ববিষয়েই শিক্ষা দিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন। সেই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে পৃথক পৃথক ভাবে করাই ভাল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি মেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই আলোচনা করিব।

আজকাল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নানা কারণে মানুষের জীবন ক্রমেই জটিল ও সমস্যাময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে অনেক সময় মেয়েদের গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম ছাড়া বাহিরের কাজও করিতে হইতেছে। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক মেয়ে আজকাল লেখাপড়া বা কাজকর্ম্ম শিখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করিতেছেন। শ্রীশ্রীমার সময় এতখানি পরিবর্ত্তন না হইলেও মেয়েদের ভিতর অল্পবিস্তর জাগরণ দেখা দিয়াছিল। সাধারণ মানুষ সেই জাগরণের পরিপূর্ণ রূপ সঠিক বুঝিতে না পারিলেও শ্রীশ্রীমা দিব্যদৃষ্টি-বলে সকল কিছুই দেখিতে পাইতেন। মেয়েদের উচ্চ ভাব দান করা, উচ্চ আদর্শে তাহাদের জীবন গড়িয়া তোলা, মোটের উপর তাহাদের সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা-দানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীশ্রীমা জীবনে বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুযোগ পান নাই। ছেলেবেলা ছোট ভাইদের সঙ্গে তিনি কখনও কখনও পাঠশালায় যাইতেন এবং অল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পরে তিনি পাঠা-ভ্যাস বজায় রাখিলেও লেখার অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে লিখিতে কখন দেখা যায় নাই। প্রায়ই তাঁহাকে রামায়ণাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে দেখা যাইত। যাহা হউক, ভাইদের সহিত পাঠশালায় গিয়া তাঁহার

বিদ্যাচর্চ্চা করার আগ্রহ দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার নিজের উৎসাহেই তিনি পড়াশুনা করিতে গিয়াছিলেন। নিতান্ত বালিকা-বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরও তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সাধ মিটে নাই। কামারপুকুরে এবং পরে যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তখনও তাঁহার শিক্ষা-সাধনা চলিয়াছিল। এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া মা একবার তাঁহার এক সন্ন্যাসী সন্তানকে বলিয়াছিলেন, "কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম, ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে। বললে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনলুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত। ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একাটি একাটি আছি। ভব মুখুয্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাকপাতা, বাগান হতে যা আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।" এই পড়াশোনার ফলে মা রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন। স্বীয় যত্নেই মার লেখাপড়া শেখা হইয়াছিল। কেহ উৎসাহ তো দিতই না বরং হৃদয়ের কাছ হইতে বাধা পাইতেন। তথাপি তিনি গোপনে তাঁহার পাঠাভ্যাস বজায় রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর যখন শ্যামপুকুরে ছিলেন, মা তখন দক্ষিণেশ্বরে একলাটি থাকিতেন। সেই সময় তাঁহার অবসর ছিল প্রচুর, আর সেই অবসরসময় তিনি বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া কাটাইতেন। নিজস্ব অধ্যবসায় যথেষ্ট ছিল বলিয়াই তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি যে মেয়েদের লেখাপড়া ভালবাসিতেন তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে বহু কথার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র বিদ্বান মূর্খ সকল সন্তানদের তিনি সমান ভাবে দেখিলেও স্বাধীন সংযত জীবনযাপনে অভিলাষিণী বিদুষী মহিলারা তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। সাধুদের মধ্যেও শিক্ষিত সাধুদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "যেন হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান।"

শ্রীশ্রীমা তাঁহার দুইজন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের দিয়া বই পড়াইতেন এবং চিঠিপত্রাদি লিখাইতেন। তাঁহাদের পড়াশোনা তিনি যে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিতেন তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। একদিনের একটি ঘটনা হইতে ইহা বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাইবে—'বেলা হয়েছে, রাধু সামনের মিশনারী স্কুলে যাবে বলে খেয়ে দেয়ে কাপড় পরে প্রস্তুত, এমন সময় গোলাপ মা এসে মাকে বললেন, 'বড় হয়েছে মেয়ে, এখন আবার স্কুলে যাওয়া কি?' এই বলে রাধুকে যেতে নিষেধ করলেন। রাধু কাঁদতে লাগল।' মা বললেন, 'কি আর বড় হয়েছে, যাক না। লেখাপড়া শিল্প এসব শিখতে পারলে কত উপকার হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে—এসব জানলে নিজের এবং অন্যের কত উপকার করতে পারবে, কি বল মা?' পরে রাধু স্কুলে গেল।" মা রাধুকে স্কুলে যাইতে দিলেন শুধু তাহাকে অতিরিক্ত স্নেহ করিতেন বলিয়াই নহে, লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া অন্যের উপকার করিতে পারিবে এই চিন্তাও তাঁহার মনে ছিল। অর্থাৎ, পরোক্ষভাবে তিনি লেখাপড়া

শিখিবার এবং তদ্দ্বারা পরের উপকার করিবার শিক্ষা দিলেন। বিদ্যালাভ করিয়া তাহা আপনার মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া অন্যের মধ্যে বিতরণ করা এবং অপর মনুষ্যের অজ্ঞতা দূর করাই বিদ্যাশিক্ষার চরম সার্থকতা।

আমাদের দেশে অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, মা তাহার জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। একবার দুইটি মাদ্রাজী মেয়ের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "মাদ্রাজের দুটি মেয়ে—বিশ বাইশ বছর বয়স—বিবাহ হয় নি, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা, তারা সব কেমন কাজকর্ম্ম শিখেছে। আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোক আট বছর হতে না হতেই বলে—পর-গোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।' আহা, রাধুর যদি বিয়ে না হতো তা হলে কি এত দুঃখ-দুর্দ্দশা হতো?" যে সব মেয়েরা বিবাহ না করিয়া আত্মনির্ভরশীল ও সংযত জীবন যাপন করিতে চাহিতেন, মা তাঁহাদের সমর্থন করিতেন। বালবিধবা, স্বামি-পরিত্যক্তা বা ব্রহ্মচারিণী কুমারী মেয়েরা যাহাতে ভগবানকে অবলম্বন করিয়া লেখাপড়া ও কাজকর্ম্ম শিখিয়া মানুষ হইতে পারে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। বিবাহ না হইলে নারীর জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় না। একবার একজন স্ত্রীভক্ত তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার পাঁচটি কন্যা, অথচ তাহাদের বিবাহ দিতে পারিতেছেন না; সেইজন্য বড় ভাবনায় আছেন। মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবে-দিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।" তাঁহার এক অল্পবয়স্কা বিধবা সন্তানকে মা বলিয়াছিলেন, "জগতে তোমাদের করবার অনেক কাজ আছে। তিনিই তোমাদের শান্তি দেবেন, আনন্দ দেবেন। তোমাদের দ্বারা তিনি অনেক কাজ করাবেন। কোন ভয় নেই মা, কোন ভাবনা নেই মা।"

বিদেশিনী নিবেদিতা যখন এখানে মেয়েদের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, মা তখন তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহদান ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন এবং মা সর্ব্বদাই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। নিবেদিতা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে মা একবার সেখানে গিয়াছিলেন। মেয়েদের কাজকর্ম্মাদি দেখিয়া ও তাহাদের গান শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 'উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে' আসিলে তিনি তাহাদের উৎসাহ দিতেন, নানা উপদেশ দিতেন এবং পড়াশোনার সংবাদ লইতেন। সুধীরাদিকেও মা বিশেষ ভালবাসিতেন। তাঁহার কার্য্যের, পরিশ্রমের এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বাধীন সংযত জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" ২য় খণ্ডের একস্থানে আছে ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর সুধীরাদির খুব অসুখ হওয়ায় মার বিশেষ ভাবনা হইল। তখন ঠাকুরকে বলিলেন, "ও ঠাকুর, সুধীরা যাবে কি? তার যে কত কাজ বাকী"— আর চোখের জল ফেলিতেন। সুধীরাদি সুস্থ হইয়া মার নিকট যাইলে মা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল। যা হোক, ঠাকুরের কৃপায় সেরেছ, মা। এই নিবেদিতাটি গেল, আবার তোমার অসুখ—শুনে ভাবি, সুধীরা গেলে স্কুল চালাবে কে?" পরে অন্যান্য কথার পর মা সিষ্টার ক্রিশ্চিনকে স্কুলের বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুধীরাদির কথা-প্রসঙ্গে মা একবার তাঁহার এক মন্ত্রশিষ্যাকে বলিয়াছিলেন, "ঐ এক মেয়ে। বে করলে না। কেমন নিজের জোরের উপর রয়েছে, গাড়ী চড়ে বেড়াচ্ছে।"

চিরস্মরণীয়া গৌরীমা তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই হয় আমাদের দেশের নারীজাতির উন্নতি-কল্পে ব্যয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার এই প্রিয় শিষ্যাকে মেয়েদের দুরবস্থা ও কষ্ট দূর করিবার জন্য আদেশ দেন। পরে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া মেয়েদের দুঃখদুর্গতি স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল এবং তিনি গুরুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কি করিয়া মেয়েদের লেখাপড়া শিখান যায়, কি করিয়া তাহাদের যথার্থ মানুষ করা যায় এবং কি করিয়া তাহারা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য; বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ও অনেক পরিশ্রম করিয়া তিনি মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে গৌরীমা যে শ্রীশ্রীমার কাছ হইতে প্রেরণা ও উৎ-সাহ পাইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মার আশীর্ব্বাদ লইয়া ব্যারাকপুরে প্রথম 'সারদেশ্বরী' আশ্রমের কাজ আরম্ভ করা হয়। তাহার পর কলিকাতায় এই প্রতিষ্ঠান উঠিয়া আসে। আশ্রম বালিকাদের মুখে স্তবসঙ্গীতাদি শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। এখানকার ছাত্রীরাও তাঁহার নিকট হইতে আশার বাণী শুনিতে। গৌরদাসী (গৌরীমা) সম্বন্ধে শ্রীশ্রীসারদা-দেবী খুব উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে মা একবার বলিয়াছিলেন, "যে বড় হয় সে একটাই হয়।" শ্রীশ্রীমা রামেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিলে একটি স্ত্রীভক্ত যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কি দেখে এলেন বলুন?" মা বলিলেন, "অনেক লোক আমাকে দেখতে এসেছিল। সেখানকার মেয়েরা খুব লেখাপড়া জানে; আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে। আমি বল্লুম, আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।"

কোয়ালপাড়ায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "এদেশের মেয়েরা সব পশুর মতন দেখছি। আমার এক এক সময় ইচ্ছা হয় এদের শেখাবার ব্যবস্থা করি; কিন্তু করি কি করে? শেখাবার লোক আনতে গেলে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে আনতে হয়; তাতে হিতে বিপরীত ফল হবে। মানুষের স্বভাব এই যে, তারা মন্দটা আগে শেখে। তাদের অনেক সদ্‌গুণ আছে, সে সব নিতে পারবে না, বাবুয়ানাটি আগে নেবে। আহা, এদেশের মেয়েরা যদি সেরকম শিক্ষিতা হয়!" শুধু লেখাপড়া নয়, সূচীশিল্পাদি যে কোন কাজ মা দেখিতেন, সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং প্রশংসা করিতেন। যে সব মেয়েরা সংযত ও সদ্ভাবে থাকিয়া জীবন কাটাইতে চাহিতেন, মা তাঁহাদের লেখাপড়া ও কাজকর্ম্মাদি শিখিয়া স্বাবলম্বিনী হইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ জীবন-যাপনের উপদেশ দিতেন। তদ্ব্যতীত যে সব বালিকাদের অভিভাবকগণ তাহাদের বিবাহ দিতে পারেন নাই, সেই রকম কুমারী মেয়েদের, বালবিধবাদের এবং স্বামি-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে মা ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়া কোন মেয়েকে অবিবাহিতা রাখার বিরুদ্ধে ছিলেন। ইহার মন্দ পরিণামের কথা উল্লেখ করিয়া কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। স্থানকালপাত্র ভেদে সব জিনিষের বিচার করা উচিত। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই কোন কোন ভক্তকে মা অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ দিবার উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীশ্রীমার বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর এক-দিন গোলাপমাকে বলিয়াছিলেন, "ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" একবার মাকে

অলঙ্কার গড়াইয়া দিবার সময় ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "ওরে, ওর নাম সারদা—ও সরস্বতী; তাই সাজতে ভালবাসে।" স্বামী বিবেকানন্দও মার সম্বন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামীজি মাতাঠাকুরাণীকে কেন্দ্র করিয়া একটি মেয়েদের মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষিতা ও ব্রহ্মচারিণী মেয়ে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা করেন। শ্রীশ্রীমার স্থূল দেহ সংবরণের পর ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই মেয়েদের ভিতর জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল বিশ বৎসরের ঘটনাবলী আলোচনা করিলেই আমাদের নারীসমাজের প্রচুর পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তখনকার দিনে মেয়েদের পক্ষে যাহা অসম্ভব ছিল বা মেয়েদের নিকট যাহা দুর্লভ ছিল এখন মেয়েরা সেই সকল কার্য্য করিবার শিক্ষা লাভ করিয়াছে। নারী তাহার মনের অন্ধকার ঘুচাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া যে চাকুরী করিতে হইবে বা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। বিদ্যালাভ করিয়া নিজের অজ্ঞতা দূর করা, অপরের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালান এবং পরের উপকার করাই শিক্ষার চরম সার্থকতা। জ্ঞানলাভ না হইলে মতৃজাতির উন্নতি এবং জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারে না। বর্ত্তমানে মেয়েদের অনেকেরই বিদ্যার্জ্জনের আগ্রহ এবং চেষ্টা দেখা যায়। এই ব্যাপারে মেয়েরা নিজেরাই যদি অগ্রসর হন এবং আপন সমাজের মধ্যে জ্ঞান-বিতরণে সাহায্য করেন তবেই নারীজাতির সুদিন আসিবে। প্রথম প্রথম বাধা-বিঘ্ন আসিলেও সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। শ্রীশ্রীমা নিজে অসুবিধা সহ্য করিয়া এবং স্বীয় ঐকান্তিক যত্নে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পরে তিনি যে শুধু ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন বা করাইতেন তাহা নয়, তিনি সংবাদপত্র-পাঠ শ্রবণ করিতেন এবং দেশের তথা বিশ্বের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তিনি মেয়েদের বিদ্যালাভের এবং সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে বলিতেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে আমাদের দেশের মেয়েরা রীতিমত শিক্ষিতা হইয়া উঠুক। লেখাপড়া অর্থে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়া বা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে জীবনাদর্শ গড়িয়া তোলা নহে, সকল রকম জ্ঞানার্জ্জনের কথাই মা বলিতেন। মানবজীবনে জ্ঞানলাভই চরম সার্থকতা, সুতরাং নারীসমাজের সকল প্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীশ্রীমার আশীর্ব্বাণীতে এবং উৎসাহপূর্ণ কথায় ও কার্যে জ্ঞানলাভের পথ সুগম হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে সকলের সমবেত চেষ্টায় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক ইহাই প্রার্থনা।

"মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়েমানুষ জেগে উঠবেন এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জয়ের স্বরূপ

শ্রীউমারাণী দেবী

ভাঙ্গি' রুদ্ধদ্বার
প্রচ্ছন্ন কুয়াসা ভেদি'
প্রকট প্রকাশে
কে গো তুমি দেখা দিলে
জাগ্রত জয়ের রূপে
চির জ্যোতির্ময় !

'আছি, আমি আছি' বলে
বিকাশিয়া অসীম সত্তায়,
প্রসন্ন প্রদীপ্ত রূপে
প্রমত্ত প্রভায়,
মেলি' শত বীর্যবাহু
প্রগাঢ় উল্লাসে,
দুর্জয় ঝঞ্ঝার সম
দাঁড়াইলে সৌম্য দরশনে ?
আহা মরি একি স্পর্শে মোর
দারুণ টঙ্কারে মোর
হৃদিতন্ত্রী পরে আজি
টানিলে গো বিষম ঝঙ্কার !
সুরে সুরে সহস্র কম্পনে তার
বিরাট মূর্চ্ছনা,
মগ্ন করি' দিল মোর
জীবন জগৎ।

অসীম আকাশ-তলে
এ বিশ্ব নিখিল,
স্পন্দিত কম্পিত হোল
আকুল উল্লাসে।

স্পর্শে তার
অন্তরের আনন্দ উজান
খেলে গেল বিজলী লেখায়,
স্থূলে সূক্ষ্মে পরমাণু
অণুতে অণুতে,
ব্যাপিয়া এ বিশ্বচরাচর
বিরাট নিখিল বক্ষ
করিয়া বিভোর।

কে পারে বাঁধিতে মোরে
কে পারে রোধিতে আজি
অনন্তে এ দীপ্ত অভিযান ?
মরমের বন্দী 'আমি'।
মুক্তি মাগে মুক্ত 'আমি' মাঝে
নাহি জানি ভাল মন্দ
সত্য মিথ্যা কিবা ভুল ঠিক ;
শুধু জানি তুমি আছ,
তুমি আছ হে প্রিয় আমার,
অন্তরে বাহিরে ঐ
জলে স্থলে আকাশে বাতাসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে মোর
প্রতিটি স্পন্দনে
স্পন্দিত যে তুমি প্রিয়
পরম সোহাগে।
স্নিগ্ধ মুগ্ধ হাসিখানি
মগ্ন করি' গভীর নেশায়।
এসো এসো হে অনিন্দ্য,
লহ মোর স্তব্ধ নিবেদন।

এমনি জাগিয়া ওঠো,
ভরে 'ওঠো বক্ষ জুড়ি'
ব্যাকুল প্রবাহে।
সকল ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা আর
জড়তা জঞ্জাল,
ঘুচে যাক, মুছে যাক,
ধুয়ে যাক যত কিছু
লজ্জা ঘৃণা ভয়!
হীনতা দীনতা নয়
শুধু জয়, তোলো জয়
জাগ্রত ঝঙ্কার
জয় প্রভু প্রিয় হে তোমার।

পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচার

(৫)

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ফরাশগঞ্জ-অঞ্চলস্থিত সান্ধ্য অধিবেশনের স্থান 'গৌরাবাস' ভবনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি স্থাপিত ছিল। প্রতিকৃতিখানি ঐ অঞ্চলের ভূম্যধিকারিণী ভক্তিমতী লক্ষ্মীমণি দাসী কর্তৃক প্রদত্ত পুষ্পমাল্যে প্রতি শনিবার নিয়মিতরূপে সুসজ্জিত হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ 'গৌরাবাস' ভবনে শুভাগমন করিবেন এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় পূর্ব হইতেই বহু ভক্ত নরনারী, ছাত্র ও স্থানীয় মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ অধিবেশন-স্থানে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিখানি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহার আসন-গ্রহণের পর সম্মেলনের প্রারম্ভে যথারীতি 'রামকৃষ্ণ-চরণসরোজে মজরে মনমধুপ মোর' নামক ভজন-সঙ্গীতটি গীত হইল। ভজন-সঙ্গীতের পর সমবেত আগ্রহশীল ভক্তগণ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশে সম্মেলনের প্রচলিত রীতি অনুসারে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ হইতে লাগিল। একস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্ন্যাস-জীবনের কঠোর নিয়ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ। স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না।" উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে জনৈক ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ মহারাজকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আমাদের তো নানা কাজকর্ম উপলক্ষে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়। আমাদের পক্ষে তা হ'লে ঠাকুরের উপদেশ ঠিক ঠিক পালন করা কি সম্ভবপর হয়?" মহাপুরুষ মহারাজ কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, বাড়ীতে যখন ছিলে তখন মা-বোন ছিল তো? মা-বোনদের সঙ্গে যেমন সরল-প্রাণে মেলামেশা করতে, ঠিক সেইরকম মন নিয়ে এখন স্ত্রীলোকদের সঙ্গে প্রয়োজনমত কথাবার্তা বলবে। মনে মনে ভাববে যে তারা

তোমার মা-বোন। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কি ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গেও কথা-বার্তা না বলাই ভাল—বিশেষ করে আলাদা ভাবে। পাঁচ জনের সামনে কাজকর্মের কথা বলতে পার। তোমরা সাধু হতে এসেছ, নিজের ভাব বজায় রেখে, নিজ আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্বদা চলবে। নারীজাতিকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর অংশ জ্ঞান করবে। এই হ'ল সাধনা।" ব্রহ্মচারী তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, তাতেও যদি মনে কুভাব আসে তো কি করব?" মহাপুরুষ মহারাজ উচ্চস্বরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "যেখানে সেখানে মেয়েমানুষ দেখলে যাদের মনে কুভাবের উদয় হয়, তারা সাধু হবার তো উপযুক্ত নয়-ই, এমন কি লোকসমাজে থাকারও উপযুক্ত হয় নি। তাদের উচিত এমন কোন নিভৃত স্থানে চলে যাওয়া যেখানে স্ত্রীলোকের মুখপর্যন্ত দেখতে পাবে না—স্ত্রীলোকের কোন সংস্রব নেই; সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর ভাবে জীবন-যাপন করে মনের ঐ সকল পাশব প্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তবে লোকসমাজে আসা উচিত। সমাজেরও একটা নিয়ম আছে, একটা শৃঙ্খলা আছে।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-পাঠ শেষ হইলে জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, ভগবানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় কি?" মহাপুরুষ মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "শাস্ত্রে তো ভগবান-লাভের উপায় সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ রয়েছে, কিন্তু শেষ কথা হ'ল শরণাগতি—শরণাগতি। শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করে সর্বতো-ভাবে তাঁহার শরণাগত হ'য়ে পড়ে থাকতে পারলে আর কোন ভয়-ভাবনা নেই। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, যোগ ইত্যাদি সব উপদেশ দিয়ে শেষটায় বলছেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' এই হ'ল সমগ্র গীতার সার। ভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, ধর্ম-অধর্ম সব পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ লও, তা হ'লে আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব।' তবে ভগবানে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি এক দিনে আসে না। এ বড় কঠিন ব্যাপার। যত পূজা, পাঠ জপ, ধ্যান, কঠোর সাধনা—সবই একমাত্র শরণাগতি আনার জন্য। সর্বোপরি চাই ভগবৎ-কৃপা। অনন্যমনে তাঁর ধ্যান, চিন্তা ও প্রার্থনা করতে করতে তিনি কৃপা করে সেই দুর্লভ শরণাগতি দেন।"

অধিবেশন শেষ হইলে উপস্থিত ভক্ত নর-নারীগণের মধ্যে ফলমিষ্টি-প্রসাদ বিতরিত হইল। মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত হইলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের শুভাগমনের পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ফরাশগঞ্জ অঞ্চলের অধিবাসিগণ এখনও আনন্দ অনুভব করিতেছেন। 'গৌরাবাস' ভবনের অধিবেশন-স্থানটি বহু সাধু-সন্ন্যাসি-মহাত্মার শুভ পদার্পণে এবং ধর্মপ্রসঙ্গাদির আলোচনায় তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। গৃহস্বামীর নিজ প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় অনেক বৎসর পর 'গৌরাবাস' ভবনের এই সুন্দর হলটি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ ছাড়িয়া দেন এবং ঐ অঞ্চলের অন্যতম ব্যবসায়ী ভক্ত শ্রীসুরথলাল দাসের বুড়ীগঙ্গাতীরস্থ বাটীর একাংশে সাপ্তাহিক ধর্মসভার অধিবেশন পরিচালনা করিতে থাকেন।

স্বামী শিবানন্দ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের জনৈক কর্মীকে একদিন উপদেশচ্ছলে বলিয়া-ছিলেন, "দেখ, শাস্ত্রপাঠ আলোচনা ভজন ইত্যাদি সবই ঠিক জপধ্যানের মত সাধনজ্ঞানে

করবে। আর এই ভাবটি সর্বক্ষণ মনে জাগরূক রাখবে যে তুমি তাঁরই কাজ করছ। তাঁর সেবাজ্ঞানে কাজ করলে তোমার পরম কল্যাণ হবে। বাহিরে শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা ইত্যাদি করে এসে যখনই সময় পাবে তখনই নিয়মিত জপ-ধ্যান করতে বসবে—এমন কি শোবার পূর্বেও নিয়মিত জপ করা চাই-ই।" অন্য একদিন জনৈক ভক্ত মহাপুরুষ মহারাজকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর বলতেন যে বাসনার লেশমাত্র থাকলেও ভগবানলাভ হয় না—যেমন সুতোয় একটু ফেঁসো থাকলে তা ছুঁচের ভেতর ঢোকে না। কিন্তু আমাদের মনে তো অসংখ্য কামনা-বাসনা রয়েছে। আমাদের উপায় কি?" মহাপুরুষ মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "উপায় আছে। চিত্তরূপ সুতোয় ভক্তিবিশ্বাস-রূপ তেল-জল মেখে কামনা-বাসনারূপ ফেঁসো-গুলো বেশ করে রগড়ে নিলেই চিত্ত অনায়াসে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মগ্ন হবে। খুব ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক—তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রাণের আর্তি জানাও। তিনি বড় আশ্রিত-বৎসল—শরণাগতকে কখনও ত্যাগ করেন না।"

স্বামী শিবানন্দ তদীয় গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ সহ ভক্তগণের একান্ত অনুরোধ ও আগ্রহে ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের শুভাগমন-বার্তা চারি-দিকে প্রচারিত হইবার ফলে বহু দূরবর্তী স্থান হইতে ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের পুণ্য-দর্শন ও সঙ্গলাভ করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন-কার্য সম্পন্ন করেন এবং সমবেত জিজ্ঞাসু নরনারীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবেদ ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ এক জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা কীর্তন করেন এবং দুইদিন পরেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ আরও কয়েক দিন ময়মনসিংহে অবস্থান করিয়া ধর্মোপদেশ-প্রদানে ভক্তগণের আনন্দবিধান করেন এবং পুনঃ ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে বেলুড় মঠ হইতে প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের কঠিন অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বামী শিবানন্দ অত্যন্ত বিচলিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। একদিন রাত্রে ধ্যানান্তে তিনি বলিলেন, "মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কঠিন অসুখ। আমি আর এখানে থাকব না—কালই কলকাতায় যাব। সব ব্যবস্থা কর।" ঢাকায় আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল—একটানা ভগবৎ-প্রসঙ্গের প্রবাহ থামিয়া গেল, ভক্তগণ মহাপুরুষের দিব্যসঙ্গলাভের বিমল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন। স্বামী শিবানন্দ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অবিলম্বে গুরু-ভ্রাতার রোগশয্যাপার্শ্বে উপনীত হইলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "শিবানন্দ দাদা, এসেছ?" মহাপুরুষ রোরুদ্যমান কণ্ঠে আবেগভরে বলিলেন, "মহারাজ, তুমি চলে গেলে আমরা কি করে থাকব? তুমি ইচ্ছা করলেই সেরে যাবে।"

স্বামী অভেদানন্দ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরের নানাস্থানে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকা লক্ষ্মীবাজারস্থিত রাজাবাবুর বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় একটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে 'গির্জার পৌরোহিত্য ও খৃষ্টধর্ম' (Churchianity and Christianity) সম্বন্ধে একটি, শহরের অন্যত্র আরও দুইটি এবং নারায়ণগঞ্জে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বক্তৃতাগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির নব জাগরণ এবং দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দ একাধিকবার পূর্ববঙ্গের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁ, বালিয়াটী, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে গিয়া ধর্মপ্রচার করেন এবং বহু নরনারীকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। তাঁহার জীবনযাত্রা, কথাবার্তা, উপদেশ—সবই ছিল সরল, সহজ ও অনাড়ম্বর। উপদেশগুলি ভক্তগণের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করিত। জিজ্ঞাসু ভক্তদের সহিত তিনি এরূপ সরলভাবে মিশিতেন যে, তাহারা নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, জ্বালাতন ও দুর্বলতার কথা খুলিয়া বলিতেন এবং তিনিও প্রকৃত ধর্মগুরুর ন্যায় তাহাদের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি ও করুণা প্রদর্শন করিয়া সাধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে ও সনির্বন্ধ আহ্বানে তিনি অনেক সময় তাহাদের গৃহে যাইয়া আনন্দোৎসব ও উপদেশপ্রদান করিতেন। একদিন ঢাকায় স্বামী সুবোধানন্দ বর্তমান লেখক সহ একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া জনৈক ভক্তের গৃহে যাইতেছিলেন। লেখক গাড়ীতে অতি সন্তর্পণে ও সঙ্কুচিতভাবে মহারাজের বিপরীত দিকে বসিয়াছিল। লেখকের অত্যধিক সতর্কতা ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বলিলেন, "সে কি! তুমি এত সঙ্কুচিতভাবে বসেছ কেন? ঠিক হয়ে বস। আমি কি একটা কেষ্ট-বিষ্টু রয়েছি? তুমি নিজকে এত ছোট মনে করছ কেন? আমার গায় লাগলে কিছু হবে না—ভয় নেই।" এইরূপ সরলতা ও ব্যবধানবুদ্ধি-রহিত মনোভাব হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, স্বামী সুবোধানন্দ প্রকৃতপক্ষেই 'খোকা' মহারাজ ছিলেন। গুরুভ্রাতা বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অল্প বয়স ও বালকসুলভ সরলতা দেখিয়াই তাঁহাকে আদর করিয়া 'খোকা' নামে ডাকিতেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতারাও তাঁহার অপূর্ব সারল্য ও অনাড়ম্বর জীবন দেখিয়া তাঁহাকে 'খোকা মহারাজ' ডাকিতেন। অনেক সময় স্বামী বিবেকানন্দ অত্যধিক গাম্ভীর্য অবলম্বন করিলে এই 'খোকা' মহারাজই তাঁহার নিকট নির্ভয়ে গিয়া তাঁহার গাম্ভীর্য ভঙ্গ করিতেন। প্রকৃত-পক্ষে তিনি নামেও যেমন খোকা, কাজেও তেমনি খোকা ছিলেন—তাঁহাকে দেখিলে এই ধারণা সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইত। মহাপুরুষগণের চরিত্রে একাধারে অনাড়ম্বর বালকোচিত সারল্য ও ঋষির প্রজ্ঞা বিদ্যমান থাকে বলিয়াই যীশুখ্রীষ্ট উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন: "Except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven." অর্থাৎ, যদি তোমরা দীক্ষিত না হও এবং ছোট শিশুদের মত সরল না হও, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

স্বামী সুবোধানন্দ ১৯২৪ সনের ৭ই মে, ২৪শে বৈশাখ, শুভ অক্ষয়তৃতীয়া দিবস ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুরমন্দির 'প্রেমানন্দ-স্মৃতি'র প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের আদেশে খোকা মহারাজ এই শুভ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সোনারগাঁ যান। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ হইতে বহু ভক্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পূর্ববঙ্গের ঢাকীদের বাজনা এবং পার্শ্ববর্তী বহু গ্রাম হইতে সমবেত সাধারণশ্রেণীর লোকদের খোল-করতাল সহ সুমধুর সংকীর্তন শুনিয়া খোকা মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হন। ছিন্ন-মলিনবস্ত্রপরিহিত শত শত দরিদ্র শ্রমজীবী নরনারী ও বালকবালিকা দেখিয়া তিনি সানন্দে ঘরের বাহিরে আসেন এবং সকলের ভক্তিপূর্ণ

প্রণাম গ্রহণ করেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা-দিবসে স্বামী সুবোধানন্দ অনেক ধর্মার্থীকে মন্ত্রদীক্ষা এবং বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের অনুমতিক্রমে তিনজন সাধু-কর্মীকেও ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা প্রদান করেন। উৎসব উপলক্ষে নানা স্থানের সহস্র সহস্র লোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ খোকা মহারাজকে আশ্রম হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মপুত্রনদের তীর হইতে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বাদ্য, সংকীর্তন ও শোভাযাত্রা সহযোগে লইয়া আসিয়াছিলেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর তিনি তথায় প্রায় ১০।১২ দিন অবস্থান করিয়া তদঞ্চলের বহু নরনারীর হৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপিত করেন। সেই বৎসরের শেষভাগে স্বামী সুবোধানন্দ পুনঃ সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে আসিয়া মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। এবার ভক্ত নরনারীগণ কর্তৃক আহূত হইয়া তিনি নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামেও শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সনেও স্বামী সুবোধানন্দ ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গে যান এবং সোনারগাঁ আশ্রমে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করেন। তাঁহার সরল উপদেশে সকলেই উপকৃত হইত। তিনি বলিতেন, "ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা কর, তবেই হবে। আন্তরিক প্রার্থনা কাকে বলে—না, কাঁদাকাটা করে তাঁর নিকট নিজের ব্যথা জানান। ভক্তি-বিশ্বাস-প্রেম কেন লাভ হবে না? তুই ঠাকুরের লীলা-সঙ্গীর সঙ্গী—সর্বদা মনে জোর রাখবি।" কেহ হয়ত কামজয়ের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, তদুত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "পূবদিকে গেলে পশ্চিম দিক পেছনে পড়ে থাকে, সুতরাং কামভাব উঠল কি গেল সেদিকে কোন নজর না দিয়ে ভগবানের পথে চলে যা। কিছুদিন পরে দেখবি কাম কোথা দিয়ে চলে গেছে, টেরও পাস নি। মহামায়ার ইচ্ছা না হলে কিছু হবার উপায় নেই। মহামায়া যাকে যখন যে ভাবে রাখেন সেই ভাবেই থাকতে হবে। তিনি যখন কৃপা করে আমাদের দোষ ছাড়িয়ে দেবেন, তখনই গেল।" পূর্ববঙ্গ হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ভক্তদের নিকট একদিন বলিলেন, "সোনারগাঁ মঠে স্বামীজির জন্মতিথির দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখি স্বামীজি আসিয়া উপস্থিত। তাঁর কপালে বড় বড় চন্দনের ফোঁটা; ফোঁটাগুলি কে দিল জিজ্ঞাসা করাতে স্বামীজি উত্তর দিয়াছিলেন—'মাদ্রাজের সব ভক্তেরা দিয়েছে'।" শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-প্রচারের জন্য তিনি নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী প্রাচীন বঙ্গের এই উন্নতিশীল বাণিজ্যিক বন্দর সোনারগাঁয় তিনবার গমন করেন।

স্বামী সুবোধানন্দ ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রমে ১৯২৪ ও ১৯২৫ সনে দুইবার ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে গমন করেন। প্রথমবার তিনি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন-কার্য সম্পন্ন করেন এবং কতিপয় দিবস তথায় অবস্থান করিয়া ধর্মার্থী নরনারীগণকে দীক্ষা ও ধর্মোপদেশ-দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারও তিনি আশ্রমে অবস্থান করিয়া অনেক ধর্মপিপাসু নরনারীকে দীক্ষা ও ধর্মোপদেশ দেন। একদিন আশ্রমপ্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সর্বধর্ম-সমন্বয়' সম্বন্ধে তিনি দশ মিনিট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যারতির পর তাঁহার ঘরে স্থানীয় ভদ্রলোকগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, স্বকীয় সাধনকালের প্রসঙ্গ, সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরলাভের উপায় সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। নিজ জীবন সম্বন্ধে প্রশ্নগুলি তিনি প্রায়ই এড়াইয়া যাইতেন

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা উঠিলেই প্রোৎসাহিত হইতেন। ঈশ্বরলাভের উপায় সম্বন্ধে প্রায়ই বলিতেন, "ভগবানের কৃপা ছাড়া আর কোন উপায় নেই; সুতরাং তাঁর নাম করা, তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা—এ সব করতে হবে।" বালকগণকে তিনি খুব ভালবাসিতেন, তাহাদিগকে দেখিলেই নিকটে ডাকিয়া ধর্মজীবন-গঠনের কথা, ঈশ্বরীয় কথা বলিতেন। স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর একটি ছাত্রকে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিকটে ডাকিয়া আনিয়া দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "আমি যা দিয়েছি তা-ই তোর মন্ত্র; আর গুরু করবি নি, আমিই তোর গুরু। যে মন্ত্র দিয়েছি, তা-ই সকাল-সন্ধ্যায় একটু একটু জপ করবি। জপ করে তারপর পড়তে বসবি। আর দেখ, এই মন্ত্র কারুর কাছে বলবি নি, বললে কিন্তু ফল হবে না।" উক্ত বিদ্যালয়ের আর একটি সেবাপরায়ণ ও ধর্মভাবাপন্ন বালকের খোকা মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তখন সময় ছিল না। তাই যে দিন স্বামী সুবোধানন্দ বালিয়াটী গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন সে দিন বালকটি তাঁহার পালকির সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত দৌড়াইয়া গিয়াছিল। শুষ্কমুখ আগ্রহশীল বালকটিকে এইরূপে পালকির পিছনে পিছনে দৌড়াইতে দেখিয়া খোকা মহারাজের দয়া হইল। তিনি পালকি থামাইয়া বালকটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই সে পায়ের উপর পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন মহাপুরুষ সমস্তই বুঝিলেন এবং ব্যাকুলহৃদয় বালককে সস্নেহে উঠাইয়া তাহার আধ্যাত্মিক জীবনগঠনের প্রয়োজনীয় উপদেশদানে কৃতার্থ করিলেন।

১৯১১ সনের শেষভাগে অথবা ১৯১২ সনের প্রথমদিকে স্বামী সুবোধানন্দ বরিশাল গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় প্রায় দেড় মাস অবস্থান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা-প্রচারে নিযুক্ত থাকেন। বরিশালে বহু ধর্মপিপাসু নরনারী তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধান পাইয়াছেন।

ঝরাপাতা

শ্রীমুরারিমোহন কুণ্ডু, বি-এ, সাহিত্য-সরস্বতী

পৌষের কুহেলি ঘন শীতল বাতাসে
শুষ্কবৃন্ত হতে পাতাগুলি পড়ে ঝরে,
শীতের শিশিররূপ শেলসম শ্বাসে
তারা কি সকলে সত্যি গেছে এবে মরে?
সেবার সবুজ সাজে বন মাঝে তায়
কোকিলের মধুডাকে বিগত বসন্তে
দূর হতে ভেসে আসা মৃদু মন্দ বায়
এরাই নাচিয়াছিল প্রতি বৃন্তে বৃন্তে?

তরু কি তা বলে তায় রাখিবে আঁকড়ি
সবেগে আপন বুকে ঝরাপাতাটিরে?
সব মায়া মুছে তারে দিতে হবে ছাড়ি
কঠিন পাষাণ সম রুক্ষ ধূলি পরে।
ঝরাপাতা ঝরে যাবে মাঘের বাতাসে
ফাগুনে ফিরিবে সে যে কুঁড়ির আবাসে!

ভারতীয় দর্শনে অবিরোধ

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্‌-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

(সমাপ্ত)

আমরা এই প্রবন্ধে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোকপাত করি নাই, কিন্তু সাংখ্য-পাতঞ্জলাচার্য্যগণ মোক্ষে কোন সুখের সত্তা স্বীকার করেন নাই তাহা আমরা বলিয়াছি। যে অভিপ্রায়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ মোক্ষে সুখের সত্তা স্বীকার করেন নাই, সাংখ্য ও পাতঞ্জলাচার্য্যগণেরও তাহাই অভিপ্রায়। পাতঞ্জলসূত্রে বলা হইয়াছে—"কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপি অনষ্টমতদন্যসাধারণত্বাৎ"; ইহার অভিপ্রায় এই যে মুক্ত পুরুষের নিকট প্রকৃতির আর কোন সত্তা নাই। কিন্তু বদ্ধ পুরুষের নিকট প্রকৃতি অবস্থিতই থাকে। যে অদ্বৈতবাদিগণ মুক্ত পুরুষের নিকট মায়া বা অবিদ্যার উচ্ছেদের কথা বলিয়াছেন পাতঞ্জল দর্শনও তাহাই বলিয়াছেন। বদ্ধ পুরুষের নিকট মায়া বা অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে ইহা যেমন বেদান্তিগণ বলিয়াছেন তেমন পাতঞ্জলও বলিয়াছেন। সাংখ্য যে পুরুষবহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন—'পুরুষবহুত্বং সিদ্ধম্' (১৮ কারিকা, সাংখ্যকারিকা)—তাহাও সাংখ্যাচার্য্যগণের অভ্যুপগমবাদ মাত্র। আপামর সমস্ত জীবগণের নিকটে আত্মভেদ প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। 'অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ'—অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তুর প্রতিপাদনেই শাস্ত্র সপ্রয়োজন হইয়া থাকে। জ্ঞাতজ্ঞাপন করিলে শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে যে পুরুষবহুত্ব বলা হইয়াছে তাহা অভ্যুপগমবাদ মাত্র, অর্থাৎ বদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি অনুসারে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ কথা এই যে সাংখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষের ভেদই সিদ্ধ হইতে পারে না—'অয়মেব ভেদো ভেদহেতুর্বা যোঽয়ম্ বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ কারণভেদশ্চ'। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসম্বন্ধ-প্রযুক্ত অথবা কারণভেদপ্রযুক্ত বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। সাংখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষ নিত্য বলিয়া তাহার ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। সাংখ্যসিদ্ধান্তে পুরুষ অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাহাতে কোন ধর্ম্মই সম্ভাবিত নহে, সুতরাং বিরুদ্ধ ধর্ম্মও সম্ভাবিত নহে। অতএব ভেদক ধর্ম্ম নাই বলিয়াই ভেদ সিদ্ধি হইতে পারে না। ভেদক ধর্ম্ম না থাকিলেও যদি বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হইত তবে প্রত্যেক বস্তুর নিজের সহিত নিজের ভেদ হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কি? 'স্বং স্বস্মাৎ কুতো ন ভিদ্যেত?' বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নাই বলিয়াই স্ব হইতে স্ব-এর ভেদ সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যাচার্য্যগণ ১৯ কারিকাতে পুরুষের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়াছেন—'সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য'—ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে পুরুষ কাহার সাক্ষী? সাক্ষিভাস্য বা সাক্ষ্য বস্তুটি সাংখ্যমতে কি? সুখ-দুঃখাদি আন্তর পদার্থই সাক্ষিভাস্য বলা উচিত। বেদান্তমতে সুখদুঃখাদি যেমন সাক্ষিসিদ্ধ সাংখ্যমতেও তাহাই। কিন্তু যাঁহারা 'প্রতিবিষয়াধ্যবসায়দৃষ্টম্' (যুক্তিদীপিকা, ১৯ কারিকা) এই প্রত্যক্ষ-কারিকার ব্যাখ্যাতে সুখদুঃখাদিকেও ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষের অন্তর্গত করিতে কুপ্রয়াস করিয়াছেন তাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্রের বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। এইজন্য প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যগণ 'শ্রোত্রাদিবৃত্তিপ্রত্যক্ষম্' বলিয়াছিলেন। ইহাতে বহিরিন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষই ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে আন্তর প্রত্যক্ষমাত্রই সাক্ষী প্রত্যক্ষ।

এই সাক্ষী প্রত্যক্ষকেও ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অন্তর্গত করিয়া কারিকার প্রত্যক্ষ লক্ষণটিকে বিপ্লুত করা হইয়াছে। 'ন্যায়শাস্ত্রে বাসনার প্রাবল্য-প্রযুক্ত যাঁহারা সুখদুঃখাদি মানসপ্রত্যক্ষ বলিতে উৎসাহী হইয়া সাংখ্যের প্রত্যক্ষ লক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারা পুরুষের সাক্ষিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। যাহা হউক, সাংখ্য-পাতঞ্জলের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় ইহা অদ্বৈত-বাদের বিরোধী। বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' পদের ব্যাখ্যার জন্য 'ত্বং' পদের ব্যাখ্যাতে সাংখ্যশাস্ত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং 'তৎ' পদার্থের ব্যাখ্যাতে পাতঞ্জল দর্শন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিলে ইহার সারবত্তা বুঝিতে পারা যাইবে। শোধিত 'তৎ' পদার্থ ও 'ত্বং' পদার্থের ঐক্য উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। আর সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই দুইটি দর্শন 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধনে উপদিষ্ট।

ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রপ্রস্থানই এই অদ্বৈত-মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। এই কথা মধুসূদন সরস্বতীর 'প্রস্থানভেদ' আলোচনা করিলে স্পষ্ট হইবে। আমরা এই প্রবন্ধে মাত্র দার্শনিক প্রস্থানের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অন্য বিদ্যাপ্রস্থানের আলোচনা এখানে করিব না। সম্পূর্ণ ব্যাকরণশাস্ত্র অর্থাৎ পাণিনীয় প্রস্থান এই অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈয়াকরণগণ যে শব্দাদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন ইহা ব্রহ্মাদ্বৈতবাদেরই নামান্তর। ভগবান ভর্তৃহরি পাণিনীয় প্রস্থানের পরম আচার্য্য, তাঁহার 'বাক্যপদীয়'-গ্রন্থের ধাতু-সমীক্ষা-প্রকরণে তিনি বলিয়াছেন—

'শুদ্ধতত্ত্বং প্রপঞ্চস্য ন হেতুরনিবৃত্তিতঃ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াদিরূপস্য মায়ৈব জননী ততঃ॥'
(চিৎসুখী, ৬০ পৃঃ, নির্ণয়সাগর)

ইহাতে সুস্পষ্ট ভাবে ভর্তৃহরি অদ্বৈত-বেদান্তের প্রক্রিয়ারই সমর্থন করিয়াছেন। 'বাক্যপদীয়ে'র মঙ্গলশ্লোকেও—

'অনাদিনিধনং ব্রহ্মশব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থ ভাবেন প্রক্রিয়া জগতঃ যতঃ॥'

শব্দতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দের অনারোপিত রূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। আর, তাহাই বিয়দাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। ভট্টজী দীক্ষিত প্রমুখ এই অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা অদ্বৈতবাদের বহু গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। নিরুক্ত-সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ও অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে এই অদ্বৈতবাদেই তাহাদের পর্য্যবসান বুঝিতে হইবে।

সুপ্রাচীন পূর্ব্বমীমাংসক-সম্প্রদায় বহু প্রকারে এই অদ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন। তাহার নিদর্শন মণ্ডনমিশ্র প্রণীত 'ব্রহ্মসিদ্ধি' গ্রন্থে এবং বিধিবিবেক, পঞ্চপাদিকা ও বিবরণের দ্বিতীয় বর্ণকে আলোচিত হইয়াছে। 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার নিজেই যে 'অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে'—বলিয়া পূর্ব্বপক্ষটি দেখাইয়াছেন, ইহা সুপ্রাচীন অদ্বৈত মীমাংসকগণেরই মত। ইহারা জ্ঞানে বিধি স্বীকার করিতেন বলিয়াই ভাষ্যকার তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। আমরাও এই প্রবন্ধে সুচরিতমিশ্রের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি—ব্রহ্মজ্ঞানে বিধি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের স্বরূপসিদ্ধি হইতে পারে না। এই সুপ্রাচীন মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত প্রভাকর-মতানুযায়ী ছিল। প্রভাকরের পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াও যে সমস্ত স্থানে প্রচলিত বেদান্ত-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছিলেন তাহারই খণ্ডন করিবার জন্য ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে'—এই উক্তির সারসংগ্রহ করিবার জন্য কল্পতরুকার বলিয়াছেন—

"অরস্তু সন্তু বেদান্তাঃ মানং ব্রহ্মাত্মবস্তুনি। কিন্তু জ্ঞানবিধিদ্বারেত্যেষ ভেদঃ প্রতীয়তাম্॥" স্পষ্টভাবে পূর্বমীমাংসকগণকে ব্রহ্মাত্মবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মাত্মবাদ বেদেরই সিদ্ধান্ত। বৈদিক দার্শনিকগণ ইহার বিরোধী হইতে পারেন না। ন্যায়াদি-সিদ্ধান্তও উদ্ধরণ করিয়া ইহা আমরা দেখাইয়াছি। 'ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব'—এই সূত্রের 'ভামতী'-ব্যাখ্যাতে যে উৎকট অদ্বৈতপ্রস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রাচীন মীমাংসকগণ অদ্বৈতবাদে কীদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। 'বৃহদারণ্যক'-ভাষ্যকার আচার্য্য প্রপঞ্চবিলয় পক্ষ, কামপ্রবিলয় পক্ষ প্রভৃতি পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাচীন মীমাংসকগণের অদ্বৈতবাদে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

'আত্মতত্ত্ববিবেক' গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য শূন্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য এই অদ্বৈতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং অদ্বৈতবাদে অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন ('আত্মতত্ত্ববিবেক' ৫০৩-৫০৪, Asiatic Society)। উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেকের পরিশেষে সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তরাশির একটি সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতির দ্বারা আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া শ্রুত আত্মতত্ত্বের মনন দ্বারা নিশ্চয় করিয়া শ্রদ্ধা, শমদমাদি সহকারে শ্রুত ও মত আত্মতত্ত্বের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। আর তাহাতেই শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য এই শ্রুত্যর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। অতঃপর আচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই আত্মতত্ত্বের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ সমস্ত বিষয়রাশি বাহ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থা অবলম্বন করিয়াই কর্ম্মমীমাংসার উপসংহার হইয়াছে এবং বাহ্যবিষয়ে অতিপ্রবণতাহেতু আত্মস্বরূপের অদর্শননিবন্ধন চার্ব্বাকমতের সমুত্থান হইয়াছে। চার্ব্বাকগণ যে আত্মতত্ত্বদর্শন করিতে পারেন না, তাহা বাহ্যবিষয়ে অতিশয় প্রবণতা হেতুই এই কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন—

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥'

যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া কর্ম্মমীমাংসা প্রবৃত্ত হইয়াছে এই অবস্থায় জীব পর্য্যবসিত না হউক এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি—'পরং কর্ম্মভ্যঃ অমৃতত্বমানশুঃ' বলিয়াছেন। আত্মোপাসনায় প্রবৃত্ত পুরুষ প্রথমতঃ আত্মা হইতে ব্যতিরিক্ত বাহ্যবিষয়রাশি দর্শন করিয়াছিল। সেই পুরুষই আত্মোপাসনায় আরও অগ্রসর হইলে তখন আত্মাই অর্থাকারে ভাসমান হইয়া থাকেন। এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রৈদণ্ডিক মত উপসংগৃহীত হইয়াছে। ভর্তৃপ্রপঞ্চ ভাস্কর প্রমুখ এই ত্রৈদণ্ডিক মতানুসারী। এই আত্মার অর্থাকারতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই বৌদ্ধ যোগাচার মতের সমুত্থান হইয়াছে। আত্মোপাসনায় প্রবৃত্ত পুরুষের কিয়দ্দূর অগ্রগমনের পরে আত্মাই যে অর্থাকারে ভাসমান হন ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন—'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্'—এই অবস্থায় জীব পরিনিষ্ঠিত না থাকুক এই জন্য এই অবস্থার প্রত্যাখ্যানের জন্য 'অগন্ধমরসম্' ইত্যাদি দ্বারা শ্রুতিই আত্মার অর্থাকারতার নিষেধ করিয়াছেন। এই আত্মোপাসনায় প্রবৃত্ত পুরুষ আরও অগ্রসর হইলে আর আত্মাকে অর্থাকার বলিয়া দর্শন করেন না। আর এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়াই প্রাথমিক বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহাকে আচার্য্য বেদান্তদ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাকার-বিবর্জ্জিত আত্মার অবস্থান অত্যন্ত অসম্ভাবিত মনে করিয়া শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের নৈরাত্ম্যবাদের অভ্যুত্থান হইয়াছে। শূন্যবাদিগণের

নৈরাত্ম্যবাদ ও শ্রুতিই পূর্ব্বপক্ষরূপে দেখাইয়াছেন—'অসদেবেদমগ্র আসীৎ'। আত্মোপাসক এই অবস্থায় পরিনিষ্ঠিত না থাকুক এইজন্য এই অবস্থার নিরসনাভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ" ইত্যাদি নৈরাত্ম্যদর্শনই আত্মহনন। এই আত্মোপাসনায় প্রবৃত্ত পুরুষ আরও অগ্রে ধাবিত হইয়া জড়বর্গের সহিত আত্মার বিবেকদর্শন করিয়া থাকেন, আর এই অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া সাংখ্যসিদ্ধান্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অবস্থাই জড়বর্গের প্রকৃতি, মহান্ প্রভৃতিরূপে পরিগণনা করা হইয়াছে। 'প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ'—ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা জড়বর্গ হইতে প্রকৃতির বিবেকশ্রুতিই প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অবস্থাতেই আত্মোপাসক রত না থাকুক এই জন্য শ্রুতি 'নান্যৎ সৎ' ইত্যাদি বলিয়াছেন। ইহার অর্থ আত্মব্যতিরিক্ত অনাত্মবস্তু সৎ হইতে পারে না। অনন্তর নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চ আত্মা মাত্রই প্রকাশমান হয়। এই অবস্থাকেই অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতমত উপসংগৃহীত হইয়াছে। এই অবস্থা-প্রতিপাদনের জন্য 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে। নির্ধর্ম্মক বলিয়া এই অবস্থা বাক্য ও মনের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এই অবস্থা হেয় হইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমিক ধ্যান অবস্থাগুলির ক্রমশঃ হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া শ্রুতি আগে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর অবস্থা দেখাইয়াছেন। কিন্তু আত্মার যাদৃশ অবস্থাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত উপসংগৃহীত হইয়াছে, আত্মার তাদৃশ অবস্থা হেয় হইতে পারে না। এই অবস্থা-প্রতিপাদনের জন্য—'ন পশ্যতীত্যাহুঃ একীভবতি' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। দ্বৈতাভাববিশিষ্ট আত্মস্বরূপের যে দ্বৈতাভাব ভাসমান হয়, এই অভাব দ্বৈতরূপ প্রতিযোগি-সাপেক্ষ বলিয়া ইহা কখনও পারমার্থিক হইতে পারে না। আত্মার স্বরূপ কখনও দ্বৈতসাপেক্ষরূপ নহে। এইজন্য আত্মজ্ঞানে দ্বৈতাভাবেরও স্ফুরণ না হউক এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি দ্বৈতাভাব-স্ফুরণের প্রতিষেধের জন্য 'নাদ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং'—ইত্যাদি বলিয়াছেন। অনন্তর দ্বৈতবিষয়ক সমস্ত সংস্কার দূরীভূত হইলে কেবল আত্মাই ভাসমান হইয়া থাকে। এই আত্মা সবিকল্পকজ্ঞানবেদ্য নহে। সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত জ্ঞান নির্ব্বিকল্পরূপ, আর আত্মার এই অবস্থাতেই চরম বেদান্তের উপসংহার বলা হইয়াছে। আচার্য্য উদয়নও এইস্থলে তাহাই বলিতেছেন। আচার্য্য উদয়ন বেদান্তের তিনটি ভাগ বলিয়াছেন—(১) দ্বারবেদান্ত, (২) অদ্বৈতবেদান্ত, (৩) চরমবেদান্ত। অনন্তর আচার্য্য বলিয়াছেন, এই চরমবেদান্তই মোক্ষনগরীর সিংহদ্বার—অর্থাৎ এই অবস্থায় আত্মার যাদৃশ দর্শন হইয়া থাকে, তাঁহার যাদৃশ নির্ব্বিকল্পক সাক্ষ্য হইয়া থাকে—তাহাতেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ আত্মা নির্ব্বিকল্পক সাক্ষাৎকারী একমাত্র কারণ। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য দ্বারা বেদান্তিগণ আত্মার নির্ব্বিকল্পকত্ব সাক্ষাৎকারের কথাই বলিয়াছেন। আত্মার যে এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ইহাও স্থায়ী বস্তু নহে। ইহাও নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, আর কেবল আত্মাই অবশিষ্যমাণ থাকিবে। আত্মার এতাদৃশস্বরূপেই ন্যায়সিদ্ধান্ত উপসংগৃহীত হইয়াছে, আর এই স্বরূপ-প্রতিপাদনের জন্যই শ্রুতি—'অথ যো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে' ইত্যাদি বলিয়াছেন। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রবন্ধে আমরা বাৎস্যায়ন-ভাষ্য হইতেও এই কথাগুলি দেখাইয়াছি। আচার্য্য উদয়ন বাৎস্যায়ন-ভাষ্যের রেখামাত্র লঙ্ঘন করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন আচার্য্য পরে অদ্বৈতমতের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা

াৎস্যায়নের কথা কেন ভুলিয়া যান? আরও াক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বাৎস্যায়ন ও উদয়ন াহা বলিয়াছেন ইহার অধিক অদ্বৈতবেদান্তিগণ দার কি বলেন? তাঁহারাও তো এই শ্রুতিগুলির দাশ্রয় বিশ্লেষণ করিয়া স্বসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক, উদয়ন বলিয়াছেন— াঁহারা আত্মতত্ত্ব-বিচারাভ্যাসকামী তাঁহারা অপদ্বার পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ-নগরের মুখ্য দ্বারপথে যেন প্রবেশ করেন। মোক্ষনগরের সিংহদ্বার কি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আত্মতত্ত্ববিবেক, ১৩৫-১৩৬ পৃঃ)।

আমরা অতি সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শন-প্রস্থান-সমূহের যে একই আত্মতত্ত্বে বিশ্রান্তি াটিয়াছে তাহা প্রদর্শন করিলাম। ভারতীয় বৈদিক অবৈদিক সমস্ত দর্শনপ্রস্থানই এই আত্মতত্ত্বদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছে। ভারতের দার্শনিক আলোচনা ব্যক্তিগত কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য নহে, ইহা জীবনের সর্ব্বস্ব, জীবনের সমস্ত কার্য্যপ্রবাহ এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রবাহিত করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটি দর্শনের মূলেই শ্রুতি অথবা আগম বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রৌত বা আগমিক সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্যই দর্শনপ্রস্থানের প্রবৃত্তি হইয়াছে। দার্শনিক দৃষ্টির দ্বারা সুমার্জ্জিত সিদ্ধান্তের অনুকূলে জীবন-স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য প্রতিদর্শনেরই দার্শনিক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহারা গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যাহত গতিতে এই দার্শনিক চিন্তার স্রোত ভারত-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। আজও এই স্রোত সর্ব্বথা উচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। আশা করি ভারতের শুভদিনে এই দার্শনিক চিন্তাস্রোত বহুমুখে প্রবাহিত হইয়া ভারতভূমি তথা পৃথিবীর কল্যাণসাধন করিবে। 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে'র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা হইল—

'ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাম্
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥'

শান্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা অবলম্বনে)

যতক্ষণ পোড়ে কাঠ পড়্ পড়্ করে,
ধূমে যায় চারিদিকে একেবারে ভ'রে;
প্রচণ্ড অগ্নির তাপে কাছে যাওয়া দায়,
নষ্ট করে যাহা কিছু সম্মুখে সে পায়।
পুড়ে শেষ হ'য়ে গেলে তখন তাহার
জ্বালা কিন্তু নাহি থাকে কিছুমাত্র আর।
আসক্তি হইলে শেষ জীবেরও তেমন,
নির্ব্বিকার শান্তি রাজে হৃদয়ে তখন।

একমাত্র জ্ঞান শুধু এই যেন হয়,
তাঁরে বাদ দিলে আর কিছু নাহি রয়।
একে ক্রমে শূন্য দিলে অঙ্ক যায় বেড়ে,
শূন্য প'ড়ে রয় যদি এক দাও ছেড়ে।
ভোগাসক্তি যদি আজো বাড়িতেই থাকে,
বিফল জীবন হ'বে, পাবে নাকো তাঁ'কে।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কথা

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৫-১-২৫ সন। স্থান—গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। অনাথ বাবু নামক জনৈক ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহারাজকে গান শুনাইতেছিলেন। গান সমাপ্ত হইলে মহাপুরুষজী বলিলেন—"বেশ অনুরাগের গান!" আবার একটি গান হইল। এই গান শুনিয়া মহারাজ খুব খুশী হইলেন। এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর গান গাইতে পারতেন কি?"

মহাপুরুষ—হাঁ, তিনি খুব ভাল গাইতে পারতেন, গানে তাঁর একটা মস্ত আকর্ষণ ছিল; খুব মিষ্টি গলা ছিল, তিনি নিজেই বলতেন—'আমিত ওস্তাদ'।

ক-মহারাজ—স্বামীজিও গাইতে পারতেন?

মহাপুরুষ—তিনি ত গানে সিদ্ধই ছিলেন, খুব যত্ন করে ছোটবেলা হতেই গান শিখেছিলেন। তিনি উত্তম গান করতেন।

ল-মহারাজ—(ক-মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া) মহাপুরুষ মহারাজও কিন্তু ভাল গাইতে বাজাতে পারেন।

ক-মহারাজ—সত্য নাকি? (মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া) দয়া করে, মহারাজ, আমাদের একটি গান শোনান।

সকলেই অত্যন্ত জিদ করায় তখন মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন—"এখন আমার সর্দ্দি হয়েছে, কি করে গান শুনাব? অন্য সময়ে দেখা যাবে।"

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজির কথা উঠিল।

ক-মহারাজ বলিলেন—স্বামীজির মত লোকের আর সন্ন্যাসের কি প্রয়োজন ছিল তবে লোকশিক্ষা।

মহাপুরুষ—হাঁ সত্য বটে, তিনি ত নিত্যসি মহাপুরুষ, সকল বিষয়ে সিদ্ধ হয়ে পৃথিবীত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মত লোকে কা কথা!

ক-মহারাজ—স্বামীজির একাধারে এত গুণ

মহাপুরুষ—হাঁ, ওঁদের কথা কি! ওঁরা স শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন।

ম-বাবু—স্বামীজির কথা কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর খ শুনতেন।

মহাপুরুষ—"হাঁ।" ন্যাংটা তোতাপুরী শ্রীশ্রীঠাকুরকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন সেই কথা বলিলেন—"একবার ন্যাংটার ধুনি হইতে এ নাগা সাধু অগ্নি লইয়াছিল, ইহাতে ন্যাংটা তাঁহাকে খুব গালিগালাজ দেন। তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকু তাঁহাকে অর্দ্ধবাহ্যদশায় হাস্যের রোল তুলি বলিয়াছিলেন—'দুর্ শালা, দুর্ শালা! এ তোমার অদ্বৈতজ্ঞান?' ঠাকুরের কথ তোতাপুরীর চৈতন্য হইল। আর একদি শ্রীশ্রীঠাকুর হাততালি দিয়া ভগবানের না করিতেছিলেন। ইহাতে অদ্বৈতবেদান্তী তোতাপু ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলিয়াছিলেন—'আরে, কেঁ রোটি ঠোকতে হো?' ঠাকুর শুনিয়া হাসি বলিলেন, 'দুর্ শালা! আমি ঈশ্বরের না করূচি, আর তুমি কিনা বলূছ—আমি রু ঠুকূচি'।" অনন্তর কিভাবে তোতাপুরী গঙ্গা ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকু

তাঁহাকে শক্তি মানিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ হইল।

আবার গান আরম্ভ হইল। অনাথ বাবুর গৌরাঙ্গ-বিষয়ক হিন্দি গান শুনিয়া মহাপুরুষ মহারাজ খুব আনন্দিত হইলেন এবং ল-মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"দেখ ল—, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমাদের এখন যে কোন গান হউক না কেন, তাতেই আনন্দ হয়। কারণ আমাদের ত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নেই, তাই আমরা সকল রকম গান শুনেই আনন্দ পাই। অন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোক কালীবিষয়ক গান হলে হয়ত উঠে যাবে; আমাদের তা হবার জো নেই।"

অতঃপর অনাথ বাবু বিদায় লইবার জন্য উঠিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনাথ বাবু অবিবাহিত শুনিয়া মহাপুরুষজী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে ভাবে জীবনযাপন করছ—উত্তম পথ। বিয়ে করলে লোক আর সেরূপ থাকে না। সব মন যশ, ভালবাসা ও মেয়েদের দিকে যায়। সেই মন দিয়ে আর ভগবানের সেবা হয় না। তুমি সদ্‌ভাবে জীবন চালাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। দেখ, এই সংসারে মান-যশ বেশী দিন থাকে না। ভগবানই সত্য, তাঁর দিকে মন গেলেই ধন্য। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

১৬-৯-২৫ সন। স্থান—গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ কালীদর্শন সম্বন্ধে বলিলেন—"দেখ, মাকে বাস্তবিক দর্শন লোকের হয় না। কি করে হবে? লোকের মন সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত রয়েছে। মাকে দর্শন করবার জন্য প্রাণে একটা আগ্রহ চাই। তাঁকে দেখ্‌ব বলে মনে প্রথমেই একটা ব্যাকুলতা আনতে হয়। এইরূপ মনের অবস্থা হলেই ঠিক ঠিক দর্শন হয়। তা না হ'লে মন্দিরে ঢুকলুম, মা মা বলে দুটা চীৎকার দিলুম, আশে-পাশে যত সব দেখবার তা দেখলুম—একে কালী-দর্শন বলে না। তবে হাঁ, এও মন্দের ভাল।

ল-মহারাজ—মূর্ত্তি দেখলে মাকে মনে পড়ে, এই জন্যই ত মূর্ত্তি।

মহাপুরুষ—তা বইকি। তাঁকে মূর্ত্তির মধ্যে দেখলে ত সত্য সত্য তাঁর স্মরণ হয়। তিনি স্থূলভাবে এ-জগতে রয়েছেন, আবার সূক্ষ্মভাবেও ভেতরে রয়েছেন। এই যে চণ্ডী—তিনি একবার সব বাইরে প্রকাশ করছেন আবার ভেতরে। চণ্ড-মুণ্ড-মধুকৈটভ—এই সব বধ করে তিনি জগতের মঙ্গল করলেন।

জনৈক ভক্ত—এই যে চণ্ড-মুণ্ড প্রভৃতি তিনি বধ করলেন—তা কি বাস্তবিক সত্য, না ভিতরে যে আমাদের সব রিপু আছে সেগুলিকে বধ করলেন?

মহাপুরুষ—উভয়ই সত্য। দেবী স্থূলভাবে চণ্ড-মুণ্ড প্রভৃতি দৈত্যাদিগকে বধ করলেন, আবার সূক্ষ্মভাবে ধরতে গেলে আমাদের ভেতরে যে সকল রিপু আছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহাদিগকে নাশ করলেন।

জনৈক ভক্ত—মহারাজ, এই জগৎ যে অনিত্য, অসত্য, তা' সব মহাপুরুষই উপলব্ধি করে গেছেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯ জনই এই জগৎটা যে অসত্য তাহা বুঝে না—ইহার অর্থ কি? আমাদের অসত্যে সত্য বোধ কেন হচ্ছে?

মহাপুরুষ—এই তো মায়া, তাঁর লীলা! তোমার প্রশ্নের উত্তর এই—তিনি যদি দয়া করে কাকেও বোঝান যে সংসার অনিত্য, তবেই সে বুঝতে পারে! তা ভিন্ন অন্য উপায় নেই! মানুষকে তিনি একটা 'অহং' দিয়ে রেখেছেন। মানুষ সেই 'অহং'টির জোরে আমি এই করবো, ও করবো মনে করে! আবার তিনি সেই

'অহং' নাশ করে দিলেই মানুষ রক্ষা পায়। দেখ, মানুষ কি মজার! ঘাড়ের পিছনে কট artery (ধমনী) আছে তা জানে না। শরীরের ভেতর কোথায় কি অসুখ হচ্ছে, আবার সেরেও যাচ্ছে। কত ক্রিমি শরীরের ভেতর হচ্ছে, যাচ্ছে, মরছে তা জানে না। নিজকে 'অহং' বলে বেড়ায়। এই শরীরের কত যত্ন, কত প্রসাধন, কত কি করছে!

জনৈক ভক্ত—সত্যের উপর নিষ্ঠা ও অনুরাগ না হলে এদেশের রক্ষা নেই।

মহাপুরুষ—'হাঁ, সত্য। তা ভিন্ন কি করে রক্ষা পাবে? মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে জার্মেণির কাইজারের কথা তুলিয়া বলিলেন, "দেখুন, কাইজার ৫।৭ বৎসর প্রবল প্রতাপে কি যুদ্ধই না করেছিলেন! মনে করেছিলেন তিনি সব করতে পারেন। এখন দেখুন সেই কাইজারে কি অবস্থা! এখন তিনি কোথায়? মজা এই—মানুষ মনে করে আমি সব করতে পারি। বাস্তবিক, ভগবান যাকে যতটুকু শক্তি দেন তিনি ততটুকুই করতে পারেন। ঠাকুরের সেই গল্প জানেন তো? গরুটাকে যতটুকু দড়ি দিয়ে বাধা যায়, তার মধ্যেই সে ঘুরে বেড়ায় আর মনে করে সে স্বাধীন। বাস্তবিক, সে স্বাধীন কি?"

মহাত্মা গান্ধীর কথা উঠিলে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ বলিলেন—"বাস্তবিকই গান্ধীজি উন্নত ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছা ছিল সকলকে নিয়ে উন্নত হন। কখন হয় কি? তিনি বেশ সত্যবাদী ও নির্ভীক

সাঁঝের দিগন্ত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুদূর পথের শেষে আকাশ দিগন্তে মিশে
আধো ছায়া আধো আলো
নীলিমার রেখা,

অপূর্ব্ব গগনছবি অস্তমিত সন্ধ্যারবি,
মসীময় নভঃপটে
নবচিত্র আঁকা।

গোধূলির রক্তরাগে সুপ্তসন্ধ্যা সদ্য জাগে,
বিস্তারি কলাপি-পক্ষ
শিখিপুচ্ছ প্রায়

ধূসর জলদজাল সাজায় গগনভাল
পবন হিল্লোলে দুলি
দূরে ভেসে যায়।

যেন শত শুভ্র তরী অকূল পাথারে পড়ি,
পথ ছাড়ি ঘুরি ফিরি
ভ্রান্ত পথে ধায়।

দিনের বিদায় ভালে সাঁঝের তারকা ঝলে
যেন শত দেবশিশু
মিটি মিটি চায়।

বিহগ কাকলী-স্বরে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে
পথক্লান্ত পান্থ চলে
দিগপ্রান্তে চাহি।

সাঁঝের বিদায়গান, তটিনীর কলতান
নদীবক্ষে চলে নেয়ে
শেষ খেয়া বাহি।

আভীর ফিরিছে ঘরে ধেনু চলে দূরে দূরে
ধূলিজাল রচি ক্ষুরে
গগন সাজায়।

দিগন্ত অনন্তে মিশে সাঁঝের ধরণী হাসে
আঁধারের যবনিকা
বসুধার কায়।

স্মরণ ও উদ্ভাবন

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

ইন্দ্রিয়াদির সাহচর্য্য ব্যতীত মনের স্বয়ংসাধ্য ক্রিয়ার নাম মনন। মন তাহার আধারের মধ্যে সঞ্চিত রূপ ও ভাবধারা লইয়া এই ক্রিয়া সম্পাদন করে। এখানে সে স্বয়ং কর্ত্তা; প্রচ্ছন্নভাবে পশ্চাতে কাহারও ইঙ্গিত থাকিলেও এই অবস্থায় তাহার সত্তার সন্ধান পাওয়া কঠিন। মননক্রিয়া আবার দুই প্রকার: একটি সরল, আর একটি যৌগিক। সরল ক্রিয়া অতি সাধারণ, মেধার সাহায্যে স্মৃতির মধ্যে পূর্ব্ব-লব্ধ সম্পদের সন্ধান মাত্র। ইন্দ্রিয়াদির সহযোগিতায় মন তাহার ভাণ্ডারে পূর্ব্ব হইতে যে সকল বিষয় সঞ্চিত রাখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোনটির জন্য অনুসন্ধানের মধ্যেই এই কার্য্য সীমাবদ্ধ। ইহার নাম চিন্তা। চিন্তা আবার দুই প্রকার: একটি স্মরণ, আর একটি উদ্ভাবন। দুইটিই পূর্ব্বসঞ্চিত সম্পদ হইতে উদ্ভূত। একটি হয় মেধার সাহায্যে; তাহা পূর্ব্বদৃষ্ট বা পূর্ব্বশ্রুত পদার্থের পুনরানয়ন। যেন মানসফলকে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কোন জ্ঞেয় বস্তুকে অনেক কাল আগে অঙ্কিত রাখা হইয়াছিল, এইরূপ পর পর অনেক বিষয় গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে, অনুসন্ধানের দ্বারা তাহারই একটাকে পুনরুদ্ধার করা। ইহাই স্মরণ। মেধাশক্তি প্রবল হইলে স্মরণক্রিয়া দ্রুত সম্পাদিত হয়। মেধার তারতম্যে স্মরণের আনুপাতিক বিলম্ব এবং অভাবে স্মৃতির লোপ। উদ্ভাবনও পূর্ব্ব-আহৃত উপাদান হইতে সংঘটিত হয়। তবে তাহার মধ্যে নূতনত্ব থাকে। চিন্তাধারে গচ্ছিত বিষয়ের যথাযথ উদ্ধারই স্মরণ এবং তাহার সহায়তায় চেষ্টাদ্বারা কিছু পরিবর্ত্তিত অবস্থার অবতারণই উদ্ভাবন। স্মরণকার্য্যে বাহিরের সহিত ভিতরের ও অতীতের সহিত বর্ত্তমানের মিলন আছে। স্মৃত পদার্থের সহিত জগতের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। কিন্তু উদ্ভাবিত বস্তু নূতন। সে জগতে আসিয়া নিজেকে একা দেখে। আত্মীয়তা-সূত্র থাকিলেও সকলেই দূর, নিকট কেহ নহে। স্মরণ ঐতিহাসিক, উদ্ভাবন বৈজ্ঞানিক। স্মরণীয় বস্তু বৃদ্ধ, উদ্ভাবিত পদার্থ নবজাত। বৃদ্ধ অপেক্ষা নবজাতকের আদর অধিক। সেইজন্য স্মরণ অথবা অনুকরণ অপেক্ষা আবিষ্কার শ্রেষ্ঠতর, তাই অধিক গৌরবের।

যাদুকর খেলা দেখাইতে নামিয়া ভানুমতীর বাক্সের ভেল্কী দেখাইতেছে। একটি সাধারণ বাক্স, অভাবে থলি। তাহার মধ্য হইতে বহু রকম বস্তু বাহির করিয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিবে। প্রথমে আধারটি খুলিয়া ঝাড়িয়া অভ্যন্তর শূন্য আছে বুঝাইয়া দিল। বাস্তবিকই শূন্য; এখানে জুয়াচুরির কিছু নাই। তারপর সর্ব্বসমক্ষে সকলকে দেখাইয়া বুঝাইয়া পাঁচটি কি দশটি জিনিষ ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। বাহির করিবার সময় একটি একটি করিয়া পঞ্চাশটি বাহির করিল; তাহাই তাহার চাতুরী। এই পঞ্চাশটির মধ্যে পূর্ব্বেকার প্রবেশ করান পাঁচ দশটি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্তই নূতন। হইতে পারে, যেই পাঁচ প্রকার প্রবেশ করান হইয়াছিল, এইগুলি সেই প্রকার বস্তুই, কেবল সংখ্যায় অধিক;

অথবা ঐ কয়টি ব্যতীত সমস্তই ভিন্ন প্রকারের এবং সমস্তই নূতন। সে যাহাই হোক, অবশিষ্ট বস্তুগুলি সমস্তই দর্শক-জগতের নিকট উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত। যাদুকরের জুয়াচুরি কোথায় কাহারও চক্ষে ধরা পড়ে না। চতুরতাদ্বারা চালাকি খেলিয়া ফাঁকির ঘরের ফাঁক বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এখানে যাদুকর কে জানি না, তাহার বিষয় আলোচ্য নহে; কিন্তু বাক্সটি আমাদের নিজস্ব। তাহা আমাদের মন। ঐ যে পাঁচ দশটি বস্তু ভিতরে প্রবেশ করান হইয়াছিল, তাহাই আমাদের বহির্জগৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান। আমরা ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে সে সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লই, তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষভাবে বাক্স বা থলির আধারে রক্ষিত বস্তু। বাহির করিবার সময় হুবহু সেই কয়টিকে আনিয়া দেওয়ার নাম উদ্গিরণ, তাহাই স্মরণ। একই প্রকার অধিকসংখ্যক বস্তুর অবতারণার নাম অনুকরণ। তাহার মধ্যে নূতনত্বের কিছু নাই। সংখ্যাধিক্য বা পরিমাণের গুরুত্বই তাহার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশটি পদার্থের যদি পূর্ব্বপ্রবিষ্ট বস্তুর সহিত কোন প্রকার অবয়বের সাদৃশ্য না থাকে তবেই তাহাকে উদ্ভাবন বলা চলে। ইহা নূতন। ইহারই মোহিনী শক্তিতে জগৎ মুগ্ধ হয়। যাদুকরের সবটুকুই রহস্যময়। যে কয়টি জিনিষ প্রবেশ করান হইল তাহার অতিরিক্ত বাহির করিতে পারিলেই সে যাদুকর আখ্যা পায় ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে। যাহারা কেবল অনুকরণ করে, তাহারাও সাধারণ অপেক্ষা অধিক শক্তিধর বলিয়া এক সম্প্রদায়ের কাছে কিছু সম্মান পাইয়া থাকে। কিন্তু আবিষ্কারকের সম্মান ও প্রতিপত্তি সর্ব্বাধিক।

ইহাই খেলার রহস্য। ইহা দেখিয়াই প্রেক্ষাগৃহ অর্থাৎ জগদ্বাসী আনন্দিত হয়। কিন্তু রহস্যের অন্তরালে আরও একটি রহস্য আছে, তাহার জন্য মাত্র দুই একটি লোক মাথা ঘামায়। তাহারাই পৃথিবীতে যাদুকরী বুদ্ধি লইয়া চলাফেরা করে। তাহাদের নজর থাকে লোকটির হাত সাফাই-এর উপর। ইহা যে কোনরূপ মন্ত্রশক্তি অথবা দ্রব্যগুণের ক্রিয়া নয় তাহা তাহারা বিশ্বাস করে। লোকটি অতগুলি বস্তুকে কেমন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইল তাহাই তাহারা ভাবিতে থাকে এবং পরিণামে ঠিক যাদুকর না হইলেও যাদুকরের কারসাজি কতক বুঝিতে পারে।

লোকটি প্রথম কয়টি বস্তুর সঙ্গেই অবশিষ্ট জিনিষগুলি ভিতরে চালাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে, কেহই দেখিতে পায় নাই। এখানেও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে জ্ঞাতব্য বিষয় মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু অনাবশ্যক বস্তু ভিতরে চলিয়া যায়। মন একরূপ অজ্ঞাতসারেই তাহাদের ছাপ তুলিয়া লয়। বাহির করিবার সময় তাহারা সব একে একে বাহির হইয়া আসে। একটি বস্তুর উপর টর্চের ফোকাস্ নিবদ্ধ করিলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বস্তু প্রধানতঃ দর্শনীয় না হইলেও যেমন কথঞ্চিৎ আলোকিত হইয়া উঠে, ইহাও কতকটা সেইরূপ ভাবেই সংঘটিত হয়। একটা বিষয়ের উপর মন নিবিষ্ট করিলে তৎসম্পর্কিত বিষয়গুলিকেও মন কিছুটা প্রভাবিত করে। সেই সময় ঠিক উপলব্ধ না হইলেও পরে বুঝা যায় যে, একদিন অনিচ্ছা সত্ত্বে একরূপ অজ্ঞাতসারেই বিষয়টি আয়ত্ত হইয়াছিল, আজ বাহির হইয়া আসিতেছে। তখন ইচ্ছা থাকিলে হয়তো আরও ভাল করিয়াই শিখা যাইতে পারিত!

জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক, যাদুকর যাহা ভিতরে প্রবেশ করায় নাই এমন

কোন বস্তুই সে বাহির করিতে পারে না। যতগুলি জিনিষ সে বাহির করিল তাহার সব কয়টিকেই সপ্তগ্রামের সহিত তাহাকে বাড়ী হইতে লইয়া আসিতে হইয়াছিল। মনের মধ্য হইতেও যত কিছু বাহির হইবে, অনুকৃত বিষয়ের তো কথাই নাই, উদ্ভাবিত বিষয়ও মূলগত উপাদান হিসাবে বহির্জগৎ হইতেই আহৃত। একই দৃশ্য দেখিয়া বা শব্দ শুনিয়া কেহ তদতিরিক্ত বিষয়ে অবতরণা করিতে পারে—কেহ বা যথাযথ কেবল সেইটিকেই উদ্গার করিয়া দেয়। কারণ সেই পূর্ব্বানুরূপ বিষয়বস্তু সাধারণ হইলেও কেহ যাদুকরী বুদ্ধি খাটাইয়া অধিক মাত্রায় আহরণ করে, কেহ বা মাত্র সেইটিকেই উতরাইতে পারে; ইহা শুধু গ্রহণ করিবার সময় চতুরতা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। আবার এমন লোকও আছে যাহারা গৃহীত বস্তুর আংশিক মাত্র বাহির করিতে পারে। তাহারা যাদুকর মোটেই নয়, এমন কি তাহাদের সাধারণ ক্ষমতারও অভাব। যাহা পাঁচজন লইতে পারে, তাহারা তাহা পারে না। লইতে না পারিলে দিবে কোথা হইতে? পূর্ব্বে যাহা লইয়াছে তাহাও সামান্য, তাহার সংগ্রহই কম। উদ্ভাবন দূরের কথা অনুকরণই তাহার দ্বারা সম্ভব নহে।

জগতে অনুকারীর সংখ্যাই অধিক। ঐন্দ্রজালিকগণ সচরাচর এক বস্তুকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ অথবা বহুগুণ করিয়া জাতির সমতা রক্ষা করিয়া চলে। ইহাই সহজ প্রক্রিয়া। প্রকারভেদ ও জাতীয়তার বৃদ্ধি ক্রীড়ার মধ্যে হইলেও কথঞ্চিৎ কঠিন। ভিন্ন জাতীয়ের মধ্যে অবয়বের গুরুত্ব আবার আরও কঠিন। পড়াশুনার দ্বারা অল্প জ্ঞান লাভ করিয়া অধিক দান করা জগতে বিরল। ইন্দ্রিয়াদি-আহৃত সামান্য জ্ঞানের মূলধন লইয়া কেবল মনের সাহায্যে বহুবিধ বস্তু উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছে জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা বড় বেশী নাই। কানাকড়ির বেসাতি করিয়া কয় জন এখানে প্রভূত ধনসঞ্চয় করিতে পারিয়াছে। পৃথিবীতে যেমন ঢালে তেমনই কুড়াইয়া লয়, আবার যেমন কুড়াইয়া লয় তেমনই ঢালিয়া দিতে হয়। তবে যে দেখা যায় কেহ কেহ গ্রহণ অপেক্ষা বেশী করিয়া দিয়া গেল; তাহা ঐ যাদুকরের মতই গ্রহণের সাথে সাথে আরও অনেক কিছু সরাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া। পার্থক্যের মধ্যে যাদুকর স্বেচ্ছায় সরাইয়া রাখিয়াছিল, এখানে মন সকল সময় বুঝিতেই পারে না তাহার মধ্যে কি গেল বা না গেল; যদিও গ্রহণের প্রত্যক্ষ কর্ত্তা একরূপ সে নিজেই।

মনের এই আহরণকার্য্য শিশুকাল হইতেই চলিতে থাকে। চক্ষুকর্ণাদি গ্রাহক যন্ত্রগুলি সক্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যারম্ভ সূচিত হয়। তবে প্রাথমিক সংগ্রহ এমন ভাবেই নিম্নস্তরে চাপা পড়িয়া যায় যে তাহাকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। পর পর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বোঝা আসিয়া তাহাকে বহু নিম্নে চাপিয়া রাখে, অথবা নিজেদের সহিত মিশাইয়া গুছাইয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে। ইহাও সেই মনেরই কাজ। এক বস্তুকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কিছু বাড়াইয়া কমাইয়া আনিতে হইলে যাদুকর নিজেই তাহা গোপনে সম্পন্ন করে। শিশুকালের সাদা মনে যে রং ধরান যায় তাহাই লাগিয়া যায়। সাদা মন শূন্যতার ইঙ্গিত করে। খেলোয়ার প্রথমে শূন্য বাক্সই দেখাইয়া লয়। তবে যদি তাহার মধ্যে গোপনে কিছু রক্ষিত থাকে তাহা লোকচক্ষুর দৃষ্টিবহির্ভূত। মনের মধ্যেও জন্মান্তরীণ সংস্কার হিসাবে কিছু অঙ্কিত থাকিলেও তাহা সাধারণের

দৃষ্টিগোচর হয় না। এমনও হয়, যাদুকর বাক্সের মধ্যে কিছুমাত্র প্রবেশ না করাইয়াই শুধু খালি বাক্স দেখাইয়া তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকার বস্তু বাহির করিতে থাকে। এই খেলাতে চতুরতা ও নিপুণতা বিশেষ ভাবে আবশ্যক। কোন কোন লোক দেখা যায়, শিশুকাল হইতেই জ্ঞানের কথা বলে। জগৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান হইল না কিছুই, কিন্তু লোককে সে জ্ঞান দিতে থাকে, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই বলিয়া দিতে পারে, নিজেরও অতীত জীবনের কাহিনী উল্লেখ করে। ইহারা জাতিস্মর। যাদুকর বহু পূর্ব্বেই খালি বাক্সের মধ্যে সামগ্রীগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আসরে আসিয়া যথাস্থানে বাহির করিয়া দিল। ইহাদেরও মনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞান গুপ্ত ছিল, যথাকালে প্রকাশ হইল। উন্মেষের জন্য কাহারও সহিত সংসর্গ বা কোনরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইল না। সমস্তই যেন আপনা হইতে সংঘটিত হইয়া গেল।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উদ্ভাবিত বস্তু নূতন হইলেও পুরাতন। যাহার অস্তিত্ব কোন দিনও নাই, তাহার জন্মও কখন হইতে পারে না। যে ছিল সেই আসে, যে নাই সে কোন দিনও নাই। মনের মধ্য হইতে যখন উদ্ভাবিত হয় তখন তাহার উপাদান এই ভাবে বাহির হইতেই গৃহীত হয়। সুতরাং মানস-ফলকই উদ্ভাবনের জন্মস্থান বুঝা যাইতেছে। তবে উদ্ভাবন-অর্থে ইহা নহে, কেবল ভূগোল, খগোলেরই বড় বড় আবিষ্কার। নিত্যকারের কার্যকলাপের মধ্যে মানুষ স্মরণ ও উদ্ভাবন লইয়াই নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। প্রতি-নিয়ত তাহার প্রতিটি কর্ম্মের মধ্যেই স্মরণের আবশ্যকতা হয় এবং উদ্ভাবনও প্রায় সেই সঙ্গেই চলিতে থাকে। জীবনযাত্রার কার্য্যাদি সামান্য ও তুচ্ছ বলিয়া মাথা ঘামাইবার কিছু নাই, কিন্তু উদ্ভাবন-ক্রিয়া মানুষের প্রায় সকল সময়ই চলিতেছে। মধুর অভাব গুড়ের দ্বারা সারিয়া লওয়া, দুগ্ধের কাজ ঘোলে সম্পন্ন করা, বালিশের অভাবে বস্তা ভাঁজ করিয়া নেওয়া, বর্ষার দুর্য্যোগে কোনরূপ আশ্রয়ের সুবিধা করা—মানুষের এই জাতীয় চিন্তা প্রায়ই উদ্ভাবন-পর্য্যায়ের। ইহার মধ্যে অনুকরণ ও স্মরণের অতিরিক্ত যতটুকু পাওয়া যায় সমস্তই উদ্ভাবন। ইহার জন্য ঘটা করিয়া গবেষণাগার খুলিয়া আড়ম্বরের সহিত কার্য্যারম্ভ আবশ্যক হয় না; আপন হইতে স্বাভাবিক প্রণালীতেই ঘটিয়া যায়। এই সকল ছোট খাট বিষয় ছাড়াও কোনও শাস্ত্রানুশীলনে সত্যে উপনীত হওয়া—তাহাও উদ্ভাবন। ভৌগোলিক বা খাগোলিক আবিষ্কার—বৈজ্ঞানিক তথ্য—ইহাও উদ্ভাবন। ইহাদের কতকগুলির ক্ষেত্র মন, কতকগুলির ক্ষেত্র বহির্জগৎ। এমন অনেক সময় হয়, পূর্ব্ব হইতে কোনপ্রকার চিন্তা বা চেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও সম্মুখে আসিয়া গেল বলিয়াই বস্তুটি উদ্ভাবিত হইল। কলম্বস্ ভারত-বর্ষে আসিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এখানে মনের কার্য্য অন্যরকম। এখানে বস্তুর উপস্থিতিকে মানসিক উদ্ভাবন অনুসরণ করে। আগে বিষয়বস্তু, পরে মনের প্রতি-ক্রিয়া। তাহা হইলেও উদ্ভাবন উদ্ভাবনই। যেই মাত্র ইহা উদ্ভাবন বলিয়া জ্ঞান হইল, সেই মুহূর্ত্তেই ইহা স্মরণ হইতে পৃথক হইয়া গেল। মনের মধ্যে ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই পূর্ব্ব-সঞ্চিত স্মৃত পদার্থের উপাদান লইয়াই সম্পন্ন হইবে। মনের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আহৃত জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া স্মৃতি বলিয়া দিবে, ইহা ভারত-বর্ষ নহে, নূতন দেশ। তখনই বাহিরের উদ্ভাবন-ক্রিয়া ভিতরে স্বীকৃত হইয়া পাকাপাকি হইয়া গেল। উদ্ভাবিত বস্তু বা বিষয়টি যেমন নূতন,

উদ্ভাবন-ক্রিয়াও নূতন। মনের ভিতর পূর্ব্বলব্ধ উপাদানের সাহায্যে ইহা সৃষ্ট হয়, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মনের মধ্যে তাহার কোন ছাপ থাকে না। ভিতরে থাকিলেও গর্ভস্থ সন্তানের মত সে আত্মগোপন করিয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার মত শুভলগ্ন বুঝিয়া বাহির হইয়া আসে, তখনই তাহাকে জানিতে পারা যায় ও তখনই তাহার জন্ম হইল বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু সেই বুঝা ও জানাই হইল উদ্ভাবন। উদ্ভাবন সেই ভাবে জন্ম হওয়ারই নামান্তর-মাত্র।

নীরব নিবেদন

শ্রী----

প্রভু, ডেকেছি তোমারে মনের ক্ষোভেতে
　　আমার কথা তো শোন নাই।
প্রভু, খুঁজেছি তোমারে প্রাণের জ্বালায়
　　তবু প্রিয় তুমি আস নাই।

এসেছিনু বাছা আমি,
　　পাও নাই তুমি দেখিতে,
নয়ন তোমার অন্ধ যে ছিল
　　গলিত অশ্রু-রাশিতে!

ছুঁয়েছিনু আমি তোমা,
　　তুমি পার নাই জানিতে,
হৃদয় তোমার অসাড় যে ছিল
　　তব দুঃখের গ্লানিতে।

সদা কাছে থাকি আমি,
　　নাহি সজোরে ডাকার প্রয়োজন;
সদা শুনে থাকি আমি
　　শুধু তোমার নীরব নিবেদন।

———

উপদেশ

শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

পুরুষার্থ-সিদ্ধি জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই জ্ঞান-লাভের দুইটি উপায় আছে—স্বতঃ এবং পরতঃ। পর হইতে যে জ্ঞান-লাভ তাহার নাম উপদেশ। উপদেশ কত প্রকার হইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধে দর্শিত হইবে।

পর হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় সেই পর যে কেবলমাত্র প্রাণীই হইবে তাহা নহে, অপ্রাণীও হইতে পারে। দেখা যায় যে পুস্তকাদি হইতেও জ্ঞান প্রাপ্ত হয়; অতএব উহাও উপদেষ্টা। অনেক সময় জড় বাহ্যদ্রব্যের ক্রিয়াদি দর্শনেও বহুবিধ লৌকিক রহস্যের জ্ঞান হয়; মহাকবিদের গ্রন্থে বহু উপদেশ জড়-পদার্থের কার্য দেখিয়া ভাবিত হইয়াছে দেখা যায়, অতএব জড় পদার্থ হইতেও যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহা স্বীকার্য। যদিও এই জাতীয় স্থলে দর্শককেই বিচার করিতে হয়, তথাপি জ্ঞানের উদ্দীপনের জন্য বাহ্য বস্তুও কারণ হয় বলিয়া তাহারাও গৌণভাবে উপদেষ্টা—এইরূপ বলা যাইতে পারে। 'পর হইতে জ্ঞান-লাভ' রূপ লক্ষণটি জড়পদার্থেও সংগত হয় বলিয়া 'জড়কর্তৃক' উপদেশ উপদেশের একটি ভেদ স্বীকার্য।

মুখ্য উপদেশ প্রাণিকর্তৃক প্রদত্ত হয়। পশ্বাদি ও মনুষ্যরূপ দ্বিবিধ ভেদ ইহার হইতে পারে। পশ্বাদির ব্যবহার-দর্শনে বহুবিধ জাগতিক ব্যাপারের রহস্য জানা যায়, যেরূপ সারগ্রাহীর উদাহরণে 'হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতের জ্ঞানাহরণ যে পশু হইতে হইয়াছিল—তাহাও এই বিষয়ের প্রসিদ্ধতম উদাহরণ। এই জাতীয় উপদেশকেও গৌণ-উপদেশ বলা যাইতে পারে।

পুরুষান্তর হইতে শব্দ-সহায়ে যে জ্ঞানলাভ, তাহাই সাধারণতঃ উপদেশ-পদের [১] চির-প্রসিদ্ধ অর্থ। কেবলমাত্র শব্দ-সহায়েই যে স্ব-বোধ অন্যকে দেওয়া যায়, তাহা নহে, অন্য উপায়েও উহা পাওয়া যায়। পূর্বে ইহার এক প্রকার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে জড় ও পশ্বাদি হইতে, পরন্তু সচেতন মানবাদি হইতেও শব্দ-ব্যতীত উপদেশ হইতে পারে—তাহা পরে বিচার্য। আদৌ শব্দ-সহায়ে যে উপদেশ তাহা বিবৃত হইতেছে।

আগমমূলক উপদেশ—প্রত্যেক উপদেশেই বক্তা ও শ্রোতার কোনও রূপ সান্নিধ্য অত্যাবশ্যক। বক্তার প্রতি যে স্থলে শ্রোতার অবিচলিত নিষ্ঠা বিদ্যমান তথায় বক্তার উপদেশের প্রতি শ্রোতার যে অবিচারসিদ্ধ নিশ্চয় হয়—তাহাই অত্রত্য উদাহরণ। আগম='আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেন উপদিশ্যতে, শব্দাৎ তদর্থবিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ' (যোগভাষ্য, ১।৭)। সর্ব-প্রকারের চেতন-কর্তৃক উপদেশেই 'পরত্র স্ববোধসংক্রান্তি'-রূপ লক্ষণটি

১ যাস্ক-নিরুক্তের (১।২০) বাক্য হইতে উপদেশের মুখ্য অর্থ সাক্ষাৎভাবে জানা যায় অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃতধর্মার জ্ঞানকে অসাক্ষাৎকারিগণ সহসা অধিগত করিতে পারে না। ঋষিগণ এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকে যে ভাবে অসিদ্ধ শিষ্যকে বুঝান তাহাই উপদেশ।

বিদ্যমান, এইজন্য সমগ্র শাব্দিক উপদেশেরই ইহা মূল। ভ্রান্ত এবং অভ্রান্তভেদে এই উপদেশ দ্বিবিধ। উপদেশমূলক জ্ঞানে যে ভ্রান্তি হয় তাহার কারণ (১) বক্তার অশক্তি প্রভৃতি দোষ, (২) প্রতিপত্তিবন্ধ্যাদি দোষযুক্ত বাক্য বলা এবং (৩) শ্রোতৃ-কর্তৃক যথাযথভাবে বক্তার শব্দার্থের গ্রহণ না হওয়া। আগমমূলক উপদেশে যেরূপ বিচার সম্ভব নহে, তদ্রূপ সবিচার উপদেশও আছে, যেহেতু বিচাযমাণ এবং অবিচার্যমাণ-লক্ষণক বাক্য লোকে প্রসিদ্ধ আছে। কোটি-দ্বয়স্পৃগ্‌বিজ্ঞানং বিচারঃ।

শাব্দিক উপদেশের অন্যদৃষ্টিতে অন্যভাবে বিভাগ হইতে পারে। যথা, (১) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ উপদেষ্টা উপদেশন-কালেই শিষ্যকে সেই পদার্থের যথাসম্ভব সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন ; যথা, অগ্নি-বিষয়ক উপদেশকালে অগ্ন্যুৎপাদন করা। লোকে কার্যকর উপদেশসমূহের মধ্যে ইহা অত্যুত্তম ; (২) পরোক্ষ-উপদেশ অর্থাৎ যে স্থলে উপদেষ্টা পদার্থের গুণাদির বর্ণনা মাত্র করেন (মহাভাষ্য, ১।৩।২)। বক্তার সামর্থ্য-অনুসারে এই ভেদ করা হইয়াছে।

উপদেশ শিষ্য-সাপেক্ষ, অতএব শিষ্য-স্বভাবের ভিন্নতা হেতু উপদেশকরণেও [২] ভিন্নতা হইবে, যথা, (১) সংক্ষিপ্তভাবে অল্প-শব্দের দ্বারা উপদেশ, যথা বীজমন্ত্রাদি। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যাহার অর্থ ধারণা করিতে করিতে পুরুষার্থসিদ্ধি হইতে পারে ; (২) ব্যাখ্যানাত্মক উপদেশ, অর্থাৎ যে স্থলে বিস্তৃতভাবে বলা হয়। উপদেশ-পদ যে ব্যাখ্যানবাচী তাহা স্ফোটসিদ্ধির গোপালিকা টীকা হইতে জানা যায়। শিষ্য-হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়াই যে সূত্র-বৃত্তি-ভাষ্য-টীকা সহায়ে উপদেশ দেওয়া হইত তাহা স্বীকার্য। এস্থলে সূত্রগ্রন্থাদির দ্বারা তৎস্থশব্দোপদেশ বিবক্ষিত, গ্রন্থ নহে।

ইহা ব্যতীত অন্যভাবেও উপদেশ করা যাইতে পারে, যথা (১) শব্দ-প্রধান উপদেশ অর্থাৎ যে স্থলে আচার্য স্বমুখোচ্চারিত শব্দাবলী শিষ্যকে কণ্ঠস্থ করান। ইহা আগম নহে, যেহেতু 'শব্দ হইতে অর্থবিষয়া বৃত্তিকে আগম বলে, কিন্তু এই স্থলে শব্দেরই উপদেশ প্রধানতঃ হয়। এই বিষয়ে একটি সুন্দর ঋঙ্‌মন্ত্র আছে 'যদেষাম্ অন্যো অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ' (৭।১০৩।৫)—অর্থাৎ একটি ভেকের ধ্বনিকে যেরূপ অন্য ভেক অনুকরণ করে তদ্রূপ শিষ্য গুরুর বচনকে অনুকরণ করে। উপদেশের এই জাতীয় শব্দপ্রধান স্বরূপটি এখনও ভারতবর্ষে বহু সংস্কৃত বিদ্যাকেন্দ্রে দেখা যায়। পরবর্তী কালে বেদের অর্থজ্ঞানের প্রশংসাপর বহু বচন যাস্কাদিকর্তৃক ভাষিত হওয়ায় এইরূপ স্পষ্ট অনুমান হয় যে অর্থশূন্য শব্দপ্রধান উপদেশ-রূপ একজাতীয় উপদেশ অস্মদ্দেশে বিদ্যমান ছিল। (২) অর্থ-প্রধান উপদেশ, আগমমূলক উপদেশ ও স-বিচার উপদেশ এই উপদেশের একটি অংশ তাহা বলা বাহুল্য। এই জাতীয় উপদেশের অন্যদিক্ দিয়া আমরা ভাগ করিতেছি। যথা—(ক) প্রবচনাত্মক উপদেশ, (খ) সংস্কারপূর্বক উপদেশ, (গ) অধিগম-পূর্বক উপদেশ।

বিকশিত বাগিন্দ্রিয়-যুক্ত মানবকর্তৃক যে শাব্দিক উপদেশ তাহার ভেদ দর্শিত হইল। কিন্তু ক্বচিৎ অশব্দের দ্বারাও উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। অশব্দ=(ক) শব্দ গ্রহণ না করিয়া এবং (খ) শব্দব্যতীত অন্য পদার্থ গ্রহণ

২ শিষ্য নানাজাতীয় হইতে পারে, যথা—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞাননিষ্ঠ, উপেক্ষক, অভক্ত, অনিচ্ছ, বিদ্বেষী ইত্যাদি। অনুকূল এবং প্রতিকূল—এইরূপও দ্বিবিধ শিষ্য হয়। শিষ্যের চরিত্র-অনুসারে যে উপদেশেরও ভেদ হয়, তাহা আর্যশাস্ত্রজ্ঞগণ জানেন। 'দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা'—ইহা এই বিষয়ের প্রামাণিক বাক্য।

করিয়া। শব্দের সহায়তা না লইয়াও যে উপদেশ করা হয় তাহা দার্শনিকগণ জানেন, যথা—'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ' (দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্রম্)। এমন কি বহু লোকব্যবহারেও শব্দ ব্যবহার না করিয়াও স্বীয় মনোভাব জ্ঞান জ্ঞাপিত করা যায়, যথা—মৌনধারণের দ্বারা স্বীয় সম্মতি প্রকটিত করা হয়। তাই উক্তিও আছে "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্"।

শব্দব্যতীত অন্যজাতীয় পদার্থের দ্বারাও চেতন-কর্তৃক উপদেশ করা হইয়া থাকে, যথা—(১) দৃষ্টিশক্তির দ্বারা অর্থাৎ যোগসিদ্ধ মহাত্মগণ দৃষ্টির দ্বারাও শিষ্যকে জ্ঞান দিতে পারেন, শ্রীরামকৃষ্ণাদি ইহার উদাহরণ; (২) স্পর্শের দ্বারা, অর্থাৎ শিষ্যশরীরকে স্পর্শ করিয়া স্বজ্ঞানের সঞ্চার করা, (৩) হস্তাদি চালনের দ্বারাও স্বীয় বোধ অপরকে জানান যায়। ইহা সব উপদেশেরই প্রকার-ভেদ মাত্র, যেহেতু 'পর হইতে জ্ঞান লাভ' রূপ লক্ষণটি এস্থলেও চরিতার্থ। অতএব শব্দের দ্বারা উপদেশ করা হয় ইহা অপবাদ মুখ্য নিয়ম জানিতে হইবে।

উপদেষ্টার ভিন্নতায় উপদেশেরও তারতম্য হইবে, অতএব উহা বিবৃত হইতেছে—(১) নিরপেক্ষ উপদেশ—অর্থাৎ যেস্থলে কেন যে উপদেশ করা হইল তাহা জানা যায় না, ইহার বিশদতম উদাহরণ কাশ্মীরী শৈবাদ্বৈতবাদিগণের শক্তিপাত। পরশিবের যে শক্তিপাত, তাহার কোনও কারণ নাই, তাই আচার্যগণ ইহাকে 'নিরপেক্ষ' বলিয়াছেন (শক্তিপাত অর্থাৎ উপদেশমাত্র যাহা অবশ্য স্বীকরণীয়); (২) সাপেক্ষ উপদেশ—অন্তর্দৃষ্টিমান্ গুরু যেস্থলে অধিকারীর অনুরূপ উপদেশ করেন, যথা—গঙ্গায় স্নানকারী 'ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ'—ইহা সম্যক্ সত্য নহে, তথাপি ইহার দ্বারাও উপযুক্ত শিষ্যের যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে; কর্মসঙ্গী জনগণকে বুদ্ধিভেদ না করাইয়া যে অপূর্ণ সত্যের উপদেশ করা হয় তাহাই এই স্থলের উদাহরণ। অধিকাংশ বিধি-নিষেধমূলক উপদেশই ইহার অন্তর্গত। (৩) অদৃশ্য উপদেশ—যেস্থলে আচার্যের শরীর দৃষ্ট হয় না, ইহা ত্রিবিধ যথা—(ক) শিষ্যের অজ্ঞাতসারে যখন কোনও মহাপুরুষ কৃপা করিয়া তাহার জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন করেন, (খ) যেস্থলে নির্মাণকায় বা নির্মাণচিত্তকে আশ্রয় করিয়া মহাযোগী করুণাপূর্বক উপদেশ করেন, ইহার মধ্যে নির্মাণকায় দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু কেবল নির্মাণচিত্ত দর্শনীয় নহে—ইহাকেই আকাশবাণী বলা যায়। ইহাই প্রধান 'অদৃশ্য উপদেশ'। (গ) ভগবানের জ্ঞানধর্ম প্রকাশ (যোগভাষ্য, ১।২৫)—এই উপদেশ ঐশ্বর্য-নিয়মনের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই হয়, ঈশ্বরকে দৃশ্য হইয়া ইহা করিতে হয় না। (৪) তাত্ত্বিক উপদেশ—যেস্থলে শিষ্যধীকে লক্ষ্য না করিয়া 'প্রকৃতসত্য উপদেশ' বলা হয়। সাধারণতঃ উপদেশ অল্পদেশাশ্রয়ী সমাজবন্ধন-রক্ষার্থ কল্পিত ও শিষ্যবুদ্ধির ক্ষমতা-অনুযায়ী ভাষিত হয়। এতদতিরিক্ত যে প্রকৃত তাত্ত্বিক উপদেশ উপদেষ্টা দেন তাহাই এস্থলের উদাহরণ। (৫) কার্যকর উপদেশ—যথা যোগসিদ্ধের বিনেয় শিষ্যের প্রতি উপদেশ, ইহা অমোঘ; অব্রহ্মচারীর উপদেশ অস্ফুট ও কার্যকর হয় না। অন্যান্য ভেদও কল্পিত হইতে পারে। পূর্বে শিষ্য-সাপেক্ষ উপদেশেরও উদাহরণ দত্ত হইয়াছে, যদিও প্রত্যেক উপদেশই আচার্য-প্রধান। অবশ্য শিষ্য-প্রধান উপদেশও আছে—অর্থাৎ যেস্থলে শিষ্য আচার্য-বিষয়ক স্মৃতিমাত্রকে অবলম্বনপূর্বক তদ্‌গতচিত্ত হইয়া পুরুষার্থ সিদ্ধি করে। এতাদৃশ জ্ঞান লাভেও আচার্যের অপেক্ষা আছে, তাই ইহাও উপদেশ। ইহার সর্বজনমান্য উদাহরণ একলব্য।

মা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

স্নেহময়ী তুমি মাতা, আমি শিশু অবোধ সন্তান,
তবু মোরে ভালবাস, এযে তব কৃপা অহেতুকী !
আমার মঙ্গল লাগি' উচ্ছলিত তব আর্দ্র প্রাণ,
আমি তোমা' নাহি চাহি, চিত মম নিয়ত উন্মুখী !

বিপুল হৃদয়ে তব মোর তরে ব্যাকুলতা কত,
কত ব্যথা জাগে তব, আমি তা'র না রাখি সন্ধান !
দুষ্কৃত অধম আমি, কলুষিত, সদা পাপব্রত,
কর্ণে মোর নাহি বাজে স্নেহাকুল তোমার আহ্বান !

তোমারে মা, পরিহরি' যত দূরে যাই আমি চলি,
ভুলে যাই তব ব্যগ্র-নয়নের গভীর-চাহনি,
স্নেহের শাসন তব যত আমি দৃপ্ত-পদে দলি,
তবু ত' রহ না দূরে—ভোল নাকো আমারে জননি !

তুমি মোরে রাখ' বক্ষে, ধর অঙ্কে, বাঁধ মমতায়,
আমারে জানাতে চাও, তুমি মোর আছ এ জগতে ;
তুমি ছাড়া কেহ নাহি, নাহি অন্য শরণ-উপায়,
আছ মোর সাথে সাথে, আছ মোর জীবনের পথে !

অতৃপ্ত সন্তান আমি, কাঁদি আমি দারুণ ক্ষুধায়,
তোমার বক্ষের স্তন্য তাই ঢালো বিশুষ্ক অধরে ;
তোমার স্নেহের দানে, করুণার অশ্রান্ত ধারায়,
ভ'রে দিতে মোর প্রাণ দিবানিশি জাগিছ শিয়রে !

অব্যক্ত অনন্ত তুমি, তুমি মাতা ভুবন-অতীতা,
সন্তানের স্নেহ-ডোরে তবু চির রয়েছ বন্দিনী !
করুণায় ঘন হ'য়ে এলে কাছে নিত্য পরিচিতা,
তুমি নিত্যা, জগন্ময়ী, জগন্মূর্ত্তি, জগৎ-রূপিণী !

ধরিয়া গগন-রূপ বিরাজিছ অন্তরে বাহিরে,
বাতাসের-রূপে আছ দিয়া প্রাণ নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
আলোকের রূপে তুমি দেখাইছ এই পৃথিবীরে,
রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে স্নেহ তব হৃদয়ে উল্লাসে !

থাকি দুঃখে, থাকি কষ্টে, যদি আমি ব্যথার জ্বালায়,
জন্ম মৃত্যু-ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরে মরি তোমার ভুবনে !
তোমার প্রাণের স্নেহ মোর মাঝে কভু না হারায়,
আছি তব পক্ষ-পুট-সমাবৃত জীবনে জীবনে !

যে পথেই চলি আমি জগতের বিপথে কুপথে,
তোমারি সকাশে চলি, চলি আমি মুক্তির মন্দিরে !
অতীতের দ্বার খুলি' বর্ত্তমান হ'তে ভবিষ্যতে—
মাতৃপক্ষ-পদ্ম-শিশু চলি আমি মাতৃবক্ষে ফিরে !

ভারত-শিল্প

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

রাজপুতানা-স্থাপত্য

চিতোর পাহাড়ের উপর স্থাপিত মোকালজির মন্দির ভাস্কর্য্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। একাদশ শতাব্দীতে উহা নির্ম্মিত এবং মোকালজির শাসনের সময় (১৪২৮-৩৮) ইহার সংস্কার সাধিত হয়। স্তম্ভের গাত্রে যে ১৬টি রিলিফ মূর্ত্তি আছে, এগুলিতে বিশেষ উন্নত ভাস্কর্য নাই।

যোধপুরের প্রাচীন শহর ওসিয়াতে (৮ম-৯ম শতাব্দী) ১২টি মন্দির আছে। একটি মন্দিরে (৮ম-৯ম শতাব্দী) কুবেরের মূর্ত্তি বিদ্যমান; ভাল কাজ। এখানে সূর্য্যের একটি শিখরমন্দিরও আছে। সামনে স্তম্ভওয়ালা অলিন্দ; মন্দিরটি ছোট হইলেও বেশ সুদৃশ্য।

চিতোরের জয়স্তম্ভ বিখ্যাত। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাণাকুম্ভ ইহা (১৪৪০-১৪৪৮ খৃঃ) স্থাপন করেন। ইহা ১২০ ফুট উচ্চ এবং ৯ তলা। তলা হইতে চূড়া পর্য্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পূর্ণ। স্তম্ভটি "হিন্দু পুরাণের চিত্রিত অভিধান" বলিয়া বর্ণিত।

জৈন-স্থাপত্য (১১শ-১৫শ শতাব্দী)

জৈনস্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আবুপর্ব্বত, সাদরি (উদয়পুর), গোয়ালিয়র, আরাবল্লী পর্ব্বত,

শত্রুঞ্জয় ও গির্নার পর্ব্বত (গুজরাট), শ্রাবণবেল-গোলা (মহীশূর) প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

আবুপর্ব্বতের • দিলওয়ারা জৈনমন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। দক্ষিণ রাজপুতানায় ৪০০০ ফুট উচ্চ আবুপর্ব্বতে অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী দিলওয়ারা গ্রামের নাম হইতে মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। চারিটি মন্দির আছে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিমলসা-নির্ম্মিত আদিনাথ মন্দির (১০৩২) এবং তেজপাল-নির্ম্মিত নেমিনাথ মন্দির (১২৩২)। ইহা আগাগোড়া সাদা মার্ব্বেলে তৈরী। মণ্ডপের স্তম্ভ, দ্বারপথ, কুলুঙ্গি এবং ছাদ (ভিতরের দিক) অশেষ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে শোভিত। ভারতের কোথাও এমন সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য নাই ; ছাদ হইতে ফুল লতাপাতা ঝালরের মত ঝুলিতেছে। একজন লেখক বলিয়াছেন "Some of the designs are veritable dreams of beauty." এইরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাকি হাতুড়ি বাটালির দ্বারা সম্ভব নহে। জনশ্রুতি যে, মার্ব্বেল চাঁছিয়া করা হইয়াছে, এবং কারিগরগণ যে যত মার্ব্বেল-ধূলিকণা উৎপন্ন করিতে পারিয়াছে, সেই অনুসারে মজুরি পাইয়াছে।

সকল জৈন মন্দিরে জিনদের মূর্ত্তি বাঁধা ফরমূলা-অনুসারে তৈরী, তাহা ভয়ানক সরলী-কৃত। সকল জিনমূর্ত্তিই এক ছাঁচে গড়া, শিল্পীর এই অবস্থায় মৌলিক কিছু করা সম্ভব হয় নাই।

জৈনতীর্থ-সমূহ যেন এক একটি মন্দির-নগর। বহু শত মন্দির লইয়া একটি মন্দির-নগর গঠিত হইয়াছে। গুজরাটের গিরনার পর্ব্বতে এবং কাথিওয়াড়ের পালিতানে বা মৃত্যুঞ্জয় পর্ব্বতে এরূপ মন্দিরনগর আছে। এগারটি বেষ্টনীতে ৫০০ শতের উপরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি ১১শ শতাব্দীর এবং অধিকাংশই ১৫শ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কালের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

গুজরাটে অনেক বিখ্যাত প্রাচীন হিন্দু ও জৈন মন্দির ছিল, উহাদের অধিকাংশ মুসলমান-দের হস্তে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে গুজরাটের মুসলমান নৃপতিগণ নিজেদের প্রয়োজন-অনুযায়ী হিন্দু কারিগর দ্বারা মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ; এইজন্য আমেদাবাদের বহু মসজিদ হিন্দু-স্থাপত্যের পরিচয় দেয়।

দশম শতাব্দীতে সোলাঙ্কি চালুক্য বংশ প্রবল হয়। উত্তর গুজরাটে, যেখানে বর্ত্তমানে পাটন অবস্থিত, সেখানে প্রাচীন রাজধানী অনহিল-পাঠক বা অনহিলবার ছিল। সোলাঙ্কি চালুক্য-বংশের পরাক্রান্ত রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ (১০৯৩-১১৪৩) সিদ্ধপুরনগর স্থাপন করেন। তিনি অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধপুরে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির এখনো আছে। পাটনের ইতিহাস-বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ; ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ গজনি কর্ত্তৃক ইহার ধ্বংস সাধিত হয়। রাজা কুমারপাল (১১৪৩-১১৭৪) ইহার পুনর্গঠন করেন। ইহা আবার মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মসজিদে পরিণত হয়। গুজরাটের সোলাঙ্কি চালুক্যদের মন্দির প্রাদেশিক চালুক্য বা বেসর রীতি-অনুযায়ী।

বস্তুপাল ও তেজপাল গুজরাটের চালুক্য রাজার দুই মন্ত্রী। তাঁহারা শত্রুঞ্জয়, গির্নার এবং আবুপর্ব্বতের জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-ভারতের জৈনধর্ম্মের কেন্দ্র মহীশূরের শ্রাবণ-বেলগোলা। সেখানে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়ান গোমতেশ্বর পাথরের মূর্ত্তি বিখ্যাত, ৫৭ ফুট উচ্চ, ভূমির উপর দাঁড়ান মূর্ত্তির অন্যতম। ইহা ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে চামুণ্ডারাজ কর্ত্তৃক খোদিত। চামুণ্ডারাজ মহীশূরের পাশ্চাত্য গঙ্গবংশীয় নৃপতির মন্ত্রী ছিলেন। গোমতেশ্বর প্রথম তীর্থঙ্করের

পুত্র, তিনি রাজত্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। উহা "কায়োৎসর্গ" অনুষ্ঠানকালীন মূর্ত্তি, পায়ের কাছে সাপ রহিয়াছে, উরু অবধি উইয়ের ঢিবি উঠিয়াছে এবং কাঁধ অবধি লতা উঠিয়াছে। শ্রাবণ-বেলগোলাতে "বস্তি" নামক কতকগুলি জৈন মন্দিরে ভাস্কর্য্যশোভিত জিনমূর্ত্তি আছে। এগুলি চোল-দ্রাবিড় রীতি-অনুযায়ী, নির্ম্মাণকাল ১১-১২শ শতাব্দী। শ্রাবণবেলগোলাতে বহু প্রাচীন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বহু জৈন তীর্থযাত্রীর আগমন হইয়া থাকে। জনশ্রুতি যে, মৌর্য্যবংশের স্থাপয়িতা চন্দ্রগুপ্ত শেষ বয়সে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং শ্রাবণ-বেলগোলাতে দেহত্যাগ করেন।

গোয়ালিয়রের আরাবল্লী পর্ব্বতগাত্রে তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি খোদিত আছে (১৫শ শতাব্দী); পর্ব্বতে কোন গুহামন্দির খোদিত হয় নাই। পর্ব্বতগাত্রে কুলুঙ্গি খুদিয়া তাহার মধ্যে তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি করা হইয়াছে। বিরাটাকার মূর্ত্তি আছে, একটি মূর্ত্তির উচ্চতা ৫৭ ফুট।

কাশ্মীর-স্থাপত্য

কাশ্মীর স্থাপত্যের একটু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যস্থানের সঙ্গে মিলে না। এই রীতিতে নির্ম্মিত মন্দিরের বিভিন্ন নমুনা ৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে হইয়াছে। কাশ্মীরী রীতির সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত মন্দির হইল অষ্টম শতাব্দীর মার্ত্তণ্ড মন্দির; স্থাপয়িতা কাশ্মীরের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী নৃপতি ললিতাদিত্য (৭২৪-৬০)। ইহা সূর্য্য-মন্দির ছিল, মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট, প্রস্থ ৩৮ ফুট। ইহা আয়ত, উত্তর ভারতের হিন্দু মন্দিরের মত চতুষ্ক নহে। মন্দিরের বাহিরের দেয়াল ২২০×১৪২ ফুট। মন্দিরের পিরামিডাকৃতি ছাদ ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য দরজার উপর ত্রিকোণাকৃতি গাথুনি (পেডিমেণ্ট) এবং গ্রীক ডোরিক অথবা আইওনিক রীতি-অনুযায়ী স্তম্ভ। মালোটে এই ধরনের মন্দির আছে। গান্ধার হইতে এই গ্রীক প্রভাব আসিয়াছে। চম্বা এবং কুলুতে এই ধরনের কাঠের মন্দির দেখা যায়।

কাথিওয়াড়ে গোপ নামক স্থানে কাশ্মীরী রীতির মন্দির আছে, নির্ম্মাণকাল ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দী।

হোয়সল মন্দির (১১শ-১৩শ শতাব্দী)

হোয়সল বংশের নৃপতিগণ মহীশূর একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। দোরসমুদ্রে তাঁহাদের রাজধানী ছিল, দোরসমুদ্র আধুনিক হলেবীদ। তাঁহাদের নির্ম্মিত হলে-বীদের হোয়সলেশ্বর মন্দির (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং বেলুরের মন্দির (দ্বাদশ শতাব্দী) প্রসিদ্ধ।

মহীশূরের মন্দিরসকল, উত্তর ভারতের নাগর বা শিখর মন্দির ও দক্ষিণের দ্রাবিড় (পল্লব, চোল) পদ্ধতির মধ্যবর্ত্তী। ফার্গুসন মহীশূর এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দির-সকলকে চালুক্যরীতি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের পরিভাষায় ইহা "বেসররীতি"। হলেবীদ এবং বেলুরের মন্দির এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই রীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে; মন্দির অনুচ্চ ও বিস্তৃত; ভিত্তি বহুকোণিক ও তারকাকৃতি, একটি হলকে ঘিরিয়া তিনটি মন্দিরের অবস্থিতি, পিরামিডাকৃতি চূড়া, ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র চূড়া পর্য্যন্ত কতগুলি বেষ্টনী দ্বারা বেষ্টিত। দ্রাবিড় চূড়া থাকে থাকে উঠিয়া গিয়াছে বহুতল অট্টালিকার মত। মন্দিরের সু-উচ্চ ভিত্তি আলঙ্কারিক মূর্ত্তিতে পূর্ণ। জানালা একখণ্ড পাথর বিদীর্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

হোয়সলেশ্বর মন্দির অসমাপ্ত রহিয়াছে।

অনেক মহীশূর-মন্দিরে একটা নূতনত্ব আছে, অনেক মূর্তির গায়ে, শিল্পীর নাম খোদাই করা আছে। বেলুরে ১২ জন শিল্পীর স্বাক্ষর আছে, হোয়সলেশ্বর মন্দিরে ১৪টি নাম দেখা যায়। মহীশূরের এক মন্দিরে (১৩শ শতাব্দী) ৮ জন শিল্পীর নাম লিখিত, তাঁহাদের মধ্যে মল্লিতাম্মা ৪০টি মূর্তি করিয়াছেন।

হোয়সলেশ্বর শৈব মন্দির—উচ্চ ভিত্তি বহু পরিশ্রম এবং ধৈর্য্যসাধ্য ভাস্কর্য্যে পূর্ণ। ভিত্তি-গাত্রে একটুও ফাঁক নাই, সমস্ত জমকালো অলঙ্করণে পূর্ণ, কোথাও চক্ষু বিশ্রাম পায় না। ফার্গুসন ইহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, "মন্দির ৫।৬ ফুট উচ্চ চাতালের উপর স্থাপিত; ইহার উপরে মন্দিরের ভিত্তিতে হাতীর ফ্রিজ, ৭১০ ফুট লম্বা, ২০০০ হাজার হাতীর সারি আছে। নানাপ্রকার সাজে হাতী সজ্জিত, অনেক হাতীর আরোহী দেখা যায়, ইহার উপর শার্দূলের সারি এবং নানাপ্রকার আলঙ্কারিক কার্য্য, তাহার উপর অশ্ব-শ্রেণী। রামায়ণের রিলিফ আছে, ইহার দৈর্ঘ্য হইবে ৭০০ ফুট (গ্রীসের পার্থিনন ফ্রিজের দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট।"

এই মন্দিরে আলঙ্কারিক পশুপক্ষী এবং নরনারীর মূর্তি দৃষ্ট হয়। চালুক্যরীতি অনুযায়ী জানালা, সমগ্র পাথর খুদিয়া বাহির করা।

চালুক্য ভাস্কর্য্য—আলঙ্কারিক ভাস্কর্য্যে চালুক্য শিল্পী পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও বিশুদ্ধ ভাস্কর্য্যে তাহারা উন্নত শ্রেণীর কার্য্য করে নাই; কাজগুলি মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক। মূর্তি 'হাইরিলিফ,' ভূষণে পূর্ণ এবং গভীর ভাবে কর্তিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী অখিলানন্দজী—প্রভিডেন্স এবং বোষ্টন (আমেরিকা) বেদান্ত সমিতিদ্বয়ের অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী দুই জন আমেরিকান ভক্ত-মহিলাসহ গত ২২শে অগ্রহায়ণ বম্বে আগমন করিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণ বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। ১৯৩৭ সনে তিনি একবার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। স্বামী অখিলানন্দজী কিছু কাল ভারতে অবস্থান করিবেন। তিনি সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর যাবৎ বিশেষ কৃতিত্ব সহকারে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীয় ভক্ত-মহিলাদ্বয়কে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি।

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রচার ও সেবাকার্য—গত এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবনির্মিত-মন্দিরসংলগ্ন প্রশস্ত প্রার্থনাগৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ তথা বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি স্বামী ওঁকারানন্দজী ভক্তজন-সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও উহার গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করিয়াছেন এবং পরে মাসাধিক কাল তিনি মূল শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ প্রাঞ্জল ভাষায় সকলের নিকট ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষার জন্য প্রায় ছয় মাস নিয়মিত ভাবে আশ্রমে শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছেন এবং স্থানীয় বিভিন্ন কলেজের সমাগত অধ্যাপক-বৃন্দ ও ভক্তগণের সঙ্গে নানা বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া অনেক জটিল প্রশ্নেরও সমাধান করিয়াছেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীও হিন্দী ভাষাভাষিগণের বোধসৌকর্যার্থ হিন্দী ভাষায় বেদান্তশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা করিয়া বেদান্তের গভীর তাৎপর্য সকলকে সম্যকরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের জন্মতিথি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তী উৎসব প্রভৃতি আশ্রমে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আশ্রমের অন্যান্য জনহিতকর কার্যাদি, যথা—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ ও শল্য-চিকিৎসা বিভাগ (Surgical Department), অবৈতনিক স্কুল, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি নিয়মিত ভাবে পূর্ববৎ পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত দুঃস্থ শরণার্থিগণের সেবাকার্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-ক্রমে পাটনা আশ্রমের পক্ষ হইতে বিহিটা (Bihta) ও মোকামায় (Mokameh) সুচারুরূপে বিগত মে মাস হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। উভয় স্থানেই দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী, শিশু, বালক-বালিকার চিকিৎসা ও পথ্যাদি বিতরণের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। শরণার্থিবৃন্দের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য উভয় কেন্দ্রেই গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। বিহিটা-কেন্দ্রে সেবারত সন্ন্যাসিগণের সম্যক প্রচেষ্টায় "শ্রীরামকৃষ্ণ বালকবালিকা বিদ্যালয়" নামে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে শতাধিক বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব-প্রচারোদ্দেশ্যে নিয়মিত ভাবে, শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন, ভজন ও ধর্মগ্রন্থাবলম্বনে বক্তৃতা ও আলোচনাদিরও সুব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকন্তু, মোকামা-কেন্দ্রে বিহার গভর্নমেণ্ট-প্রদত্ত দুগ্ধবিতরণের সমগ্র ভার আশ্রম-কর্তৃপক্ষ সাদরে গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিতেছেন। সম্প্রতি বিহিটা-কেন্দ্রের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মোকামা-কেন্দ্রে শরণার্থিগণের সেবাকার্য এখনও পাটনা আশ্রম হইতে পূর্ণোদ্যমে পরিচালিত হইতেছে। এবম্বিধ বিবিধ জনহিতকর কার্যানুষ্ঠানের ফলে পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম জাতিধর্মনির্বিশেষে সাধারণের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ১৯৪৯ সনের কার্য-বিবরণী—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৯ সনের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। ইহার সেবাকর্ম প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত: (১) চিকিৎসা, (২) শিক্ষা ও (৩) প্রচার।

(১) চিকিৎসা-বিভাগ— এই বিভাগের অন্তর্গত দাতব্য ঔষধালয়ে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। শহরের এবং বহুদূরবর্তী পল্লীসমূহের দুঃস্থ ও নিঃস্ব নরনারীগণ এই দাতব্য ঔষধালয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়া থাকেন। আলোচ্যমান বর্ষে মোট ১২৮৯২ জন নরনারী ঔষধ পাইয়াছেন—তন্মধ্যে নূতন ৫১১১, পুরাতন ৭৭৮১ জন। আশ্রম-পরিচালিত মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ডাঃ শ্রীরাজমোহন সেন, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ডাঃ শ্রীহেরম্বকুমার বসু বিনা পারিশ্রমিকে কার্যপরিচালনা করিয়াছেন; তজ্জন্য আশ্রম-

কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এই মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ১৫৩৬ জন প্রসূতিকে বাড়ীতে গিয়া পরিদর্শন করা এবং ৪৩ জনকে বিনা পারিশ্রমিকে প্রসব করান হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১০২টি শিশু এবং ১৫৭ জন জননী কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১০২৭২ জন শিশু ও মাতাকে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজন শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকার বেতন বহন করিতেছেন। ডাঃ শ্রীসুধীরকুমার বসু ও ডাঃ শ্রীধীরাজমোহন সেন মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এক জন অভিজ্ঞা মহিলা স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা ও দুই জন শিক্ষাপ্রাপ্তা ধাত্রী এই বিভাগের কার্যাদি পরিচালন করেন। চিকিৎসকগণ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না; এক জন ধাত্রীর আংশিক বেতন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি হইতে পাওয়া যায়। সরকারী জনস্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান পরিচালকের অর্থানুকূল্যে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মাতৃ ও শিশুমঙ্গল বিভাগের বিশেষ সাহায্য এবং বঙ্গীয় রেড্ক্রশ সোসাইটি দুগ্ধ সরবরাহ করেন। চিকিৎসা-বিভাগ দুইটির যাবতীয় কার্য ডাঃ শ্রীঅবনীধর গুহ নিয়োগী মহাশয়ের পরিদর্শনাধীনে পরিচালিত হয়। ভারতীয় রেড্ক্রশ সোসাইটির সহযোগিতায় আশ্রমের দুগ্ধকেন্দ্র হইতে মোট ১০৩৮০ জনকে ৩৭২ পাউণ্ড গুঁড়া দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে।

(২) শিক্ষাবিভাগ—আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় পরিকল্পনা আংশিক ভাবে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। আলোচ্যমান বর্ষে মোট দশ জন বিদ্যার্থী ছাত্রাবাসে ছিল—তন্মধ্যে ৩ জন ইণ্টারমিডিয়েট এবং ২ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আশ্রমের হরিজন বিদ্যালয়ে সমাজের তথাকথিত অনুন্নত বালকগণের শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠনের চেষ্টা করা হয়। আশ্রমের গ্রন্থাগারে মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, সাহিত্য-সম্বন্ধীয় মোট ১২৮৮ খানা পুস্তক আছে। আলোচ্যমান বর্ষে ৮৩৪ খানা পুস্তক পাঠের জন্য বাড়ীতে দেওয়া হইয়াছিল। পাঠাগারে ৭ খানা মাসিক, ১ খানা দৈনিক ও ৩ খানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে।

(৩) প্রচারবিভাগ—আশ্রমের উপাসনা-মন্দিরে ধর্মার্থিমাত্রই ধ্যান-ভজন করিবার সুযোগ পান। ধর্মের মূলতত্ত্বসমূহ প্রচারের নিমিত্ত আশ্রম বিভিন্ন স্থানে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আলোচ্যমান বর্ষে ধর্ম-সম্বন্ধে ১২টি বক্তৃতা এবং ২৪টি আলোচনা-সভা হইয়াছে।

আলোচ্যমান বর্ষে এই প্রতিষ্ঠানের আয় ছিল ২২৫৬৬৸৶১০ এবং ব্যয় ২২৬১৯৷৷৫; এই বৎসর আয়ের অতিরিক্ত ৫৩৲১৫ ব্যয় হইয়াছে।

একটি পাকা উপাসনামন্দির, ছাত্রাবাসের নূতন গৃহ, নূতন গ্রন্থাগার, আশ্রমিকগণের বাসোপযোগী গৃহাদির অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। অভাব-দূরীকরণার্থ আশ্রমকর্তৃপক্ষ আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্যের জন্য সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগ—গত ১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি দেড়টার সময় শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে তদীয় আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় এক পক্ষকাল তিনি মূত্রাশয়ের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। মৃত্যুর পর পঞ্চম দিনে তাঁহার নশ্বর দেহ আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, চারদিন যাবৎ তাঁহার দেহে কোন পচন-লক্ষণ বা বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই। পঞ্চম দিনে পচন-লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় দেহ সমাহিত করা হয়। ইতোমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সহস্র সহস্র অনুরাগী ভক্ত পণ্ডিচেরী গমন করিয়া মৃতদেহ দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই মনীষীর অবদান অপরিসীম। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তিনি কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ, আই-এম্-এস্ খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। কৃষ্ণধন পুণ্যশ্লোক রাজনারায়ণ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। বাল্যকালে দার্জিলিং সেণ্ট পল্স্ স্কুলে অধ্যয়নের পর সাত বৎসর বয়সে বালক অরবিন্দ ইংলণ্ডে যাইয়া ক্যাম্ব্রিজ কিংস্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি আই-সি-এস্ প্রতিযোগিতার জন্য পরীক্ষা দান করেন। সকল বিষয়ে কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হইয়াও শুধু অশ্বারোহণ-পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিতে পারেন নাই।

১৮৯৩ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া বরোদা রাজসরকারের নানা বিভাগে কার্য্য করেন। এই সময়ে ইংরেজ সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ভূপাল বসুর কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। তাঁহার পত্নী আধ্যাত্মিক-ভাবসম্পন্না ছিলেন : তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং কিছুকাল বাগবাজার ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সংলগ্ন 'মাতৃমন্দিরে' অবস্থানও করেন। শ্রীঅরবিন্দও পণ্ডিচেরী যাইবার পূর্ব্বে বাগবাজার 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সনে তাঁহার পত্নী মৃণালিনী পরলোকগমন করেন।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ প্লাবনের সময়ে স্বদেশ-প্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া ইহাতে মহোদ্যমে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ইহার কিছুকাল পরেই ১৯০৮ খৃঃ বাংলার বিপ্লবপন্থী দলের নেতারূপে তিনি আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন। পরলোকগত ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কারাকক্ষে অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দ অনন্যচিত্তে গীতাধ্যয়ন এবং যোগাভ্যাস করিতেন। বরোদায় অবস্থিতি-কালে আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইলেও আলিপুর কারাগারে উহা বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। বোমার মামলায় অভিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি ইংরেজীতে দৈনিক পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্' বাহির করেন। তাঁহার উদ্দীপনাময় প্রবন্ধসকল পাঠ

করিয়া বাংলার তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশের স্বাধীনতা-লাভের জন্য আত্মবলিদানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকায় রাজনীতি ব্যতীত অনেক আধ্যাত্মিক প্রবন্ধও প্রকাশিত হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের অসামান্য ব্যুৎপত্তি এবং তাঁহার অপূর্ব্ব লিখনভঙ্গী তদানীন্তন শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি ইংরেজীতে সাপ্তাহিক 'কর্ম্মযোগিন্' এবং বাংলায় সাপ্তাহিক 'ধর্ম্ম' নামক পত্রিকা বাহির করেন। এই দুইটি পত্রিকাতে শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিকতা, জাতীয়তা, ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বহু সারগর্ভ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে পুনঃ গ্রেপ্তার করিবেন জানিতে পারিয়া তিনি কলিকাতা হইতে গোপনে ফরাসী-অধিকৃত চন্দন-নগর গমন করেন এবং তথা হইতে ১৯১০ খৃঃ ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে উপনীত হন। ইহাই তাঁহার বাংলা দেশ হইতে শেষ বিদায়। খ্যাতনামা লেখক শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী বাংলার বিপ্লবপন্থীদের সুযোগ্য নেতা শ্রীঅরবিন্দের গৌরবোজ্জ্বল জীবনের এই অধ্যায়ের সবিস্তর ইতিহাস 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিক ভাবে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন।

পণ্ডিচেরীতে অবস্থানের প্রথম ভাগে শ্রীঅরবিন্দ ফরাসীদেশীয় পল রিচার্ড এবং তাঁহার পত্নী মীরা রিচার্ডের সহযোগিতায় 'আর্য্য' নামে দর্শন ও সংস্কৃতি-বিষয়ক একটি ইংরেজী পত্র বাহির করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার বহু দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উপরোক্ত মহিলা বর্ত্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিনেত্রী-পদে অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি আশ্রমবাসী ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর নিকট 'মাদার' (Mother) বলিয়া খ্যাত। পণ্ডিচেরীতে অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় নির্জন কক্ষে কালযাপন করিতেন। তিনি সাধারণতঃ লোকসমক্ষে বাহির হইতেন না এবং অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত কাহারও সহিত বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করিতেন না। বৎসরে মাত্র তিন দিন তিনি তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণকে প্রকাশ্যে দর্শন দিতেন। পাণ্ডিচেরী আশ্রমে প্রায় আটশত নরনারী অবস্থান করেন। এই ভাবে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল তিনি পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দের অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে বিশেষরূপে পরিস্ফুট। তাঁহার রচনাবলী 'Life Divine' (দিব্যজীবন), 'Essays on the Geeta' (গীতা-নিবন্ধাবলী), 'The Ideal of the Karma-yogin' (কর্ম্মযোগীর আদর্শ) প্রভৃতি বহু গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আধুনিক যুগের এক জন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক বলিয়া পরিগণিত।

আমরা এই দেশবরেণ্য মহামনীষীর পুণ্যস্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দেহত্যাগ—গত ২১শে অগ্রহায়ণ বেলা ৯টা ৩৭ মিনিটের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান যোদ্ধা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বম্বে বিড়লা-ভবনে হৃদ্‌রোগে

দেহত্যাগ করিয়াছেন। অবস্থা উদ্বেগজনক হইবার সময় হইতেই শয্যাপার্শ্বে তাঁহার পুত্র শ্রীদয়াভাই প্যাটেল, কন্যা শ্রীমণিবেন প্যাটেল, পুত্রবধূ, পৌত্র, প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীভি শংকর, বম্বের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম্ ডি ডি গিল্ডার ও ডাঃ নাথুভাই ডি প্যাটেল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সর্দারজীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া দিল্লী হইতে বিমান-যোগে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু, দপ্তরহীন মন্ত্রী শ্রীরাজা-গোপালাচারী, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম-দাস ট্যাণ্ডন প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বিড়লা-ভবনে উপস্থিত হন। দেশীয় নৃপতিগণ, বম্বের মন্ত্রিমণ্ডলী, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, ভারতীয় নৌ বিমান ও সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষগণ সমেত প্রায় পাঁচ লক্ষ নরনারী সর্দারজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁহার নশ্বর দেহ শুভ্র খদ্দরদ্বারা আচ্ছাদিত এবং পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া একটি শকটযোগে অপরাহ্নে শোভাযাত্রা-সহকারে পাঁচ মাইল দূরবর্তী সোনাপুর শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। সমগ্র রাস্তায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, গীতাপাঠ ও ভজন চলিতে থাকে। রাত্রি ৭টা ৫০ মিনিটের সময় সর্দারজীর মৃত-দেহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ শ্মশানক্ষেত্রে এক সময়োপযোগী ভাষণে বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্দারজীর বিরাটত্যাগ, দুঃখবরণ ও গঠনমূলক কার্যাবলী ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর গুজরাটের নাদিয়াদ তালুকের করমসদ গ্রামে বল্লভভাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জাবেরভাই প্যাটেল কৃষিজীবী হইলেও সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি পাঁচ পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় ভি জে প্যাটেল এই পাঁচ জনের মধ্যে একজন ছিলেন। অল্প বয়সেই বল্লভভাই তাঁহার নিজ গ্রামের নিকটবর্তী গণগ্রামের জাবেরবাকে বিবাহ করেন। জাবেরবার গর্ভে কন্যা মণিবেন ও পুত্র দয়াভাইর জন্ম হয়। এই সাধ্বী মহিলা বহুকাল টিউমার রোগে ভুগিয়া ১৯০৮ সালে হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সর্দার প্যাটেল বাল্যকালে নাদিয়াদ শহরে মাতুলালয়ে থাকিয়া তথাকার এক হাই স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৮৯৭ সনে প্রবেশিকা ও ১৯০১ সনে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিছুকাল পাঁচমহল জেলায় ওকালতি করিয়া পরে কয়রা ও আমেদাবাদ যান। ১৯১০ সনে তিনি লণ্ডনে যাইয়া কৃতিত্বসহকারে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন এবং ১৯১৩ সনে ভারতে আসিয়া আমেদাবাদে আইন-ব্যবসা করিতে থাকেন। ফৌজদারী মামলায় সর্দার প্যাটেল খুব প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক অভিমত এবং তৎপ্রবর্তিত অহিংস সহযোগ আন্দোলনের প্রতি সর্দার প্যাটেল প্রথমতঃ একেবারেই সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি পরে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মাজীর প্রধান সহকারী হন। ১৯১৮ সনে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে সর্দারজী সুপ্রতিষ্ঠিত আইন-ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কয়রা সত্যাগ্রহ পরিচালন করেন। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর গবর্নমেণ্টে তথাকার দরিদ্র কৃষকদের দাবী মানিয়া লন। ১৯১৮ সনে আমেদাবাদ মিল-ধর্মঘটে তিনি শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিতে মিল-মালিকগণকে বাধ্য করেন। নাগপুর জাতীয়

পতাকা আন্দোলনে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি হয়। ১৯৮২ সনে তিনি বারদৌলী স্বরাজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথাকার কৃষকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া সত্যাগ্রহ পরিচালনে কৃতিত্ব দেখাইলে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক তিনি সর্দার উপাধিতে সম্মানিত হয়। বল্লভভাই কংগ্রেসের ৪৬ তম করাচী অধিবেশনের সভাপতি এবং মহাযুদ্ধের সময়ে কয়েক বার কারারুদ্ধ ও আটক ছিলেন। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্দারজী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার কংগ্রেসের দুর্জয় সংগঠনী শক্তি ও সাফল্যে তাঁহার অবদান অসাধারণ।

সর্দার প্যাটেল রাজনীতিক কর্মে নিমজ্জিত থাকিয়াও নানাবিধ গঠনমূলক কার্য করিয়াছেন। ১৯৩৫ সনে বোরসাদ তালুকে মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিলে তিনি দীর্ঘকাল ঐ স্থানে থাকিয়া উহা দূরীভূত করেন। গুজরাট বিদ্যা-পীঠের জন্য দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। গুজরাটে বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণকে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে সর্দার প্যাটেল সহকারী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া দেশীয় রাজ্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। এই কার্যপরিচালনে তিনি যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সংগঠনী শক্তি ও কর্ম-কুশলতা দেখাইয়াছেন তাহা যথার্থই অতুলনীয়। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ ছোট-বড় বহু দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সর্দারজীর অক্লান্ত চেষ্টায় অতি অল্পকালের মধ্যে বিনাযুদ্ধে বিনা-বিপ্লবে প্রায় ছয় শত দেশীয় সামন্ত রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহার পূর্বে আর কেহ এরূপ ভাবে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ মহাশক্তিতে পরিণত করিতে পারেন নাই। এ জন্য তিনি যে ভারতেতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সংঘর্ষ-ক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যে অপূর্ব নির্ভীকতার বিকাশ দেখা যাইত। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সংকল্প গ্রহণ এবং উহার অনুসরণ করিতেন। এ জন্য লৌহ-মানব (Iron-man) বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। জাতীয় জীবনের এই সংকটকালে তাঁহার দেহত্যাগে ভারতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, ইহা সহজে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আমরা এই দৃঢ়চিত্ত দৃঢ়কর্মা স্বদেশ-সেবক মনীষীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পল্লীর পরিবেশমধ্যে লালিতা-পালিতা হইলেও তিনি অচিরেই স্বীয় অনুপম পবিত্রতা, মাতৃসুলভ স্নেহ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি-প্রভাবে জনসমাজে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নামে সুপরিচিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে আদর্শ মাতৃত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং ভারতের চিরস্মরণীয়া সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির সমুচিত অলৌকিক গুণরাশির সমাবেশ দর্শনে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ৺ষোড়শীরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে

পূজার্ঘ্য এবং করকমলে স্বীয় সাধনলব্ধ ফল অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের দায়িত্ব স্বভাবতঃই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর উপর অর্পিত হইয়াছিল ; ঐ সময়ে তাঁহারই অদৃশ্য শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং বহু ধর্ম্মপিপাসুকে মুক্তির আস্বাদ প্রদান করিয়াছিল।

তাঁহার শতবর্ষ-জয়ন্তী জগতের সর্ব্বত্র মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় বেলুড় মঠের কর্ত্তৃপক্ষ প্রারম্ভিক কার্য্য সমাধানের জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন এবং একটি কার্য্যপদ্ধতিও নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সমিতিতে আপাততঃ ৮ জন সভ্য আছেন। তাঁহাদের সভাপতি হইয়াছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ এবং সম্পাদক হইয়াছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ। কার্য্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমিতির সভ্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে। জয়ন্তীর জন্য রচিত পরিকল্পনাটি এই :

১। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

২। বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং যথাসম্ভব অন্যান্য দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের একখানি প্রামাণিক ও বিস্তৃত জীবনী এবং আর একখানি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হওয়া বিধেয়।

৩। শ্রীশ্রীমায়ের বিবিধ প্রতিকৃতি ও তাঁহার স্মৃতির উদ্দীপক বিভিন্ন স্থানের চিত্র সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রকাশ করা আবশ্যক।

৪। ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন যুগে ও ক্ষেত্রে যে সকল মহীয়সী নারী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী ও অবদান-মূলক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ আবশ্যক।

৫। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতির দ্বারা পবিত্রীকৃত স্থানগুলিতে স্মৃতিফলক-স্থাপন আবশ্যক।

৬। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সম্বন্ধে রচনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা বিধেয়।

৭। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-আলোচনার্থ বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ নারীপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সভা-সমিতির আয়োজন হওয়া উচিত।

৮। শ্রীশ্রীমায়ের পত্রাবলী ও তাঁহার দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আয়োজন করা আবশ্যক।

৯। কামারপুকুর, জয়রামবাটী ও অন্যান্য যে সকল স্থান শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে তীর্থযাত্রার আয়োজন আবশ্যক।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এতাদৃশ কার্য্যের সাফল্যের জন্য কেবল সুচিন্তিত পরিকল্পনাই পর্য্যাপ্ত নহে, প্রত্যুত প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। সুতরাং যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে মাতৃজাতির সেবা এবং মাতৃপূজা জগতের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, তাঁহাদের নিকট আবেদন এই যে, নিম্নোক্ত যে কোনও বা প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যে যথাশক্তি অর্থদান করিয়া তাঁহারা এই জয়ন্তী উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করুন :—

১। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিরক্ষা।

২। মাতৃজাতির সেবা।

৩। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদির প্রকাশ।

সমস্ত অর্থ ও চেক শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তীর সম্পাদকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে—পোষ্টাফিস বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

বেলুড় মঠ,
অক্টোবর ২৫, ১৯৫০।

স্বাঃ বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক